১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৩৩৮

পরিচয়

পত্রিকা

শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

কল্যাণীয়েষু—

তোমার ত্রৈমাসিকের আসরে আমার কোনো একটি লেখার উদ্দেশে তোমার আমন্ত্রণ আছে। কোনো সাজসজ্জা না ক'রে এক-ছুটে গেলে যদি মানা না পায় তাহলে এই সুরু হোলো।

প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের ক'রলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চল্‌তে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময়রক্ষা ক'রে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে যাত্রা সুরু ক'রতে লজ্জিত হত না, মাসিকপত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখমাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসঙ্কোচে আসরে নাম্‌ত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের 'পরে নির্ভর ক'রে এমনতর আট-পৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেননি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজনে কম প'ড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না।

তা'র পর থেকে চ'ল্‌ল এই ছাঁদেরই মাসিক পত্রের অনুকরণ। নূতনত্বের চেষ্টা কেবল পরিমাণবাহুল্যের দিকে, ফর্ম্মা বৃদ্ধির ঘোড়দৌড়ে। আরো ছবি, আরো গল্প, আরো হাজার রকমের ইত্যাদি।

প্রবাসী-জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি ক'রেচে। জন-সাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু

আঘাতে জাগিয়ে রাখে। এদিকে দেশে লেখক বেশি নেই, এবং অধিকাংশ পাঠক গভীর বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট ক'রতে নারাজ। উদ্বোধনের চেয়ে উত্তেজনা তা'রা স্বভাবত বেশি পছন্দ করে। তাই সাহিত্যের মাসিক মজলিশে মদ যদি বা নাও থাকে অন্তত কড়া চুরুটের প্রচুর আমদানী চাই, সাহিত্যিক তাস-পাশার চেয়ে ভারী রকমের আয়োজনে বৈঠকের রসভঙ্গ হয়।

সাধারণের সঙ্গে যদি কারবার ক'রতে হয় তবে সাধারণের দাবী অজস্র পরিমাণেই মেটানো চাই। নইলে কাজ চলেই না। তাই লোক-চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা জগৎ জুড়েই হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। যারা সেই হাল্‌কা দরের মন ভোলানো মাল যথেষ্ট পরিমাণে ও নিঃসঙ্কোচে জোগাতে পারে তাদের সঙ্গেই আর সকলের প্রতিযোগিতা। হাঁড়ি চলা চাইযে। এ ব্যবসায়ে যারা আছে তাদের মনে উচ্চ সংকল্প থাক্‌লেও নিজের অজ্ঞাতসারে আদর্শ নীচু হ'য়ে আসে। সাধারণের মন-জোগাবার আয়োজন চারিদিকে যতই বিস্তারিত হয় ততই অলস মনের সৌখীন ফরমাস বেড়ে ওঠে। বিপদ এই, তাদেরই বাহবার বাজার দর বেশি। উপযুক্ত লেখকের সংখ্যা কম অথচ লেখার পরিমাণ সীমা মানতে চায় না। অর্থাৎ ভোজে রবাহূত অতিথিসমাগমে পাত পাড়া বেড়েই চলেচে, অথচ দইয়ের হাঁড়ি সে-অনুপাতে টানলে বাড়ে না, তাতে জলের উপর নির্ভর ক'রতেই হয়, আর সে-জলও সকল সময়ে বিশুদ্ধ হতে পারে না। যদি একজন থিয়েটার-ওয়ালা লোভ দেখায় যে ছু'টাকার টিকিটে রাত একটা পর্য্যন্ত অভিনয়ের পালা চালাবে, তাহলে তা'র চেয়েও ছুঃসাহসিক রাত্রি ছুটোর কমে বাতি নেবায় না। তবুও সময় বাড়ালে ভোগ্য বস্তুটাকে ফিকে না করা অসম্ভব—অথচ তাতে নেশার কম্‌তি হলে মঞ্জুর হবে না। এর ফল হয় এই যে, মিতাচারী যে-মানুষ রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ভালো জিনিষের রস ভোগ ক'রে ভালোমানুষের মতো বাড়ি ফিরতে চায় তা'র আর উপায় নেই। এমন কি, ক্রমে তা'রও অভ্যাস মাটি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মেন্‌কেন্ একজন নামজাদা মার্কিণ লেখক, অল্পদিন হোলো তিনি একটা লেখায় বল্‌ছিলেন,—হঠাৎ আর্থিক ছুর্গতি ঘটায় আমেরিকায় সম্প্রতি পাঠক সংখ্যা ক'মে গেল, তাতে দায়ে প'ড়ে রচনার পরিমাণ ক'মে যাচ্ছে। তাঁর মতে এটাকে বলা যায় শাপে বর। চারদিক থেকে লেখা চাই লেখা চাই রবে উপযুক্ত পরিমাণ সময় নিয়ে লেখবার অবকাশ থাকে না। বইয়ের পাত ও নিজের গাঁঠ ভরাবার প্রলোভন যদি শান্ত হয় তাহলে লেখার উপরে নিষ্কামভাবে যোলো আনা মন দেওয়া সহজ হবে। নইলে অত্যন্ত পসারগ্রস্ত ডাক্তার যেমন হাঁসপাতালে ঢুকে

তাড়াতাড়ি একধার থেকে নাড়ি টিপে বাঁধা নিয়মে চল্‌তি ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌ষণ লিখে দিয়ে দ্রুত পদে মোটরে চ'ড়ে বসেন,—তেমনি বহু ফরমাসে আক্রান্ত লেখক বাঁধা খদ্দেরদের সাধারণ পছন্দ বাঁচিয়ে হু হু ক'রে কলম চালিয়ে যান—ঘন ঘন নগদ-বিদায়ে তাঁদের ব্যবসা চলে। এই নগদ-বিদায়ের বস্তা বস্তা লেখা ক'মে যায় লোভের তাগিদ ক'ম্‌লেই। এর থেকে বোঝা যায়, পাঠক-সাধারণের নিয়ত দাবীর কর্ষণে সকল দেশেই সস্তা সাহিত্যের প্রচুর ফলন্ ফলচে, অর্থাৎ খেলো নবাবীর বাহুল্যে কাশ্মীরে ঝুঁটা শালের উৎপত্তি বিপত্তির মতোই হ'য়ে উঠ্‌ল, যথেষ্ট সময় দিয়ে সেকেলে ভালো শাল রচনা সময়ে ও সামর্থ্যে এখন আর পোষায় না। সে সব বড়ো দরের শিল্প যাবার দাখিল।

আমার বক্তব্য, সাহিত্যেই কি, ব্যবহার-সামগ্রীতেই কি, অধিকাংশের সম্বলের দিকে তাকিয়ে এ-কথা বল্‌তেই হবে যে, সস্তা সামগ্রীর প্রয়োজন বহু পরিমাণে আছে। তাই ব'লে, আদর্শের দাবী, পরিমাণের মাপে যার বিচার করা চলে না, সে যদি স্তরে স্তরে চাপা প'ড়তে থাকে তাহলে তা'র চেয়ে শোকাবহ আর কিছুই হতে পারে না।

আদর্শরক্ষা ক'রতে গেলে প্রয়াসের দরকার, সাধনা না হলে চলেনা। বারোয়ারির আসরে দাঁড়িয়ে সাধনা অসম্ভব। সেই সাধনাপেক্ষী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো, ক্ষেত্রও চাই উদার। এ-জায়গায় ভিড় জমাবার আশা নেই, কাজেই গুণজ্ঞের পরিতোষ ছাড়া অন্য পারিতোষিকের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতেই হবে। সাধারণের খ্যাতি-নিন্দার চড়া-নামা অনুসারে অর্থের দিকে সাহিত্যবাজারের এক্‌স্‌চেঞ্জ্ রেট্ ওঠে নামে। সেদিকে দুর্য্যোগ ঘ'টলেও মনের শান্তি রক্ষা করা চাই। শান্তি থাকেনা যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে। শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ মেনে অর্থকে অনর্থ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মীর ভ্রূভঙ্গ উপেক্ষা ক'রেও যদি সরস্বতীর ভজনা করবার ভরসা থাকে তবেই বিশুদ্ধভাবে অবিচলিত মনে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনায় নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয়।

একদা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের উপর দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসজাত শ্রেষ্ঠ আদর্শের বিশিষ্টতাকে বিশুদ্ধ রাখবেন তাঁরা। সেই উদ্দেশ্যে, জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের বাহুল্য তাঁদের কমাতে হোলো। তাঁদের কাছ থেকে উজ্জ্বল বেশ বা আত্মঘোষণার বিচিত্র সমারোহ কেউ প্রত্যাশাই ক'রত না। তাঁদের সম্মান নির্ভর ক'রত তাঁদের সত্যের উপর, গভীর সংযম ও বাহুল্যবর্জ্জিত সুরুচির উপর। অর্থাৎ পরিমাণ নিয়ে তাঁদের বিচার ছিল না, তাঁদের গৌরব ছিল আন্তরিক পরিপূর্ণতা নিয়ে। জন-সাধারণের সম্মতি মেনে নিয়ে তাঁদের আদর্শ টিঁকে ছিল না, তাঁদের

আদর্শকেই জনসাধারণে সবিনয়ে মেনে নিত। তা'র কারণ, সাধ
দ্বারাই তাঁরা সত্যের অধিকার পেয়েছিলেন। ভোগবাহুল্যবর্জ্জিত উপক
বিরল জীবনযাত্রার জন্যে তাঁদের যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ি
জনসাধারণ সেটা জুগিয়ে দেওয়া দ্বারাই নিজেকে সার্থক ও সম্মানিত ব
ক'রত,—সে জন্যে কারো মন জুগিয়ে তাঁদের মাথা হেঁট ক'রতে হত ন
যখন থেকে ব্রাহ্মণ নিজের দায়িত্বরক্ষার কঠিন সাধনা ছেড়ে দিয়ে কে
পৈতে দেখিয়ে সম্মান ও অর্থ আদায়ের সহজ পথ অবলম্বন ক'রে
তখন থেকে কী ঘট্‌ল এ-প্রসঙ্গে সে-আলোচনা অনাবশ্যক।

আমার বলবার কথা এই, সাধারণের মন না রেখে সাহিত্যে
বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব কোনো না কোনো জায়গায় থাকা চাই। নই
দেখতে দেখতে সাহিত্য অন্ত্যজবর্ণের রূপ ধ'রবেই। বিশিষ্ট সাহিত্য
অবলম্বন ক'রে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে একদিন মণিল
আমার কাছে এসেছিল। আমি জানতুম, এটা কঠিন কাজ,—আম
অন্য কর্ত্তব্যের উপর এটা চাপালে বোঝা দুঃসহ ভারী হবে তাই নি
এ-দায় নিতে রাজি হলুম না। অথচ অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এক
অনেকদিন ভেবেচি—তাই সংকল্পটাকে একেবারে নামঞ্জুর ক'রতে পারল
না। নৌকো ভাসাবার জন্যে প্রথম ধাক্কাটা দিতে এবং কিছুদিনের জ
লগি ঠেল্‌তে রাজি হলুম। তখন বয়স এখনকার চেয়ে অল্প এবং সাহ
এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। প্রমথকে সম্পাদক ক'রতে পরাম
দিয়েছিলুম। কেননা যদিও তিনি পড়াশুনো ক'রেচেন আমাদের চে
অনেক বেশি, তবু সংকলনের দ্বারা ঝুলি ভর্ত্তি করা মন তাঁর নয়। ভাবন
সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের একটা স্বকীয় প্রবর্ত্তনা ও লেখবার সম্বন্ধে এক
স্বকীয় ছাঁদ আছে। সম্পাদকের এই গুণ থাকলে কাগজটা বেগবান হ'
ওঠে। এই বেগ তাঁর সহযোগী লেখকদের মনকে ঠেলা দিয়ে তাঁদে
চিত্তকে সতর্ক ও উদ্যমশীল ক'রে রাখতে পারে।

মণিলালের সঙ্গে প্রথম সর্ত্ত এই হোলো যে, যারা ওজন দরে ব
গজের মাপে সাহিত্য-বিচার ক'রে তাদের জন্যে এ-কাগজ হবে না। স
লেখাই পয়লা নম্বরের হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএ
আয়তন ছোটো ক'রতেই হবে। গল্প না দিলে মরণং ধ্রুবং, তবু বাড়াবাি
বর্জ্জনীয়, অর্থাৎ গল্প স্বল্প হবে, এক গ্রাসে দুটো চারটে চলবে না। ছি
দেওয়া নিষেধ, বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যাজ্য, তা'র মানে, মুনফার লো
থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই। লোকসান জিনিষটা কারে
পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক্, ছোটো আয়তনের কাগজে ছোটো আয়তনে
লোকসান সাংঘাতিক হবে না এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে

নিঃসঙ্কোচ রাখাই ভালো। মণিলাল রাজি হলেন, বল্‌লেন, এ-কাগজে ব্যবসার ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না। লক্ষ্মী দেবী সকৌতুকে হাস্‌লেন কিন্তু ভ্রূকুটি ক'রলেন না।

বিনয় রক্ষা ক'রে সাবধানে কথা কওয়া শাস্ত্রবিহিত। আমরাই উঁচুদরের লেখার আদর্শ প্রবর্ত্তন করবার জন্যে সংসারে এসেচি এই কথা সর্ব্বদা মনে রেখে লেখকীয় উচ্চ বর্ণের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন ক'রে চলার ভঙ্গীটাকে ইংরেজিতে বলে হাই-ব্রাউয়িজ্‌ম্, উঁচ্-কপালেগিরি। এটা ভালো নয়,—তাই ব'লে নত-চক্ষু অতি-নম্র ছদ্ম বিনয়ের আত্মলাঘবভঙ্গীটা মাটির মানুষের লক্ষণ ব'লে সাধারণ্যে প্রশংসিত হ'লেও সেটাকে পরিহার করা চাই। আমাদের মধ্যে শক্তির পরিমাণ কার কত তা নিয়ে নিজের মনে বা পরের কানে কথা তুল্‌তে গেলে অত্যুক্তি এসে প'ড়বে। কিন্তু একথা বল্‌তে দোষ নেই, যে, যার যত শক্তি থাক্ তা'র উপযুক্ত প্রকাশের জন্যে বাইরের দাবীটা একটা মস্ত প্রেরণা। আকাশে আষাঢ়ের সজল মেঘ ফিরে ফিরে আসে অথচ পৃথিবীর হাওয়ায় রসের অভ্যর্থনা নেই—মেঘ অল্প স্বল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চ'লে যায়, মাটি যথেষ্ট ভেজে না। দানের জল আষাঢ়ের কমণ্ডলুতে পূরো পরিমাণ আছে কিন্তু ধরার অঞ্জলি ঠিক মতো ক'রে তুলে ধরা হয় নি ব'লে ঋতুর দানসত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল এমন ঘটনা বারবার ঘটে। সাহিত্যেও সে-কথা খাটে। আমি মণিলালকে এই কথাটি ব'ললুম, "তুমি যে-কাগজ বের ক'রবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তা'র চেয়েও বড়ো কথা। সে-দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়,—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে-দাবী থাকবে। সে-চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ ক'রে সাবধান করে; লেখায় অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সঙ্কুচিত হয়; অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চারিত্রবৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তা'র তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি ক'রে তুল্‌বে।"

অবশেষে সবুজ পত্র বাহির হোলো। এই পত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোল্‌বার জন্যে কিছুকাল সাধ্যমতো চেষ্টা ক'রেছিলেম সে কথা তোমাদের জানা আছে। আশা ছিল ক্রমে আমার ভার লাঘব হবে এবং একদল নতুন লেখক নিজের শক্তিকে আবিষ্কার ক'রে নতুন উদ্যমে এ'কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুজনে লগি ঠেলার জায়গায় পাঁচ-সাতজন দাঁড়ি জুটে গেলে তখন হাঁফ ছাড়ব।

এই অধ্যবসায়ে অন্তত একজন ওস্তাদ লেখকের সাড়া পাওয়া গেল। তখন তাঁর নাম ছিল অজানা, আশা করি, এখন তাঁর নাম জানে এমন লোক খুঁজলে মেলে। তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি নিজের চিত্তের জোরে নিজের মতো ক'রেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ ক'রে প্রকাশ ক'রতে পারেন। তিনি নতুন কালের নতুন লেখক তাতে সন্দেহ নেই, সেইজন্যেই তাঁকে বাইরে নূতনত্বের ভেক ধারণ ক'রতে হয় নি, চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নূতনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।

যাই হোক্ ভার কম্‌ল না। সাময়িক কাগজের বাঁধা ফর্‌মাস জুগিয়ে চলা সেকেলে ট্রামগাড়ির ঘোড়ার মতো দুঃখী জীবের কাজ। মন ছুটি চাইল, ক্লান্ত হ'য়ে শেষকালে জবাব দিলুম। বন্ধ হোলো চিত্রবিহীন ফর্ম্মা-বিরল সবুজ পত্র।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ফর্ম্মা গণনা ক'রে সবুজ পত্রের আয়ু নির্ণয় কোরো না। সবুজ পত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এ-জন্যে যে-সাহস যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েচে তা'র সম্পূর্ণ গৌরব একা প্রমথনাথের। এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দর মহলে। অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে সদরের সভায় এখন সে যে-প্রশস্ত আসন নিয়েচে সেটা আজকাল তক্‌মা-পরা চোপদারেরও চোখে পড়ে না। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বিবাদ বিদ্রূপ যথেষ্ট হ'য়ে গেছে কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-সব জিনিষের যাথার্থ্য প্রমাণ হয় না। একবার যেম্‌নি এ'কে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেচে। তা'র কারণ, এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তা'র নিজের স্বভাবের মধ্যেই; ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে' দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

যথার্থ স্বত্বাধিকারীকে প্রবল পক্ষ অনেকদিন যখন বঞ্চিত ক'রেচে তখন তাকে দখল দেওয়াবার জন্যে যে-মানুষ কোমর বেঁধে সীমানার কাছে এসে দাঁড়ায় তা'র মাথা বাঁচানো শক্ত হয়, কারণ লোকে তাকেই বলে ডাকাত। প্রমথর পিঠে অনেক বাড়ি প'ড়েচে, কিন্তু অহিংস্রনীতি তাঁর নয়। মোটা লাঠির ঘা খেয়েচেন, চালিয়েচেন তীক্ষ্ণ সড়কি। যাই হোক্ বাংলা ভাষার হাওয়া যেই পূব দিকে মুখ ফেরাল অমনি তখন থেকে একটা নব বারিবর্ষণের পালা প'ড়েচে। শুনেচি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্ত্তি ক'রেচেন ব'লে গৌরব করেন কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ ক'রেচেন তা'র চেয়ে

ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানিনে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।

দুঃসাহসে ভর ক'রে তুমি "পরিচয়" ত্রৈমাসিক বের ক'রেচ। এটিকে কী মূর্ত্তি দিলে মন খুসি হবে সেইটি জানাবার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতে ব'সেছিলুম। আমার মতো স্বভাব-কুঁড়ে মানুষ কেজো লোকের চেয়ে অনেক বেশি খেটে মরে, কিন্তু নিজেকে ভোলাবার জন্যে খাটুনিকে কুঁড়েমির মুখোষ পরাতে হয়। তোমাকে যখন লিখ্‌তে বসলুম প্রথমটা মন পিছু-হঠবার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে, "বাস্‌রে, আবার কলম ধরো কেন?" আমি তাকে দিলাশা দিয়ে ব'ললুম, "ভয় নেই, একখানা চিঠিমাত্র।" মন তখন তুল্‌কি গতিতে ব'কে গেল। তাকে লাগাম পরাতে গেলে দুর্ঘটনা ঘট্‌ত। কিছুকাল থেকে আমার এই দশা। বহুকালের স্বভাবদোষে নানারকমের চিন্তা অন্তরের ক্ষেত্রে চ'রে বেড়ায়। বেঁধে যদি তাদের চালাতে যাই তাহলেই বল্‌গা দাঁতে কাম্‌ড়িয়ে ধ'রে থেমে যাবার চেষ্টা করে। তখন জিন লাগাম ফেলে দিয়ে খালি পিঠে চ'ড়ে পা দোলাতে দোলাতে মাঠে বাটে বনে বাদাড়ে দৌড় করিয়ে নিয়ে আসি—এ'কেই বলে আমার চিঠি। (এ হচ্চে নিজের মনকে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খাওয়ানো। এ'কে চিঠি বলাই ভুল। যাকে লিখি সে লক্ষ্য নয়, সে উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু উপ-লক্ষ্যেরও দাম আছে, এরকম চিঠিও সবাইকে লেখা চলে না। ব্যক্তি-বিশেষের অন্দর দরজার ভিতর দিয়ে অবশেষে এ-চিঠিগুলো পৌঁছয় গিয়ে সদরে। তা'র খোলা জানলায় ব'সে সে যদি ডাক দিয়ে না আন্‌তে পারে তাহলে রাস্তা পাওয়া যায় না। রাস্তাটি পরিচিত রাস্তা হওয়া চাই। মানে এ নয় যে অনেক দিনের জানা রাস্তা, কিন্তু তা'র মধ্যে যেন একটি স্বভাবসিদ্ধ পরিচয় আছে, বাধা কম, বন্ধুত্ব থাক্ বা না থাক্, বন্ধুরতা নেই।)

বোধ করি আমার কাছে একখানা প্রবন্ধ প্রত্যাশা ক'রেছিলে। আজকাল সেই প্রত্যাশাকে অত্যন্ত ডরাই ব'লে এই পত্র। এর মধ্যে নিজের কথা অনেকখানি আছে কিন্তু সেটাও অবান্তর, সেই প্রসঙ্গে কিছু ব'লেচি যেটা প্রবন্ধে বলা চলত। অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অলস মনকে তা'র অজ্ঞাতসারে একটুখানি কর্ত্তব্য করিয়ে নিয়েচি। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রীতি-বিচার

শ্লেষ

(১)

বর্ত্তমান কালের বিদগ্ধ মানুষ তার স্বদেশী ভাষার কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। একটি দুটি বিদেশী ভাষার সাহিত্যের সাক্ষাৎ অনুশীলনে সে অভ্যস্ত, এবং অনুবাদের মারফৎ আরও অনেক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এর ফলে আধুনিক কাব্য-রসিক ও সাহিত্য-পাঠকদের রসজ্ঞতা ও সাহিত্যিক বোধ সূক্ষ্ম ও উদার হ'য়েছে। রস-সৃষ্টির যে কৌশল ও সাহিত্য-রচনার যে ভঙ্গী ভাষা-বিশেষের বিশেষত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে তাকে খুব বড় দাম দিতে তার মন নারাজ। এবং সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধরা-বাঁধা কোনও নির্দ্দিষ্ট উপায় নেই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকেরা যে নানা ঋজু ও কুটিল পথে এক-ই গন্তব্যে যেয়ে পৌঁছেন এ প্রত্যয় তার মনে আজ সুদৃঢ়। অর্থাৎ কাব্য ও সাহিত্যের যাকে মোটামুটি বহিরঙ্গ বলা যায়, ভাষার সেই প্রয়োগ-কৌশল থেকে দৃষ্টি স'রে এসে প্রায় একান্তভাবে নিবদ্ধ হ'য়েছে ওদের মর্ম্ম-স্থানে, রস ও বক্তব্যের উপরে। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের সাহিত্য-রসিকদের চিত্তধারা স্বভাবতই বিভিন্ন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্য ও সাহিত্যই ছিল তাঁদের চর্চ্চার বিষয়। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত কাব্যাদির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু ও-সব ভাষা ছিল দৈবী সংস্কার-সম্পন্ন দেব-ভাষা সংস্কৃতের অনুচর মাত্র, তৎভব বা তৎসম (১)। তার সঙ্গে সমান আসনে বসার অধিকারী নয়। সেইজন্য কাব্য ও সাহিত্য বিচারে সংস্কৃত ভাষার কোনও কোনও বিশেষত্বকে তাঁরা সাহিত্য-রচনার অপরিহার্য্য গুণ বা দোষ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। এ কালের মানুষের বিশেষকে সামান্য ব'লে ভুল করার এ সম্ভাবনা অনেকটা কম। নানা ভাষার সাহিত্যের চর্চ্চা ও তুলনা তাকে সে ভ্রম থেকে রক্ষা করে। কিন্তু একটিমাত্র ভাষায় লেখা সাহিত্যের উপর অখণ্ড মনোযোগের একটা সুফলও ফলেছিল। কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ঐ ভাষা প্রয়োগের সমস্ত রকম কল-কৌশলের দিকে তাঁদের ঔৎসুক্য ছিল অপরিসীম। এবং মনের সমস্ত বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে রচনা-রীতির গুণদোষের কারণ ও স্বরূপ তাঁরা অনুসন্ধান করেছিলেন। ফলে যা আবিষ্কার করেছিলেন তার বেশীর

---

(১) সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥ (দণ্ডী, কাব্যাদর্শ ১।৩৩।)

ভাগ কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য-রচনা রীতির বিশেষত্ব নয়, সকল ভাষার ও সকল সাহিত্যের রচনা-রীতির সাধারণ দোষগুণ। কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই ভাষা প্রয়োগের কতকগুলি মূল কৌশল আছে, যা সকল ভাষাতেই প্রায় এক। বিশ্লেষণের শক্তি যাদের আছে তারা যে কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্য পরীক্ষা ক'রে এ গুলি আবিষ্কার ক'র্‌তে পারেন। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাই করেছিলেন। আমরা আধুনিক লোক অনেক ভাষার কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা ক'রে, এবং অনেক ভাষার কাব্য সাহিত্যের অন্য ভাষার অনুবাদমাত্র প'ড়ে প'ড়ে, প্রায় ভুল্‌তে বসেছি যে ভাষা সাহিত্যের পোষাক নয়, শরীর। এবং দেহহীন আত্মা আর যেখানেই থাক্‌ সাহিত্যে নেই। প্রাচীনকালেও দেখা যায় আমাদের নব্য-আলঙ্কারিকেরা রসকে যখন কাব্যের আত্মা ব'লে দৃঢ়নিশ্চয় হ'লেন তখন কাব্যের রচনা-রীতি সম্বন্ধে তাদের আর অনুসন্ধিৎসা থাক্‌ল না। নব্য-আলঙ্কারিকদের পুঁথিতে রীতি-বিচার দু-এক পৃষ্ঠাতেই শেষ হ'য়েছে, এবং তাঁদের বক্তব্য প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি মাত্র।

(২)

ইংরেজিতে যাকে 'ষ্টাইল' বলে তার আলঙ্কারিক নাম 'রীতি' বা 'মার্গ'। "বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ" (বামন)। কাব্য ও সাহিত্য রচনায় পদের মনোনয়ন ও তার বিন্যাস-প্রণালীর বিশেষত্বই হচ্ছে 'রীতি'। 'ষ্টাইল'-ও এ ছাড়া আর কিছু নয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন ছবিতে রেখার যে স্থান, কাব্য ও সাহিত্যে রীতি বা ষ্টাইলের সেই স্থান। "রীতিষু রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতং" (বামন)। চিত্র যেমন রেখায় প্রতিষ্ঠিত, কাব্য তেমনি রীতিতে প্রতিষ্ঠিত। ছবিতে রং ফলানো, তার অংশ সংস্থানের পারিপাট্য, তার ভাবের অভিব্যঞ্জনা এ সবের উৎকর্ষ অসম্ভব হয় যদি না মূলে থাকে রেখাঙ্কনের বিশুদ্ধি ও সুকৌশল। পদবিন্যাসের কুশলতাকে আশ্রয় ক'রেই কাব্যের অলঙ্কার, ধ্বনি, রস এ সব ফুটে ওঠে। শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যে পদ-প্রয়োগের নৈপুণ্য, ও তার গ্রন্থণ-ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব প্রথমেই পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। আলঙ্কারিকদের মধ্যে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে ;—

> "তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
> পদবিন্যাস মাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ॥"

সে নারীর রূপ-ই বা কি, আর সে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বই বা কোথায়,—পদ-বিন্যাসমাত্রই যারা মনকে না মুগ্ধ করে। অর্থাৎ 'ষ্টাইলের'

চমৎকারিত্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের একটি সুব্যক্ত অব্যভিচারী লক্ষণ।

যদি সমগ্রভাবে দেখা যায় তবে প্রত্যেক যথার্থ কবি ও সাহিত্যিকের 'ষ্টাইল' তাঁর নিজস্ব। কারও রচনা-রীতি ঠিক অন্য কারও মত নয়; যেমন এক মানুষের মুখের গড়ন ঠিক অন্য মানুষের মত নয়। সুতরাং প্রতি কাব্য ও সাহিত্য-স্রষ্টার রীতির তুলনা ও প্রভেদ আলোচনা অসম্ভব। আলঙ্কারিক দণ্ডীর কথায় এ যেন ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়ের স্বাদের তফাৎ। আস্বাদয়িতা মাত্রেই বোঝে এ সব জিনিষের মিষ্টত্বের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কিন্তু সে প্রভেদ সম্পূর্ণ ক'রে ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে স্বয়ং সরস্বতীও অক্ষম; কারণ তা অনির্ব্বচনীয় (২)। কাজেই রীতি-বিচার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ধ'রে রচনা-রীতির কয়েকটি মুখ্য বিভাগ বা 'টাইপের' গুণদোষের বিচার ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। এমনধারা শ্রেণী-বিভাগেও আলঙ্কারিকেরা দেখেছেন;—

"অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।" (কাব্যাদর্শ)।

যদি পরস্পরের সব সূক্ষ্মভেদ ধরা যায় তবে তার সংখ্যাও বড় কম হয় না। সুতরাং আলোচনাকে নিষ্ফল বাহুল্য থেকে রক্ষার জন্য প্রায় অলঙ্কারিক-ই দুটি মাত্র রীতির পরস্পর তুলনা ক'রে 'ষ্টাইলের' লক্ষণ ও দোষগুণের বিচার ক'রেছেন। কারণ তাঁদের মতে এ রীতি-দুটি প্রায় বিপরীত ধর্ম্মী, রচনা-পদ্ধতির সুমেরু কুমেরু। আর সব 'ষ্টাইল' এদের মধ্যবর্ত্তী; একটির বা অন্যটির দুটি একটি লক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়াই কারও বিশেষত্ব, উভয় রীতির কতক লক্ষণ কিছু কিছু মিশিয়ে কারও বা সৃষ্টি। এ দুটি রীতির একটির নাম বৈদর্ভী, অন্যটির নাম গৌড়ী।

বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ মোটামুটি প্রাচীন বিদর্ভ। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ নিয়ে ছিল প্রাচীন গৌড়দেশ। বৈদর্ভী আর গৌড়ী এ নাম দুইটি এসেছে অবশ্য ঐ দুই দেশের নাম থেকে। বামন প্রশ্ন করেছেন,—"কিং পুনর্দেশবশাদ্রব্যবদ্‌গুণোৎপত্তিঃ কাব্যনাম্, যেনায়ং দেশাবিশেষব্যপদেশঃ।" দেশের জলমাটির গুণে যেমন উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ দোষ জন্মে, তেমনি দেশভেদে কি কাব্যেরও রকম বদ্‌লায় নাকি যে দেশের নামে কাব্যের রীতির নামকরণ হয়? উত্তর দিয়েছেন, তা অবশ্য নয়; সুধু দেশ কাব্যের কিছু ভালমন্দ জন্মায় না। ঐ ঐ দেশের কবিরা ঐ রচনারীতির স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি ও অনুসরণ করেছেন ব'লেই দেশের নামে

---

(২) ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥ (কাব্যাদর্শ, ১।১০২।)

রীতির নাম (৩)। বিদর্ভ দেশের কোন কবি সম্প্রদায়, হয়তো বা বৈদর্ভী দময়ন্তীর কাব্য-গাথা গান ক'রে, বৈদর্ভী রীতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন তা জানা নেই। গৌড়ের কোন কবি পরম্পরা গৌড়ী রীতিকে বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন সে ইতিহাসও অজ্ঞাত। বামনের অনুমানের মূলে সত্য কতখানি আছে তা-ও ঠিক ক'রে বলা চলে না। কিন্তু এ অজ্ঞতায় কিছু যায় আসে না। বৈদর্ভী রীতি কাকে বলে, আর গৌড়ী রীতিই বা কি আলঙ্কারিকেরা তা পরিষ্কার বলেছেন। এবং তা থেকে দেখা যায় এ দুই রীতির নামের ইতিহাস যা-ই হোক, এ দুটি 'ষ্টাইল' সব দেশের সব কালের সাহিত্যেই রয়েছে। অর্থাৎ ও নাম দুটি পারিভাষিক, এবং নামধেয় রীতি দুটি সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালিক।

(৩)

বৈদর্ভী রীতির পরিচয় দিতে যেয়ে বামন বলেছেন, "সমগ্রগুণা বৈদর্ভী" ;—'ষ্টাইলের' যে গুলি গুণ তার সব যাতে রয়েছে তার নাম বৈদর্ভী রীতি। বলা বাহুল্য এটা সংজ্ঞা নয়, স্তুতি। সুতরাং আলঙ্কারিকেরা কাকে বৈদর্ভী রীতি বলেন তা বোঝার উপায় 'ষ্টাইলের' কোন কোন বিশেষত্বকে তারা গুণ বলেন তার অনুসন্ধান নেওয়া। 'ষ্টাইলের' এই সব গুণদোষের বিচারই আলঙ্কারিকদের রীতি-বিচার।

যে সব গুণের সমাবেশে বৈদর্ভী রীতি 'সমগ্রগুণা', অর্থাৎ আলঙ্কারিকদের মতে যে সব বিশেষত্ব 'ষ্টাইলের' গুণ, তার ফর্দ্দ দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শের' একটা শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

> "শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
> অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ॥" (১।৪১)।

শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি। এই দশটি হচ্ছে 'ষ্টাইলের' গুণ, এবং এর সবগুলি যে লেখায় আছে তার ষ্টাইল হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বৈদর্ভী। বামন তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্রেও' এই দশটি গুণের নাম করেছেন। কিন্তু নাম এক হ'লেও এই দুই আলঙ্কারিকের কাছে তাদের অর্থ সব সময় এক নয়। এঁদের গ্রন্থে এই দশটি নামে যে সব গুণ বোঝায় তা অনেক জায়গায় অল্প বিস্তর ভিন্ন। বিশেষ সন্দেহ নেই যে এই নামগুলি অতি

---

(৩) তত্রত্যৈঃ কবিভির্যথাস্বরূপমুপলব্ধত্বাত্তৎসমাখ্যা।
ন পুনর্দেশৈঃ কিংচিদুপক্রিয়তে কাব্যানাম্। (কাব্যালঙ্কার সূত্র ২।১০।)

প্রাচীন, এবং যে সব আলঙ্কারিকদের পুঁথি আমরা পাই তাঁদের সময় এই নামগুলির অর্থ নিয়ে মতভেদ ঘটেছে।

(৪)

দণ্ডীর শ্লোকে 'ষ্টাইলের' প্রথম গুণটির নাম 'শ্লেষ'। শ্লেষ শব্দের অর্থ সংযোগ। যে বাক্যের উচ্চারণে তার অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে উচ্চারণ হয় সেই বাক্যে এই শ্লেষ-গুণ রয়েছে, অর্থাৎ সে বাক্য হচ্ছে 'শ্লিষ্ট'। "শ্লিষ্টমস্পৃষ্টশৈথিল্যম্" (দণ্ডী); শ্লিষ্ট বাক্য হচ্ছে তাই শিথিলতা যাকে স্পর্শ করে নাই। সোজা কথায় 'ষ্টাইলের' প্রথম গুণ হচ্ছে যে পদ-বিন্যাস এমন হবে যে বাক্যগুলির গড়ন হবে আঁটা সাঁটা, ঢিলে ঢল্‌ঢলা নয়। এই আঁট্-সাঁট্ রচনাকে আলঙ্কারিকেরা বলেন 'গাঢ়বন্ধ'; যার বিপরীত হচ্ছে 'শিথিলবন্ধ'।

কিন্তু রচনাকে গাঢ়বন্ধ করা যায় অনেক উপায়ে। অর্থাৎ গাঢ়-বন্ধত্বের রকমভেদ আছে। সংস্কৃত ভাষায় এর একটা সহজ উপায় হচ্ছে দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদ দিয়ে বাক্য-রচনা করা; এবং সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম এ উপায়কে খুব সাহায্য করে। নমুনা স্বরূপ ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকের' মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি নেওয়া যেতে পারে।

চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জ্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভারমুচ্চাটয়ং
শ্চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ॥

'শিরোভূষণ চন্দ্রের চারুকলার প্রকট শিখাগ্রে যিনি দীপ্তিমান, চঞ্চল কাম-পতঙ্গকে লীলাবশে যিনি অবলীলায় দগ্ধ করেছিলেন, মঙ্গল যাঁর সম্মুখে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অন্তরের অপার মোহতিমিরের গুরুভার উত্তোলন ক'রে সেই মহাদেব যোগীদের চিত্তগৃহে জ্ঞানের প্রদীপ হ'য়ে বিরাজ করেন।' ভর্তৃহরির এই শ্লোকটি যে গাঢ়বন্ধ তা বলা বাহুল্য। ওর প্রথম ও তৃতীয় চরণ পদগুলির সমাস ও সন্ধিতে জমাট বেঁধে এক হ'য়ে আছে; এবং সমস্ত শ্লোকটির শব্দের গতি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটানে চ'লে এসেছে, কোথাও আহত হয় নি। তবে ভর্তৃহরি বড় আর্টিষ্ট; দীর্ঘ সমাস দিয়ে তিনি নাক ও কানের দম বন্ধ করেন নি। প্রথম চরণের লম্বা একটানা সমাসের পর, দ্বিতীয় চরণে স্বর ও কানকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়ে, তবে আবার জমাট তৃতীয় চরণটি এনেছেন; এবং শেষ চরণে দীর্ঘ-সমাস

একবারে বর্জ্জন ক'রে কানকে ক্লান্তি-বিরামের সুখ ও বৈচিত্র্যের চমৎকারিত্ব দিয়ে খুসি করেছেন।

কিন্তু আলঙ্কারিকেরা বলেন বৈদর্ভী-রীতির শ্লেষ এ গাঢ়বন্ধত্ব নয়। সমাস ও সন্ধির চাপে বাক্যের যে জমাটবাঁধা ভাব তার নাম 'ওজঃ'; বাঙ্গলায় আমরা যে ভাবে বলি 'ওজঃস্বিনী ভাষা' কি 'ওজঃস্বিনী বক্তৃতা'। তাঁদের মতে বৈদর্ভী-রীতির কোনও কোন রকম গদ্যে ওটি বেশ লাগসই বটে, কিন্তু পদ্যে অচল। গৌড়ী-রীতির লেখকেরা ঐ রকম দীর্ঘ-সমাসবদ্ধ পদ দিয়েই পদ্যকেও গাঢ়বন্ধ করেন, কিন্তু শ্লেষ তা নয়। (৪)। শ্লেষের গাঢ়ত্ব হচ্ছে পৃথক্ সব পদের গাঢ়বন্ধন। পদগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাক্‌বে কিন্তু বিন্যাসের কৌশলে মনে হবে যেন একটি মাত্র পদ। বামন শ্লেষকে বলেছেন মসৃণত্ব। "মসৃণত্বং শ্লেষঃ", এবং ব্যাখ্যা করেছেন, "মসৃণত্বং নাম যস্মিন্ সতি বহূন্যপি পদান্যেকবদ্ ভাসন্তে"। সুতরাং শ্লেষ হচ্ছে সেই গুণ যাতে পদগুলির পৃথকত্ব বজায় থাকে, অথচ রচনা হয় গাঢ়বন্ধ, অর্থাৎ অশিথিল ও মসৃণ। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলার' নান্দী বাক্যটি পরীক্ষা করা যাক্।

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

এ শ্লোকের পদগুলি লম্বা সমাস দিয়ে বড় বড় খণ্ড ক'রে একত্র গাথা নয়, সুতরাং এর অংশগুলির মধ্যে ফাঁক আছে যথেষ্ট; এমন কি এর সন্ধি-সমাসবদ্ধ পদগুলিও জমাট বাঁধা একাকার নয়, তাদেরও অংশ-গুলির ব্যক্তিত্ব বজায় আছে। (৫)। কিন্তু তার ফলে শ্লোকটির গড়নে কোথাও শিথিলতা আসে নি, বা তার গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। পদগুলির পৃথকত্ব বজায় রেখেই এর রচনা চমৎকার গাঢ়বন্ধ, এবং এর

(৪) ওজঃ সমাসভূযস্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্।
পদ্যেঽপ্যদাক্ষিণাত্যানামিদমেকং পরায়ণম্॥ (কাব্যাদর্শ, ১।৮০)।

দণ্ডী সাধারণভাবে 'গদ্যস্য' বলেছেন বটে, কিন্তু 'কাব্যাদর্শের' টীকায় ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ দেখিয়েছেন যে ওর যথার্থ অর্থ কোনও কোনও রকমের গদ্য প্রবন্ধ। কারণ এমন সব গদ্য ছিল যাতে দীর্ঘ সমাস ব্যবহার হ'তো না। "এতৎ সমাসভূয়স্ত্বরূপমোজঃ, গদ্যস্য পদ্যপ্রবন্ধবিশেষস্য উৎকলিকা প্রায়াত্মকস্যেত্যর্থঃ, চূর্ণকাদৌ দীর্ঘসমাসত্বাভাবাৎ"।

(৫) যেমন 'সর্ব্ব-বীজ-প্রকৃতি-রিতি', 'প্রপন্ন-স্তনুভি',-রবতু 'বস্তাভি-রষ্টাভি-রীশঃ'। ভর্ত্তৃহরির শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের 'লীলা-দগ্ধ-বিলোল-কাম-শলভঃ' তুলনা করলেই প্রভেদটি স্পষ্ট বোঝা যায়। 'লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ' সমাসবদ্ধ একটি পদ। কিন্তু ওর অন্তর্গত মূল পদগুলির ব্যক্তিত্ব লোপ হ'য়ে যায় নি, যেমন প্রথমও তৃতীয় চরণে হ'য়েছে।

অব্যাহত গতি 'বলের' মত একটানা গ'ড়িয়ে চলা নয়, সুগঠিত দেহের স্বচ্ছন্দ সুঠাম গতি-ভঙ্গী। আলঙ্কারিকেরা একেই বলেন 'শ্লেষ'। রচনায় গাঢ়বন্ধত্ব 'ষ্টাইলের' একটা প্রধান গুণ, কিন্তু বন্ধের এ গাঢ়তা আস্‌বে পদগুলিকে তাল পাকিয়ে একাকার ক'রে নয়, বিচিত্রকে ঐক্যের বন্ধন দিয়ে। অর্থাৎ এ গাঢ়বন্ধত্ব mechanical নয়, organic।

(৫)

যে ভাষায় সন্ধি নেই ও সমাস চলে না সেখানে গাঢ়বন্ধত্ব মাত্রেই এই বৈদর্ভী শ্লেষ, কারণ গৌড়ী ওজঃ তাতে অসম্ভব। সুতরাং সে ভাষায় কেবল শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাতেই বন্ধের গাঢ়তা দেখা যায়; কারণ সন্ধি-সমাসের মোটা উপায়টা না থাকায় একমাত্র শ্লেষের সূক্ষ্ম কারিকুরি-ই সেখানে লেখায় গাঢ়বন্ধত্ব আন্‌তে পারে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যই সে ভাষার রচনা যেখানে গাঢ়বন্ধ, তার ফলও কান ও মনের উপর চমৎকার। যেমন কীট্‌স্ এর Mermaid Tavern-এর আরম্ভটা ;—

Souls of Poets dead and gone,
What Elysium have ye known,
Happy field or mossy Cavern,
Choicer than the Mermaid Tavern?

বামন 'শ্লেষের' উদাহরণ দিতে যেয়ে 'কুমারসম্ভবের' প্রথম শ্লোকটি তুলেছেন ;—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

সংস্কৃত ভাষায় যেটুকু সন্ধি সমাস এক রকম অপরিহার্য্য, এবং যা সে ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকার খাপ খায়, কালিদাস তার সাহায্য পেয়েছেন। অনুস্বার বিসর্গের সুকৌশল প্রয়োগে সংস্কৃত রচনায় যে সংহতি আসে কালিদাস তাও ব্যবহার করেছেন। কীট্‌স্-এর এ-সব সুবিধা ছিল না। কিন্তু তাঁর কবিতার গাঢ়বন্ধত্ব কালিদাসের শ্লোকের চেয়ে কম নয়; ও কবিতা যেমন অশিথিল, তেমনি মসৃণ। অবশ্য তুলনা কর্‌তে হ'লে কালিদাসের কবিতার বিষয়ের গাম্ভীর্য্য, এবং কীট্‌স্-এর কবিতার বিষয়ের লঘুত্ব তাঁদের ভাষায় যে ভিন্ন ছায়া ফেলেছে তার তফাৎটা মনে রেখে তুলনা কর্‌তে হবে। এবং সম্ভব পাঠকের মনে হবে কীট্‌স্-এর কবিতার

বন্ধগাঢ়তা কালিদাসের শ্লোকের চেয়েও বা মনোরম, কারণ ওর 'শ্লেষের' কৌশল আরও প্রচ্ছন্ন, শিল্প আরও সূক্ষ্মতর।

সন্ধি-সমাসহীন ভাষায় 'শ্লেষ' যে সহজ-লভ্য নয়, তার কারণ সেখানে রচনা সাধারণত হ'য়ে পড়ে হয় শিথিল, নয় অমসৃণ। ভাষা হয় নিজেকে টেনে লতিয়ে চলে, নয় খট্ খট্ ক'রে লাফিয়ে হাঁটে। কীট্‌স্‌-এর কবিতাটির সঙ্গে টেনিসনের The May Queen-এর প্রথম চার লাইন তুলনা করা যাক্ ঃ—

You must wake and call me early, call me early, mother dear ;
To-morrow 'ill be the happiest time of all the glad New-year ;
Of all the glad New-year, mother, the maddest meriest day ;
For I'm to be the Queen O' the May, mother, I'm to be Queen
[O' the May.

কীট্‌স্‌-এর তুলনায় এ কবিতায় বন্ধের গাঢ়তা নেই বল্লেই চলে। তার কারণ এ নয় যে কীট্‌স্‌-এর কবিতা অল্পমাত্রিক হ্রস্ব-ছন্দের কবিতা, আর টেনিসনের কবিতার হচ্ছে বহুমাত্রিক দীর্ঘ ছন্দ। শিল্পীর হাতে প'ড়লে দীর্ঘ-ছন্দের কবিতাও সমান গাঢ়বন্ধ হ'য়ে ওঠে।

Where are the songs of spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,—
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue ;

কীট্‌স্‌-এর এ দীর্ঘ ছন্দের কবিতাও চমৎকার গাঢ়বন্ধ। আবার ছন্দ হ্রস্ব হ'লেই গাঢ়বন্ধত্ব আসে না। যেমন টেনিসনের—

Go not, happy day,
From the shining fields,
Go not, happy day,
Till the maiden yields.
Rosy is the West,
Rosy is the South,
Roses are the cheeks,
And a rose her mouth.

'Maud'-এর এ কবিতার ছন্দ খুবই হ্রস্ব, এবং বিষয়ও কবিত্বের, কিন্তু তবুও কবিতাটি গাঢ়বন্ধ হ'য়ে উঠল না। কারণ শিথিলতা থেকে মুক্ত হ'লেও মসৃণতা ওতে আসে নি। লতিয়ে চলা যদি বা এড়ান যায়, অমনি এসে পড়ে লাফিয়ে হাঁটা।

আলঙ্কারিকেরা বলেছেন 'শ্লেষের' গাঢ়বন্ধত্বের মূল হচ্ছে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের বিন্যাসের সুকৌশল। স্বরবর্ণ, বর্গের অযুগ্মবর্ণ অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ, এবং য, র, ল, ব্ এই কয়টি হচ্ছে অল্পপ্রাণ বর্ণ কারণ, অল্প আয়াসেই এদের উচ্চারণ করা যায়। বাকী বর্ণগুলি

মহাপ্রাণ, যাদের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ যত্নসাধ্য। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে-রচনায় 'শ্লেষ'-গুণ আছে দেখা যায় তাতে অল্পপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ বেশী, দণ্ডীর কথায় সে রচনা "অল্পপ্রাণাক্ষরোত্তরম্" ; কিন্তু তার মাঝে মাঝে এমন কৌশলে মহাপ্রাণ বর্ণের বিন্যাস থাকে যাতে রচনা একসঙ্গে গাঢ় ও মসৃণ হ'য়ে ওঠে। ক্রমদীশ্বর ভ্রমরের গুঞ্জনের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন ঃ—

"অল্পপ্রাণেষু বর্ণেষু বিন্যাসোঽপ্যন্তরান্তরা।
মহাপ্রণস্থ চ শ্লেষো যথায়ং ভ্রমরধ্বনিঃ॥"

আলঙ্কারিকদের এ 'থিওরি' পরীক্ষার ভার পণ্ডিতদের উপর দেওয়া গেল। পাঠকদের মধ্যে যদি কেউ কুতূহলী থাকেন তবে Mermaid Tavern ও 'কুমারসম্ভব' থেকে যে দুটি শ্লোক তোলা গেছে তাতে এ 'থিওরি' প্রয়োগ ক'রে দেখ্‌তে পারেন। আলঙ্কারিকদের কথা নেহাৎ মিথ্যা মনে হবে না।

(৬)

কবির ক্ষমতা যতই কম হোক্, পদ্য রচনায় কিছু না কিছু গাঢ়তা এসেই যায়। তার কারণ কবিতার ছন্দ। ছন্দের ছকে আস্‌লেই ভাষা কতকটা গাঢ়বন্ধ না হ'য়ে পারে না। কিন্তু গদ্যরচনায়, যেখানে ছন্দের সাহায্য নেই, সেখানে 'শ্লেষ'-কে আয়ত্ব করা কঠিনতর কাজ। বামন গদ্যকে বলেছেন 'দুর্ব্বন্ধ', কারণ ওকে গাঢ়বন্ধ করার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই ; এবং পূর্ব্বাচার্য্যদের একটি বচন তুলেছেন, "গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি" (১।৩।২১), গদ্যরচনা হচ্ছে সাহিত্যিকদের ক্ষমতার কষ্টিপাথর। আর কোনও ক্ষমতার কষ্টিপাথর হোক্ না হোক্ রচনাকে গাঢ়বন্ধ করার ক্ষমতার যে কষ্টিপাথর তাতে সন্দেহ নেই। অথচ গাঢ়বন্ধত্বের প্রয়োজন পদ্যের চেয়ে গদ্যেই বেশী। কবিতার আর পাঁচটা উপকরণ আছে যা দিয়ে তার বন্ধগাঢ়তার ত্রুটি ঢাকা পড়ে। ওর ছন্দের সুর ও তাল, অনুপ্রাসের কৌশল, অলঙ্কারের দীপ্তি—এ-সব-ই কবিতার সহায়। এগুলির প্রসার পদ্যের তুলনায় গদ্যে অতি সামান্য। সেইজন্য গদ্যরচনার গাঢ়বন্ধত্বের অভাব আর কিছু দিয়ে পূরণ হওয়া কঠিন। নারীর দেহে রেখার সুষমা ও গড়নের বৈচিত্র্য আছে ; নানা অলঙ্কারে তাকে অলঙ্কৃত করা চলে। দৃঢ়বন্ধত্বের অভাব হ'লে পুরুষের দেহ হ'য়ে পড়ে নিতান্ত কুশ্রী।

সংস্কৃতের গদ্যরচনা প্রায়ই হচ্ছে দীর্ঘসমাসবহুল। তাই লক্ষ্য ক'রেই দণ্ডী বলেছেন যে দীর্ঘসমাস হ'লো গদ্যের প্রাণ,—"গদ্যস্য জীবিতম্"।

যে দুখানি গদ্য-কাব্য সংস্কৃতে অতি প্রসিদ্ধ, এবং যা থেকে আলঙ্কারিকেরা নানা উদাহরণ তুলেছেন, সেই 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ দিয়েই লেখা। তবে বাণভট্ট হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর লেখক। তাঁর লেখার গুণে দীর্ঘসমাসের অনবরত ব্যবহারেও তার রচনা কোথাও শ্রুতিকটু নয়, কোথাও তার প্রসাদ-গুণ নষ্ট হয় নি। এবং সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির অশেষ মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বাণভট্ট আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

"আসীদশেষনরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ, চতুরুদধি-মালা মেখলয়া ভুবো ভর্ত্তা, প্রতাপানুরাগাবনতসমস্তসামন্তচক্রঃ—।"

দীর্ঘসমাসশূন্য যে গদ্য সংস্কৃতে চল্‌তি ছিল আলঙ্কারিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'চূর্ণক' বা 'চূর্ণ'। লম্বা সমাস না থাকায় বাক্যের অংশগুলি ছোট ছোট টুক্‌রোয় ভাঙ্গা বা চূর্ণ ব'লেই সম্ভব এর নাম 'চূর্ণক'। বামন এর যে উদাহরণ দিয়েছেন,—"অভ্যাসো হি কর্ম্মাণাং কৌশলমাবহতি। নহি সকৃন্নিপাতমাত্রেণোদবিন্দুরপি গ্রাবণি নিম্নতামাদধাতি।" (৬)—তা থেকেই বোঝা যায় এ গদ্য নিতান্তই কাজের কথার গদ্য, হিতোপদেশের ভাষা। কাব্যের গদ্য এ নয়। এবং লেখায় যাঁরা কিঞ্চিৎ মাত্রও সাহিত্য-রস আন্‌তে চেয়েছেন তাঁরাই ও গদ্য ত্যাগ ক'রে দীর্ঘসমাসের আশ্রয় নিয়েছেন। এর প্রধান কারণ দীর্ঘসমাসশূন্য অথচ গাঢ়বন্ধ এমন গদ্য সংস্কৃত ভাষায় গ'ড়ে ওঠে নাই। অর্থাৎ সংস্কৃত-গদ্যের গাঢ়বন্ধত্ব মাত্রেই গৌড়ী ওজঃ, বৈদর্ভী শ্লেষ ও ভাষার গদ্যে নেই। সংস্কৃত পদ্য-সাহিত্যের তুলনায় ওর গদ্য-সাহিত্য যে নিতান্ত হীনপ্রভ তার মূল এইখানে। যাকে বলা যায় 'সাহিত্যিক' গদ্য লম্বা সমাসবদ্ধ চেহারা ছাড়া তার অন্য কোনও রূপ ছিল না; এবং সে গদ্য একমাত্র কাব্যেই অতি কষ্টে চলে, তা-ও মহা-শক্তিশালী লেখকের হাতে। এর ফলে যে গদ্য-প্রবন্ধ কাব্য নয় তা লিখ্‌তে গিয়ে সংস্কৃত-লেখকেরা তার সাহিত্যিক গড়নের দিকে কিছুমাত্র নজর দেওয়া দরকার মনে করেন নি; কারণ যখন কাব্য নয় তখন অর্থ প্রকাশ হ'লেই হ'ল। টীকাকার ও ভাষ্য-লেখকেরাও যে লম্বা লম্বা সমাস দিয়ে লিখেছেন তার উদ্দেশ্য নয় রচনাকে গাঢ়বন্ধ করা, এবং অতিদীর্ঘসমাস সত্ত্বেও তাঁদের লেখা মোটেই গাঢ়বন্ধ নয়;—তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যেমন ক'রে হোক্ খুব কম কথায় খুব বেশী কথা বলা। ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন শঙ্করাচার্য্যের লেখায়;—

"যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদি বিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততোনিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং

(৬) কাব্যালঙ্কার সূত্র; ১।৩।২৪।

হস্তময়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিত-তৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তীতি, এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্ত্তন্তে তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখী ভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্চাদিভিঃ পুরুষাণং প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহারঃ।”

এ লেখা দেখে বোঝা যায় যে সংস্কৃত গদ্যেও বৈদর্ভী শ্লেষ গ’ড়ে উঠ্‌তে পার্‌ত। কিন্তু এ রকম গদ্য শঙ্করাচার্য্যও খুব বেশী লেখেন নি; অন্য লেখকদের ত কথাই নেই।

(৭)

বাঙ্গলা ভাষায় সন্ধি নেই বল্‌লেই হয়, এবং সমাস যেটুকু চলে সংস্কৃতের তুলনায় তা কিছুই নয়। যে সমাস সংস্কৃতে মোটেই দীর্ঘসমাস নয়, এবং যা সে ভাষার চূর্ণকে বা শ্লেষে চমৎকার চলে, বাঙ্গলার ক্ষীণ শরীরে তা গুরুভার। সে রকম সমাস দিয়ে যদি বাঙ্গলা রচনাকে গাঢ়বন্ধ করা যায় তবে তা হয় ওজঃ, শ্লেষ নয়। এবং ওজঃ বাঙ্গলা ভাষার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। ঠিক এই জন্যই বৈদর্ভী রীতির লেখকেরা গদ্য রচনাকে দীর্ঘসমাস দিয়ে গাঢ়বন্ধ ক’র্‌লেও, কবিতায় ও প্রথা বর্জ্জন ক’রে-ছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের মতে কবিতার প্রকৃতির সঙ্গে ওজঃ খাপ্ খায় না।

দীর্ঘসমাসবদ্ধ রচনার মূল কথা হচ্ছে খুব বড় বড় টুক্‌রো দিয়ে বাক্যকে গাঁথা। কিন্তু বড়-ছোটর কোনও বাঁধা মাপকাঠি নেই। সংস্কৃতের আয়ত শরীরে যা ছোট, বাঙ্গলার স্বল্পদেহে তাই বড়। সেই জন্য কেবল লম্বাসমাসযুক্ত পদ নয়, খুব বড় মহাপ্রাণ পদ, অর্থাৎ গালভরা শব্দও বাঙ্গলা-বাক্যের বড় টুক্‌রো। এ রকম পদ বেশী দিয়ে লিখ্‌লে বাঙ্গলা রচনা ঠিক তা-ই হয়, দীর্ঘসমাসবহুল পদ দিয়ে সংস্কৃতে বাক্য-রচনা কর্‌লে যা হয়। দীর্ঘসমাসের চাপে সংস্কৃত গদ্য মাথা তুল্‌তে পারে নি; সমাস ও মহাপ্রাণ শব্দের ভারে বাঙ্গলা গদ্য একেবারে পিষে যায়।

গত একশ বছর ধ’রে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ‘ষ্টাইল’ যে বদ্‌লে আস্‌ছে তার গতি হচ্ছে দীর্ঘসমাস ও দীর্ঘশব্দ, আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেন ‘উদ্ধত পদ’,—তার গাঢ়বন্ধত্বের মায়া ছেড়ে, ছোট ছোট টুক্‌রো দিয়ে বাক্যকে গাঢ় ক’রে গ’ড়ে তোলার দিকে। অর্থাৎ গৌড়ী ওজঃ ছেড়ে বাঙ্গলা গদ্য বৈদর্ভী শ্লেষের পথ ধরেছে, যে পথ সংস্কৃত গদ্য কখনও খুঁজে পায় নি।

(৮)

ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের পণ্ডিতমহাশয়েরা সাধু বোধে যে বাঙ্গলা গদ্য লিখেছেন তা সংস্কৃত গদ্য-কাব্যের গড়নের দিকে চেয়ে, এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বাক্য স্মরণ ক'রে যে ওজঃ বা সমাসবাহুল্যই হচ্ছে গদ্যের প্রাণ।

"ভাবনার এ বড় অদ্ভুত শক্তি যে অসিদ্ধ বস্তুও সিদ্ধবৎ প্রতীত হয়; অতএব শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থসকল যে ভাবনাতে সিদ্ধ হবে তাহা কি কহিব? আজ অবধি এইরূপ ভাবনা শাস্ত্রেতে কর, তবে তোমার ঝটিতি শাস্ত্রার্থ সাক্ষাৎকার হবে। —এইরূপে ধনুর্বিদ্যাজিজ্ঞাসুর হস্তজড়তা দূরীকরণ পুরঃসর শীঘ্রহস্ততা সম্পাদনার্থ কর্ণপর্য্যন্ত করাকর্ষণ-ভ্যাসপ্রায় মহিষীভাবনাভ্যাসবশতঃ অনবস্থিতচিত্ততা নিরাকরণ পূর্ব্বক অনন্যমনতা সম্পাদন করাইয়া শিষ্যকে শাস্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন।"

এ সমাস বাঙ্গালা গদ্যের প্রাণ না ফাঁসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে কথা ভাবা দরকার মনে করেন নি। সংস্কৃত গদ্যের ওজঃ যে এ রচনার কাছেও আসেনি, এবং আস্‌তে পারে না, সে দিকেও দৃষ্টি দেন নি। দীর্ঘসমাসে সংস্কৃত গদ্য গাঢ়বন্ধ হয়, সুতরাং দীর্ঘসমাস দিয়ে বাঙ্গলা গদ্য লিখে গেছেন। কিন্তু বাঙ্গলা গদ্যের প্রাণ যে কোথায় তার খোঁজ ও-লেখাটার প্রথম দিকে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিজেই দিয়েছেন, কারণ সেটা গুরুর মুখের কথা, লেখকের হাতের লেখা নয়।

সংস্কৃত গদ্যের যথার্থ অনুরূপ বাঙ্গলা গদ্য বাঙ্গলা সাহিত্যে আনেন বিদ্যাসাগর। যে মাত্রাজ্ঞান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিন্দুমাত্র ছিল না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তা ছিল পুরোমাত্রায়। বিদ্যাসাগর জান্‌তেন যে সংস্কৃত গদ্যের দীর্ঘসমাস বাঙ্গলা গদ্যে আন্‌লে সংস্কৃত গদ্যের ওজঃ বাঙ্গলা গদ্যে আসে না, সে হ'য়ে পড়ে কিম্ভুত কিম্বাকার একটা গড়নশূন্য জিনিষ। সংস্কৃত গদ্যের ওজঃ বাঙ্গলায় আস্‌তে পারে সংস্কৃতের তুলনায় অনেক ছোট ও অনুদ্ধত পদের সুকৌশল প্রয়োগে।

"রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লব শোভার আবির্ভাব; বাহু-যুগল কোমল বিটপ-শোভা ধারণ করিয়াছে; আর নব যৌবন বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।"

এ গদ্য মধুর, মসৃণ এবং অনেকটা গাঢ়বন্ধ। কিন্তু এ হচ্ছে রাজ-সভার ভাষা,—প্রসন্ন-গম্ভীর, কিন্তু প্রাণের লীলা-বৈচিত্র্য এর মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায় না। সভা থেকে বের ক'রে মুক্ত আকাশের তলে খোলা মাটির উপর একে দাঁড় করান যায় না।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ হতেই বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গালীর মন লুঠ ক'রে নিলেন সে তাঁর বাঙ্গলা গদ্যের 'ষ্টাইলের' গুণে নয়, তাঁর প্রতিভার নূতন সৃষ্টির ক্ষমতায়, নূতন রসের উদ্ভাবনে।

"নগেন্দ্রসঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে মনে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরিদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চন বর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ; অলকস্পর্শীভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণ-তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতি বিশিষ্ট।"

এ গদ্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের চেয়ে মধুরও নয়, মসৃণও নয়, গাঢ়বন্ধও নয়। এবং সংস্কৃতের অনুকরণে লম্বা সমাসগুলি বাঙ্গলা গদ্যের ভার-কেন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছে। ওর সমাসবদ্ধ পদের দীর্ঘ, স্ফীত দেহের মন্দগতি সূর্য্যমুখীর চোখের সমস্ত রূপটা পাঠকের চোখের সাম্‌নে একসঙ্গে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে না। যদি সংস্কৃতে লেখা যেতো, 'অলকস্পর্শীভ্রূযুগসমাশ্রিতং কমনীয়বঙ্কিম পল্লবরেখামধ্যস্থং স্থূলকৃষ্ণতারা-সনাথম্'—তবে হ্রস্বদীর্ঘ ও গুরুলঘুর যথাযথ উচ্চারণে, এবং অনুস্বারের মৃদঙ্গধ্বনিতে ওর মধ্যে যে সংহতি ও গাম্ভীর্য্য আস্‌তো বাঙ্গালায় তা সম্ভব নয়। বাঙ্গলা গদ্যে দীর্ঘ, স্ফীত সমাসের প্রাণ থাকে না, সুধু ভারটা অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত গদ্যের নকল ছেড়ে সমাসহীন ও অসুদ্ধত পদ দিয়ে বাঙ্গলা লিখেছেন, তখন তাঁর গদ্যের রূপ হ'য়েছে সম্পূর্ণ আলাদা।

"সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই; ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটীতে ভ্রমরের মন; লেখাপড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর।"

সূর্য্যমুখীর রূপবর্ণনার চেয়ে ভ্রমরের এ পত্র লেখার বর্ণনা অনেক বেশী মসৃণ ও গাঢ়বন্ধ। তার কারণ এর গাঢ়তা সমাস কি বড় বড় শব্দের চাপে নয়, ছোট ছোট কথার শব্দ-সামঞ্জস্যে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য এখানে ওজঃ ছেড়ে শ্লেষকে আশ্রয় করেছে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' যুগেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে রস যেখানে

হাল্‌কা, কি গভীর কথাও একটু কৌতুকের ছাঁদে বল্‌তে হবে সেখানেই এ গদ্যের স্থান। 'গভীর কথা, গভীর সুরে শুনিয়ে দিতে' হ'লে ওজঃকেই আশ্রয় কর্‌তে হয়। শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যে এ মত বদ্‌লেছিলেন তা সকলেই জানেন।

(৯)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বাঙ্গালার গদ্য-রচনায় 'সাধু বনাম চল্‌তি ভাষার' যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সে যুদ্ধে কোনও পক্ষের হার হয় নি, কারণ যুদ্ধটা তর্কযুদ্ধ এবং হার কেউ স্বীকার করেনি। কিন্তু যুদ্ধের পর শান্তির মজ্‌লিসে প্রমথ বাবু সম্পূর্ণ জিতেছেন। বাঙ্গলা গদ্যের চেহারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বদল হয়েছে। প্রমথ বাবুর রচনা-রীতি যে-লেখকেরা ষোল-আনা মানেন নি, তাঁরাও বার-আনা গ্রাহ্য ক'রেছেন। এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকে তঁার বাঙ্গলা গদ্যের বাহন ক'রে এর শক্তি ও বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী পাঠককে নিত্য বিস্মিত কর্‌ছেন।

প্রমথ বাবুর গদ্য-রীতির একটা প্রধান কথা হচ্ছে বাঙ্গলা গদ্যকে সম্পূর্ণ বৈদর্ভী শ্লেষ দিয়ে গাঢ়বন্ধ করা, গৌড়ী ওজঃ-এর সঙ্গে কোনও আপোষ না রেখে। সমস্ত রকম দীর্ঘ-সমাস ও শব্দাড়ম্বর বর্জ্জন ক'র্‌তে হবে, অথচ রচনা হবে যেমন অাঁট-সাঁট, তেমনি মসৃণ। সকলেই জানেন বাঙ্গলার ক্রিয়াপদ নিয়ে লড়াই-টাই ছিল ও যুদ্ধের একটা প্রধান পর্ব্ব। এর কারণ খুব স্পষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় থেকে বাঙ্গলার সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির যে রূপ চ'লে আস্‌ছিল তা যেমন লতানো, তেমনি শিথিল। 'হইয়া', 'করিয়া', 'যাইয়া' 'হইতেছিল', 'করিতেছিলাম', 'যাইতেছিলেন'—এ-সব ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে আন্‌লে তাকে গাঢ়বন্ধ করা হয় একরকম অসম্ভব কাজ। সুতরাং বাঙ্গলা গদ্য হ'য়ে পড়ে নিতান্ত শিথিল। এই শিথিলতা থেকে মুক্তির জন্য লেখকেরা অনেক সময় ক্রিয়াপদ প্রায় বর্জ্জন ক'রে বাক্যের পর বাক্য লিখে চল্‌তেন, কিন্তু তাতে প্রায়-ই আন্‌তে হ'তো দীর্ঘ-সমাস। অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলির ঠিক ও-রূপ বজায় রেখে বাঙ্গলা গদ্যে শ্লেষ আনা যায় না, এবং শ্লেষ ছিল প্রমথ বাবুর লক্ষ্য। সুতরাং তিনি কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের কথার অনুরূপে ক্রিয়াপদগুলিকে কেটে ছোট কর্‌লেন। বাঙ্গলার ক্রিয়াপদগুলি ওর দুর্ব্বলতার জায়গা। এই উপায়ে সে দুর্ব্বলতা প্রমথবাবু অনেকটা দূর করেছেন, কিন্তু ও-দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ ঘুচবার নয়। ক্রিয়াপদগুলি ছোট হ'য়ে গাঢ়বন্ধত্বের সহায় হ'য়েছে, কিন্তু স্বল্প-ক্ষম লেখকের হাতে প'ড়লেই

মসৃণত্বের পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে। এ দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ গোপন ক'রে, বাঙ্গলা গদ্যকে বৈদর্ভী শ্লেষের পূর্ণ গড়ন দিতে পারে, শুধু প্রমথবাবুর মত যাঁরা ওস্তাদ আর্টিষ্ট।

প্রমথবাবুর গদ্য বাঙ্গলা গদ্যে বৈদর্ভী শ্লেষের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ওর মেদশূন্য শরীর যেমন দৃঢ়সংনদ্ধ, ওর গতি তেমনি অবাধ ও জড়তাহীন।

"যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেন নি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায়, তাঁর অভিভাষণ এতই জলের মত হয়েছে যে, তা এক-নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণ গন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়,—কেননা তা হয় অমৃত, নয় সুরা।" ('নানা-কথা'। সাহিত্য-সম্মিলন।)

এটা প্রমথবাবুর লেখার অত্যন্ত একটা সাধারণ নমুনা। এই লেখাকেই যদি অনতিপূর্ব্ববর্ত্তি যুগের যে কোনও বাঙ্গলা গদ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় তবে এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝ্‌তে মুহূর্ত্ত লাগে না।

বাঙ্গলা গদ্যে যে প্রমথ বাবুর রীতি ভাষাকে কত বেশী জোরালো ও ধারালো করে তা রবীন্দ্রনাথের সম-শ্রেণীর একটি পুরনো লেখা ও একটি আধুনিক লেখা পর পর পড়্‌লেই বোঝা যায়।

"এ কন্‌ফারেন্স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী! আমরা ইংরাজি শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামর-সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরী করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয় হরণের জন্য ছল-বল-কৌশল-সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।" ('স্বদেশী সমাজ'।)

"যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স। সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা;—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন, দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাস্‌চে, আর মাথার

উপর অপমানের মূষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌চে, "অদৃষ্ট"! দেশের সেই পোলিটিশান আর দেশের সর্ব্ব-সাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্‌ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বল্‌চে "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী"। তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চল্‌ছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম 'চাই' আজ তেমনি জোরেই বলচি 'চাইনে'। ('রায়তের কথা'র ভূমিকা।)

প্রমথ বাবুর গদ্য-রীতির একটা বিশেষ গুণ এই যে ওর ক্রিয়াপদ ও অব্যয় প্রভৃতি অন্যান্য কলকব্জাগুলো হাল্কা হওয়াতে সংস্কৃত ভাষার অনেক বিচিত্র সুরের ও বিচিত্র বর্ণের বিশেষ্য-বিশেষণ এ ভাষা অনায়াসে নিজের শরীরে বহন কর্‌তে পারে, ভারে নুয়ে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের শেষের লেখাটি তার প্রমাণ। নৌকা চল্‌ছে ইলেক্‌ট্রিক মোটরে, মাঝি মাল্লা, রসা রশির ভার কম; ওতে মাল ভর্ত্তি করা যায় অনেক।

প্রমথ বাবুর লেখা থেকেই একটা নমুনা তোলা যাক্‌।

"সে দেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদন-সখা বসন্ত যে ভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোন এক সুপ্রভাতে, ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল পরে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে—অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমন বার্ত্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট, এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন,—পশু-পক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।"

('বীরবলের হালখাতা'; ফাল্গুন।)

'সাধু'-গদ্যে এ কথা লিখ্‌তে গেলে অবিচ্ছিন্ন বড় বড় কথার চাপে ভাষায় এমন জড়ত্ব এসে যেতো যে বিলিতী ঋতুরঙ্গের বসন্ত-লীলাটি তার মধ্যে কিছুতেই ফুটিয়ে তোলা যেতো না।

একখানি 'বীরবলের হালখাতা' ও একখানি 'নানা-কথা' হাতের কাছে রয়েছে। যেখানেই খুলছি ইচ্ছা হয় এই গাঢ়বন্ধ বৈদর্ভী গদ্যের নমুনা তুলি। কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, সে লোভ দমন কর্‌তে হ'লো। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' থেকে একটা জায়গা তুলেই শেষ কর্‌বো। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দেহ ছিল 'সাধু'-গদ্য ছাড়া অন্য গদ্য বাঙ্গলায় কাব্যের ভাষা হ'তে পারে কি না। রবীন্দ্রনাথের মুখে তার উত্তর শোনা যাক্‌।

"এখানকার পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্যজড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোন রাগিনীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধুয়ো নেই, তাল নেই, শম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিষ ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না।............

তাই ও যখন ভাব্‌চে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুসি, এমন সময়ে আষাঢ় এলো পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েচে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরি-নির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কূল ছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছু দিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাক বাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।”

টিপ্পনী ক’রে এর মোহ নষ্ট করবো না।

শ্লেষের কথা শেষ হ’লো। পাঠকদের মন জানার উপায় নেই। সম্পাদক-সঙ্ঘ যদি অভয় দেন রীতি-বিচারের বাকী কথা ক্রমশঃ বলা যাবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ

এদেশে যাহাকে আমরা 'অদ্বৈতবাদ' বলি, পাশ্চাত্যদর্শনে তাহার নাম Idealism। অধ্যাপক ডয়সন Idealism-এর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

The Atman is the sole reality; with the knowledge of it, all is known ; there is no plurality and no change. Nature, which presents the appearance of plurality and change, is an illusion.

অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মই পরমার্থ-সত্য—উপনিষদের ভাষায়, তিনিই 'সত্যস্য সত্যম্'। তাঁহাকে বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়—আত্মনি খলু অরে বিদিতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। কারণ, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—নানা, বিবিধ, বিচিত্র, দ্বৈত বলিয়া কোন কিছু নাই। এই যে বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ—ইহা প্রতীতি, মায়া মাত্র। কারণ, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। তিনিই পূর্ব্বে, তিনিই পশ্চিমে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই অধে—এই বিশ্ব তিনি বই নহে।

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং, পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ ব্রহ্ম, দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

অর্থাৎ (দার্শনিকের ভাষায়)

" God alone and nothing besides Him is real. The universe as regards its extension in space and bodily consistence is in truth not real ; it is mere illusion, as used to be said, mere appearance as we say to-day."

আর জীব ?—যাহাকে পাশ্চাত্য দর্শনকার Individual soul বলেন। 'The Individual soul like the external world has no reality'—যেমন জগৎ, তেমনই জীব—জীবেরও কোন বাস্তব সত্তা নাই—জীবও সত্য নহে, বস্তু নহে,—প্রতিভাস মাত্র।

' The Individual soul is an apparition, as the external world is an appearance. It is all Avidya—illusion.'

ব্রহ্মসূত্রের ভাষায়, মায়ামাত্রংতু কাৎস্নেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ। ফলতঃ দার্শনিক বিচারের বিষয়ীভূত এই যে তত্ত্বত্রয়—ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব—অদ্বৈত মতে এ ত্রিতয়ের (triad-এর) মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ—অপর দুইটি—অর্থাৎ জগৎ ও জীব, অবিদ্যার বিজৃম্ভণ—অসৎ। এবং এই জীবাত্মা তত্ত্বতঃ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। সেই জন্য চারি বেদের চারি মহাবাক্য বা চরম উপদেশই এই—সোহং, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ও অহং ব্রহ্মাস্মি।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ —কৈবল্য, ১৭

পুনশ্চ এই যে আত্মা বা ব্রহ্ম, তিনি অজ্ঞেয়—তিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা-সহ। সেই জন্য তিনি (তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়) 'অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত অনিলয়ন'—Unseeable, Unutterable, Unfathomable, Unrealisable। অতএব তাঁহার একমাত্র লক্ষণ বা নির্দ্দেশন 'নেতি, নেতি'—যেহেতু, তিনি সমস্ত ধর্ম্ম ও গুণ (attributes ও qualities) হইতে বিভিন্ন—অন্যত্রধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—অতএব স এষ নেতি নেতি আত্মা।

অধিকন্তু, এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—'He is the knowing Subject within us'—তিনিই একমাত্র বিষয়ী—একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা,—নান্যৎ অতোস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোস্তি শ্রোতৃ। এই দ্রষ্টা কিন্তু কখনও দৃশ্য হন না, হইতে পারেন না—এই বিষয়ী (subject) কিন্তু কখনও বিষয় (object) হন না, হইতে পারেন না। 'The knowing subject is itself unknown'—ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ। সেই জন্য তিনি—অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ—তিনি দ্রষ্টা কিন্তু দ্রষ্টব্য নন, শ্রোতা কিন্তু শ্রোতব্য নন, মন্তা কিন্তু মন্তব্য নন, জ্ঞাতা কিন্তু জ্ঞাতব্য নন।

অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র

উপরে আমরা উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে তিনটি সূত্র বিস্পষ্ট হইল :—

(ক) ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই একমাত্র বস্তু—তিনিই পরমার্থ-সত্য (Sole Reality)—জীব ও জগৎ প্রতিভাস, ছায়া বা মায়া মাত্র—Apparition, Appearance, Illusion ভিন্ন অন্য কিছু নহে ;

(খ) জীব ও ব্রহ্ম—জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন—সোঽহং, তত্ত্বমসি ;

(গ) আত্মাই বিষয়ী (Knowing Subject within us) কিন্তু তিনি অবিষয়—object—নহেন—তিনি জ্ঞাতা কিন্তু কখনও জ্ঞেয় হন না। তাঁহার পরিচয়—নেতি নেতি মাত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই সকল সূত্র কিরূপ অকুণ্ঠ ও অমোঘভাবে বিবৃত ও বিস্তৃত করিয়া অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে সমস্ত দার্শনিক চিন্তার লক্ষ্য— ঐক্য-সাধন, —খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিশিষ্টের মধ্যে সামান্য,—এক কথায়, বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা। *

পাশ্চাত্য দেশে ইহার সংজ্ঞা 'Monism'। Monism বলিলে কি বুঝায় ?

'It involves that all plurality (consequently all proximity in space, all succession in time, and inter-dependence of cause and effect, all contrast of subject and object) has no reality in the highest sense.'

অর্থাৎ দৈশিক দূরান্তিকত্ব, কালিক পূর্ব্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্য্য-কারণত্ব এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 'ত্রিপুটী'-রূপী নানাত্ব পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু—একমেবাদ্বিতীয় অদ্বয় বস্তুই সৎ।

ঐ অদ্বয়-তত্ত্ব বা Principle of Unity-কে প্রাচীন গ্রীকেরা বলিতেন Ens। প্রাচীন ভারতে ইহার নাম ছিল 'পুরুষ'।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১

জগতের এই অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক 'পুরুষ' Cosmic Principle রূপে অধিষ্ঠিত। বিশ্বের মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্—ঋগ্ বেদ, ১০।৯০।২

তিনি অখণ্ড (পরিচ্ছেদহীন)—সেই জন্য ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে তাঁহাকে 'অদিতি' বলা হইয়াছে ঃ

অদিতির্দ্যৌ রদিতিঃ অন্তরিক্ষং
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ
অদিতির্জাতম্ অদিতির্জনিত্বম্॥—ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০

সেই এক (অদ্বিতীয়)—যিনি ব্যতিরিক্ত অপর কিছু নাই—সেই অ-দিতি

আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্একং
তস্মাদ্ হান্যৎ ন পরঃ কিঞ্চনাস—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২

—ব্যাপকভাবে ইনিই 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।

---

* And universal Nature, thro' her vast
And crowded whole, an infinite paroquet,
Repeats One Note.—Emerson.

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ
স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

'তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে—এ সমস্তই তিনি।' যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উপর এক গ্রাম চড়াইয়া বলিলেন—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥—বৃহ, ৪।৪।১৯

'মনের দ্বারা ইহাই দৃষ্টি করা চাই—এখানে 'নানা' (বহু) কোন কিছু নাই। যে এখানে মোহবশে 'নানা' দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা বিধা

যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তদ্ ইতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরম্ অভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎতৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং অভিবদেত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫

'যেখানে দ্বৈত, দ্বিতীয় যেন থাকে, সেখানেই একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যখন সমুদায়ই আত্মা হইয়া গেল, তখন কাহাকে কিরূপে আঘ্রাণ করিবে? কাহাকে কিরূপে দর্শন করিবে? কাহাকে কিরূপে শ্রবণ করিবে? কাহাকে কিরূপে বচন করিবে? কাহাকে কিরূপে মনন করিবে? কাহাকে কিরূপে বিজ্ঞান করিবে?'

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র ইহার অন্বয় করিয়া বলিতেছেন—

যত্র বা অন্যদ্ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যেখানে অন্য কিছু যেন থাকে, সেখানেই একে অপরকে দর্শন করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বচন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শন করে, বিজ্ঞান করে।' এখানে ঐ 'ইব' শব্দ লক্ষ্য করিবার বিষয়—অর্থাৎ জগৎ যেন আছে, নানা যেন আছে, দ্বিতীয় যেন আছে, দ্বৈত যেন আছে; বস্তুতঃ নাই—তাহার ভাণ হয় মাত্র। আছেন কেবল তিনি—তিনিই পরমার্থ-সৎ

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তিনিই একমাত্র সৎ—তিনি শুধু এক নহেন, তিনি অ-দ্বিতীয়—কেবল 'Unity' নহেন, 'Uniquity'।

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা--বৃহ ২।৪।৬, ৪।৫।৭

'এ সমস্তই সেই পরমাত্মা।' তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই।

নান্যঃ অতোস্তি দ্রষ্টা, নান্যঃ অতোস্তি শ্রোতা,
নান্যঃ অতোস্তি মন্তা, নান্যঃ অতোস্তি বিজ্ঞাতা—বৃহ, ৩।৭।২৩
নান্যৎ অতোস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোস্তি শ্রোতৃ,
নান্যৎ অতোস্তি মন্তৃ, নান্যৎ অতোস্তি বিজ্ঞাতৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

কারণ, এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ—ইহা তাঁহার নিশ্বাস মাত্র—'The Universe is drawn out of Him'—যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—

এবং বৈ অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ * * অস্যৈব এতানি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ২।৪।১০

সেই জন্য বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ
এবমেব অস্মিন্ আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এতে আত্মনঃ সমর্পিতাঃ—২।৫।১৫

অর্থাৎ সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত, সমস্ত দেব, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মায় সমর্পিত। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত এই—যেষাং নঃ অয়মাত্মা অয়ং লোক ঃ—বৃহ, ৪।৪।২২—(Whose Soul this Universe is)—এই বিশ্ব তাঁহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র—বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'। বলা বাহুল্য—ইহা নিপট Idealism (অদ্বৈতবাদ),—ভূমা-বাদ বা Pantheism নহে। যেহেতু, (পাশ্চাত্য-দর্শনের ভাষায়)।—

Idealism regards everything besides the Atman as unreal, whereas Pantheism identifies the universe with the Atman.

কারণ, যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে এই বিবিধ বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার মাত্র—তাঁহারই modes of manifestation।

ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা
ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা—বৃহ, ২।৪।৬

'এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত, এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মা।'

স যথা দুন্দুভে র্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। —বৃহ, ২।৪।৭-৯

'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না; কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ।' অর্থাৎ ব্রহ্মই Sole Reality—সত্যস্য সত্যম্ * এবং এই বিবিধ বিশ্ব যখন পরমাত্মারই বিভাব (mode), তখন তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত জানা হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ঃ—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্—বৃহ, ২।৪।৫

'আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিবে। কারণ, আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান দ্বারা ইদং সর্ব্বং—এ সমস্তই বিদিত হয়।'

ইহার প্রতিধ্বনি আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদে শুনিতে পাই। সেখানে দেখি, শ্বেতকেতু, ঋষি-পিতা অরুণিকে প্রশ্ন করিতেছেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি ?

—'হে ভগবান্ সেই আদেশ (রহস্য-উপদেশ) কি, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়?' অরুণি দৃষ্টান্ত (analogy) প্রয়োগ করিয়া উত্তর দিলেন ঃ—

যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। যথা সোম্য একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা সোম্য একেন নখ-নিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।—ছা, ৬।১।৪-৬

'হে সোম্য! যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম

* বৃহ, ২।১।২০

মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য ; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য ; যেমন একখণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য ; হে সোম্য ! এ আদেশও সেইরূপ।' অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র।*

'বাচারম্ভণং বিকারঃ'—ইহা সেই প্রাচীন উপদেশ—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋগ্‌বেদ, ১।১২৪।৪৬)

'যিনি সৎ, তিনি এক—তাঁহার দ্বৈত নাই—কারণ, দ্বৈত 'বাচারম্ভণ' মাত্র—merė matter of words।

জীব-ব্রহ্ম—তত্ত্বমসি

জগতের মধ্যে যেমন Cosmic Principle (অধিভূত তত্ত্ব) ব্রহ্ম, জীবের মধ্যে সেইরূপ Psychic Principle (অধ্যাত্ম তত্ত্ব) আত্মা। জীব বিচিত্র ও বহু—ব্যাপারে বৃত্তিতে ভোগে লক্ষ্যে শক্তিতে সম্ভাবনায় ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু অন্তরতম নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিকতায় এক ও অভিন্ন। অধিকন্তু আত্মা-ব্রহ্ম—'Brahman is the knowing subject in us'। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ —'সেই অজর অমর অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি অন্তর্য্যামী—তিনিই তোমার আত্মা।' অন্তর্য্যামী তিনি—যিনি অন্তরে যমন করেন, যিনি নিগূঢ়ভাবে অন্তরতম ভাবে জগৎকে ও জীবকে প্রেরণা করেন। (অধ্যাপক বার্গসঁ Creative Evolution এর পশ্চাতে যে 'Elan Vital'-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন—যাহা 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies * * which feels and strives and achieves'—তাহা এই অন্তর্য্যামী অমৃতেরই প্রতিধ্বনি।) তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে আমরা 'এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ'—এই formula ('আদেশ') যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে—একবার নয়, দুইবার নয়—একুশ বার শুনিতে পাই। তাহার কয়েকটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

* অভিজ্ঞ পাঠকের এই প্রসঙ্গে চৈনিক আচার্য্য কনফুজির শিক্ষা স্মরণে আসিবে।

The system of cosmology, as taught by Confucius starts out with an impersonal cosmic energy and principle, which produced the *yin* and the *yang*, the negative and the positive principles. These, by their interaction, produced Heaven and Earth and all beings.—Encyclopedia Britannica.

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্য আপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যম্যমৃতঃ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতাণি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যঃ প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীব, যিনি বায়ুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা, অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তর, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি সর্ব্বভূতে থাকিয়া সর্ব্বভূতের অন্তব, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি সর্ব্বভূতকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অন্তর, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণকে অন্তরে যমন করেন, সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অন্তর, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।

যিনি মনে থাকিয়া মনের অন্তর, মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর,—যিনি মনকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।' অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার, সমস্ত জৈবিক ব্যাপার, সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মবস্তু বিদ্যমান,—তাঁহারই প্রাণনে তাহারা ক্রিয়াবান্, তাঁহারই সংযমনে তাহারা ব্যাপারবান্।

আত্মা সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বানুভূ

কেবল তাহাই নহে—ঐ আত্মা সর্ব্বান্তর—
এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ —বৃহ, ৩।৪।১-২

তিনি সমস্তের মধ্যে অনুস্যূত, সর্ব্বব্যাপী—all-pervading। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ —বৃহ, ৪।২।৪।

'পূর্ব্বদিক্ তাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তরদিক্ উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধ প্রাণ, অধোদিক্ অধঃ প্রাণ, সর্ব্বদিক্ সর্ব্ব প্রাণ।' এই 'Eternal Omnipresent' আত্মার সন্ধান পাইয়া কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থ একদিন অমর ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts.. a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air
And the blue sky and the mind of man,
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of thought
And rolls through all things.

সেই উপনিষদের প্রাচীন কথা :—

যো দেবঃ অগ্নৌ য অপ্‌সু
যঃ অখিলং ভুবনম্ আবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

'সেই দেবতাকে নমস্কার—যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি অখিল ভুবনের অন্তস্তলে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে—তাঁহাকে নমঃ নমঃ।'

এই পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকারিণী গার্গীকে বলিতেছেন—

যদ্ ঊর্দ্ধং গার্গি! দিবো, যদ্ অবাক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ ইত্যাচক্ষতে আকাশে তৎ ওতং চ প্রোতং চ—৩।৮।৪

'যাহা দ্যুলোকেরও ঊর্দ্ধে, পৃথিবীর অধে, যাহা দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তরে, যাহা একাধারে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান (অর্থাৎ Eternal Now) —সেই আকাশে সমুদায় ওত ও প্রোত।' (বলা বাহুল্য এখানে আকাশ ব্রহ্মেরই নামান্তর—আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২২)

যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সঙ্কলন করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন :—

যদৈতমনুপশ্যতি আত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

যস্মাদ্ অর্বাক্ সংবৎসরো অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্
—বৃহ, ৪।৪।১৫-১৬

'যখন ভূত ভবিষ্যতের ঈশান পরমাত্ম-দেবের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তখন মানব ভয়ের অতীত হয়। যাঁহার পশ্চাতে সংবৎসর (অর্থাৎ কাল Time) দিবসের সহিত আবর্ত্তিত হইতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ আয়ুঃস্বরূপ অমৃতরূপ দেবতাকে দেবগণও উপাসনা করেন।'

এই 'আকাশ'—যাহাতে সমুদায় ওতপ্রোত রহিয়াছে, (যাজ্ঞবল্ক্য বলেন) ব্রহ্মজ্ঞেরা ইঁহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—'অক্ষর'। অক্ষরের অর্থ Immutable। এতদ্বৈ তদ্ অক্ষরম্ গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।

এই অক্ষরের ঈশিত্ব ও বিধাতৃত্বের (Providence) পরিচয় দিতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ঃ—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ —বৃহ,৩।৮।৯।

'হে গার্গি! ইঁহারই প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিধৃত রহিয়াছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে; হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে পূর্ব্ব দিগ্বাহী নদীচয় শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিম দিগ্বাহী নদীচয় অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ,—মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেছে।'

তৈত্তিরীয় উপনিষদের উদাত্ত মন্ত্র ইহারই প্রতিধ্বনি—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র, যম, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

ব্রহ্মের এই ভৈরব ভাবকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন——মহৎ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্ (কঠ, ২।৩।২)

যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনা একটু ভিন্ন ধরণের। তিনি বলেন—

অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ। স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃহ, ৩।৯।২৬।

'সেই ঔপনিষদ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) পুরুষ তিনি, যিনি সমস্ত দেবকে সমস্ত পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রণোদ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন।'*

বলা বাহুল্য, এ সকল কথা আত্যন্তিক অদ্বৈতবাদের প্রতিকূল, কারণ, সে মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়—দ্বৈত, বিবিধ, নানাত্বের একান্ত নিষেধ। ঐ মতে Before, around and in us we see only the one omnipresent Supreme Soul। সংস্কৃত দর্শনের পরিভাষায় ইহাকে "প্রৌঢ়িবাদ" বলে—অর্থাৎ ব্যবহারাজীবের ভাষায় assuming but not admitting—as a concession to the empirical consciousness। মানব চিত্ত অদ্বৈতের উত্তুঙ্গ ভূমিতে সুস্থিত থাকিতে পারে না। এই জন্য ঋষি-উপদেষ্টারা সময় সময় উচ্চ ব্যোম ছাড়িয়া দ্বৈতের নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট পরমাত্মা অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বান্তর। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ হইতে ১৮ কাণ্ড দ্রষ্টব্য) এই আত্মাকে 'বৈশ্বানর আত্মা' বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—বৈশ্বানরো বিশ্বো নর এব বা সর্ব্বাত্মত্বাৎ (the Universal Man, the All-Self)—কারণ, তিনি কেবল আমার মধ্যেই বিপশ্চিৎ † (knowing subject) রূপে বিরাজিত নহেন—তিনি উপনিষদের ভাষায় 'সর্ব্বাহংমানী' (synthesis of all the knowing subjects)।

সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ (বৃহ, ২।৫।১৯) অর্থাৎ all-perceiving। এই যে ঐক্য-যুতি (equation) আত্মা-ব্রহ্ম—ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—সমস্ত উপনিষদ্ ইহার ঝঙ্কারে মুখরিত। কিন্তু ইহার মূল উৎস বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য হইতে।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে দেখি উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ্ব—যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা—তাঁহার ব্যাখ্যান কর।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ—এই তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। সেই যে সর্ব্বান্তর আত্মা—ইনিই ব্রহ্ম—অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্।

---

* 'Who impelling asunder these spirits and driving them back, steps over and beyond them,' i. e., who spurs them on to their work, recalls them from it and is pre-eminent over them.—Deussen.

† ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮ ; তিনি দ্রষ্টা, তিনি সাক্ষী—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ
* * সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ—প্রশ্ন, ৬।৫,১৪

ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত

এই যে আত্মা বা ব্রহ্ম—যদিও ইনি সর্ব্বান্তর, যদিও ইনি অন্তর্য্যামী, যদিও ইনি—তদ্ অন্তঃ অস্য সর্ব্বস্য ; যদিও ইনি দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেচ (closer then our hand and feet),—তথাপি তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এ কথা বারম্বার বলিয়াছেন—

ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতে র্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।

"দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শোনা যায় না, মতির মন্তাকে মনন করা যায় না, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে বিদিত হওয়া যায় না।" এই জন্য তিনি অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অমত মন্তা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা।

অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতঃ মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা—বৃহ, ৩।৭।২৩।
অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

অতএব নিষেধ মুখে ভিন্ন তাঁহার নির্দ্দেশ সম্ভবপর নয়—It can only be known negatively। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনো অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।—বৃহ ৩।৮।৮

'হে গার্গি! সেই অক্ষর (ব্রহ্মকে) ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বর্ণন করেন। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন ; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, তমঃ নহেন, তেজ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।' অতএব তাঁহার 'আদেশ' নেতি নেতি মাত্র, ইহা নয় ইহা নয়—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৭)। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে চারি বার এই 'আদেশ' উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার সম্প্রসারণ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে অসঙ্গো ন হি সজ্জতে অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। —বৃহ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ও ৪।৫।১৫।

ফলতঃ তাঁহার মুখে ইহা একটি formula বা সূত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। সে সূত্রের অর্থ এই যে, 'এই আত্মা ন ইতি ন ইতি।

ইনি অগৃহ্য ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ কিছুতে সক্ত হন না, ইনি অবদ্ধ কিছুতে ব্যথা পান না, ইনি হিংসিত হন না।'

উপনিষদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশস্থলে এই নঞ্ ও নকারের ছড়াছড়ি, কিন্তু সকল বচনেরই মূলে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ উপদেশ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ।—কঠ, ৩।১৫

'ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, ব্যয়হীন বস্তু।'

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রম্অবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি-পাদম্।—মুণ্ডক ১।১।৬

'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, আগোত্র, অবর্ণ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।'

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমবপ্যদেশ্যম্—মাণ্ডূক্য, ৭

'যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; যিনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত।

'কেন'-উপনিষদ্ ইহার সার সঙ্কলন করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি—কেন, ১।৩

অর্থাৎ তিনি বিদিত অবিদিত, কোন কোঠাতেই পড়েন না।

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয় ?

ব্রহ্ম বা আত্মা কেন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়? যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাই চরম উত্তর।

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ —বৃহ, ৪।৫।১৫।

অর্থাৎ যিনি বিষয়ী (knowing subject), তিনি বিষয় (known object) হইবেন কিরূপে? যিনি বিজ্ঞাতা, তিনি কোন দিন বিজ্ঞাত হইতে পারেন কি?

কোন কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় কিরূপে? উপাধির দ্বারা। এই উপাধি ত্রিবিধ—দেশ, কাল ও নিমিত্ত। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাদিগের নাম Categories—(the three categories of Space, Time and Causality)। (Space = দেশ, Time = কাল এবং

Causality = নিমিত্ত বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ)। ব্রহ্ম যখন নিরুপাধি—দেশাতীত, কালাতীত ও নিমিত্তাতীত, তখন তিনি জ্ঞানের বিষয় হইবেন কিরূপে? যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনায় ব্রহ্ম অনন্তম্ অপারম্ (বৃহ, ২।৪।১২) — তিনি অনন্তরমবাহ্যম্—অর্থাৎ তিনি দেশাতীত। তিনি অপূর্ব্বম্-অনপরম্। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কিছু নাই—অর্থাৎ তিনি কালাতীত। অধিকন্তু তিনি অক্ষর, অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি, অপচয় উপচয়হীন—তদেতৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি (বৃহ, ৩।৮।৯)। তিনি ধ্রুব—ক্ষয় ব্যয়হীন) অর্থাৎ নিমিত্তের অতীত।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যং এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবং।
বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥ —বৃহ, ৪।৪।২০

'ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও ধ্রুব। তাঁহাকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি রজোহীন, আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি অজ, মহান্, ধ্রুব।'

পুনশ্চ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায়, ব্রহ্ম ভূমা। ভূমা কি?

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।
—ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

'যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনি ভূমা; আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়; তাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।' ব্রহ্ম যখন ভূমা, তখন তাঁহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একাকার ভাব। তিনি দ্বৈত-রহিত, অদ্বৈত, ত্রিপুটীর অতীত। এক কথায়,

একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছা, ৬।২।১

নানাত্বের, ভেদের, দ্বৈতের তাঁহাতে কোন অবকাশই নাই। অতএব তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন? এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য অতি মনোজ্ঞ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ২।৪।১১।

অর্থাৎ, 'যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয়, সেখানেই অপর অপরকে আঘ্রাণ করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায়, তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে কে কাহার বচন করিবে, কে কাহার মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান করিবে?' অতএব ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত, একাকার, ভূমা—তখন তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না।

ব্রহ্মের ঐকদেশিক প্রতীক-প্রত্যাখ্যান

ব্রহ্ম যখন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—যখন তাঁহাকে কোন বিশেষণেই বিশেষিত করা যায় না, কোন চিহ্নেই চিহ্নিত করা যায় না, কোন লক্ষণেই লক্ষিত করা যায় না—যখন তিনি বচনের মননের নিরূপণের অতীত—তখন তাঁহার নির্ব্বচন ও বিবর্ণন করিতে যাওয়া পণ্ড শ্রম নহে কি? জনক-সভায় বিদগ্ধ শাকল্য ঐরূপ ব্যর্থ প্রয়াস করিলে যাজ্ঞবল্ক্য 'আহল্লিক'* (ষণ্ড) বলিয়া তাঁহাকে ভৎ‌র্সনা করিয়াছিলেন। শাকল্য একে একে বলিলেন—শরীরে যে শারীর পুরুষ, কামে যে কামময় পুরুষ, আদিত্যে যে আদিত্যস্থ পুরুষ, আকাশে যে প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ, তমে যে ছায়াময় পুরুষ, রূপে যে আদর্শস্থ পুরুষ, জলে যে সলিলস্থ পুরুষ, রেতে যে পুত্রময় পুরুষ—তিনিই সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ (সমস্ত আত্মার পরায়ণ বা climax)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেক নির্দ্দেশনার তুচ্ছত্ব ও ঐকদেশিকত্ব (inadequacy) প্রদর্শন করিয়া বলিলেন 'উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষ (ব্রহ্ম) কিন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট পুরুষ নহেন। তিনি কে? স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্য অত্যক্রামৎ।' (বৃহ, ৩।৯ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বালাকিঅজাতশত্রু-সংবাদ ইহারই অনুরূপ। পণ্ডিত-মানী দৃপ্ত বালাকি অজাত শত্রুকে বলিলেন 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি'। অজাত শত্রু বলিলেন 'বেশ'। তখন বালাকি একে একে আদিত্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, আদর্শে, শব্দে, দিকে, ছায়াতে এবং আত্মাতে ব্রহ্মের সত্তা তিনি যতদূর জানিতেন, যথাক্রমে বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পর অজাতশত্রু বলিলেন "ইহ বাহ্য কহ পরে আর"। স হ তুষ্ণীম্ আস গার্গ্যঃ (বৃহ, ২।১।১৩)—তখন দৃপ্ত বালাকি নীরব হইলেন। অজাতশত্রু বলিলেন এই পর্য্যন্ত? বালাকি বলিলেন "হাঁ, এতাবৎ—এই পর্য্যন্ত।" অজাতশত্রু বলিলেন 'নৈতাবতা বিদিতং ভবতি' এবং পরে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ত্রয়ের পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিলেন।

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে যে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদ বিবৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন 'যৎ তে কশ্চিদ্ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম—অন্য কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন শুনিতে ইচ্ছা করি।' জনক তখন অন্যান্য বেদাচার্য্যগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেন—বাক্ বৈ ব্রহ্ম, প্রাণোবৈ ব্রহ্ম, চক্ষুর্বৈ ব্রহ্ম, শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্ম, মনো বৈ

* অহল্লিক=ষণ্ড। ইহা রঙ্গরামানুজের অর্থ। আনন্দ গিরি বলেন অহল্লিকের অর্থ প্রেত।

ব্রহ্ম, হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন উপাসনার প্রতীক (symbol) রূপে, এই সকল ব্যবহৃত হইতে পারে* কিন্তু ব্রহ্মের নির্দ্দেশরূপে নহে। কারণ, ইহারা এক পাদ মাত্র (partial)—একপাদ্ বা এতৎ। স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে (বৃহ, ৪।২।৪)। †

ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তরে ছন্ন-শক্তি

ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া উপনিষদে তাঁহার সম্বন্ধে 'নিগূঢ়', 'প্রচ্ছন্ন' প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্।

'দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায় সমস্ত ভূতের মধ্যে ব্রহ্ম নিগূঢ় রহিয়াছেন।' ধ্যানরসিক ওমর খৈয়াম এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঃ—

Whose secret presence, thro' creation's veins
Running quick-silver like, eludes your pains.

এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ এই—

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ।
—বৃহ, ২।৪।১২

'যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলেই বিলীন হয়, তাহার আর পৃথক্ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।' এই মর্ম্মে ছান্দোগ্য উপনিষৎও ঐ লবণের উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—লবণমেতদ্ উদকে অবধায় × × অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি—ছা, ৬।১৩।১-২

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। অনাখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভর-কুলায়ে। তং ন পশ্যন্তি।—১।৪।৭

'যেমন ক্ষুর ক্ষুরধানে, যেমন অগ্নি অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি সেই আত্মা এখানে নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাকে,

---

* প্রজ্ঞা ইত্যেনৎ উপাসীত, প্রিয়ম্ ইত্যেনৎ উপাসীত, সত্যম্ ইত্যেনৎ উপাসীত, অনন্ত ইত্যেনৎ উপাসীত, আনন্দ ইত্যেনৎ উপাসীত, স্থিতিঃ ইত্যেনৎ উপাসীত—বৃহ, ৪।১।১-৭

† 'খং ব্রহ্ম' 'আকাশো ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৪।১০।৫, ৩।১৮।১)—এ উপদেশ সম্বন্ধেও যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য ঐ। তিনি বলেন—আকাশ সর্ব্বগত হইলেও কখন ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতীক হইতে পারে না ; কারণ, বিরজঃ পর আকাশাৎ (বৃহ, ৪।৪।২০)—ব্রহ্ম আকাশ হইতে পরতর। সেই জন্য গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি! আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ (বৃহ, ৩।৮।১১)—সেই অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত, অ-মত অবিজ্ঞাত অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওত ও প্রোত।

কেহ দেখিতে পায় না।' ঋগ্বেদের ঋষি তাই ইঁহাকে 'প্রথমচ্ছদ' বলিয়াছিলেন, ১০।৮১।১। সেইজন্য ছান্দোগ্যে তাঁহার নাম অণিমা—স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা—৬।১৩।৩

সেই জন্যই বোধ হয় অধ্যাপক এডিংটন (Eddington) বলিয়াছেন—"Something unknown is doing we know not what"। প্রথম দৃষ্টিতে এই বাণী অভাবাত্মকই মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনটি ভাবাত্মক বাক্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথম বিশ্বব্যাপক শক্তি, দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী ব্যাপার, এবং তৃতীয় বিশ্বায়ত অভিসন্ধি। *

এই বিশ্বশক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য এই—

The power which manifests throughout the universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness—(Herbert Spenser's Ecclesiastical Institutions. Page 829).

ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্ ও আনন্দম্

যাজ্ঞবল্ক্য এই বিশ্বশক্তি বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন যে তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম—বৃহ, ৩।৯।২৮। অর্থাৎ ঐ বিশ্বশক্তি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের অন্ধ জড়শক্তি (blind force) নহে, তিনি বিজ্ঞান (intelligence)। জগৎ ব্যাপারে তাঁহার এক নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে এবং কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া ঐ অভিসন্ধির প্রপূর্ত্তি হইতেছে—

মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি
যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি।

Yet I doubt not through the ages one increasing purpose runs.

এই অভিসন্ধি আপূর্য্যমান—কোন না কোনদিন ইহার চরিতার্থতা হইবেই। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্স জিন্সের (Sir James Jeans) কয়েকটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য—

The universe begins to look more like a great thought than like a great machine. * * * We discover that the universe shews evidence of a designing, of a controlling power, that has something in common with our individual minds.

এ প্রসঙ্গে আর একজন বৈজ্ঞানিক মনীষীর বাক্য অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে।

---

* The above statement, sounding negative, actually states three positives—a universal power, a universal process and a universal purpose.—Dr. Cousins.

There is evidence of mind at work, beneficent and contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding, an adaptation to conditions.—Making of Man by Sir Oliver Lodge.

কিন্তু ব্রহ্ম শুধু বিজ্ঞান নহেন—যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দম্—অর্থাৎ, পাশ্চাত্য কবির ভাষায়, the heart of being is eternal bliss। সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের নাম ভূমানন্দ। সে আনন্দ বচনাতীত, মননাতীত—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রহ্মের যে ভূমানন্দ, জীব তাহার কণিকামাত্র লাভ করে। তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩২
বিষয়ে জীব যে, আনন্দ অনুভব করে, তাহার কারণ এই যে, বিষয়ের মধ্যে সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব সেই রসের আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদের উক্তি এই—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি—তৈত্তরীয়, ২।৭

'তিনিই রস। রস আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। যদি আনন্দস্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তবে কে প্রাণন করিতে পারিত? তিনিই আনন্দিত করেন।' সেইজন্যই কবি ব্রাউনিং (Browning) বলিয়াছেন—

Where enjoyment is, there is He.

মানুষ সুখান্বেষী—আনন্দেন খলু জাতানি জীবন্তি। যেখানেই অনেন্দের উৎস, সেখানেই মানুষের প্রেম। উপনিষদ্ বলিলেন—অন্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ এই, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সেখানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের অপেক্ষা আর প্রেমাস্পদ কে? তিনি—

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ—বৃহ, ১।৪।৮
'ব্রহ্ম পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয় অন্য সমস্তের অপেক্ষা প্রিয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট এই তত্ত্বই অতি চমৎকার ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন:—

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃপ্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায়

জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। × × × ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকা প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। —বৃহ, ২।৪।৫

'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।'

সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের একটি 'ছদ্মনাম' (mystery-name) 'তদ্বন'। ব্রহ্মের সমান 'বনিত' আর কি আছে? অতএব (যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন) এই ব্রহ্মের সহিত ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সংপদ্‌এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২।

'ইনিই পরমা গতি, ইনিই পরম সম্পদ্, ইনিই পরম লোক, ইনিই পরমানন্দ।'

আমরা এখানে যাজ্ঞবল্কের ব্রহ্মবাদের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। বারান্তরে তাঁহার জীববাদ ও মোক্ষবাদের প্রসঙ্গ করিব—কারণ, ঐ দুই প্রসঙ্গের অবধারণ না করিলে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ অসম্পূর্ণ রহিবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নীললোহিতের স্বয়ম্বর

আদিপর্ব্ব

সেদিন রূপেন্দ্র আমাদের নবতর-জীবন সমিতিতে মহাবক্তৃতা করছিলেন, এই কথা সকলকে বোঝাবার জন্য যে, আমাদের দেশের মামুলি বিবাহপ্রথার বদলে স্বয়ম্বর-প্রথা না চালালে আমরা জাতি-গঠন কিছুতেই করতে পারব না।

রূপেন্দ্রের এ বিষয়ে এত উৎসাহ হবার কারণ—প্রথমতঃ তাঁর বাপ মা তাঁর জন্য মেয়ে খুঁজছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি দু'দিন আগে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গ পড়েছিলেন, আর তৃতীয়তঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি যথার্থই রূপেন্দ্র, অর্থাৎ অসাধারণ সুপুরুষ। আর আমরা যে ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর বক্তৃতা একমনে শুনছিলুম, তার কারণ আমরা সকলেই ছিলুম অবিবাহিত অথচ বিবাহযোগ্য। কাজেই এ আলোচনায় আমরা সকলেই মনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম, চুপ করে ছিলেন সুধু নীললোহিত। তাই রসিকলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, তুমি কোন কথা কইছ না কেন? রূপেন্দ্রের প্রস্তাবে তোমার মৌনতা কি সম্মতির লক্ষণ নাকি?" নীললোহিত কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বললেন, "যা হয় তা হওয়া উচিত, এরকম nonsensical কথার উপর আর কি বলব?" এ কথা শুনে আমরা সকলেই কান খাড়া করলুম, কেননা বুঝলুম এইবার নীললোহিতের কেচ্ছা সুরু হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"বাঙলার মেয়েরা আজও স্বয়ম্বরা হয় নাকি?" নীললোহিত বললেন, "আলবৎ।" আমি আবার প্রশ্ন করলুম, "তুমি কি করে জানলে?" নীললোহিত বললেন, "জানলুম কি করে? বই কি কাগজ পড়ে নয় শুঁড়ির দোকান কিম্বা গুলির আড্ডাতে পরের মুখে শুনেও নয়—নিজের চোখে দেখে?"

—চোখে দেখে?

—হাঁ, চোখে দেখে। আমি একটি জাঁকালো স্বয়ম্বর-সভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলুম, আর আমার চোখ বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ত তোমরা সকলেই জানো।

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোনবার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করাতে, নীললোহিত তাঁর বর্ণনা সুরু করলেন।

আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানি চিঠি পাই, অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হল মেয়ের লেখা। তার প্রতি অক্ষরটি যেন ছাপার অক্ষর,

আর সেগুলি সাজানো হয়েছে সব সরল রেখায়। লেখা দেখে মনে হল পূর্ব্বপরিচিত, কিন্তু কোথায় এ-লেখা দেখেছি, তা মনে করতে পারলুম না। শেষটা চিঠিখানি খুলে যা পড়লুম, তাতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিখানি এই ঃ—

"আপনি জানেন যে বাবা হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক, আপনারা যাকে বলেন idealist। একটা idea তাঁর মাথায় ঢুকলে, সেটিকে কার্য্যে পরিণত না করে তিনি থামেন না। আর অপর কেউ তাঁকে থামাতে পারে না, কারণ তাঁর পয়সা আছে, আর সে পয়সা তিনি অকাতরে অপব্যয় করেন। বড়মানুষের খোশ-খেয়ালও ত একরকম idealism।

বাবা যেদিন থেকে পৈতে নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষাত্রধর্ম্মের চর্চ্চা করছেন। অতঃপর তিনি মনস্থির করেছেন যে, আমাকে এবার স্বয়ম্বরা হতে হবে। আমাদের বাড়ীতে আগামী মাঘী পূর্ণিমায় স্বয়ম্বর-সভা বসবে। আপনি যদি সে সভায় উপস্থিত হন, অবশ্য নিমন্ত্রিত হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে—ত খুসী হই। এরকম অপূর্ব্ব নাটক আপনি কলকাতার কোন থিয়েটারেও দেখ্‌তে পাবেন না। অবশ্য আপনাকে ছদ্মবেশে আস্‌তে হবে। কি করে কি করতে হবে সে সব মেজদা আপনাকে জানাবেন। ইতি—

মালা।'

চিঠি পড়েই বুঝলুম যে এ মালশ্রীর চিঠি।

আমাদের ভিতর কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহিলাটি কে, মাদ্রাজী না মারাঠী?" নীললোহিত উত্তর করলেন, "চিঠি শুনে কি মনে হল যে, ও চিঠি কোনও কাছা-কোঁচা-দেওয়া মেয়ের হাত থেকে বেরতে পারে? দু'পাতা ইংরেজী পড়ে মাতৃভাষাও ভুলে গিয়েছ নাকি?

—না, তা ভুলিনি। কিন্তু কোনও বাঙালী মেয়ের মালশ্রী নাম কখনও শুনিনি। এমন কি হাল-ফেশানের নভেল-নাটকেও পড়িনি।

—সে নিজের নাম নিজে রাখেনি, রেখেছে তার বাপ মা।

—মেয়েটি কার মেয়ে?

—রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের একমাত্র সন্তান।

বাপের নাম শুনে আমরা অনেকেই আর হাসি রাখ্‌তে পারলুম না। আমাদের হাসি দেখে ও শুনে নীললোহিত মহা চটে বললেন—"বীরবলী ভাষা পড়ে পড়ে যদি সাধুভাষা ভুলে না যেতে, তাহলে আর অমন করে হাস্‌তে না। এ ঋষভ সঙ্গীতের ঋষভ, বাঙলায় যাকে বলে রেখাব। নুরনগরের রাজ-পরিবারে ছেলেমেয়েদের নামকরণ করা হয় সঙ্গীতাচার্য্যদের উপদেশমত। মালশ্রীর পিসিদের নাম হচ্ছে জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী, আর তার পিসতুতো মেজদাদার নাম হচ্ছে নটনারায়ণ, আর বড় দাদার নাম ছিল দীপক। গান বাজনার যদি ক, খ, জানতে, তাহলে

এগুলি যে সব বড় বড় রাগরাগিণীর নাম, তা আর আমাকে তোমাদের বলে দিতে হত না। বনেদি পরিবারের ছেলের নাম কি হবে পাঁচু আর মেয়ের নাম পাঁচি ?"

নীললোহিতের এ বক্তৃতা শুনে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে এ পরিবারে সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চ্চা আছে ?" নীললোহিত বললেন—"রাজা ঋষভরঞ্জন পয়লা নম্বরের ধ্রুপদী। তাঁর তুল্য বাজখাঁই গলা কোনও গাঁজাখোর ওস্তাদেরও নেই"। রসিকলাল উত্তর করলেন—"আমরা গান বাজনার ক, খ, না জানি—এটা জানি যে ঋষভের গলা বাজখাঁইই হয়ে থাকে।" এ কথা শুনে আমরা কোনমত প্রকারে হাসি চেপে রাখলুম, এই ভয়ে যে নীললোহিত আমাদের হাসি দ্বিতীয়বার আর সহ্য করতে পারবেন না। নীললোহিত বললেন—"কথায় কথায় যদি বস্তাপচা রসিকতা করো, তাহলে আমি আর কথা কইব না।"

অনেক সাধ্য-সাধনার পর নীললোহিত মালশ্রীর স্বয়ম্বরের গল্প বলতে রাজী হলেন, on condition আমরা কেউ টুঁশব্দ করব না। নীললোহিত আরম্ভ করলেন,—তোমাদের দেখছি আসল ঘটনার চাইতে তার সব উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশী। এ হচ্ছে বিলেতী নভেল পড়ার ফল। গল্প যাক্ চুলোয়, তার আশ-পাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই তোমরা দেখতে চাও। সে যাই হোক্, এখন আমার গল্প শোনো।

মালশ্রীর মেজদাদা অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের ভাগ্নে আমার একজন বাল্যবন্ধু। রূপেন্দ্রের বিশ্বাস তিনি বড় সুপুরুষ। একবার নটনারায়ণকে গিয়ে দেখে আসুন চেহারা কাকে বলে;—তার উপর সে আশ্চর্য্য গুণী। নাচে গানে তার তুল্য গুণী, amateur-দের ভিতর আর দ্বিতীয় নেই। আর তার কথাবার্ত্তা শুনলে রসিকলাল বুঝতেন যথার্থ সুরসিক কাকে বলে।

রাজাবাহাদুর যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন নটনারায়ণের সুপারিসে আমি মালশ্রীর প্রাইভেট টিউটার হই। ইংরেজী সে আমার কাছেই শিখেছে। তেরো থেকে ষোলো, এই তিন বৎসর সে আমার কাছে পড়ে যেরকম ইংরেজী শিখেছে, সে ইংরেজী তোমরা কেউই জানোনা। আর তাকে এত যত্ন করে পড়িয়েছিলুম কেন জানো ? মেয়েটি সত্যিই ডানাকাটা পরী, তার উপর আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী। তারপর রাজাবাহাদুর আজ দু-বৎসর হল দেশে চলে গিয়েছেন,—আমলাদের অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল বলে। ইতিমধ্যে তাঁদের আর কোন খবরই পাইনি, হঠাৎ ঐ

চিঠি এসে উপস্থিত। সকালে চিঠি পেলুম, বিকেলেই মেজদার সঙ্গে দেখা করলুম। মালশ্রী নটনারায়ণকেও চিঠি লিখেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম ঃ

—মেজদা, ব্যাপার কি?

— রাজামামার খেয়াল।

—এ খেয়ালের ফল দাঁড়াবে কি?

—প্রকাণ্ড তামাসা।

—সে তামাসা আমিও দেখ্‌তে চাই।

—সেখানে গেলেই দেখ্‌তে পাবে।

—সেখানে যাই কি করে?

—নামরূপ ভাঁড়িয়ে।

—কি সেজে?

—বর সেজে নয়।

তারপর সে পরামর্শ দিলে যে, আমি দরওয়ান সেজে ও-সভায় যেতে পারি। রাজাবাহাদুরের পুরোনো জমাদার রামটহল সিং জনকতক নতুন ভোজপুরি দরওয়ান সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতায় এসেছে; তাদের দলেই আমি ঢুকে যেতে পারি।

উদ্যোগপর্ব্ব

তারপর দিন সকালে আমি মেজদার ওখানে হাজির হলুম। আমার নাম হল লীললাল সিং, আর নটনারায়ণ আমাকে এ দলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলে। সবরকম ভোজপুরি দেহাতী বুলি আমি বাঙলার চাইতেও অনর্গল বলতে পারি। আর "করলবড়া"র জায়গায় ভুলেও আমার মুখ থেকে "করলবাণী" বেরোয় না, কাজেই রামদুলাল সিং, রাম অবতার সিং, রামখেলাওয়ান সিং, রামদিন সিং, রামযশ সিং, রামরূপ সিংহ, রামভূপ সিং, রামদৎ সিং, রামগোলাম সিং, রামগোপাল সিং প্রভৃতি ভোজপুরি ছত্রীর দল আমাকে আর বাঙালী বলে চিন্‌তে পারলে না। আমি জমাদার হয়েই দু-বেটা মূর্ত্তিমান পাপকে সুধু বিদেয় করলুম। কারণ ওঙ্কারনাথ ব্রাহ্মণ ও বৈজনাথ ব্রাহ্মণকে দেখেই বুঝলুম যে দু-বেটাই মৃজাপুরি গুণ্ডা, দু-বেটাই খুনে। দু-পয়সার লোভে কাকে কখন চোরা-ছোরা মেরে দেবে, তার ঠিক নেই। আর ফলে আমার বদনাম হবে।

এই রামসিংদের সঙ্গে আমার দু'দণ্ডেই ভাব হয়ে গেল, আর তাদের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে পড়্‌লুম যে, সেই রাত্তিরে ট্রেণে রামগোলাম সিং ও রামগোপাল সিং তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলে।

আমি দু'জনকেই কথা দিলুম যে, প্রথমে মুনিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক্—তারপর আমার বিয়ের কথা ঠিক করা যাবে। তারা বললে—"ই বাৎ ঠিক হ্যায়"। Loyalty কাকে বলে দেখ্‌তে চাও ত এদের দেখো। সেই একদিনের আলাপ, কিন্তু আজও যদি খবর দিই ত তারা সূতোপটী, ময়দাপটী, পাথুরেঘাটা, দরমাহাট্টা, যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে হাতের গোড়ায় যে হাতিয়ার পায়, তাই নিয়ে ছুটে আস্‌বে। আজও বড়বাজারের গদিতে গদিতে ও পাথুরেঘাটার দেউড়িতে দেউড়িতে একথা প্রচার যে, বাঙলামে কোই মরদ হ্যায় ত হ্যায় লীললাল ব্রাহ্মণ। আমি যে ছত্রী নই, সে-কথা তারা পরে জানতে পেরেছে, আর তার পর থেকেই আমার সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলে, "গোড় লাগি মহারাজ"।

আমি সদলবল বিকেলে ট্রেণে উঠলুম থার্ড ক্লাসে, আর ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলেন আর একদল, কে তা চিনিনে। ভোর হতে না হতেই পীরপুর ষ্টেশনে পৌঁছলুম। রাত্তিরে অবশ্য গাড়ীতে ঘুম হয়নি। আমাদের মুখে যেমন সিগারেট, রামসিংদের মুখে তেমনি গাঁজার কলকে, মধ্যেমধ্যেই ধোঁয়া ছাড়ছে। তার উপর আবার গান। কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী, কেউ বা আবার লাউনি। ভজনই এরা গায় ভাল, কারণ ভজনে তান নেই, আছে শুধু টান। তাদের মুখে ভজনগুলোই আমার লাগছিল ভাল। "প্রভু অগুণে চিতে না ধরো" ভজনটা শুনে আমার মন ভক্তিরসে তেমন স্যাৎসেঁতে হয়ে ওঠেনি, যেমন হয়েছিল "সাহেব আল্লা করিম রহিম" এই ইসলামী ভজন শুনে। হিন্দু-মুসলমানের মনের গর্ভ-মন্দিরে যে একই দেবতা বিরাজ করছেন, এই সব গানের প্রসাদে সে-সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মোবারকবাদী কাকে বলে জানো?—শুভকর্ম্মের শুভলগ্নে গান। ভক্তিরস অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই ওদের মধ্যে সব চেয়ে ফুর্ত্তিওয়ালা ছোকরা রামরঙ্গিলা সিং যখন এই বিয়ের গান ধরলে—

"হাস হাসকে ঘুঁঘট খোলে লালবনা।
আম্মা মেরে টীকা দেখলে ভয়া লালবনা॥"

তখন ঘরসুদ্ধ হাসির গর্‌রা পড়ে গেল। "বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে রুলির ফোঁটা দেখে নিয়েছে"—এ কথায় হাসবার যে কি আছে তা জানিনে, কিন্তু ঐ সূত্রে যে-সব দেহাতি রসিকতা শুনলুম, তা তোমাদের না শোনাই ভাল। সে যাই হোক, ঘুম নাহলেও রাতটা কেটেছিল ভাল। ব্যাপার হয়েছিল একদম Musical Soiree।

এতক্ষণ সকলে চুপ করে ছিল। অবশেষে আমাদের মধ্যে প্রধান গাইয়ে, বিশ্বনাথ ওস্তাদের সাগ্‌রিদ শ্রীকণ্ঠ বলে উঠলেন—"নীললোহিত, তুমি দেখছি গানবাজনাতেও cxpert হয়ে উঠেছ। ভজনের সঙ্গে খেয়ালের তফাৎ কি, তাও তুমি জানো।"

তিনি উত্তর করলেন—তিন বৎসর ত আর কানে তুলো দিয়ে মালাকে পড়াইনি। ও-বাড়ীতে যে দিবারাত্র ওস্তাদী গান হয়। গানের expert গলা সাধলে হয় না, তার জন্য চাই কান সাধা।

—মানলুম তাই। আর দরওয়ানরাও সব ওস্তাদি গান গায়? —অবাক্ করলে!

—ভাল! দরওয়ানের সঙ্গে ওস্তাদের তফাৎটা কি? দু'জনেই ডালরুটি ও গাঁজা খায়, দু'জনেই মুগুর ও সুর ভাঁজে। কেন, তুমি কখনও কোন পালোয়ানকে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাল ঠুকে কুস্তি করতে দেখো নি? ওরা সব আজ ওস্তাদ কাল দরওয়ান, আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ,—যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।

তারপর তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—যা বল্লুম তার থেকে মনে ভেবো না যে, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনরূপ prejudice আছে কি ছিল। নিরক্ষর ও নিঃস্ব হলেও, মানুষের অন্তরে যে প্রেম ও ভক্তি আর দেহে জোর ও হিম্মত থাকতে পারে, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক্‌লে তোমরাও তা' দেখ্‌তে পেতে। তোমরা ত 'হিষ্টরি' পড়েছ। সন সাঁতাওনকে গদড় কারা করেছিল? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা, না এদের বাপ-ঠাকুরদারা? তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করো, তার কারণ তোমরা জানো না ছাতুর ভিতর কি মাল আছে। কালিদাস কি খেয়ে মেঘদূত লিখেছিলেন, ভাত না ছাতু?

আমি বললুম—হয়েছে, এখন গল্প বলো।

নীললোহিত উত্তর করলেন—"আমি ত তাই বলতে চাই, কিন্তু তোমরা বলতে দেও কৈ? গল্প শুনতে তোমরা শেখোনি, শিখবেও না, কারণ তোমরা চাও নিজের নিজের বিদ্যে দেখাতে,—কেউ সঙ্গীতের, কেউ সাহিত্যের। এত সমালোচকের পাল্লায় পড়লে আমি ত আমি, Shakes-peare-ও তাঁর গল্প বল্‌তে পারতেন না। কেউ না কেউ Caliban-এর anthropology নিয়ে ঘোর তর্ক সুরু করত। যদি সত্যিই শুনতে চাও ত এখন শোনো ;—বিদ্যে গোলদীঘিতে গিয়ে জাহির করো।

পীরপুর ষ্টেশন থেকে নুরনগর দশ মাইল রাস্তা। আমি গাড়ী থেকে নেমেই, আমাদের দলবলকে একবার drill করালুম, এবং তারপর সকলকে

shoulder arms করে quick march করতে হুকুম দিলুম। আর একখানি লরিতে ভাবী জামাইবাবুরা রওনা হলেন; অর্থাৎ তাঁরা, যাঁরা ট্রেনে ফার্ষ্টক্লাসে এসেছিলেন। হাজার হাজার নাকে বেসরপরা চাষার মেয়ে দু-পাশে কাতার দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করলে—"এ কিরকম হল, বরের দল চলেছে হেঁটে—আর তাদের তল্পীদাররা চেপেছে মোটর গাড়ীতে,—বোধহয় মালপত্র হেপাজৎ করে নিয়ে যাবার জন্যে?" এ ভুল যে তাদের হয়েছিল, তার কারণ আমার দলবলরাই ছিল দেখতে রাজপুত্তুরের মত,—আর যারা লরিতে ছিল তারা দেখতে তোমরা যেমন।

আমরা দু'দলই রাজবাড়ীতে একসঙ্গে পৌঁছলুম। পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তা, সে রাস্তায় আমাদের পায়ের সঙ্গে মোটর পাল্লা দিতে পারবে কেন? সেখানে গিয়েই জামাইবাবুরা রাজাবাহাদুরের Guest House-এ চলে গেলেন, আর আমাদের বাসা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরি ব্যারাকে।

বাঁ পাশের ঘরগুলোতে আস্তানা করেছিল—বাঙালী লাঠিয়ালরা। গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে। কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁতন করছে, কেউ বাবরি চুল আঁচড়াচ্ছে ত আঁচড়াচ্ছেই, কেউ আবার একমনে দাঁতে মিশি দিচ্ছে। সকলেরই পরনে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, কোমরে গোট, বাজুতে দাওয়া আর দোয়া-ভরা কবচ ও মাদুলি, আর কাঁধে লাল ডুরেদার গামছা। বেটারা যেন সব নবাবপুত্তুর—কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান দোখতা খেতে আর কাজিয়ার সময় লোকের পেটে সড়কি বসিয়ে দিতে। তার পরেই নিরুদ্দেশ। বেটাদের বাড়ী হচ্ছে হয় নটীবাড়ী নয় শ্রীঘর—আর যেখানেই তারা যায়, সেখানেই ত এ দুই ঘরবাড়ী আছে। এই সব লাল-খাঁ কালো-খাঁদের বাঁয়ে রেখে, আমরা নিজের আড্ডায় গিয়ে ঢুকলুম।

দিনটে কেটে গেল—হাতিয়ার শানাতে। কারণ, রাজবাড়ী থেকে যে সব ঢাল-তলওয়ার আমাদের দেওয়া হয়েছিল—সে সব দু'শ বৎসরের মরচেধরা। তাদের মরচে ছাড়াতেই প্রায় দিন কাবার হয়ে গেল। সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না, যদিচ রাজবাড়ী থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল। আমরা সকলে জলের ছিটে দিয়ে ছাতু তাল পাকিয়ে নিয়ে, গণ্ডা গণ্ডা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তা গলাধঃকরণ করলুম। সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় আমাদের ডাক পড়্ল—স্বয়ম্বরসভা পাহারা দেবার জন্য। ভোজ-পুরিদের সঙ্গে লাঠিয়ালদের তফাৎ এই যে, লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয়, আর ভোজপুরিরা পাহারাওয়ালা।

সভাপর্ব্ব

বিয়ের সভা বসেছিল ঠাকুরবাড়ীতে, কারণ তার নাটমন্দিরে শ-পাঁচেক লোক হেলায় বসতে পারে। ঠাকুরবাড়ীতে ঢোকবার আগে বাইরের উঠানে দেখি লাঠিয়ালরা সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ এক নতুন মূর্ত্তি। এবার তারা সব কাপড় পরেছে, উত্তর বঙ্গের চাষার মেয়েদের মত বুক থেকে ঝুলিয়ে, আর সে কাপড়ের ঝুল হাঁটু পর্য্যন্ত। সকলেরই ডান হাতে পাঁচ হাত লম্বা লাঠি, কারও কারও হাতে আবার পুঁটিমাছধরা ছিপের মত সরু সরু লম্বা সড়কি, তার মুখে ইস্পাতের ফলাগুলো জিভের মত বেরিয়ে আছে। সে ত মানুষের জিভ নয়, সাপের দাঁত। আর সকলেরই বাঁ হাতে থাবাপ্রমাণ বেতের ঢাল। প্রথমে এদের দেখে চিনতেই পারিনি। মাথার চুল এখন আর তাদের কাঁধের উপর ঝুলছে না, ছাতার মত মাথা ঘিরে রয়েছে। শুনলুম, মাথার চুল দিনভর ময়দা দিয়ে ঘসে ঘসে ফুলিয়েছে। এই নাকি তাদের যুদ্ধের বেশ।

ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকে দেখি নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য। আর সুমুখের ঠাকুরদালান খালি, সুধু দু'ধারে দু'সার চেয়ারে বরবাবুরা বসে আছেন। একধারে সাদা কাপড়ের উপর বড় বড় শালুর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'কর্ম্মবীর', অন্যধারে একই ধাঁচে 'জ্ঞানবীর'। ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব কর্ম্মবীর, ইংরেজীতে যাকে বলে sportsman ;—তাদের কারও হাতে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, কারও হাতে tennis racket, কারও হাতে boxing gloves, কারও হাতে hockey stick, কারও হাতে foot-ball। সুধু একজনের হাতে রয়েছে দেখলুম এক হাত লম্বা একটি খাগড়ার কলম, শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর। মধ্যে যেখানে চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে হয়, সেখানটা ফাঁক। তার পরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর,—সুধু কারও D-র পিছনে আছে L, কারও L. T. কারও S. C। কে কোন্ দলের লোক, তা তাদের মাথার উপরের placard না দেখলে বোঝা যায় না। দু-দলেরই রূপ এক। ব্যাং আর ফড়িং এ-দলেও ছিল, ও-দলেও ছিল। অথচ উভয় দলই পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখছিলেন।

রাজাবাহাদুর নাটমন্দিরে ঢুক্‌তেই একটি উচ্চাসনে অর্থাৎ High-court-এর জজের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর এক পাশে ছিল নটনারায়ণ, আর এক পাশে দেওয়ানজী। চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের মধ্যে যে গলিটা

ছিল, আমি আমার দলবল নিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সকলেরই মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে সাদা চাপকান, কোমরে তলওয়ার আর পায়ে নাগরা জুতো; সুধু আমার মাথার পাগড়ি ছিল ডাইনে নীল বাঁয়ে লাল, আর একমাত্র আমার তলওয়ারে ছিল হাতির দাঁতের বাঁট। আমরা প্রথমে গিয়েই সব single file-এ দাঁড়িয়ে salute করলুম। তারপরে এই বলে অভিবাদন করলুম, "জিয়ে মহারাজ, জিয়ে মোতিওয়ালা, দোস্ত বাহাল, দুষ্‌মণ পয়মাল"। শুনে রাজাবাহাদুর খুব খুসী হলেন। তারপরে নটনারায়ণ হুকুম দিলেন "জমাদার লীললাল সিং, পাহারাকো বন্দোবস্ত করো।" আমি "জো হুকুম" বলে, ঠাকুরবাড়ীর উত্তর দুয়ারে ছ-জন, দক্ষিণ দুয়ারে ছ-জন, পশ্চিম দুয়ারে ছ-জনকে মোতায়েন করে দিলুম। আর আমি দাঁড়ালুম চণ্ডীমণ্ডপের নীচে, যেখানে মাথার উপরে বড় বড় ইংরেজী হরফে লেখা ছিল "None but the brave deserve the fair"। আর রামরঙ্গিলা সিংকে রাজাবাহাদুরের সুমুখে খাড়া করে দিলুম। তার কারণ সে ছোকরা ছিল বহুৎ খবসুরৎ।

মিনিট পাঁচেক পরে নটনারায়ণের হুকুমে একটা বাবরিচুলো ছোকরা-ভাণ্ডারী মহা শঙ্খধ্বনি করলে, আর তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলের দুয়ার দিয়ে মালশ্রী চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হলেন, বিয়ের কনে সেজে। দেখলুম তার বিশেষ কিছু বদল হয়নি, সুধু লম্বায় একটু বেড়েছে, আর গায়ের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সঙ্গে আছেন একটি মহিলা, যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, যেমন কালো তেমনি ফ্যাকাসে,—এক কথায় শ্রীমতী মূর্ত্তিমতী dyspepsia। তার হাতে একখানা সোনার থালার উপরে একটি বেল ফুলের গোড়েমালা। পরে শুনেছি ইনি হচ্ছেন মিস্ বিশ্বাস জাত খৃষ্টান, পাস M. A., মালার নতুন মাষ্টারণী। মালা এসে প্রথমে এক নজরে সভাটি দেখে নিলে, তারপর মিস্ বিশ্বাসকে কি ইঙ্গিত করলে। আর মিস্ বিশ্বাস একমুখ হেসে অগ্রসর হ'তে সুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি ব্যাটধারীর সুমুখে দাঁড়িয়ে মালশ্রীকে সম্বোধন করে বললেন—

এই বীর যুবকদের কুলশীলের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। রাজাবাহাদুর যে সমান ঘর থেকে সমান বরের আমদানী করেছেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এদের রূপ তুমি নিজের চোখ দিয়ে দেখ, আর গুণ আমার মুখে শোনো। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য বাসু

বোস, ওরফে দ্বিতীয় রঞ্জি। ঐ যে হাতে ব্যাট দেখছ, ওর স্পর্শে বল্ অসীমে চলে যায়। তুমি যদি ওঁকে বরণ করো ত উনি তার পরদিনই নববধূ কোলে করে বিলেত চলে যাবেন,—Lord's Cricket Ground-এ ম্যাচ খেলতে। আর উনি যখন Century-র পর Century করবেন, তখন স্বয়ং রাজা ওঁর handshake করবেন, ও রাণী তোমার।

এ সব শুনে মালশ্রী বললে—Advance। মিস্ বিশ্বাস অমনি দ্বিতীয় বীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—

ইনি হচ্ছেন নেড়া দত্ত। এঁর তুল্য Goal-keeper ভূ-ভারতে নেই। ইনি বল ঠেকান সুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই, সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে। যখন গোরার পায়ের লাথি খেয়ে বল্ উৰ্দ্ধশ্বাসে মরি-বাঁচি করে ছোটে, তখন এঁর মাথার গুঁতোয় তা চৌচির হ'য়ে যায়—অন্যের হলে মাথা চৌচির হয়ে যেত। তুমি যদি এঁকে বরণ করো ত ইনি তোমাকে ঐ অপূৰ্ব্ব ও অমূল্য মাথায় করে রাখ্‌বেন।

মালা আবার বললে—Advance।

মিস্ বিশ্বাস তৃতীয় বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে সুরু করলেন—ইনি হচ্ছেন ঘুসি ঘোষ। ঐ যে ওঁর দু'হাত জোড়া দুটো পাঁওরুটি রয়েছে, ও bread নয়—stone। ও-রুটি যার মুখে পড়ে, তার একসঙ্গে দাঁত ভাঙ্গে আর দাঁতকপাটি লাগে। তুমি যদি এঁকে বরণ করো তাহলে ঐ রুটির অন্তরে যে রক্তমাংসের হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তোমার পাণি গ্রহণ করবেন।

আবার শোনা গেল—Advance। মিস্ বিশ্বাস চতুর্থ বীরের সুমুখে দাঁড়িয়ে বললেন—উনি হচ্ছেন নগা নাগ, the world-famous hockey champion, আর তার লক্ষণ সব ওঁর দেহেই রয়েছে। ওঁর শরীর যে কাঠ হয়ে গিয়েছে সে শুধু দৌড়ে দৌড়ে, আর ওঁর বর্ণ যে মলিন শ্যাম, সে কতকটা, রোদে পুড়ে আর অনেকটা রাঁচির কোল-জাতীয় হকি-খেলোয়াড়দের ছোঁয়াচ লেগে। মহাবীরের রূপ এইরকমই হয়। তাদের দেহের গুণ রূপকে ছাপিয়ে ওঠে।

জোর গলায় হুকুম এল—Advance.

মিস্ বিশ্বাস পঞ্চম বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—এঁর নাম খঞ্জন মিত্তির। Tennis ground-এ ইনি খঞ্জনের মত লাফিয়ে বেড়ান বলে, লোকে এঁর পিতৃদত্ত নাম রঞ্জন খণ্ডে খঞ্জন করেছে। এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলিগোছের, তাঁর কারণ টেনিস খেলায় ভীমের মত বলের দরকার নেই, কৃষ্ণের মত ছলই যথেষ্ট। এ খেলায় muscle চাইনে, চাই শুধু nerve।

মালা বললে—Advance। অতঃপর মিস্ বিশ্বাস লিপিবীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—

ইনি হচ্ছেন বীর নৃসিংহ ভঞ্জ, প্রসিদ্ধ "তেজপত্রে"র সম্পাদক। প্রথমে ইনি ছিলেন গত সবুজপত্রের সহকারী সম্পাদক, যে কাগজে বীরবলের ব্যঙ্গের ভয়ে ইনি মন খুলে হাত ঝেড়ে লিখতে পারেন নি। পরে সে পত্র যখন শুকিয়ে ঝরে গেল, তখন ইনি তেজপত্র প্রকাশিত করলেন। সে পত্র যে কতদুর তেজপূর্ণ, তা ত তুমি জানো, কারণ তুমি তা পড়েছ। তার দু' ছত্র পড়লেই পাঠকের শিরায় উপশিরায় ধমনীতে উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়। তখন পাঠকের অন্তরে আর ধৈর্য্য থাকে না, উথলে ওঠে সুধু বীর্য্য। The pen is mightier than the sword, এ কথা যে সত্য—তা হাতে কলমে প্রমাণ করেছে ওঁর হাতের ঐ কলমটী।

মালা হুকুম করলে—Forward।

মিস্ বিশ্বাস হাতে সোনার থালা ও ফুলের মালা নিয়ে শেষ কর্ম্মবীর ও প্রথম জ্ঞানবীরের মধ্যে যে হাত দশেক ব্যবধান ছিল ধীরে ধীরে তা অতিক্রম করতে লাগলেন, এদিকে মালশ্রী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তোর হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর আমার বাঁ পাশে এসে আমার বাঁ হাত ধরে দাঁড়ালে। আর আমি আমার অসি খাপমুক্ত করতে বাধ্য হলুম। এ ব্যাপার দেখে সভা সুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তারপর হঠাৎ রামরঙ্গিলা ছোকরা চীৎকার করে তার ভাই ব্রদ্রীকে জানালে, 'মালা হামলোককা মিল গিয়া, আর এইসা তেইসা মালা নেই—একদম মোতিকো মালা'। অমনি রাম সিংদের দল সমস্বরে চীৎকার করে উঠল "জয় লীললাল সিংকো জয়"!

রাজাবাহাদুর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আমার দলবলের এই ক্ষত্রিয়োচিত জয়জয়কার শুনে তিনি বললেন—

"ই বাৎ হো নেই সেক্তা"।

রামরঙ্গিলা অমনি বললে—

"অগর হো নেই সেক্তা তো হুয়া কৈসে?"

আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললুম "তোম্ চুপ রহো"। আর রাজাসাহেবকে সম্বোধন করে বললুম—"হুজুর, ইনকো লেড়কপন্কা চঞ্চলতা মাপ কিজিয়ে"। অমনি আবার সব চুপ হয়ে গেল।

তখন রাজাবাহাদুর বীরের দলকে সম্বোধন করে বললেন:—

"হে বীরগণ, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য করো। এই দরওয়ান বেটারহাত থেকে মালাকে ছিনিয়ে নেও।"

এ কথা শুনে কর্ম্মবীররা চুপ করে রইলেন, কিন্তু জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন উঠে বললেন—

"মহাশয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নেই। আপনার মেয়ে ত আমাদের প্রত্যাখ্যান করেনি, করেছে কর্ম্মবীরদের, ওঁরাই এখন যথা কর্ত্তব্য করুন।"

কর্ম্মবীররাও নড়বার চড়বার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। সুধু লিপিবীর বাঁ হাত দিয়ে মিস্ বিশ্বাসের অঞ্চল ধরে পাশের বীরকে ঠেলতে লাগলেন। লিপিবীরের ঠেলাতে অস্থির হয়ে খঞ্জন মিত্তির উঠে বললেন—"রাজাবাহাদুর, এত playground নয়—battlefield। আমরা নিরস্ত্র, ওরা সশস্ত্র; আমাদের হাতে আছে শুধু ব্যাটবল, আর ওদের হাতে আছে তলওয়ার। এ অবস্থায় আমরা যুদ্ধং দেহী বলতে পারি নে। এই দু'মিনিট আগে শুনলুম—Pen is mightier than the sword;—তা যদি হয় ত তেজপত্রের সম্পাদক কলম হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

ঐ প্রস্তাবে লিপিবীর মিস্ বিশ্বাসের পিছনে আশ্রয় নিলে।

এই সব ব্যাপার দেখেশুনে মালা আমার কানে কানে বললে—"দেখলে বাবার ফরমায়েসী বীরের দল?"

তারপর রাজাবাহাদুর বললেন, "দেখছি তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না, আমার মেয়ে আমিই উদ্ধার করব।" এর পর তিনি নটনারায়ণের কানে কানে কি বললেন। সে অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর মিনিট খানেকের মধ্যে লেঠেলের সর্দ্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। রাজাবাহাদুর বললেন, "যাও সরিতুল্লা, যাও। তোমরা গিয়ে ডাক ছাড়ো, তারপর যেমন যেমন দরকার হবে তেমনি হুকুম দেব।" সরিতুল্লা "হুজুর মালিক" বলে রাজাবাহাদুরের পায়ের ধূলো জিভে ঠেকিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে যাবা মাত্র লেঠেলরা সকলে গলা মিলিয়ে "লা আল্লা ইল আল্লা মহম্মদ রসুল-উ-উ-উ-উ-ল" বলে ভীষণ জিগির ছাড়লে,—যেন মনে হল এইবার সভায় ডাকাত পড়বে। আর তাই শুনে রামসিংদের দল "সীতাপতি রামচন্দ্রজিকো জয়" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মনে হল, এইবার দুইদলে বুঝি যুদ্ধ বাধে।

জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে রাজাবাহাদুরকে বললেন—"মহাশয় করছেন কি, একটা হিন্দু

মুসলমানের riot বাধাবেন না কি? এমন জান্‌লে ত এখানে কখনো আসতুম না, এখন বেরতে পারলে বাঁচি। যা করতে হয় করুন, কিন্তু non-violent উপায়ে।” রাজাবাহাদুর উত্তর করলেন—“শান্ত উপায় অবলম্বন করতে আমি সদাই প্রস্তুত, অবশ্য তা যদি ক্ষাত্রধর্ম্মের অবিরোধী হয়।” আমি দেখলুম আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা কিছু নয়। অমনি আমার দলবলকে হুকুম দিলুম বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে। যেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অমনি আমি আমার মাথার পাগড়ি ও কোমরের বেল্ট খুলে ফেললুম। রাজাবাহাদুর আমার দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—“কে, নীললোহিত নাকি?” আমি বললুম “আজ্ঞে আমি নীললোহিত শর্ম্মা।” আমার পরিচয় পেয়েই বাসু বোস, ঘুসি ঘোষ, নেড়া দত্ত, নগা নাগ ও খঞ্জন মিত্র সমস্বরে চীৎকার করে উঠল,—“Three cheers for the conquering hero”, তারপর হুরে হুরে শব্দে সভাগৃহ কেঁপে উঠল। দেখলুম এরা সত্যসত্যই sportsmen বটে। এদের মধ্যে একমাত্র লিপিবীর ক্রোধকম্পান্বিতকলেবর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—”এ মূর্খের দলে আমার ঢোকাই ভুল হয়েছিল। রাজাবাহাদুরের মত বাঙালীদের আজও এ জ্ঞান হয়নি যে, গোঁয়ার ও বীর এক জিনিষ নয়। যাই একবার কলকাতায় ফিরে, এ বিষয়ে একটি চুটিয়ে আর্টিকেল লিখব”। তিনি মনের আক্ষেপ এই ক’টি কথায় প্রকাশ করে, দ্রুতপদে জ্ঞানবীরদের কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক’রে তাদের কানে কি মন্ত্র দিতে লাগলেন।

একটু পরে রাজাবাহাদুর অতি ধীর গম্ভীর বুনিয়াদী গলায় বললেন—

“আমার মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় স্বয়ং তোমাকে বরণ করেছে, তখন এ বিবাহে আমার কোন ন্যায্য আপত্তি থাকতে পারে না। আমি শুধু ভাবছি, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান আর মালশ্রী ক্ষত্রিয়-কন্যা; সুতরাং এ বিবাহ কি শাস্ত্রসঙ্গত হবে?”

আমি বললুম—

পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ, তথা তথা এই রঙ্গ॥

একথা শুনে জ্ঞানবীরদের দলের একজন দোজবরে D. L. দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—

"এ বিয়ে দিতে চান দিন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এইটুকু স্বধু জেনে রাখবেন যে তা সম্পূর্ণ illegal হবে। মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই। উদ্বাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন্, কারণ বিদ্যাসুন্দরকে কোনমতেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায় না। যদি এ বিষয়ে শেষ কথা আর সার কথা জানতে চান ত Sir Gurudas-এর Marriage & Stridhan পড়ুন। আর ও বই পড়া আপনার নিতান্ত দরকার, কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু marriage নয়, স্ত্রীধনের কথা রয়েছে।"

আমি জবাব দিলুম, "শাস্ত্রফাস্ত্র জানিও নে, মানিও নে। কারণ

আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে মালা ছাড়িবার নই॥
মোর মালা মোরে দেহ, মোর মালা মোরে দেহ,
জাতি লয়ে থাক তুমি, আমি যাই গেহ॥"

রাজাবাহাদুর আমার কথা শুনে থ হয়ে রইলেন। এর পর প্রমাণ পেলুম যে পটলডাঙ্গার পণ্ডিতরা ঘোর পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু গড়ের মাঠের খেলোয়াড়রা ঘোর মূর্খ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য, আর শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্ম্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

রাজাবাহাদুর উভয়সঙ্কটে পড়েছেন দেখে খঞ্জন মিত্তির চেঁচিয়ে বললেন—

"অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং এ বিবাহ দিলে আপনার পণও রক্ষা হবে, জাতও রক্ষা হবে।"

রাজাবাহাদুর এই সুসংবাদ শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। D. L-টি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আইনের আর এক ফেঁক্ড়া তুললেন। তিনি বললেন—

"যদিচ ওরকম বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ, তবুও তা শাস্ত্রসঙ্গত হতে পারে, যদি ওঁর পূর্ব্ববিবাহিত স্ত্রী ব্রাহ্মণী হন"।

রাজাবাহাদুর অমনি আমার দিকে চাইলেন। আমি বললুম, "আজ্ঞে আমার প্রথম স্ত্রী ত আমি স্বয়ম্বর সভা থেকে সংগ্রহ করিনি। সে স্বধু ব্রাহ্মণী নয়, উপরন্তু কুলীন্-কন্যা, লক্ষ্মীপাশার মেয়ে সুতরাং সপত্নীতে আপত্তি নেই।" যেই এ কথা বলা, অমনি মালশ্রী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বাপের কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—

"এ বিবাহ আমি কিছুতেই করব না, প্রাণ গেলেও নয়। স্বামী নিয়ে partnership business!"

আমি বললুম—"মালশ্রী, আমি বিপদে পড়ে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি যে কার্ত্তিক ছিলুম, সেই কার্ত্তিকই আছি"। মালশ্রী উত্তর করলে—

"তাহলে সেই কার্ত্তিকই থাকো। মিথ্যাবাদীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করব না। প্রাণ গেলেও নয়"।

আমি বললুম—"তাই সই, আমি চিরকুমারই থাক্‌ব। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।"

মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে বললে—"আমিও চিরকুমারী হয়ে থাকব। এরপর আমি পুরুষ-বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে নারী-আন্দোলনে যোগ দেব।"

এই কথা বলেই সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

এরপর আমি সটান ষ্টেশনে চলে গেলুম, একেলা হেঁটে নয়, মোটর গাড়ীতে নটনারায়ণের সঙ্গে।

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "মালার কি হল ?" নীললোহিত উত্তর করলেন—"সে খোঁজ তুমি করোগে। আমি ঘটক নই।" এর পর রসিক-লাল জিজ্ঞাসা করলেন—"আর মোতির মালাটা ?" নীললোহিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—

"সেটি তোমার চাই নাকি ? তুমি দেখছি রাম-রঙ্গিলার মাসতুতো ভাই। মালা গেল তাতে দুঃখ নেই, মোতির মালা হারাল এইটেই হচ্ছে জবর ট্রাজেডি। বাঙালী জাতটে হাড়ে ছিবলে। কোনও serious জিনিষ তোমরা ভাবতেও পারো না, বুঝতেও পারো না। তোমাদের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে প্রহসন। যাও সকলে মিলে পড়ো গিয়ে 'বিবাহ বিভ্রাট'।"

এই শেষ কথা বলে নীললোহিত কপালে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মাথার ঘাম কি চোখের জল মুছতে মুছতে, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমরা সকলে হো হো করে হেসে উঠলুম। কারণ নীললোহিতের ধমক সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে ট্রাজেডি বলে আমরা বুঝতে পারলুম না, আমাদের মনে হল, ওটি একটি roaring farce।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ফরাসী জীবন

ইংরাজের আদবকায়দা আমরা যে বহু পরিমাণে অঙ্গীকার করে নিয়েছি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা'দের সুসংস্কারগুলি যতটা পেয়ে থাকি আর না থাকি তা'দের কুসংস্কারের ভূত আমাদের ঘাড়ে পূরো মাত্রায় চেপে বসেছে—তাই অনেক স্থলেই আমরা আজও অন্য জাতির চরিত্র বিচার করতে গিয়ে ইংরাজের চোখেই করে থাকি। ফলে নিজেদেরই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। সেই জন্যই আমাদের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতেদেরও বল্‌তে বাধে না—"London is London"। অর্থাৎ লণ্ডনের মত স্থান দুনিয়ায় নেই—আর সেখানে যে শিক্ষালাভ করা যায় সে শিক্ষা নাকি কোথাও মেলে না।

ফরাসী জাতি-সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা হ'য়ে গেছে—তা'দের দেশ নাকি শুধু স্ফূর্ত্তি করবার স্থান—শিক্ষার স্থান নয়—তাই আমাদের দেশের ছেলেরা সেখানে গেলেই নাকি বয়ে যায়। এ ধারণাও আমরা ইংরাজের কাছ থেকে পেয়েছি। ইংরাজ যখন ফরাসীদেশে পৌছায় তখন সে তা'র অভ্যস্ত রীতিগুলি না দেখ্‌তে পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ ফরাসীদেশে গাড়ী ঘোড়া রাস্তার বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে যায়,—বাড়ীর জানালাগুলি ভিতরে না খুলে বাইরে খোলে আর সব জানালাতেই শার্সি থাকে। প্যারিসের মত বড় শহরেও বাড়ীগুলি বেশির ভাগ চক্-মিলানো—আর তা'র মাঝখানে উঠান। বাড়ীর নীচুতলায় দোকান, উপরে নানা পরিবারের বাস। আর সমস্ত বাড়ীটার উপর নজর রাখবার জন্য দরজার নিকট ঘর নিয়ে থাকে Concierge। ফরাসীরা কেউ সকালে breakfast খায় না—দুপুরে lunch খেতে সবাই ঘরে ফিরে আসে। যখন তা'রা গল্প করতে চায় তখন "কাফে"-তে একটা drink নিয়ে দু'ঘণ্টা বসে কাটিয়ে দেয়। নিজের দেশের বিপরীত এই সব রীতি ইংরাজের ভাল লাগে না—আর প্যারিসের হোটেলে সকালে যখন সে পূরা পেট breakfast পায় না তখন তা'র মন আরও চটে যায়। অথচ ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই সব রীতির চল্‌তি।

ফরাসীদের সম্বন্ধে ইংরাজের কুসংস্কার দূর করবার জন্য সম্প্রতি এক ইংরাজই কলম ধরেছেন। এঁর নাম ফিলিপ কার।* বিশ বৎসরের উপর ফরাসীদেশের শহরে ও গ্রামে বাস করে তিনি ফরাসী-চরিত্রের একটা যথাযথ ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। দু'শ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বইয়ে তিনি ফরাসী জাতির চরিত্র নানাদিক থেকে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে ফরাসী-চরিত্র-সম্বন্ধে ইংরাজের যে-সব কুসংস্কার,

* Philip Carr—*The French at Home;* Methuen & Co., London, 1930.

তা'র মূলে রয়েছে তা'র নিজের অহমিকা ও অন্য জাতির চরিত্রবোধে অক্ষমতা। অবশ্য ফরাসী জাতির চরিত্র যে নির্দ্দোষ তা'ও তিনি বলেন না—তবে সে-সব দোষ সার্ব্বজনীন।

ফরাসীর সম্বন্ধে ইংরাজ মনে করে যে, সে স্ফূর্ত্তিপ্রিয়, চরিত্রহীন, কুঁড়ে, জোচ্চোর ও নোংরা। এ-সব দোষ যে-কোন জাতির চরিত্রেই মারাত্মক এবং ইংরাজের এই অভিযোগ মেনে নিলে ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নিরাশ হ'তে হয়—আর তা'র বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসও দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এ জাতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌লে দেখা যায় যে ইংরাজের ও-সব অভিযোগের একটীও সত্য নয়। ফরাসী জাতি স্ফূর্ত্তিপ্রিয় বটে—কিন্তু তা'র স্ফূর্ত্তির ভিতর যে স্বচ্ছন্দতা ও সহজভাব আছে তা' অন্যত্র দুর্লভ। এই স্বচ্ছন্দভাবই তা'র চরিত্রের বিশেষ গুণ। কিন্তু স্ফূর্ত্তিপ্রিয় বলেই সে চপল-স্বভাব এ কথা বলা চলে না। সে যে ধীরভাবে কষ্টসাধ্য কাজ করতে সক্ষম তা'র বহু প্রমাণ ফরাসী শিল্প, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেই রয়েছে। এ-সব বিষয়ে তা'র মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা সারা জগতই মেনে নিয়েছে। ফরাসী জাতির নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধেও ইংরাজের যা' ধারণা তা'র মূলেও রয়েছে অহমিকা। ইংরাজ তা'র নিজের দেশের আবর্জ্জনাকে যেমন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায় ফরাসী তা' পারে না। বড় শহরের যে-সব আবর্জ্জনাকে কেউ কখনো দূর করতে পারে নি, সেগুলিকে বরং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে লোককে সাবধান করে দেওয়াই সে পছন্দ করে। তাই প্যারিসের যে-সব নাট্যশালা সুরুচি-সম্মত নয় সেখানে সত্যকার ফরাসীদের বড় একটা দেখা যায় না—সেগুলি রুচিবাগীশ ইংরাজ ও আমেরিকানদের কলধ্বনিতেই মুখরিত। তাই বলে ফরাসীরা সকলেই যে শুকদেব, তা নয়—কারণ কোন জাতির সম্বন্ধেই সে কথা বলা চলে না। ফরাসীজাতির নৈতিক অবনতির আর একটা কারণ নাকি তা'র মদ খাওয়া। জলের বদলে ফরাসীরা মদ খায় বটে—কারণ তা'দের দেশে বহু পরিমাণে আঙ্গুর জন্মায়—আর তা'রা সব চেয়ে ভাল মদও তৈরি করে। কিন্তু তাই বলে তা'দের ভিতর মাতলামি যে খুব বেশি একথা সত্য নয়—ইংরাজ তা' নিজেই স্বীকার করে; ফরাসীদেশের চেয়ে ইংলণ্ডেই মাতালের সংখ্যা অধিক। ফরাসীরা যে লোককে ঠকায় তা'র প্রমাণ শুধু তা'দের ব্যবসায়েই কিছু কিছু পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায়ও তা'র বহু প্রমাণ মিল্‌ছে। কিন্তু ফরাসীদেশে ছোটোখাটো দোকানদার ও গ্রামের চাষীদের ভিতর লোক-ঠকানো বিরল।

ফরাসীকে কুঁড়েমি করতে প্রায়ই দেখা যায়। তাই 'কাফে'-তে দু' এক ঘণ্টা সে আনন্দের সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু

যখন কুঁড়েমি করতে চায় তখনই সে তা' করে অন্য সময়ে করে না। তাই যখন সে কোন কাজ পাঁচ মিনিটে করবে বলে প্রতিশ্রুত হয় তখন সে কাজে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগায় না—আর কুঁড়েমি করবার ইচ্ছা থাক্‌লে "bonnes cinq minutes"—লাগ্‌বে বলে দেয়,—তখন তার কাজ পনেরো মিনিটের পূর্ব্বে শেষ হয় না। এর ভিতরে তা'র চরিত্রের স্বচ্ছন্দভাবই ফুটে ওঠে—মানুষকে সে যন্ত্র করতে চায়না। ফরাসী সৈন্য যখন অভিযান করে তখন তা'রা "লেফ্‌ট-রাইট" করে তালে তালে পা ফেলে চলে না—মানুষের মত স্বচ্ছন্দগতিতেই চলে। তাই বহুদূরের অভিযানে অন্যজাতির চেয়ে বেশি সক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু বলেই তা'দের খ্যাতি আছে।

ফরাসীকে ইংরাজ আর দুটী কারণে দেখতে পারে না—প্রথমতঃ সে বেশি কথা বলে, আর দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যবহারে সে কখনো অপ্রস্তুত হয় না। ফরাসী বেশি কথা বলে সত্য—কিন্তু তাই বলে সে কাজে অবহেলা করে না। সে বেশি কথা বল্‌লেও তার কথা কখনো এলোমেলো নয়। তা'র সব কথার ভিতর যুক্তির আভাস পেয়েই ইংরাজ অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। ফরাসীর এই বেশি কথা বল্‌বার প্রবৃত্তিতে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর ফরাসী ভাষায় এমন একটা বাঁধুনী আছে যে সে ভাষায় কথা কইতে গেলে ভাসা-ভাসা কথা বলা সম্ভব হয় না। সেই জন্যই ঐ ভাষা এককালে সারা ইউরোপে lingua franca হ'য়ে উঠেছিল—আর আন্তর্জাতিক যত কিছু সন্ধিসর্ত্ত করা হ'ত বা এখনও হয় তা' ফরাসী ভাষায়ই লেখা হয়—কারণ সে ভাষায় কোন বাক্য দ্ব্যর্থ-বোধক নয়। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসীকে কখনও অপ্রস্তুত হ'তে দেখা যায় না—সকলের সঙ্গেই সে সহজভাবে ব্যবহার করতে জানে। কিন্তু তা'র ব্যবহারের এই স্বচ্ছন্দভাবকে অস্বাভাবিক মনে করে তা'র স্বভাবে একটা কৃত্রিমতার দোষ আরোপ করা ইংরাজের অভ্যাস। কিন্তু ফরাসীচরিত্র ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সামাজিক ব্যবহারে তা'র এই স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে রয়েছে অহমিকার সম্পূর্ণ অভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যবাদও যে এর মূলে নেই তা' মনে হয় না। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসী চরিত্রের এই সমভাব খুব প্রাচীন—মলিয়েরের নাটকেই তা' স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ফরাসী-বিপ্লবের তিনটী মূল-সূত্র হচ্ছে—Liberté, Egalité ও Fraternité, মৈত্রী, সাম্য ও স্বাধীনতা। সত্য কথা বল্‌তে ফরাসীরা মৈত্রী ও স্বাধীনতার তোয়াক্কা না রাখলেও, সাম্যের উপর তাদের পূরাদস্তুর ঝোঁক আছে। সেই জন্যই ফরাসীদেশে Lord, Sir, প্রভৃতির বালাই নেই—Baron, Duke দু'একজন থাক্‌লেও তাঁরা কোণ-ঠেসা হ'য়ে থাকেন—

নিজেদের গণ্ডির বাইরে মুখ দেখান না? Monsieur-র বেশি খেতাব কারো নেই—আর দেশের ও দশের কাজের জন্য কেউ যদি সরকার থেকে বিশেষ সম্মান (Legion d'honneur) পান তবে সে সম্মান সাধারণতঃ কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থাকে। এবং সরকারের দেওয়া রঙীন ফিতেও ঘরে তোলা থাকে কারণ তা' প'রে বেরুলে লোকে নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা করে না। ফরাসীদেশে এই সাম্যভাব আছে বলেই 'রেস্তোরাঁ'তে (Restaurant) বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও কলের মজুর এক টেবিলে বসে খায়—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে নামজাদা অধ্যাপকও লাইব্রেরীতে ঢুকে টুপি তুলে বেয়ারাকে অভিবাদন জানান ও তার করমর্দ্দন করেন।

ফরাসীর পারিবারিক জীবনই হচ্ছে সব চেয়ে প্রশংসার যোগ্য। ফরাসী স্বভাবতঃ স্বার্থপর হ'লেও নিজের পরিবারের জন্য যে কতটা স্বার্থত্যাগ করতে পারে তা ইংরাজ কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না। এই জন্যই সে মিতব্যয়ী—বাইরে না খেয়ে ঘরে এসে যা জোটে তাই খায়। এই পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে স্ত্রীজাতি। ফরাসী আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির কোন পৃথক সত্তা না থাক্‌লেও পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে তা'র স্থান খুব উঁচুতে। ইংরাজ যখন তা'র "family"-র কথা বলে তখন সে তা'র নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথাই ভাবে। বিয়ে না করা অবধি কোন পারিবারিক কর্ত্তব্যের কথা তা'র মনে হয় না কিন্তু ফরাসী যখন "famille"-এর কথা বলে তখন নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ব্যতীত তা'র ভাই বোন ও পিতামাতার কথাও ভাবে। সুতরাং বিয়ের পূর্ব্বেও তা'র পারিবারিক টান থাকে আর সেই পরিবারের কেউ শারীরিক অক্ষমতার জন্য সংসার চালাতে না পারলে তা'র সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জ্ঞানের কিছু অভাব হয় না। ফরাসীদেশে আইনের ও সমাজের চোখে এখনো Conseil de famille (অর্থাৎ পারিবারিক মন্ত্রণা-পরিষদ) উঁচু স্থান অধিকার করে। নাবালক, উন্মাদ ও অসমর্থের ব্যবস্থা করতে হ'লে এই মন্ত্রণা-পরিষদকেই আহ্বান করা হয়। আদালতের জজ (Juge de paix) মাতামহ-বংশের তিনজন ও পিতামহ-বংশের তিনজনকে ডেকে পরিষদ সংগঠন করেন এবং এই পরিষদই সব ব্যবস্থা করে দেয়। সামাজিক জীবনে এই পরিবারকেই unit ধরা হয়। তাই কোন পরিবারে যখন কেউ মারা যায় তখন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সে খবর দেবার জন্য যে চিঠি বিলি করা হয় তা'তে যে শুধু মৃতের স্ত্রীরই সই থাকে তা' নয়—তা'র ছেলে, মেয়ে, ভাই ও তা'র পিতামহ ও মাতামহবংশের নামও থাকে। পরিবারের এই প্রভাবের জন্য সকল ছেলে-মেয়েই পৈতৃক সম্পত্তিতে

সমান অধিকারী এবং কেউ তা'র প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশি পেতে পারে না। ছেলে মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে এখনো পিতামাতার হাত আছে। গ্রামে এখনো বিবাহিত মেয়ের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়—যে তা'র মা-ই তা'র জন্য ভাল 'বর' বেছে দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবিবাহিত মেয়েরা এখনো গ্রামে বা শহরে কোথাও স্বেচ্ছাচার করতে পায় না। বাইরে যেতে হ'লে তা'রা একা যায় না—আত্মীয় বা অভিভাবকের সঙ্গেই যেতে হয়। বিবাহের পরও তারা বড় একটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় না—দক্ষতার ও সুব্যবস্থার সঙ্গে গৃহকর্ম্ম চালানোই তা'দের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সেই জন্যই নাগরিক জীবনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। তাই বলে যে মেয়েরা ফরাসীদেশে কোন স্বাধীন ব্যবসায় করে না তা' নয়—তাদের ভিতরও ডাক্তার, কাগজের সম্পাদক, জর্ণালিষ্ট ও এডভোকেট (Avocat) দেখা যায়। বস্তুতঃ ফরাসীদেশেই সর্ব্বপ্রথম মেয়েদের ভিতর এডভোকেট হ'য়েছিল। এ ছাড়া শহরের নানা দোকান ও আফিসে বহু মেয়েরা কাজ করে।

ফরাসীদের পারিবারিক জীবনে এই দৃঢ় বন্ধন আছে বলেই সামাজিক বিনয়-ব্যবহার তা'রা অল্প বয়স থেকেই শেখে। বিনা কারণে লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করাই যদি ভদ্রতার লক্ষণ হয় তা'হলে সকল ফরাসীকেই ভদ্রলোক বলতে হবে; কিন্তু চেহারায় চালচলনে, কাপড়-চোপড়ে একটা আভিজাত্যের ছাপ ও নাগরিকতার বিশিষ্ট ভাণ না-থাক্‌লে ও কথাবার্ত্তা বেশ কায়দাদুরোস্ত না-হ'লে যদি কেউ ভদ্রলোক না হ'ন—তাহ'লে ভদ্রলোকের অস্তিত্ব ফরাসীদেশে নেই বল্‌লেই চলে। ফরাসীদেশে গ্রাম ও শহরে এমন কাউকে দেখা যায় না যে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না, এই ব্যবহার সে পারিবারিক জীবনে ছোটবেলা থেকেই শেখে আর এই হচ্ছে তা'র সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে তা'র আন্তরিকতা। তাই ইংরাজ যখন Thank you বা তা'র অপভ্রংশ শুধু—"kiu" বলে তখন তা'র মুখে কোন ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখা যায় না। কিন্তু ফরাসী যখন merci bien বা merci beaucoup বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তখন তা'র মুখে যে একটা মধুর ভাব ফুটে ওঠে তা' তা'র সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনিই দেখেছেন। এই আন্তরিকতা আছে বলেই ফরাসীভাষায় এখনও মধ্যমপুরুষের একবচন অর্থাৎ tu—"তুমি বা তুই" টিঁকে আছে। ইতালীর লোকেরা ফরাসীদেশকে —le pays du compliment বলে ঠাট্টা করে থাকে। ফরাসীজাতি অন্যকে compliment দিতে জানে—আর সেটা আন্তরিক ভাবেই যে দিয়ে থাকে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না।

ফরাসীরা কা'কে কি ভাবে সম্বোধন করতে হ'বে তা জানে। তাই চিঠিতে আন্তরিকভাবে পরিচিত না হ'লে—শুধু Monsieur, বেশি পরিচিত হ'লে—Cher Monsieur, ও বিশেষ হৃদ্যতা থাক্‌লে—Cher Monsieur Dutt পাঠ লিখ্‌বে, আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে Bien Cher Dutt পাঠও লিখে থাকে। তাই ফরাসীরা নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ব্যতীত অন্যের কথার জবাবে "হাঁ" বা "না" বল্‌তে হ'লে—"Oui" বা "Non" দিয়ে সারে না—তা'র সঙ্গে একটা Monsieur জুড়ে দেয়।

ফরাসীর বিনয়-ব্যবহার ও সাম্যজ্ঞানই তার জাতীয় ঐক্যের মূলসূত্র। ফরাসীদেশের সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত ন'ন তাঁরা মনে করেন যে শহরে ও বাইরে ফরাসীর চরিত্র এক নয় এবং তা'দের ভিতর কোন যোগাযোগ নেই। সব ফরাসীর ভিতরই যে একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তা নয়, তা'দের অনেকের উৎপত্তি-স্থান বিভিন্ন। তাই বাইরের থেকে দেখ্‌লে মনে হয় বৃটানী ও প্রভাঁস (Provence দক্ষিণ ফ্রান্স) এবং আলসাস্‌-লোরেন (Alsace-Loraine) ও পিরিনিজ (Pyrenees)-এর বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। আকৃতি ও চরিত্রের অনেক খুঁটিনাটিতে ওই সব দেশবাসীদের ভিতরে বহু পার্থক্য ধরা পড়ে তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু প্রকৃতিগত একটা বড় ঐক্যও তাদের মধ্যে দেখা দেয় সেই ঐক্যই হচ্ছে ফরাসী সভ্যতা। তাই রেনাঁ (Ernest Renan) পূরাদস্তুর বৃটন ও দোদে (Alfonse Daudet) প্রভাঁসের (Provence) লোক হয়েও ফরাসী সাহিত্যিকদের শীর্ষস্থানীয়।

অন্যান্য দেশে রাজধানী জাতীয় জীবনের যতটা কেন্দ্র হোক্ বা না হোক্ প্যারিস যে পূরামাত্রাতেই ফরাসী জীবনের কেন্দ্র তা'তে সন্দেহ নেই। শুধু প্যারিসের লোকেরাই তাই ভাবে না সমস্ত ফরাসীজাতিই প্যারিসকে সেই চোখে দেখে। প্যারিস ফরাসীজাতির শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রস্থানীয়। তা' ছাড়া বাইরের থেকে দেখ্‌লেও প্যারিসের ভিতরেও ফরাসীদেশের গ্রাম্যজীবনের অনেক হাবভাব চোখে পড়ে।

গ্রাম থেকে প্যারিসে এসে যাঁরা বসবাস করেন তাঁ'রাই সে হাবভাব বজায় রাখেন। প্যারিস যাঁরা ওপর ওপর দেখেছেন অর্থাৎ মোঁমার্তের (Montmarte) নাচঘর ও রেস্তোরাঁ, ল্যাটিন কোয়ার্টার (Quartier Latin) ও মোঁপার্নাসের (Montparnasse) কাফেগুলি দেখেই যাঁরা প্যারিস দেখার গর্ব্ব করেন তাঁরা প্যারিসের যা' সত্যকার ফরাসী জীবন তা' যে দেখেন নি এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কারণ নাচ গানে ভরা এই সব কাফে ছেড়ে শহরেরটু এক ভিতরে ঢুক্‌লেই দেখ্‌তে

পাওয়া যায় যে সত্যকার ফরাসী নিঃশব্দে তা'র কাজ করে যাচ্ছে—তা'র ভিতর দিয়ে যে প্রাণ-প্রবাহ চলেছে সেই প্রবাহই ফরাসীজাতির নিজস্ব—ও সেইখানেই গ্রাম ও শহরের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ।

সহর ও গ্রামের ভিতর এই যোগাযোগ আছে বলেই ফরাসীরা প্যারিসকে লণ্ডন বা নিউ ইয়র্ক হ'তে দেয় নি। রাস্তাগুলির কখনো দু'ধারে কখনো বা মাঝখানে এখনো সবুজ গাছের সার দেখা যায়—অনেক রাস্তায় এখনো ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে তা'র জিনিষ বিক্রি করে যায়—আর জাতীয় উৎসবের দিন রাস্তার উপর এখনো নাচ গান হয়—ও সেই উপলক্ষে রাস্তার দু'ধারে যে মেলা বসে তা' একমাসেও ভাঙে না।

তাই বাইরের চেহারায় সত্যকার প্যারিস বিদেশীকে বড় একটা চমক লাগাতে পারে না—ছ'তলার বেশি উঁচু বাড়ী প্যারিসে নেই—এবং দু'বছর পূর্ব্বেও প্যারিসের সীমান্ত সাঁসিরে (St. Cyr) যখন প্রথম দশতলা বাড়ী তৈরি সুরু হয়েছিল তখন মিউনিসিপালিটীই সে বাড়ী তৈরি বন্ধ ক'রে দেয়। প্যারিসের সব চেয়ে বড় ও প্রাচীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—কলেজ দ' ফ্রাঁস্—(College de France)। ফরাসী দেশের সব চেয়ে নামজাদা পণ্ডিতেরাই এখানকার অধ্যাপক কিন্তু তাঁ'রা এখনো একটা পুরানো দোতলা বাড়ীর এঁধো ঘরেতেই ক্লাস করে থাকেন। প্যারিস শহরে এই বাইরের আড়ম্বরের অভাব দেখেই ইংরাজ ও আমেরিকানের মন চটে যায় আর তা'রা মনে করে Paris is dirty। প্যারিসকে ভেঙে চুরে নিউইয়র্ক করায় ফরাসী জাতির এই অনিচ্ছার মূলে রয়েছে তা'র বহুদিনের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যবোধ। প্যারিসের অনেক জিনিষ বিদেশীর পছন্দ না হ'লেও সকলেই প্রায় স্বীকার করে—যে প্যারিস সুন্দর। মিউনিসিপালিটীর কমিটি নক্সা করে বড় বড় রাস্তা ও Sky-scrapper তৈরি করে দিলেই কোন শহর সুন্দর হয় না—শহরকে সুন্দর করতে হ'লে চাই নাগরিকের বহুশতাব্দীর মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান। সেই জন্যই প্যারিসের যে এফেল টাওয়ার (Tour Eiffel) দেখে বিদেশী বলে "সাবাস্", ফরাসী তা'কে তা'র কদর্য্য কুকীর্ত্তি বলেই মনে করে।

প্যারিস ও বাইরের ফরাসীদের ভিতর নিকট সম্বন্ধের আর একটা কারণ হচ্ছে তাদের কৃষি। ফরাসী দেশকে কৃষকের দেশ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ নাগরিকের চেয়ে কৃষকের সংখ্যা তাতে অনেক বেশি। এই কৃষকেরা ত'দের জমির ফসল ও তরি-তরকারি নিজেরাই শহরে আমদানি করে। আর শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভিতর

অনেকেরই গ্রামে এক টুক্‌রা জমি আছে—ছুটী পেলেই তা'রা গ্রামে যায়, আর বৃদ্ধ-বয়সে অবসর নেবার পর গ্রামের জমিই তাদের প্রধান অবলম্বন হয়। তা' ছাড়া গ্রামের কৃষকদের ভিতর থেকেই ফরাসীদেশ অনেক বড় লোক পেয়েছে। ক্লেমঁাসোর (Clemenceaux) পিতা ডাক্তার ছিলেন বটে—কিন্তু তাঁর পিতামহ গ্রামের কৃষক—ফশের (Foch) জন্ম দরিদ্র পরিবারে—আর জোফ্রের (Joffre) পিতামাতা দুজনেই কৃষক। জঁা জরেস্ (Jean Jaures), ব্রিয়ঁা (Briand) এরিও (Herriot) প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লোকেদেরও গ্রামের দরিদ্র পরিবারেই জন্ম।

গ্রামের সঙ্গে শহরের নিকট-সম্বন্ধের আর একটা কারণ হচ্ছে ফরাসীদেশের শিক্ষাপদ্ধতি। ফরাসীদেশে খুব কম ছেলেমেয়েরাই বোর্ডিঙে যায়। তারা শিক্ষার বয়সে সাধারণতঃ শহরে পিতামাতার নিকটেই থাকে—আর তাঁরা যদি শহরে রেখে তা'দের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হন তাহ'লে তা'রা গ্রামে পিতামহ-পিতামহী বা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকটে থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Ecole communale) পড়াশুনা করে। সাধারণতঃ এগারো থেকে তেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তা'রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাটায়—তার পর certificat d'etudes নেবার পর নিজেদের পথ ঠিক করে নেয়। যা'দের আরও পড়াশুনা করবার সুবিধা থাকে তা'রা তাই করে—নতুবা তা'রা কোন কাজে লেগে যায়। ভাল ছেলেমেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে—এই বৃত্তি পেয়েই অনেকে শহরে কলেজের পড়াশুনা করতে পারে। কিন্তু শহরে এসেও গ্রামের টান তাদের কমে না—শৈশবের মধুর স্মৃতি, গ্রামের লতাপাতা ফুলফলের সঙ্গে তা'দের পাতানো সম্বন্ধ ও পিতামহ-পিতামহীর বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহগ্রন্থী প্রভৃতির আকর্ষণে তা'রা প্রায়ই সেদিকে ছুটে যায়—এমন কি দু'একদিনের ছুটীতেও সেই স্মৃতিকেই কতকটা জাগিয়ে তুলবার জন্য তা'রা শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে যায়—তাই প্যারিসের প্রান্তভাগে যে সব বন আছে—বোয়া দ' বুলঙ্ (Bois de Boulogne), ভ্যারসাই (Versailles) ও ফঁতেনব্ল (Fontainbleu) রবিবারে বা অন্য ছুটীর দিনে এদের কলধ্বনিতে ভরে ওঠে।

গ্রাম ও জমির সঙ্গে এই যোগ আছে বলে ফরাসীজাতি অন্যজাতির তুলনায় সুখী। কৃষিকার্য্যই তা'দের বড় সম্বল, কলকারখানা তা'দের থাক্‌লেও নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষের বড় বেশি তা'রা তৈরি করে না—তাই প্রাচ্যদেশের বাজারের ওপর তা'দের ততটা লোলুপ দৃষ্টি নেই। বিদেশের থেকে দেদার অর্থ আসে না বলেই তা'দের জীবনযাত্রার খরচ অসহনীয় ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাই অন্যদেশের তুলনায় ফরাসীদেশে

সকলেরই মাইনে কম। প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটীর সব চেয়ে বড় কর্ম্মচারী বছরে ৫৫০০৲ ও চীফ এঞ্জিনিয়ার ৪৫০০৲ টাকার বেশি মাইনে পায় না। সৈন্যবিভাগে Marshal of France বছরে প্রায় ১৬০০০৲ অর্থাৎ মাসে প্রায় তেরো শ টাকা ও General তা'র অর্দ্ধেক এবং সব বিভাগেই অধস্তন কর্ম্মচারীরা বছরে গড়ে দেড় হাজার টাকার বেশি পায় না। তাই প্যারিসের যে সব অধ্যাপক সব চেয়ে বেশি মাইনে পান তাঁরাও মোটরকার রাখবার কথা কল্পনাতেও আন্‌তে পারেন না। তাই বলে সেই সব অধ্যাপকেরা যে খুব কষ্টে দিনপাত করেন তা' নয়—কারণ সপ্তাহে একবার করে তাঁরা নিজেদের সব ছাত্রকেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে থাকেন।

* * *

ফরাসী চরিত্রের এই সব গুণ আছে বলেই কার (Carr) সাহেবের তা' ভাল লেগেছে এবং আমাদেরও তা' ভাল লাগে। ফরাসী চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বাঙ্গালীর চরিত্রে আছে তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ইংরাজ ও ফরাসী চরিত্রের প্রভেদ একটী গল্পে বেশ ফুটে উঠেছে। গাড়ীতে একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ পাশাপাশি যাচ্ছিল। দু'জনেই চুপ করে ছিল—কারণ বিনা পরিচয়ে ইংরাজ কারো সঙ্গে কথা বলে না। ফরাসী বেশিক্ষণ চুপ করে থাক্‌তে পারে না। সিগারেটের আগুন ছিট্‌কে পড়ে ইংরাজের ট্রাউজার পুড়ছে দেখে সে বলে উঠ্‌লো, মশায়, আপনার ট্রাউজার পুড়ছে। ইংরাজ চটে উঠে তা'র উত্তরে বল্‌লো—মশায়, ত'াতে আপনার কি? অনেকক্ষণ ধরে আপনার জামার পকেট পুড়ছে সেজন্য আপনাকে কি আমি কিছু বলেছি? এ গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য না হ'লেও উভয় জাতির চরিত্র অনেকটা ঐ প্রকারের। সিগারেট খাবার সময় পকেটে দেশলাই না থাক্‌লে ফরাসী অপরিচিতকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেশলাই চেয়ে নেয়—ইংরাজ দেশলাইয়ের অভাবে সারাদিন সিগারেট না খেলেও অপরিচিতের কাছে চাইবে না; গাড়ীতে সারাদিন পাশাপাশি বসে থাক্‌লেও অপরিচিতের সঙ্গে কথা কইবে না। কিন্তু ফরাসী তা' পারে না—বাঙ্গালীও তা' পারে না। কারণ উভয়ের সভ্যতাই এখনো পূরামাত্রায় যান্ত্রিক হয় নি। কিন্তু যে পথে আমরা চল্‌ছি ও ইউরোপের যে জাতির হাবভাবের আমরা অনুকরণ করছি তা'তে চরিত্রের সহজভাব হারিয়ে আমাদের জীবনযাত্রাকে যে অচিরেই যান্ত্রিক করে তুল্‌বো তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

প্রাচীন ভারতে নাগরকজীবন

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রত্নতত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লইয়া নূতন ভাবে আলোচনাও সাধারণতঃ উদ্ভট কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধে 'রিসার্চে'র নামগন্ধ নাই এবং 'পাঠকগণকে নূতন কিছু শুনাইবার দুরাশাও নাই। প্রাচীন ভারতে নগরবাসিগণ কি প্রণালীতে সাধারণ জীবনযাপন করিতেন, পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থিত করাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে হয়ত অন্য কথাও আসিয়া পড়িবে, কিন্তু পুরাকালে ভারতীয়গণের দৈনন্দিন গৃহজীবনের মধ্যেও কতটা আদর্শবাদ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল, তাহা দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতে 'নাগরক' শব্দের দুটী অর্থ আছে। একটী চোর, অপরটী নগরবাসী। সুতরাং নাগরক বলিতে বিশিষ্ট কোনও সম্প্রদায় বুঝায় না এবং বৃত্ত বলিতে কোনও একটী বিশিষ্ট বৃত্তি বুঝায় না, সাধারণ জনপদ-বাসীকেই ইঙ্গিত করে। প্রথমে নাগরিকগণ যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, নাগরকবৃত্ত বলিতে তাহাই বুঝাইত। কালক্রমে ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ হইয়া পড়ে। আমরা এখানে বাক্যটীর প্রাচীন অর্থ ধরিয়া লইয়া সভ্য ও শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন জনপদবাসিগণের জীবনপ্রণালী আলোচনা করিব।

প্রাচীন ভারতে কি ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত তাহার অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ত্রিবর্গ-সাধনই সেকালে পরমার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কামসূত্রাদি গ্রন্থগুলি পড়িলে মনে সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে যখন পুরাকালে ভারতীয়গণের কামজীবনের বিশেষভাবে সেবা করিবার বিধি ও ব্যবস্থা ছিল, তখন তাঁহারা ঘোর ইন্দ্রিয়সক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন কি না? অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন যে মানবজীবনে ভোগ ও বিলাসের অবাধ সংমিশ্রণ হইলে ও কামজীবনের উপাদানগুলি বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে, ধর্ম্মজীবনে ব্যাঘাত ঘটে ও পুরুষার্থের প্রতি লক্ষ্য স্বভাবতঃই ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রকারগণ আপনা হইতেই যুক্তি দেখাইয়াছেন। তখনকার দিনে যে নগরবাসীর জীবনে পুষ্প, মাল্য, চন্দন প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, উত্তম শয্যা, উৎকৃষ্ট যান ও বাহন, ভৃত্যবর্গ ও সুসজ্জিত পরিচারিকা-বৃন্দ প্রভৃতি বিলাসের যাবতীয় উপকরণ ছিল, একথা সুনিশ্চিত। গোষ্ঠী-জীবনেও উদ্যানগমন, সুরাসবপানের উল্লেখ এবং গণিকাগণের উপস্থিতি

হইতে অনুমান হয় যে সেকালে মানবজীবনে ইন্দ্রিয়-সেবার স্থান ও অবসর ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে পুরাকালে অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর কি কামশাস্ত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল? অর্থাৎ, এককথায়, সূত্রকার-গণ গ্রন্থ-প্রণয়নকালে কি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন?

বাৎস্যায়ন নিজেই বলিয়াছেন,—

"এবমর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্ম্মং চোপাচরন্নরঃ।
ইহামুত্র নিঃশল্যমত্যন্তম্ সুখমশ্নুতে॥
কিং স্যাৎ পারত্রেত্যাশঙ্কা কার্য্যে যস্মিন্ন জায়তে।
ন চার্থঘ্নং সুখং চেতি শিষ্টাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥
ত্রিবর্গসাধকং যৎ স্যাদ্দ্বয়োরেকস্য বা পুনঃ।
কার্য্যং তদপি কুর্ব্বীত ন ত্বেকার্থং দ্বিবাধকং॥"
(দ্বিতীয় অধ্যায়—৩৯-৪০ শ্লোঃ)

অর্থাৎ এইরূপে অর্থ, কাম ও ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিলে ইহকালে এবং পরকালে বাধাবিঘ্নহীন অশেষ সুখলাভ করিতে পারা যায়। এই শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে কেবল কামসেবা সূত্রকারের অনুমোদিত নয়; ত্রিবর্গ-সাধন মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য আগে অর্থকে প্রাপ্ত হইয়া পরে কাম ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হয়; নতুবা অর্থ ও কামের প্রতি অবহেলাবশতঃ ঐহিক সুখলাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য মনে ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। শেষোক্ত সংগ্রহ শ্লোকটীতে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। যে কার্য্য করিলে পারলৌকিক জীবনে শান্তিলাভের আশঙ্কা না জন্মে, অর্থের ক্ষতি না হয়, অথচ সুখ ভোগ হয়, ত্রিবর্গবিৎ শিষ্টজন সেইরূপ সুখকর কর্ম্মে নিরত হন। সাধারণ অধিকরণে বাৎস্যায়ন, এই কামধর্ম্ম পশুধর্ম্ম হইতে কত পৃথক্, তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। সাধারণ লোকে ভুল করিয়া মনে করে যে ধর্ম্মাচরণ করিবার কোনও সার্থকতা নাই, কারণ তাহার ফলের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে কামসেবার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা কখনই পরমার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। নতুবা অপরপক্ষে, দর্শ ও পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম ও গবাময়ন প্রভৃতি গৃহ্য ও শ্রৌত ক্রিয়াগুলির এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে কেন? লোকায়ত-সম্প্রদায় অথবা চার্ব্বাক্‌পন্থিগণের সিদ্ধান্তগুলি একেবারে অভ্রান্ত নয়; সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সেগুলি খণ্ডনসাধ্য। অতএব কোনও একটী বিশিষ্ট জীবনের পরিচর্য্যা যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ ত্রিবর্গের সমন্বয়েই মানব ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের অধিকারী হয়। যাঁহারা জীবনকে এই আদর্শে পরিচালিত করিতে অভিলাষী হইতেন, তাঁহাদের

পক্ষে কামশাস্ত্রের অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক হইত। কিন্তু সকলেই কিছু কৃতবিদ্য ছিলেন না, আর তখনকার যুগে শাস্ত্রপাঠেও অধিকার ভেদ ছিল। যিনি এই শাস্ত্রপাঠে অধিকারী, তিনি স্বয়ং মূল গ্রন্থ সযত্নে শিক্ষা করিতেন; যিনি অনধিকারী, তিনি নাগরিকজনের সমবায়ে, অর্থাৎ সাধারণের বৈঠক বা সভা হইতে কামজীবনের তথ্যগুলি জানিয়া লইতেন।

নাগরকবৃত্তপ্রসঙ্গে সূত্রকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "গৃহীতবিদ্যঃ······ গার্হস্থ্যমধিগম্য নাগরকবৃত্তম্ বর্ত্তেত।" টীকাকার ইহার বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

'বিদ্যাগ্রহণের পর' গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া তবে লোক নাগরকবৃত্ত অবলম্বন করিবে'। গৃহীতবিদ্য না হইলে নাগরক হওয়া সহজ নয়। নাগরক স্বভাবতঃ বিদগ্ধজন। সংস্কৃত বিদগ্ধ বাক্যটীর প্রতিশব্দ cultured। একালে আমরা যে ব্যক্তিকে সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া থাকি, বাৎস্যায়নের যুগে তাঁহাকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করা হইত। সুতরাং বিদগ্ধ ব্যক্তির বৃত্তবর্ত্তনে যোগ্যতা ও তদনুরূপ বিদ্যার প্রয়োজন। স্ত্রী না থাকিলে নাগরকজীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেইজন্য শাস্ত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পত্নীলাভ হইলে যদিও গৃহকর্ম্ম নাগরকযোগ্য হয়, তথাপি অর্থব্যতিরেকে স্বাচ্ছন্দ্যে এরূপ জীবন যাপন সম্ভবপর হয় না। সব যুগেই স্ত্রী ও অর্থের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; টীকাকারও বলিতেছেন যে অর্জ্জিত হউক অথবা অন্বিত হউক, অর্থাগমের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ব্রাহ্মণ 'প্রতিগ্রহ'দ্বারা, ক্ষত্রিয় জয়দ্বারা, বৈশ্য 'ক্রয় বিক্রয়' করিয়া আর শূদ্র 'ভৃতি'র সাহায্যে অর্জ্জিত অর্থে ঐ জীবন যাপন করিবে। চতুর্বর্ণেরই যে এই বৃত্তিতে অধিকার ছিল, তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ হইতে বোঝা যায়।

যেখানে যাহার বৃত্তি, সেখানেই তাহার স্থিতি। অতএব নগরে, পত্তনে (রাজধানী), খর্ব্বটে (দুইশত ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি) অথবা সজ্জনা-শ্রয়ে নাগরক অবস্থান করিবেন। এগুলি ছাড়া অন্য যেখানে থাকিলে জীবিকানির্ব্বাহ সহজে সম্পন্ন হয়, সেখানেও নাগরক থাকিতে পারেন। 'বৈদগ্ধ্য' একটী সামাজিক গুণ; ধীর ও সংযত ভাষা, উন্নত রুচি এবং ব্যবহারের সৌজন্য মানবমন ও সমাজকে অলঙ্কৃত করে। সেইজন্য, জনবহুল স্থানেই নাগরকজনের বাস করিবার ব্যবস্থা ছিল।

নাগরকজীবনকে তিনভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ গোষ্ঠীজীবন, দ্বিতীয়তঃ গার্হস্থ্যজীবন, তৃতীয়তঃ দৈনন্দিনজীবন।

পুরাকালে সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীর একটী বিশিষ্ট স্থান ছিল। 'সভা' ও 'সমিতি'তে যেমন রাষ্ট্রীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, গোষ্ঠীতে সেইরূপ সামাজিক জীবনের বিকাশ হইত। আধুনিক যুগের ক্লাব্, বৈঠক বা সভার সহিত ইহার কতকটা মিল আছে। গ্রীক্‌গণ যেমন রঙ্গমঞ্চে, মুক্তপ্রাঙ্গনে অথবা বিপণির মধ্যে সম্মিলিত হইতেন, পুরাকালে নাগরকগণ সেইরূপ গোষ্ঠীতে সমবেত হইতেন। গোষ্ঠীতে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ হাস্য-কৌতুক, পানাহার ও নৃত্যক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিতেন। নাগরকগণের সাধারণ কতকগুলি ক্রীড়াকৌতুকের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। গোষ্ঠী-সমবায়, যাত্রার ব্যবস্থাপন, সমাপানক, উদ্যানগমন ও সমস্যাক্রীড়ার প্রবর্ত্তন, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য। পক্ষে বা মাসে কোনও একটী বিশিষ্ট দিনে, সরস্বতীগৃহে নাগরকগণের সম্মেলন হইত। আগন্তুক নটগণ ও অভ্যাগত নর্ত্তকীগণ তাঁহাদিগকে নৃত্যগীত প্রভৃতি শুনাইত। যাহারা পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত, তাহারা বেতনভোগী বলিয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বীয় কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিত। এই স্থলে ঘটানিবন্ধন বলিয়া একটী কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অপরাহ্নে গোষ্ঠীবিহার, সমাপানক অর্থাৎ সকলে একসঙ্গে মিলিয়া পান ক্রিয়া, বিহারার্থ গৃহবাটিকায় গমন প্রভৃতি কর্ম্মগুলি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু ঘটানিবন্ধন একটী বিশিষ্ট উৎসব। যত নাগরক কোন একটী প্রজ্ঞাত দিনে (সাধারণতঃ নাগরকগণের বিদ্যাকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আয়তনে পঞ্চমী তিথিতে) একত্র মিলিত হইয়া যাহাতে সামাজিক আলাপ করিতে পারেন; তাহার জন্য এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কুশীলবগণ নাগরকদের নিকট বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন, নাগরকগণও তাঁহাদিগকে একটী নিকৃষ্টপর্য্যায়ে ফেলিয়া শিল্পকলার অবমাননা করিতেন না। কুশীলবগণ ধনী নির্ধন, পাত্রভেদ না করিয়া আপনাদের কলাচাতুর্য্য দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিত। যদি তাহাদের নৃত্যগীত শ্রুতিসুখকর ও দৃষ্টিমধুর হইত, তাহা হইলে প্রেক্ষকগণের অনুরোধে সেই সব নৃত্যগীতের পুনরভিনয় চলিত। নাগরক-গণও তাহাদের প্রয়োগদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলে রঙ্গ অথবা সভামধ্যেই তাহাদিগকে পূজাফল (প্যালা দেওয়ার টাকা কড়ি) উপহার দিতেন। তখনকার দিনে বেতনভোগী নিযুক্ত শিল্পিগণের ও আমন্ত্রিত কুশীলবগণের মধ্যে কোনও রূপ বিদ্বেষভাব ছিল না। আগন্তুকগণের উৎসবে অথবা ব্যসনে অপর পক্ষ তাহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া দিত। সেইরূপ, নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার কার্য্য অভ্যাগত নটগণ সম্পন্ন করিয়া লইত। এই এককার্য্যকারিতা অর্থাৎ পরস্পরের

সাহায্য করার প্রবৃত্তি সেকালের গণধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

গোষ্ঠীসমবায়ের প্রধান অঙ্গ গণিকা, যেহেতু নাগরকগণ সাধারণতঃ তাহাদের গৃহেই সমবেত হইতেন। গোষ্ঠীসমবায় বলিতে আমরা, সভামণ্ডপে, গণিকাগৃহে অথবা অন্যতম নাগরক ব্যক্তির গৃহে, 'সমানবিদ্যা, সমানবুদ্ধি, ও সমধনশালী কতকগুলি সমবয়স্ক ব্যক্তির বিশ্রম্ভালাপসহযোগে একত্র অবস্থিতি' বুঝিয়া থাকি। সেস্থানে নাগরকগণ কাব্য, নৃত্য, গীত অথবা অন্য কোনও চারুকলার চর্চ্চা করিতেন। সেই গোষ্ঠীতে নাগরকদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে পরিচারিকা-দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা চলিত। গণিকাদিগের গোষ্ঠীতে অবস্থিতি সমাজবিরুদ্ধ রীতি নহে, ইহা শিষ্টসম্মত সামাজিক প্রথা। আধুনিক যুগেও অনেক প্রদেশের অধিবাসিগণ নৃত্যগীত শুনিবার জন্য ঐ স্থানে সমাগত হওয়া নির্দ্দোষ আমোদ মনে করেন। এই গণিকাবৃত্তিকে গ্রীসদেশের Hatærism প্রথার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রীসে যেমন গণিকাকুল সমাজের মধ্যে একটী নিজস্ব স্থান অধিকার করিয়াছিল, প্রাচীন ভারতেও তেমনি তাহারা নৃত্য, গীত প্রভৃতি চতুঃষষ্ঠিকলার অনুশীলনের ফলে সমাজে বরেণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যে গণিকাবৃন্দের উপস্থিতি অনেকস্থানেই উল্লিখিত আছে। মহর্ষি দত্তক অনেকদিন যাবৎ গণিকাগৃহে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের বৃত্তিরহস্য ও সাম্প্রদায়িক কলানৈপুণ্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মৃচ্ছকটিকেও দেখিতে পাই যে বসন্তসেনা কুলনারী না হইয়াও চারুদত্তের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তদানীন্তন রাজন্যবর্গের সভামণ্ডপে গণিকাগণের উপস্থিতি ও প্রবেশ অব্যাহত ছিল। কাদম্বরীতে রাজাশূদ্রকের, ও বাণভট্টের হর্ষচরিতে রাজা শ্রীহর্ষের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত গণিকার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। অধ্যাপক Lüders, অশ্বঘোষরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ ও যে অন্য দুখানি খণ্ডিত নাটকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতেও আমরা ঐরূপ চরিত্র চিত্রিত আছে দেখিতে পাই। সুতরাং গণিকাবিবাহ, অথবা তাহাদের কলানৈপুণ্য দর্শনার্থ তাহাদের গৃহে গমন একটী সামাজিক প্রথা বলিয়া গণ্য ছিল এবং ঐরূপ প্রথা ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। জন্মগ্রহণ দৈবাধীন, কিন্তু শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের ফলে সম্মানলাভ স্বীয় চেষ্টিতফল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক Keith-এর Classical Drama নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। গণিকাগণের জীবনবৃত্তি, তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী, প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বাৎস্যায়নের বৈশিকাধিকরণেও বিশদরূপে বিবৃত আছে। সুতরাং শাস্ত্রকারগণও যখন

তাহাদিগকে গোষ্ঠীতে স্থান দিবার অনুমতি দিয়াছেন, তখন ইহা কোনও নিন্দনীয় ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিল না।

গোষ্ঠীতে মিলিত হইয়া নাগরকগণ একত্র পানক্রিয়ায় রত হইতেন। ইহাকেই সমাপানক বলা হইত। এক সময়ে একজনের বাটীতে, অন্য সময়ে অন্যজনের গৃহে পালা করিয়া এই পানগোষ্ঠী সম্মিলিত হইত। সেকালের পানরীতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আপানক বলিতে আমরা 'মধু, মৈরেয়, সুরা ও আসব' এই কয়টী বুঝি। এই পানীয় আগে গণিকাদিগকে উপহার দেওয়া হইত, পরে নাগরকগণ তাহা পান করিতেন। এই রীতি দ্বারা গণিকাগণের অভ্যর্থনা, সম্মান ও গৌরবই সূচিত হইতেছে। এই পানগোষ্ঠী উদ্যান-গমনের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। উদ্যানগমন কালে নাগরকগণ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারূঢ় হইয়া পরিচারকগণ সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেখানে কুক্কুট-যুদ্ধ (Cock-fight) ও দ্যূতক্রীড়ার (পাশাখেলা) আয়োজন থাকিত। ঐ সকল ক্রীড়ায় পূর্ব্বাহ্ণ অতিবাহিত করিয়া উদ্যানজাত পত্রপুষ্প সঞ্চয় করিয়া নাগরক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইতেন। দ্যূতক্রীড়া ও কুক্কুটযুদ্ধ ভিন্ন হিংস্র জলচররহিত দীর্ঘিকা অথবা পুষ্করিণীতে জলক্রীড়ারও প্রচলন ছিল।

এইবার সমস্যাক্রীড়ার কথা বলা হইতেছে। টীকাকার বলিতেছেন, এই ক্রীড়া দুই প্রকারের—মাহিমানী ও দেশ্যা। মাহিমানী ক্রীড়ার মধ্যে 'যক্ষরাত্রি', 'কৌমুদীজাগর' ও 'সুবসন্তক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যক্ষরাত্রি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাকেই বলা হইত। সেই রাত্রিতে নাগরকগণ দ্যূতক্রীড়া করিতেন, এইজন্য ইহার অপর নাম দ্যূতপ্রতিপৎ। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার প্রাচুর্য্য হয় বলিয়া ঐ রাত্রিকে কৌমুদীজাগর বলা হইত। সে সময়ে দোলাদ্যূতপ্রায় ক্রীড়া হইত। সুবসন্তক একটী বিশিষ্ট দিন, কারণ ইহার অপর নাম মদনোৎসব। বসন্তে মদনত্রয়োদশী তিথিতে নৃত্যবাদ্য ও বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক অনুষ্ঠিত হইত; নাগরকজীবনে ইহা একটী স্মরণীয় দিন ছিল। দেশ্যা অথবা সম্ভূয়ক্রীড়ার মধ্যে সহকার-ভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, একশাল্মলী, পাঞ্চালানুযান ও কদম্বযুদ্ধের নাম উল্লেখযোগ্য। যে ক্রীড়ায় সুগন্ধি অপক্ক আম্রফলের ভঞ্জন হয়, তাহাকে সহকারভঞ্জিকা বলে। ইহা এখনও আমাদের দেশে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং বাল্যকালে পল্লীগ্রামে অনেকেই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। ছোলা, মটর প্রভৃতি পুড়াইয়া খাওয়ার ধুমকে অভ্যূষখাদিকা বলে। যে ক্রীড়ায় মৃণাল তুলিয়া খাওয়া হয়, তাহাকে বিসখাদিকা বলে। নববর্ষার ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইলে, বৃক্ষরাজিতে যখন নবপল্লবের উদ্গম হয়, তখন সিক্ত বনস্থলীতে গিয়া প্রণয়ী ও প্রণয়িনীগণ যে ক্রীড়ায় রত হইতেন,

তাহারই নাম নবপত্রিকা। পাঞ্চালানুযান ক্রীড়াটী বোধ হয় কোন স্থানীয় কৌতুকবিশেষ। ইহা অনেকটা আজকালকার পুতুলনাচ, মিছিল ও শোভাযাত্রার মত। শাল্মলীবৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছ লইয়া নিজ দেহ সুসজ্জিত করার নাম একশাল্মলী। কদম্বযুদ্ধ ক্রীড়াটী বোধ করি আধুনিক যুগের টেনিস্ খেলার প্রাচীন সংস্করণ। কদম্বপুষ্পকে প্রহরণ লইয়া ক্রীড়ার নাম ছিল কদম্বযুদ্ধ। এই ক্রীড়া কয়টী নাগরকজনোচিত ও অতি সুন্দর। সব কয়টীই প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তিবিধানের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাহা ছাড়া, এই ক্রীড়াকৌতুকের নামকরণে সেকালের দীক্ষা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ নামগুলির মধ্যে কেমন একটী মোহময় শব্দবিন্যাস ও সৌকুমার্য্য আছে।

এইরূপে, নাগরকগণ ক্রীড়াকৌতুকে, কাব্যসমস্যায় ও কলাচর্চ্চায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ফলে, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট সবিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। গ্রামবৃদ্ধগণ শুধুই উদয়নের প্রেমকাহিনী বলিতেন না; অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা পাইলে তাহাদের নিকট নাগরকবৃত্ত বর্ণনা করিতে বসিয়া যাইতেন এবং যাহাতে তাহারা নাগরকদের মত জীবনকে সুন্দর ও সফল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে সেই মত উপদেশ দিতেন।

উপরে বর্ণিত গোষ্ঠীজীবন হইতে প্রতীয়মান হয় যে গোষ্ঠী কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের স্থান ছিল না। সেখানে বিশেষ বিশেষ কাব্যচর্চ্চা এবং ক্রীড়াকৌতুকও চলিত। নাগরকগণ স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও সুকুমার-বৃত্তির অনুশীলনে অনুরাগী ছিলেন। পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও বিনীত ব্যবহার, উপযুক্ত ব্যক্তিগণের পূজা এবং যাত্রা ও উৎসবাদিতে প্রবর্ত্তমান পুরুষের উপচার ও সম্মান প্রদর্শন তখনকার দিনে শিষ্টতাসম্মত ছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে কাব্য ও কলার অনাদর ছিল না, নতুবা সাহিত্যে কবিচর্য্যার এত নিদর্শন মিলিত না।

এইবার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গোষ্ঠীর কথা শেষ করা হইবে। এখনকার মত তখনকার দিনেও নিশ্চয়ই ভাষাসমস্যা ছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিকগণের সম্মেলনে কোন্ ভাষায় কথা কওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন—

> নাত্যন্তং সংস্কৃতেনৈব, নাত্যন্তং দেশভাষয়া
> কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ল্লোঁকে বহুমতো ভবেৎ।'
>
> (৪র্থ অধ্যায়—২০ শ্লোঃ)

শুদ্ধ সংস্কৃতে অথবা কেবল দেশভাষা অবলম্বন না করিয়া আলাপাদি কার্য্য করিলে সমাজে সম্মানিত হইবে। অর্থাৎ, মিশ্রিত ভাষায় আলাপ

করা উচিত, ইহাই শিষ্টজনের অভিমত। অধুনা রাষ্ট্রভাষা লইয়া আন্দোলনের যুগে এ কথা কয়টী প্রণিধানযোগ্য। গোষ্ঠীতে বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে সামাজিকতা থাকা উচিত, সেইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ উপযুক্ত গোষ্ঠীতে যথাসুখে বিচরণ করিতেন এবং সকলের বোধগম্য ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া আপনার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিতেন ;—

"লোকচিত্তানুবর্ত্তিন্যা ক্রীড়ামাত্রৈক কার্য্যয়া
গোষ্ঠ্যা সহ চরন্ বিদ্বাল্লোঁকে সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"

(৪র্থ অধ্যায়—২০ শ্লোঃ)

এইবার গৃহজীবনের কথা। যাঁহারা সুন্দরের পূজা করিতেন, তাঁহারা যে নিজ গৃহ শুধু বাসোপযোগী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একথা বলা বাহুল্য। বাসগৃহটী যাহাতে মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এ বিষয়ে তাঁহাদের সবিশেষ যত্ন ছিল।

নগরবাসিগণ সাধারণতঃ 'আসন্নোদক ভূমিতে' গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। পান ও বিহারের উপযোগী নির্ম্মলজলপূর্ণ বাপীতট অথবা সরোবরের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানই বাসগৃহের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কেবল উত্তম বাসস্থানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না ; সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকাকে তাঁহারা একটী অপরিহার্য্য উপকরণ বলিয়া মনে করিতেন। এই গৃহোদ্যানের উল্লেখ শকুন্তলা-প্রমুখ সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। বাসগৃহটী 'বিভক্তকর্ম্মকক্ষ' হইত, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকোষ্ঠগুলিকে সাজান হইত। যাবতীয় গৃহকর্ম্ম একই গৃহে করিতে থাকিলে বাসভবনের শোভা নষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য নাগরকগণ বিভিন্ন কক্ষভাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শয়ন ও উপবেশনের জন্য দুইদিকে দুটী বাসগৃহ থাকিত। এই রীতি রুচিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয় কারণ শয়নগৃহ নির্জ্জন ও অন্তরালবর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকাল অবশ্য যাঁহাদের স্থানাভাব নাই, তাঁহারা এইরূপে প্রকোষ্ঠ ভাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রায়ই উক্ত কক্ষ দুটী ভিন্নদিকে না হইয়া পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে গৃহনির্ম্মাণের অবশিষ্ট বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইল না, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহা বাস্তুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে যে বাস্তু ও স্থপতিবিদ্যার এবং তক্ষণশিল্পের বহুল প্রচলন ছিল তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। যাঁহাদের এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তাঁহারা শুক্রনীতিসার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকরণ খুলিলেই দেখিবেন যে সেখানে বৃক্ষরোপণ, জলসেচন হইতে আরম্ভ করিয়া কূপ ও পুষ্করিণীখনন, মন্দিরাদি দেবায়তননির্ম্মাণ, মূর্ত্তিগঠন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের

অনুপাত প্রভৃতি ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথারীতি উল্লিখিত রহিয়াছে।

গৃহসজ্জায় নাগরকগণ অত্যন্ত যত্নবান্ ছিলেন; এবং বাসগৃহে আধেয় বস্তুর (আস্‌বাব পত্রের) বিন্যাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। যাঁহারা নাগরকদের গৃহসজ্জা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্র পড়িতে পারেন। মূলগ্রন্থের অভাবে, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'আমাদের শিক্ষা' নামক বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। প্রায় তের বৎসর আগে তিনি 'বইপড়া' শীর্ষক প্রবন্ধে এই 'নাগরিকদের গৃহের ও দেহের সাজসজ্জার' বর্ণনাচ্ছলে অনেকগুলি মূল্যবান্ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বহির্ভাগস্থ বাসগৃহে দুটী সুন্দর উপাধান এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী শুভ্র আস্তরণ অথবা চাদর পাতা থাকিত। তাহারি নিকটে আর একটী শয্যা প্রস্তুত থাকিত, তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রপ্রসর। শয্যার শিরোদেশে কোনও চিত্রযুক্ত কূর্চ্চাসন (ব্রাকেট্) ও পাদদেশে একটী কাষ্ঠময়ী বেদিকা স্থাপিত থাকিত। শিরোদেশে কূর্চ্চাসনটী ছিল দেবতার স্থান, আর অধোদেশে বেদিকাটী ব্যবহৃত হইত বিলাসের উপকরণগুলি সুসজ্জিত রাখিবার জন্য। গৃহমধ্যে অনুলেপন, মাল্য, সিক্‌থকরণ্ডক (মোমের কৌটা), সৌগন্ধিকপেটিকা (চূর্ণ গন্ধদ্রব্য রক্ষার জন্য আধার-বিশেষ) মাতুলুঙ্গত্বক্ (ফলবিশেষের ছাল) এবং তাম্বুলপাত্র রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। নিম্নে ভূমিদেশে থাকিত পতদ্‌গ্রহ (পিক্‌দানী), চিত্রফলক (চিত্রাঙ্কনের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলক), এবং বর্ত্তিকাসমুদ্‌গক (তুলি ও রং প্রভৃতি আঁকিবার সরঞ্জাম)। গৃহসজ্জার প্রধান উপকরণ দুটী ছিল 'ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তিদন্তে বিলম্বিত, কারুকার্য্যখচিত বীণা' ও পুস্তকাধার। সাধারণতঃ এই বীণা বাজান হইত না, 'নিচোল-অবগুণ্ঠিতা' (ঘেরা-টোপে ঢাকা) হইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিত মাত্র। পুস্তক সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে, কেননা টীকাকার 'পুস্তক' বাক্যটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'যঃ কশ্চিৎ পুস্তকঃ' অর্থাৎ যে কোনও বই। সম্ভবতঃ, বিলাসী নাগরকের গৃহে পুস্তক গৃহসজ্জার একটী অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়া গণ্য হইত।

ইহা ছাড়াও গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণ ছিল। গোলাকৃতি ও আস্তরণযুক্ত আরামপ্রদ আসনবিশেষের নাম ছিল বৃত্তাস্তরণ। তাহাতে মস্তকনিধানের জন্য একটী শিরোভাগ থাকিত। 'আকর্ষফলক' নামক অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের পরিচয় কোথাও মিলে নাই। সম্ভবতঃ আজকালকার বিলিয়ার্ড খেলার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। একটী

অাঁক্‌সী লইয়া কাঠের ফলকের উপর বল্ খেলা হইত। এই আকর্ষ-ফলক ও দ্যূতফলক (পাশাখেলার ছক্) ভূমিতেই কুড্যাশ্রিত অর্থাৎ স্তম্ভগাত্রে অথবা গৃহের দেয়ালে সংলগ্ন থাকিত। অভ্যন্তর-গৃহটীর বিন্যাস বাহিরের বাসগৃহের সজ্জারই অনুরূপ। কেবল বৃত্তাস্তরণের পরিবর্ত্তে পালঙ্ক ব্যবহৃত হউত। তাহার উপর একখানি সুরভিত আস্তরণ তুলিকাপাতে সুচিত্রিত হইয়া শোভা পাইত। ইহার শিরোদেশে ও অধোভাগে উভয়বিধ উপাধান রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শয্যা অতি সুকোমল এবং মধ্যভাগে বিনত ও মৃদুস্পর্শ; আচ্ছাদন-বস্ত্রটীও শুভ্রবর্ণ ও সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিত। নিকটেই একটী প্রতিশয্যিকা অর্থাৎ উক্ত শয্যা হইতে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুদ্র ও উচ্চ শয়নীয় প্রস্তুত রাখা হইত। ইহা অবশ্য আচার ও নিষ্ঠাবান্ নাগরকদের জন্য। এই অভ্যন্তর বাসগৃহটী সচরাচর পুরন্ধ্রীদের জন্যই ব্যবহৃত হইত। বাসগৃহের অনতিদূরে নানা-জাতীয় পক্ষিপূর্ণ পিঞ্জরগুলি হাতীর দাঁতের দাঁড়ে ঝুলান থাকিত। নাগরক-গণের ক্রীড়াভূমির স্থান নির্ণয় হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা নির্জ্জনতা ও একান্তবর্ত্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। তরুরাজির স্নিগ্ধ শ্যামছায়ায় প্রেঙ্খা-দোলা ও চক্রদোলা খাটান হইত। নারীবৃন্দের এই দোলাভূমি অতি মনোরম স্থান ছিল এবং রৌদ্র নিবারণের জন্য চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ ও লতাগুল্মের ঘন সমাবেশ থাকিত। বিহারভূমির অপর একটী অংশে "স্থণ্ডিলপীঠিকা" অর্থাৎ কুট্টিমময়ী বেদিকা ছিল। এই পুষ্পাকুল স্থানটীর নাম ছিল লতামণ্ডপ। এইরূপে ভবনবিন্যাস সম্পূর্ণ হইত। কূর্চ্চাসন হইতে সঙ্গীতযন্ত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় আধেয় বস্তুগুলি গৃহের অভ্যন্তরে যথাস্থানে সজ্জিত থাকিত। গৃহের পারিপাট্য ও শোভাসাধন যে মার্জ্জিতরুচির তথা বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক, একথা নাগরকগণ কখনও বিস্মৃত হন নাই। প্রাচীন ভারতের রুচি, সংস্কার ও আদর্শ হইতে আজ আমরা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি, তথাপি গৃহসজ্জায় তাঁহারা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

এ যাবৎ আমরা নাগরকের নৈমিত্তিক বৃত্ত লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন নিত্যকর্ম্মগুলির বর্ণনা আবশ্যক। নাগরকগণের দৈনন্দিন জীবনপদ্ধতি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের জীবনধারায় একটী বিশিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছিল। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহারা আগে মুখপ্রক্ষালন করিতেন, পরে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিতেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর মনকে প্রফুল্ল ও সতেজ রাখিবার জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার ও বেশবিন্যাস অনুমোদিত ছিল। ধূপ, মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা দেহ অনুলেপন, অলক্তক দ্বারা ওষ্ঠরঞ্জন, তাম্বুলপাত্র গ্রহণ

ও দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তবে অন্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সূর্য্যোদয়ের পরেও শয্যাসীন থাকা দূষণীয়, সুতরাং নাগরকসুলভ বিলম্বে গাত্রোত্থানজনিত দোষস্খালনের জন্য নিয়তকৃত্য করিয়া তবে সাংসারিক অথবা ধর্ম্ম কর্ম্মের উদ্যোগ হইত। ধূপ, অগুরু, স্রক্, শেখরক প্রভৃতি উপকরণের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে সেকালেও পুরুষগণের মধ্যে অঙ্গরাগের ও প্রসাধনের কোনও ত্রুটি ছিল না। এগুলি গেল বাহ্যসংস্কার। শরীররক্ষার জন্য আরও অনেকগুলি কর্ত্তব্য ছিল। প্রত্যহ নিয়মিত অবগাহন, দ্বিতীয় দিনে উৎসাদন অর্থাৎ তৈলাদি-দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, তৃতীয় দিনে ফেনক ব্যবহার করিয়া দেহের কর্কশতা অপনোদন, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে আয়ুষ্য ও প্রত্যায়ুষ্য (ক্ষৌরকর্ম্ম) করা হইত। নিত্যস্নান ওজস্কর ও পবিত্র, গাত্রমর্দ্দন শরীরের দৃঢ়তাবর্দ্ধক, এবং ফেনক ব্যবহার যে পরিষ্কারক, ইহা নাগরকগণ বুঝিতেন। ঘাম দূর করার জন্য কর্পট অথবা রুমাল ব্যবহার করার প্রথা ছিল। তখনকার দিনে ইহা অনাবশ্যক বোধ করা হইত না, কারণ গন্ধিত কর্পট ব্যবহার না করিলে শরীর ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাতে নাগরকের বৈদগ্ধ্যের অভাব সূচিত হয়। এইরূপে শরীরসংস্কার ও মানসিক স্ফূর্ত্তিবিধান সেকালের সরল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ছিল।

পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন, দিনমান ও রাত্রিকে সাধারণতঃ আট ভাগে বিভক্ত করা হইত। পূর্ব্ব তিনভাগে উপরি-উক্ত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান শেষ হইলে নাগরকগণ ত্রিবর্গসাধক ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেন। ইহাতে নাগরক যে বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া স্বীয় ইষ্টচিন্তা বিস্মৃত হন নাই তাহাই প্রমাণ করে। পূর্ব্বাহ্নের চতুর্থ ভাগে সাধারণতঃ ভোজন করা হইত। অপরাহ্নের শেষ ভাগে বলসঞ্চারের জন্য পুনর্ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। পুনর্ভোজন যে চারায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের অভিমত, এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে—

> ‘অজীর্ণে ভোজনং যচ্চ যচ্চ জীর্ণে ন ভুজ্যতে।
> রাত্রৌ ন ভুজ্যতে যচ্চ তেন জীর্য্যন্তি মানবাঃ ॥’

অর্থাৎ অজীর্ণে ভোজন, অথবা ক্ষুধা পাইলে ভোজন না করা, কিংবা রাত্রিতে অকারণ উপবাস করিলে মানব নিজেই জীর্ণ হইয়া যায়।

ভোজনের পর আরও কতকগুলি কার্য্য ছিল। শুকসারিকার প্রলাপন, দিবাশয়ন, (অধর্ম্ম হইলেও গ্রীষ্মকালে শরীর পোষণের জন্য অনুমোদিত), প্রহেলিকা, প্রতিমালা প্রভৃতি কলাক্রীড়া, পীঠমর্দ্দ ও বিদূষকের সহিত আলাপ, এবং তৎপরে বন্ধুবান্ধবসহযোগে গোষ্ঠীবিহার, ইহাই নাগরকগণের

দৈনিক জীবন শেষ করিত। সন্ধ্যাকালে গণিকাগৃহে পুনরায় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইত। নৃত্যগীত শেষ হইলে অনেকেই নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। অতঃপর গৃহসম্মার্জ্জন এবং পুষ্পশয়ন রচনা করিয়া তাঁহারা বাসগৃহ সুরভিত করিতেন। ইহাই নাগরকগণের নৈশবৃত্ত। অবশ্য ইহার পরেও ইচ্ছানুক্রমে দূতীপ্রেরণ, সঙ্কেত স্থানে নায়িকার জন্য প্রতীক্ষা, অভিসারিকার আগমন প্রভৃতি কার্য্য চলিত।

প্রাচীন ভারতে জীবনপর্য্যায়ের যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়, কারণ জীবনের মধ্যে সংযম ও সামঞ্জস্য আনিবার প্রচেষ্টাকে মহৎ বলিতে হইবে। একদিকে যেমন আমোদ ও স্ফূর্ত্তির বিধান ছিল, অপর দিকে তেমনি সুকুমার কলাচর্চ্চার প্রতি অবহেলা ছিল না। ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে গিয়া তাঁহারা কোনও দিন শরীররক্ষণে অমনোযোগী হন নাই, বরং তাহার সংস্কার ও ক্ষয়নিবারণের জন্য তাঁহারা অশেষ যত্ন লইতেন। কি গোষ্ঠী-সম্মেলনে, কি গৃহসজ্জায়, কি নৃত্যগীত উপভোগে, সর্ব্ববিষেয়েই তাঁহাদের একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তাঁহারা শুধু প্রাণধারণেই পরিতৃপ্ত হন্ নাই ; আনন্দের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই জীবধর্ম্ম মানিয়া লইয়াছিলেন। এস্থানে একটী কথার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহাদের জীবনধারা আলোচনা করিলে তাঁহাদের বিষয়াসক্তিই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Dr. Gore ১৯২৯-৩০ সালে প্রদত্ত Gifford Lectures—The Philosoply of the Good Life পুস্তকে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছে। বোধ হয় অন্যান্য ধর্ম্মের উপর খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণ করিবার জন্যই এ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার অভিমতটী নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—" We cannot expect to find from Hinduism any firmly conceived ideal of the good life······" তিনি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কোনও নৈতিক আদর্শের সন্ধান পান নাই, এবং বলেন যে সব 'natural religions'ই নীতিবিগর্হিত। ভারতীয় দর্শন অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোনও স্থানেই তিনি এই উচ্চাদর্শের ও 'Good Life'এর সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন দেখিতে পান নাই। তাই তিনি শেষে বলিয়াছেন, "We must then leave out India in our survey of the good life as being disqualified by a fundamental pessimism or moral indifference." এই সিদ্ধান্তগুলি পড়িয়া অবশ্য চিন্তাকুল হইয়া উঠিবার কোনও আশঙ্কা নাই, কারণ বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনুকূল অথবা প্রতিকূল মতামতগুলির বিশেষ কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভারতবর্ষে জীবনে যে একমাত্র দুঃখবাদ অথবা নৈতিক অবনতিরই প্রসার

হইয়াছিল, তাহা নহে। নাগরকবৃত্ত পড়িলে এইটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে ধর্ম্মাচরণ অতি প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবনকে সুন্দর, বরণীয় ও মঙ্গলময় করিয়া তোলা অসম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে যে কোনও দিন ইন্দ্রিয়বাদ আসিয়া পড়ে নাই, ও পরবর্ত্তী যুগে যে এই নাগরকগণের উচ্চ আদর্শ ম্লান হয় নাই, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপভোগ কখনই ব্যভিচার নামে অভিহিত হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরও যে সার্থকতা আছে, তাহা নাগরকগণ স্বীকার করিতেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী তাঁহারা কোনদিন ছিলেন না। সেই জন্য সূত্রকার একমাত্র যৌবনকে এই ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের সেবার প্রশস্ত সময় বলিয়াছেন, 'কামঞ্চ যৌবনে ইতি স্থাবিরে ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ'। আচার্য্যগণ এ মতের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন, কারণ তাঁহারাও দুই ধর্ম্মের সম্প্রতিপত্তি ও বিপ্রতিপত্তি সূচক যুক্তির অবতারণা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "শতায়ুর্বৈ পুরুষো বিভজ্য কাল মন্যোন্যানুবদ্ধং পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত"।

অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও এই ভোগাসক্তি অথবা বিলাসপ্রিয়তার উদাহরণ মিলিতে পারে। রোমকদিগের মধ্যেও জীবনকে সরল, সুসংযত, ও শোভনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই; সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই তাহা কামুকতা ও যথেচ্ছ-চারিতায় পরিণত হয়। ফরাসীজাতিও ভোগপ্রিয়, কিন্তু তাহাদের বিলাসিতার আতিশয্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয়, একমাত্র গ্রীসের সহিত এবিষয়ে ভারতের উপমা চলিতে পারে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দী হইতে Periclean যুগ পর্য্যন্ত এথেনস্‌বাসীর জীবনে যে নব উদ্যোগ আসিয়াছিল, তাহা কতকটা ভারতীয় প্রচেষ্টারই অনুরূপ। Greek view of "good life" বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে জীবায়ন সেই দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল। আনন্দের মধ্য দিয়া শুধু ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি নয়, জাতীয় শিল্পকলারও চরম বিকাশ হয়। দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, কিংবা কোনও জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারে; কিন্তু শিল্পকলার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সে জাতির সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌষ্ঠবজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। ভারতীয়গণ আধ্যাত্মিক জাতি হইলেও সুন্দর জীবন-যাত্রায় কোনও দিন বিরাগ অথবা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই।

প্রাচীন ভারতে এই নিত্য ক্রীড়া, কৌতুক ও বিহারের আয়োজন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে বাড়িয়া ওঠার সুখ আছে বটে, কিন্তু এরূপ জীবন Pagan জীবনেরই সমতুল।

কথাটী অমূলক নয়, কিন্তু এ দুই জীবনের মধ্যে প্রভেদও রহিয়াছে। Pagan শুধু প্রাণধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট এবং সম্মুখীন সুখভোগেই তৃপ্ত, জীবনে উচ্চাদর্শের প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করে নাই। কিন্তু এই নাগরকজীবনের পিছনে অনেক আত্মসংস্থিতি, শিক্ষা ও সংস্কার গুপ্ত রহিয়াছে। নতুবা তাহার জন্য এত দর্শন ও যুক্তিবাদের অবতারণার আবশ্যকতা ছিল না, এবং বাৎস্যায়ন, চারায়ণ, শুক্র, বাভ্রবীয় প্রভৃতি বিভিন্ন আচার্য্য ও সূত্রকারগণের গ্রন্থপ্রণয়ন এবং মতদ্বৈধও নিতান্ত নিরুদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই নাগরকগণের তিনটী বিশিষ্ট দানের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। যে তিনটী গুণ তাঁহাদের জীবনকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে তিনটী,—সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য ও সুসংযম। এই তিন গুণের মিলন সাধারণ জীবনে অতি বিরল। প্রসাধন ও অঙ্গ-রাগাদির ঘটা থাকিলেও, তাঁহারা আপনাকে কখনও অযথা বিলাসভারে পীড়িত করেন নাই; জীবনে ইন্দ্রিয়ভোগের সুযোগ থাকিলেও, তাঁহারা মাধুর্য্য ও সংযমের অনুরাগী ছিলেন, এবং বেশভূষার প্রচুর আয়োজন থাকিলেও তাঁহারা আড়ম্বরহীন সৌষ্ঠবেরই পক্ষপাতী ছিলেন। সত্য ও সুন্দরের উপাসনা তাঁহারা প্রতিনিয়তই করিতেন, কিন্তু জীবনকে মনোজ্ঞ করিতে গিয়া তাহাকে কখনও নিরর্থক ও অরুচির করিয়া তোলেন নাই। মোট কথা, জীবনকে দেখিবার, ভোগ করিবার ও যথাযথ উপলব্ধি করিবার সেকালের একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল। অবশ্য ইহাকে যদি কেহ Paganism বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমরা বিদেশীয় কবির সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে চাই যে আমরা পুনরায় এইরূপ Pagan হইতে স্বীকৃত আছি; কেননা তাহাতে অন্ততঃ আজকালকার অসুন্দর আবেষ্টন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

অনেকদিনের কথা। শাহজাদা সেলিম সবে জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন আর মেহেরউন্নিসাকে ছিনিয়ে এনে তাঁর জহান আলো করার ফন্দি আঁটছেন। সেই সময়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক কুঁড়ে-ঘরে অশীতিপর এক ফকীর বাস করেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, আর ঘরের বাহির হ'ন না। বহুলোক তাঁর কাছে আসে, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য নয়, গল্প শুনতে। ফকীর রাজা-উজীরের পুরানো গল্প অনেক করেন। সব গল্প যে নিছক সত্য তা বলা যায় না, তবে সত্য-মূলক বটে। আকবর বাদশাহের আমলে অনেক বৎসর ধ'রে প্রতিদিন এই শাহসাহেব রাজধানীর এক প্রশস্ত রাজপথে ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে বসতেন। নীরবে ব'সে থাকতেন। কখনও "এক পয়সা দাও বাবা" ব'লে লোককে বিরক্ত করতেন না। তবু অযাচিত দানে তাঁর ভাণ্ড রোজ ছাপিয়ে উঠত। কেউ কেউ অলস অকর্ম্মণ্য ব'লে গালিও দিত না, এমন নয়। তবে ফকীর গালিগালাজ গায়ে মাখতেন না, ভিক্ষা-লব্ধ ধন নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় আল্লার নাম করতে করতে বাসায় ফিরতেন। সেই রাজপথে অবিরাম জনস্রোত ব'য়ে যেত, রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরাহ, সিপাহী, সৌদাগর সব রকমই। ফকীর সবাইকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, সবাইকে পরিচিত বন্ধু ব'লে মনে ক'রতেন। এক শীতের সন্ধ্যায় খোদ বাদশাহ সেই পথে যেতে যেতে তাঁকে এক কাশ্মীরী শাল বখশীশ করেন। আর একবার মিঞা তানসেন তাঁকে দুই আশরফী দান করবার সময় সুর করে কি এক গজল গেয়ে দিয়েছিলেন। ফৈজী, বীরবল, আবুল ফজল, টোডর মল এঁদের হাত থেকে ত কতবারই ভিক্ষা পেয়েছিলেন। মানসিংহ কাবুল থেকে বিজয়-বাহিনী নিয়ে ফেরবার পথে ফকীরকে পাঁচ আশরফী দিয়ে প্রণাম ক'রে দুয়া চেয়েছিলেন। এই রকম নানা কাহিনী ফকীরের সঞ্চয় ছিল। ডালপালা দিয়ে এই সব পরের কথা বলাই ছিল তার বৃদ্ধ বয়সের পেশা। নিজের কথা বলতেন না, কারণ বলবার মত কিছু ছিল না। লোক-রঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

আমার অবস্থাও কতকটা এই শাহসাহেবের মত। যে যুগে অর্দ্ধশতাব্দীর বেশী কাটিয়েছি সে যুগ আকবরের যুগের মত সমৃদ্ধ না হলেও ভারতের ইতিহাসে এক মহাসন্ধিস্থল। ফকীরের মত, আমিও এই পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে অনেক অযাচিত দান পেয়েছি আর নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছি। সে সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বন্ধুমহলে অনেক গল্পই ক'রে থাকি। তারই দু'দশটা নিয়ে আজ সাহস ক'রে এই বড় আসরে হাজির

হয়েছি। প'ড়ে কারও ভাল লাগলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। একটা ছোট গল্প ব'লে আমার মনের কথাটা আরও পরিষ্কার করে নিই। এক দিন ভোরের বেলায় এক বলদ তার মুনিবের ক্ষেতে লাঙ্গল টানছিল। সেই সময় তার এক স্বজাতি সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে সম্ভাষণ ক'রে বল্লে, "কি ভাই, এত ভোরে করছ কি?" বলদ কিছু বলবার আগেই, তার শিঙ্গে বসেছিল এক মাছি, সে গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, "আমরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছি।" ঐ মাছির মত আমিও ঘটনা-চক্রে শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত হয়েছি, কিন্তু "লাঙ্গল দিচ্ছি" এ কথা মনে করার মত কল্পনা-শক্তি কখনও হয় নি।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি বর্দ্ধমান জেলার লোক। বর্দ্ধমানের নাম না শুনেছেন এমন কি কেউ আছেন? যদি থাকেন তাঁর জন্য নিজের জেলার গুণগান একটু করব। একদিন সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার সুন্দর বহু আয়াসে এইখানে বিদ্যালাভ করেন। লাভ করার আগে কিন্তু মশানে প্রায় নিজের মাথাটা দিয়ে ফেলেছিলেন। সুন্দর যা পারেন নি, সের আফগান সপ্তদশ শতাব্দীতে সেটা করলেন। কাঁচা মাথাটা দিলেন মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। অনেক দিন গেল, আবার একজন এখানে মাথা দিলেন। তিনি হিন্দুবীর শোভাসিংহ। মোগলসৈন্যকে হারিয়ে দিয়ে মেদিনীপুর হ'তে অপ্রতিহত-গতিতে মুরশিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বর্দ্ধমানে মতিচ্ছন্ন ধরল। রাত্রে শিবিরে রাজকুমারীর ছোরার ঘায়ে তাঁর হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন শেষ হ'ল। ইদানীং কৈ আর এরকম ঘটনা বর্দ্ধমানে হওয়ার কথা শুনিনি। সব চুপচাপ।

এই বিখ্যাত জেলার এক প্রান্তে দামোদর পারে অতি ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমার বাড়ী। দু'তিন পুরুষ আগে গ্রামখানা আমাদেরই ছিল; শুনেছি প্রপিতামহ-মহাশয় চাষীদের উপর রাগ ক'রে তাদের জব্দ করবার অভিপ্রায়ে রাতারাতি এক নামজাদা জবরদস্ত জমীদারের কাছে বেচে দেন। সেই থেকে আমরাও নিজ গ্রামে প্রজা হয়ে গেলাম। নিকটস্থ দু একটা গ্রামের এক আধ পাই বখরা থাকার দরুণ একেবারে প্রলেটেরিয়েট শ্রেণী-ভুক্ত হওয়া গেল না। "গাঁয়ের বাবুরা" নামটা রইল। পিতামহ নিরীহ লোক ছিলেন, তবে পুরানো বাড়ীর দেউড়ীর চালায় লুকান শখানেক মরচে-পড়া সড়কীর মাথা একবার ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। এক সময় সেগুলো ব্যবহারে লাগত মনে করলে দোষ হয় না। আমরা শাক্তবংশ বটে কিন্তু সড়কী দিয়ে ত আর পাঁঠাবলি হয় না। বর্দ্ধমান জেলার নামও খারাপ ছিল। শুনতে পাই, যখন খ্যাতনামা কাপ্তেন শ্লিম্যান ঠগী দমন

ক'রে এলেন্ তখন কোম্পানী-বাহাদুর আমাদের জেলার লোককে শান্ত শিষ্ট করবার ভার তাঁকে দেন। তিনি এমন জোরে শান্তিস্থাপন করেছিলেন যে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁর নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। এখনও খায় কিনা জানি না। কারণ আবার যা দিনকাল পড়েছে, গরুর কথা দূরে থাক, ছাগলেও বাঘ-সিংহির জল কেড়ে খাচ্ছে।

আমার মামার বাড়ী রায়না। গ্রামটা এক সময়ে সকলেই জানত, তবে ডাকাতে রায়না এই নামে। বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডাকাইতে জমীদারে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভব্য শিষ্ট আমরা একথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই; কিন্তু কথাটা সত্য। আমার মাতামহকে ছেলেবেলায় দেখেছি। সে কালের গ্রাম্য জমীদারের দোষগুণ সবই তাঁ'তে ছিল, কিন্তু মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখলেই একটা রোমান্টিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসাতে প্রাণ ভ'রে উঠত। তিনি রায়খাদে কি দামোদরের চরে ডাকাতি কখনও করেননি বটে, কিন্তু আশ-পাশের যত পাক, লেঠেল, ঠ্যাঙ্গাড়ে তাঁকে যমের মত ভয় করত। অনেকেই লাঠি খেলায় তাঁর সাকরেদ ছিল আর জানত যে তিনি নিজে লাঠি ধরলে দশজন লোকের মওড়া নিতে পারেন। দাদামশায়ের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবেশী জমীদারদের সঙ্গে দাঙ্গা করা। এই ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমার মনে আছে একদিন বলেছিলেন,"—কোম্পানী জেলায় জেলায় যে রকম কাজী কোটাল বসিয়েছে, আর ভদ্রলোকের বাঁচবার উপায় রাখলে না।" সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। আমাকে এক চমৎকার কুকরী ও আমার দুই ভাইকে এক তলোয়ার ও এক সাঁজোয়া উপহার দিয়েছিলেন। সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ করেননি, তবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে কুকরীটা সব রকম রক্তই খেয়েছে। আমি যে যুগের লোক, তাকে সব রকম খোরাক আর কোথা থেকে দেব, তবে অনেক অভ্যাসের পর ছেলেবেলায় দু চারটে ছাগমুণ্ড কেটেছি। স্বয়ং দেবী যখন আজ ছাগ রক্তে তুষ্ট তখন খড়্গের তুষ্টি হয় নি, মনে করার কারণ নেই। দাদামহাশয়ই বা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তাঁর হাতিয়ারকে নররক্ত কি ক'রে যুগিয়ে ছিলেন তা পাঠক কে বোঝান দরকার। তাঁর রীতি এই ছিল যে প্রতিপক্ষকে খবর না দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতেন না। কারও সঙ্গে মন কষাকষি হ'লে তাকে এই রকম একটা চিঠি দিতেন—কাল ভোর চারটের সময় আমি অমুক গ্রামে আমার কলুপুকুরে মাছ ধরতে যাব, আপনার রুচি হয় ত আমাকে বাধা দিবেন।" কলুপুকুরের মালিকী সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার আছে কি? বিপক্ষ রাত তিনটা হ'তে পুকুর ঘেরাও ক'রে ব'সে থাকতেন, এঁরা চারটের সময় মশাল জ্বেলে লাঠি হাতে

উপস্থিত হ'লে বল পরীক্ষার পর কলুপুকুরে মাছ ধরার হক সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত হ'য়ে যেত। কোম্পানীর আদালত উকীল জেঁকে বসবার আগে এর আর আপীল চলত না। সচরাচর এই রকমের হাঙ্গামায় নায়েব হুকুম দিলেই কাজ হ'ত। বড় জোর দু'চারটে হাত প ভাঙ্গত। কিন্তু ঝগড়ার কারণটা একটু গুরুতর হ'লে লড়াই হ'ত a l'outrance, অর্থাৎ খুনের মার। খুনের মারের বিশেষত্ব এই ছিল যে কর্ত্তা নিজে অভিযানের নেতা হ'য়ে গিয়ে হুকুম না দিলে লাঠি সড়কী উঠত না, হুকুমটা দিয়ে চলে গেলেই নিয়ম পালন হ'ত, কিন্তু আমার দাদামহাশয় "Go on, lads"-এর পরিবর্ত্তে "Come on, lads" বলাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এই রকম কোনও শুভলগ্নে তাঁর কুকরীদেবীর নররক্ত পান ঘটে থাকবে। একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি যে আমার মাতুলকুল বৈষ্ণব। কিন্তু তা'তে কাজ বাধত না। বৌদ্ধ হিন্দু, শাক্ত বৈষ্ণব, আর্য্য অনার্য্যের মহা সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই বাঙ্গলা দেশ।

একবার তাঁর কুকরীঠাকরুণকে এই রকম রক্তপান করনোর পর দাদামহাশয় পালকী চেপে দু-আড়াই ঘণ্টায় আটক্রোশ পথ ভেঙ্গে সদরে গিয়ে ভোর বেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের সঙ্গে "জনাব, মেজাজ শরীফ" ক'রে এলিবি প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর পালকীটার হাতল বড় করা যেত, আর আটজন বাহক একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে সেটাকে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে পারত। সাহেব এতটা জানতেন না। তখন ত আর সি, আই, ডি, ছিল না।

সেকালে গ্রামে বিনা অনুমতিতে পুলিশ ঢুকত না। আমার যে ভাই গ্রামে এখন আমাদের প্রতিনিধি তিনি গৌরব ক'রে বলেন, "বড়-দা, আর ত সব গেছে, কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজও গাঁয়ে পুলিশ ঢুকতে দিই নি।" আজ এটা কথার কথা, কিন্তু এক সময় এই জাঁকের একটা গভীর অর্থ ছিল। এই ভাবের জন্যই বাঙ্গলা বারোভূঁইয়া বাঙ্গলা ছিল, আর বারোভূঁইয়া ভাঙ্গতে সম্রাটদের এত কষ্ট পেতে হয়েছিল। রাজনীতি এসে পড়ছে, আবার গল্পের রাজ্যে আশ্রয় নিই। একটা রীতি সেকালে ছিল যে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কেউ পালকী বা ঘোড়ায় চড়ে যেত না, গেলে গ্রামের বাবুর অসম্মান করা হ'ত। একদিন আমার মাতামহ বৈঠকখানা বাড়ীতে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে আছেন। একটা সামাজিক ব্যাপারের বিচার চলেছে। পাইক জনকয়েক নীচে বসে আছে। এমন সময় দূরে পালকীবেহারার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যাপার কি দেখতে পাইক দু'জন ছুটে গেল। তারা এসে জানালে যে পুলিশের একজন ছোকরা সাহেব পালকী ক'রে যাচ্ছেন।

কর্ত্তা তখন তাঁর এক মুসলমান সরদারকে বললেন, "যা ত একবার, একি মগের মুল্লুক নাকি ?" সরদার একটু পরে ছোকরা সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। দাদামহাশয় সাহেবকে গ্রামের রেওয়াজ কি তা জানালেন। সাহেবের মোটা বুদ্ধি সে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে না চেষ্টা করে জোর ইংরেজীতে কি কি চীৎকার ক'রে বললে। দাদামহাশয় ইংরেজী বুঝতেন না, বেতমিজ, গোস্তাগী ইত্যাদি কয়েকটা ফরাসী শব্দ প্রয়োগ করে হুকুম দিলেন যে সাহেবকে গ্রামের বাহির দিয়ে চলিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। সরদার হুকুম পালন করলে, কিন্তু শোনা যায় যে দু'চার ঘা পাদুকা প্রহারও করেছিল। দু'দিন বাদ ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব দাদামহাশয়কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তিনি হীরালালবাবুকে আশরাফ আদমী ব'লে জানতেন কিন্তু বাবু যখন সাহেবের ইজ্জৎ রাখতে জানেন না তখন তিনিও আর বাবুর ইজ্জৎ রাখবেন না। দাদামহাশয় নিতান্ত ভালমানুষ সেজে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি হয়েছে। যা' শুনলেন তা'তে বুঝলেন যে ছোকরা সাহেব জুতো মারার কথাটা প্রকাশ করেনি। তখন তিনি বললেন, "সাহেব, তোমরা ত কেউ কোনও দিন আমার গ্রামের পথে পালকী চ'ড়ে যাও না। এ সাহেব নাদান, না জেনে গিয়েছিল তাই আমার লোক তাকে গ্রামের বাহিরের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। সেজন্য আমি মাপ চাইছি। তাঁকে ডাকাও, তিনি যদি বলেন যে আমার আর কিছু কসুর হয়েছে তাহলে আমাকে সাজা দিও।" ছোকরা সাহেবটী এলেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলেন না যে জুতো খেয়েছেন। তখন দাদামহাশয় তার কাছে মাফ চেয়ে বললেন, "সাহেব তুমি নূতন হাকীম, এখনও সব বোঝ না, কিন্তু এটা মনে রেখো যে তোমরা আমাদের মান না রাখলে আমরাই বা তোমাদের মান কি ক'রে রাখব ?" বড় সাহেবও এই মর্ম্মে দু'চার কথা বলার পর শান্তি স্থাপন হ'য়ে গেল, দাদামহাশয় রোকশত নিলেন।

গল্পগুলো শুনে হয় ত অনেকে চিন্তাকুল হবেন, ভাববেন যে এই সব আধা ফিউডল্ জমীদারের ঘরে বর্ত্তমান যুগের ভাবপ্রবণ কাব্যশাস্ত্র-বিনোদী তরুণের দল কি ক'রে জন্মাল ? কিন্তু কবিভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। জয়দেব ঠাকুর যে দিন গেয়েছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারং", সেদিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত এই ভাবের ধারা শুকায় নি। লাঠিবাজী ও ললিতকলা মোগল যুগে কি রকম পাশাপাশি চলেছিল তার আভাস ত রবিবাবু বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে দিয়েছেন। আমার দাদামহাশয়ের আমলে বাঙ্গলা দেশে সনেট আসেনি, তখন যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন, হাপাকড়াইয়ের দিন। কাজেই তিনি এ সবেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দিবারাত্র ছড়া কাটতেন, গজল আওড়াতেন, কখনও আবার যাত্রার পালা পর্য্যন্ত বেঁধে

দিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও জমীদারী চাল ছিল। একটা গল্প বলি। গ্রামে এক ভিখারী বৈষ্ণব গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াত। একবার সে কোথা হ'তে এক নূতন গান শিখে এসে মহা ধুম লাগিয়ে দিলে। গানটা ছিল "নদীয়ায় অবতরি ইত্যাদি।" গোসাঁই কিন্তু জোর ক'রে গাইত, "নদীয়ায় রব তরী"। দাদামহাশয় সব বিষয়ে যেমন গ্রামের একচ্ছত্রী রেফারী ছিলেন, সাহিত্যেও তাই। তিনি গোসাঁইকে ডেকে অনেকবার সাবধান ক'রে দিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। সে আবার একদিন বৈঠকখানার সামনে এসে খুব সুর ক'রে "রব তরী" গাইতে লাগল। তখন আমার কবি-দাদামহাশয় হতাশ হ'য়ে জমীদার দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হলেন। হুকুম হ'ল, "বোষ্টম ব্যাটাকে কয়েদ ক'রে রাখ, যতক্ষণ না অবতরি বলতে শেখে।" অনেক ঘণ্টা অবরোধে থেকে বোষ্টম শেষটা বুঝলে যে গোরাচাঁদ নদীয়ায় "অবতরণ" করেছিলেন "রবতরী" করেননি। এসব জমীদারের দল বাঙ্গলা দেশ থেকে আজ অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। হয়ত ভালই হয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রভাব বোধ করি আজও পুরোদস্তুর বলবৎ রয়েছে। নইলে 'অটোক্রাট' বিহনে বাঙ্গলা দেশে কোনও কাজ চলে না কেন?

আর দেশের কথা বলব না। ক্রমশঃ প্যাক্স্ ব্রিটানিকা ও ম্যালেরিয়া দেশে জমী নিয়ে বসল। আমার বাবা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজী শিক্ষা ও চাকরীর পথে বাহির হ'য়ে পড়লেন। আমারও দেশে জন্ম নেওয়া হ'ল না। কোথায় বা দামোদর অজয়, কোথায় বা সেই কাঁকরে ভরা লাল মাটি, কোথায় বা ধানের ক্ষেতের সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। জন্মালেম গিয়ে সুদূর উত্তরে হিমালয়ের কোলে এক স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী-মহাশয়ের ঘরে। স্বাধীন রাজ্য শুনে কেউ হাসবেন না যেন। স্বাধীনতা জিনিসটা আপেক্ষিক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভাণ্ড দুই মধুপানের পর মনিবে গোলামে কোনও তফাৎ থাকে না, দুজনেই সমান স্বাধীন। যাক্, আমার এই জন্মস্থান খেলাঘরের স্বাধীন রাজ্য হলেও ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ আমাদের মহারাজকে দেখলে স্বতঃই মনে হ'ত সেকালের কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কোশলের রাজাদের কথা। ছেলেবেলাকার কল্পনা এঁকে নিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত স্বপ্নই না দেখেছে! মহারাজ সাহেবদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাতেন। এই নিয়ে নূতন রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্দীপ্ত দেশের লোক তাঁর নিন্দাবাদও অনেক করত। কিন্তু তাঁর নিজের জাতীয় গৌরব যে কত বেশী ছিল তা' যে তাঁকে কাছাকাছি দেখেছে সেই জানে। দুই একটা গল্প এখানেই বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, যদিও অনেক পরের কথা।

ইং ১৯০৩ সালে বৃটিশ বাদশাহীর ইজ্জৎ বাড়াবার জন্য লাট কার্জ্জন-সাহেব দিল্লীতে দরবারের বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কার্জ্জন-বাহাত্বরের নিজের গৌরব বৃদ্ধি যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা সে সময়ের সবাই জানেন। বাদশাহের খুড়া-মহাশয় এসেছিলেন বটে, কিন্তু সব বিষয়ে তাঁর হ'ল দ্বিতীয় স্থান। জিনিসটা রাজাদের ভাল লাগেনি কিন্তু তাঁরা বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করলেন। তুই একজন, যথা বড়োদার মহারাজ গায়কোয়াড়, একটু মাথা খাড়া করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মোটের উপর কার্জ্জন-লাটেরই জয় জয়কার হয়েছিল। যখন লাট-সাহেব দিল্লী পৌছেন, আগে থেকেই রাজাদের (অন্ততঃ ছোট খাটো রাজাদের) প্লাটফর্ম্মের উপর সারবন্দি হ'য়ে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অনেক দেরী হওয়াতে কোমল-শরীর রাজবৃন্দ একটু শ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিলেন। এক বেচারা ক্ষুদ্র কাঠিয়াবাড়ী রাজা কাসি পাওয়াতে সারি ছেড়ে যেই পেছনে গেছেন অমনি এক মহাকায় ইংরেজ সেনাপতি লাফিয়ে এসে তার কাঁধ ধ'রে তাঁকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিলে। রাজা-মহাশয়ের কাসিই পেয়েছিল, কাশীপ্রাপ্তির কোনও ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। সেই রাজ-শ্রেণীতে শিখ, মরাঠা, রাজপুত, পাঠান সবাই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভাবে এত অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন, যে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটা তাঁদের নজরেই পড়ল না। তখন আমাদের মহারাজ ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গমনে সারি ছেড়ে তুই একবার টহল দিলেন। দেওয়ার সময় খাপের ভেতর তলোয়ারটা একটু বোধ হয় ঝন্ ঝন্ করে থাকবে, কেননা ব্রিটিশ সেনানী সেবার চুপ ক'রে গেলেন। গল্পটা ভাল হ'লেও সত্য।

এই গান্ধী-যুগের আগে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস ছিল যে সাহেব দেখলেই মেরুদণ্ড অতি সহজে বেঁকে যেত আর একটা অতি অমায়িক হাসি মুখখানাকে বিকৃত করে দিত। যাঁরা খুব বড় লোক, রাজা উজীর মানুষ, তাঁদেরও এ লক্ষণ দেখেছি, আমাদের মত সাধারণ লোকের ত কথাই নেই। আর একটা রোগ প্রবল ছিল, আমাদের খাওয়া পরা, ঘরদোর সম্বন্ধে আমরা সদাই জগতের কাছে বড় লজ্জিত থাকতাম। পরনের ধুতি, খাওয়ার অন্ন ব্যঞ্জন, অর্দ্ধনগ্ন আত্মীয় স্বজন এ সব অতি সঙ্গোপনে সাহেব-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতাম। মহারাজের আর্য্যামি ছিল না বরং ষোলো আনা সাহেবি ছিল কিন্তু যে রোগের কথা উপরে বলেছি তার কবলে তিনি কখনও পড়েননি। বৎসরান্তে যে দরবারী ভোজ হ'ত তা' সম্পূর্ণ বাঙ্গালী রীতিতে। নিজে ত ধুতি পরতেনই, অনেক সময় তাঁর ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও ধুতি পরে আসন-পীঁড়ি হয়ে দিব্য তু'হাতে খেতেন।

একবার ভাদ্র মাসে মহারাজ তাঁর ফুটবল খেলোয়াড়দের কলিকাতায় খেলিয়ে কুচবেহার ফিরছিলেন। সবাই ধুতি পরে চটি পায়ে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হঠাৎ ফ্রেজার লাট-সাহেব এসে উপস্থিত। তিনিও সেই গাড়ীরই যাত্রী। অর্দ্ধ নগ্ন হ'লেও রাজা ত বটে, কাজেই সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড সৌজন্য ক'রে গেলেন। বোধ হয় সেই সৌজন্যের মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন Britannia rules the waves ভাব ছিল, হয়ত বা ছিল না। কিন্তু মহারাজ ঠিক করলেন সাহেবের সঙ্গে একটু বনেদী ধরণের সামাজিকতা করবেন। ট্রেণ ছাড়ার পর বারাকপুরে একজন কর্ম্মচারী (A. D. C.) পাঠিয়ে লাট-বাহাদুরকে খানায় নিমন্ত্রণ হ'ল। লাট নিমন্ত্রণ কবুল করলেন। ট্রেণ রাজপ্রতিনিধি পিঠে ক'রে সদর্পে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে মহারাজের পার্শ্বচরেরা শশব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। স্বয়ং লাট খেতে আসবেন অথচ মহারাজ কাপড় বদলানোর নামও করেন না। শেষে একজন প্রবীণ বয়স্য সাহস ক'রে কথাটা পাড়লেন যে খানার পোষাক পরতে একটু সময় লাগবে আর লাট এলেন ব'লে। মহারাজ হেসে বল্লেন, "লাট ত আর পোষাক খেতে আসছে না। তোর ইচ্ছা হয় এই গরমে জামা-জোড়া আঁটগে যা।" দুচার ষ্টেশন পরে লাট তলোয়ার বাঁধা কাপ্তান সঙ্গে ক'রে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ অতিথিকে আদব কায়দা মত অভ্যর্থনা ক'রে খাবার কামরায় নিয়ে গেলেন ও বল্লেন, "আমাদের আজ লুচী তরকারী খাওয়ার কথা কিন্তু আপনার জন্য ইংরেজি খাদ্যও তৈরি আছে, যেমন আদেশ করবেন তেমনিই খাওয়া হবে।" 'সুপিরিয়রিটি কম্পেল্‌ক্‌সে' একটু ধাক্কা লাগল বোধহয়, কিন্তু সাহেব অমায়িক হাসি হেসে বল্লেন, "আজ আর সুরুয়া রোষ্ট নয়, আসুন আনন্দ ক'রে সবাই লুচী খাওয়া যাক্।" ষোড়শোপচারে লুচী সেবা হ'ল। পানীয় কোন্ দেশের প্রথামত এল সে সম্বন্ধে আমি খোঁজ করিনি।

মহারাজের একটা নিন্দার কথা এখানে না ব'লেও থাকতে পারছি না। তিনি আমাদের বাঙ্গলাদেশের জমীদার প্রভৃতি বড়লোকদের অনেক লোকসান করেছিলেন। এই ভদ্রলোকেরা প্রাণপণে কুচবেহারিয়ানা করতে যেতেন কিন্তু ফল অনেক সময় বড় বিশ্রী হ'ত। একটা উদাহরণ বলি। কুচবেহারের গাড়ীর উপর, চাকরের উর্দ্দির উপর, ও আসবাব পত্রে C. B. এই দুই অক্ষর ও একটা মুকুট আঁকা থাকত। সেই দেখা দেখি চারিদিকে B. B., P. P. ইত্যাদি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল। লোকে জানতে চাইলে না যে বাগনান দুটো B কি ক'রে হয়, পলাশীতেই বা দুটো P কোথা থেকে আসে। তার পর মুকুট, যে রাজার রাজ্য

নেই তার মুকুটই বা কোথায় ? অথচ একটা কিছু তাজের মত অক্ষরের সঙ্গে দেওয়া চাই। আরও গোল হ'ল যাঁরা নামেও রাজা নন তাঁদের। তাঁরা নিজের নামের অক্ষরটা বেঁকিয়ে ত্বুবার লিখে উপরে একটা গোলাকার ফুলের মালা দিয়ে দিলেন। আভিজাত্যের যদি কোনও দেবতা থাকেন ত তিনি এ সব দেখে কি হাসিটাই না হেসেছেন ! ক্রমশঃ বাঙ্গলার জমীদারেরা স্বয়ং বিদেশে গিয়ে মন্ত্রদীক্ষা সংগ্রহ করে আনতে আরম্ভ করলেন। তখন আরও অদ্ভুত জিনিষ সব ঘটতে লাগল। তবে মহারাজকে আর দায়ী করবার কারণ রইল না।

আর পরনিন্দা ক'রে কাজ নেই। একটা গল্প আছে, নৃপেন্দ্র-কর্জ্জন-সংবাদ সেটা পরে যথাস্থানে বলব। এখন অনেকটা পথ পিছিয়ে কুচবেহারে যেতে হবে। আমার ছেলেবেলার দেখা জিনিস ত্বই একটা বলতে চাই। আমি ত একরকম বলেইছি যে আমার জন্ম, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে, রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে। সুধু তাই নয়, প্যারেড ময়দানে যে পেতলের তোপটা ছিল সেটা সাতবার দাগা হয়েছিল। জ্যোতিষী-ঠাকুরের হুকুম ছিল যে তিন বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত মাটিতে পা না পড়ে। তা পড়ে নি, কোলে কোলেই ফিরতাম। অন্নপ্রাশনের দিন হাতী চড়ে মিছিল করে ঠাকুর প্রণাম ক'রে এসেছিলাম। মহারাজ তাঁর অমাত্যকে সত্যি ভালবাসতেন। একটু বড় হ'য়ে নিজের শৈশবের সব কথা শুনতাম। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের রূপকথাও কম শুনিনি। এর ফলে আমার রূপকথার রাজ্যে জীবন কাটানোরই কথা। কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের ভাগ্য-আকাশে এমন এক ধ্রুবতারা উঠল যে গন্তব্য পথ সম্বন্ধে ভাবী ভারত-সন্তানের আর কোনও গোলযোগ রইল না। আমার জন্মের বিশ বৎসরের আগে দেশে যে তুফান উঠেছিল, তার জের রয়েই গেল। জগদীশপুরের কুমারসিংহের অলৌকিক সাহস, গঙ্গামায়ীর তাঁর প্রতি অসাধারণ কৃপা, ইংরেজের মকরাক্ষনীতি, অর্থাৎ গরুর পালের আড়াল থেকে তাঁর উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ, এই সব গল্প-কথা অহোরাত্র বাড়ীর হিন্দুস্থানী সিপাহী-বরকন্দাজদের কাছে শুনতাম। আমাদের বৈঠকখানায় একটা চীনা মাটির পুতুল থাকত, তার মাথায় একটা হাঁড়ির মত ফুলদানি ছিল। আমার গল্প-শিক্ষকেরা ব'লে দিয়েছিল, যে সেটা ঝাঁসীর রাণীর মূর্ত্তি, ঐ রকম হাঁড়ীতে আগুন ভ'রে তাঁর মাথায় চাপিয়ে তাঁকে কোম্পানী প্রাণে মারেন। কখনও বা শুনতাম যে অশ্বত্থামা হনুমান্ প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের কাশী, আযোধ্যা, প্রয়াগে অনেকবার দেখা গেছে, একদিন না একদিন নিশ্চয় হিন্দুর ত্বঃখে তাঁদের মন গলবে। সব কথাই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতাম। শৈশবের

ইতিহাস শেখা এই রকমেই হয়েছিল। কুচবেহারে দু'চার ঘর সাহেব ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল, খুব ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ী খেলাধুলো করতে অনেক যেতাম, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি, কারণ চারিদিকে লোকে কেবলই মনে করিয়ে দিত যে এরা আমাদের রাজার মাইনে-খাওয়া সাহেব, এ রকম সাহেব সাবেক কালেও অনেক ছিল। বাঙ্গলা পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের আগেই "আনন্দ মঠ", "নীল দর্পণ" প'ড়ে চুকিয়েছিলাম, বুঝি বা না বুঝি। আমাদের সচরাচর আবৃত্তির পদ্য ছিল, "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", "কত কাল পরে বল ভারত রে", "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" এই সব। ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ায় কিছুদিন পরেই সুরেনবাবুর জেল হ'ল। আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম। সভা ক'রে বক্তৃতা হ'ল, সব বুঝলাম না, কিন্তু মনে একটা স্থির বিশ্বাস হ'ল যে একটা কিছুর সূত্রপাত হচ্ছে। ইস্কুলে আমাদের ইতিহাসের বই ছিল হণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষ। তার এক জায়গায় এই উল্লেখ ছিল, "His adopted son, Nana Sahib was the infamous leader of the Sepoy Mutiny"। মাষ্টার মহাশয় ক্লাসে এসেই শেষ কয়েকটা কথা কেটে দিয়ে লিখে নিতে বল্লেন, "The illustrious leader of the Great Sepoy war"। শিক্ষা এই ভাবেই চল্‌ল। স্বপ্ন যা দেখতে শিখলাম তাও এই শিক্ষারই অনুগামী।

দেশ হ'তে তখনও পুরানো ব্যায়ামের অভ্যাস যায় নাই। খুব ছেলেবেলাতেই পিতৃ-আদেশে ভোরে আখড়ায় মাটি মাখতে হ'ত। হয়ত কসরতের চেয়ে মাটি মাখা ও ছোলা খাওয়াটারই বহর বেশী ছিল, কিন্তু ছাড়ান ছিল না। সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়াও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যেই ছিল। কখনও কখনও ছুটীর দিনে বাবা আমাদের দু'চারজনকে মফঃস্বলে তাঁবুতে নিয়ে যেতেন। ক'দিন খুব ঘোড়ায় চ'ড়ে নদীতে সাঁতার দিয়ে আনন্দ ক'রে আসতাম। বড় ছেলেরা বন্দুক ছুঁড়তেও পেতেন। যথা সময় সে বিদ্যাও আয়ত্ত হ'ল। তবে শিকারের দৌড় তখন পাখী পর্য্যন্তই ছিল যদিচ বনের পশুরাও অপরিচিত ছিল না। বাঘ প্রায়ই আমাদের গোয়াল থেকে গরু নিতে আসত। ক্যাম্পে গেলে ত কথাই নেই, এক একদিন তাঁবুর আশপাশেই ডাক শুনতে পেতাম। এই সব পাঁচ রকম কারণে wholesome fear-টা (ভয়ডর) শিক্ষার অঙ্গীভূত হ'ল না। পর-জীবনে এর জন্য ভুগতে হ'ল অনেক।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রুষবিপ্লবের ইতিবৃত্ত

১

বল্‌শেভিক্ মতবাদ সম্পূর্ণ নূতন নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল্ মার্ক্স্ যে-তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহাই আধুনিক বল্‌শেভিক্‌দের বেদবাক্য। মার্ক্সের অন্যান্য শিষ্য ও বল্‌শেভিক্‌দিগের মধ্যে প্রভেদ আছে কিন্তু সে-পার্থক্য আদর্শের নহে—কর্ম্মপ্রণালীর মাত্র। বল্‌শেভিক্ নামটি আকস্মিক—রাশিয়ার সোসিয়ালিষ্ট্ ডিমোক্র্যাট্‌দিগের ১৯০৩ সালের লণ্ডন অধিবেশনে লেনিনের সমর্থকগণ সংখ্যায় অধিক থাকায় তাহারা বল্‌শেভিক্ বা সংখ্যাধিকের দল বলিয়া খ্যাত হয়। রুষবিপ্লবের পর, ১৯১৮ সালে, বল্‌শেভিকেরা কমিউনিষ্ট্ বা সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করে। এই নামটি ইহার সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মার্ক্স্ তাঁহার নিজের দলের আখ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মার্ক্সের মতে অতীত ও বর্ত্তমানের সকল সমাজই শ্রেণীবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন শ্রেণীতে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের ঐক্য থাকা অসম্ভব—কোন জাতি বা সমাজের সম্মিলিত স্বার্থের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। কার্য্যতঃ চিরকাল এক শ্রেণী অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে এবং যতদিন সমাজের মধ্যে এইপ্রকার স্তরভেদ থাকিবে ততদিন শ্রেণীসংঘর্ষ ও এক পক্ষ কর্ত্তৃক অন্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব অনিবার্য্য। রাষ্ট্রশক্তি শ্রেণী-বিশেষের আধিপত্যের নিদর্শন—শাসনযন্ত্র প্রভুদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়—দেশপ্রেম বা জাতিভক্তি পদানত জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য স্তোকবাক্য। যে-কোন দেশের শ্রমিকদিগের পক্ষে স্বদেশী ধনিক অপেক্ষা বিদেশী শ্রমিকগণ নিকটতর। সমাজের অধিকাংশ লোকের শ্রমোপার্জ্জিত ধনের উপর ভাগ বসাইয়া এতকাল অভিজাতবর্গ ও ধনিকেরা রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে ধনোৎপাদন-প্রণালীর বিপুল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের সঙ্ঘাত ক্রমশঃ সুস্পষ্ট ও প্রচণ্ড এবং শ্রমিক-আন্দোলন জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়িবে। ফলে শ্রেণী-বিভাগ উঠিয়া গিয়া সমস্ত মানবসমাজ এক বিরাট শ্রমিকসম্প্রদায়ে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মার্ক্সের এই চিন্তাধারা ইউরোপের অধিকাংশ সোসিয়ালিষ্ট্ দল গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিংশ-শতকে মার্ক্সের অন্যতম পুরোহিত জার্ম্মান্ নেতা কার্ল্ কাউট্‌স্কি পর্য্যন্ত বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সমর্থন করিতে পারেন নাই। লেনিন্ যে কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করেন তাহা ইহাদের নিকট নূতন বলিয়া

মনে হয়। অথচ লেনিন্ তাঁহার মতবাদ মার্ক্সেরই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কতকগুলি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বল্‌শেভিক্‌দের নিকট অন্যান্য সোসিয়ালিষ্টেরা মার্ক্স্‌তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও উপহাসের পাত্র। বিপ্লবের পর সোসিয়ালিজ্‌ম ও কমিউনিজ্‌মের মধ্যে পার্থক্য কি, ইংল্যাণ্ড হইতে এই প্রশ্ন আসিলে, উত্তরে বল্‌শেভিকেরা লিখিয়াছিল যে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে ভিন্ন মতগুলি সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ই নহে—তাহার ভাণ মাত্র।

মার্ক্সের আদর্শানুসারে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন সম্ভব নহে ইহাই লেনিনের মতের প্রথম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মতে এই পরিবর্ত্তন সাধারণ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, কারণ মধ্যবিত্ত ধনিকশ্রেণী অর্থবল, ধর্ম্মপ্রচার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে। যাহারা মার্ক্সে বিশ্বাসী তাহাদের কর্ত্তব্য অকস্মাৎ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দেশের শাসনযন্ত্র অধিকার করা। ইহার জন্য দীর্ঘ আয়োজন ও স্থান কাল বিচার, নিশ্চয়ই, আবশ্যক, কিন্তু বিপ্লব ভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য কখনও ঘুচিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবের পরে দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপন করা প্রয়োজন। বিপ্লবের পরমুহূর্ত্তেই শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া যাইবে না—সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ। ভবিষ্যতে শ্রেণীশূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত যে সময়টুকু অতিক্রম করিতে হইবে তাহারই জন্য এই অধিনায়কত্বের ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার, ন্যায়ের বিচার—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সমস্ত আদর্শ বর্ত্তমানে ধনিক-প্রভুত্বের আবরণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভবিষ্যতে নূতন সমাজ গঠিত হইলে পর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সত্যসত্যই সম্ভবপর হইবে।

শাসনভার গ্রহণের পর বল্‌শেভিকদিগকে সময়োপযোগী নানারূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অনেক সমালোচকের চক্ষে সেগুলি মত-পরিবর্ত্তনের চিহ্ন। কিন্তু বস্তুতঃ বল্‌শেভিকেরা তাহাদের মূল আদর্শ ও বিশ্বাস হইতে চ্যুত হয় নাই। লেনিনের মতবাদে শ্রমিকদিগের প্রভুত্ব-স্থাপনের দ্বারাই নূতন যুগের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে।

২

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত আট মাস, সোভিয়েট্ রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম পর্ব্ব। পেট্রোগ্রাড্ ও মস্কো হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবের স্রোত দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। একদিকে

নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রমিকদিগের নূতন অস্ত্র—সোভিয়েট্ সমিতিগুলি—গঠিত হইতেছিল; অন্যদিকে নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কেরেন্‌স্কি, কর্ণিলভ্ ও কালেভিনের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল। বহু শতাব্দীর পুরাতন প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্রকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। এবং শাসনব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য আহূত জাতীয় মহাপরিষদে বল্‌-শেভিকেরা মুষ্টিমেয় বলিয়া যখন সেই সভার কার্য্য সাঙ্গ হইল, তখন রাশিয়াতে অন্যদেশের ন্যায় গণতন্ত্র স্থাপনের আর আশা রহিল না (জানুয়ারী, ১৯১৮)।

মূল আদর্শে নিষ্ঠা ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা উদ্ভাবন,—বল্‌শেভিক্ নীতির এই দুই দিকই এই সময়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

দেশের সমস্ত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইলেও, জমিদারদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের জমি কৃষকদিগকে ভাগ করিয়া লইবার আদেশ দিতে লেনিন্ ইতস্ততঃ করেন নাই। কৃষকদিগের স্বাতন্ত্র্য সোসিয়ালিজ্‌ম্-প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ বাধা, কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরে তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ নিতান্ত আবশ্যক ছিল। সেই একই কারণে কৃষক-বন্ধু এসারদলের চরমপন্থী শাখার সহিত প্রথম কয়েক মাস একত্র কাজ করিতে লেনিনের আপত্তি হয় নাই—যদিও বিপ্লবের পূর্ব্বে অন্য কোন দলের সাহচর্য্য তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল।

রণক্লান্ত জনসাধারণের মনে বল্‌শেভিকেরা যুদ্ধাবসানের আশা আনিয়া দিয়াছিল। সুতরাং অবিলম্বে যুদ্ধ শেষের জন্য তাহারা এক সন্ধিসভা আহ্বান করে। রাশিয়ার মিত্রশক্তিগণ কেহ ইহাতে যোগ দেয় নাই। সেই সুযোগে জার্ম্মাণী রাশিয়ার নিকট এমন কঠোর সন্ধি প্রস্তাব করে যে বল্‌শেভিকেরা প্রথমে তাহাতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু যখন জার্ম্মান-বাহিনী রাশিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল তখন দেশের সেই অবস্থায় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া অসম্ভব জানিয়া লেনিন্ ব্রেষ্ট্-লিটভ্‌স্কের সন্ধি স্বাক্ষরের আদেশ দিলেন (মার্চ্চ, ১৯১৮)। দুইশত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম দিকে রাশিয়া যতখানি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা এই রূপে হস্তচ্যুত হইল বটে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম না হইলে বল্‌শেভিক রাজত্ব কখনও স্থায়ী হইতে পারিত না।

যে-সমস্ত পদানত জাতি রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের স্বাধীনতাপ্রয়াসে বল্‌শেভিকেরা কোন বাধা দেয় নাই। ইহাতে রাজ্যক্ষয় হইলেও এই জাতিসমূহের মধ্যে বল্‌শেভিক্‌দিগের প্রতিপত্তির সূত্রপাত হয়। ফলে অনেকে সোভিয়েট্ রাজত্বে ফিরিয়া আসে এবং রাশিয়ার মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্বের প্রকোপ কমিয়া যায়।

ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌গণ প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রিকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে, সাধারণের এই বিশ্বাস সত্য নহে। বিপ্লবের পর ব্যাঙ্ক, রেল, বিদেশী বাণিজ্য পরিচালনের ভার নূতন শাসন-তন্ত্রের অন্তর্গত হইয়া পড়ে কিন্তু ১৯১৮ সালের জুনের পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীকরণের কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়গুলিকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে নিয়মাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভেসেন্‌হা বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সৃষ্টি হইল (ডিসেম্বর, ১৯১৭)। শুধু স্থানীয় শ্রমিকদের অবাধ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বা প্রভুদিগের পলায়নের ফলে কতকগুলি কারখানা চালাইবার ভার ষ্টেট্‌ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করে। কারখানা-সমিতি গঠন করিয়া পরিচালন-কার্য্যে শ্রমিকদিগকে অংশ দিবার দিকে এই সময় অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। ব্যবসায়গুলির এই অবস্থা ডায়ার্কি বা দ্বৈত-শাসনের অনুরূপ।

নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশের জন্য লেনিনের এই সাবধানতা বুকারিন, র‍্যাডেক্‌ প্রভৃতি নেতাদের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা অপমান-জনক সন্ধিসর্ত্ত গ্রহণ ও রাষ্ট্রীকরণে উপেক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেশের প্রকৃত অবস্থা লেনিন্‌ অধিক বুঝিতেন। তাঁহার সমালোচকদের এই চরমপন্থাকে তিনি, একটি গ্রন্থে, সাম্যবাদীদলের শৈশব-ব্যাধি বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন।

৩

রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯১৮ সালের জুন হইতে ১৯২১-এর অগাষ্ট পর্য্যন্ত তিনটি বৎসর। এই সময়টি বল্‌শেভিক্‌দের অগ্নি-পরীক্ষার যুগ। চারিদিক হইতে বিপদ যেন তখন ঘনাইয়া আসিল,—একদিকে অন্তর্যুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌ আধিপত্য ধ্বংসের প্রচণ্ড উদ্যম ও অন্যদিকে বহির্জগতের সহিত সকল সম্পর্কের অবসান। দেশের ভিতরেও অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল।

কৃষকদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া এসারদলের চরমপন্থিগণ ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সোভিয়েট্‌সমূহ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। তাহার পর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সেনাপতিবৃন্দ নানা দিক হইতে বল্‌শেভিক্‌দিগকে আক্রমণ আরম্ভ করেন। ইঁহাদের অভিযান বল্‌শেভিক্‌বাদের রক্তপতাকার বিরুদ্ধে বলিয়া ইঁহাদের অনুচরদিগকে শ্বেত-সেনাদল নামে অভিহিত করা হইত। উত্তরে সেনাপতি যুভেনিচ্‌ দুইবার পেট্রোগ্রাডের দ্বার

পর্য্যন্ত আসেন। দক্ষিণ হইতে সেনাপতি ডেনিকিন্ ও র‍্যাঙ্গেল্ মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। পূর্ব্বে সমগ্র সাইবেরিয়া কোল্চাকের বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি ইউরাল্ অঞ্চলে উপস্থিত হইলে স্থানীয় সোভিয়েট্, রাজধানী মস্কোর কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, বন্দী সম্রাট্ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে হত্যা করিল (জুলাই, ১৯১৮)। পশ্চিমে রাশিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী উক্রেন্ ও শ্বেত-রাশিয়া প্রদেশদ্বয় স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করে এবং পোল্যাণ্ডের সহিত কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ হয়।

জার্ম্মানীর সহিত বল্শেভিক্দিগের পৃথক সন্ধিতে মিত্রশক্তিবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এই সময় শ্বেত সৈন্যদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। আর্চাঙ্গেল্, ওডেসা, বাকু, ভ্লাডি-ভষ্টক্ প্রভৃতি রাশিয়ার প্রধান বন্দরগুলি ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান ও জাপানী সৈন্যের অধিকারে আসিল। এইভাবে বিদেশের সহিত রাশিয়ার সমস্ত যোগ ছিন্ন হইয়া যায়।

চারিদিকে বেষ্টিত হইলেও বল্শেভিকেরা এই সংগ্রামে জয়লাভ করে। সুবিখ্যাত লোহিত-বাহিনার সৃষ্টি করিয়া ট্রট্স্কি দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বল্শেভিক্দলের অসাধারণ উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা ও নেতাদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বিজয়ের অন্যতম কারণ। জমিদারদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের ভয়ে কৃষকেরাও বল্শেভিক্দের যথেষ্ট সাহায্য করিতে থাকে। গৃহশত্রুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে দমনের জন্য চেকা নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল—এখনও পর্য্যন্ত গেপেয়ু (G.P.U.) নামে ইহার অস্তিত্ব রাশিয়াতে রহিয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তিদিগের সেনাবল ধীরে ধীরে অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যুদ্ধের অবসান হয়। ১৯২১ সালের মধ্যভাগে বল্শেভিক্দের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সঙ্কটের দিনে রাশিয়াতে সামরিক সাম্যতন্ত্রের (War Communism) আবির্ভাব হইয়াছিল। আত্মরক্ষার নিমিত্ত বল্শেভিক্দিগকে দেশের সমুদয় সম্পদ করায়ত্ত করিতে হয়। ১৯১৮ সালের জুন মাসে যখন অন্তর্যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই সকল কারখানায় রাষ্ট্রীকরণের আদেশ প্রচার হইল। তখন হইতে ব্যবসায়গুলি কেন্দ্র হইতে চালাইবার চেষ্টা হয়। একদিকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের স্বাধীনতা লোপ করিয়া—অন্যদিকে সমস্ত ধন রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে গণ্য করিয়া শাসকসম্প্রদায় বণ্টনের সুব্যবস্থা করিলেন। স্থির হয়, কৃষকদিগকে অর্থের বদলে বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে শস্যাদি জোগাইতে হইবে। এই প্রাগ্রসরণ-নীতি অনেক অধীর বল্শেভিকের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করে।

৪

সামরিক সাম্যতন্ত্র যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়াছিল বটে কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ১৯২১ সালে অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। দেশের কেন্দ্র হইতে সমস্ত ব্যবসায় পরিচালনের চেষ্টায় রাষ্ট্রশক্তি সম্যক সফলতা লাভ করে নাই। উৎপন্ন দ্রব্য অনেক কমিয়া গেল। রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্য বল্‌শেভিক্‌দিগকে কৃষকদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। ইচ্ছামত বিক্রয় বন্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক শস্যসংগ্রহে এখন তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। তাহারা শস্যোৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমাইয়া ফেলিয়া নগরগুলিতে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করিল। ফলে ক্রন্‌ষ্টাডের বিশ্বাসী সৈন্যদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বল্‌শেভিক্‌দল লেনিনের নেতৃত্বে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করে। সামরিক সাম্যতন্ত্রের পথ ছাড়িয়া বিপ্লবের প্রথম যুগের নীতিই এখন আবার অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই নব-বিধান রাশিয়াতে নেপ্ (N.E.P.) নামে পরিচিত। কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যাদি ইচ্ছামত বিক্রয় করিবার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল; তাহাদিগের নিকট এখন হইতে অন্যদেশের ন্যায় শুধু রাজকর সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকেরা পুনরায় খাদ্য ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বেতন পাইতে লাগিল। দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য বিদেশী ধনিকদিগকে কারখানা খুলিবার সুবিধা দেওয়া হইল। স্বাধীনভাবে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় চালাইবার পথে বাধাও উঠাইয়া দেওয়া হয়।

ধনিকদিগের প্রতিপত্তি এইরূপে রাশিয়াতে কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিলেও রাষ্ট্রের মুষ্টি একেবারে শিথিল হইয়া যায় নাই। প্রধান ব্যবসায়গুলি এখনও রাষ্ট্রের হাতে রহিল। অন্য অনেক ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব কমিয়া গেলেও স্বাধীন মালিকদিগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভেসেন্‌হার প্রভাবও পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া গেল। সমবায়-পদ্ধতির দ্রুত উন্নতির বিবিধ প্রচেষ্টা দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে সতর্কতার জাল বেষ্টিত ধনিকের বিদ্যমানতা সাম্যবাদীদিগের নিকট নিতান্ত মারাত্মক বলিয়া বোধ হয় নাই।

৫

যুদ্ধজয়ের ফলে দেশে শান্তিস্থাপনের পর যখন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে সদ্ভাব ফিরাইয়া আনিতেছিল

তখন বিদেশী রাজ্যগুলির সহিত রাশিয়ার সম্বন্ধও পুনর্গঠিত হইতে লাগিল।

বিপ্লবের পর রাশিয়ার সঙ্গে অন্যদেশের সম্পর্ক ছিন্ন হইবার অনেক কারণ ঘটে। বিদেশী ধনিকদিগের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ-হিসাবে তাহাদিগকে কিছু অর্থ দেওয়া বল্‌শেভিকেরা প্রয়োজন বোধ করে নাই। সম্রাট্‌দিগের সময়ে রাশিয়া বিদেশ হইতে যে-ঋণ গ্রহণ করে তাহাও শোধ করিতে তাহারা অসম্মত হয়। বল্‌শেভিক্‌-বাদ সর্ব্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে, সেইজন্যও সোভিয়েট্‌ রাশিয়াকে সভ্যসমাজের বাহিরে রাখিবার চেষ্টা চলে। নূতন তন্ত্র স্বল্পায়ু হইবে এই আশাতে মিত্রশক্তিগণ অন্তর্যুদ্ধে শ্বেত-সেনাদলের সাহায্য পর্য্যন্ত করিয়াছিল।

১৯২১-এর পরে ধীরে ধীরে অবস্থা ফিরিল। সোভিয়েটের উচ্ছেদের আশা বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে পড়িল যে রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যে লাভ বই লোকসান নাই। সামরিক উত্তেজনার পরিবর্ত্তে উদারতর মনোভাবের উদয়ের ফলে, রাশিয়া-সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথা প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে লোকের সন্দেহ-উদ্রেক হইতে নাগিল। বহির্জগতের অনেকে নেপ্‌-পদ্ধতিকেও বল্‌শেভিক্‌দের অনুতাপের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইল।

অন্যদিকে বল্‌শেভিকেরাও পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের আশু সম্ভাবনা-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া রাশিয়ার স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিল। রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এই দুই আদর্শের সজ্ঘাত বারম্বার দেখা যায়। সোভিয়েট্‌ নেতারা এই সময় বিদেশের সহিত বাণিজ্য ও বিদেশী মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন।

এসিয়ার রাজ্যসমূহের সহিত প্রথম হইতেই রাশিয়ার সদ্ভাব হইয়াছিল। তুরস্ক ও চীন সোভিয়েট্‌-শক্তির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। নূতন বাল্‌টিক্‌ রাজ্যগুলির সহিত সহজেই বন্ধুভাব আসিয়া গেল কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে পোল্যাণ্ড্‌ ও রুমেনিয়ার সহিত সীমানা লইয়া রাশিয়ার গোলযোগ এখনও মিটে নাই। ১৯২১ সালে ব্রিটেন্‌, ইটালি ও জার্ম্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যের বন্দোবস্ত হইল। পর বৎসর জেনোয়া ও হেগ্‌ নগরীর বৈঠকে রাশিয়ার বিদেশী ঋণ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই সময়েই রাপালোর সন্ধির ফলে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন হইল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্ম্মানী ও সভ্যসমাজে স্থানহীন রাশিয়ার মৈত্রী যেমন স্বাভাবিক তেমনই অন্যদিগের ভয়ের কারণ। ১৯২৪ সালে ব্রিটেন্‌, ইটালি, ও ফ্রান্সের সহিত সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার

পূর্ণ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পর বৎসর জাপান ইহাদের পদানু-সরণ করে। ইংল্যাণ্ডের সহিত ১৯২৭-এ সম্পর্ক একবার ছিন্ন হইলেও তিন বৎসর পরে লেবার দল আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনে। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্য্যন্ত বল্‌শেভিক্‌দিগকে রাশিয়ার শাসকরূপে স্বীকার করে নাই। জেনেভার জাতিসঙ্ঘকে ধনিকদিগের প্রতিষ্ঠান জ্ঞানে সোভিয়েট্‌ রাশিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যবধান ক্রমশঃ ভাঙ্গিবার পথে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের অধীন কয়েকটি সভার কার্য্যে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করে নাই। ১৯২৮ সালে জেনেভার বৈঠকে সোভিয়েট্‌ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ্‌ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আনিয়া সকল দেশকে চমকিত করিয়াছিলেন।

শ্রীসুশোভন সরকার

ভারতের ভাস্কর্য্য

ভারতের কলা-শিল্পের বিচিত্র পুঁথির সকলের চেয়ে বেশী দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য অধ্যায় হ'ল—ভারতের ভাস্কর্য্য বা প্রতিমা-শিল্প। এদেশের পশু, মানব ও দেবতার রূপের অদ্ভুত কল্পনা, আর কোনও দেশের রূপ-কল্পনার সঙ্গে ঠিক মেলে না। ভারতের প্রাচীন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, যাঁরা ভারতের পৌরাণিক কল্পনাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন না, তাঁদের পক্ষে, ভারতের প্রাচীন প্রতিমা-শিল্পের রূপ ও রসের মূল্য বিচার করা বড় কঠিন। এই জন্য পশ্চিমদেশের কলাকুশলীর চক্ষে, ভারতের শিল্প অনেকদিন 'জাতিচ্যুত' হয়েছিল। ভারতের শিল্পকে তাঁরা সভ্য-মানুষের শিল্প বলে অনেকদিন স্বীকার করতে চাননি। গ্রীক শিল্পের উচ্চ প্রাচীরের আড়ালে, 'অ্যাপোলো' আর 'ভিনাসের' ধ্যানেই পশ্চিমের কলাসাধকেরা বহুকাল নিমগ্ন ছিলেন। অন্যদেশের রূপ-শিল্পকে তাঁরা বড় আমলেই আনতেন না। বিধাতার বরে, তাঁদের এখন তৃতীয় চক্ষু খুলেছে, গ্রীক শিল্পের ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করে, তাঁদের অতি-বিস্তৃত দৃষ্টি শিল্পজগতের নানা নূতন রাজ্যের, বিভিন্ন রীতির, বিভিন্ন কল্পনার রূপ-শিল্পের অনুসন্ধান করছে। ক্রমশঃ একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে যে, বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের শিল্পের বিচার একই মাপ-কাটীতে করলে, অবিচার হবে। মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি যত বিচিত্র, তার বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন রীতির আত্মপ্রকাশ ও রূপ-কল্পনাও তত বিচিত্র। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের, রূপ-শিল্পের রহস্য ও সার্থকতা তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। তার মনের চাবিটী খুঁজে না পেলে এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের রত্ন-মন্দিরের দ্বার চিরকালই রুদ্ধ থাকবে। সুতরাং গ্রীক শিল্পের রূপ ও আদর্শের সঙ্গে মেলে না বলে, কোনও নূতন-রীতির শিল্পকল্পনাকে আর অগ্রাহ্য করা চলে না। গ্রীক শিল্পের বেড়াই যখন ভাঙল, তখন বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের গ্রীস-বিরোধী, অথচ নূতন পর্য্যায়ের নানা শিল্পরীতির দাবী, পশ্চিমের কলা-কুশলীরা আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। একজন প্রসিদ্ধ কলাবিৎ ইংরাজ পণ্ডিত স্পষ্টই স্বীকার করে ফেল্লেন "এলগিন্ মারবেল্‌স্-এর আড়ালে লুকিয়ে, পূর্ব্বদেশের শিল্পের দাবী আর আমরা অস্বীকার করতে পারি না।" পশ্চিমের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করে, পূর্ব্বদেশের আদর্শের মাপকাটীতেই বিচার সুরু হ'ল, পূর্ব্বদেশের শিল্পের রস-বস্তুটী কি, তার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির গুণপনা কোথায়? বিচারের ফলে, ভারতের পৌরাণিক যুগের, নানা 'গজানন', 'ষড়ানন', 'অষ্টাভুজা', 'দশভুজা',

'চতুর্ভুর্জ' প্রভৃতি 'উদ্ভট' ও 'অদ্ভুত' মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে রূপ-শিল্পের নূতন সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ, পশ্চিমের কলা-রসিকরা এখন পেয়েছেন। তাঁরা এখন স্বীকার করছেন, ভারতের এই সব অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত কল্পনার মধ্যে, রূপশিল্পের 'নব্যন্যায়ের' একটা নূতন সঙ্গতি, একটা নূতন রূপতত্ত্বের নূতন সামঞ্জস্য, রূপ-সৃষ্টির একটা নূতন কৌশল, একটা নূতন শক্তি আছে। এই নূতন ধারার রূপ-সৃষ্টি, ভারতীয় দৃষ্টি ও আদর্শ দিয়েই বিচার করতে হবে। বিচারে দেখা যায়, ভারত-শিল্পের ভাষার ব্যাকরণ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও অলঙ্কারশাস্ত্র, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অন্যদেশের ভাষা ও ধারার সঙ্গে বড় মেলে না। ভারতের মূর্ত্তি-শিল্পের ভাষা, তার উদ্ভব, অভিব্যক্তি ও পরিণতির ধারা বড় বিচিত্র। যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে অনুসন্ধান না করলে, হঠাৎ এই বিশিষ্ট ধারা আমাদের নজরে পড়ে না। মূর্ত্তি-শিল্পে ভারতের বিশিষ্ট ধারাটী কি তা প্রাচীন ভারতের পশু-চিত্রে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ধারা, এই বৈশিষ্ট্য অন্য দেশের পশুচিত্রের সহিত তুলনা করলে, সহজেই চোখে পড়ে।

প্রথমে, আমরা আলোচনা করব,—গ্রীস দেশের একটী সিংহ চিত্র (১)। সাদা পাথরের পরিপাটী প্রতিমূর্ত্তি। আমাদের চোখে-দেখা পরিচিত সিংহ-মূর্ত্তির সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। বেশ বলিষ্ঠ, নাতি-কৃশ, নাতি-স্থূল, শক্তিশালী মূর্ত্তি;—মাংসপেশীর কোথাও বাহুল্য নাই,—বেশ ঠাস বুনান, কোথাও চোখে লাগে না। পেটের কাছে,—একটী শিরার সূক্ষ্ম-রেখা, নজরেই পড়ে না। এই মূর্ত্তি-কল্পনায়,—সিংহ-চিত্রের আসল model হুবহু নকল করা হয়েছে, কোথাও একটু অত্যুক্তি নেই, স্বাভাবিক আদর্শের রূপ হতে একচুল তফাৎ নেই। এক কথায়, কোথাও কল্পনার কোনও অবসর নেই,—মানুষের চোখ যা দেখেছে তাই লিখেছে। এই চিত্রে, কল্পনা যদি কোথাও সুযোগ পেয়ে থাকে ত ঐ মাথার ও কাঁধের উপর কেশের সমাবেশে। শিল্পী সিংহের কেশ-গুচ্ছ,—যেন একটু মন-গড়া রীতিতে, মনের মতন করে সাজিয়ে নিয়েছেন,—মুখের চারপাশে, ও দাড়ীর নীচে পর্য্যন্ত,—কেশরগুলি,—একই রকমের তিনটী জোড়া জোড়া বাঁকা রেখার থাকে-থাকে সাজান,—গুচ্ছের কল্পনা করে, শিল্পী যেন একটু অলঙ্কার দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অলঙ্কার-রীতি বেশী ফুটতে পায়নি,—সিংহের আসল প্রাকৃত রূপটী, বড় হয়েই প্রকাশ পেয়েছে—এবং এই বাহ্য রূপ-চিত্রের অতি-প্রকাশে,—সিংহের পশু-প্রকৃতির উদ্দাম শক্তি ও তেজের প্রখরতা কতকটা যেন খর্ব্ব হয়ে রয়েছে। বাহিরের রূপটী যেন ভিতরকার রূপটীকে বেশী ফুটতে দেয়নি।

ভারত-শিল্পীর পশু-কল্পনা, ইউরোপের রীতি হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের বিচিত্র "পশু-শালার" নানা উদাহরণ প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও স্থপতি-শিল্পে বিদ্যমান আছে, যথা:—সিংহ, নরসিংহ, গরুড়, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি। এই সব পশু-মূর্ত্তির নূতন রূপ-কল্পনা পৌরাণিক জগৎ ও ভাবধারার অপূর্ব্ব রূপ-সমুদ্র থেকে রস ও উপাদান সংগ্রহ করেছে। ভারতের শিল্প-অভিধানের 'সিংহ', 'শার্দ্দূল', 'কেশরী' আমাদের পশু-শালার চোখে-দেখা প্রকৃত সিংহ নয়;—সিংহের রূপের অন্তর্নিহিত fundamental, elemental গড়নটী এমন একটী নূতন রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেটী আমাদের চোখে-দেখা বাস্তবিক সিংহের সঠিক প্রতিচ্ছবি নয়, কোনও ব্যক্তিগত, জাতিগত সিংহ-বিশেষের প্রতিকৃতিও নয়;—সিংহের অবয়বের মূলগত, প্রকৃতিগত, একটা সাধারণ generalised form,—সিংহত্বের মূলরস ও তত্ত্বের অপরূপ কল্পনা। এ যেন আমাদের অরণ্যের পশুরাজ নয়, এ আমাদের হিতোপদেশের ভাবুক, চৈতন্যময়, নীতি-বিশারদ moral philosopher। বনের পশুকে আমরা হারিয়েছি, তার জায়গায় পেয়েছি শিল্পীর কল্পনার "নর-সিংহ"। ভারত-শিল্পের পশু-শালায় বেশীর ভাগ সিংহের যে রূপটী বিরাজ করে, সেটী এই নর-সিংহের কল্পনার প্রতিচ্ছবি। এই 'নর-সিংহ' বিষ্ণুর অবতার নয়, সিংহের নর-রূপী কল্পনা। আমাদের প্রাচীন মন্দিরের দুপাশে শিল্পীরা যে দুটী সিংহ বসিয়ে দেন, সেগুলি ভারত-শিল্পের Heraldic device, অর্থাৎ রাজশক্তির আলঙ্কারিক সঙ্কেত ও প্রতীক। ভাবটী এই যে, দেশের রাজশক্তি, দেশের ধর্ম্মশক্তির সেবায় নিযুক্ত; মন্দিরের পূজা-পদ্ধতি, ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্যাদি রাজা মন্দিরের দ্বারদেশে বসে সমস্ত শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে রক্ষা করছেন।

সুতরাং ভারত-শিল্পীর কল্পিত সিংহচিত্রের (২) শক্তিরূপী সেবকরূপী সিংহের মুখে, চোখে, নাকে, মানুষের ভাব ও ছায়ার পরিকল্পনা সঙ্গত। সিংহের বক্ষে কুণ্ডলী পাকানো কেশরের কল্পনা, রাজার প্রশস্ত বক্ষে মণি-মাণিক্য ও মুক্তা-হারের ঐশ্বর্য্যের ভাবটী যেন সূচনা করে। মানুষের রূপের ছায়া নিয়ে কল্পিত হলেও, সিংহের বিক্রম ও পশুশক্তির ভাবটী একেবারে বর্জ্জন করা হয়নি। ভারত-শিল্পীর এই কল্পনা-সৃষ্টি বাস্তবিক পশুশালার আসল সিংহ থেকে অনেক দূরে, অথচ প্রকৃতিবাদী সিংহচিত্রের অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনারকের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে উদ্ধত সিংহ-যুগলের চিত্রে, পশুরাজের শৌর্য্য, বিক্রম ও শক্তির যে পরিচয় আমরা পাই—ইউরোপের প্রকৃতিবাদী পশু-শিল্পীর চিত্রে, তা খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভারতের সিংহ-চিত্রের রসটী কেবল যে অতিকায় মূর্ত্তির কল্পনা বলে ফুটে

১। সিংহ, গ্রীস।

২। সিংহ, যব-দ্বীপ।

৩। গজ-সিংহ, ("যালী"), মাতুরা।

৪। সিংহ-মিথুন, কোণারক।

উঠেছে তা নয়,—সমস্ত সিংহজাতির পুঞ্জীভূত শক্তি একত্র করে এই বিরাট সিংহমূর্ত্তী কল্পনা করা হয়েছে, যার তুলনায় আমাদের পশুশালার শ্রেষ্ঠ সিংহও সিংহত্বের হীন ও নিকৃষ্ট নমুনা। প্রকৃতির আদর্শ ও সৃষ্টি অতিক্রম করে নূতন কল্পনার রূপ সৃষ্টি করিবার অধিকার যে শিল্পীর আছে, ভারতের ভাস্কর্য্যের পশু-চিত্রে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

দ্রাবিড় দেশে দক্ষিণী শিল্পী, কল্পনার বলে, দুটি বিভিন্ন জাতীয় পশুর আকার জুড়ে নিয়ে, একত্র করে, এক অপরূপ "যালী" বা 'গজ-সিংহ' (৩) গড়ে তুলেছেন। আকৃতিটী মোটামুটী সিংহের মতন, বেশীর মধ্যে হাতীর লম্বা শুঁড় ও প্রকাণ্ড কান। এই বিস্তৃত কান লতাপাতার অলঙ্কার নিয়ে, কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে। আর সিংহের মূর্ত্তিকে অপরূপ ঐশ্বর্য্য দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে। একই অলঙ্কারের ভাষায়, লাঙ্গুলের ভূষণ-স্বরূপ কেশগুচ্ছটি একই তালে, একই ছন্দে, সিংহের গায়ে বিচিত্র লহর তুলে ফুটে উঠেছে। "যালী" ও সিংহের রূপ, ভারত-শিল্পীর কল্পনায় প্রাকৃত রূপের অনেকটা বিপরীত,—তথাপি এই অপরূপ, অপ্রাকৃত রূপ দুটীকে হাস্যাস্পদ কিম্বা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। শিল্পীর সৃষ্টির কৌশলে, বেশ একটা সম্ভাব্যতার ছাপ এই পশু কল্পনায় আছে। মনে হয় যেন, "যালীর" মতো কোনও পশু ভারতবর্ষে কোন অতিপ্রাচীন যুগে ছিল,—এখন তার বংশ লোপ পেয়েছে। এখন বিচারের বিষয় হচ্ছে—বড় শিল্পী কারা, পশু-রূপের প্রাকৃত নমুনায় যাঁদের দৃষ্টি চিরকাল সীমাবদ্ধ তাঁরা, না যাঁরা পশুরূপের আভ্যন্তরীণ রূপটী আত্মসাৎ করে, পশু-সৃষ্টির নূতন ভাষা রচনা করেছেন তাঁরা ?

স্থানে স্থানে ভারতের শিল্পী, পশুর দেহের প্রাকৃত রূপটী অতিক্রম না করেও মানুষের ভাব ও ভাবনা আরোপ করে যে-এক নূতন রসের সৃষ্টি করেছেন, তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কোনারকের মন্দিরের গায়ে "কেশরী-মিথুন"—সিংহ ও সিংহিনীর আলিঙ্গন ও প্রেম-সম্ভাষণের চিত্র (৪)। পশু-জীবনে যৌন বা মৈথুন-কামনা সাধারণ প্রকৃতি-গত ভাব, সুতরাং সে চিত্রে শিল্পীর কৌশল ও কল্পনার অবসর নেই। পশুর পশুত্ব অতিক্রম করে, শিল্পী প্রীতির প্রেরণা দিয়ে, সাত্ত্বিক প্রেম-রসের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই পবিত্র প্রীতির পূত স্পর্শ দিয়ে, পশুকে মানুষের উচ্চ আসনে টেনে তুলেছেন কোনারকের অমর শিল্পী। সাবলীল গ্রীবাভঙ্গে, নয়নের অভিষিক্ত ভাবে, হস্ত-পদের স্নিগ্ধ ভঙ্গীতে এই সিংহ-মিথুন পশুভাব ভুলে গিয়ে,—নিবিড় প্রেমের আনন্দে এক হয়ে, নূতন রসে মত্ত হয়ে উঠেছে।

এই শ্রেণীর পশু-কল্পনার নানা বিচিত্র সৃষ্টিতে ভারতের শিল্পীরা কি অফুরন্ত অলঙ্কারের ভাষা গড়ে তুলেছেন,—তার অনেক পরিচয় তাঁদের

শিল্প-শাস্ত্রের বিরাট অভিধানে, ও প্রাচীন শিলাচিত্রে পাওয়া যায়। কিন্নর ও গন্ধর্ব্বের রূপ-কল্পনা ঠিক পশু জগতের কি দেবলোকের কোঠায় পড়ে না। কিন্তু এই শ্রেণীর কাল্পনিক রূপ-সৃষ্টিতে ভারতের প্রাচীন শিলা-শিল্পীরা কি অদ্ভুত কৌশল ও মৌলিক রচনা-রীতির পরিচয় রেখে গেছেন! গন্ধর্ব্ব-মিথুনের অপরূপ চিত্রমালা জৈন মন্দিরের ছাদের অতি অন্ধকার কোণে কোণে কি উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বেলে দিয়েছে,—অর্ব্বুদ-গিরির মর্ম্মর-মন্দিরের অনাবিল ঐশ্বর্য্য যাঁরা স্বচক্ষে না দেখেছেন, তাঁদের কাছে বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন। এখানে উদ্ধৃত চিত্রে (৫) তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে। গন্ধর্ব্ব নরনারী একই ভঙ্গীতে হাত তুলে নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়েছে,—প্রত্যেক অবয়বের ভঙ্গীটী পরস্পরের প্রতিধ্বনি তুলেছে,—আর দুটী মূর্ত্তির নাভী-মূল থেকে প্রসারিত হয়েছে দুটী অপূর্ব্ব অলঙ্কারের লতা-পল্লব,—তারই বেষ্টনীর ছটার মধ্যে আনন্দে নাচ্‌ছে এই গন্ধর্ব্ব-মিথুন। এ দুটী প্রাণী যে-কল্পনার অপ্রাকৃত জগতের জীব, এই লতা-পল্লবের সম্ভারও সেই একই জগৎ থেকে এসেছে,—এদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, কোনও অসঙ্গতি নেই। এ লতাও কখনও আমরা চক্ষে দেখিনি, এই নরাকৃতি পক্ষী-মিথুনও কখনও আমাদের নজরে পড়ে নি। শিল্পীর কৌশলে, অসম্ভব-সম্ভাবনার মধুর মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে এই কল্পনার অপরূপ সৃষ্টি। কিন্তু এই মানুষ ও পশু-রূপের যুগ্ম-কল্পনা (composite-figure) কেবল ভারতের শিল্পীর বিশেষত্ব নয়। ঈজিপ্ট ও আসীরিয়াতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এর সূচনা হয়েছে। খৃঃ পূঃ সাত শতকে রচিত, আসীরিয়ার প্রাচীন প্রাসাদে, নরমুণ্ড ও পক্ষ-যুক্ত একাধিক অতিকায় বৃষের শিলা-মূর্ত্তি (৬) পাওয়া গিয়েছে। লণ্ডন ও প্যারিসের চিত্রশালায় তার নিদর্শন আছে। কিন্তু আসীরিয়ার এই যুগ্ম-মূর্ত্তির কল্পনায় পশু ও মনুষ্য-প্রকৃতির কোনও সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা নেই,—বৃষের স্কন্ধে মানুষের মুখ যেন যান্ত্রিক ভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঝাঁকড়া, কোঁকড়ান চুল ও দাড়ীর জের টেনে, অসঙ্গত ভাবটী ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি,—মানুষের স্কন্ধে মানুষের মুণ্ড—মন্দিরের চূড়ার মত—যেমন স্বাভাবিক ভাবে জেগে উঠা উচিত, এক্ষেত্রে বৃষের অবয়বের নানা রেখাবলী মানুষের মুণ্ডে তেমন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। শিল্পী নানা কৌশলে,—পিঠের উপর প্রকাণ্ড পাখার চাদর উড়িয়ে দিয়ে,—বৃষের দেহটী ভুলিয়ে দিয়ে—কোনও রকমে অসঙ্গতি ও হাস্য-রসের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এরই অনুরূপ কল্পনায়, ভারতের শিল্পী "কামধেনুর" (৭) স্কন্ধে কি অদ্ভুত কৌশলে নারী-মুখের সমাবেশ করেছেন,

৫। গন্ধর্ব্ব-মিথুন, তেজপাল মন্দির, অর্ব্বুদগিরি।
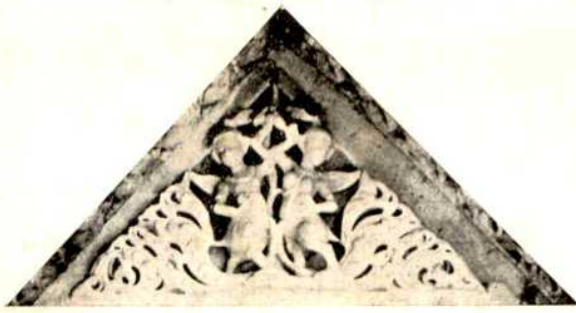
৬। পক্ষ-যুক্ত বৃষ, আসীরিয়া, (বৃটিশ মিউজিয়ম্)।

৮। অসুর নসীর-পাল, আসীরিয়া। ১০। শিশু-নাগ (?), মথুরা।

৯। অন্ধ্র-রাজা ও রাণী, কার্লীগুহা।

মাতুরা মন্দিরের ধাতু-নির্ম্মিত দেবতার বাহনে তার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই। মুখটী স্কন্ধদেশ থেকে যেন আপনা-আপনি সহজ-প্রকৃতি-গত ভঙ্গীতে জেগে রয়েছে—কোথাও অসঙ্গতি নেই—অসামঞ্জস্য নেই। শৃঙ্গ দুটী খর্ব্ব করে—মাঝে একটী পদ্ম জুড়ে দিয়ে—বেশ একটী সুন্দর মুকুট রচনা করে দিয়েছেন, জীবটী যে শৃঙ্গযুক্ত তা আমাদের মনেই হয় না। দুই কানে জুড়ে দিয়েছেন দুটী প্রকাণ্ড কুণ্ডল ও ঝুম্‌কো ফুল। তারই পাশ দিয়ে অনায়াসে সহজ ভঙ্গীতে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ বেণীর লীলায়িত রেখা। পিছনের পুচ্ছটি যেন পুচ্ছই নয়,—সামনের বেণীর সঙ্গে তাল রাখবার জন্য আর একটী অলঙ্কার মাত্র। গাভীর কণ্ঠের নীচে দোলায়মান মাংস-পেশীর রেখা আচ্ছন্ন করে, ঝুলছে থাকে-থাকে হারের বিচিত্র লহর। পশুর অবয়বের প্রত্যেক বিশিষ্ট অঙ্গটী প্রসাধনের প্রাচুর্য্যে ডুবিয়ে দিয়ে, নারী-মূর্ত্তির অলঙ্কৃত মহিমাকে উজ্জ্বল করে চখের সামনে ধরা হয়েছে। এদিকে পেছনের পুচ্ছটী অতিক্রম করে পিঠের ঠিক নীচেই জেগে উঠেছে ময়ূরের পাখা। সমস্ত চিত্রে বেশ একটু নারী-সুলভ কমনীয়তা ও কোমলতার ছায়া কল্পনাটীকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পশু-রূপের নূতন সৃষ্টির কৌশলে, ভারতের ভাস্কর অদ্বিতীয়, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়।

এই ত গেল পশু-সৃষ্টির পালা,—তার পর, মানুষ ও দেব-দেবীর রূপ-সৃষ্টি। ভারতের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে নর-নারীর রূপ-কল্পনা কিছু বিচিত্র। অতি প্রাচীন যুগে, মানুষের মূর্ত্তি-কল্পনায় আসীরিয়ার ভাস্কর্য্যের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। ভারতের অতি প্রাচীন মাটির মূর্ত্তি ও পুত্তলিকার রূপ ও ধারা কিছু স্বতন্ত্র। কিন্তু আদি-যুগের প্রস্তর-মূর্ত্তির সহিত, আসীরিয়ার রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও আদর্শ-মূর্ত্তির সহিত ভারতের ভাস্কর্য্যের কিছু তুলনা করা যেতে পারে।

খৃঃ পূঃ ৮৮৩-৮৫৯ যুগের জগৎ-বিখ্যাত সম্রাট্ দ্বিতীয় অসুর-নসীর-পালের প্রতিমূর্ত্তি (৮) আসীরিয়ার এই শ্রেণীর রূপ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লম্বা কেশ ও শ্মশ্রুময় মুখ, অনাবৃত মস্তক, দীর্ঘ দেহ,—এক হাতে একখানি লম্বা ছুরি, আর এক হাতে রাজ-দণ্ড। হাতের ভাঁজ করা কনুইটী বাদ দিলে, সমগ্র মূর্ত্তিটী যেন দুটী সরল রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ —একটী স্তম্ভের প্রতিকৃতি বলে বোধ হয়। এই ঋজু-রেখা অবলম্বন করে, শিল্পী শক্তিশালী অথচ স্থির ও গম্ভীর রাজ-শক্তির কল্পনা করেছেন। নীচে ছিলেকাটা কাপড়ের আবরণের তলায় পা দুটী যেন দেখাই যাচ্ছে না—এই গতিহীনতার ভাবে, চাঞ্চল্যহীন, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তিটী বেশ ফুটে উঠেছে। আসীরিয়ার মূর্ত্তিটীর সহিত ভারতের এক যক্ষ-

মূর্ত্তির, আকারগত না হোক,—একটা ভাব ও রস-গত সাদৃশ্য আছে। সম-পাদে বিভক্ত, ঋজু রেখায় কল্পিত, স্থির, শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি—"ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধঃ",—বিশাল শক্তির অবতার। কোনও চাঞ্চল্য নেই, কোনও গতির চেষ্টা নেই,—আপনার শক্তিতে যেন আপনি লীন। পরনে ধুতী, কোমরের কাছে কোমর-বন্ধ প্রকাণ্ড ফাঁস দিয়ে বাঁধা। বিশাল বক্ষের উপর হার, তার উপর উপবীতের মত আস্তরণ; উপর হাতে বাজু-বন্ধ। কেউ কেউ বলেন ইনি নন্দ-বংশের রাজা "বর্ত্তনন্দী," কেউ কেউ বলেন এটী যক্ষমূর্ত্তি। রাজাই হোক, আর যক্ষই হোক, মূর্ত্তিটী পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যের কল্পনা, দৈবশক্তির মূর্ত্তি নয়। বিশেষ কোনও উচ্চ-ভাব, কি সুকুমার কল্পনার অবকাশ এই শ্রেণীর মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি,—মথুরার আর একটী যক্ষ-মূর্ত্তি (১০)। কেউ কেউ বলেন এটি শিশুনাগবংশের রাজা কুণিক অজাতশত্রু। বেশ শক্তিশালী অতিকায় প্রতিমূর্ত্তি। একটা বিরাট massiveness, ও অতি-মানবের ভাব মূর্ত্তিটীকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মাধুর্য্য কি কমনীয়তা একবারেই নেই, কিন্তু খুব majesty, শক্তির ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। একটা পুঞ্জীভূত শক্তির আধার, শিল্পী যেন কল্পনা করেছেন এই অতি-বিশাল যক্ষের বিপুল অবয়বে। অনেক পরিশ্রম করতে পারেন, অনেক গুরুভার বহন করতে পারেন, মূর্ত্তিটীতে এইটেই যেন বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কাপড় পরবার ভঙ্গী ও রীতিতে এবং অলঙ্কারের ভঙ্গীতে পূর্ব্বের উল্লিখিত মূর্ত্তিটীর সঙ্গে বেশ মিল আছে। মোটের উপর একটা অতি-প্রাচীনতার ভাব মূর্ত্তিটীতে আছে। সেইজন্য কেউ কেউ মূর্ত্তিটী খৃষ্টের পূর্ব্বে ৬০০ বৎসরের, এইরূপ অনুমান করেন।

এগারো নম্বরের চিত্রটী আসীরিয়ার "ভীমের" মূর্ত্তি,—দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের দেবতা। সিংহকে, যেন এক ছোট বিড়ালের মত, এক হাতে চেপে ধরে রেখেছেন। এখানে শিল্পী শক্তির আভাস দিয়েছেন,—হাতের ও পায়ের মাংস-পেশীর রেখার উপর খুব জোর দিয়ে, emphasis দিয়ে ফুটিয়ে তুলে। এই মাংশ-পেশীর বাহুল্য, exaggeration, প্রায় এই যুগের আসীরিয়ার সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভীমের অতিমানুষিক শক্তির পরিচয় দিতে হ'ল, মূর্ত্তিটীকে আকারে বড় করে, আর সিংহটীকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে চিত্রিত করে। এই রীতি, এই কৌশল, কতকটা স্থূল-রীতির objective method। ভারতের শিল্পীর অনুসৃত পন্থা কিছু স্বতন্ত্র, তাঁদের রীতি হ'ল, subjective, কল্পনাবাদী পন্থা। যবদ্বীপের সিঙ্গাসারীর শৈব-মন্দিরের দ্বারে (১২) দুটী দ্বারপালের মূর্ত্তি

১১। "ভীম", আসীরিয়া।

১২। দ্বার-পালক, যবদ্বীপ।

১৩। আপোলো বেলভেদীয়র, ভাটিকান, রোম।

১৪। চন্দ্র-শেখর শিব, চোল-যুগ, দাক্ষিণাত্য।

আছে, আসীরিয়ার "ভীমের" তুলনায়, আকারে অনেক ছোট,—কিন্তু এই দ্বারপালের মূর্ত্তির অন্তর্নিহিত শক্তি, ঐ আসীরিয়ার "ভীমের" মূর্ত্তিকে অনায়াসে পরাস্ত করেছে। অধিকন্তু, এই দ্বারপালের মূর্ত্তিতে আর একটু নূতন রস ফুটে উঠেছে। আসীরিয়ার মূর্ত্তিটী কতকটা আপনার শক্তি নিয়ে সচেতন ও জাগ্রত, কেমন একটা conscious, গায়ে-পড়া aggressive ভাব; কিন্তু এই ভারতীয় দ্বারপালের মূর্ত্তি একবারেই unconscious—নিজের তেজ ও শক্তি সম্বন্ধে নিজের কোনও চেতনা ও বোধ যেন নেই। আপনার মনে, বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হয়ে, যে মন্দিরের দ্বার রক্ষা করছে, সেই দেবতার ধ্যানেই যেন আত্ম-বিস্মৃত। অথচ গদা ও তরবারী মুঠোর মধ্যে ধরেই সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে—আবশ্যক হলেই, অস্ত্র-ব্যবহারে কোনও বিলম্ব হবে না। এই যে কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেও কর্ম্মহীনতার ভাব,—এই detachment, এটী হ'ল ভারতের ভাস্কর্য্য-কল্পনার একটী প্রধান বিশেষত্ব। গীতার সেই আসক্তিহীন কর্ম্মবাদই যেন অনুসরণ করছে।

অনেকে বলেন, ভারতের শিল্পী, ঐ শক্তি-সামর্থ্যের মূর্ত্তি—ঐ যক্ষ, জরাসন্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, অজাতশত্রুর প্রতিকৃতি—অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পারেন; কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সুন্দর মানব-দেহের মধুর রসটী তা'র চখে পড়েনি। মানুষের দেহের সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকটা, কেবল গ্রীক শিল্পীর দিব্যদৃষ্টিতেই ধরা দিয়েছিল। গ্রীক-সাধনার আগে, কিম্বা পরে, কোনও দেশের শিল্পীই, মানব-দেহের দিব্যশ্রী, সুষমা ও লালিত্যটুকু, এমন সুন্দর করে, এমন মনোহারী করে, পটে কি শিলায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন নি। কথাটা একদিক দিয়ে খুব সত্য। গ্রীক-শিল্পী মানবদেহের যে বহির্মুখী বাহ্য সৌন্দর্য্যের দীপ্তিটী নত-শিরে পূজা করেছেন, সেই বাহ্য, কমনীয়, আপাত-রমণীয় সৌন্দর্য্য, ভারতবর্ষের বিশ্ব-কর্ম্মারা অতি সাবধানে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির আদর্শ ছিল ভিন্ন।

গ্রীসে দেবতার আদর্শ সুগঠিত, সুললিত মনুষ্য-দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রোমের ভাটিকান চিত্রশালার Apollo Belvedere-এর মূর্ত্তি (১৩)। বেশ সুন্দর পরিপাটী বলিষ্ঠ দেহ-কান্তি;—ব্যায়াম-কৃশ সুললিত সুঠাম দেহ-যষ্টি,—বেশ একটু শান্ত অথচ মধুর ভাব, এবং বেশ একটু আকর্ষণী-শক্তি আছে। এ আদর্শ কিন্তু দেবতার কিম্বা অতি-মানবের কল্পনা নয়। গ্রীসের দেবতা একটী সুন্দর সুগঠিত-দেহ মানুষ মাত্র। সোয়াসিউল্‌ গোফিয়্যের নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক পারী-সহরে একটী Apollo-র মূর্ত্তি এনেছিলেন। বহুকাল ধরে

পুরাতাত্বিক পণ্ডিতেরা বাদানুবাদ করেছিলেন যে মূর্ত্তিটী দেবতার মূর্ত্তি, না কোনও পালওয়ানের প্রতিকৃতি। অলিম্পিয়ার ব্যায়ামক্ষেত্রে যাঁরা বাজী জিৎতেন, তাঁদের অনেকের প্রতিমূর্ত্তি গড়ে রাখা হত। দেবতার মূর্ত্তির সহিত, পাল্‌ওয়ানের মূর্ত্তির যে ভ্রম হত, তার কারণই এই যে সুগঠিত ও বলিষ্ঠ দেহ-যুক্ত পালওয়ানের বাহ্য অবয়ব-সৌন্দর্য্যের আদর্শের উপর ভিত্তি করে, গড়া হত গ্রীসের দেবতার প্রতিমা।

মনুষ্য-দেহ অবলম্বন করে, দেব-প্রতিমা ফুঠিয়ে তোলা যতদূর সম্ভব, তা বোধ হয়, এই "এপোলো বেলভেডীয়রের" মূর্ত্তিতে ফুটেছে। ব্যায়াম-শালার পালওয়ান্ বলে ভুল না করলেও ভারতের শিল্পী এঁকে গর্ভগৃহের প্রতিমা বলে বরণ করবেন না। দক্ষিণদেশের সুব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিমা না হলেও, আমাদের একালের বাঙ্গালাদেশের কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তির আদর্শের সহিত ইহার কিছু রস-গত সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিটীর তুটী হাতের সুললিত গতি-ভঙ্গে বেশ একটু চমৎকার balance, ছন্দোবন্ধতা, আর সমস্ত শরীরে একটু সচঞ্চল গতির লীলা, সুষমা ও লালিত্য বড়ই রমণীয়। গ্রীক দেবতা-রূপের এই কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইউরোপের সুধী-সমাজকে আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করে রেখেছে। স্থানে স্থানে তু'দশজন রূপ-সাধক ব্যতীত, কেহই এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যের মোহপাশ এখনও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে যদি "এপোলো বেল-ভেডীয়রের" অনুরূপ কিছু খোঁজা যায়, তবে বোধ হয় দেখা যাবে দক্ষিণে "চন্দ্রশেখর" শিবের (চিত্র ১৪) মঙ্গলময় শোভন কল্পনার মধ্যে তার কিছু কিছু আছে। "এপোলো বেলভেডীয়রের" চাঞ্চল্য এই মূর্ত্তিতে একেবারেই নেই। গ্রীক প্রতিমার Repose, ভারতের সাত্বিক শান্তিরস হতে অনেক দূরে। সুপুষ্ট, সুগঠিত, শ্রমশীল দেহে, যে একটী বাহ্যিক স্বাস্থ্যের সুষমা ফুটে উঠে, সেটী হল গ্রীসের রাজসিক শান্তিরস। ভারতের সাত্বিক শান্তিরস, আহার, বিহার ও চিন্তার সংযমে, ইন্দ্রিয়ের আত্যন্তিক নিরোধে ফুটে উঠে। দেবাদিদেব মহাদেবের যোগী-মূর্ত্তি, ভারতের সাত্বিক শান্তিরসের অভিনব অলৌকিক প্রতিমা। পদ্মপীঠের উপর সমপাদ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তিটী চার হাতের আয়ুধ ও বরাভয় মুদ্রার সুকৌশলে সংস্থাপিত লীলাভঙ্গীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ছন্দোবন্ধ গ্রীক দেবতার balance ও ছন্দ-মাধুরীকে বোধ হয় পরাস্ত করেছে।

কেবল বীর-রসের বাহ্য-সৌন্দর্য্যই যদি খুঁজি,—তা হলে প্রাচীন গ্রীক শিল্পী পলিক্লীতসের রচিত "দিয়তুমিনসের" মূর্ত্তি নিন্দনীয় নয়। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি-কল্পনায়, গ্রীক ব্যায়ামী-যুবক দেবতার ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের ছলনা করিতে আসেননি। এই রূপ-কল্পনায়, ইনি সুস্থদেহ,

১৫। পহ্লব-বীর, মহামল্লপুরম্।

বলিষ্ঠ-কান্তি, সুগঠিত দৈহিক সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল পুরুষ-মূর্ত্তি। পরিপূর্ণ যৌবনের দীপ্তি ও স্বাস্থ্যের সুষমা এই মূর্ত্তিতে যথেষ্ট আছে। তথাপি এই মূর্ত্তিকে গ্রীসের অলৌকিক শিল্প-বুদ্ধির অপরূপ দান বলে, আমরা স্বীকার করতে পারি না। কারণ এই বলিষ্ঠ দেহের বাহ্য-সৌন্দর্য্য ভারতের শিল্পীরাও প্রাচীন মন্দিরের দ্বারে দ্বারে ছড়িয়ে গেছেন। কিন্তু দক্ষিণদেশে পহ্লব-রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ বীর-রসের একটী অলৌকিক মূর্ত্তি (চিত্র ১৫) গ্রীকদেশের ব্যায়াম-কুশলীর সমস্ত সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব পদাঘাতে চূর্ণ করেছে। Grace, Repose, Balance প্রভৃতির যদি কোনও অভিধানিক সার্থকতা থাকে, তাহলে এই শব্দগুলির যথার্থ সংজ্ঞা পহ্লব-মন্দিরের এই ভারতীয় "এপোলো" অনায়াসে আত্মসাৎ করেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে, আশ্বিনের প্রত্যুষে, এই মূর্ত্তিটীর রূপ যখন প্রথম আমার চখের সাম্‌নে হঠাৎ ফুটে উঠেছিল,—এরূপ সুললিত স্বপ্ন পাথরের কঠিন অক্ষরে লেখা যায়, তার পূর্ব্বে আমার ধারণায় ছিল না। প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম কিরণ যখন আমার সম্মুখে এই মূর্ত্তির দেহ স্পর্শ কর্‌লে, তখন আমার যেন মনে হ'ল, এর অবয়বের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম রেখা-সুষমা পাছে ভিন্ন হয়, এই ভয়েই যেন সূর্য্য-দেবতার অরুণ-রশ্মি পহ্লব-বীরের দেহ-যষ্টি অতি সন্তর্পণে চুম্বন করছে।

দেখা যাচ্ছে, গ্রীক ও ভারতের শিল্পের সম্পর্ক, মিলনের সম্পর্ক নয়, বিপরীতের সম্পর্ক। তথাপি, এই মূর্ত্তিতে গ্রীক ও ভারতের শিল্পের একটা বিভিন্ন-স্তরের মিলন-ক্ষেত্র আছে। ভারতের ভাস্কর্য্যের কতকটা সাদৃশ্য বা analogy যদি খুঁজতে হয়, তাহলে যেতে হয় নাইল-নদীর সুবর্ণ-বালু ক্ষেত্রের মন্দিরে ও সমাধি-গুহায়। চার হাজার বৎসরের পূর্ব্বের টলেমী যুগের মিশরদেশের রাজা ও রাণীর একশ্রেণীর আদর্শপ্রবণ যুগল প্রতিমায় (idealised portraits) যে এক অপূর্ব্ব শক্তি, ও বিশালত্বের স্পর্শ আছে তা বাস্তবিকই অভিনব। কালের বুকের উপর যেন অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে,—এই স্পর্দ্ধা ও স্মৃতির কেতন, এই monumental quality কি গ্রীসে, কি ভারতে, সর্ব্বত্রই বিরল। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি যুগলের সুঠাম বর্ত্তুল-রেখার সুললিত গতি-লীলার মধুর ঝঙ্কার ও ঐকতানের স্পর্শে একটা মোহিনী-শক্তি আছে। পক্ষান্তরে, রাজা ও রাণীর কঠিন ঋজু ও আড়ষ্ট ভঙ্গীতে, দেবতা-প্রতিমার অনুকারী একটু দূরত্বের ভাব আছে, যার প্রভাব এই শ্রেণীর মিথুন-মূর্ত্তির অতি-সান্নিধ্যের একটা বাধা রচনা করে। এর অনুরূপ remoteness, এই দূরত্বের ভাবটী, ভারতের বহু দেব-প্রতিমার প্রধান বিশেষত্ব। মিশরদেশের মূর্ত্তির অনুরূপ রস পুণা-সহরের নিকট কার্লীর মহা চৈত্য-মন্দিরের দ্বারদেশে অন্ধ্র রাজা ও

রাণীর মিথুন চিত্রে কতকটা স্থূল ভাবে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহরের নিকট কান্হেরীর গুহা-মন্দিরের বারান্দায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ সদারাপুত্র-দানপতির শৈলচিত্র কার্লী গুহার এই শ্রেণীর প্রতিমূর্ত্তির অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে। কিন্তু এই রীতির উপাসক "রাজ-রাণীর" শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়, সাত শতকের মহামল্লপুরের পহলব রাজাদের শৈব-মন্দিরের প্রকোষ্ঠে। সবগুলিই relief work, অর্দ্ধ চিত্র, (১৬) রাজা আগে চলেছেন,—ভক্তিনম্র ও সলজ্জ ভঙ্গীতে অনুসরণ করেছেন রাণী;—চল্তে চল্তে রাজা ফিরে কথা কইছেন রাণীর সঙ্গে। এই ভঙ্গীটির স্তম্ভিত-গতির সুমধুর ভাবটী শিল্পী বড় কৌশলে, সুন্দর ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ভঙ্গীটির কুশল-চিত্রে শিল্পীর anatomy-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চাতের ভিত্তি-পটে (back ground) মোটা মোটা রেখা টেনে, মূর্ত্তির মসৃণ ও সুগোল অঙ্গলীলার মাধুর্য্য বিপরীত রস দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটীও অনাবশ্যকীয় অলঙ্কার, কি অন্য কোনও খুঁটী-নাটীর বাধা নেই। এই অলঙ্কারহীন সরল ঐশ্বর্য্যে অপরূপ শিলা-চিত্রটী বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

গ্রীক ও ভারতের বিভিন্ন নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিপরীত ও বিভিন্ন কল্পনায় চিত্রিত নানা শিলাপটে প্রকটিত হয়েছে।

বৃটিশ মিউজিয়ম চিত্রশালার বিখ্যাত Townley Venus গ্রীক শিল্পীর অভিনব রূপ কল্পনা (১৭)। দেবী দাঁড়িয়েছেন এক পায়ের উপর ভর দিয়ে, অপর পাটী একটু কুঞ্চিত করে। একটী হাত লীলা-ভঙ্গীতে মাথার নিকট পর্য্যন্ত তুলেছেন, অপর হাতটী কটীতে ন্যস্ত করে প্রসারিত করেছেন। পরিধানের বস্ত্র নাভীর নীচে দিয়ে এসে হাতের উপর অযত্নে স্থাপিত। রূপ-শিল্পীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের অপরূপ কামধেনু। ভারতের দেবী মূর্ত্তির তুলনায়, রূপের রসটী যেন একটু অতিউজ্জ্বল, অতিউগ্র, অতিপ্রখর। তবে ভঙ্গীটী বেশ মনোহর, নয়ন মুগ্ধকর।

(চিত্র ১৮) আর এক অভিনব ভঙ্গীতে, বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করে, নব-বিকশিত বৃক্ষের ফল ও পুষ্প-সম্ভারের উপহার নিয়ে—মোহনী-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে দাঁড়িয়েছেন প্রাচীন ভারতের বৃক্ষের অধিশ্বরী-দেবী,—নব-বসন্ত সমাগমে বৃক্ষের নবযৌবনশ্রী। গ্রীসের "ভিনাস" হতে আকৃতিতে কিছু খর্ব্বা, কিছু পীনাঙ্গী, কালিদাসের কবিতায় অভিনন্দিত, ভারতের অভীপ্সিত নারীর কাম্য-মূর্ত্তি। মথুরার ভাস্কর্য্য-শিল্পে নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে, পূজা পেয়েছেন এই নয়নের তৃপ্তি-দায়িনী রূপের মায়াবিনী—কখনও 'যক্ষিনীর' ভূমিকায়, কখনও 'নায়িকার' বেশে, কখনও 'বৃক্ষদেবীর' রূপে, কখনও গৃহলক্ষ্মীর সলজ্জ, সংযত, স্তিমিত স্নিগ্ধ দীপ্তি নিয়ে।
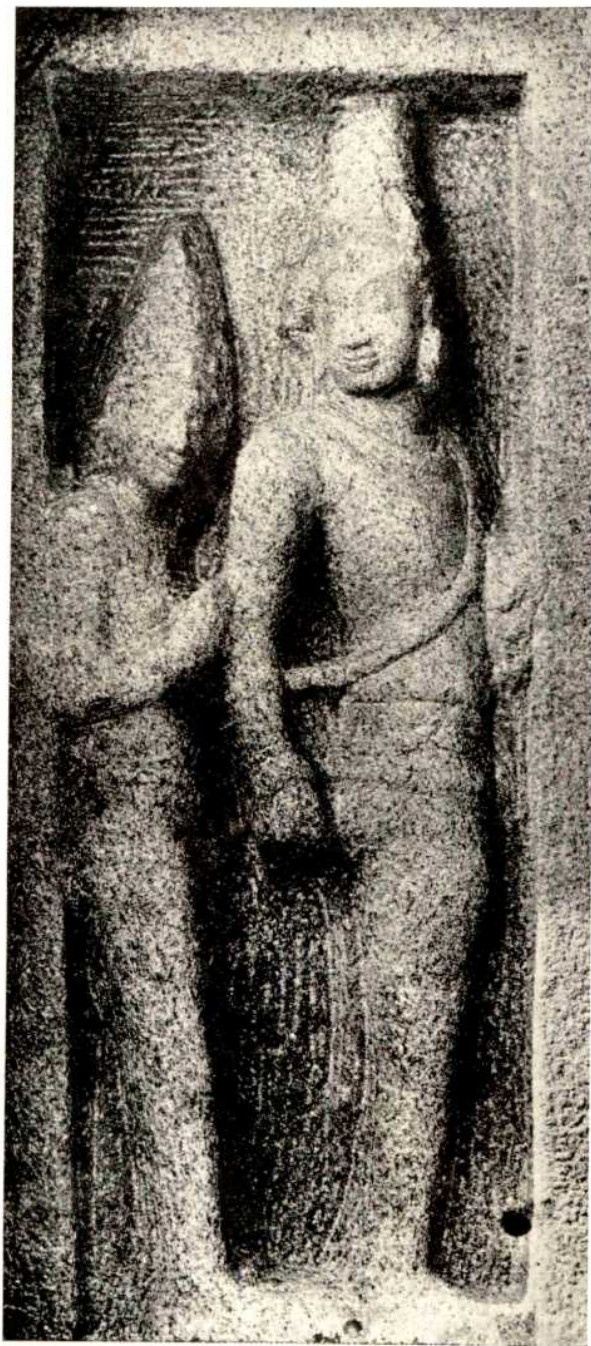
১৬। পহ্লব রাজা ও রাণী, মহামল্লপুরম্।

১৭। টাউন্‌লী ভিনস্‌, বৃটিশ মিউজিয়ম্‌।

১৮। বৃক্ষ-দেবতা (যক্ষিণী ?), সাঞ্চী।

বৃক্ষের তলায় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে, এক হাত বৃক্ষের পল্লবে রেখে আর এক হাতে বৃক্ষের শাখা বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছেন, ভারতের আর এক প্রাচীন বৃক্ষ-দেবতা (চিত্র ১৯)। মথুরার নানা প্রাচীন চৈত্য-মন্দিরের স্তম্ভের উপর, এই শ্রেণীর নানা ভঙ্গীর বৃক্ষ-দেবতা ও যক্ষিনীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে। দেবী-প্রতিমার সংযম ও মাধুর্য্য এই শ্রেণীর মূর্ত্তিতে প্রায় পাওয়া যায় না। একটা লালসা ও কামনার ভাব,—ইন্দ্রিয়-বোধের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যেন প্রায় ফুটে উঠে, এই সব বৃক্ষকা ও যক্ষ-সুন্দরীদের রূপ কল্পনায়।

বাম-পদাঘাতে অশোক-বৃক্ষের ফুল ফুটিয়ে, অভিনব রসের মূর্ত্তি নিয়ে, নূতন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন আর এক সুন্দরী (২০)। রূপ ও অবয়বের কল্পনা প্রায় একই, প্রভেদ কেবল ঐ ভঙ্গীতে। সুন্দরীর পাদ-তাড়নায় অশোক-বৃক্ষ যে মঞ্জরিত হয়ে উঠে, এই কবি-কল্পনা কালিদাসের অনেক কবিতায় উল্লেখ আছে। 'রঘু-বংশে'র "অজ-বিলাপে," রাজা আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ—"তুমি যার দোহদ সম্পন্ন করেছ, সেই আশোক যখন পুষ্পিত হয়ে উঠবে, তখন তোমার অলকাভরণের উপযুক্ত ফুল নিয়ে আমি কি করব ? অশোক তোমার স-শব্দ-নূপুর চরণানুগ্রহ স্মরণ করে নিশ্চয়ই কুসুমাশ্রু বিসর্জ্জন করবে" [রঘু, ৮, ৬২-৩]। ভীত, চকিত, ও সলজ্জ ভঙ্গীতে হাত দুটী যুক্ত করে, দাঁড়িয়ে আছেন আর এক ভামিনী, (২১)। কুণ্ডলী-পাকান কেশের অপর্য্যাপ্ত সম্ভার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কটী-তটের রসনার গুরুভার যেন নুয়ে পড়েছে পাদ-দ্বয়ের সুললিত বক্র-রেখায়। সমস্ত মূর্ত্তিটী একটু সলজ্জ মাধুরী ও সঙ্কোচের ভাবে অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এই মূর্ত্তি-চিত্রের সুকুমার, সুললিত রেখা-ভঙ্গী ও কল্পনার রূপ-রসটী বেশ স্নিগ্ধ সংযমের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। এই মূর্ত্তির ভাব ও আদর্শ মথুরার অসংখ্য যক্ষিনী-চিত্রের উত্তপ্ত রস ও প্রখর দীপ্তি হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভারতের নারী-কল্পনার স্তিমিত মাধুরী হতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, গ্রীসের নারী সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত দীপ-শিখার প্রখর আলোকে দুটী বিভিন্ন আদর্শের নারী-কল্পনার আবার তুলনা করা যাক।

লুভ্‌র্-চিত্রশালার ফ্রেজুস্ আফ্রোডইট্, (২২) প্রণয়ের দেবী-প্রতিমা,—রূপের ঈশ্বরী। এঁর রূপের লাবণ্য ও দীপ্তি ফুটেছে স্থির, গম্ভীর প্রশান্ত, গৌরব-পূর্ণ, সুন্দর দাঁড়াবার ভঙ্গীটিতে। এই গতি-হীন গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিটিকে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যে দীপ্যমান করে তুলেছে। কিন্তু এই দিব্য-ভাবটীর কিঞ্চিৎ বিপরীত রস ফুটেছে দুটী হাতের সঞ্চালনের ভঙ্গীতে। উর্দ্ধমুখী হাতটীর কাপড়-টানার ভাণটীর বিশেষ কোনও তাৎপর্য্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কৃত্রিম-অভিনয়ের ভঙ্গী, হাতটীর সুগঠিত, সুগোল

সৌন্দর্য্য দেখাবারই একটা কল্পিত pose বা ভাণমাত্র মনে হয়। সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে যে বেশ একটু নীরব নিশ্চলতার গম্ভীর রস ফুটে উঠেছে, হাত দুটীর কৃত্রিম চঞ্চলতায়, তার ঠিক সম্মান ও সঙ্গতি রক্ষা হয়নি।

ভারতের এক দেবী-প্রতিমায় অফ্রোডাইটের অবয়ব-সমাবেশের একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে। এক হাতে কটীদেশ, আর এক হাতে উর্দ্ধে লতা-বেষ্টনীর উপরিভাগ স্পর্শ করে, এক পায়ের উপর স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছেন,—মকরের 'পীঠের' উপর আসন করে,—মকরবাহিনী (২৪)। ভঙ্গীর ভাবটী হচ্ছে—স্থির, গতিহীন। কিন্তু এই গতিহীন অচঞ্চল রসটী অনুবাদ করা হয়েছে, নানা বক্র ও চঞ্চল রেখার প্রাচুর্য্যে। কোথাও একটী ও সরল সোজা straight line নেই—সবই বাঁকা রেখা। পা দুটী বাঁকা, হাত দুটী বাঁকা, মকরের দেহটী বেশ গোলগাল বাঁকা রেখায় আঁকা, —আর সমস্ত মূর্ত্তিটীকে ঘেরে চলেছে একটী অলৌকিক লতার বক্র-বেষ্টনী,—শিল্পীর উদ্দাম কল্পনা,—মকরের মুখ থেকে বেরিয়ে কটীলগ্ন হাতের নীচে দিয়ে ঘুরে, মাথার চারিদিকে প্রভা-তোরণের মত ঘিরে রয়েছে। মূর্ত্তিটী দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু এর চিত্রের সমস্ত রেখাগুলি, পরস্পরের ঘাড়ে পড়ে তরঙ্গ তুলে, যেন ছুটে চলেছে। এই গতিহীন চঞ্চলতা,—movement in repose,— ভারতের অনেক দেবী প্রতিমার অবয়ব-কল্পনার অভিনব শিল্প-কৌশল। এই কৌশলটী বোধ হয় মথুরার শিল্পীরা তাঁদের যক্ষিণী ও নায়িকা-চিত্রে প্রথম আবিষ্কার করেন; পরের যুগের অনেক ভাস্কর্য্যে বহুদিন কৌশলটী প্রচলিত ছিল।

ষোলো শতকের বিজয়-নগরের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত "তাড়পত্রীর" মন্দিরের এক মকরবাহিনী (চিত্র ২৫) সেই একই কল্পনার অনুসরণ করেছে। লতা-বেষ্টনী আলিঙ্গন করে, মধুর সচঞ্চল ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মন্দিরের দ্বার-পালিকা। মাথার পিছনে ফুলের মালার উপর দিয়ে সুগোল কুণ্ডলী পাকিয়ে, প্রকাশ পেয়েছে কেশ-পাশের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য। গ্রীসের দেবীদের মত, ভারতের দেবীরা অত জাগ্রত, অত self-conscious নয়। স্তিমিত নেত্রে আপনার মধ্যে আপনি নিমজ্জিত ধ্যানের ভাবটী, সেই জন্য শিল্পী বেশ নিবিড় করে ফুটেয়ে তুলেছেন। যত কিছু ভূষণের ঘটা ও রেখা-মালার চঞ্চলতা ও কোলাহল, circle-এর পরিধির ধারে,—কেন্দ্রস্থলে কিন্তু প্রশান্ত, নিশ্চল নীরবতা। দুটী বিপরীত রসের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি শিল্পী বড় কৌশলেই সু-সম্পন্ন করেছেন।

ফ্লোরেন্সের চিত্রশালার সুবিখ্যাত "মেদিচি ভিনাসের" (২২) অনাবৃত সৌন্দর্য্যের অনেক পূজারী, ইউরোপের নানা সৌন্দর্য্য-বিদ্যা-পীঠে, এই প্রতিমার চরণে প্রতি বৎসর মাথা নত করতে শিক্ষা করেন। সু-সমাবিষ্ট

১৯। যক্ষিণী, সাঞ্চী।

২২। মেদিচি ভিনস্, ফ্লোরেন্স।

২০। অশোক বৃক্ষমূলে তরুণী. মথুরা।

২১। নারীমূর্ত্তি. মথুরা।

২৩। ফ্রেজুস্ আফ্রোডাইট, লুভ্র।

২৪। গঙ্গাদেবী, ভেলুর।

২৫। গঙ্গাদেবী
তাড়পত্রী, বিজয়নগর।

২৬। পরিচারিকা
কুরঙ্গনাথ-মন্দির, চোলযুগ।

২৭। প্রজ্ঞাপারমিতা, যবদ্বীপ, লাইডেন মিউজিয়ম।

দেহের লাবণ্যে ও স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে মূর্ত্তিটী বাস্তবিকই অনবদ্য। কিন্তু হাত দুটীর লাজের ও সঙ্কোচের ভঙ্গীটী, যেন দেবী-কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত-রসের সৃষ্টি করেছে। লাজের বাধা ও সঙ্কোচের ক্ষুদ্রতা সংযুক্ত করে, দেবী-প্রতিমাতে মানুষীভাব আরোপ করা হয়েছে। সদ্য-ত্যক্ত-বসনার বস্ত্রহীনতা, অস্বস্তি ও সঙ্কোচ, লজ্জার বেদনায় ফুটে উঠেছে। দেবীকে মানুষের ক্ষুদ্রতায় ক্ষুণ্ণ করে, ছোট করে কল্পিত ও চিত্রিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ-দেশের চোল-যুগের একটী মন্দিরের পরিচারিকার মূর্ত্তি (চিত্র ২৬),—গ্রীসের ঐ অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্য, Venus-মূর্ত্তির সহিত তুলনা করা যাক। এটী দেবীর মূর্ত্তি নয়,—চামর-বাহিনী পরিচারিকা মাত্র,—কাঁধের উপর চামরটী রেখে, এক হাতে দণ্ডটী ধরে, অপর-হাতটী কটীতটে রেখে, সমপাদ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা। অবশ্য একটী হাত ও একটী পা ভেঙ্গে গিয়ে, মূর্ত্তিটীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়েছে। কিন্তু এই পরিচারিকার মূর্ত্তিতে, বাধাবিহীন সঙ্কোচহীন, অনাবৃত উত্তমাঙ্গের অকৃত্রিম, সরল সৌন্দর্য্যে, যে দিব্য ভাবটী আপনা-আপনি, ফুটেছে,—যে অলৌকিক অধ্যাত্ম-সুষমার ছটা কল্পনাটীকে আলোকিত করে রেখেছে, গ্রীসের মানুষী দেবী-প্রতিমায় তা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিলেও মিলবে না। মন্দিরের দেব-দাসী দেবতার ধ্যানেই আত্মহারা, তাহার উত্তমাঙ্গ আবৃত, কি অনাবৃত, গ্রীসের ভিনাসের মত, অত ভেবে দেখবার অবসর বা প্রবৃত্তি নেই। নারীর প্রতিমা ভারতের শিল্পীর চক্ষে, সাধারণতঃ, মাতৃত্বের গৌরবের চিহ্ন নিয়ে অসঙ্কোচে ফুটে উঠে,—এ কল্পনায় লজ্জা-সঙ্কোচের অবসর নেই। দেবলোকের অমানুষী কল্পনার মানসীরা, ক্ষুদ্র-মানবের ইন্দ্রিয়-বোধের বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, মানুষের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির কলঙ্কের ছায়া দেবলোকের দিব্য জ্যোতিকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আদি বুদ্ধের জননী, প্রজ্ঞাপারমিতার (চিত্র ২৭) অলৌকিক প্রতিমা যে স্বর্গের সুষমা, যে অধ্যাত্ম-জগতের পবিত্র পাবক-শিখার প্রখর আলোকে উজ্জ্বল, তার জ্বলন্তশিখায় মানুষের মনের সমস্ত ক্ষুদ্রভাব চিরকালের মত সমাধি-লাভ করে, নীরব ও নিস্তব্ধ হয়। মাতৃ-মূর্ত্তির মুখের অনাবিল সৌন্দর্য্যে, মধুর ধ্যানীভাবে নিমজ্জিত হয়ে, আমাদের চোখেই পড়ে না যে দেবীর উত্তমাঙ্গ অনাবৃত। শিল্পী ঝোঁক দিয়েছেন, মনোনিবেশ করেছেন কোনওরূপ বাহ্য, দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশে নয়;—দেহকে, বাহ্য-বস্তুকে, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে, ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করে, অতীন্দ্রিয়কে জাগিয়ে তুলেছেন ভারতের চির-অনুস্মৃত, দৈব-কল্পনার অলৌকিক অপ্রাকৃত রূপের,—মানুষের হাতে-গড়া,—অমানুষী সৌন্দর্য্য-

সৃষ্টি ;—ভারতের ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব ভাব-কল্পনা ও অভিনব শিল্প-কীর্ত্তি। সৌন্দর্য্য-জগতের এই সাত্ত্বিকতার অপ্রাকৃত, অভিনব রূপ-কল্পনা, গ্রীসের দৈহিক, রাজসিক ও তামসিক কল্পনার বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে, এই অতীন্দ্রিয়ের উপাসনা,—এই ভোগী জগতের অতীত অধ্যাত্ম রূপের আরাধনা,—এই "সমস্ত বিশ্বের রূপ-ডোবান রূপের" পূজা—আমাদের নবীন-শিল্পীদের লেখনী-মুখে, আবার কবে জেগে উঠবে, ব্যগ্র হয়ে তার প্রতীক্ষা করছেন আমাদের ভারতের প্রাচীন শিল্প-দেবতা।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত

সমগ্র সভ্যজগতে আমাদেরই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চ্চা করিতে চাহিলে তর্কের উদ্ভব হয়। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরাজ রাজত্ব ও ইংরাজী ভাষা। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এমনই ভাবে গঠিত যে জ্ঞানার্জ্জনের সকল দ্বারগুলিই ইংরাজী ভাষার অর্গলে আবদ্ধ। এই অর্গলটি খুলিবার শক্তি সঞ্চিত না হইলে আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি কোন্ বিষয়েরই অন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই না। এমন কি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতাও ইংরাজী ভাষায় কৃতিত্বের মাপকাঠিতে বিচার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। পৌর্ব্বাপর্য্য-বিপর্য্যয়, ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? সুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে, বিদ্যায়তনের বাহিরেও ইংরাজী ভাষার মোহ আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, শিক্ষিত মহলে পত্রালাপ ও অনেকস্থলে কথাবার্ত্তাও রাজভাষাতেই পরিচালিত হইত। বাংলাদেশে এমন সংসার এখনও লোপ পায় নাই যেখানে ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের সহিত ইংরাজীতেই আলাপ করে, ও বাড়ীর কাহারও অ্যাক্‌সেন্ট্ যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ না হইলে তাহার সহিত হিন্দী ব্যবহার করে, পাছে বাংলা বলার হীনতায় লিপ্ত হইতে হয়।

মাতৃভাষার অবহেলা ক্ষোভের কারণ বটে, তবুও এই বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনে বাঙালীমনের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিরূপতা যতই তীব্র হউক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে, সমৃদ্ধতর সাহিত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙালী ইংরাজীকে গ্রহণ করিয়াছিল, ব্যবসায়বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লাভের আশায় নহে, তাহার কাব্য-সাহিত্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া। বাঙালী যেরূপ তন্ময়ভাবে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছে, অন্য কোন জাতি কোন বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে সেরূপ চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় এক সময় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে মাতৃভাষাকেও অবহেলা করিত, কিন্তু কোন রুশ লেখক ফরাসী ভাষায় এমন কিছু লিখিতে পারেন নাই, যাহা ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে। অথচ বাঙালী সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া লর্ড কার্জ্জনের ঈর্ষা হইয়াছে; বাঙালী লেখকের ইংরাজী গদ্য ইংরাজ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে; আর বাঙালী কবি ইংরাজীতে এমন কবিতা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, যাহা ইংরাজী

কাব্যচয়নে সগৌরবে আসন গ্রহণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গদ্য, তাহার নানা বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরাজী সাহিত্যে এমন একটি অভিনব রূপ-সম্পদ দান করিয়াছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে বিংশশতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে বাঙালীর এ-কৃতিত্ব স্বরাজ-অর্জ্জনের অপেক্ষাও মহত্তর—ইহা দিগ্বিজয়।

সুধু ইহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্য আজ বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য। তাহার এ সম্মানের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য। যেদিন ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত আরবী ফারশী ভাষায় সুপণ্ডিত রামমোহন ইংরাজী বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়া লাতিন গ্রীক হিব্রু পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন, সেইদিন হইতে বাঙালীর চিন্তাধারা যে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইয়োরোপের ও বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া বাঙালীর জীবন-বেলায় আঘাত করিয়াছে, তাহার জীবন-বেদকে আলোড়িত করিয়াছে। এই আলোড়নের ফলেই আজ বাংলার সমাজ পরিবর্ত্তনের দুর্দ্দম বেগে টলমল, তাহার রাষ্ট্রনীতি স্বাধীনতার তীব্র কামনায় বিপ্লব-পন্থী, তাহার সাহিত্য সুদূরের উন্মাদনায় বিভোর।

কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে যে-দীপের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য, দ্বিপ্রহরের দিবালোকে তাহাকে জ্বালাইয়া রাখাই মূঢ়তা। বাংলার নির্ব্বাপিত প্রাণপ্রদীপকে দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য ইংরাজী ভাষার দীপশলাকার প্রয়োজন ছিল। আজ যখন জাতীয় জীবন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আজও কি আমাদের জ্ঞানালোকের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, পরভাষার নিকট ভিক্ষা মাগিতে হইবে? জাতীয় সমুত্থানের কোনই সার্থকতা থাকিবেনা যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ বিশ্বসম্পদে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে না পারি। আমাদের সমস্ত জ্ঞান-প্রচেষ্টার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে যেখানে যাহা কিছু জানিবার আছে, বুঝিবার আছে, উপভোগ করিবার আছে, সমস্তই যেন আমরা সুধু বাংলা ভাষার সহায়তায় জানিতে, বুঝিতে, উপভোগ করিতে পারি।

এ-পথের পথিক হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, সমস্ত শিক্ষায়তনে—উচ্চ-মধ্য-নিম্ন-নির্ব্বিশেষে—বাংলা ভাষার যতদূর সম্ভব একান্ত প্রচলন। যাহা কিছু বাংলায় পড়ানো সম্ভব, তাহার জন্য যেন অন্য ভাষারপ্রয়োগ

না হয়। আর প্রয়োজন, বাংলা ভাষার অসম্পূর্ণতার দিকে শিক্ষিতজনের খরদৃষ্টি, ও সম্প্রসারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত সাধনা।

সুদীর্ঘ বিলম্বের পর এতদিনে দেশের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে। আদ্য পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমুদয় পাঠ্য যাহাতে বাংলায় পঠিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায়, নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই উহা বিধিবদ্ধ ও সাধিত হইবে। ইংরাজী ভাষা অবশ্যশিক্ষনীয়ই রহিল, তবে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় সমস্তই বাংলার মারফৎ শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এই যে, সংস্কৃত ভাষা এতদিন আবশ্যিক ছিল, এখন তাহাকে ঐচ্ছিকের কোঠায় ফেলা হইল।

ইহা লইয়া দেশের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের, এমন কি আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না থাকিলে এত কম ছাত্র উহা পড়িতে চাহিবে যে, পণ্ডিতমহাশয়গণের দুরূহ জীবন দুরূহতর হইয়া উঠিবে। এই ধারণা করুণার উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নহে, কাজেই এ-প্রসঙ্গে আর কিছু না বলাই শোভন। তাঁহাদের দ্বিতীয় আর একটি গুরুতর আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত না পড়িলে বাংলা ভাষার ও সাহিতের উন্নতি অসম্ভব। কেননা, বাঙালীর সমাজ, ধর্ম্ম, দর্শন, সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশাসনে পরিচালিত; ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রভাবে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত; তাহার পরিশীলীয় ঐতিহ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অন্তরে সুরক্ষিত।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহারা বাঙালী বলিতে বাঙালী হিন্দুকে বোঝেন, যদিও হয়ত তর্কের খাতিরে স্বীকার করিবেন, সংস্কৃতের মত আরবী বা ফারশীও অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাঙালী, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে বাঙালী হইয়া উঠুক, ইহাই কি সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় নহে? এই মিলনের জন্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা প্রশস্ততর কোন্ ক্ষেত্র আছে? এই মিলনের জন্য বাংলা ভাষাকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলা চাই যে, তাহা যেন সকল বাঙালীরই মনের ভাষা, প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে। তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে, পৃথিবীর যে-কোন ভাষা হইতে যে-কোন-কিছু আহরণ করিতে আমরা যেন লজ্জিত না হই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করা দরকার, বাংলা ভাষার উদ্ভব যেখান হইতে বা যেমন করিয়া হোউক না কেন, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাহার স্বাধীন সত্তাকে মানিয়া লইয়া তবে এই আহরণ-প্রণালী প্রয়োগ করা উচিত। বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত যাহার বিরোধ, তাহাকে আমরা যেমন অকুণ্ঠে

বিসর্জ্জন দিব, যাহার সহিত তাহার মিল, তাহাকে তেমনই অকুণ্ঠে বরণ করিয়া লইব। এই উদ্দেশ্যে, দেশের পরিশীলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক যত ভাষার প্রচার হয় ততই শুভ। কিন্তু কোনটিকেই অবশ্য-পাঠ্য করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখি না—এমন কি যাহার সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ নিগূঢ়তম, সেই সংস্কৃতকেও না। সংস্কৃতপন্থী-দিগকে আমরা সবিনয়ে জানাইতে চাহি, সংস্কৃত অভিধানের যে-কোন পদ, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি সমাস কৃৎ-তদ্ধিতের যে-কোন নিয়ম, প্রয়োজন হইলেই আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার আক্ষরিক রূপ ও তাহার শব্দরূপ ধাতুরূপের বিশাল ভার অবশ্যপাঠ্য করিয়া ছাত্রদের স্কন্ধে চাপাইতে চাহি না। আমাদের মনে হয়, যে-ভাবে পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য বাংলা পড়ানো হইত, সে-ভাবে পড়াইলে, সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না হইলেও শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না। আর যদি ছাত্রেরা সংস্কৃত না-ও পড়ে, তাহা হইলে যে-লোক বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ', তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী', কালিসিংহের 'মহাভারত' ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র বাংলা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহাকে বাংলা অনুবাদের ভিতর দিয়া সংস্কৃত পরিশীলনের সারমর্ম্ম জ্ঞাপন করা নিতান্ত কঠিন হইবে না।

ইংরাজী তাহা হইলে অবশ্যশিক্ষনীয় থাকিবে কেন? যতদিন ইংরাজ এদেশের রাজা, ততদিন এ-তর্কের কোন সার্থকতা নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষার দিক্ হইতে প্রশ্নটীর কোন উত্তর দেওয়া হইল না। আসল কথাটী এই যে, বাঙালীকে ত সুধুই বাঙালী থাকিলে চলিবে না, তাহাকে বিশ্বের অন্য জাতির সহিত মিশিতেই হইবে—ভাবের আদান-প্রদান, পণ্যের আদান-প্রদান করিতেই হইবে। ইংরাজী ভাষা এ-বিষয়ে আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু যে-ভাবে ও যে-ধরণের ইংরাজী আমাদের দেশে সাধারণতঃ শেখানো হয় আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের শেখা দরকার কাজ-চালানো ইংরাজী, অথচ আমরা শিখি—অর্থাৎ শিখিবার হাস্যকর ব্যর্থ চেষ্টা করি—সাহিত্যিক ইংরাজী। সাধারণ বাঙালী সাহিত্যিক ইংরাজীকে লেখায় বা কথায় ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারে না বলিয়া ইংরাজ-মহলে "বাবু-ইংরাজীর" প্রতি কটাক্ষের অন্ত নাই। ইংরাজী সাহিত্যের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি; তবুও বলিব, এই সাহিত্যিক ইংরাজী ছাত্রগণের অবশ্যপাঠ্য না হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানের উন্নতিতে ও বাণিজ্যের তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ আজ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এরূপ

সঙীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভাষা-সমস্যার সমাধান না করিলেই নহে। অনেকদিন হইতেই একটা সার্ব্বজনীন ভাষা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলে চলিতেছে। উদ্ভাবনও হইয়াছে অনেক, কোনটাই কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে ধোপে টিঁকিতেছে না। ভাষাতাত্ত্বিকের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়া তাহারা সংসারে প্রবেশ করিতেছে অকালভূমিষ্ঠ শিশুর মত জীবন্মৃত অবস্থায়। দৈনন্দিন ব্যবহার ভাষার প্রাণ, অথচ এমন একদল লোকও নাই যাহারা স্বভাবতঃ এ-ভাষাগুলি ব্যবহার করে। অনেকগুলি চেষ্টা আবার দু-তিনটী সুপরিচিত ভাষার জগাখিচুড়ী মাত্র—একান্ত নিজস্ব বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। সার্ব্বজনীনভাবে এরূপ ভাষা চলিবার সম্ভাবনা কতটুকু, সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু সম্প্রতি কেম্ব্রিজ্-এর মড্লিন্ কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক সি, কে, অগ্ডেন্ এই কূট সমস্যার এক সুচারু সমাধান করিয়া দিয়াছেন—অন্ততঃ এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। বেব্ল্স্তম্ভের আমল হইতে যে ভাষা-বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কথিত, হয়ত ইঁহার চেষ্টায় তাহার নিরাকরণ হইবে। ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, ইংরাজী ভাষা লোক-সংখ্যায় অন্য সব ভাষাকে বহুদূর পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছে। অধ্যাপক অগ্ডেন্-এর বিশ্বাস, কয়েকটি আভ্যন্তরীণ বাধা দূর করিতে পারিলেই ইহা একেবারে সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে। তাই সমস্ত ইংরাজী ভাষাকে তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইংরাজী ৮৫০টী শব্দ দিয়াই সাধারণতঃ মানুষের ভাষা-ব্যবহারের সমস্ত প্রয়োজন মেটানো যায়; আর যে বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী-অনুযায়ী এই শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহারা একটি পৃষ্ঠার মধ্যেই অনায়াসে স্থান করিয়া লইতে পারে। তাঁহার এই উদ্ভাবনায়—যাহার নাম হইয়াছে Basic English—ইংলণ্ডে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তিনি তাঁহার Debabelisation পুস্তিকায় করিয়াছেন। তাহার মুখবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

Basic English is an attempt to give to everyone a second, or international, language, which will take as little of the learner's time as possible.

It is a system in which everything may be said for all the purposes of everyday existence: the common interests of men and women, general talk, news, trade, and science.

To the eye and ear it will not seem in any way different from normal English, which is now the language of 500,000,000, persons.

There are only 850 words in the complete list, which may be clearly printed on one side of a piece of note-paper. But simple rules are given for making other words with the help of those in

the list; such as **designer, designing** and **designed,** from **design,** or **air-plane** from **air** and **plane.**

The word order is fixed by other short rules, which make it clear from an example such as

" I will put the record on the machine now."

What is the right and natural place for every sort of word?

Whatever is doing the act comes first; then the time word, such as **will** ; then the act or operation **put, take,** or **get** ; then the thing to which something is done, and so on.

It is an English in which 850 words do all the work of 20,000; and has been formed by taking out everything which is not necessary to the sense. **Disembark,** for example, is broken up into **get off a ship. I am able** takes the place of **I can** ; **shape** is covered by the more general word **form;** and **difficult** by the use of **hard.**

By putting together the names of simple operations—such as **get, give, come, go, put, take**—with the words for directions like **in, over, through,** and the rest, two or three thousand complex ideas like **insert** which becomes **put in,** are made part of the learner's store.

Most of these are clear to everyone. It would be hard, for example, to go wrong about the way to put **disembark** or **debarquer,** into Basic English. But in no other language is there an equal chance of making use of this process. That is why Basic is designed to be the international language of the future.

In addition to the Basic words themselves, the learner has, at the start, about fifty words which are now so common in all languages that they may be freely used for any puryose. Examples are **Radio, Hotel, Telephone, Bar, Club.** Records like the one now on your machine will make it clear what the sounds are to be like.

For the needs of any science, a short special list gets the expert to a stage where international words are ready to hand.

Those who have no knowledge of English will be able to make out the sense of **Radio Talk,** or a **business letter,** after a week with the word-list and the records; but it may be a month or two before talking and writing are possible.

An Englishman will make an adjustment to Basic ways of thought in a very short time, but at first he will have to take some trouble to be clear and simple.

In fact, it is the business of all internationally-minded persons to make Basic English part of the system of Education in every country, so that there may be less chance of war, and less learning of languages—which, after all, for most of us, are a very unnecessary waste of time.

বাংলা প্রবন্ধে এই সুদীর্ঘ ইংরাজী সঙ্কলনের কৈফিয়ৎ আবশ্যক। সে কৈফিয়ৎ, বেসিক্ ইংলিশ্-এর আসল চেহারার সহিত বাঙালী পাঠককে পরিচিত করিয়া দেওয়া। কারণ, বলিয়া না দিলে বোঝা দুঃসাধ্য, এই প্রবন্ধের আগাগোড়াই বেসিক্ ইংলিশ্-এ লিখিত। এ-ভাষার বিরুদ্ধে আর যে আপত্তিই থাকুক, ইহাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। ইহাতে

এমন একটি কথাও নাই যাহা সাধারণ ইংরাজে সাধারণতঃ ব্যবহার করে না।

ইংরাজী ভাষা সহজ হইবার পথে আর একটি প্রকাণ্ড বাধা আছে, অধ্যাপক অগ্‌ডেন্‌-এর উদ্ভাবনা যাহার সর্ব্বাঙ্গীন নিষ্পত্তি করিতে পারে নাই—অর্থাৎ ইংরাজীর বানান ও উচ্চারণ-বৈষম্য। প্রত্যেকটি বর্ণ প্রত্যেক স্থলে সমভাবে উচ্চারিত হইবে, ইহাই হইল আদর্শ রীতি। সব ভাষাতেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু ইংরাজীতে বানান ও উচ্চারণে বিভেদ অনেক সময় দিনরাত্রির মত বিপরীত। তাই আর একজন অধ্যাপক—ইনিও ইংরাজীকে সার্ব্বজনীন করিতে অভিলাষী যদিও নিজে সুইডেনবাসী—ইংরাজীর বানানরীতির সংশোধন করিয়া একটি খসড়া তৈরি করিয়াছেন। তাহারও বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। তাই অধ্যাপক জ্যাক্‌রিশন্‌-এর আংগ্লিক্‌ ইংরাজীর (Anglic English) কিছু নমুনা প্রদত্ত হইল।

The prezent orthografy has mor than 500 waez of speling the 40 od soundz that okur in English wurdz in kurent use. Anglic has 65. Spaes is saeved to the extent of wun or tuu lienz on a printed paej. Anglic has aulredy been submited to nuemerus praktikal tests. Leeding eduekaeshonists and reprezentativz of the Pres, who hav been prezent at korsez givn in Stockholm and Uppsala, hav testified that Anglic is a moest efektiv meenz of teeching English to forinerz. After 20 lesnz the puepilz had aquierd a wurking nolij of English, and were aebl to reed not oenly Anglic but aulso eezy spesimenz of English in the egzisting speling.

তবে বেসিক্‌ ইংরাজীর স্বপক্ষে এইটুকু বলিবার আছে, ৮৫০টী কথার বানান ও উচ্চারণ শিখিতে কোন শিক্ষার্থীরই আপত্তি হওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ যখন এ-ভাষার সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত বাক্‌-বিনিময়ের সম্ভাবনা। কাজেই অবশ্যপাঠ্যভাবে ইংরাজী শিখিতে হইলে আমাদের সাহিত্যিক ইংরাজী না শিখিয়া এই বেসিক্‌ ইংরাজী শেখাই উচিত। আর ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগীদিগকেও আমরা সবিনয়ে বলিয়া রাখি, বেসিক্‌ ইংরাজী সাহিত্যিক ইংরাজীর প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক; সাহিত্য-প্রিয় ব্যক্তির নিকট বেসিক্‌ ইংরাজী হইতে সাহিত্যিক ইংরাজীর দূরত্ব মাত্র একটি পদক্ষেপ, এমন কি তদপেক্ষাও ন্যূন।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

অকৃতজ্ঞ

(১)

বিনীতা মুখভার করিয়া বসিয়াছিল ; বিমলা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—রাগ কোরে কি হবে বল্ মা, বিনু। আমাদের কি সাধ যে তোকে এমন কোরে কষ্ট দিই। কিন্তু আর উপায় ত কিছু নেই।

"দিদি, এদিকে এসো, দেখে টেখে নাও জিনিসপত্তর সব। তোমার মেয়েকে আসবে দেখতে, আর খাটুনি খেটে মরব আমি।" হাসিতে হাসিতে একটী যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া, মা ও মেয়ের মুখের ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া গেল। তাহার পিঠে কে যেন চাবুক কসাইয়া দিল। সে দেখিল বিনীতার মুখ রাগের ঝাঁঝে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলা কিন্তু শান্তস্বরেই কহিলেন—বিনু আজ ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, সুজয়। কিছুতেই তৈরি হ'তে চাইছে না। তুই একটু ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্ দেখি। আমি যাই, আবার ওদিকের ব্যবস্থা কোরতে হবে ত। ওরা হয়ত এখুনি এসে পড়বে।

বিমলা চলিয়া গেলেন। বিনীতা মুখভার করিয়াই রহিল। তাহাকে বুঝাইবার কোন চেষ্টা করিতেই সুজয় সাহস পাইল না। সুধু অপলক-দৃষ্টিতে বিনীতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। এই তরুণীর মনের ব্যথাটী তাহার কাছে অতি সুস্পষ্ট। এই যে মাঝে মাঝে সাজিয়া গুজিয়া বলিদানের পশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে একদল তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষের সামনে হাজির হওয়া ; তাহার পর পরীক্ষার নাম করিয়া এক নির্ম্মম অত্যাচার ; লেখাপড়া, গৃহকর্ম্ম, চিত্র, সঙ্গীত ও অঙ্গসৌষ্ঠব, সকল বিষয়েই পরীক্ষকেরা সবজান্তা, কাজেই অন্যায় প্রশ্ন ও অযথা মন্তব্য করিতে একটুও বাধে না ;—এই অগ্নিপরীক্ষার পরেও যদি বার বার প্রত্যাখ্যত হইতে হয়—এমন একটী অপরিশোধনীয় অপরাধে যাহা তাহার স্বকৃতও নহে—তবে কোন্ তরুণী স্বীয় নারীত্বের এই দুঃসহ অপমান নির্ব্বিবাদে বহন করিতে পারে ? আর এই পরীক্ষার পুনরভিনয়ের আতঙ্কে সে যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়, কোন হৃদয়বান যুবক তাহার সমর্থন না করিয়া পারিয়া ওঠে ! সুজয় চুপ করিয়া রহিল, বিনীতাও মুখ তুলিল না। দুজনার সুকঠিন নিস্তব্ধতায় গৃহমধ্যস্থ বায়ু অস্বাভাবিক ভারী হইয়া উঠিয়া তাহাদের নিঃশ্বাস রোধ করিতে লাগিল।

হঠাৎ খট্ খট্ করিয়া অচেনা ধরণে দরজার কড়া বাজিয়া উঠিল। সুজয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া অর্দ্ধজড়িতস্বরে বলিল—"ঐ বুঝি তাঁরা এসে পড়লেন।" তারপর স্পষ্ট করিয়াই বলিল—"আর দেরী করিস্নে, বিনু, উঠে পড়্ লক্ষীটি, ঠিক হয়ে নে, শীগ্গির।"

বিনু তাহার কালো চোখজোড়া মুহূর্ত্তকাল সুজয়ের মুখের পরে স্থাপিত করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আলনা হইতে কাপড় ব্লাউজ নামাইয়া লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

*   *   *

অতিথিদের বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিতেই বিমলা জিজ্ঞাসিলেন—কি বল্লে ওরা?

সুজয় খুব গম্ভীর হইয়াই উত্তর দিল—যা বলে।

বিমলার মুখ আঁধার হইয়া গেল। এমন সময় বিনীতা বলিয়া উঠিল—আজ তুমি আমাকে কি বিপদেই ফেলেছিলে যাহোক। তোমার ওপর যা রাগ হচ্ছে আমার—

সুজয় বলিল—কেন? অপরাধ?

—ফ্রেঞ্চ পড়ি সে কথা তোলার কি দরকার ছিল?

—মিথ্যে বলেছি কি?

—কিন্তু ঠিক সত্যি কথাও বলনি। ডিক্‌স্‌নারী দেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দুচার লাইন পড়তে পারলেই বুঝি একটা ভাষা জানা হয়? যদি ওরা avoir কি etre-এর conjugation জিজ্ঞাসা কোরত?

—কোরে নিত? আর ওই রকম করেছিলাম বলেইত তোর কপাল খুলে গেল আজ। আর তোকে কষ্ট কোরে পড়ে একজামিন দিতে হবে না। ওরাই তোকে পাশ করিয়ে একেবারে ডিগ্রী দিয়ে দেবে।

বিমলা বিরক্তভাবে বলিলেন—তুই দিনকার দিন ভারি বদ্ হয়ে উঠ্‌ছিস্, সুজয়। এ কি-রকমের ঠাট্টা। সত্যি কথায় যখন ঠাট্টা করিস্, রাগ করি না, কিন্তু—

—তাহলে দিদি তোমার এখনও রাগ করা অন্যায়। আমি যা ঠাট্টা করছি, তা সব সত্যি। ওরা মেয়ে পছন্দ করেছে। কাল কি পরশু এসে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সব কথা পাকা কোরে যাবে।

কথাটা বিমলার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত; অথচ সুজয় এখন যেভাবে কথাটী কহিল তাহাতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাই স্তম্ভিত বিমলা কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলেন—ছেলের ত নিজেরই দেখ্‌তে আসার কথা ছিল, না?

—হ্যাঁ, বাঁ কোণের চেয়ারে যে বসেছিল, সে-ই ত তোমার জামাই, অর্থাৎ হবু-জামাই। দেখছিলে না নিজেই কি রকম প্রশ্ন করছিল।

—আমার এই কালো মেয়ে তবুও—

—তা হলে কি হবে! বাহিরে গিয়ে আমায় বলছিল—বিনুর আঁকা ছবিগুলো তার খুব ভালো লেগেছে। বিয়েটা তাহলে আমারই গুণে হচ্ছে বল্‌তে হবে।

—কি যে বকিস্ তার ঠিক নেই! হয়ত এত কিছু চেয়ে বসবে, আমাদের সামর্থ্যে কুলোবে না।

বিমলা সত্যই সে আশঙ্কা করিতে পারিতেন। সচরাচর ভাল পাত্র বলিতে যে গুণগুলি বুঝায় তাহার সবগুলিই অপ্রকাশের ছিল।

—কিন্তু ওদের ত কোন দাবী দাওয়া নেই ; মেয়ের সঙ্গে চেলী আর রুলি ছাড়া আর কিছুই চায় না।

—তাই বলে গেছে নাকি ? কিন্তু হঠাৎ এত দয়ার ত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। কোন গলদ্ নেই ত ? তাই তাড়াতাড়ি যাহোক কোরে বিয়েটা সেরে নিতে চায় ?

সুজয় বলিল—এ রকম সন্দেহ করা তোমার ভারী অন্যায় দিদি। যে ছেলে শিক্ষার দাম বোঝে, সে যে বিনুকে আগ্রহ কোরে নিয়ে যেতে চাইবে, এতে ত আমি কিছুই আশ্চর্য্যি দেখতে পাই না।

বিমলা বলিলেন—কি জানি বাপু, চারহাত এক্‌ঠাঁই হবার আগে কিছুতে বিশ্বাস নেই আমার।

সুজয় বলিল—"না থাকে নেই থাক।" তারপর বিনীতার দিকে ফিরিয়া কহিল—"ও কিরে, তুই অমন নিঝুম হয়ে বসে পড়লি কেন ? বিয়ের কথা যে হাঁ কোরে গিলছিস দেখছি।···শোন্, শোন্, কাপড় ছাড়তে যেতে হবে না, চল্ বায়োস্কোপ দেখে আসি।"

—না।

—চল্ না, আজ যে Daddy Long Legs আছে ; তোর Mary Pickford Judy-র role-এ।

—আর একদিন যাবো।

—আজ শেষ দিন।

—হোক্‌গে, ভালো লাগ্‌ছে না।

সুজয় একটু বিস্মিত হইল। এই মেয়েটীকে বায়োস্কোপের পোকা বলিলেই হয় ; আর মেরি পিক্‌ফোর্ডের এমন ভক্ত আমেরিকাতেও আছে কিনা সন্দেহ। আজ সেই মেরি পিক্‌ফোর্ডের 'জুডি'র অভিনয় দেখিতে বিনীতার আগ্রহের অভাব দেখিয়া সুজয় খোঁচা দিয়া বলিল—ও বাবা, ত্রিযে দেখ্‌ছি গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। বিয়ে না হতেই এত বৈরাগ্য,

বিয়ে হয়ে গেলে দেখছি আর কাউকেই মনে থাক্‌বে না। কিন্তু এত অহঙ্কার ভালো না, হয়ত ভেঙেও যেতে পারে।

বিনীতা চীৎকার করিয়া বলিল—মা, তুমি কি আজ কালা হয়েছ? শুন্‌তে পাচ্ছ না আমায় কি রকম জ্বালাতন করছে?

—সত্যিই ত সুজয়, কেন ওকে জ্বালাচ্ছিস্‌?

—কেন ও আজ আমার সঙ্গে যাবে না? ক'দিন পরে হয়ত আর দেখতে পাবেনা।

—কি পাগল ছেলেরে তুই! কালই ত আর বিয়ে হচ্ছে না। যখন ওর যেতে ইচ্ছে নেই, তখন না-হয় থাক্‌ না আজ।

—না; ও না যায়, আমি আজই যাবো। একলা যেতে কি আমি পারি না?

বিমলা জানিতেন একলা সিনেমায় গিয়া সুজয় কোন আনন্দই পাইবে না, অথচ প্রতিবাদ করিলে তাহার জেদ চড়িয়া যাইবে। তাই বুদ্ধি করিয়া কহিলেন—তোর ত আজ যাওয়া হবে না। উনি আফিস থেকে এসে সব খবর জানতে চাইবেন। তুই না থাকলে চলবে না ত!

সুজয় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—দিদি কি চালাক্‌। মেয়ে গেল না দেখে আমাকেও ধরে রাখার মতলব। মেয়ের ওপর এত টান।

বিমলা হাসিয়া উত্তর দিলেন—টান আমার দুটীর পরেই সমান। এই দুজনের কেহই জানিল না যে পাশের ঘরে বিনীতা লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(২)

এই সংসারটীকে আজ দেখিয়া বুঝিবার জো নাই যে এমন একদিন ছিল যখন সুজয় ইহার কেহই ছিল না; আজ বুঝিবার জো নাই, জন্মাবধি এই আবহাওয়ায় সুজয় বাড়িয়া উঠে নাই, সে এখানে আসিয়াছে নবারোপিত কলমের চারার মত। সুজয় বিমলার সম্পর্কিত ভাই। আট-ন বছর বয়সের সময় তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাহারপর দশটী বৎসর তাহার পিতার শাসন-সুকঠিন স্নেহের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পিতার মৌন গাম্ভীর্য্যের প্রভাবে সে মানুষ না হইয়া সুপরিচালিত কলের মতই হইয়া উঠিতেছিল। মায়ের লীলাচঞ্চল, হাস্যমুখর, স্নেহমধুর মূর্ত্তিটি সুজয়ের মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়িত। কিন্তু পিতার গম্ভীর মুখ সে স্বপ্নকে দূরে সরাইয়া দিত। তাহার যৌবনসুলভ সামাজিকতা ও সরসতা এইরূপে ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু এই যে প্রাণপণ চোখে-চোখে-রাখা তাহাও বৃথা হইল। হঠাৎ এক দিন সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া ঘণ্টা চার পাঁচ মাত্র ভুগিয়া সুজয়ের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এত আদরের পুত্রটীর যে কি গতি হইবে তাহার কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে পারিলেন না।

খবর পাইয়া আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই আসিলেন। যে-সমস্যার সমাধান সুজয়ের পিতা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলকেই বিব্রত করিতে লাগিল। সুজয়ের ভার যে কাহার উপর পড়িবে তাহা ভাবিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। এটা যে সকলেরই কর্ত্তব্য তাহা সকলেই বুঝিতেছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া এই কর্ত্তব্যের ভার নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লওয়ার মত কর্ত্তব্যজ্ঞান কাহারও ছিল না। আর যে বস্তুটী থাকিলে অনেক গুরুভার আপনা হইতে লঘু হইয়া আসে, সুজয়ের পিতার সহিত সেই সমপ্রাণতা কোন আত্মীয়েরই ছিল না। কারণ তাঁহার প্রকৃতিগত অসামাজিকতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য আত্মীয়ের সহিত সম্পর্ককে মৌখিক ভদ্রতা ছাপাইয়া বাড়িয়া উঠিতে দেয় নাই।

সুজয়ের বাড়ীতে যখন ঘনঘন আত্মীয়-মহাসভার অধিবেশন হইতেছিল, বিনীতার পিতা মহেন্দ্রনাথ তাহার সকলগুলিতেই উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু কোন কথা কহিতেন না। তাঁহার স্বভাব এমনই সুপরিজ্ঞাত ছিল যে কেহ কোন অনুরোধও করে নাই। কারণ অমিশুক বলিয়া ইঁহারও বিশেষ বদনাম ছিল। লোকে বলিত, এই দুনিয়ায় তিনি চেনেন কেবল দুটী জিনিস—বাহিরে আফিস ও ঘরে তামাক। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনকে ঘড়ির কাঁটার সহিত ছন্দ রাখিয়া চালাইতেন। তাহার একতিল নড়চড় হইবার জো ছিল না। কতবার কতখানি জল খাইবেন, স্নানের সময় কত ঘটী জল মাথায় ঢালা হইবে, খাইতে বসিয়া ক'খানি রুটী খাইবেন, ও শুইতে গিয়া কি রকমে বালিশ বিছানা গুছাইয়া লইবেন—এ সমস্তই তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কয় ছিলিম তামাক বাড়ীতে খাইবেন, তাহা স্বহস্তে কলিকায় সাজিয়া ক্রম ও মাত্রা অনুসারে কাওয়াজী সৈন্যের মত সাজাইয়া রাখিতেন, এবং কোন্ সময় কত নম্বর কলিকা লাগিবে ও তাহা পুড়াইতেও কতক্ষণ সময় লাগিবে, এসব বিষয়েও তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়ম ছিল। আবশ্যকের অতিরিক্ত কোন কথা কহিতে বা কোন কাজ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

যেদিন শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে প্রাথমিক কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাওয়ায় সুধু সুজয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই বৈঠক বসিল, মহেন্দ্রনাথ সেদিন এক কথায় সকলকে স্তম্ভিত ও আশ্বস্ত করিয়া দিলেন।

সমবেত আত্মীয়মণ্ডলীকে তিনি ধীরস্বরে জানাইলেন যে কাহারও কোন আপত্তি না থাকিলে ও সুজয় কোন অসুবিধা বোধ না করিলে, তিনি তাহার সমস্ত ভার আনন্দের সহিত নিজের হাতে তুলিয়া লইতে ইচ্ছুক। মহেন্দ্রনাথ অপুত্রক, সংসারে স্ত্রী ও কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই, কাজেই তাঁহার আশ্রয়ে সুজয় আশাতীত সুখে থাকিতে পারিবে এ বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ রহিল না। সুতরাং আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিপজ্জনক সমস্যার এই সুচারু সমাধানে আনন্দের আতিশয্যে তাঁহারা সুজয়ের মতামতের অপেক্ষা করিলেন না—পাছে সে অস্বীকার করিলে ঝুঁকিটা আবার তাঁহাদেরই ঘাড়ে ফিরিয়া আসে।

হেমন্তের এক অনাড়ম্বর ধূসর-ম্লান সন্ধ্যাবেলায় আজন্ম-পরিচিত গৃহ হইতে চিরবিদায় লইয়া শঙ্কাকম্পিতহৃদয়ে সুজয় তাহার দিদির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিমলার সহিত সুজয়ের ইতিপূর্ব্বে কোন ঘনিষ্ঠতার যোগ ছিল না। মা বাঁচিয়া থাকিতে কয়েকবার দেখিয়াছিল মাত্র। আর বিনীতাকে ত অপরিচিতা বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। মহেন্দ্রনাথ সুজয়কে আনিয়া দিয়াই বেশ নিশ্চিন্তমনে আফিস ও তামাক লইয়া জমিয়া গেলেন। এই ছেলেটীর সমস্ত তত্বাবধানের ভার বিমলার উপরেই পড়িল।

এই অপরিচিত পরিবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া সুজয় নিজেকে অতিরিক্ত সংযত করিয়া তুলিল। কাহারও সহিত মিশিল না। এই গাম্ভীর্য্যের আবরণ হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য বিমলা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বৃথা হইল। তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন না। তিনি জানিতেন শোকের ক্ষত শুকাইয়া না গেলে কোন মানুষই সুস্থ ও সহজ হইতে পারে না। তিনি সময়ের প্রলেপের অপেক্ষায় রহিলেন।

এই ব্যবস্থা কিন্তু বিনীতার মোটেই মনঃপূত হইল না। চিরদিন নিঃসঙ্গভাবে বর্দ্ধিত সে হঠাৎ এই লোকটীর আগমন-সংবাদে একটী সঙ্গী লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লাসের সঙ্গিনীদের সকলেরই কেহ-না-কেহ কলেজে পড়ে, এইবার যখন তাহাদের সহিত ছাত্রজগতের আলোচনা হইবে, তখন যে তাহাকে উৎসুক শ্রোতাই থাকিতে হইবে না, সেও যে সেই আলোচনাতে যোগদান করিতে পারিবে, এই কল্পনা তাহাকে খুব মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু নবাগতের অটল গাম্ভীর্য্য ও বিচ্ছিন্ন সঙ্গবিমুখভাব তাহার উৎসাহকে নিবাইয়া দিল। চটিয়া মটিয়া সে স্থির করিল ওই লোকটীর সম্বন্ধে মোটেই কেয়ার করা হইবে না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এই প্রিয়দর্শন যুবকের সামান্যটুকু গতিবিধিও অতি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া পারিল না।

(৩)

বাহির হইতে বাড়ী ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুজয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—বিমলা ও বিনীতা তাহার ঘরে। বিমলা ডাকিলেন—"বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিতরে এসো।" ঘরে ঢুকিতেই বিমলা স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি ছবি আঁকতে পার?"

সুজয় লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েকদিন আগে এক রাত্রে ইংরেজ কবির—

And the long moonbeam, on the hard wet sand,
Lay like a marble column half upreared—

লাইনটী পড়িয়াই তাহার সুপ্ত চিত্রাঙ্কন-বৃত্তি সাড়া দিয়া উঠে। ঝোঁকের মাথায় তৎক্ষণাৎ কাগজ, পেন্সিল, পিঁড়ি, রং ও তুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আঁকিতে বসিয়াছিল—দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা তাহার সহিল না। তাহার পর হইতে প্রত্যহ রাত্রে সে ছবিটির উপর কাজ করিত, কৌতূহল উদ্রেক করিবার ভয়ে দিনে আঁকিত না।

বিমলা আবার বলিলেন—বিনু বলছিল কাল রাত্রে উঠে তোমার ঘরে অত রাত্রে আলো জ্বলছে দেখে সে উঁকি মেরে দেখেছিল যে তুমি ছবি আঁকছ।

সুজয় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলা তখন সুজয়ের কাছে আসিয়া বলিলেন—তুমি আমাদের এত পর ভাবো কেন? কতদিন এখানে এসেছ, তবুও এত দূরে দূরে থাক। অথচ তোমাকে আপনার কোরে নেবার জন্য আমাদের যে কত আগ্রহ তা বোধহয় তুমি বুঝতে পারছ। আর সম্পর্কে আমি তোমার দিদি বটে কিন্তু বয়সে এত বড় যে সাধারণতঃ লোকের যে বয়সে ছেলে হয়, সে বয়সে হলে, তুমিও আমার ছেলে হতে পারতে। ভগবান আমায় পুত্রভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাই তোমাকে পেয়ে ভাবছিলাম হয়ত আমার সে অভাব পূরণ হতে পারে।

সুজয়ের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, বলিল—আমি বুঝতে পারি, দিদি আমার এই ব্যবহারে আপনারা কষ্ট পান। একা থেকে থেকে আমার এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে কারো সঙ্গে মিশ্‌তে আমার সঙ্কোচ হয়। এখন থেকে আমি চেষ্টা করব, দিদি, আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত হতে।

এমন সময় বিনীতা বলিয়া উঠিল—আমার খুব ইচ্ছে করে যে আমি ছবি আঁক্‌তে শিখি।

বিমলা বলিলেন—শেখ্‌না কেন তোর মামার কাছে। স্কুলে ড্রয়িং ত তুই মন্দ পার্‌তিস্‌ না।

বিনীতা বলিল—ড্রইং নয়, আমার পেন্টিং শিখ্‌তে ইচ্ছে।

সুজয় বলিল—পেন্টিং শেখার গোড়ার কথা হচ্ছে রুচি তৈরি করা। বড় বড় চিত্রকরের আঁকা ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা ও রুচি গড়ে ওঠে। আমার কাছে ছবির এল্‌বাম্‌ আছে।

সেইদিন হইতে চিত্রচর্চ্চা আরম্ভ হইল। বিনীতা বুঝিল—ছবি দেখাটা সুধু ছবির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বেশ হইয়াছে বা কিছু হয় নাই বলিলেই শেষ হয় না। ইহার প্রতিটী রেখা, ভঙ্গী ও বর্ণের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। চিত্রশিল্পেও ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা-জ্ঞান না থাকিলে রসবোধ সম্পূর্ণ হয় না। তাই সে প্রাচীন ইজিপ্‌সীয়, আসিরীয় ও গ্রীক আর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌, একস্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ কিউবিজ্‌ম্‌, পৌয়াতিলিজ্‌ম্‌, ওপন্‌-এয়ার স্কুল প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া উঠিল। চীন, জাপান, পারস্য ও ভারতের শিল্পও তাহাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়িত না। দূরাদূরসংস্থান, ছায়ালোকসম্পাত, বর্ণস্তরবিন্যাস ইত্যাদি ব্যাবহারিক বিষয়েও তাহার জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে রাফাএল্‌ ও মুরিলোর মাতৃমূর্ত্তি, টার্ণার ও রুইস্‌ডেলের স্বভাব-চিত্র, হলবাইন, রেনল্‌ড্‌স্‌ ও মুঘলদিগের মূর্ত্তি-চিত্র, য়ুরোপীয় জাঁর (Genre) পেন্টিং ও ভারতীয় রাজপুত শিল্প প্রভৃতির তুলনামূলক সমালোচনায় বিনীতা সুজয়ের সহিত তুমুল তর্ক বাধাইয়া দিত। এক অজ্ঞাত-সুন্দর বিশ্বের সুপরিচিত অধিবাসী হইয়া উঠাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সুজয়ের অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিও এই সুযোগে শতধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। হাসির হাওয়ায়, ঝগড়ার ঝড়ে, মান-অভিমানের মেঘরৌদ্রখেলায় ইহারা বিমলার বৈচিত্র্যহীন সংসারকে বসন্তাগমে কোকিল-কাকলী-মুখরিত ধরণীর মত সজীব করিয়া তুলিল।

(৪)

সন্ধ্যার কিছু পরে অভ্যস্ত স্থানটীতে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া মহেন্দ্রনাথ অভ্যস্তভাবেই তামাক টানিয়া যাইতেছিলেন। চাঁদের আলোয় রেলিঙের ছায়া ছাতের ধারে সুন্দর একটী পাড় বুনিয়া দিয়াছিল। হাল্কা হাওয়া আসিয়া বিনীতার ঝুলন্ত শাড়ীখানিতে মৃদু দোল দিয়া গেল। স্যাক্‌রার দোকানের ঠুক্‌ঠাক্‌, পাঠনিরত বালকের চীৎকার ও থিয়েটারের আখ্‌ড়ার

বাঁশীর শব্দ তাঁহার গড়গড়ার সুপ্রিয় আওয়াজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, মনোযোগ আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলেন, ঘনশ্বেত ধূম্রকুণ্ডলী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পাক খাইতে খাইতে কেমন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নায় মিলাইয়া যাইতেছিল।

এমন সময় বিমলা আসিয়া বলিলেন—দেখেছ একবার ছেলেমেয়ে ছুটোর কাণ্ড।

—না।

—তা দেখবে কেন? তুমি ত তাদের কোন দোষই দেখতে পাওনা?

—তাদেরই আজ দেখতে পাচ্ছিনে ত তাদের দোষ দেখব কোথা থেকে?

—আমিও ত সেই কথাই বলছি। তাদের দেখতে পাবে কি? তাঁরা বেরিয়েছেন সেই দুপুরবেলায়, এখনও উদ্দিশ নেই। কোথায় গেছে তা-ও বলে গেল না। জিজ্ঞেস করলুম, বল্লে, এসে বলব। কি যে হাস্‌ছ, তোমার আদরেই ত এইসব হচ্ছে। সুজয় গেছে যাক্, সে ছেলে! কিন্তু মেয়েটা যে এই ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌ছে, তার কি বিয়ে-টিয়ে দেবে না?

—না, একেবারে বিয়ে দেব না এতবড় সাহস আমার নেই, তবে আরও কিছুদিন বিনু জীবনটাকে একটু উপভোগ কোরে নিক্।

সিঁড়িতে খটাখট্ ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ। বিনীতা ও সুজয় ছাতে আসিয়া হাজির হইল।

বিমলা জিজ্ঞাসিলেন—কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব?

বিনীতা উত্তর দিল—আর্ট এক্‌জিবিসন দেখতে গিছলাম, মা।

—সেটা কি রাত নটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে নাকি?

সুজয় বলিল—তারপর তোমার মেয়ে বায়না ধরলেন, অচল ছবি দেখলুম, সচল ছবি দেখে তবে বাড়ী যাব।

—আহাহা, তাই বুঝি? আমি ত বল্‌লুম, উট্‌রাম ঘাটে খানিকটা বেড়িয়ে চল বাড়ী যাই। তোমার ওই ডেম্‌প্‌সী-কারপাঁতিয়ে-র ঘুষো-ঘুষি দেখতে আমার ত ভারী বয়ে গিয়েছিল।

—বটে, তুই দেখছি আর্টিষ্ট হবার একদম অযোগ্য। ওরে, কারপাঁতিয়ে যদি সেকালের গ্রীসে জন্মাত, তবে লিসিপ্পাস কি প্র্যাক্‌সিটিলিস্ ওর মূর্ত্তি গড়তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কোরত।

—ভাগ্যিস আনাতোল ফ্রাঁস কথাটা বলে ফেলেছিল, নইলে কি ওটা তোমার জোগাত?

—কথাটা আমারই, যেহেতু ওটাকে আমি সত্যি বলে মানি। তবে কিনা আনাতোল ফ্রাঁস চুরি কোরে আগে বলে ফেলেছে, এই যা। ভাবছি ওর নামে একটা নালিশ ঠুকে দেব।

—কোথায়? নখদন্তহীন লীগ্-অব-নেশনস্-এর বেকার সুপ্রীম্ কাউন্সিলে নাকি? যাক্‌গে, হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে, তোমায় জিজ্ঞাসা কোরে নিই। শিল্পীরা নগ্নমূর্ত্তি আঁক্‌তে এত ভালোবাসেন কেন? আর ভালো যে বাসেন, আজকের ছবির মেলা ও ফ্রান্সের যে কোন সালোঁ তার প্রমাণ।

আর্টের বিচারে সুজয় সর্ব্বদাই তৈরি; সে গম্ভীর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—তার কারণ মানুষের দেহটা তাঁদের চোখে এমনই সুন্দর যে কাপড় দিয়ে ঢেকে তার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতাকে ক্ষুণ্ণ কোরতে তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধে ঘা লাগে।

—তোমার এই কথাটা যদি সত্যি হয় তবে নগ্নমূর্ত্তির মধ্যে বেশীর ভাগই নারী-দেহ হবার মানে কি?

—মানে অনেক। প্রথমতঃ এই কথাটা আগে বলে নিই, আর্টে পুরুষ নগ্নমূর্ত্তিও বড় ফেল্‌না নয়। গ্রীক্ ভাস্কর্য্য, মাইকেল এঞ্জিলো ও রোদাঁর কথা মনে কোরে দেখ। কবিতায় হুইট্‌ম্যানের কথাও ভুললে চল্‌বে না। তবে নারীদেহ যে বেশী আঁকা হয়েছে, তার কারণ একদল বলেন, ওটা নাকি বিবর্ত্তন-ধারায় একধাপ এগিয়ে গেছে; কোন কোন বিশেষ অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে সুন্দর। আমার কিন্তু মনে হয় চিত্রকরেরা পুরুষ এইটাই হচ্ছে আসল কারণ। নারীদেহের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।

—তা হলে যাঁরা নারীশিল্পী আছেন, তাঁদেরও ত পুরুষের প্রতি ওই রকম একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। অথচ তাঁদের আঁকা একটাও নগ্নপুরুষমূর্ত্তি আমার চোখে পড়েনি।

—তার কারণ নারী এখনও কোনখানেই সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে ওঠেনি। পুরুষের সম্বন্ধে তার মনোভাব এখনও অসঙ্কোচ সরলতা ও শিল্পীর নিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ করেনি। সেই দিনই নারীর অন্তরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, যেদিন পুরুষের সম্বন্ধে তার মনোভাব লজ্জা-ভয়-দ্বিধা-লেশশূন্য হতে পারবে; যেদিন সে প্রাণ খুলে বলতে পারবে, পুরুষের শক্তি, পুরুষের সৌন্দর্য্য তার ভাল লাগে।

বামুনঠাকুর ডাক দিল—দিদিমণি, খাবার দিয়েছি।

বিনীতা বলিল—ঠাকুর, মামাবাবুরও খাবার দাও।

সুজয় বলিল—সে কি, আমি এখন পড়তে বসব যে।

—না, এখন খাবে চল। আমার একলা খেতে ইচ্ছে করছে না।

দুজনে চলিয়া গেল।

বিমলা জিজ্ঞাসিলেন—চুপ কোরে রয়েছ যে? কি ভাবছ?

—ভাবছি, বিনুর একটা বিয়ে দিতে হবে।

—কেমন, কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে। আমি যখন আগে বলেছিলাম তখন ত গ্রাহ্য করনি।

—আমি ভেবেছিলাম, বিনুর আরো কিছু লেখাপড়া করা দরকার। কিন্তু দেখছি সুজয়ের সঙ্গে থেকে তার পুঁথিগত বিত্তের চেয়ে বস্তুগত বিত্তে ঢের বেশী হয়ে গেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবকিছুকে তলিয়ে বুঝবার এমন ক্ষমতা বিনুর হচ্ছে যাতে জীবনের সুখদুঃখ দুটোকেই ও সহজভাবে নিতে পারবে। সুজয়কে বোলো সে যেন বিনুর জন্যে একটী ভাল পাত্রের খোঁজ করে।

ঘরের ভিতর হইতে উচ্চহাসি ও বিনীতার গলার স্বর আসিয়া পৌঁছিল—মা দেখ, মামুবু 'কুমীর'কে 'জামাই' কোরতে পারছে না।

সুজয় উত্তর দিল—আমি 'জল'কে 'দুধ' কোরতে, কিম্বা 'আকাশ'কে 'পাতাল' কোরতে রাজী আছি, কিন্তু 'কুমীর'কে 'জামাই' কোরতে কিছুতেই রাজী নই। তুমি আছ দিদি?

বিনীতা বলিল—চালাকি রেখে দাও, পারছ না, তাই বল।

মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন—কি বল্‌ছে, বুঝতে পারছি না ত?

বিমলা বলিলেন—ও এক রকম খেলা,—কথা বদল করা—"সন্দেশ"-এ বেরিয়েছিল।

(৫)

বাংলা দেশে সাধারণতঃ মা ও মেয়ের মধ্যে সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও স্বস্তি-পূর্ণ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। কথায় বলে, মেয়ে হলে জ্বালা, থাক্‌লে জ্বালা, মরলে জ্বালা। বিমলাও মেয়ের মা হইয়া এই জ্বালার হাত এড়াইতে পারেন নাই। যতদিন মেয়ে বাপের আদরে ও খামখেয়ালিতে ধিঙ্গি হইয়া উঠিতেছিল, ততদিন মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারিলেও মনে মনে শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন না। ক্রমে যখন মেয়েকে পাত্রের পর পাত্র আসিয়া উপেক্ষা করিয়া গেল, তখন তাঁহার অশান্তি কত বেশী হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বরপক্ষ যখন অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সহিত বিবাহের সমস্ত

সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিল, তখনও তিনি সুস্থ বোধ করিতে পারেন নাই। অপ্রকাশ মিরাটে কাজ করে, তাহার ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেই বিবাহ সারিয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিতে হইবে, সুতরাং বরপক্ষ মোটেই অপেক্ষা করিতে রাজী নহে। কিন্তু বিমলার মনে হইতেছিল তাঁহার এতদিনকার সযত্ন-পালিতা কন্যাটীকে কে যেন জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। অথচ এ আশঙ্কা সুজয় কি মহেন্দ্রনাথের কাছে খুলিয়া বলিবার জো নাই। তাহারা ত উহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে।

বিবাহের পরদিন আত্মীয়-কুটুম্বিনীরা দল বাঁধিয়া জটলা করিতে-ছিলেন। একজন বলিলেন—বিমলার আমাদের কপাল ভাল। বেশ জামাইটী পেয়েছে। ওই ত কালো মেয়ে।

দ্বিতীয়া একজন বলিলেন—যা বলেছ ভাই; আমিও এই কথাই ভাবছিলাম।

নবীনা একজন তৃতীয়া বলিয়া উঠিলেন—কেন বাপু, মেয়ের নিন্দে করছ। রংটাই না হয় একটু কালো, কিন্তু কেমন শিক্ষিতা?

প্রথমা বলিলেন—তোদের কথা শুনে গা জ্বলে যায়। শ্বশুর-বাড়ী কি আপিসঘর না হাইকোর্ট, যে লেখাপড়া নইলে চলে না। আমার নগেনের বৌ যদি কালো হত ত লোকের কাছে মুখ দেখাতেই পারতুম না।

দ্বিতীয়া বলিলেন—যা বলেছ ভাই।

তৃতীয়া বলিলেন—জামাইটী এদিকে মন্দ নয়। কিন্তু ভারী গোমড়া-মুখো। আমার ভয় হচ্ছে, একটা বেরসিকের হাতে পড়ে এমন মেয়েটা না মাটি হয়ে যায়।

প্রথমা বলিলেন—পুরুষমানুষ ত ওই রকম হওয়াই ভালো। আমার নগেন তার বোনেদের সঙ্গেও হেসে কথা কয় না। আজকাল কি সব ছেলে হচ্ছে বাপু, যত কথা, যত হাসি, সব মেয়েদের সঙ্গে। দেখ না ওই সুজয় ছোঁড়াটা, বিমলার সঙ্গে এমন ধারা কথা কয় যেন ও তার পেট-থেকে-পড়া ছেলে আর কি?

এমন সময় বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুজয়কে আমি পেটে জায়গা দিইনি বটে, কিন্তু ও আমার পেটের ছেলের মত।

প্রথমা শিহরিয়া বলিলেন—বলিস্ নি ও কথা, ও কথা মুখে আনতে নেই। ওতে পাপ হয়।

বিমলা বলিলেন—তাতে কি হয়েছে। ও যখন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে, আমার তখন মনে হয়, কোন মা বোধহয় কোন

ছেলেকে এর চেয়ে বেশী ভালোবাসেনি। আগে আমার ছেলে নেই বলে দুঃখ হত, এখন মনে হয়, পেটের ছেলে ও-রকম না হলে একেবারে না হওয়াই ভালো।

সুজয় আসিয়া বলিল—দিদি, তুমি এখানে? তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি।

দলের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল।

বিমলা বলিলেন—কেন?

—বিনু আজ কোন সুট্‌টা পরবে তা কিছুতেই ঠিক কোরতে পারছি না—তুমি বল না ওকে কোনটায় বেশী মানাবে, মোভ্‌ রঙেরটা, না, এমিথিষ্ট রঙেরটা?

—সে তুই যা হয় করিস্‌ এখন, আমি এখন একটু জামাইয়ের কাছে যাই।

বিমলা ও সুজয় চলিয়া গেল।

নবীনা বলিলেন—যা-ই বল বাপু, বেশ ছেলেটী। বিমলা-দির সত্যিই কপাল ভালো।

প্রবীণা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—ওরে, যে দুধের আস্বাদ জানে না, তার কাছে ঘোলই মিষ্টি। আর দেখা যাবে, দেখা যাবে কতদিন এ রকম থাকে। এক গাছের ছাল কখনও আর একগাছে জোড়া লাগে? পর কখনও আপনার হয়?

দ্বিতীয়া বলিলেন—যা বলেছ ভাই।

ইহারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে তাঁহারা সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত—যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—পরকে আপনার করা, এক গাছের ছালকে আর এক গাছে জোড়া লাগানো।

* * * *

কি একটা কাজে সুজয় বাহিরে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়াই শুনিল, বর-কন্যার যাইবার সময় হইয়াছে। আর দেরী করা চলে না।

উপরে গিয়া দেখিল, বিমলা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। বিনীতাকে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। কিন্তু তাহার নিজের ঘরে ভেজান দরজা খুলিয়া দেখিল, বিনীতা একটা চেয়ারে গোঁজ হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে।

সুজয়ের মনটা খারাপ হইয়া গেল। তবুও হাসিমুখ করিয়া কহিল—কাঁদ্‌ছিস কেন, ছি! আবার ত ক'দিন পরেই ফিরে আস্‌বি।

বিনীতার মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক কঠিন হইয়া উঠিল; সে তাহার চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে নত হইয়া

সুজয়কে প্রণাম করিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন ফিরতে না হয়।

সুজয় কিছু না বুঝিতে পারিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এমন সময় প্রথমা প্রবেশ করিয়া বলিলেন—বেশ বাপু, তোমরা দুটীতে এখনও গল্প করছ ? এতকাল কথা ক'য়েও কথা ফুরোয়নি ? ওদিকে যে শুভক্ষণ উত্তরে গেল, তার হুঁস আছে কি ?

তিনি বিনীতাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

(৬)

প্রোফেসর ঘোষের লেকচার শেষ হইবার পরই সুজয় তাড়াতাড়ি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পিছন হইতে শৈলেশ ডাকিয়া বলিল—এই সুজয়, চল্লি যে, এখনও আর একটা ক্লাস আছে।

সুজয় না ফিরিয়াই উত্তর দিল—থাকব না।

—তুই না থাক্‌লে আজ হকি ক্লাবের মিটিংএর কি গতি হবে ?

—যে গতি তোরা করবি।

—তাহলে আমরা তোকে আর এবার কলেজ-টীমে নামাবো না।

—বেশ, দেখা যাবে, বলিয়া সুজয় চলিতে আরম্ভ করিল।

শৈলেশ আবার বলিল— এত যদি তাড়া ত আজ কলেজে এসেছিলি কি করতে ?

—"ভুল হয়েছে ! কালকে না হয় আস্‌ব না।" এই বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া সে একখানা ছুটন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

কণ্ডাক্‌টার আসিয়া বলিল—বাবু, টিকিট।

সুজয় পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিল—কালীঘাট।

—এটা হাইকোর্টের গাড়ী, এস্‌প্লানেডের নয়।

সুজয় অপ্রতিভ হইয়া নামিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া দেখিল, বিনীতা বিমলার সহিত হাত পা চোখ মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছে। ঘরে ঢুকিতেই বিনীতা তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

—কখন এলি ?

—এই খানিকক্ষণ।

—ভাল ছিলি ত ?

—হ্যাঁ।

—শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগ্‌লো ?

—মন্দ কি ?

—ও বাবা, এর মধ্যেই শ্বশুরবাড়ী ভালো লেগে গেছে। তাহলে তোর রাগ পড়ে গেছে বল ?

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন—রাগ আবার কবে হোল ?

—তা বুঝি জান না, দিদি। সে এক কাণ্ড। ওরা যেদিন যায় সেদিন যাওয়ার ঠিক আগেই দেখি বিনু আমার ঘরে বসে কাঁদ্‌ছে।

বিমলা বলিলেন—তা ত কাঁদবেই ; প্রথমবার আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, আর কান্না আসবে না ?

—বেশ ত, তা না হয় হোল। কিন্তু আমি যখন সান্ত্বনা দিতে গেলুম—

বিনীতা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—তখন আমার এমন রাগ হয়ে গেল। নিজেরা বেশ দল বেঁধে চেনা জায়গায় থাকবেন, আমায় যেতে হবে কোথায় এক অচেনা জায়গায় অচেনা লোকের মধ্যে। এই বলিয়া বিনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুজয় বলিল—উঠ্‌লি যে ? যাচ্ছিস্‌ কোথায় ?

—আমার ঘরে। কথা কাটাকাটি কোরতে ভাল লাগছে না।

—বাঃ, আজ আমাদের হকি ক্লাবের মিটিং ছিল, তাই ফেলে আমি এলাম, আর তুই কি না—

—যাওনা তোমার মিটিং-এ। সময় ত এখনও বয়ে যায় নি।

বিমলা ভাবিলেন ইহারা আবার আগের মতই খুন্‌সুড়ি কাটা আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু বিনীতার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে সুজয় ব্যথা পাইল। বাইক্‌ লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে বিনীতা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল—মামুবু কি সত্যিই চলে গেছে নাকি ?

বিমলা উত্তর দিলেন—তাই দেখছি।

এদিকে হকি ক্লাবে সুজয়কে দেখিয়া শৈলেশ বলিল—এই যে চাঁদ এসেছ। তখনই জানতুম, তুই আসবি। হকি যে তোর কাছে কাব্যের চেয়ে কম প্রিয় নয়, তা কি আর আমি জানিনে ?

সেইদিন সুজয়েরর মনে ব্যথা দিয়া অবধি বিনীতার স্বস্তি ছিল না। অথচ তখন ব্যথা না দিয়া অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। সুজয় যে বিষয়ের কথা তুলিয়াছিল, আল্লা দিলে কোন বিশ্রী অপ্রীতিকর আলোচনায় তাহার শেষ হইত ভাবিয়া বিনীতা শিহরিয়া উঠিল। সে আরো লক্ষ্য করিয়াছে সেইদিন হইতে সুজয় তাহাকে যেন এড়াইয়া

চলে। সুজয়ের মনের বেদনার এই পরিচয় পাইয়া তাহার নিজের বেদনা আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটাকে সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সে একদিন সুজয়ের ঘরে ঢুকিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ হাল্কা সুরে জিজ্ঞাসিল—কি হচ্ছে?

সুজয় ছবি আঁকিতেছিল—আনন্দ-চঞ্চল সমুদ্রের বিশাল বিস্তার আর একটি ছোট নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—কে বিনু, আয়।

—কি আঁক্‌ছ ওটা?

—দেখ্‌তেই ত পাচ্ছিস্।

—Sea-scape আঁক্‌তে লেগে গেছ, অথচ তুমি ত কখনও সমুদ্র চোখে দেখ নি।

সুজয় মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—কি করি, দায়ে প'ড়ে।

—তুমি কি আজ সোজা কোরে কথা কইবে না?

—এটা Sea-scape নয়, বিবাহের উপহার।

—আবার হেঁয়ালি।

—বুদ্ধি থাকে এবার হেঁয়ালি ভেঙে নাও। আমাদের জলধির বিয়ে।

—ও; মেয়ের নাম বুঝি তটিনী বা নির্ঝরিণী বা অমনি কিছু?

—হ্যাঁ।

দুজনেই দুজনের মুখে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিনীতা বলিল—পরের বিয়ে দিয়ে কল্পনার খোরাক জোগানো কেন? মাকে বল্‌ছি তোমার একটা কনে ঠিক কোরতে।

—তুই যে দেখছি এরই মধ্যে প্রজাপতি কোম্পানীর ক্যানভাসার হ'য়ে উঠেছিস্।

বিনীতা উত্তর দিল—তুমিও যদি কোরতে তাহলে তুমিও বল্‌তে তাই।

সুজয় বলিল—আমার বিয়ে-টিয়ে হচ্ছে না—

—আমার যখন হোল, তখন তোমারই বা হবে না কেন?

—"কেন, তা দেখবি। এই দেখ্"—বলিয়া সুজয় এলবাম হইতে তেনিয়ে (Tenier-le-fils)-র অঙ্কিত হাইমেন-ছবিটি দেখাইয়া দিল। ছবিটির একটি বিশেষত্ব ছিল। শিল্পী বিবাহ-দেবতাকে এমন করিয়া আঁকিয়াছেন যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় হাসি-হাসি, সুখ-বিহ্বল। কিন্তু কাছে আনিলে আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। সে মূর্ত্তি শোক-মলিন, বিষাদ-জর্জ্জর। এইটী দেখাইবার জন্যই ছবিখানি চিত্রশালিকায় একটী

মঞ্চের উপরে রাখা হয়, যাহাতে লোকে দূর হইতে একটি রূপ দেখিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া অপর রূপটি দেখিতে পায়।

বিনীতা বলিল—কিন্তু এই চিত্রের চিত্রকরও বিয়ে করেছিলেন, আর ভুলে যাওনি বোধ হয় এই ছবি দেখানোতেই সেই বিয়ের সূত্রপাত।

সুজয় বলিল—এই ছবিটা দেখে চিন্‌তে পারে এমন মেয়ে বাংলা দেশে তুই ছাড়া কটা আছে জানিনে।

সেইদিন মিরাট হইতে বিনীতা পত্র পাইল। অপ্রকাশ লিখিয়াছে, তাহার বাসা সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা তাহাকে শীঘ্রই লইয়া আসে।

বিনীতা উত্তরে লিখিল—তাহারও তাই ইচ্ছা।

(৭)

চাক্‌রীর বিচিত্র গতি। বছর দুই পরে বড় সাহেবের এক কলমের খোঁচায় অপ্রকাশ মিরাট হইতে কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিল। বড় ভাই কলিকাতায় থাকিতেন, তাঁহারই সহিত একত্র বাসা করিল।

এত কাছে থাকিয়াও কিন্তু বিনীতার বাপের বাড়ী আসা হইত না। অপ্রকাশ বিশেষ অপছন্দ করিত। বিনীতাও কখন বিশেষ আগ্রহ জানায় নাই। বিমলা যে কন্যা-জামাতা-পরিশোভিত সংসারের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নই রহিয়া গেল বটে, কিন্তু নিজের বিবাহিত যৌবনে স্বামী-সাহচর্য্যের কথা মনে করিয়া, কন্যা স্বামীসোহাগিনী হইয়াছে ভাবিয়া, অদর্শনক্লেশ কোনমতে চাপিয়া রাখিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে স্বীয় গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া বিনীতা ছোট দেবরের ঘরটী পরিষ্কার করিতে যাইতেছে, এমন সময় শুনিল বড় জা তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছেন।

—তোদের মেজ-বৌ কোথা?

—ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

—দুপুর বেলায়? ছেলেপিলে হবে নাকি?

বড় জা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—ওর আর কোন কালে হয়েছে?

—কেন?

বড় জা খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া চাপা গলায় বলিলেন—আমাদের মেজবাবুর বাপ হবার ক্ষমতা নেই, অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিছুতেই সারানো গেল না।

বিনীতা আর দাঁড়াইতে না পারিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। একটা অন্ধকার রহস্য আজ তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া গেল। আজ সে বুঝিল কেন স্বামী তাহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতেছেন, কেন আজ পর্য্যন্ত সে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে স্থান পায় নাই। ব্যাপারটা তাহার কাছে বিসদৃশ লাগিত, কিন্তু স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইবে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া কোনদিন কোন প্রতিবাদ করে নাই।

আহারান্তে ইচ্ছা করিয়াই বেশ খানিকটা দেরী করিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া বিনীতা দেখিল অপ্রকাশ তখনও বই পড়িতেছে। দেখিতে ভালোমানুষটীর মত এই লোকটাকে দেখিয়া আজ তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তথাপি কাছে আসিয়া ধীরস্বরে বলিল—আমি আর তোমার ও-সব নিয়ম-কানুন মান্‌ব না।

—হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?

—কেন মান্‌ব? বিয়ে যখন হয়েছে, তখন তার সমস্ত অধিকার আমি পেতে চাই। প্রকৃতিকে বঞ্চিত কোরে ও-রকম সংযমের বাঁধনের কোন অর্থ নেই।

অপ্রকাশ খোঁচা-মারা ঠাট্টার স্বরে বলিল—তা থাক্‌বে কেন? যে সংযমের উদ্দেশ্য জীবনে পশুত্বকে লোপ করা, মানুষকে ভগবান কোরে তোলা, তা তুমি বুঝবে কেন? সাধে কি কথা আছে—নারী নরকের দ্বার?

—দেখ, ভূতের মুখে রামনাম শোভা পায় না। যে চেষ্টা কোরেও অসংযমী হতে পারে না, তার আবার সংযমের দাম কি? তোমার মত পুরুষত্ব-বর্জ্জিত লোকের ও-সব কথা মুখে আনাই পাপ।

—কি? কে বলেছে তোকে?

—যেই বলুক, কথাটা যে সত্যি তোমার ওই চম্‌কে ওঠায়, ওই অভদ্র ভাষায় টের পাচ্ছি। তোমায় এখন জিজ্ঞাসা করি আমি, কেন তুমি জেনেশুনে আমায় বিয়ে কোরে এমন ঠকালে?

—বলতে লজ্জা করে না, একটী পয়সা না নিয়ে বিয়ে কোরে তোকে উদ্ধার কোরে দিয়েছি। মনে নেই, তার আগে কত লোকে লাথি মেরে চলে গেছে।

—আমায় তুমি বিয়ে করেছিলে কি আমায় উদ্ধার করার জন্যে, না আমার বন্ধ্যাত্ব প্রচার কোরে তোমার পুরুষত্বহীনতাকে চাপা দিয়ে লোক-সমাজে তোমার মান বজায় রাখবার জন্যে? আর আমার বিয়ে যদি না-ই হোত, ত ছবি এঁকে অনায়াসে আমার দিন কেটে যেত।

—জানি গো জানি, ছবি-আঁকিয়ে মামার সঙ্গে ঘর কোরতে পেলে খুব ফুর্ত্তি হোত জানি। আহা কি সম্বন্ধ—মামাও বটে, ভাইও বটে, আর একটা হলেই ত্র্যহস্পর্শ সম্পূর্ণ হোত।

—উঃ, তুমি এত ছোটলোক। যার নাম কোরে এই বিশ্রী কথাগুলো বলতে তোমার একটুও বাধলনা, তার ভদ্রতার এককণাও যদি তুমি পেতে ত উদ্ধার হয়ে যেতে।

—"কে কাকে উদ্ধার করে দেখছি।" এই বলিয়া অপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। এত দিনের সযত্ন-রক্ষিত ধর্ম্মের মুখোষটা এইমাত্র খসিয়া পড়াতে তাহার কদাকার স্বরূপ অতি পাশবিকরূপেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। নিষ্পেষিত প্রবৃত্তির চাপা-আগুন চোখের লেলিহান দৃষ্টিতে জ্বলিয়া বাহির হইল। দুই হাত বাড়াইয়া সে বিনীতার পানে অগ্রসর হইল। বিনীতা ভয় পাইয়াছিল ছুটিয়া বাথরুমে গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।

অনেক রাত্রে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ছাদের আলিসার উপর আসিয়া বসিল। সংকল্প—অপ্রকাশ সেখানে আসিলে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

সেইখানে বসিয়া বিনীতা ভাবিতেছিল—কি হইল, এ তাহার কি হইল? কি করিয়া সে এই নীচপ্রাণ ভণ্ড লম্পটের সহবাসিনী হইয়া সারা জীবন কাটাইবে। ভাগ্যবিধাতার উপর তাহার রাগ হইল। কিন্তু যাহার কোন রূপ নাই, যাহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, তাহার উপর রাগ টিঁকিয়া থাকিবে কেমন করিয়া? তাই তাহার সমস্ত রাগ, কেন্দ্রীভূত হইল সুজয়ের উপর—যে তাহাকে নারী-জীবনের বিশাল আদর্শের সন্ধান দিয়াছিল, যে শিখাইয়াছিল মহত্ত্বকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ও নীচতাকে প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা করিতে।

(৮)

একতাড়া চাবির শব্দে চকিত হইয়া সুজয় চাহিয়া দেখে বিনীতা দাঁড়াইয়া। ত্রস্ত হইয়া বলিল—দিদি ত বাড়ী নেই।

এই কথা ক'টির আড়ালে যে একটী পর্ব্বত-প্রমাণ অভিমান ঢাকা রহিয়াছে বিনীতা তাহা বুঝিল। আরও বুঝিল, এটা তাহার ন্যায্য পাওনা। বাপের বাড়ী আসিয়া সে যে সুজয়ের সঙ্গকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিত, তাহা আর সকলকে ফাঁকি দিলেও সুজয়কে ঠকাইতে পারিবে না, ইহা সে জানিত।

বিনীতার এই চিত্ত-পরিবর্ত্তনে সুজয় ব্যথা পাইল বটে, কিন্তু সে-ও পিঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনীতা আসিলে তাহার বাহিরের কাজ লক্ষগুণ বাড়িয়া যাইত।

আজ একলা বাড়ীতে বিনীতার এই হঠাৎ আবির্ভাবে সে এখন নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত ভাবিতে লাগিল।

বিনীতা কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া সুজয়কে প্রণাম করিয়া সহজভাবে কহিল—ভালোই হয়েছে, আমি তোমার কাছে এসেছি।

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ, কথা আছে, অনেক।

—কথা, আমার সঙ্গে ? সে ত অনেককাল হয়নি।

—"তাই ত আজ বলতে এসেছি।" এই বলিয়া বিনীতা টেবিলের উপর চড়িয়া বসিল। সুজয় চেয়ারে বসিয়াছিল।

দুজনেই চুপচাপ। তারপর সুজয় বলিল—কৈ, কি বল্‌বি, বল্‌।

—আমি তোমায় বলতে এসেছি যে তোমায় আমি খুব ভালো বাসতুম।

সুজয় হাসিয়া উঠিল—সরল, সবল, উচ্ছ্বসিত হাসি। বলিল—এই কথাটা এত ঘটা কোরে বলার কি দরকার ?

—আছে। তোমাকে ভালবাসতুম আমি স্বামীর মত। স্বামীত্বের সমস্ত আদর্শটা তোমাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল।

সুজয়ের হাসি কোথায় উড়িয়া গেল। গম্ভীর তিরস্কারের স্বরে বলিল—ছিঃ ও-কথা মুখে আনা—

—পাপ, কিন্তু যে-কথা মনের ভিতরকার চাপে ঠেলে মুখের কাছে আসে, তাকে আট্‌কাই কি দিয়ে ? ভয় পেওনা তুমি, আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে বর্ম্মা মুলুকে যাবার ব্যবস্থা কোরতে আসিনি। আমি সুধু তোমায় এই কথাটা জিজ্ঞাসা কোরতে চাই, তোমায় যদি আমার ওইরকম কোরেই ভালো লেগে থাকে, সে দোষটা কি কেবল আমারই একলার ? কেন তুমি ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে পরিচিত ছিলে না ? কেন তুমি হঠাৎ এলে আমার যৌবনোদ্‌গমের সেই অনন্ত-সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন আমি প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছি। কেন আমার চোখে পড়্‌ল না এমন একটাও লোক যার চেয়ে তুমি রূপে গুণে কোন অংশে নিকৃষ্ট ? আর যার হাতে তোমরা দেখে শুনে তুলে দিলে তোমার তুলনায় সে কেন এমন, সে কেন এমন.........

সুজয় তাহার জামাটা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল, বিনীতা দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাচ্ছ কোথায় তুমি ? আরো

অনেক কথা তোমায় শুনতে হবে। তুমি জান, এসব কথাগুলো তোমার কানে যত খারাপ লাগছে, তোমার দিদির কানে তা লাগবে না। 'তোমার মত' জামাই' তিনি কামনা কোরতেন। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমায়, কেন মা তোমাকে ভাইএর চেয়ে ছেলে হিসেবেই বেশী দেখে ?

সুজয় আর সহ্য করিতে পারিল না। দাঁত চাপিয়া রুক্ষস্বরে কহিল—তুই এত নীচ, তোর মনে এত ময়লা যে তার কাদা দিয়ে তুই আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকে ঘোলাটে করে দিচ্ছিস্। তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। পথ ছাড়্।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া বিনীতা দরজা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। মহেন্দ্রনাথ আসিয়া বলিলেন—কে বিন্নু, কখন এলি মা ?

—এই এখ্‌খুনি।

সুজয় বাহিরে চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে একটা অস্পষ্ট গুম্‌রানির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সুজয় দেখিল, বিনীতা তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে। তাহাকে জাগিতে দেখিয়া বিনীতা সুজয়ের পা-দুখানি নিজের বুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ গুঁজড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই বলিতে লাগিল—জ্বলে গেলাম, আমি জ্বলে গেলাম।

ঘর অন্ধকার ; সুধু পথের গ্যাসের আলো সাম্‌নের বাড়ীর নতুন-রং-করা দেওয়ালে প্রতিফলিত হইয়া অন্ধকারের গায়ে সাদা তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। তারি মাঝে বিনীতার এই অসঙ্কোচ আত্মনিবেদন—সুজয় সংযম হারাইল। বিনীতাকে সাদরে নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এই যদি তোর মনে ছিল, রাক্ষুসী, আগে বলিস্ নি কেন ?

বিনীতার মুখে এক অস্বাভাবিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি বৃথা-বিজয়ের হাসি। সুজয়ের সংযম-কঠিন হৃদয়কে সে যে তাহার প্রাণের উষ্ণ আবেগ দিয়া গলাইতে পারিয়াছে, এ হাসি সেই নিষ্ফল সার্থকতার হাসি। বিনীতা ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—কি লাভ হোত তাতে ?

উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

—দেখ, তোমার সংযম যখন একবার ভেঙেছে, তখন তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। তুমি আর এখানে থাকতে পাবে না।

—দিদির কি হবে

—"সে ভাবনা আমি ভাব্‌বো।" তারপর মিনতির সুরে কহিল, "আমার একটা মাত্র জুড়োবার জায়গা এই বাপের বাড়ী। এটাকে তুমি ঘুচিয়ো না।"

আবার চলিয়া যাইতেছিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তাই বলে আজ-কালই যেওনা যেন। যেও, আমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে।

পরদিন অপ্রকাশের ছোট ভাই আসিয়া বিনীতাকে লইয়া গেল।

(৮)

ক'দিন পরে রাত্রে একদিন সুজয় নিজের ঘরে শুইতে যাইতেছিল, বিমলা ডাকিয়া কহিলেন—"শুনে যা ত এঘরে।" সুজয় ঘরে ঢুকিবার সময় মনে মনে বলিল—"তবে আজই, আচ্ছা তাই হোক্।" বিমলা বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোর হয়েছে কি? ক'দিন ধ'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্! বাড়ীতে মোটে তোকে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না, বাইরে বাইরে থাকিস্! কেন? কি জন্যে?"

সুজয় বেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল—ছাড়াছাড়ি ত হবেই একদিন, তাই এখন থেকে ওটার মহলা দিয়ে অভ্যাস কোরে রাখছি।

—আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোকে ঘরজামাই কোরে রাখ্‌তে পারে এমন শ্বশুরবাড়ীর সন্ধান ত আমি আজও পাইনি।

—আর কতকাল তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌ব দিদি।

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন। এ ত উপহাসের স্বর নয়, এ যে নিবিড় অনুভূতির স্বর, প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

—গলগ্রহ, তুই আমাদের গলগ্রহ, কে তোকে এ কথা বলেছে, ফের যদি তুই এমন কথা মুখে আনবি—

এইবার মহেন্দ্রনাথ কথা বলিলেন। এই মৃদুস্বভাব লোকটি সাধারণতঃ কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু যখন মুখ ফুটিয়া কথা বলা দরকার, তখন তাঁহাকে কখন মুখ বুঁজিয়া থাকিতেও দেখা যায় নাই। আর তাঁহার উক্তি সুস্থির চিন্তাশীলতার এমন একটী পরিচয় দিত যে প্রায়শঃই তাঁহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকিত না। তিনি বলিলেন—সুজয়কে যে আমরা গলগ্রহ মনে করি না, তা ওকে আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। তবুও যদি ও মনে করে এখানে থাকাটা ওর মঙ্গলের পক্ষে অন্তরায়, তবে আমার মতে ওকে জোর কোরে না আটকানই উচিত।

বিমলা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"চাইনে আমি তোমার ওসব কথা শুন্‌তে। কি বোঝে ও ওর জীবনের ভালমন্দর কথা।" তারপর সুজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর সুজয়, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর সুজয়, আর কখনও ও সব কথা মনে আনবি না।"

সুজয়ের মনে বন্যার মাতামাতি আরম্ভ হইল। একে ত দিদির প্রতি তাহার আন্তরিক টান ছিল, তাহাতে তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের এই প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার চিত্তের দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে বিমলার পা ছুঁইয়া বলিল—তাই হবে, দিদি, তোমার কথাই রইল।

বিমলা বলিলেন—আজ থেকে তোকে আর একলা শুতে দেওয়া হবে না, তুই আমার কাছে শুবি।

সুজয় বলিল—না দিদি, তার কোন দরকার নেই। আমি বলছি আমার কথার কোন নড়চড় হবে না।

কিন্তু নিজের প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া সুজয়ের চিত্ত আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রের সমস্ত ঘটনা আবার তাহার চোখের সম্মুখে অভিনীত হইতে লাগিল—বিনীতার সেই আকুল ক্রন্দন, সেই অসঙ্কোচ আত্মনিবেদন, সেই ক্রূর রহস্যময় হাসি, সেই অলঙ্ঘ্য আদেশ। একজোড়া কুঞ্চিত-ভ্রূ কালো চোখ তাহাকে তীব্র আক্রমণ করিতে লাগিল। যতই রাত্রি পোহাইয়া আসিতেছিল, একটা ব্যাকুল বাণীও যেন শব্দ সপ্তকের উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। তাহা বলিতেছিল—"তুমি যাও, আজই যাও, আজ নইলে তোমার আর যাওয়া হবে না।" ভোরের মুখে সুজয় আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। একটা কাগজে লিখিল—

দিদি,

ক্ষমা কোরো, আমি চল্লুম। দুঃখ কোরো না, পর কখনও আপনার হয় না। ইতি—

অকৃতজ্ঞ সুজয়

তারপর বিমলার ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল শীতপ্রভাতের ঘন কুজ্ঝটিকা তাহার পশ্চাতের অনন্ত বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীস্বয়ম্ভূ চক্রবর্ত্তী

কবিতাগুচ্ছ

এইটুকু ?

(শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের Credo নামক কবিতা পাঠান্তে)

মনের কথা মনের মতন ক'রে কইবে শুধু কান্নাহাসির ফাঁকে ?—
হায় রে ! যখন পথের প্রতি বাঁকে সুদূর নিতুই ডাকে···ডাকে···ডাকে !
কবিরে কি শুধুই সমীপ চায় ? ছায়াপথও ডাকে না কি তারে ?
ঊর্দ্ধলোকের দুরভিসার-দাবী নয় কি তাহার জন্ম-অধিকারে ?
হৃদির অতল রত্নাকরের তলে মুক্তামাণিক জ্বল্‌ছে থরে থরে
মন-ডুবুরি ডুব দিয়ে না তুলি' রইবে ব'সে অলস বেলা-'পরে ?
পরিয়ে হিয়ার কুসুম প্রিয়ার চুলে সারা জীবন মিট্‌বে কি আশ তার ?
অভীপ্সা যা'র রচ্‌তে তারা-ফুলে প্রাণ-দিশারীর উজল স্তবহার ?

জন্ম-বেদুইন যে—গৃহছাড়া হয় নিয়ত উধাও মরু-পারে,—
পাথার তরি ধায় যে স্বপ্ন চোখে নিত্য নূতন ভুবন আবিষ্কারে,—
বিন্দুমাঝে সিন্ধুনূপুর শোনে যে-শ্রুতিধর প্রতি চরণপাতে,—
নন্দনেরি মন্দারে যে যাচে মর্ত্ত্য হিয়ার মালঞ্চে ফুটাতে,—
লঙ্ঘে গিরি, দলে আগুন, কাটে লক্ষ পিছুটানের ঊর্ণাজালে,—
বিদ্যুতেরি বহ্নিঝলকে যে অঙ্কিতে চায় তিলক মরভালে,—
যুগে যুগে অন্তরে যার ঘোষে ঃ অল্পে কোথাও নেইকো সার্থকতা,—
দুর্গমী-সে রইবে ধরি প্রিয়ার আঁচল—কহি' আধ-আধ কথা।

বদ্ধ সীমায় শাপ সম যে গণে রূপের মাঝেও অরূপে যার রতি,—
ধ্রুবে যাহার বুক ওঠে না ভ'রে অধ্রুবেরেই নিত্য করে নতি,—
সগৌরবে যে-জন নটের ঢঙে মাখে না হীন অগৌরবের কালি,—
অশ্রু-নেশায় চায় না মায়া-রঙে, মিথ্যা অর্ঘ্যে সাজায় না তার ডালি,—
উদ্‌গাতা যে অলখ চিরন্তনের, মানুষ ব'লে নেইকো গরব যার,—
পদে পদে মানুষ সে—এই ছাপ জীবনে যার চরম তিরস্কার,—
যার দুরাশা-দর্পণে দেবতা দেবাতীতের ছায়া হেরি' ডরে,—
মনস্‌-পারের সেই ধ্যানী কি শুধুই কইবে কথা মনের মতন ক'রে ?

———

শিখর-দুরাশী

আলোদীপ্ত গিরিচূড়া ; চলে পান্থ সেই পথে ; আঁখি তা'র ধাঁধে সে-আভায় ;
ঊর্দ্ধ-নিমন্ত্রণে তার হৃদে ক্ষুধা উঠে জাগি',—তবু লুব্ধ ফিরে ফিরে চায়
যেথা নিম্নে অদ্রিমূলে রাজে নব দূর্ব্বাশ্যাম প্রীতিস্বচ্ছ কান্ত মায়াধাম ;—
শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনাও বীণার নিক্কণসম শুনিত যেথায় অভিরাম।

নাহি সেথা গতিবেগ ? উত্তাল উচ্ছ্বাস নাহি ? নাহি সঙ্কটের অভিসারে
উদাত্ত আনন্দ ব্যথা ? আসে যায় কতটুক ? স্বস্তি-তরু ছায়া ত বিথারে !
নাহি সেথা যতিহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা ? নাহি অকূলের বিপুল বাঁশরী ?
"কী বা যায় আসে ?"—ক্ষুব্ধ পথিক উত্তরে কহে মধ্যপথে আহ্বান পাসরি'।

"আহ্বান ?—কিসের ? কোথা ?" সুধায় সে থাকি থাকি,সত্য কি সে
শুনেছে তাহারে ?
ওই দীপ্যমান ছায়া শূন্য হিম-মৌলি ' পরে কভু কেহ বাঁচিতে কি পারে ?
তথাপি তারেই চাহে—যুক্তি মানা নাহি মানি' গহনেই পশিবে বিদ্রোহী ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ ডাকে···ডাকে···অধিত্যকা পিছে ফেলি' চলে চাতকের তৃষ্ণা বহি'।

পথে মেঘ ছায় তা'র হৃদাকাশ পলে পলে ভাবে থামি প্রতি সানুদেশে ;
ছায়া যদি পদে পদে আলোজয়ী,—তবে সে কি চলে আলেয়ার মোহে ভেসে ?
ঝঞ্ঝা-ভীত পক্ষ দুটি গুটায়ে আশ্রয় মাগে সেই নীড়ে—বিদায়েছে যাহে,
হাসে সে-মমতাময়ী, গৃহাঙ্গনে সন্ধ্যা জ্বালি' ফিরে তারে বাহুপাশে চাহে।

কিন্তু—এ কী পরিহাস ! যারে হায় ! ফিরে চায় সেও যে আলেয়াসম ভায়—
সেই দিন হ'তে—যবে বাজিল শিখর-বাঁশি—"ওরে যাত্রী ! মোর কাছে আয়"
সে-বাঁশি না শুনে যবে—সংশয়ে ঘনায় ব্যথা, দৃষ্টি আবিলায় বারম্বার,
ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা আশা তবু চলে—ঊর্দ্ধদিঠি ; নিম্নে তৃষা মিটে না যে তার।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

———

কবি পরিচয়

মোর নদীতটে বটের ছায়ায় পায়ে-পায়ে-আঁকা সরণীতে
উতলা হাওয়ায় পাতা ঝ'রে যায়, গ্রাম-বধূ আসে জল নিতে ;
এই ঘাটে, কবি, এলে তরী বেয়ে
কান্না হাসির সারি-গান গেয়ে,
এই তব পরিচয় ;
এই বন-ফুলে তোমাতে আমাতে হলো মালা-বিনিময়।

আঙিনায় শ্যাম আঁচল বিছানু, সেথায় তোমার কাটে বেলা,
কত না মূর্ত্তি ভেঙেছো গড়েছো, করেছো নিভৃতে কত খেলা।
আমি জানি তব বাঁশরীর সুর
কত বিচিত্র কত পরিপূর
যাদু মাধুরীতে মাখা ;
জানি ছন্দের বলাকা তোমার মেলে অনন্তে পাখা।

আমার গঙ্গা মিলেছে তোমার ভাব-গঙ্গার জল-ধারে,
আমার যমুনা চিনিয়া নিয়াছে তব যৌবন-যমুনারে।
তব চিত্তের নৃত্যের তালে
দোলা লাগে মোর মাধুরীর ডালে,
কালবৈশাখী-গলে
তোমার সুরের বিদ্যুতে গাঁথা বজ্রমাণিক জ্বলে।

তোমার গানের প্লাবনে আমার শ্রাবণেরে করে দিশাহারা,
তব আনমনা বিরহ-বেদনা নীপবনে রচে স্বর-ধারা।
বাদল-বাতাসে মোর মেঘে মেঘে
তব মল্লার উঠে জেগে জেগে,
মুখর করিলে তুমি
ভরা বাদরের উৎসব-রাতে মোর অরণ্যভূমি।

মুগ্ধ চোখের পরশমাণিক মাধুরী লাগায় নীলাকাশে
সলিল-রিক্ত মেঘের কোণায়, শিশির-সিক্ত ঘাসে ঘাসে !
শিথিল শেফালি ক্ষণে ক্ষণে ঝরি
সাজিখানি মোর দেয় ভরি' ভরি' ;
তোমার ছন্দে ঢালা
মনের বাসনা বনের বাসনা কুড়ায়ে গেঁথেছি মালা।

আমার ধূসর ধূলার বাসর সন্ধ্যামালতী দেয় ছেয়ে,
তোমার গাঁথনী মিলন-মালায় ঠাঁই পাবে ব'লে রয় চেয়ে ;
ঘুমহারা রাতে বৌকথাকও
যে-সুর জাগায়, তা'রে তুমি লও
স্বপ্ন ডালায় তব,
বিশ্বের চির-বিরহবাণীতে রচো তা'রে অভিনব।

মজিয়া আমার সহজিয়া সুরে চিরদিন ধরা দিলে মোরে,
জনমে জনমে আসিবে হৃদয়ে রাখিলাম সেই ঠাঁই ক'রে।
আশ্বিনে যেথা হঠাৎ হাওয়ায়
ছায়া-আলোকের তরণী বাওয়ায়
নবীন ধানের ক্ষেতে,
সেথায় শ্যামল কাঁপনে তোমার রাখিব আসন পেতে।

যেথা ঝলে তব যশের মুকুট, ভক্তেরা আসে ভিড় ক'রে,
মালা চন্দনে বন্দনা-গানে অঙ্গনতল যায় ভরে,
যেথায় তোমার উন্নত শির
উচ্চ আসনে অতি গম্ভীর—
সেথা মোরে নাহি পাবে,
আমি যুগে যুগে ডাকিব তোমায় ধূলার খেলার ভাবে॥

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

—

বর্ষপঞ্চক

১

পঞ্চ বর্ষ গত হলো। আলোড়িয়া মরুপথধূলি
সহসা অদৃশ্য হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
দৃষ্টির দিগন্তপারে, অনিশ্চিত বেদনার মাঝে
সমাপ্ত পূরবী যেথা নির্ব্বিকার অনুনাদে বাজে
স্মৃতির গন্তব্যহরা অসংহত রিক্ত সন্ধিক্ষণে।
একদা যে-পঞ্চবর্ষ অমিতির নিশ্চিহ্ন অয়নে
ব্যূহবদ্ধ শরীরের ঘনঘোর ছায়াপাত করি
দীপ্র ভবিতব্যতারে রেখেছিলো সম্পূর্ণ আবরি
আমার নয়ন হতে ; স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ব্যেপে
যে-মন্থর পঞ্চবর্ষ জগদ্দল প্রতি পদক্ষেপে
সুপ্রতিষ্ঠ শতাব্দীরে ক'রে যেতো হেলায় নিষ্পেষ,
সীমাশূন্য শূন্যতায় তারাও কি হলো নিরুদ্দেশ ?
অবিচ্ছিন্ন অবিরাম অচঞ্চল তাদের প্রগতি ,
আপাতনিশ্চলা যেন হিমনদী অন্তর্বেগবতী,
আচম্বিতে একদিন প্রলয়ের বিক্ষুব্ধ সম্পাতে
করে আত্মপ্রকটন। আজি নব বসন্তপ্রভাতে
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ তাহাদের স্থবির প্রয়াণ
মোর স্তব্ধ যৌবনেরে দিয়ে গেছে বিনষ্টির দান,
ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট নগ্ন নিঃস্ব বৈধব্য গোপন॥

ভেবেছিনু নাহি ত্বরা ; তোদের সাদর সম্ভাষণ
শুনিলে চলিবে পরে। ভেবেছিনু তোরা বর্ত্তমান,
রক্ষণশীলের শত্রু জয়দৃপ্ত, চির-আয়ুষ্মান,
নহিস ক্ষণের পান্থ ; তোদের ও-অচল গৌরব
ফুরালে, পাতিবো সখ্য ; এখন গতের পরাভব
উদ্ধত অসহযোগে নিতে হবে পরিশোধ ক'রে।
অতীতের ক্ষত দেহ ভাঙা বক্ষে তাই চেপে ধ'রে,
ফিরায়ে আনত পৃষ্ঠ বসেছিনু প্রস্তরের মতো
মুমূর্ষুর শুশ্রূষায়, নিয়েছিনু মৌনিতার ব্রত
অনম্র উপেক্ষা-ভরে। ভাবিনি যে, ভাবিনি সেদিন
লগ্ননিষ্ঠ গড্ডলিকা জিতশ্রম স্বচ্ছন্দবিহীন

গমনসর্ব্বস্ব তোরা ; অনন্তের পটে যেন আঁকা
অসীমের আজ্ঞাবহ মুক্তপক্ষ উদ্বাস্তু বলাকা
তোরা ক্ষিতিনিরপেক্ষ। বুঝি নাই সেইদিন মনে
জীবনের মায়াপুরে নিরুদ্ধ স্ফটিক বাতায়নে
সবাষ্প রঙীন শ্বাস তোরাও যে ব্যাহত কালের,
নিমেষে বিলুপ্ত হবি ; অচুম্বিতা কুমারীগালের
সন্ত্রস্ত লজ্জার রাগ প্রথম প্রগল্‌ভ নিমন্ত্রণে,
তোরাও বিলীন হবি সম্ভোগের সার্থক লগনে
পাণ্ডু শ্লথ তর্পণের নিরুপায় নির্ব্বীর্য্য ধিক্কারে
অকস্মাৎ। নিষ্করুণ মধ্যাহ্নের প্রখর প্রহারে
তোদের সন্তাপশুভ্র হৃদয়ের মুকুরফলকে
যে-ইন্দ্রধনুর কান্তি বিচ্ছুরিত বিচিত্র ঝলকে,
কে জানিতো সেইদিন, হবে তার আশু-পরিণাম
উন্মাদিনী বৈশাখীর প্রলয়দ নবঘনশ্যাম
তড়িৎতাড়িত মেঘে। কে জানিতো পাঁচটি বৎসর
কালগ্রাসী বিধাতার অলক্ষিত তুচ্ছ অবসর
প্রহরাপীড়িত আঁখি একবার পালটি লবার।
কে জানিতো সেইদিন, ভোগাসক্ত বিরহ আমার
বিলাসী অশ্রুর ধারা মুছিতে পাবেনা অবকাশ ;
করিতে নারিবে সাঙ্গ দীর্ণ দীর্ঘ একটি উচ্ছ্বাস
মুহূর্ত্তেক অবহেলি উর্দ্ধশ্বাস মিলন-উল্লোল ॥

২

আজি পুন প্রত্যাগত বসন্তের পুলকহিল্লোল
সগর্ব্বে প্রচার করে চেতনের মজ্জায় মজ্জায়
নব প্রতীক্ষার বার্ত্তা ; মাঙ্গলিক নূতন লজ্জায়
হোথা ওই শোকস্তব্ধ ভ্রান্তমতি উলঙ্গ বল্লরী
আস্বচ্ছ কপিশ বস্ত্র রিক্ত বক্ষে টানিছে শিহরি
আগন্তুক জ্যোতিষ্কের মুগ্ধ স্থির তপ্ত আঁখিপাতে ;
সংহতির চির-অরি যৌবনের দুর্ব্বার সঙ্ঘাতে
বিজড় প্রান্তর ওই অকস্মাৎ হয়েছে জাগ্রত
প্রাণের পরম স্পন্দে ; অভিশপ্তা অহল্যার মতো,
তরুণের পদস্পর্শে উজ্জীবিত শিলাস্তূপে আজি
অঙ্কুরিছে আচম্বিতে হর্ষোত্থিত নব রোমরাজি ;

কিছু না ভ্রূক্ষেপ ক'রে আত্মম্ভরী যুগের সারথি
অজ্ঞানগোচরগতি চ'লে গেছে যে-পথে সম্প্রতি
ঘর্ঘরিত রথচক্রে এঁকে দিয়ে গভীর লাঞ্ছন,
সে-পথের মর্ম্মক্ষত ফাল্গুনের লঘু বরিষণ
সস্নেহে দিয়েছে ধুয়ে। ভুলিবার এসেছে সময়।
প্রাচীন দৌর্ব্বল্য মোর কম্প লজ্জা ক্ষয় পরাজয়
হারায়ে আশ্রয়, যাক ঝরকে ঝরকে টুটে লুটে
সর্ব্বভুক্ রজনীর ব্যয়কুণ্ঠ রহস্যসম্পুটে,
বিস্মৃতির গুহাগর্ভে।

পশ্চিমের শ্মশান-অঙ্গনে
যে-চিতা নির্ব্বাণমুখ অনাঙ্গিক পঞ্চভূতসনে
মূর্ত্ত পঞ্চ বৎসরেরে একাকার করিয়া বিষাদে
স্তিমিত অরুণ তেজে এখনও জ্বলে ভস্মাচ্ছাদে,
সৃজনবেদনাস্ফীত পীত তার উর্ব্বর জরায়ু
আবার কি জন্ম দিবে ক্ষণস্থায়ী অথচ চিরায়ু
অক্ষয় ফিনিক্স্ সম অভিনব বৎসরপঞ্চকে ?
তাহারাও আসিবে কি বিজয়ের শূন্য প্রপঞ্চকে
অর্গলিত দুর্গ মম অবরোধ করিতে আবার ?
সঙ্কীর্ণ আকাশ মোর উদ্ভাসি সদর্পে পুনর্ব্বার
তাহাদের বৈজয়ন্তী আস্ফালিবে বহুবর্ণচ্ছটা ?
আসিবে কি পুনর্ব্বার স্বার্থসিদ্ধি, কুহকী কুলটা,
মিসর সাম্রাজ্ঞীসম বিলাসের অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
ভাঙিতে উদীর্ণ ব্রত ; তনিমার সলীল ভঙ্গীতে
আত্মদান-বিনিময়ে করিবে কি স্মিত অঙ্গীকার
সে-তপ্তকাঞ্চন দেহে নিমেষের মত্ত অধিকার ?
মনোজ্ঞ মৃত্যুরে পুন লয়ে তারা আসিবে কি সাথে
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যাম কান্তি, বাঁশের বাঁশরী বাঁকা হাতে
করুণ তরল হাসে নির্ব্বাণের নিঃশঙ্ক আশ্বাস ?
পথাশ্লিষ্ট-শূন্য-আঁখি, ক্ষিপ্র-পদ, সঘন-নিঃশ্বাস,
আসিবে দুরন্ত প্রেম, টঙ্কারিত কুসুম-কার্ম্মুকে
অলক্ষ্যসন্ধানী শর সংস্থাপিয়া চপল কৌতুকে
হানিতে নিখিলব্যাপী দুরারোগ্য দুর্ব্বিচার ক্ষত ?

৩

এ-জীষ্ণু সেনার পাছে, জানি জানি আজিকারি মতো,
ভ্রমিবে কবন্ধযূথ, অন্ধকার ত্রষ্ণু বিভীষিকা,
নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কালশেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিষ্কারণ অতৃপ্তিযন্ত্রণা,
ক্ষুব্ধ আত্মধিকারের ধূমাঙ্কিত খিন্ন তুষানল।
পলক ফেলার আগে এ-নবীন বিজেতার দল
পঞ্চ বৎসরের শেষে বিনাবাক্যে হবে অন্তর্দ্ধান
আসন্ন আঁধারে পুন। দুর্নিবার তাদের প্রয়াণ
সময়ে হবেনা লক্ষ্য। সেদিনেও অশ্রুনত চোখে
অচপল ব’সে রবো, অবলুপ্ত অতীতের শোকে
উপেক্ষিয়া স্থূলগন। তার পরে কেটে গেলে বেলা,
হঠাৎ পড়িবে মনে, করিয়াছি পুন অবহেলা
দ্বারাগত অতিথিরে। আরবার শিরে কর হানি,
অসম্পূর্ণ অভ্যর্থনা, অসমাপ্ত পরিচয়খানি
বেদনাবিলাসী বক্ষে বর্ম্মসম ধরিবো গৌরবে।
পুন মোর বন্ধ দ্বারে বসন্তের বৈতালিক যবে
উচ্চারিবে আবাহনী, নিবৃত্তির আত্মপরসাদে
রুদ্ধ ক’রে রবো শ্রুতি। সেদিনেও অন্ধ পরমাদে
ব্যর্থতারে শ্রেষ্ঠ ব’লে মনে মনে করিবো নিশ্চয়;
ভাবালু সঙ্গীতে পুন পরাস্তের দুর্জ্জেয় বিজয়
চাহিবো ঘোষিতে মর্ত্ত্যে; স্বেচ্ছাপঙ্গু ঘৃণ্য নিরাশারে
অসঙ্কোচে দিবো নতি; নিশ্চেষ্ট বাচাল অহঙ্কারে
কৃতীর পবিত্রাসনে করিবো ক্লীবের অভিষেক;
রত্নগর্ভা-প্রতি হানি বিষতিক্ত বিদ্রূপ শতেক
ভাবিবো মহৎ বুঝি নিরিন্দ্রিয় বন্ধ্যার সংযম;
ভবিষ্যের মৈত্রীবাহী অধুনা-দূতের সমাগম
হেলায় নিষ্ফল ক’রে, সহ্যশীল অদৃষ্টের পরে
অর্পিবো সমস্ত দোষ, রুদ্র যবে রুষ্ট মূর্ত্তি ধ’রে
হানিবে নিষ্ঠুর বজ্র।
এই ভাবে কেটে যাবে কাল।
জরান্ধ নির্ণয়হারা নিয়তির বাহুর আড়াল,

নির্ব্বল নির্ভরশীল নিরুপায় দুলালের মতো,
আমারে বেষ্টন করি দূরে দূরে রাখিবে নিয়ত,
পতন ও অভ্যুদয়ে যেই পন্থা হয়েছে বন্ধুর,
সে-পথের প্রান্ত হতে। গৃহকোণে ব্যর্থশ্রমাতুর,
ক্ষতির সহিত ক্ষতি, অপচয়-সনে অপচয়
যোগ দিতে দিতে মোর সুদীর্ঘ জীবন হবে ব্যয়
অখ্যাতির অবচ্ছায়ে। ঘটিবেনা কোনোখানে ত্রুটি।
বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাবাতে বিজ্ঞতার সতর্ক দেউটি
হবেনা নির্ব্বাণ কভু নপুংশের নির্ব্বিঘ্ন ভবনে।
যে-অতীত চুপে চুপে আয়ুটুকু কাটায়ে ভুবনে
অকীর্ত্তির অন্তরালে অবশেষে লভিছে বিশ্রাম,
নগণ্য দুষ্কৃতি যার অবজ্ঞেয় নশ্বর দুর্নাম
ঐতিহ্যের স্মৃতিস্তম্ভে কোনো কালে নাহি হবে লেখা
গভীর অক্ষরে, তারি নিভৃত পদের ভূগুরেখা
শুধু মোর হৃদয়ের ক্রুশুষ্ক ফলকে গোপন
হয়ে রবে সদা পূজ্য, হয়ে রবে চির চিরন্তন ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অনুবাদ

[শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় শেলির 'One word is too often profaned'-শীর্ষক কবিতার অনুবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে সংশোধনের জন্য পাঠান। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও পত্র প্রেরণ করেন তাহা মূল অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ

একটি কথা লোকে এত করে কলুষিত,
অমি তাহা করিব না আর ;
একটি অনুভূতি এত বৃথাই হেলিত,
তারে হেলা অযোগ্য তোমার ;
একটি আশা নিরাশার এ-হেন আত্মীয়,
বিবেচনা রোধে না ক তায় ;
তব অনুকম্পা মোর তারো চেয়ে প্রিয়,
প্রেম যদি দেয় অপরায়।

লোকে যারে প্রেম বলে নাহি দিব আমি ;
করিবেনা তুমি কি গ্রহণ
হৃদয়ের যে-অর্চ্চনা ঊর্দ্ধলোকগামী,
দেবতাও করেনা বর্জ্জন ;
দূর তারকার লাগি পতঙ্গের তৃষা,
ঊষা লাগি নিশার কামনা,
বেদনিত বিশ্ব হতে বহু দূরে মিশা
যে-মাধুরী তার আরাধনা ?

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও কবিতা

.........রেলগাড়িতে বসে নাড়া খেতে খেতে শেলির সেই তর্জ্জমাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করচি। তুমি যে লাইন কটি দিয়েছিলে তার উপর ভূমিকম্প হয়ে গেল—তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু তার ছন্দটির বহর খাটো বলে তার মধ্যে পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া গেল না। মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা

অনুরূপ হয়েচে। মূল কবিতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এটা যে তারা জলের মতো বুঝবে এমন আশা নেই, কিন্তু সে জন্যে আমি বা বাংলা ভাষাই যে একমাত্র দায়ী তা মান্‌তে পারিনে। বস্তুত প্রথম শ্লোকের শেষ দুটো লাইন ঠিক যেন জায়গা পায়নি—যেন আরেক জনের কেদারার হাতার উপরে বসেচে। —সময় আয়ত্তে নেই অতএব ইতি জুলাই ২০ (?) ১৯৩১।

একটি কথা বারেবারেই পেয়েছে লাঘবতা,
　　তাহারে লঘু করিবনাকো আর।
দিনে দিনেই সয়েছে হেলা একটি মনোব্যথা,
　　অবমাননা কোরোনা তুমি তার।
একটি আশা নৈরাশেরি নিকট আত্মীয়,
　　তারেও দলি' করিবে খান্ খান্?
তোমার অনুকম্পাটুকু যেমন মোর প্রিয়
　　তেমন নহে আর কাহারো দান॥

প্রেমের নামে লোকে যা দেয় দিব না তাহা আমি,
　　লবে না কিগো আমার নিবেদন—
নিম্ন হতে যে-অর্চ্চনা ঊর্দ্ধলোকগামী—
　　দেবতা যারে করেনা বর্জ্জন;
তারার লাগি পতঙ্গ যে-আশায় মরে ঘুরে,
　　ঊষার লাগি নিশার যে-সাধনা—
পীড়িত এই মর্ত্ত্য হতে যা আছে বহুদূরে
　　তাহারি লাগি যে-পূজা আরাধনা?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রির প্রতি

(শেলি হইতে)

১

অস্ত-সাগর পার হ'য়ে এস চপলপায়,
হে নিশীথিনী !
পূর্ব্ব-অচলে গুহা তব ঢাকা কুহেলিকায় ;
দীর্ঘ দিবস নির্জ্জনে সেথা, হে মায়াবিনী,
বুনিলে কি শুধু হর্ষ-ভীতির স্বপন-জাল ?
প্রিয় তুমি তাই, তাই তব রূপ এত করাল,
চল-চারিণী !

২

তারকা-দীপ্ত অম্বরে দেহ দিয়োগো ঢাকি,
মসী-বরণা !
ঘন কুন্তলে অন্ধ করিয়া দিনের আঁখি,
চুম্বনে তারে করিয়ো বিবশ, হত-চেতনা ;
যেয়ো তারপর ভূধর সাগর নগরী বন,
ঘুম-পাড়ানিয়া কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে সারা ভুবন,
চির-কামনা !

৩

উষার আলোকে না দেখি' তোমারে, দীর্ঘশ্বাস
বহিল মোর,
রবিকরাঘাতে টুটিল ধরার শিশির-বাস,
ফুলে পল্লবে মধ্যদিনের ঘনালো ঘোর,
ম্লান হোলো ক্রমে ক্লান্ত রবির প্রখর ভাস,
তবু কই, হায়, দিন না ফুরায় ! দীর্ঘশ্বাস
বহিল মোর ।

৪

তব সহোদর মরণ আসিয়া কহিল ডাকি',
"চাহ আমায় ?"
শয়ন-শিয়রে আসিল সুপ্তি ধূসর-আঁখি,
তোমারি দুলালী, মধ্যদিনের মধুপ-প্রায়,
মৃদু গুঞ্জনে প্রশ্ন করিল, "চাহ কি মোরে ?"
"তোমার পাশে কি হবে মোর ঠাঁই ?" কহিনু, "তোরে
চাইনা, হায় !"

৫

আসিবে মৃত্যু চিরতরে তুমি যাবে যখনি,
তড়িৎ-গতি ;
আসিবে সুপ্তি তুমি পলাতকা হ'লে, রজনী।
তাদের কারেও জানাবনা কভু মোর মিনতি !
শুধু তোমারেই করি নিবেদন বাসনা মম,
এস ত্বরা করি', এস মোর কাছে হে প্রিয়তম,
তূর্ণগতি।

বিস্মৃতি

(এ-ই হইতে)

তিমির-গহন শূন্যে মিলালো শৈল-শ্রেণী,
অন্ধ যামিনী দিশাহারা,—তার নাই যে আঁখি
আমারো নয়নে আঁধারের ঘোর ! কালের মসী
ঘন কালিমায় যুগ-যুগান্ত দিয়েছে ঢাকি'।

কে জানে কি ছিল সে-সব যুগের তিমির-মাঝে ?
সে কোন্ মাধুরী ? কোন্ সে কামনা দুর্নিবার ?
এই জানি শুধু, সমাধি তাদের ঐ সুদূর
বেদনা-বহ্নি-দীপ্ত অস্ত-সাগর পার ॥

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কলহ

(একটী অজ্ঞাত ইংরেজ কবির ছায়াবলম্বনে)

আধো-ফোটা কুঁড়ি আর একগাছি
ফোটা গোলাপের হার,
প্রেমিক প্রেমিকা করে কোলাহল
কোন্‌টি হইবে কার।
হাসিল প্রেমিক, রাঙিল প্রেমিকা,
কথা হল শত বার ;
স্থির নাহি হয় কে লবে কুঁড়িটি,
কে লইবে ফুলহার।
অধরে অধরে হইল সন্ধি,
মিটিল কলহ তবে—
গোলাপের হার পাইবে প্রেমিক,
প্রেমিকা কুঁড়িটি লবে।
ধীরে ধীরে হল সুখনিশি ভোর
সুনিবিড় বাহুপাশে।
গোলাপের মালা ঝরেছে কখন,
ফুল হয়ে কুঁড়ি হাসে॥

অশেষ

(শেলি হইতে)

কথা সুমধুর থেমে যায় যবে
সুর কেঁপে ফিরে মনে,
বকুলের মালা শুকালে গন্ধ
শিহরে মরমকোণে ;
গোলাপ মরিলে গোলাপেরি পাতে
বাসর সাজান হবে,
দয়িত পলালে, তারি স্মৃতি পরে
প্রণয় ঘুমায়ে রবে॥

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

উত্তুঙ্গ

(বোদলেয়র হইতে)

অতিক্রমি' হ্রদহ্রদি, অধিত্যকা, কান্তার, কানন,
দুস্তর কন্দর, গিরি, নদ, নদী, জলধি, জলদ,
উত্তীর্ণ হইয়া রবিশশীকক্ষ, দূর জ্যোতিষ্পথ,
তারাস্তৃত অগণন মণ্ডলেরে করিয়া লঙ্ঘন,

ধাও প্রাণ চির-অভিসারী ! বেগে তরঙ্গে তরঙ্গে—
চলোর্ম্মি-বিহারী যথা ধায় স্রোতে পুলকমূর্চ্ছিত ;
সীমাহারা শূন্যতার বক্ষ চিরি' ধাও উল্লসিত
অবর্ণ্য পৌরুষ-দর্পে—ঊর্দ্ধায়িত বিলাস-বিভঙ্গে

হইতে বিধৌতগ্লানি শুভ্রতর সমীরণধারে—,
বসুধার বিষবাষ্পে আজি প্রাণ ! দাও হে বিদায় ;
যেই উদ্ভাসিত হুতাশন স্বচ্ছ ব্যোমব্যাপ্তি ছায়
পূত দিব্য সুধাসম—কর পান সে দীপ্ত আসারে।

অতৃপ্তির অন্তরালে, লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণামলিন,
ভারাক্রান্ত মুহ্যমান মেঘাচ্ছন্ন জীবনের পারে
শান্তোজ্জ্বল সৌম্যলোক ভায় ; সুখী সেই যে বিস্তারে
তেজস্বান্ প্রাণপক্ষ সে-নির্জ্জর লোকে অনুদিন।

সুখী সেই—মুক্ত বিহঙ্গমসম লক্ষ্যি নীলাম্বর
নির্ব্বারিত চিন্তা যার ধায় নিত্য ঊষসীসঙ্গমে,
সঞ্চরি' জীবন-ঊর্দ্ধে—শুনে নিত্য সহজ মরমে
কুসুমের মূকভাষা, নিখিলের গূঢ় মৌন স্বর ॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুস্তক-পরিচয়

"লঘু-গুরু"—প্রণেতা শ্রীজগদীশ গুপ্ত, প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়, নাথ ব্রাদার্স, ২৩-সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, পৃষ্ঠা ১৫৬, দেড় টাকা।

যে-বই পড়ার জবাবদীহি আছে সে-বই পড়তে সহজে রাজি হইনে। আমার বয়সে কর্ত্তব্যের চেয়ে অবকাশের মূল্য অনেক বেশি। বিশেষত যে-কর্ত্তব্য আমার অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে।

তবু লেখকের অনুরোধ রক্ষা করেচি, তাঁর "লঘু-গুরু" বইখানি পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে এ কথা পূর্ব্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েচি।

লেখবার ক্ষমতা আছে বললে বোঝায়, লেখক যেটা লেখেন সেটাকে পাঠ্য করে তুলতে পারেন, সেটা পথ্য না হলেও। সাহিত্য-সম্পর্কে পথ্য কথাটা বলতে এ বোঝায় না যে, জ্ঞানের দিক থেকে সেটা পুষ্টিকর, বা নীতির দিক থেকে সেটা স্বাস্থ্যজনক। যেটাকে মন সম্পূর্ণ সায় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে সেটাই পথ্য। মন যেটাকে বিশ্বাস করতে পারে সেটাকেই গ্রহণ করে। এস্থলে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিললে তো কোনো কথাই নেই, নইলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দরকার। সে-প্রমাণ মিথ্যে সাক্ষ্যের মতো বানিয়ে তোলা হলেও চলে কিন্তু তাতে সত্যের স্বাদ থাকা চাই। সাহিত্যিক এই ব'লে হলফ করে, আমার কথা যতই মিথ্যা হোক্ তবু সেটা সত্য।

লঘু-গুরু গল্প-সম্বন্ধে যদি জজিয়তী করতেই হয় তাহলে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে-লোকযাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয় তবু আমি নাচার। বলে রাখচি এ-দেশে লোকালয়ের যে-চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল কাটালুম এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়, দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেচেন।

আমার এই সন্দেহের কারণ হচ্চে এই যে, লেখক আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য দাখিল করেচেন কিন্তু তার যথেষ্ট সমর্থনের জোগাড় করতে পারেননি। যেটা দেখাতে চেয়েচেন, তিনি নিজে তার সবটাই যে দেখেচেন এমন লক্ষণ অন্তত লেখা থেকে পাওয়া যাচ্চে না।

গল্পের প্রথম নায়ক বিশ্বম্ভর তার ভগিনীপতি লালমোহনকে নিয়ে দেখা দিলে। লেখকের কাছ থেকে কোনো একটা বিশেষ অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে আসে নি। তার থেকে ঠিক করে নিলুম আমাদের দেশে সচরাচর যাদের ভদ্রলোক ব'লে থাকে, দেখা হলেই যাদের ব'লে থাকি, এই যে মশায়, ভালো আছেন তো, এও তাদেরই দলের। অতএব চৌকিটা এগিয়ে দেবার পূর্ব্বে প্রশ্ন করবার দরকার নেই।

আরো খানিকটা গিয়ে যে পরিচয়টুকু পেলুম তাতে জানা গেল, মদের আসরের উপকরণ জোগাতে আলস্য করেছিল ব'লে বিশ্বম্ভর তাড়া করাতে তার অসুস্থ গর্ভিনী স্ত্রী পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাতে মারা যায়। যাদের আমরা চৌকি এগিয়ে দিই তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ করেচে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

অতএব বিশ্বম্ভরকে ভদ্দর শ্রেণীর লোক ব'লে মেনে নিতে এখনো সন্দেহের কারণ ঘটল না।

তারপরে হঠাৎ শুনি বিশ্বম্ভর খেয়া পার হবার সময় "উত্তম" নামধারিনী এক বেশ্যাকে দেখে মুগ্ধ হোলো। এটাও ভদ্দর লোকের লক্ষণে বাধে না। কিন্তু বেশ্যাকে যখন নিজের শিশু মেয়ের বিমাতা পরিচয় দিয়ে ঘরে তুলে নিলে এবং পাড়ার মেয়েরা প্রথমটা ছি ছি করেও অবশেষে একদিন সয়ে গেল তখন মনে ভাবনা এল এই যে, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ অপরাধ ভদ্দরলোকের পক্ষে মার্জ্জনীয় বটে তবু বেশ্যাবিবাহের মতো সমাজবিরুদ্ধ অপরাধ তো তেমন চুপেচাপে সমাজে পার হয় না। তখন মনে হোলো, যে, নায়কের যে-পরিচয়ে এটা সম্ভব মনে হতে পারত গল্পের গোড়া থেকেই সেই বিশেষ পরিচয়টা সাজিয়ে রাখা উচিত ছিল। সেটা না হওয়াতে মানুষটার প্রতি নেহাৎ অবিচার করা হয়েচে। হয় তো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে লোকটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য—তবু আমরা যে ওকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারলুম বিশ্বম্ভরের দোহাই মেনে সেই তার প্রতি সন্দেহের সম্ভাবনাটুকু চুকিয়ে রাখা উচিত ছিল।

তার পরে ভাবে ভঙ্গীতে বোধ হচ্চে এককালে উত্তমের সমাজ বিশ্বম্ভরের সমাজের চেয়ে শিক্ষায় আচরণে উপরের স্তরেই ছিল। সেটাও লেখকের জবানবন্দীর উপর বিশ্বাস করে ধরে নিতে হয়। উত্তমের এইদিককার ছবিটা একেবারে বাদ দিয়েই সুরু করা হয়েচে। উত্তম যদি সাধারণ বেশ্যার মতোই হত তাহলে পাঠকের কল্পনার উপরে বরাৎ দিয়ে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখলে কোনো অসুবিধা ঘটত না। কোনো এককালে তার পতন হয়েছে ব'লেই যে সে মেয়ে একেবারে নষ্ট হবে এমন কথা নেই, কিন্তু সেটা প্রমাণের দায় লেখকের পরে। অর্থাৎ পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে, পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এই তত্ত্বটাকে একটা চমক-লাগানো অলঙ্কারের মতোই ব্যবহার করা হয়েচে। সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণবাহুল্যে অতিমাত্র রাঙিয়ে তোলায় যত বড়ো অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে তাকে সেন্টিমেণ্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা তার চেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়ালিজ্‌মের নাম দিয়ে একালের সৌখীন আধুনিকতাকে খুসি করা অত্যন্ত সহজ। যেটা সহজ সেইতো আর্টের বিপদ ঘটায়। দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্রয় দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ এই জন্যেই দেশাভিমানী কাব্যে গল্পে আর্ট জিনিষটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে। দুঃখে অপমানে উত্তমের প্রায়শ্চিত্তই এই আখ্যানের প্রধান বস্তু এইজন্যেই উত্তমের চরিত্রকে সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। বেশ্যাবৃত্তিতে যে-মেয়ে অভ্যস্ত সেও একদা যে-কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্‌গৃহিণীর জায়গা নিতে পারে এই কথাটাকে স্বীকার করিয়ে নেবার ভার লেখক নিয়েচেন, কিন্তু ধরেই নিয়েচেন আমরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করব। তারো কারণ আধুনিক রিয়ালিজ্‌মের সেন্টিমেণ্টালিটিতে এই কথাটির বাজার দাম বাঁধা হয়ে গেছে।

এই গল্পে দুইজন পুরুষ নায়ক, বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ। একজন স্বভাবসিদ্ধ ইতর, আর একজন কোমর-বাঁধা সয়তান। বিশ্বম্ভরের ছবিটা ইতরতার নোংরারঙে বেশ মূর্ত্তিমান। মানুষটি অকৃত্রিম ছোটো লোক, সম্পূর্ণ অসঙ্কুচিত। ইতরতা পদার্থটা সংসারে সুলভ, তার নানা পরিচয় নানাবেশে নানাভাবে চারিদিকেই দেখা যায় কিন্তু

খাঁটি সয়তানী এত সামান্য নয়, খাঁটি সাধুতার মতোই সে দুষ্প্রাপ্য। সয়তানীর পাঁচফোড়নে সাঁৎলিয়ে তৈরি মানুষ হাজার হাজার আছে কিন্তু হাড়ে মাসে ষোলো আনা সয়তানীতে যাদের ক্ষণজন্মা বল্‌লেই হয় ভাগ্যক্রমে পথেঘাটে তাদের দর্শন মেলে না। অতএব তাদের বিশ্বাসযোগ্য ছবি বিশেষ যত্ন করে না আঁকলে বাস্তবতার তৃপ্তি পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভরের পালার পটপরিবর্ত্তনের পরেই এল পরিতোষ, যে-উত্তম অন্তরে সাধ্বী বাহিরে অসতী যেন তাকেই শাস্তি দেবার জন্যে ধর্ম্মরাজ ঐ জীবটিকে টাট্‌কা বানিয়ে পাঠিয়েচেন, শাস্তির প্যাঁচকলে একটা পাকের পরে আরো একটা পাক দেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের দলিল চাই। একথা কেউ যেন মনে না করে যে রবিবাসরিক খৃষ্টান স্কুলের হেড মাষ্টার লোকশিক্ষার জন্যে ওকে জুজু সাজিয়ে পাঠিয়েচেন।

যাই হোক্ একথা মানতে হবে রচনা-নৈপুণ্য লেখকের আছে। আধুনিক আসরে রিয়ালিজ্‌মের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন যদি তাঁকে পেয়ে বসে তবে তাঁর ক্ষতি হবে। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে বাস্তব-প্রবণতা বা ভাবপ্রবণতা নিয়ে জাতি-ভেদের মামলা তোলা প্রায় আধুনিক কম্যুনালিজ্‌মের মতোই দাঁড়িয়েচে। অথচ সাহিত্যে ওর মধ্যে কোনোটারই জাতিগত বিশেষ মর্য্যাদা নেই। সাহিত্যে সম্মানের অধিকার বহির্নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়, অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে। অর্থাৎ পৈতে নিয়ে নয়, গুণ নিয়ে। আধুনিক একদল লেখক পণ করেচেন তাঁরা পুরাতনের অনুবৃত্তি করবেন না। কোনোকালেই অনুবৃত্তি করাটা ভালো নয় একথা মানতেই হবে। নবসংহিতাসম্মত ফোঁটা-তিলককাটা আধুনিকতাও গতানুগতিক হ'য়ে ওঠে। সেটার অনুবৃত্তিও দুর্ব্বলতা। চন্দনের তিলক যখন চল্‌তি ছিল তখন অধিকাংশ লেখা চন্দনেরি তিলকধারী হ'য়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্য-সমাজে চল্‌তি হ'য়ে ওঠে তাহলে পঙ্কের বাজারও দেখ্‌তে দেখ্‌তে চড়ে যায়। বঙ্গবিভাগের সময় দেশী চিনির চাহিদা বেড়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে বিদেশী চিনিকে মাটি মিশিয়ে দেশী করা সহজ। আগুন জ্বালিয়ে রসে পাক দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা রসিকেরা মাটির রং দেখ্‌লেই অভিভূত হবে। সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়ালিজ্‌মের রং ধরবে এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি। মানুষের এমন সব প্রবৃত্তি আছে যার উত্তেজনার জন্যে গুণপনার দরকার করে না। অত্যন্ত সহজ ব'লেই মানুষ সেগুলোকে নানা শিক্ষায় অভ্যাসে লজ্জায় সঙ্কোচে সরিয়ে রেখে দিতে চায়, নইলে বিনা-চাষেই যে-সব আগাছা ক্ষেত ছেয়ে ফেলতে পারে তাদের মতোই এরা মানুষের দুর্মূল্য ফসলকে চেপে দিয়ে জীবনকে জঙ্গল করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের বহুযুগের। কিন্তু সাহিত্য বিচারে এ-সম্বন্ধে নৈতিক ক্ষতির কথা তুলতে চাইনে। আমার বলবার কথা এই যে, যে-সকল তাড়ী-খানায় সাহিত্যকে শস্তা ক'রে তোলে, রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে তার ব্যবসা চালানো কল্পনার দুর্ব্বলতা ঘটাবে। এ-রকম শস্তা মাদকতা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েচে, সমাজেও। আজকের য়ুরোপ তার প্রমাণ। সেখানে অন্য যুগেও ক্ষণে ক্ষণে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিদ্যাসুন্দর ও সেই জাতের সাহিত্য এককালে বাংলা দেশে প্রচুর বাহবা পেয়েছিল। তখনকার বাবুয়ানাও ছিল ঐ ছাঁদের, নাগরিকতা যাকে বলা হত তার ইংরেজি প্রতিশব্দ সিটিজ্‌নশিপ্ নয়। হুতুম প্যাঁচার নক্সায়

তখনকার আবহাওয়ার একটা আমেজ পাওয়া যায়। একটা বাঁধন-ছেঁড়া মাতামাতি, তার মধ্যে বৈদগ্ধ্য ছিল না, কেবলমাত্র ছিল বেআব্রুতা। কিন্তু তবু সেটা টিঁকল না। সেই নব কলিকাতার নবীন যুগের কাদা-গোলা জলে সাহিত্যিক হোলিখেলা দেখতে দেখতে সরে পড়ল। তার কারণ, ফ্যাশানের চড়ি-মন্দির উপরেও যে-একটা নিত্যরসের পসরা আছে, বাজারদর যতই বাঁক ফিরিয়ে চলুক, তারই আমদানী হয় বারে বারে ফিরে ফিরে, বস্তুত সেই হচ্চে নিত্য আধুনিকের সামগ্রী। আজ এই কথাটাকে অবজ্ঞা করা সহজ কিন্তু কালকের দিন আজকের দিনের এক প্রহরের পায়ের তলায় কাদা-চাপা পড়েনি।

একটা কথা বলা উচিত, প্রসঙ্গ ক্রমে রিয়ালিজ্‌ম্ নিয়ে যে-কথাটা উঠে পড়ল তার সমস্তটা "লঘু-গুরু" বইটি-সম্বন্ধে খাটে না। এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই। পূর্ব্বেই বলেচি যে, গল্পের চেহারাটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্চে না এইটেতেই আমার আপত্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—(বৈদিক ও লৌকিক)—শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক, বি-এল্। প্রকাশক—দি বুক্ কোম্পানী লিমিটেড, ৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৪২২। মূল্য ৩৲ টাকা।

সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে ঐতিহাসিক দৃষ্টির যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা শিক্ষিতমাত্রেই ভালরূপে জানেন। কিন্তু ভারতের এমনি দুর্ভাগ্য যে সংস্কৃত-সাহিত্যের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস অদ্যাপি রচিত হয় নাই। এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ এই যে, সংস্কৃতসাহিত্যের গ্রন্থকারগণ প্রায়ই আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। সে জন্য তাঁহারা অনেক স্থলেই আত্মপরিচয় গোপন রাখিতেন। ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য শিলালিপি, তাম্রশাসন ও কোন কোন গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ উপাদান সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস যে গঠিত হইতে পারে না তাহা নহে। তবে এ কার্য্য বহুসময়সাপেক্ষ ও বহু লোকের সমবেত চেষ্টার ফলে সম্পন্ন হইতে পারে। অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রায় এক শতাব্দীর উপর পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের একটী সুসম্বদ্ধ ইতিহাস খাড়া করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা যে নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, বৈদেশিকগণ বিদেশীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে বসিলে অনেক সময়েই সে সাহিত্যের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা ও উপযুক্ত সহানুভূতির ভাব দেখাইতে পারেন না। এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভাষায় যতগুলি সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলগুলিতেই এ অভাব লক্ষিত হয়। অথচ দেশীয় লোকের লিখিত একখানি নিরপেক্ষ সমালোচনাপূর্ণ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। জাহ্নবীবাবুর বইখানিতে এ অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জাহ্নবীবাবুর বইএর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। দ্বিতীয় বিশেষত্ব তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা। অবশ্য তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিতই যে আমরা একমত, এমন কথা বলিতে পারি না। ভট্টিকাব্যের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "বল্লভীপুরী ধ্বংসের পূর্ব্বেই যে উহা বল্লভীনগরীতে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লভীপুরীর ধ্বংস ৫২৩ খৃষ্টাব্দে হয়।" তাহাই যদি হইল, তবে,—"এরূপ অবস্থায় ভট্টিকে দ্বিতীয় শ্রীধরের সময়ের (৫৭১-৫৮৯ খৃ:) পরে স্থাপন যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না"—এ সিদ্ধান্তটী সম্পূর্ণ অবান্তর বলিয়া মনে হয়। (পৃঃ ১৭২-৭৩)। আবার, সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকারচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, "তিনি বালকদিগের বোধসৌকর্য্যে ইহার একখানি সরল বালমনোরমা নামক টীকা ও প্রৌঢ়মনোরমা নামক একখানি বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করেন।" (পৃঃ ৩৪৩) প্রৌঢ়-মনোরমা ভট্টোজির রচিত হইলেও বালমনোরমা তাঁহার লিখিত নয়। উহা বাসুদেব দীক্ষিতের রচনা। আবার ২৬২ পৃষ্ঠায় জাহ্নবীবাবু বলিয়াছেন, "দণ্ডী দশকুমার চরিতে 'ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপম্' এই বাক্যদ্বারা স্পষ্টরূপে উদ্দ্যোতকরের উল্লেখ করিয়াছেন।" উক্ত বাক্যটী সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তাতেই আছে বলিয়া আমরা জানি। তিনি নিজেও ১৯১ পৃষ্ঠায় ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

তবে এ সকল অতি সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যুক্তি-গুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করিয়া আপনার স্বাধীন মতের পরিচয় দিয়াছেন, এইটুকুই প্রশংসনীয়।

পুস্তকখানি এক হিসাবে প্রায় সম্পূর্ণ। প্রথমে ৯৯ পৃষ্ঠায় বৈদিকসাহিত্যের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় খণ্ডে—ক্রমশঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, গদ্যকাব্য, নাট্যসাহিত্য, তন্ত্র ও দর্শন সম্প্রদায়গুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে Scientific Literature অর্থাৎ স্মৃতি, ব্যাকরণ, গণিত, বৈদ্যক, সঙ্গীত, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার মত বহু উপকরণ সংগৃহীত আছে। এ অংশটীকে ঠিক ইতিহাস বলা যায় না, ইহা অনেকটা পুস্তক তালিকার মত। পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার একটু বিস্তৃতি করিতে পারিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Son of Woman : The Story of D. H. Lawrence by JOHN MIDDLETON MURRAY (Jonathan Cape).

মিড্‌লটন্ মারির সঙ্গে পরলোকগত ডি, এচ, লরেন্সের বন্ধুত্ব ছিল। এই পরিচয়ের ফলে লরেন্স্-সম্বন্ধে কবিতা, উপন্যাস ও সমালোচনা-লেখক মারির লেখা মূল্যবান হওয়াই উচিত। এ বইয়ে বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সাহিত্যিক সমালোচনা করা মারির উদ্দেশ্য নয়। সে আশা করাই অন্যায়। মারি ব'লেই দিয়েছেন যে তিনি মুখ্যত লরেন্সের রচনাবলী থেকে ও তদুপরি তাঁর ব্যক্তিগত

পরিচয়ের সাহায্যে লরেন্সের জীবনী লিখেছেন। এ জীবনীতে অবশ্য শুধু লরেন্সের জীবনের সেইটুকু আছে, যা জানলে তাঁর রচনার ও জীবনের সার্থকতা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়, যেমন হয় মাইকেলের কবিতা তাঁর জীবন জানলে।

একথা স্বীকার্য্য যে লরেন্সই একমাত্র আধুনিক লেখক যিনি এত গভীরচিত্তে জীবনের অসম্পূর্ণতার ও ব্যর্থতার সমাধান করতে চেয়েছেন। এবং লরেন্সের নিছক শিল্পশক্তির চেয়ে তাঁর এই একাগ্র অন্বেষণ ও গভীরতা বা passionই আমাদের বেশী বিচলিত করে। এই আবেগের সূত্র, এই অন্বেষণের প্রয়োজন লরেন্সের জীবনে ছিল। সেই জীবনের নাটকীয় গল্পটা মারি আমাদের বল্‌তে বসেছেন।

৩৮৯ পৃষ্ঠার বইয়ের সারমর্ম্ম দেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, লরেন্সকে নিয়ে লেখা বাংলা ভাষায় নিরাপদ নয়। মোটামুটি যে তথ্য আমরা লরেন্সের গ্রন্থাবলী পড়ে জানতে পারি ও যে তথ্য মারি সবিস্তারে প্রকাশ করেছেন, এক কথায় সে তথ্য হচ্ছে, বৃদ্ধ টলষ্টয়ের মতো লরেন্সের মধ্যে দুটী বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব তাঁকে প্রায় উন্মাদ ক'রে দিয়েছিল। লরেন্সের হওয়া উচিত ছিল The man who had died কিন্তু তা না হয়ে তিনি রয়ে গেলেন Lady Chatterley's Lover ও খৃষ্টের তিক্ত শত্রু। উজ্জীবন তাঁর আর হল না, লরেন্স র'য়ে গেলেন crucified into sex। লরেন্সের মধ্যে জিসাসের ও জুডাসের বিরোধ আজীবন চলেছিল। এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ, তাই তাঁর জীবনের এই গতি মানবসমাজের কাছে মূল্যবান।

লরেন্সের ট্রাজেডির প্রথম ও প্রধান কারণ হলেন তাঁর মা—Son of Woman নামকরণ তাঁরই জন্য। কয়লাখনির মজুরের স্ত্রী, মাতাল অসভ্য স্বামীর চেয়ে শিক্ষিত ও স্বামীর সম্বন্ধে হতাশ, তিক্ত। লরেন্সের অনাকাঙ্ক্ষিত জন্মের পরে লরেন্সের প্রতিই তাঁর অতৃপ্ত হৃদয়ের ভালোবাসা পড়ল। লরেন্স তাঁর মায়ের হৃদয়-জীবনের কেন্দ্র হলেন। এর ফলে কি হ'ল, তা Sons and Lovers, Fantasia of the Unconscious ইত্যাদিতে লরেন্স নিজেই আভাস দিয়েছেন ঃ

"The unhappy woman beats about for her insatiable satisfaction, seeking whom she may devour. And usually, she turns to her child. Here she provokes what she wants . . . . . . But as a matter of fact, a man never leaves his first love, once the love is established. He may leave his first attempt at love. Once a man establishes a full dynamic communication at the deeper and the higher centres, with a woman, this can never be broken . . . . what is he actually to do with his sensual, sexual self? Bury it? Or make an effort with a stranger? For he is taught, even by his own mother, that his manhood must not forego sex. Yet he is linked up with ideal love already, the best he will ever know." "A man finds it impossible to realise himself in marriage. He recognises the fact that his emotional, even passional, regard for his mother is deeper than it ever could be for a wife. This makes him unhappy, for he knows that passional communion is not complete unless it be also sexual. He has a body of sexual passion which he cannot transfer to a wife. He has a profound love for his mother. Shut in between the walls of tortured and increasing passion, he must find some way of escape or fall down the pit of insanity or death." ইত্যাদি।

এই Son and Lover-এর অন্তর্বিরোধ লরেন্স্‌কে সারা জীবন ভুগিয়েছে। আসলে প্রেমের ব্যাপারে তাঁর মন ছিল শিশুর মতো। কিন্তু আহত পৌরুষবোধ তাঁকে বরাবর করতে চেয়েছে সবল দৃঢ় বর্ব্বর পুরুষ, the dominant male। কিন্তু নারীকে যে fulfilment দেওয়া dominant male-এর কর্ত্তব্য সে ক্ষমতা লরেন্সের ছিল না। তাঁর অন্তর্বিরোধ এর একটী কারণ। আর একটী কারণ লরেন্সের মধ্যে dominant male-এর স্বাভাবিক প্রবল যৌনপ্রবৃত্তির অভাব ও তাঁর সন্তানহীনতা। মারি সেইজন্য তাঁর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন The Sexual Failure। এর পরেও লরেন্সের মুক্তির উপায় ছিল। তখনও তিনি মারি-অনুমোদিত খৃষ্টমার্গ নিতে পারতেন। কিন্তু চরিত্রই ভাগ্য। ব্যর্থ পৌরুষের আঘাতে লরেন্সের ধারণা হয়েছিল যে Spirit ও Flesh-এর মধ্যে দেহের সার্থকতাই বেশী এবং দেহধর্ম্মকে অস্বীকার ক'রে খৃষ্ট ফাঁকি দিয়েছেন। কাজেই লরেন্সের যাত্রা চল্‌ল ইন্দ্রিয়ের নিরানন্দ বন্ধুর পথেই—যে পথে পাওয়া যায় Women in Love এবং যে পথের শেষ বুকচাপা স্বপ্নের মতোই কষ্টকর, ভয়ানক।

এই সময় থেকেই লরেন্সের ভাঙন ধরা আরম্ভ হ'ল। তিনি হলেন পলাতক—উপলব্ধি-প্রাপ্তির আশায় সংসারত্যাগী শ্রীচৈতন্য নয়; ব্যর্থ, হতাশ পলাতক। কিন্তু যে 'হোলি গোষ্ট্' তাঁকে সভ্য য়ূরোপে শান্তি দেয় নি, সেই মানবাত্মাই অন্যত্র মনোমতো নূতন সমাজ-গঠনে তাঁর প্রতিবন্ধক হ'ল। সিসিলি, সার্দিনিয়া, এমেরিকা, মেক্সিকো, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া বৃথাই ঘোরা হ'ল। সিসিলিয়ান বা আজটেক্ কেউই তাঁর half-brother হ'ল না। শরীর-সর্ব্বস্ব আদিম জীবন-কল্পনাতেই রয়ে গেল। নিঃসন্তান নারীবিতৃষ্ণ লরেন্স্ নিজহাতে মানুষ করবার জন্যে কাউকে জোটাতে পারলেন না —Aaron's Rod-এ যার কল্পিত (ও কিছু বিকৃত) কাহিনী আছে। (প্রসঙ্গত, মারির একটী লাইন উদ্ধৃত করা গেল—He avoided India, for India might have understood him too well ; but he touched at Ceylon···)

মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত, মারির মতে যা ছিল লরেন্সের স্বধর্ম্ম, সে স্বধর্ম্ম লরেন্স স্বীকার করেন নি। এবং ট্রাজেডি তাঁর এই যে তাঁর স্বভাবের ভিতরেই এই স্বধর্ম্ম-পালনের বাধা ছিল। আর যদিচ লরেন্স্ ছিলেন যাকে বলে ম্যান্ অফ্ জিনিয়াস্ এবং তাঁর স্বভাবে ছিল গভীর আবেগশক্তি ও অনুকম্পন, এই বাধা তাঁর পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনকে রসহীন ও কঠিন ক'রে দিয়েছিল।

লরেন্স্ নীলকণ্ঠ ছিলেন না সত্য ; কিন্তু He lived through this experience for us : we owe him homage।

কথা উঠ্‌তে পারে লরেন্সের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? এর উত্তরে কাগজ ও সময় বেশী লাগবে। কিন্তু একথা বলা যেতে পারে যে লরেন্সের সমস্যা মানুষেরই সমস্যা, অতিসভ্য সহৃদয় বুদ্ধিমান মানুষের সমস্যা। লরেন্সের জীবনে এইসব সমস্যা বিশেষ রূপ ধরেছে, তার কারণ অবশ্য তাঁর প্রতিভা ও অবস্থাচক্র। কিন্তু আসলে সমস্যাগুলির কিছু না কিছু আমাদের জীবনেও আছে।

তা ছাড়া, যে জগতে এখনও বার্ণার্ড শ, চেষ্টার্টন্ রাজত্ব করছেন, সে জগতে গভীরচিত্ত, গভীরতাবাদী, চৈতন্যবাদী লরেন্সের সার্থকতা প্রচুর। সে সার্থকতা যাঁরা অন্তত Fantasia পড়েছেন, তাঁরা মানবেন।

মারি এই বইয়ে সেই সার্থকতার পরিচয় দেবার প্রথম চেষ্টা করেছেন। মারির মূল বক্তব্য হচ্ছে লরেন্সের এই ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়া। এই পরিচয়ে আমাদের আস্থা হয়। তার কারণ, এ Son of Woman-এর প্রকৃতির আভাস অস্পষ্টভাবে আমাদের মনে ছিল—সাহস ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে স্পষ্টতা পায় নি। মারি সে অভাব পূরণ করেছেন। এবং তাঁর অস্পষ্ট ভগবৎক্ষিপ্ততা ও স্পষ্ট জার্ণালিষ্টিক্ হিষ্টিরিয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আর তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল না হ'লে মনে রাখা উচিৎ যে সে দায়িত্ব মারির চেয়ে লরেন্সের ভাগ্যবিধাতারই হয়ত বেশী।

শ্রীবিষ্ণু দে

The Collected Poems of Edith Sitwell (Duckworth).
The Collected Poems of Robert Frost (Longmans).

শুনেছি ভালেরির মতে আধুনিক জগতে নাকি সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। কথাটা প্রথমে হেঁয়ালি ব'লে ঠেকলেও, একটু ভাবলেই দেখা যাবে ওটা ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের বিখ্যাত উক্তিরই প্রতিধ্বনি। সজ্ঘর্ষের প্রথম প্রতিক্রিয়া চীৎকার, এই চীৎকারকে শ্রুতিমধুর করতে হ'লে অনেকখানি স'রে যাওয়া অনিবার্য্য। সুদূর থেকে রেলগাড়ির বজ্রনির্ঘোষেও যে স্বরসঙ্গতির অভাব ঘটে না, সে-অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। শ্রীমতী ইডিথ্‌ সিট্‌ওয়েলের অত্যুগ্র আধুনিকতা এই প্রাচীন প্রবাদটিকে প্রত্যাখ্যান করলেও, তাঁর ভূচর কবিতাবলী এই বৈজ্ঞানিক নিয়মটিকে লঙ্ঘন করতে অক্ষম। ফলে পৌনে তিন শ পাতা ব্যাপী কাব্যসমষ্টির ভিতরে পাঠকের উৎকর্ণ মন শুধু সেই কবিতাগুলির সান্নিধ্য সইতে পারে, যেগুলির প্রবর্ত্তনায় বর্ত্তমানের যন্ত্রঝঙ্কনা নেই, আছে কেবল অতীতের মন্ত্রমূর্চ্ছনা। শুধু অতীত জীবনকে অবলম্বন ক'রে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌ যদি কবিতা লিখতেন তাহলে তাঁর কাব্যের পরিসর অবশ্যই সঙ্কীর্ণ হতো। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার কোনো স্বভাবগত দোষ নেই, স্বল্পতা বরং অনেক ক্ষেত্রেই গুণ। আয়তন ক্ষুদ্র হ'লে উপাদনকে আয়ত্তে আনা সহজ; এবং কলাবিচারে সম্পূর্ণতাই যেহেতু একমাত্র মানদণ্ড, তাই কাব্যের ভূগোলেও চীনের মতো অসীম অরাজকতায় অন্যতম দিক্‌পাল হওয়ার চেয়ে জাপানের মতো সূচ্যগ্র ভূমির একচ্ছত্র অধিপতি হওয়াই শ্রেয়ঃ। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌ ইতিহাসের এই চাক্ষুষ উপদেশটুকু অঙ্গীকার ক'রে নিলে, ইংরেজি কাব্যের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে তাঁকে মুখ্যপাত্রী বলতে আমার কোনো দ্বিধা থাকতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের প্রকৃতি অতীতধর্ম্মী হ'লেও, তাঁর কবিপ্রতিভা এতই ওজোময়ী যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী কূপমণ্ডূকত্বে তুষ্ট থাকতে পারেননি, আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে লাফ দিয়ে উঠেছেন তটের বিপন্ন প্রতিযোগে। ফলে তাঁর কবিতামালা দিশাহারা উল্লম্ফনে পরিপূর্ণ। এই উল্লম্ফন বৈশিষ্ট্যময় তাতে সন্দেহ নেই, এই ভঙ্গীর অন্তর্নিহিত চালনীশক্তিও প্রশংসনীয়; কিন্তু নীচের লেখাটি যে কাব্য নয়, তাও নিতান্ত নিশ্চিত।

When
Don
Pasquito arrived at the seaside
Where the donkey's hide tide brayed, he
Saw the banditto Jo in a black cape
Whose slack shape waved like the sea—
Thetis wrote a treatise noting wheat is
silver like the sea; the lovely cheat
is sweet as foam; Erotis notices
that she
Will
Steal
The
Wheat-king's luggage, like Babel
Before the League of Nations grew—
So Jo put the luggage and the label
In the pocket of Flo the Kangaroo.

অবশ্য এ-লাইন কটা একেবারে নিরর্থ, তা বললে অন্যায় হবে। এমন কি আমি এত দূর পর্য্যন্ত স্বীকার করতে রাজী আছি যে ও-গুলোর অসঙ্গতি ও ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসাদে ইউরোপীয় প্রমোদকেন্দ্রগুলির যে-অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গচিত্রখানি ফুটে উঠেছে সেটি একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু পশ্চিমদেশের উৎসবউন্মুখর সামুদ্রিক সহরগুলোকে বর্ণনা করার এইটাই একমাত্র উপায় ব'লে আমার মনে হয় না। উপায়ান্তরের অবকাশ রাখলে হয়তো লেখকের ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ মিলতে পারে, কিন্তু তাঁর রূপনৈপুণ্যের পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। উপরন্তু এই কবিতাটির কিছু আগে যখন উদ্ধৃত পঙক্তি কটাকে দেখি :

Said Il Magnifico
Pulling a fico—
With a stoccado
And a gambado,
Making a wry
Face: " This corraceous
Round orchidaceous
Laceous porraceous
Fruit is a lie!
It is my friend King Pharaoh's head
That nodding blew out of the Pyramid........."

এবং একটু পরেই পড়া যায় :

That hobnailed goblin, the bob-tailed Hob,
Said, " It is time I began to rob."
For strawberries bob, hob-nob with the pearls
Of cream (like the curls of the dairy girls),
And flushed with the heat and fruitish-ripe
Are the gowns of the maids who dance to the pipe.
Chase a maid?
She 's afraid!

"Go gather a bob-cherry kiss from a tree,
But don't, I prithee, come bothering me!"
She said—
As she fled.

তখন সিদ্ধান্ত ক্রমশই দৃঢ় হয় যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের ছন্দ তাঁর হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্ব নয়, তাঁর হৃদয়াবেগ এই ছন্দকুশলতার প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ প্রসঙ্গটি তাঁর রচনার উপলক্ষ মাত্র, শ্রীমতীর কলম আসলে উধাও আত্মশ্লাঘার তাড়নে। এতাদৃশ মনোভাব লেখকের ঐকান্তিক বিশিষ্টতা পরিস্ফুট করার পক্ষে অনুকূল হ'লেও, ও দিয়ে রূপসৃষ্টির কোনই সুবিধা হয় না। কারণ রূপ রসিকমাত্রের মনেই লুকিয়ে থাকে, কবির কাজ হচ্ছে অহঙ্কার ছেড়ে সেই লুপ্ত রূপের সন্ধানে পাঠকের কল্পনাকে জাগর করা।

এইখানে বলা ভালো যে আমি যে-পাঠকের কথা বলছি, কাব্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ আছে, রচনার দুরূহতাকে সে বাধা ব'লে ভাবে না, বরং কঠিন কথার ধাক্কায় তাঁর দরদী কল্পনা অত্যধিক রকমের সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু পাঠক যতই অনুকম্পায়ী হোক, কবি যদি ছুৎমার্গের আড়ালে নিজেকে পৃথক ক'রে রাখেন, তাহলে তাঁর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ অন্তে যদি অমরাবতীর সন্ধান মিলে তবে পাঠককে পর্ব্বতলঙ্ঘন করতে বলায় দোষ নেই, কিন্তু ইন্দ্রধনুর অনধিগম্য প্রান্ত প্রদর্শনের লোভ দেখিয়ে তার কাছে অষ্টসিদ্ধি প্রত্যাশা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কবি আজকের দিনে বিরল নয় যাদের লেখা শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের লেখার চেয়ে লক্ষগুণ শক্ত। ভালেরি অথবা এলিয়টের মর্ম্মে পৌঁছতে হ'লে যত বিঘ্নবিপত্তি জয় করতে হয়, যত বিশেষজ্ঞানের প্রয়োজন ঘটে, তার উপযুক্ত সময় হয়তো অনেকের হাতেই নেই; কিন্তু এঁদের নিমন্ত্রণ এতই উদার, এঁদের অন্বেষণ এতই সার্ব্বিক যে 'ল সের্‌পাঁ'র কিম্বা 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে'র সর্ব্ববাদীসম্মত দুর্ব্বোধ্যতা ও-কবিতা দুটির রসগ্রহণের প্রতিবন্ধক হয় না। বুদ্ধির অনুমতি পাবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের মুগ্ধ চৈতন্য নিঃসঙ্কোচে মেনে নেয়, কবিতা দুটি মহৎ।

এ-দুজনের পাশে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ জলবৎ সরল, ভাবের মারপেঁচ নেই, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, উপলক্ষণগুলি অসাধারণ রকমের প্রাণবন্ত। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও উদ্ধৃত লাইন কটার দুরূহতা দুর্জ্জেয়ঃ

Roads whose dust seems gilded binding
Made for "Paul et Virginie"
(So flimsy-tough those roads are), see
The panniered donkey pass.........

দশ-বিশখানা বিশ্বকোষ উল্‌টে পরিশ্রমী পাঠক যখন আবিষ্কার করে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের বালিকা-বয়সে 'পল এ ভিরজিনি'-নামে একটা ভাবালু শিশুপাঠ্য প্রেমকাহিনীর খুব কদর ছিলো, তখনো রাস্তাগুলোকে উক্ত পুস্তকের মলাটের সঙ্গে তুলনা করার সার্থকতা সে বোঝে না। আরো কিছুকাল গভীর গবেষণার পরে হয়তো এটুকুও তার বোধগম্য হয় যে সকল মামুলি ফরাসী পুঁথির মতো, ও-বইখানার পাতাও ছিলো সস্তা ও অস্থায়ী এবং তার মলাট ছিলো মহার্ঘ ও অবিনশ্বর, কিন্তু তখনো পাঠকের মনে সমবেদনা জাগে না। তবে এতক্ষণে সে হয়তো নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে

স্বীকার করতে পারে যে শ্রীমতী সিট্ওয়েলের লেখা শূন্য কলসীর সমান, ভিতরে কিছু নেই ব'লেই বাইরে অত আওয়াজ।

এ-মতটি অবশ্য অতিশয়োক্তির কোলঘেঁসা। শ্রীমতী সিট্ওয়েলের কবিতার সঙ্গে সুপরিচিত হবার পরে সকলেই মানতে বাধ্য হবেন যে এই কবির দৃষ্টি প্রখর বটে।

Green wooden leaves clap light away
From the young flowers as white as day
* * *
And eyes that seemed the dancing sound
Of waves upon enchanted ground
* * *
The snow dies, that was cold as coral
Or a fairy-story's moral

ইত্যাদি পঙক্তিগুলো কোনো উন্মনা লেখকের কলম দিয়ে বেরুতো না। কিন্তু পরবর্ত্তী লাইনগুলো লেখার প্রতিভা যে-কবির আছে :

Changing the light in eyes to heavy tears,
Changing the beat in hearts to empty years
* * *
...........Vast years
Pile mountain-high above, and the last tears
Freeze to gigantic polar nights of ice
Around the heart through crumbling centuries.
* * *
Across the thick and the pastel snow
Two people go .. .. " And do you remember
When last we wandered this shore?"..............." Ah no!
For it is cold-hearted December."
"Dead the leaves that like asses' ears hung on the trees
When last we wandered and squandered joy here;
Now Midas your husband will listen for these
Whispers—these tears for joy's bier."
And as they walk, they seem tall pagodas;
And all the ropes let down from the cloud
Ring the hard cold bell-buds upon the trees—codas
Of overtones, ecstacies, grown for love's shroud.

তিনি যে কেন নূতনত্বের লোভে নিম্নোক্ত ধরণের লেখায় তাঁর শক্তির অপচয় করেন, তা বোঝা শক্ত :

" Madame la Marquise,
If you please,
When I must play with old ladies, ombre
In Hades' shady bocage sombre—
Let me, though I am old,
Still perceive your gold
Fruit-sweet cheeks' brocade,
Smiling among that peaceful shade... ....., "

But the Marquise in the bocage,
Laughs like the sharp rockage
Of her gallant grottoes, cold as water-wells,
And shakes her curls, as pearly as their shells!

এই ধরণের রচনার সাহায্যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ যদি তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে চান, তাহলে বলতে হবে আধুনিক কাব্য-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অতিশয় অল্প। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আজকের দিনে অন্তত দশ বারো জন এমন কবি আছেন যাঁরা ছন্দের তীক্ষ্ণতায় ও উপমার অভিনবত্বে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের জ্যেষ্ঠ না হলেও, তাঁর সমকক্ষ বটে। ককৃতো, জুল্ সুপেরভিল্, মারিয়ান্ মুর্, কামিংস্ ইত্যাদি সকলেই এই দলের। কিন্তু এঁদের কথাও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তবু শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের বিশিষ্টতা আজকে আর বিশিষ্ট নয়, আর কারুর অনুকরণ না করলেও, তিনি এখন নিজের অনুকরণে ব্যস্ত। প্রথমে যেদিন 'মরাল পৃষ্ঠ' দীঘির কথা পড়েছিলুম, সেদিন বিশেষণটাকে শুধু নতুন নয়, জাজ্বল্যমান ব'লে বোধ হয়েছিলো; কিন্তু যখন আগুনমাত্রেই রোমশ হয়ে দেখা দেয়, গাছপালা, ঘরবাড়ি, রৌদ্রবৃষ্টি সকলেই একজোটে পেরুপাখীর নকল করতে লেগে যায়, তুষার হয় প্রবালশীতল এবং তৃণপল্লব ধাতুনির্ম্মিত, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর feathered race-কেও অভিনব ব'লে ঠেকে, তখন বাঙলা কবিতার বংশীমুগ্ধা চন্দ্রাবলীর কদমতলা দিয়ে যমুনায় জল আনতে যাওয়ার ছলটাতেও প্রাথমিক সত্যতা ফিরে আসে। কারণ বিধিবদ্ধ মৌলিকতা আর প্রথাসিদ্ধ ভাবালুতা, এ-দুইই এক আগাছার গোড়া আর চূড়া। উভয়ই সমান বর্জ্জনীয়, কিন্তু যদি একান্তই নির্ব্বাচন করতে হয়, তবে শেষোক্তটিকেই পছন্দ করা ভালো, কেননা তার পিছনে অন্তত বয়সের গুণে কিছু অনুষঙ্গ এসে জমেছে। যুগযুগান্তের সংস্কারের ফলে চন্দ্রাবলীর নাম আমাদের বুদ্ধিকে বিচলিত না করলেও, অনুবোধকে বেশ একটু নাড়া দেয়। এই উত্তেজনার ধাক্কা শ্রোতার মনে কল্পনার পথ দিয়ে পৌঁছতে পারে না বটে, কিন্তু অভ্যাসের সুড়ঙ্গ বেয়ে পৌঁছয়। অবশ্য এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে সময়বিশেষে, কোনো নাতিসামান্য আবেগের খাতিরে, সূর্য্যকে কাক্রিকালো আখ্যা দেওয়া শুধু সঙ্গত নয়, সার্থক; কিন্তু স্থানকালপাত্র-নির্ব্বিচারে সূর্য্য যদি ওই পোষাকী কালো কোর্ত্তা না-প'রে লোকসমক্ষে আসতে অসম্মত হন, তবে অতি বড় ব্রাত্য পাঠকও স্বীকার করবে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ অপরিহার্য্য বাক্যের সন্ধানে বেরিয়ে ও-উৎপ্রেক্ষায় উপনীত হননি, ওটাকে অবশ্যম্ভাবী ব'লে ভেবেছেন আত্মবিজ্ঞাপনের গরজে। কোনো কবির সম্বন্ধে এর চেয়ে মারাত্মক নিন্দা আমার জানা নেই।

শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের উদ্ভট-কল্পনার আসল ব্যাখ্যা ওইটাই। তাঁর লেখার ভঙ্গী নৈর্ব্যক্তিক হলেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তাঁর কাব্যের প্রাণ। অর্থাৎ জগৎ-সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য শুধু মৌখিক, বস্তুত তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের নেশায় এতই বিভোর যে দিঙ্‌মণ্ডলের দিকে চাইবার প্রবৃত্তি বা অবসর, কোনোটাই তাঁর নেই। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে একটা স্বপ্নসুলভ অসামঞ্জস্য এসে জোটে যার কারণ জানতে চাইলে মনস্তাত্ত্বিক নেবেন আশাভঙ্গের নাম। আমার বিশ্বাস যে শৈশবের সুখস্মৃতির সঙ্গে যৌবনের বঞ্চনাব্যথার সজ্ঘাতেই শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের অধিকাংশ কবিতার উৎপত্তি।

তাঁর চাকচিক্য এই নিষ্ঠুর সঙ্ঘর্ষের পরিণাম। কবির পক্ষে অশ্রুমোচন করা যদি আজকের দিনে এত অশোভন ব'লে গণ্য না-হতো তাহলে আমরা হয়তো শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলকে গ্রাম্য প্রহসনের খোঁজে গোষ্ঠে গোষ্ঠে ঘুরে বেড়াতে দেখতুম না, তাঁর সাক্ষাৎ পেতুম কৈশোরের প্রতিধ্বনিমুখর শিশিরসিক্ত তেপান্তরের মাঠে। এই ভিক্টোরীয় প্রবৃত্তিটা নিন্দনীয় ব'লেই তিনি কাষ্ঠহাসির তলায় কান্না চাপা দেন। কিন্তু ওই উপায়ে আর্ত্তনাদ ঢাকা গেলেও কৃত্রিমতা ঢাকা যায় না, ফলে অবিশ্রান্ত বৈহাসিকতা তিক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রচ্ছন্ন ট্রাজিডি আমাদের কাছে অব্যক্ত, তাই শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "ফাসাডে''র উদ্দাম হাসির ফাটলে ফাটলে অত উচ্চণ্ড দুরুক্তির আভাস মিলে কেন। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের অতীত জীবন-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবত উদাসীন, সেই জন্যেই "গোল্ড্ কোষ্ট্ কাষ্টম্‌স্''-এর দারুণ ভৎর্সনা আমাদের স্পর্শ করে না। স্বপ্রধান সাহিত্য এই কারণেই নশ্বর ও নিষ্ফল। আমার নিজের বাড়ির পরিচারিকাকে নিয়ে কাব্য লিখলে চক্‌চকে তক্‌তকে চিত্রাঙ্কনে হয়তো পাঠককে তাক লাগিয়ে দিতে পারি, কিন্তু পাঠকের অন্তরতম লোকে প্রবেশ-প্রার্থনা করলে আমার কবিতার পিছনে থাকা চাই পরিচারিকাজাতির অনুক্ত সমর্থন। এ-কথায় যাঁদের আস্থা নেই তাঁরা যেন "বিউকলিক্ কমিডিস্''-এর "ওবাড্''-শীর্ষক তিন নম্বর কবিতাটির বাক্‌ডম্বর কানে থাকতে থাকতে এলিয়টের "মর্ণিঙ্ এট্ দি উইন্‌ডো''-নামক নিরাভরণ কবিতাটি প'ড়ে দেখেন।

আমার অভিমতটির স্বপক্ষে আরো দৃষ্টান্তের দরকার হ'লে রবার্ট্ ফ্রষ্টের নাম করতে পারি। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ আর ফ্রষ্টের মধ্যে এমন মূলগত বৈসাদৃশ্য আছে যে প্রথমার কাব্যবিচার যদি ঠিক হয়, তাহলে ফ্রষ্ট্‌কে কোনোমতেই কবি বলা চলবে না। তবু আমার বিশ্বাস, রসিকমাত্রেরই মন ঝুঁকবে ফ্রষ্টের দিকে। অথচ ফ্রষ্টের কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামগন্ধ নেই, উপমা নূতনত্বহীন, প্রসঙ্গ নির্ব্বাচন সনাতনপন্থী, ভাষা এতই সরল, শব্দবিন্যাস এতই সহজ যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আদর্শ একমাত্র এই কবির লেখাতেই বাস্তব হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন কি প্রতিভার ওজন ক'রে দেখলেও শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের জয় অনিবার্য্য। তবু এই প্রাকৃত রসস্রষ্টার অনুচ্চ আহ্বানে আমাদের কল্পনা যতটা উন্নিদ্র হয়ে ওঠে, শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের সভ্য, সালঙ্কৃত কবিতাগুলির সলীল নিমন্ত্রণে তার এক চতুর্থাংশও হয় না। ফ্রষ্টের এই ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণী-শক্তির কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে এর মর্ম্মে আছে ফ্রষ্টের অকপট বিনয়। ফ্রষ্ট মনে করেন না যে তাঁর নিজস্ব জীবনের এমন কোনো গরিমা আছে যেটাকে ঢাক পিটিয়ে লোকসভায় জাহির করা উচিত। ফলে তিনি তাঁর আজন্ম সাধনার সূচনাস্বরূপ শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত যে—

I'm going out to clean the pasture spring;
I'll only stop to rake the leaves away
(And wait to watch the water clear, I may):
I sha'n't be gone long.—You come too.
I'm going out to fetch the little calf
That's standing by the mother. It's so young,
It totters when she licks it with her tongue.
I sha'n't be gone long.—You come too.

এবং বিশ্বস্ত পাঠক এই প্রচ্ছন্ন দিশারীর পদাঙ্কে কত বৃষ্টিঝড়, কত রৌদ্রহিম, অসংখ্য পর্ব্বত, অগণ্য নদনদী, বনউপবন অতিক্রম ক'রে, কখন যে অমৃতলোকের দ্বারে এসে পৌঁছয়, তা সে নিজেও বোঝেনা।

উপরের মুখবন্ধটি প'ড়ে অনেকে হয়তো ভাববেন, রবার্ট্ ফ্রষ্ট্ বুঝি সাবেকি আমলের শুচিগ্রস্ত কবি যার লেখার একমাত্র অনুপ্রেরণা হচ্ছে জ্যোৎস্নাস্নাত মাধবীবিতানে প্রকৃতিদেবীর লীলাখেলা। ফ্রষ্টের কবিতা প্রধানত নিসর্গকেই অবলম্বন ক'রে থাকে, এ-কথা খুবই সত্য, এবং স্বভাবের কবি ব'লেই তিনি বিখ্যাত। কিন্তু তাই ব'লে ফ্রষ্ট্ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এমন অমূলক ধারণার বিপক্ষে তাঁর অধিকাংশ বড় কবিতাই সাক্ষী হবে। তবে তিনি তাঁর শক্তির সীমা জানেন, তিনি জানেন যে অধুনার বিকৃত বিক্ষোভের মাঝে ধ্রুবতার সুর খুঁজে বাহির করার মতো অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি মানুষকে সাধারণত পেতে চান প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মাঝখানে। যারা টেলিফোনে ছাড়া কথা কয়না, পুল্ম্যানে ছাড়া নড়েনা, বিশতালার নীচে নীড় বাঁধেনা তাদের বিষয়ে ফ্রষ্ট্ নিরুৎসুক নন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে বর্ত্তমানের যান্ত্রিক উপসর্গগুলো বাসাবাড়ির অনাত্মীয় আসবাবের মতো, মানুষের পরমসত্তার সাক্ষাৎ চাইলে হয়তো ও-গুলোর সংস্পর্শ বিনাবাক্যে সইতে হবে, কিন্তু ওদের আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ তেমন জমবে না। তাই তিনি মনের মানুষকে ডাক দেন পাহাড়ের বিজন চূড়ায়, বনের নিভৃত অন্তরে, গ্রাম্য পথের পুষ্পিত প্রান্তে। তাঁর বিবেচনায় এয়ারোপ্লেন্ অথবা মোটর হয় মানুষের দাস, নয় মানুষের প্রভু, কিন্তু তার প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে ঘোড়া। সেই জন্যে তিনি এঞ্জিনের প্রতি দৃক্পাত না-ক'রে ঘোড়ার মনোজগতে প্রবেশ করার চেষ্টায় নিবিষ্ট হন; কারণ বন্ধুনির্ব্বাচনের মধ্যে মননের ইঙ্গিত মিলতে পারে, কিন্তু দাসখৎ অদৃষ্টলিপিরই নামান্তর।

ফ্রষ্টের নিসর্গনির্ভরতার সম্বন্ধে ভ্রান্তি পোষণ করা সহজ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে ফ্রষ্ট্ প্রকৃতিকে ফেরার আসামীর আশ্রয়স্থল ব'লে ভাবেন না; তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেন আবহমান জীবনের স্থিতিনিরূপকরূপে। সেই জন্যেই রাত্রে নক্ষত্রপঙক্তির পানে চেয়ে তিনি ব'লে ওঠেন ঃ

You'll wait a long, long time for anything much
To happen in heaven beyond the floats of cloud
And the Northern Lights that run like tingling nerves.
The sun and moon get crossed, but they never touch,
Nor strike out fire from each other, nor crash out loud.
The planets seem to interfere in their curves,
But nothing ever happens, no harm is done.
We may as well go patiently on with our life,
And look elsewhere than to stars and moon and sun
For the shocks and changes we need to keep us sane.
It is true the longest drouth will end in rain,
The longest peace in China will end in strife.
Still it wouldn't reward the watcher to stay awake
In hopes of seeing the calm of heaven break
On his particular time and personal sight.
That calm seems certainly safe to last tonight.

এই কবিতাটি থেকে বোঝা যাবে যে ফ্রষ্ট্ স্বভাববিলাসী হলেও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের শিষ্য নন। এখানে স্বভাবকে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে প্রতিপন্ন করার অথবা মানুষকে অতিমনুষ্যত্বে অধিকার দেওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই, আছে কেবল মানুষকে মানুষের সহজ পরিমণ্ডলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তাকে সহজ ভাবে দেখার প্রয়াস। ফ্রষ্ট্ মানুষকে সত্যই ভালোবাসেন, তাই তিনি তাকে দেবতা বলতে কুণ্ঠিত; তিনি জানেন সে নশ্বর, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিমেয়, কেননা মানুষ অস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু মানুষের পটভূমিকা চিরন্তনী। স্বভাব ও মানুষের মধ্যে তুলাসাম্য আনতে পারা আজকের দিনে এতই শক্ত যে শুধু এইটুকু সিদ্ধির জন্যেই ফ্রষ্ট্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

উপরে যা বললুম তা দিয়ে ফ্রষ্ট্কে মানুষের কবি ব'লে প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। স্বভাবের কবি ও স্বভাবকবি ব'লেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি শুধু এইটুকুর উপরে জোর দিতে চাই যে প্রকৃতির টীকাকার-হিসেবে তিনি অদ্বিতীয় হ'লেও, মনুষ্য-সম্বন্ধে তাঁর প্রক্ষিপ্ত ভাষ্যগুলি নিতান্ত নগণ্য নয়। নীচের কবিতার পটে দুটি বনপথের ছবি অঙ্কিত হয়েছে বটে, কিন্তু ওটির তলায় তলায় যে জৈবিক অভিজ্ঞতা অন্তঃশীলা হয়ে আছে বর্ত্তমান মনুষ্যপন্থী কাব্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে :

> Two roads diverged in a yellow wood,
> And sorry I couldnot travel both
> And be one traveler, long I stood
> And looked down one as far as I could
> To where it bent in the undergrowth;
>
> Then took the other, as just as fair,
> And having perhaps the better claim,
> Because it was grassy and wanted wear;
> Though as for that the passing there
> Had worn them really about the same,
>
> And both that morning equally lay
> In leaves no step had trodden black.
> Oh, I kept the first for another day!
> Yet knowing how way leads on to way,
> I doubted if I should ever come back.
>
> I shall be telling this with a sigh
> Somewhere ages and ages hence:
> Two roads diverged in a wood, and I—
> I took the one less traveled by,
> And that has made all the difference.

আরো উদাহরণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো সহজ নয় এবং সময় ও স্থান থাকলে নমুনার পরে নমুনা গেঁথে দশবিশ পাতা ভরিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার মতের সমর্থকরূপে ওই কটাই বোধ হয় যথেষ্ট। উপরন্তু প্রবচন চয়নের পক্ষে ফ্রষ্টের লেখা অনুকূল নয়। এঁর তনু কবিতাগুলির তনিমা এমনি সুসম্বদ্ধ, এমনি প্রাণঘন যে অঙ্গচ্ছেদের পরে তাদের বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। এইখানেই ফ্রষ্টের সঙ্গে অন্য সমসাময়িক কবিদের গভীর পার্থক্য ধরা পড়ে। আজকালকার—না, শুধু আজকালকার নয়, গত দেড় শ বছরের একাধিক বিখ্যাত কবিতাকে সমষ্টিহিসেবে বিচার করা চলেনা,

সেগুলোকে ভাবতে হয় ব্যষ্টির সংগ্রহ-হিসেবে। অবশ্য এ-কথা না-মানলে মূর্খতা হবে যে এই ধরণের ছিন্ন কাব্যকলি আজও আদর পায়, তার অধিকাংশ অনুপম ব'লেই। কিন্তু অনুপম ব'লেই মনে খটকা লাগে, সন্দেহ হয় এগুলো বুঝি আপতিক, অসার্থক। বস্তুত এগুলোর সাহায্যে সমস্ত কবিতাটির রূপ পূর্ণতর হয়ে তো ওঠেইনা, বরং অসামঞ্জস্যদোষে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। অখণ্ড অন্ধকারের মধ্যে একটিমাত্র প্রদীপ যেমন দিশাহারা পান্থকে আরো উদ্ভ্রান্ত ক'রে তোলে, স্থিরলক্ষ্য পতঙ্গের পথচ্যুতি ঘটায়, তেমনি একটি অলোকসামান্য পদ সম্পূর্ণ কবিতার রসপ্রতিপত্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ-স্বরূপ শেলির স্কাইলার্কের নাম করা যেতে পারে। একটা কবিতার মধ্যে এতগুলো অপূর্ব্ব লাইনের সমাবেশ অন্যত্র খুবই বিরল, তবু অত ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটিয়ে পাঠক যখন কবিতাটির সীমান্তে পৌঁছয় তখন হয়তো শেলির অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্বন্ধে তার অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না, কিন্তু স্কাইলার্কের বক্তব্য যে কি, সে-বিষয়ে তার অজ্ঞানান্ধকার বেড়েই চলে।

বলাই বাহুল্য ফ্রষ্ট্‌কে শেলির চেয়ে বড় কবি মনে করার মতো পাগলামি আমার নেই। এখানে ও-মহাকবির নাম অবতারণা করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে শেলির সমান সাত্ত্বিক কবিও যেখানে আপনার অসাধারণত্ব ঘোষণা করার লোভ সামলাতে পারেননি, সেখানে ফ্রষ্ট্‌ অদ্ভুত আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই দুর্ব্বলতার জন্যে শেলি সম্পূর্ণ দায়ী নন, গলদ ছিলো তখনকার কাব্যের আদর্শে। ঊনবিংশ শতকের কবিমাত্রেই ঠিক করেছিলেন যে অনাত্ম্য আর অবিশিষ্ট এ-শব্দদ্বয়ের মধ্যে ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকলেও অর্থে ও-দুটি এক। সেই জন্যেই তাঁরা প্রসঙ্গের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সমস্ত মন অর্পণ করেছিলেন কাব্যকে কবিপ্রধান ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায়। গত শতাব্দীর কাব্য-ভাণ্ডারে স্মরণীয় লাইনের প্রাচুর্য্য এই প্রাণপণ অধ্যবসায়ের একটিমাত্র শুভ ফল। ওর অন্য ফলটি শোচনীয়, কারণ তখনকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্ররোচনাতেই কাব্য কল্পনার কারবার ছেড়ে দিয়ে বিবেকের ব্যবসায়ে নেমেছিলো। আজকের কবিরা হয়তো সর্ব্বনাশের ধাক্কায় চোখ মেলে সবে দেখতে পাচ্ছে যে অত সহজে পৈতৃক পেশা পরিবর্ত্তন করা নিরাপদ নয়, কিন্তু তাহলেও আত্মরতির মোহ এখনো ভালো ক'রে কাটেনি ; তাই আজো শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌ একটি চমকপ্রদ উপমার জন্যে একশ লাইন ছড়া কাটতে পারেন, রোগীর জগৎ দুষ্প্রবেশ্য ব'লে গ্রেভেস্‌ রোগনিদানের নামে নীড়বিবাগী হন এবং সত্য-বলাকে বেণেপনার পরাকাষ্ঠা ভেবে, হাক্‌স্‌লি করেন পাইলেটের প্রতিধ্বনি। এঁরা সত্যকে চাননা, শিবকে চাননা, সুন্দরকে চাননা, চান শুধু স্বতন্ত্রকে, এবং যেহেতু পক্ষপাতেই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ, তাই এঁরা কাব্যকে রসসৃষ্টির কর্ত্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে নিযুক্ত করেন স্বমত-প্রচারের বাহনরূপে। এঁরা জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে অনাত্ম্য কাব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপের পরম সুহৃদ। কারণ এ-ধরণের কাব্যে কবির নিজস্ব ক্ষীণপ্রাণতা অমরত্বের ব্যর্থ চেষ্টায় উপহাস্য হয়ে ওঠেনা, তার স্বীকার্য্য অভিজ্ঞতা সার্ব্বত্রিক অভিজ্ঞতার সহযোগে সত্যই অবিনশ্বর মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Erstes Erlebnis Von Stefan Zweig. (Insel Verlag)

রাত্রিদিবার সন্ধিক্ষণের মত মায়াময়, প্রথম প্রেমজাগরণপূর্ণ আলো অলীক বেদনার সুস্নিগ্ধ ছায়াভরা, অজানিত গোপন আনন্দের আস্বাদন সম্ভাবনায় আন্দোলনপূর্ণ, অসম্ভবস্বপ্নপূর্ণ, যৌবনদ্বার-সম্মুখে প্রতীক্ষমান কৈশোরের দ্বন্দ্ব-বেদনার সুন্দর সরল কাহিনী বিশ্বসাহিত্যে খুব বেশী নেই। সেজন্য অষ্ট্রিয়ান লেখক ষ্টেফান ৎসয়াইগের "প্রথম অনুভব" (Erstes Erlebnis) নামে কিশোর জীবনের প্রথম প্রেমের অনুভূতিকম্পন-বিহ্বলতাভরা গল্পের বইখানির পৃথিবীর সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান আছে।

জীবনের এই পর্ব্বের মনস্তত্ব বড় বিচিত্র। কিশোর আপন নিরালা চিত্তে কত স্বপ্নের কত বেদনার জাল বোনে। সে একা, শৈশবের খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলার বয়স তার নেই, বয়স্ক-সমাজে তার এখনও স্থান হয় নি। বয়স্কদের জগতের সামনে সে রহস্যাকুল তৃষিতভাবে চেয়ে থাকে, সে-জগৎ হতে কত মোহময় স্পর্শ, কত আনন্দময় গান তার কাছে ভেসে আসে, সে সচকিত হয়ে ওঠে ; সব অর্থ সে বোঝে না, কিন্তু অজানা সুখে অন্তর দোলে। ভোরের ফুটোন্মুখ পদ্মের মত তার প্রেম-চেতনা কোন বয়স্কা নারীর প্রেমের ক্ষণিক স্পর্শে হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়, ক্ষণিক মিলনে পৃথিবী চিরন্তন স্বর্গ, প্রেমের অনাদরে জীবন অর্থহীন।

বইখানির মুখপত্ররূপে ৎসয়াইগ্ একটি ছোট কবিতা লিখেছেন ঃ

শৈশব, তোমার সঙ্কীর্ণ কারাগারের গবাক্ষজালের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার কত অশ্রুধারা ঝরেছে, যখন আমাকে অজানা পাখী নীল সোনালী ঝলমলরূপে ডাক দিয়ে চলে গেছে বাহির হতে।

হায় রাত্রির অসহিষ্ণুতা, দ্বারের অর্গলে করাঘাতের পর করাঘাত করেছি, রক্তপাত হয়েছে, কোন অপরিপক্ক বাসনা রক্তে গর্জ্জন করে উঠেছে, সমস্ত দেহমন বিহ্বল করে—তার পর দ্বার ভেঙ্গে ফেলে সকল বাধা দূর করে বাহিরে মুক্ত দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু সে মুক্তিতে মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। হায়, প্রথম ঊষার মধুর উদ্বেল ব্যাকুলতা !

"ঊষাতে" নামে প্রথম গল্পটি এইরূপ ঃ

একটি কিশোর ছুটিতে স্কট্‌লণ্ডে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছে—স্কট্‌লণ্ডের পাহাড়-বনের মধ্যে একটি সুন্দর দুর্গ-প্রাসাদ। সেখানে তার সঙ্গী নেই, বয়স্কেরা তাকে আমল দেয় না। সন্ধ্যাবেলা যখন খাওয়া শেষ হয়, সবাই ড্রয়িংরুমে চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে কফি খায়, তাস খেলে, গল্প করে, তাকে তখন শোবার ঘরে যেতে হয়। অথচ অত শীগ্‌গীর ঘুমোবার বয়স তার নয়। বাড়ীর উপবনে সে বেড়াতে বাহির হয় ; মৃদু জ্যোৎস্নালোক, গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়ামড়ি হয়ে কোথাও সঙ্কীর্ণ বক্র পথ সঘন অন্ধকারময়। সেই অন্ধকার কিশোরের বড় ভাল লাগে—ওপরে চাঁদের আলো ঝরছে, তলায় গাছের পাতা-ছাওয়া বীথিকায় অজানা অন্ধকার।

এক সন্ধ্যায় অন্ধকার বন-পথে যেতে যেতে সে পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে, কোন নারীর চলার ছন্দ। কে তার দিকে পেছন থেকে এগিয়ে

আসছে, ঝরাপাতার খস্‌খস্‌ শব্দ মধুর, পথের ছোট পাথরগুলি মৃদু আন্দোলিত, চকিত চরণের তালে তার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হল; তারপর এক তপ্ত সুকোমল করের কম্পন, দুই শুভ্রবাহুর দৃঢ় আবেষ্টন, মুক্তকেশের রহস্যময় অবারণ, অজানা উপ্তপ্ত নিঃশ্বাস, কম্পিত ওষ্ঠের বিহ্বল চুম্বন—বিশ্বের দিশা হারিয়ে গেল! তার শিরায় শিরায় কে যেন অগ্নিধারা প্রবাহিত করে দিলে, এই তার জীবনে প্রথম নারীর চুম্বন! এই নারীর চুম্বন? এমনি মাদকতাময়, এমনি বিহ্বল আনন্দভরা!

কিন্তু যখন সে চোখ মেলে চাইল, অজানা নারী অন্তর্হিতা, দূরে তার চঞ্চল-চরণের আঘাতে চ্যুতপত্রময় ছায়াবীথিকা আকুল। কে এ অজানা? কে তাকে ভালবাসে, অন্ধকারে গোপনে তাকে চুম্বন দিয়ে প্রেমনিবেদন করতে এল? বাড়ীতে যে ক'জন নারী রয়েছেন তাদের কথা সে ভাবলে, ওই যে তিন বোন রয়েছে—কিটি, মার্‌গারেট্‌, এলিজাবেথ্‌, তাদের মধ্যে কেউ? চেষ্ট্‌নাট্‌ব্রাউন কিটি অথবা ব্লণ্ড্‌ মার্‌গারেট্‌, অথবা এলিজাবেথ্‌, তার চুল এত হাল্কা রঙের যে অন্ধকারে রূপার মত ঝিক্‌মিক্‌ করে।

পরদিন সারাদিন কিশোরের মনে এই প্রশ্ন সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত; দিনের বেলা কেউ তাকে আমল দেয় না, সে ছেলেমানুষ।

রাতে সেই আলোছায়াখচিত উপবনে আবার নারীচরণের মৃদুধ্বনি, স্কার্টের খস্‌খস্‌ শব্দ নুড়ির ওপর, তারপর সেই প্রাণ-মাতানো সব-ভুলানো চুম্বন! বিদ্যুতের মত ক্ষণিক; অজানা তরুণী কখন চলে গেল, কিশোর জানতেও পারলে না।

পরদিন সকালবেলা কিশোর বলে উঠল,—মার্‌গারেট্‌, তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

মার্‌গারেট্‌ তাকে এক ধমক দিয়ে বল্লে—বব্‌ তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! বাজে বকিস্‌ না।

দিনের বেলা তাকে অবহেলা, ছোট বলে তাচ্ছিল্য কিন্তু রাতে কেন আজানা তরুণী চুম্বন দিয়ে পাগল করতে আসে। কেন সে ধরা দেয় না, তার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর খেলা করে।

সে-সন্ধ্যায় চুম্বন প্রদীপ্ত অগ্নিধারা, আলিঙ্গন হল উন্মত্তের মত। সমস্ত দিবসের বিহ্বল-প্রতীক্ষায় অনিশ্চিত বেদনায় দেহমন মথিত হয়ে উঠল।

অজানা চুম্বনদায়িনী যখন চলে গেল, কিশোর ধীরে ধীরে বনবীথিকায় ঘুরতে লাগল। বাড়ীর কাছে এসে তার চোখে পড়ল, দোতলায় একটি ঘরে আলো জ্বলছে, আলোয় ঝক্‌মক্‌ জানলার কাচখানা রূপার আয়নার মত, সেই দীপ্তশুভ্রপটে মার্‌গারেটের মোহিনী মূর্ত্তি আঁকা, দীর্ঘ তনুবল্লরী বড় সুন্দর, উন্মুক্ত কেশ এলায়িত, মার্‌গারেটের ব্লণ্ড্‌ কেশ, সে যেন চাইছে, বাগানের দিকে চেয়ে আছে কার প্রতীক্ষায়!

কিশোরের বক্ষের রক্ত দুলে উঠ্‌ল। সামনে একটি গাছ স্বপ্নের মত দাঁড়িয়ে, তার একটি শাখা মার্‌গারেটের জানলার ওপর গিয়ে পড়েছে। রূপমুগ্ধ কিশোর কম্পিতপদে গাছে উঠ্‌ল, জানলার আলো বড় তীব্র, চোখ-ঝল্‌সানো! গাছে কতদূর সে উঠ্‌ল, সে জানে না, আলো তাকে দিশাহারা করছে, তার সামনে পৃথিবী যেন ঘুরছে। আলোকোজ্জ্বল গাছ থেকে সশব্দে সে অন্ধকার মাটিতে পড়ে গেল। আহত পদের তীব্র বেদনা নীরবে সহ্য করে, রক্তাক্ত পা ঘস্‌ড়ে ঘস্‌ড়ে কোনরকমে সে সিঁড়ি

দিয়ে সামনের ঘরে উঠ্‌ল, তারপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। ড্‌য়িংরুমে একটা হৈচৈ পড়ে গেল, ঘোড়া হাঁকিয়ে লোক ছুটল ডাক্তার আন্‌তে।

রাতের স্বপ্ন শেষ হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ভাঙা পা নিয়ে বিছানাতে শুয়ে কিশোর দিনের আলোয় স্বপ্নের জাল বোনে—মার্‌গারেট্‌ তাকে রোজ দেখতে আসে। কিন্তু কিটি এলিজাবেথ্‌ তারাও ত আসে। তারা বিছানার পাশে এসে বসে, গল্প করে। কিন্তু মার্‌গারেটকে সে ভালবাসে, সুন্দরী মার্‌গারেট্‌, ব্লণ্ড্‌ মার্‌গারেট্‌। মার্‌গারেট্‌ আসে হয়ত ক্ষণিকের জন্য, তার দেহে শরতের বনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, জেস্‌মিন ফুলের গন্ধ তার চুলে, তার জ্বলজ্বল চক্ষে অগষ্ট-সূর্য্যের দীপ্তি—সেই দীপ্ত সুন্দর রূপ কিশোর দুই চক্ষু ভরে পান করে, তাকে ঘিরে প্রেমস্বপ্নজাল বোনে।

কিন্তু সে স্বপ্ন একদিন ভেঙে গেল, সে জাল ছিঁড়ে গেল টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে, কিশোর জাগ্‌ল পরমবেদনায়।

এক্‌ নিরালা দুপুরবেলা, বাহিরে রোদ ঝিমঝিম করছে, চারিদিক নিঝুম; কিশোর চোখ বুজে বিছানাতে শুয়ে। অতি ধীরে দুয়ার খুল্লে, পা টিপে টিপে তার বিছানার দিকে কে এল; কিশোর অনুভব করলে তার মুখখানি নত হয়ে পড়েছে তার মুখের ওপর, তপ্ত ব্যাকুল নিঃশ্বাস,—রাত্রির বনবীথিকার বিহ্বল মিলনের স্মৃতিভরা নিঃশ্বাস! এ কে? মার্‌গারেট্‌, নিশ্চয় মার্‌গারেট্‌!

সংশয়ে দুলে কিশোর চোখ মেল্লে, তরুণী চকিত চরণে সরে দাঁড়াল। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্য? এ ত মার্‌গারেট্‌ নয়, এ যে এলিজাবেথ। কিশোরের চোখের ওপর কে যেন একটা কালো পর্দ্দা টেনে দিলে।

এলিজাবেথ্‌ ধীরে বল্লে—বব্‌, তোমার কি ব্যথা করছে? বেদনায় তখন তার অন্তর ভেঙে গেছে। কিশোর ধীরে বল্লে—হ্যাঁ···মানে···না···আমি ভালই আছি। এলিজাবেথ্‌ চলে গেল। ভগ্নস্বপ্ন কিশোরের চোখে অশ্রুর বন্যা এল।

হায় তাকে নিয়ে এ খেলা, এ প্রতারণা কেন? মার্‌গারেট্‌ তাকে চুম্বন দেয় নি, মার্‌গারেট্‌ তাকে ভালবাসে না, আর সে যে মার্‌গারেট্‌কে ভালবেসেছে। এলিজাবেথ্‌ আগে জানায় নি কেন? তাকে কি সবাই খেলার পুতুল ভাবে!

কয়েক বৎসর পরে সে আর কিশোর রইল না, কিন্তু কৈশোরের এই ব্যর্থ প্রেম-ঘটনাটি তার সমস্ত জীবনের ওপর কালো ছাপ মেরে দিলে। মার্‌গারেট্‌ ও এলিজাবেথ্‌ দু'জনেই বিবাহ করেছে, কিন্তু সে আর কোন দিন তাদের সঙ্গে দেখা করতেও যায় নি। কিশোর বয়সের ভগ্ন প্রেমস্বপ্নের অসহনীয় বেদনার স্মৃতি কালো মেঘের মত তার সমস্ত জীবন ছেয়ে রইল, প্রেম ও নারী তার পক্ষে দুঃসহ, নারীর সহিত প্রেম তার জীবনে অসম্ভব। সে এখন ভ্রমণবিলাসী, বহুদেশ পর্য্যটন করে, স্কট্‌ল্যাণ্ডের এক জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্রথম চুম্বনের তপ্ত মদিরাভরা পেয়ালা যে খান খান হয়ে ভেঙে গেছে, তারি দুরারোগ্য ক্ষত হৃদয় বয়ে বেড়ায়।

কৈশোর যৌবনের কোন তীব্র 'লিবিডো'র নিরোধে যৌন-জীবন বিকৃত অস্বাভাবিক হয়ে যায়, প্রথম নারীপ্রেমের ব্যর্থতার মর্ম্মান্তিক আঘাতে যে ভবিষ্যৎ জীবনে নারীপ্রেমের প্রতি সন্দেহ বিরাগ ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ বহু জীবনকাহিনী ৎসয়াইগের স্বদেশবাসী মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ফ্রয়েড্‌ ও ষ্টেকেলের রোগীদের ইতিহাসের দপ্তরে পড়েছি। কিন্তু ফ্রয়েড্‌ বা ষ্টেকেল্‌ যে জীবনেতিহাস বৈজ্ঞানিকের

মত ব্যবহার করেছেন তাঁদের কোন থিওরি-প্রমাণের মালমসলারূপে, সেই ঘটনা থেকে ৎসয়াইগ্ করেছেন রস সৃষ্টি। তিনি কোন বিশ্লেষণ করেন নি, তিনি চেয়েছেন অন্তরের বেদনাকে বাণী দিতে, তাঁর ভাবব্যঞ্জক ভাষার ছন্দময় গতিতে, কথাচিত্রের সৌন্দর্য্যে, রসময় উপমায় তিনি কিশোরমনের সুখদুঃখকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেজন্য তাঁর ঘটনার বর্ণনা হয়েছে সাহিত্য।

বইখানির তৃতীয় গল্প "অগ্নিময় রহস্যকথা" বইখানির শ্রেষ্ঠ গল্প, অসামান্য শক্তির সহিত লিখিত।

গল্পটি হচ্ছেঃ এড্গার্ বলে একটি ছেলে তার মায়ের সঙ্গে সেমেরিংতে বেড়াতে গেছে, তাদের হোটেলে একটি ব্যারণ এলেন একা। ব্যারণটি এসে এড্গারের সঙ্গে খুব ভাব করলেন। একজন বড় ব্যারণ তার মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে, এড্গার্ ত গর্ব্বে সুখে উৎফুল্ল। কিন্তু এড্গারের সঙ্গে ভাবের সূত্র ধরে ব্যারণটি যখন তার মায়ের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলেন, তখন এড্গার্‌কে আর তিনি আমলই দিতে চান না। এমন কি এড্গার্‌কে একা হোটেলে রেখে ব্যারণ ও তার মা বেড়াতে যাবার ফন্দী কর্‌তেন, কিন্তু এড্গার্ বার বার তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিত; তাঁরা বেড়াতে বাহির হলেই সে কোথা থেকে এসে জুটত, মায়ের হাত ধরে চল্‌ত।

ব্যারণের ওপর বিদ্বেষে তার প্রাণ জ্বলে যেতে লাগল, তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল, আর মায়ের ওপর তার হল দুর্জ্জয় রাগ। রাতে খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, তাকে ঘরে শুতে যেতে হত, আর তার মা ও ব্যারণ ড্রয়িংরুমে বসে কত হাসাহাসি, কত গল্প করতেন। বিছানাতে শুয়ে তার ঘুম আসত না, যতক্ষণ না তার মা আসতেন ততক্ষণ সে জেগে থাকত।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে সে মায়ের প্রতীক্ষা করছে, ঘরের বাহিরে করিডরে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, ভীত কণ্ঠস্বর—না, আজ নয়। নিশ্চয় ব্যারণ মাকে কোন বিপদে ফেলবে, বিছানা থেকে লাফিয়ে দরজা খুলে জ্বল্‌জ্বল্ চোখে সে দেখলে, অদূরে তরল অন্ধকারে তার মার হাত ধরে ব্যারণ, মাকে বোধহয় কোথায় টেনে-নিয়ে যাচ্ছে, কোন বিপদের মধ্যে! ক্ষিপ্ত সিংহশিশুর মত এড্গার্ ব্যারণের ওপর ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আঁচড়ে, খিমচে, কামড়ে, ঘুসি মেরে মরীয়া হয়ে সে ব্যারণকে আক্রমণ করলে, বহুদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ হিংসা মুক্তি পেলে। ব্যারণ প্রথমে তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তাকে ঘুসি মারলেন, নিরুদ্ধ ক্রোধ তাঁরও অন্তরে জমা ছিল। কিন্তু এই ছোট ছেলের সঙ্গে মায়ের সামনে মারামারি কত লজ্জাজনক বুঝতে পেরে ব্যারণ কিছুক্ষণ পরে ক্ষুব্ধচিত্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

পরদিন প্রভাতেই ব্যারণ হোটেল ছেড়ে চ'লে গেলেন। কিন্তু এড্গারের মন শান্ত হল না, মায়ের সঙ্গে তার সহজ প্রেমের স্বাভাবিক সম্পর্ক যেন আর নেই। তার চিত্ত চঞ্চল। হোটেল ছেড়ে একা সে বাহির হ'য়ে পড়ল, সে পালিয়ে যেতে চায়, কোথাও চলে যেতে চায়। ষ্টেশনে গিয়ে এক টিকিট কিনে সে ট্রেণে চেপে বসল; সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যেবেলায় তার ঠাকুমার বাড়ীতে এসে হাজির।

এদিকে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, এড্গার্ হোটেলে ফিরল না, তার মায়ের মন চিন্তায় আকুল। আশঙ্কায় দিশাহারা হ'য়ে তিনি এড্গারের বাবাকে টেলিগ্রাফ করলেন।

ঠাকুমা যখন খবর দিলেন, এড্গার তাঁর কাছে এসেছে, মা তখন নিশ্চিন্ত হলেন। বাবা এসে যখন এড্গারকে জিজ্ঞাস করলেন, কেন সে অমন একা চলে গেল, তার মনে কি দুঃখ, কি কারণে সে পালাল, এড্গার্ কিছুতেই কোন উত্তর দিলে না। তার মা ও ব্যারণের মধ্যে ব্যাপারটা তার বালকচিত্তে সম্পূর্ণ না বুঝলেও সে এটুকু বুঝেছিল যে এ ঘটনা তার বাবাকে বলা ঠিক হবে না। সে কোন কথা কিছুতেই বল্লে না। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবার মা ও পুত্রে মিলন হল।

এড্গারের অভিমান, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, হতাশ্বাস, উদাসভাব, বালকমনের সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব ছন্দময় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্যে বালকমনস্তত্ত্বের একটি শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে স্থান পেতে পারে এই গল্পটি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

মরুমায়া—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র মোহন বাগচী, ৪৭, মনোহর-পুকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

বালুচর—জসীমুদ্দীন, প্রকাশক ডি, এম্, লাইব্রেরী।

"মরীচিকা"র কবি যতীন্দ্রনাথের নতুন বই "মরুমায়া" হাতে নিতেই আমার কানে তাঁর পুরাতন কাব্য-ঝঙ্কারের রেশ বেজে উঠল। সে ঝঙ্কারে যে বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে তা বিশ্ব-সাহিত্যে নতুন কিনা জানিনে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে খুবই অভিনব। জীবনের সুখের বীথিতে ও প্রকৃতির মোহন কাননে তিনি কোমল কবিতা-কুসুম চয়ন করেননি, দুঃখের বর্ষণ নামিয়ে হাহাকারের বন্যা বহাননি, তিনি বিশ্বের ফাঁকিকে ধ'রে দিয়ে তাকে শ্লেষ-বিদ্রূপের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করেছেন, রুক্ষ নির্ম্মম ভৎর্সনায় অন্ধবিশ্বাসের খলতা ও ছলনাকে পঙ্গু করেছেন। যাকে সকলে চিরদিন স্তুতি ক'রে এসেছে অথচ যা' শুধু ছায়াবাজি তার মায়াজাল ছিন্ন করবার জন্য তিনি ধর্ণা দেননি দার্শনিকের তর্ক বিতর্কের হেঁয়ালির দ্বারে, তার বদলে স্পর্দ্ধা ক'রে তাদের বেশ স্পষ্ট কথাই শুনিয়ে দিয়েছেন। এই স্পর্দ্ধাই তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই স্পর্দ্ধার আক্রমণ থেকে কোন প্রতারকই বাদ যায়নি; যে ভগবান মানুষ ও তার বাসনা, আশা, প্রেরণা তৈরি ক'রে তাকে আবার নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় আবদ্ধ করেছেন যিনি সাড়ে তিন হাত জীব তৈরি ক'রে আড়াই হাত পরিমিত কুঠরির মধ্যে পূরে রেখেছেন, "ঘোড়া পিটাইয়া উঠ" করতে যিনি পাকা ওস্তাদ, সেই ভগবানও তাঁর স্পর্দ্ধার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাননি। এই স্পর্দ্ধা অভিনব কাব্যরূপে তাঁর কবিতায় মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর পূর্ব্বতন লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না ঃ—

> জলদগর্জ্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি
> শোন মোর কথা—ও সবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি !

ও তর্জ্জনের অর্থ বুঝিতে হয়না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ !

চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া
আলো-আঁধারের গরাদে বসান' অপার বিশ্ব কারা !
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা ;
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা।

সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি
ছ্যাওড়া তলায় ফুটে চেয়ে থাকে সখের সূর্য্যমুখী !
বন্ধু আমারে খাট পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এত বড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা,—বিদ্রূপ ক'রো নাক'।

(মরীচিকা)

এইখানে বলা দরকার এই যে ভণ্ডতাকে কষাঘাত এ শুধু শাসনের খাতিরে নয়, ভণ্ডতা যে ব্যর্থতার ক্ষতকে গোপন ক'রে রাখে,—মায়া যে তৃষিত চিত্তকে শুধু মরু-পথেই ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাই খুলে দেখাবার জন্য।

আকাশ তার আলোগুলি নিত্য ধরে জ্বেলে,
নিবিয়ে রাখে প্রাণের মাঝে আঁধার শত শত।
অগ্নিগিরি পথের সোনা উগরে ফেলে ঢেলে,
দেখায় না যে বুকের মাঝে গভীর কত ক্ষত !

এইরূপে যেমন একদিকে মিথ্যা মায়া ও বিধাতার প্রতারণা কবির চাবুকের ঘায়ে আহত হয়েছে তেমনি তাঁর কবিতার মধ্যে একটি প্রবাহিত করুণার ধারা আর একদিকে জগতের দুঃখ ও বিড়ম্বনাকে, জগতের হীন, হেয় ও তুচ্ছকে অভিষিক্ত করেছে। এইরূপে শ্লেষ-বিদ্রূপের মলিন আবরণের উপরে অনুকম্পার শুভ শুভ্র কিরণ সম্পাত হয়েছে —

ধূ ধূ করে মরুভূমি যত চলি জীবনে,
　মরীচিকা পিছাইয়া যায় ;
শুধু দাহ শুধু তাপ এ মানব ভবনে,···
　কোথা প্রেম নিত্য রস পায় ?

টানাটানি ঠেলাঠেলি পথ যায় হারায়ে
　মরণের নাহি মিলে পার ;
অসীমের বেড়া দেওয়া নিদারুণ কারা এ,
　কেন প্রেম আনে মিছা ছাড় ?

(মরীচিকা)

কিন্তু "মরুমায়া" পড়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হ'তে হ'ল কেননা "মরুমায়া"র কবিতায় তাঁর সেই মার্কামারা শ্লেষ ও স্পর্দ্ধা স্তিমিত। যেটুকু আছে সেটুকু যেন কায়াহীন ছায়ামাত্র। "বিভীষণ" কবিতাটির—

ভাই নিয়ে এল হরণ করিয়া পরের পরমা নারী ;
প্রজার মাঝারে কামুক রাজার চরম কেলেঙ্কারী !

চুপ কোরে যদি দেখি,
বল তবে আজ, তোমাদের মতে উচিত হইত সেকি ?

অথবা "শরশয্যায় ভীষ্ম"-এর উক্তি—

নির্ব্বাক্ হ'য়ে ভাবিতেছিলাম—কোন্ লজ্জাটা ভারী ?
—পাশা জিনে' রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী,—
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসন টানে ?
ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্ম্মূল।
তাই সহিলাম ফাল্গুনী যবে প্রতি ভুল গুণে' গুণে',—
রোমে রোমে বিঁধে দিল অপূর্ব্ব শরের বর্ম্ম বুনে'।

এগুলি শ্লেষোক্তির পরিবর্ত্তে আত্মধিক্কারের দিকেই নুয়ে পড়েছে। আরও অনেকগুলি কবিতা আছে যাতে শ্লেষের ইঙ্গিত স্পষ্ট কিন্তু বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। আমার মনে হয় এটা একটা মস্ত ক্ষতি কেননা আগেই আমি বলেছি যে অন্য কবিদল যেমন বরণ করেছেন জীবনের সুললিত সারটুকু, যতীন্দ্রনাথ বরণ করেছিলেন তার বিড়ম্বিত, ব্যর্থ, ব্যথিত ইঙ্গিতটুকু, তাই তাঁর ভাষায় ছিল এতটা ভৎর্সনা, উপমায় এতটা কটুতা। আজ তাঁর লেখায় এগুলি লুপ্ত হ'তে বসেছে। অপরদিকে কিন্তু তাঁর প্রাণবান করুণাধারা ও অনুকম্পা এখনও আগের মতই স্বচ্ছন্দগতি, বরং তারা হয়েছে আগের চেয়েও সুস্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর। যেখানে তাঁর এ স্নেহরস স্পর্শ করেছে সেখানে কবিতা হয়েছে কাব্যরসে পরিপূর, নিটোল।

শ্যাম পাতে ঢাকা শ্বেত কিসলয়, তাহে ঢাকা পীত রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।

এ উদাহরণের পর আর ওকালতির দরকার হয় না। যে কুসুমের ওপর এই কাব্য-গুঞ্জন সে হ'ল "কেতকী"। কেতকী-সম্পর্কে আমার একটু পক্ষপাত থাকতে পারে, কেননা কবির মত আমিও কেতকীর অনুরক্ত ; তাঁর মত আমিও রাস্তার মোড়ে ফিরিওলার কাছ থেকে বর্ষার দিনে কেতকী কিনে এনে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে তার বিরল কিন্তু অনুপম গন্ধে মশগুল হয়ে যাই। কবি কিন্তু আমার চেয়ে বেশী টলেছেন, কেননা কেতকী গন্ধে মাতাল হ'য়ে তিনি একেবারে স্বপ্নের বাহুবন্ধে ধরা দিয়েছেন —

যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে !
আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি,—
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা !
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্ধো !
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে' মৃত কেতকীর গন্ধ !
হাঁকিল পাহারা,—উঠি ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,—
ঝর ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি !
কাঁটা বিঁধে' হাতে বুঝিনু,—স্বপন, আমার মনের ভুল ;
দুপ'র রাতের ঘুম মাটি করে দু'পইসে কেয়াফুল !

বক্তব্য-শেষে আমি "মরুমায়া" থেকে আর একটি উদাহরণ দিতে চাই যাতে কবিকৃত কাব্যরস্ ও করুণার অপূর্ব্ব সন্ধি অপরূপ প্রকট হয়েছে।—

তবু শাঁওনের রাতি যেয়ো না!
শঙ্কা-বিকল প্রাণে　　ক্রন্দনে অভিমানে
ওই গান বই আর গেয়ো না!
র'য়ে র'য়ে সন্ সন্　　অশান্ত সমীরণ
চম্ চম্ তড়িৎ চমক!
গর গর গর্জ্জে　　গুরু দেয়া তর্জ্জে,
চিতে লাগে ভীতির ধমক।
কান পেতে শোন দেখি　　গগন-অরণ্যে কি
গর্জ্জে শাবক-হারা বাঘিনী?
ও কোন্ বেদিনী মেয়ে　　অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী!

এই শেষোক্ত কবিতার ছন্দের ধ্বনি কাউকেই এড়িয়ে যাবে না। কিন্তু এই রকম দু'একটি বাদ দিলে বলতেই হবে মরুমায়ায় ছন্দের দারিদ্র্য রয়েছে। বেশীর ভাগ বিশমাত্রিক বৈচিত্র্যহীন। বাকিগুলির মধ্যে সরসতা লক্ষ্য হয় না; তারই মধ্যে একটিতে একটু নূতনত্বের আমেজ পাওয়া গেল, সেটি থেকে এইখানে একটু উদ্ধৃত করলুম।

যেতে　　বাজায়ে উপলঝাঁঝ চপল নাটে
চির-　　দুরন্ত ঝর্ণাও পা টিপে হাঁটে;
যেই　　পথের ধারে
প'ড়ে　　পথের পাষাণ
চির　　চোখের ধারে
করে　　দুখের আসান্;
যেই　　অচল পথ চলায় পিছল অধিক,
সেই　　পাওটা-পথের এক হ'ব গো পথিক।

জসীমউদ্দীনের "নক্সীকাঁথার মাঠ" কাব্যসাহিত্যে যে আশার সঞ্চার করেছিল, আমার মনে হয়, তা' "বালুচরে" কবি বজায় রাখতে পারেননি। "বালুচরে"র কবিতাগুলি নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি প্রায় একই সুরে একই ছন্দে বাঁধা, একই বক্তব্যে নিঃশেষিত। এই সুরটি বিগত বিনষ্ট প্রেমের আরাধনার সুর। কবিতাগুলির নামও এর প্রচুর পরিচয় দেয়—যথা, "কাল সে আসিয়াছিল," "তোমারে ভুলেছি আজ", "দুরাশা", "বিদায়", "কবির সমাধি" —ইত্যাদি। একটি কবিতা পূরোপূরি তুলে দেওয়া যাক, যা' থেকে এ সুরটির হৃদয়ঙ্গম হবে—

শূন্য নদীর কূলে
আমার বেদনা দুটি তট বেড়ি কাঁদিতেছে কূলে কূলে।
উতল বাতাস পাখা নড়িতেছে ব্যাকুল বেণুর শাখে
কাশবন আজি গড়াগড়ি যায় সারা গায়ে ধূলি মাখে।

গগন রেখার চক্র ধরিয়া বৃথা কাঁদে দূর বন,
সেই নির্ম্মম কভু পরিল না সবুরের বন্ধন।
মিছে ঘুরে মরে চরের বিহগ শূন্যে বাঁধিয়া ডানা,
সে দূর আজিও পাখার বাসরে আনেনি আকাশখানা।
বৃথা কেঁদে মরে মাটির ধরায় সবুজের আলপনা
কোমল বাহুর বাঁধন তাহার আজো কেউ পরিল না।

—"দুরাশা"

বালুচর ও কাশবনময়ী প্রকৃতি কবির বেদনায় বিধুর, তারই চিত্র "বালুচরে" পরিস্ফুট হয়েছে। এইটিই জসীমউদ্দীনের লেখার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিকে—বালুচরের প্রকৃতিকে—তিনি একেবারে নিজের করে নিয়েছেন, তার মাঝে তিনি সম্পূর্ণ আত্মহারা,—এইখানে তাঁর জয়। আর একটি উদাহরণ দিই,—

কেন তুমি সখা মানুষ হইলে, অতটুকু দেহ ভরি!
বিশ্বজোড়া এ রূপ পিপাসারে কেন রাখিয়াছ ধরি'!
আমি কাঁদি সখা কেন তুমি নাহি আকাশের মত হ'লে—
যেখানে যেতাম তোমারে পেতাম, দেখিতাম নানা ছলে।
আকাশের তলে ঘর
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।
তুমি কেন সখা কানন হ'লে না ফুলের সোহাগ পরি'
রঙীন তোমার দেহ-নীপখানি পুলকে উঠিত ভরি'!
বাউল বাতাসে ভাসিয়া যেতাম তোমার ফুলের বনে,
অনন্ত তৃষা মিটায়ে দিতাম অনন্ত পাওয়া সনে।

রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন "অতি সহজে যাদের লিখবার শক্তি নেই এমনতর খাঁটি জিনিষ তারা লিখতে পারে না।" এ কথার সার্থকতার নিদর্শন "বালুচরে" বহুবার পাওয়া যায়, তথাপি একই কথা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার দরুন বইখানির রসাস্বাদ গ্রহণ মন্দীভূত হ'য়ে আসে। কাব্য-সম্পদে সঙ্গতিহীন এ কথা আমার বক্তব্য নয় কেননা বহুতর পদে, বহুতর স্থানে কাব্যরস ভরে আছে কিন্তু অসার করেছে এই কাব্যসম্পদকে কবির একটা অতিমাত্রিক ভাবালুতা। একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দন ও আপশোষের পালাও পরিতৃপ্তিতে বাধা দিচ্ছে। জায়গায় জায়গায় অর্থহানিও হয়েছে। ছন্দ সাধারণতঃ একঘেয়ে, কোথাও বৈচিত্র্য নেই। আজ শুধু এই কথা বলে আমি "বালুচর"কে বিদায় দিলাম যে "বালুচরে"র কবির শ্রেষ্ঠতর লেখার জন্য আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Sur les Traces du Bouddha, René Grousset—(Paris, Librarie Plon)

যাঁরা রিসার্চ বা কোন বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করেন তাঁরা সব দেশেই অনেকটা কোণঠাসা হ'য়ে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে তাঁদের লেখা অতি নীরস এবং তাদের লেখা প্রবন্ধ বা বই এত পাদটীকায় ভরা

যে সেগুলি মোটেই সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু সব দেশেই কতকগুলি লেখক থাকেন যাঁরা সেই সব বিশেষজ্ঞদের আলোচনা সরস ভাষায় চিত্তাকর্ষক ক'রে সাধারণের সাম্‌নে উপস্থিত করেন; রেনে গ্রুসে (René Grousset) হ'লেন সেই দলের একজন। তাঁর কলমের বেশ জোর আছে—আর্ট ও দর্শনে তাঁর সমান দৃষ্টি। প্রাচ্য সভ্যতা বুঝবার ও নিজদেশবাসীদের তা' ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্যই তিনি অনেকদিন ধ'রে তাঁর সমস্ত শক্তি নিযোজিত ক'রে আস্‌ছেন। তাঁর বইয়ের ভিতর—Histoire de l' Extrême-Orient, Les Civilisations de l' Orient ও Histoire de l' la Philosophie orientale হচ্ছে প্রধান। বইগুলি ইতিহাসের ছাঁদে লেখা হ'লেও মোটেই নীরস নয়—কারণ ফরাসী পণ্ডিতদের মতে ইতিহাস শুধু রাজাদের রাজ্যকাল ও দিগ্বিজয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হয় না; রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোতে দেশের সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখানোই হচ্ছে তাঁদের মতে ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রুসের ইতিহাসও সেই ধরণের লেখা—সেই জন্য তাঁর সব বইগুলিই চিত্তাকর্ষক।

সম্প্রতি গ্রুসের একখানি নূতন বই বেরিয়েছে—Sur les Traces du Bouddha অর্থাৎ "বুদ্ধের চরণচিহ্ন অনুসরণে"। এ বইখানি যদি আমাদের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে তাহ'লে খুবই দুঃখের বিষয় হবে; কারণ প্রাচীন ভারতের সব চেয়ে গৌরবের যুগ-সম্বন্ধে এমন বই আর এ পর্য্যন্ত কেউ লেখেননি।

লেখক বুদ্ধের চরণচিহ্ন অনুসরণ ক'রে এসিয়া পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর পথপ্রদর্শক হয়েছেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়ান-চাং (Hiuan Tsang) ও ই-চিং (Yi-tsing)। প্রাচীনকালে এসিয়ার যে যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সেই সঙ্গে ভারতের আর্ট, সাহিত্য ও দর্শন গিয়েছিল, সেই সেই দেশই তিনি চীনা পরিব্রাজকদের চোখে দেখ্‌ছেন ও সেগুলির অধিবাসী, সমাজ, ধর্ম্ম, ভাস্কর্য্য ও সুকুমার শিল্প প্রভৃতিকে জীবন্ত ক'রে আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত করছেন। তাঁর এই বর্ণনায় যে সব দেশ স্থান পেয়েছে তা'র ভিতর মধ্যএসিয়ায় তুর্ফান (Turfan), কুচা (Kucha), খোটান (Khotan), আফগানিস্থানে বমিয়ান (Bamiyan), কপিশা (Kafiritan), নগরহার ও গান্ধার, ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলি ও পূর্ব্বসমুদ্রপথে শ্রীবিজয়, যবদ্বীপ, কম্বুজ ও চম্পাই প্রধান। এই হচ্ছে বৃহত্তর ভারতের গণ্ডি, তাই আজও মধ্য এসিয়াকে Ser-India এবং ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের দেশগুলিকে Indo-China বা Further India এবং দ্বীপপুঞ্জকে Insulindia বা Insular India বলা হয়। ভারত তার প্রাচীন গৌরব হারিয়েছে—কিন্তু ঐ সব দেশের সভ্যতার গঠন-কার্য্যে ভারতের প্রভাব আজও বিদ্যমান।

এই সব দেশের সভ্যতার চিত্রাঙ্কনে গ্রুসে যে শুধু চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণের উপরই নির্ভর করেছেন তা' নয়—গত শতাব্দী থেকে আজ অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ সব দেশ-সম্বন্ধে যত আলোচনা করেছেন তা'ও কাজে লাগিয়েছেন। এর উপর চিত্রাঙ্কনে তাঁর নিজের বিশিষ্ট প্রতিভাও রয়েছে।

এই সব দেশ অনুপ্রেরণা পেয়েছিল প্রাচীন ভারতের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কাছে। গ্রুসে মনে করেন যে ভারতের এই প্রতিভা পূর্ণবিকাশ লাভ করেছিল

বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে। তাই গ্রুসের মতে বৌদ্ধযুগ হচ্ছে জগতের ইতিহাসে একটা বড় কল্প, আর খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হচ্ছে সেই কল্পের সবচেয়ে স্মরণীয় যুগ। তখন ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু এসিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে ভারত ও চীনদেশকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত জাতির রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, শিল্প ও ধর্ম্মজীবন অপূর্ব্ব প্রাণসঞ্চারে শক্তিমান হ'য়ে উঠেছে।

এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ও চীনদেশের সংযোগ বিধান ক'রে সিংহল থেকে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে যে এক নূতন humanismএর স্রোত বইয়ে দিয়েছিল, তা'র গতি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতক পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ছিল। হাজার বছর ধ'রে ধ্যান ক'রে বৌদ্ধ সাধক তা'র আত্মাকে যে স্তরে উন্নীত করতে পেরেছিল তা' এখনো আমাদের কল্পনার অতীত।

এই humanismএর ভিতর দিয়েই ভারতীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বে এক নূতন প্রাণ-সঞ্চার হয়েছিল এবং তারই অনুপ্রেরণা পেয়ে বৌদ্ধজগতে যে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার সৃষ্টি হয় তা' দেখে আজও সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ। ভারতে অজন্তা, যবদ্বীপে বোরোবোদোর (Borobodor), জাপানে হোরিয়ুজী (Horiyuji), চীনে ইউন্‌-কাং (Yun-kang) ও মধ্যএসিয়ায় তুন-হোয়াং (Tun-huang) তা'রই চরম সাক্ষ্য।

এই অপূর্ব্ব আর্ট-সৃষ্টির মূলে যে বৌদ্ধসাধকের ভক্তি ও মাধুর্য্যপ্রবণভাব নিহিত ছিল তা গ্রুসের ন্যায় পাশ্চাত্য লেখকের অন্তরেও এক অভিনব বেদনার সঞ্চার করেছে—তাই তিনি অজন্তার আর্টে শান্তিদেবের মত ভক্ত কবির ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পেয়েছেন। আমরাও শান্তিদেবের সেই অপূর্ব্ব কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ দিয়েই গ্রুসের বইয়ের আলোচনা শেষ করব।

শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতারে বল্‌ছেন—"আমার চিত্তকে সম্যক্‌ উদ্ভাসিত করবার জন্য তথাগতদের পূজা করব—নির্ম্মল ধর্ম্মরত্ন ও নানা গুণের আকর কুলপুত্রদেরও পূজা করব।

"সারা জগতে যে সব ফুল-ফল ও লতা-পাতা আছে, যে সব রত্ন ও স্বচ্ছ সুস্বাদু জল আছে, নানা রত্নে পরিপূর্ণ যে সব পর্ব্বত, চিত্তহরণকারী যে সব বনপ্রদেশ, সুশোভন পুষ্পাভরণে মণ্ডিত যে সব লতা, সুকুমার ফল-ভারে নম্রশাখ যে সব বৃক্ষ, দেবলোকের যে সব গন্ধধূপ ও রত্নময় কল্পতরু, নানা বর্ণের কমলে শোভিত যে সব সরোবর, মনোহরণকারী যে সব হংস-কলধ্বনি ও প্রকৃতিজাত যে সব শস্য আছে, এই সব পূজাসম্ভারের মধ্যে যা' এখনও অন্যের লোলুপদৃষ্টিতে মলিন হয়নি—সেই সব অর্ঘ্যে আমি তাঁদের মানসপূজা করব। তাঁদের নিকট এসব অর্ঘ্য তুচ্ছ হ'লেও করুণাপর হ'য়েই তাঁরা এসব গ্রহণ করবেন, কারণ আমি পুণ্য-দরিদ্র, এ ছাড়া আমার আর কোন অর্ঘ্য নেই।

"যে সব সুগন্ধময় স্নানগৃহ উজ্জ্বল স্তম্ভের উপর স্থাপিত, যা'র বিতানসমূহ মুক্তার ঝলকে উদ্ভাসিত, যা'র কুট্টিম স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল স্ফটিকে খচিত, যার কক্ষসমূহ মনোহারী গন্ধোদক ও পুষ্পপূর্ণ কুম্ভে সজ্জিত—সেই সব স্নানগৃহে আমার সঙ্গীতের সুরযোগে তাঁদের স্নান করাব। আমার সেই দেবতাদের তনু অগুরুগন্ধে আমোদিত ও ধৌতধবল দুকূলে মুছিয়ে দেব ও শোভনরাগে রঞ্জিত, সুবাসিত চীবরে সজ্জিত ক'রে দেব।

"দিব্য মসৃণ ও বিচিত্র বস্ত্র এবং অলঙ্কারে আমি সমন্তভদ্র, অজিত ও মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি লোকেশ্বরদের সজ্জিত করব। সারা ভুবনকে যে গন্ধ আমোদিত করতে পারে সেই গন্ধই আমি তাঁদের সুবর্ণপ্রভ উজ্জ্বল তনুতে লেপন ক'রে মন্দার, উৎপল, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধময় ফুল ও সুগ্রথিত মালা দিয়ে তাঁদের অর্চ্চনা করব।"

বৌদ্ধ চিত্রকর ও ভাস্করের হৃদয়ও এই অনুভূতিতেই উদ্বেলিত হয়েছিল—তাই অজন্তা ও হোরিয়ুজীতে এই চিত্রেরই আনুবর্ণিক প্রতিলিপি পাওয়া যায়—ইউন-কাং ও তুন হোয়াং-এর ভাস্কর্য্যেও এরই প্রতিচ্ছবি। গ্রুসে নিজে আর্টিষ্ট—তাই বৌদ্ধ আর্টের এই চরম অভিব্যক্তি অঙ্কিত করাই তাঁর বইয়ের প্রধান লক্ষ্য হয়েছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম্‌-এ। শরচ্চন্দ্র এণ্ড সন্স্, ২১, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবান্বিত, রচনাবলী বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা বাংলা ভাষায় বিরল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ' বোধ হয় বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনার একমাত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে গদ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথের এত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে যে অজিতচন্দ্রের ক্ষুদ্র পুস্তকটিকে এখন আর ব্যাপক বলা চলে না। অজিতবাবু ছাড়া আরো কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। বিশ্বপতিবাবুর এই পুস্তকটিতেও সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। কিন্তু পুস্তকটির নাম দেখিয়া ধারণা হয় যে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য না হইলেও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য। যতদূর জানি এই উদ্দেশ্যে বাংলা-ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর একটি পুস্তক রচিত হইয়াছে—কাজী আব্‌দুল ওদুদের 'রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠ'।

'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকটির মুদ্রণ ও গঠন-সৌষ্ঠব উল্লেখযোগ্য। মনে হয় মলাটের উপরকার চিত্রটি কবির আকৃতি অবলম্বনে অঙ্কিত; কিন্তু কেহ যেন ইহাকে কবির প্রতিকৃতি বলিয়া ভুল না করেন, কেননা, ইহা প্রতিকৃতি নয়, পরিকল্পনা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে পাঠকগণের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে রসবিচার এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ দুয়েরই প্রয়াস আছে"। 'রসবিচার' অবশ্য বোধগম্য, কিন্তু 'তত্ত্ববিশ্লেষণ'ও কি কাব্যালোচনার অপরিহার্য্য অঙ্গ? কিন্তু বিশ্বপতিবাবু যখন 'দুয়েরই প্রয়াস' করিয়াছেন, তখন কি ভাবে তিনি এই প্রয়াস করিয়াছেন তাহাই আমাদের আলোচ্য।

পুস্তকটি তিন ভাগে বিভক্ত—রূপজগৎ, অরূপের পথে, অরূপ। 'রূপজগৎ' অংশটির আবার দুই ভাগ আছে—নিসর্গ ও নারী। এই পাঁচটি বিভিন্ন অং

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের, শুধু পাঁচটি বিভিন্ন ধারা নয়, পাঁচটি বিভিন্ন স্তর নির্দ্দেশ করিতেছে, পুস্তকটিতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। এইখানেই আমার প্রথম আপত্তি। কোনো বড় কবির সমগ্র কাব্যকে এইভাবে কতকগুলি বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা চলেনা। অবশ্য এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য বিশ্বপতিবাবু নজির দেখাইতে পারেন। নজিরমাত্রই যে মানিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই; কিন্তু যদি নজির মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠে, এই শ্রেণীবিভাগে গ্রন্থকার যে ক্রমপরিণতির ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহা কি ঠিক? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্য একদা নিসর্গ ও নারীর বন্ধনে রূপজগতে আবদ্ধ ছিল, তাহার পর একদিন মুক্তিলাভ করিয়া তাহা অরূপের পথে যাত্রা করিল এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া অরূপের প্রেরণায় তাহা নবরূপ পরিগ্রহ করিল—ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রমপরিণতির ধারা?

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বয়সে নারী সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন; 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'ক্ষণিকা', 'উৎসর্গ', 'পূরবী', 'মহুয়া' এবং হয়তো 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'বলাকা'ও তাহার প্রমাণ। এমন কোনো বয়স নাই যখন রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ সম্বন্ধে কবিতা লেখেন নাই। যদি তাঁহার বিপুল ও বিচিত্র কাব্যের কোনো একটি মূল স্থর নির্দ্দেশ করা যায় তাহার প্রেরণা নিশ্চয়ই নিসর্গ। কিন্তু একথাও সত্য যে তাঁহার পরিণত বয়সের নিসর্গ-কবিতাগুলির মধ্যে অসীমের এবং অরূপের উপলব্ধি যে-দীপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহা তাঁহার কৈশোরের বা যৌবনের কবিতায় দুর্লভ। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, কোনো কবির কাব্যকে সমগ্র ও ব্যাপকভাবে বুঝিতে হইলে, বোধ হয় ইহার স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির ধারাকে অবলম্বন করিয়া ইহার আলোচনা করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। দুঃখের বিষয়, বিশ্বপতিবাবু তাহা করেন নাই। তাই তাঁহার রচনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রমপরিণতির উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার ধারণা একেবারেই স্পষ্ট হয় নাই।

বিশ্বপতিবাবুর আলোচনা-রীতি কবির বিভিন্ন বয়সে রচিত বিভিন্ন কবিতার অংশ উদ্ধার করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য করা। মন্তব্যের উদ্দেশ্য অবশ্য রসবিচার ও তত্ত্ববিশ্লেষণ। বিচার ও বিশ্লেষণ বিশ্বপতিবাবু প্রাণপণে করিয়াছেন, কিন্তু কবির কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকের মনে তাহাতে কোনোই ধারণা হয়না। তাহার কারণ, কাব্যালোচনার প্রাণ রসবোধ; বিশ্বপতিবাবুর রচনায় রসবিচারের কঠিন প্রয়াস থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, তাঁহার রসবোধ তত্ত্ববিশ্লেষণের উৎপীড়নে প্রায় লোপ পাইয়াছে। আরও একটি কারণ আছে। কোনো বড় কবির সমগ্র কাব্যের আলোচনা এরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে করা চলেনা। একথা সত্য যে কোনো শিল্পসৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে তাহাকে দেশকালের গণ্ডি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যেই তাহার স্বরূপের সন্ধান করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো একটি কবিতার আলোচনা এই রীতিতে করা চলে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশ বাছিয়া লইয়া, কবির জীবনের বিস্তৃত পটভূমি হইতে, তাঁহার কাব্যের ক্রমপরিণতির স্বাভাবিক ধারা হইতে এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি বিশেষ পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করিলে এবং এই উদ্ধৃত অংশগুলির উপর নির্ভর করিয়া নিসর্গ বা নারী বা অরূপ রবীন্দ্রনাথের মনকে কি ভাবে স্পর্শ করিয়াছে এই সম্বন্ধে কতকগুলি মত প্রচার করিলে, তাহা তত্ত্বালোচনা হইতে পারে কিন্তু কাব্যালোচনা হয়না।

এইবার বিশ্বপতিবাবুর রসবিচারের ও তত্ত্ববিশ্লেষণের তুই-একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পুস্তকের প্রথম অধ্যায় 'নিসর্গ'। এই অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, "কবির চিত্ত বর্ষার রুদ্ররূপ কোনোদিন অনুভব করে নাই—মনের গঠনও সেরূপ তাঁহার নয়।" রবীন্দ্রনাথ যদি বর্ষার রুদ্ররূপ অনুভব না করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কেননা, রুদ্র বা কান্ত কোনো রূপই আমরা অনুভব করি না, দেখিয়া থাকি। কিন্তু ধরিয়া লইলাম, কোনো নিগূঢ় উপায়ে রূপ অনুভব করা যায়। তাহা হইলেও বিশ্বপতিবাবুর এই উক্তি প্রমাণসাপেক্ষ। আমরা নিম্নে তুই-একটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম ঃ—

(১) গগন সঘন অব, তিমির-মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর। (মরণ—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

(২) ঈষাণের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা ··· (বর্ষশেষ—কল্পনা)

(৩) তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি,
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরয নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জ্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

* * * *

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে তুলি,
সেই মতো তব কম্পিত বাহু তুলি,
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ সন্ন্যাসী কাজ নাই জপেজাপে।
(আষাঢ়—নটরাজ)

উদ্ধৃত কবিতা তিনটির প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের, দ্বিতীয়টী মধ্য-বয়সের ও তৃতীয়টি পরিণত বয়সের রচনা। এই তিনটি কবিতায় বর্ষার যে রুদ্ররূপের আভাস আমরা পাই, কবির অজস্র গানে ও কবিতায় তাহা বারম্বার মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্তগুলির উল্লেখ করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বর্ষার রুদ্ররূপ দেখেন নাই তাহা নহে, তিনি বরাবরই শুধু 'শান্তরসের সাধক'। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে শান্তরসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; বোধ হয় এইগুলি পড়িলে বিশ্বপতিবাবুর উক্ত সরল বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে।

(১) মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প-সম ফোঁসে···
(তুরন্ত আশা—মানসী)

(২) আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ-খেলা
নিশীথ-বেলা !
(ঝুলন—সোনার তরী)

(৩) সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি !

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা,
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,—
অয়ি অসম্বৃতে! (উর্ব্বশী—চিত্রা)

(৪) রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী!
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস্ হ'রে
আমার যামিনী?
(আহ্বান—কল্পনা)

(৫) হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সঙ্ঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।
(হে মোর সুন্দর—বলাকা)

আরো অনেক কবিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রুদ্রের প্রকাশ আছে কিনা সে সম্বন্ধে যদি কাহারও দ্বিধা থাকে তিনি একবার 'বলাকা' ও 'নৈবেদ্য' পড়িতে পারেন। পাতায় পাতায় তাঁহার দ্বিধা ঘুচিবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু রুদ্রের সংহার-মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহার দক্ষিণ মুখের আশ্বাস-বাণীও শুনিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন রুদ্রেব এক হস্তে উদ্যত প্রহরণ, অপর হস্তে প্রসারিত অভয়মুদ্রা। তিনি দেখিয়াছেন রুদ্রের ললাটনেত্র অগ্নিচ্ছটায় দীপ্ত, কিন্তু তাঁহার দুই নয়ন প্রেমে স্নিগ্ধ। তাই একদিকে যেমন নটরাজের প্রলয়-তাণ্ডবের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি এক অলক্ষ্য নটীর নৃত্যমন্দাকিনীর জলধারায় মৃত্যুস্নানপূত বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব শুচিতা ও আকাশ-ব্যাপী নীলিমার অসীম নির্ম্মলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে ও তাঁহার চিত্ত হইতে সকল অশান্তি হরণ করিয়াছে।

নিসর্গের পর নারী, কেননা, কবি নাকি "অকূলে তরী ভাসানোর পূর্ব্বে এখানকার এই মাটীর পৃথিবীতে বাস করিয়া দুইটি জিনিষ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, একটি প্রকৃতি অপরটি নারী।" তাহার পর বোধ হয় যেই তাঁহার ভোগস্পৃহা মিটিয়াছে, অমনি তিনি অকূলে পাড়ি দিয়াছেন। 'নারী'-শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথমেই বিশ্বপতিবাবু বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক কবি।...অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়-লালসার দিক্‌টা অত্যন্ত বেশি ফুটিয়াছে। আমার কিন্তু ঠিক বিপরীত ধারণা।" এ কথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলিকে 'নারী-বিষয়ক' কবিতা বলা যাইতে পারে তাহাদের কোনও স্থানে যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আভাস নাই তাহা নহে, কিন্তু এই অতি-সূক্ষ্ম আভাস কোথাও লালসার উন্মত্ত প্রকাশে পরিণত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে অপরূপ রূপের ইন্দ্রজাল সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার নারী-বিষয়ক কবিতাগুলি তাহারই বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠে! রবীন্দ্রনাথকে কি 'প্রেমিক কবি' বলা যায়? 'প্রেমিক কবি' কথাটি অবশ্য খুব সুশ্রাব্য নয়, কিন্তু ভাষার ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-অর্থে বিশ্বপতিবাবু এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কি সমর্থন করা যায়? অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর প্রেম সম্বন্ধে কবিতা কি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের একটি বড় অংশ? রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় নিশ্চয়ই প্রেমানুভূতির আভাস আছে। অনেক কবিতায় এই অনুভূতি অত্যন্ত করুণ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, 'মানসী'র 'ভুলে,' 'ভুলভাঙা,' 'বিচ্ছেদের শান্তি,' 'আমার সুখ' বা 'উৎসর্গে'র 'মন্ত্রে সে যে পূত, রাখীর রাঙা সূতো' প্রভৃতি কবিতায় বা 'স্মরণে'র কবিতাগুলিতে। 'বলাকা,' 'পূরবী' ও 'মহুয়া'য় এই অনুভূতি আকাশের নীলিমায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্বপ্নে স্বপ্নে অসীম শূন্য আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং অজস্র মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নিরবধি কালের মধ্যে অচল-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'প্রেমিক কবি' বলা চলে না। কেননা পুরুষ ও নারীর যে-নিগূঢ় সম্বন্ধ জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখের আবেষ্টনের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠে, তাহার অন্তরঙ্গ অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোথাও প্রবল হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রেম তাঁহার কল্পলোকের প্রেম। হয়তো এই প্রেম তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গভীর বেদনার রূপান্তর, এই প্রেমের বিপুল মহিমায় মণ্ডিত হইয়া তিনি হয়তো প্রেমের অমরাবতীতে সম্রাটের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন, হয়তো এই প্রেমের সম্পদ তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনকে অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে, কিন্তু দুইটি মানব-হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ যে-প্রেমের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার আভাস থাকিলেও তাহা কখনো একান্ত হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পটভূমি অসীম বিশ্ব এবং অনন্ত কাল; তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি এই পটভূমির উপর আলোছায়ার ক্ষণিক বিলাসমাত্র। তাই যে-অর্থে আমরা চণ্ডীদাস, ব্রাউনিং, বার্ণস্ বা এলিজাবেথীয় যুগের অনেক কবিকে প্রেমের কবি বলি, সে অর্থে রবীন্দ্রনাথকে কখনোই প্রেমের কবি বলা চলে না।

নিসর্গ ও নারী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়া বিশ্বপতিবাবু 'অরূপের পথে' কবির অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবুর মতে এই পথের আরম্ভ 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'; 'খেয়া,' 'নৈবেদ্য' প্রভৃতিতে আসিয়া ইহা প্রশস্ত হইয়াছে এবং 'গীতাঞ্জলি' ও পরবর্ত্তী কবিতাগ্রন্থসমূহে ইহার পরিসমাপ্তি। বিশ্বপতিবাবুর যদি এই বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে নিসর্গ ও নারী কি দোষ করিল যে এই পথ হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বতন্ত্র রূপ-জগতে তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করা হইল? 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' কবি প্রথম নিজের সুর আবিষ্কার করেন একথা তিনি নিজে বলিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবুর মতে "'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া কবির যে-বিশেষ মানসিক বৃত্তিটিকে আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখি, তাহা তাঁহার দুঃখানুভূতি।" যদি দুঃখানুভূতিই কবির বিশেষ মানসিক বৃত্তি হয় তাহা হইলে কি তাঁহার নিসর্গ ও নারী-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না? বিশ্বপতিবাবু অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে যায়। কিন্তু তাহা হইলে এই বৃত্তি কি করিয়া কবির কাব্যের ভিতর দিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত

হইয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হইলে বিশ্বপতিবাবু যে-রীতি অবলম্বন করিয়াছেন—অর্থাৎ কবির সমগ্র কাব্যকে রূপজগৎ, অরূপের পথে ও অরূপ, এই তিন ভাগে ভাগ করা—তাহাই কি প্রকৃষ্ট? এই রীতির ত্রুটি কি তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশ্বপতিবাবু যে নিসর্গ ও নারীর পালা শেষ করিয়া আবার সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে আলোচনা স্বরু করিয়াছেন, তাঁহার আলোচনা-রীতির ত্রুটির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"দুঃখানুভূতি" ব্যাপারটিও আলোচ্য। কবির এই মানসিক বৃত্তি নাকি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তাঁহাকে একবারে 'ভূতের মত' পাইয়া বসিয়াছে। এই ভূত নামাইবার জন্য কবিকে ওঝার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল কিনা বিশ্বপতিবাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 'প্রভাত-সঙ্গীতে' যে এই ভূতের দৌরাত্ম্যের বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায়না তাহা তিনি স্বীকার করেন। তবু দুঃখানুভূতিই যে কবির বিশেষ মানসিক বৃত্তি তাহা প্রমাণের জন্য তিনি কবির পরবর্ত্তীকালের নানা কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খুব যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারিনা। কেননা এই দুঃখানুভূতি বলিতে কি বোঝায় তিনি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। একস্থানে তিনি বলিতেছেন যে ইহা pessimism নয়। আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, "এই দুঃখপ্রিয়তা, এই অবসাদ, এই অতৃপ্তি"। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'খেয়া' পর্য্যন্ত নাকি এই দুঃখপ্রিয়তার অবিচ্ছিন্ন ধারা কবির অগোচরে তাঁহার কাব্যের তলে তলে বহিয়া আসিয়া 'খেয়া'তে হঠাৎ তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া গেল। বিশ্বপতিবাবু আশ্বাস দিয়াছেন, একদিন কবির এই দুঃখপ্রিয়তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবেন। কিন্তু একটু বিস্তারিতভাবে লিখিলেই ভালো, কেননা তাহা হইলে প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা সকলে জানিতে পারিবে।

কিন্তু আপাতত সমালোচকের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতি-মাল্য' এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে অসীমের যে-উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, খেয়া'তে ও 'নৈবেদ্যে' তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, এবং এই পূর্ব্বাভাস আকস্মিক নয়, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' প্রথম যে সুরটি বাজিয়াছিল, তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু এই ক্রমপরিণতির মূল সুর কি দুঃখবোধ? রবীন্দ্রনাথের যৌবনের ও বার্দ্ধক্যের পরিণত ও অপরিণত নানা কবিতায় দুঃখের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'দুঃখবোধ' বা 'দুঃখপ্রিয়তা', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ছাড়া আর কোথায়ও বড় হইয়া উঠে নাই। বিশ্বপতিবাবু দুঃখবোধকে এক বিশিষ্ট অর্থে ধরিয়া লইয়া তাঁহার উক্তি হয়তো সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখবোধ বলিবার তাৎপর্য্য কি? দুঃখবোধের মধ্য দিয়া কি কবি তাঁহার জীবন-দেবতার সাধনা করিয়াছেন? দুঃখ-বোধের মধ্য দিয়া কি তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অদ্বৈতের যে অখণ্ড প্রকাশ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন? ব্যক্তিগত জীবনে কবি বারম্বার গভীর দুঃখ পাইয়া থাকিতে পারেন এবং তাঁহার কোনো কোনো কবিতার মূলে দুঃখবোধের প্রচ্ছন্ন উৎস থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে-মানসিক বৃত্তি তাঁহার সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যে দুঃখানুভূতি একথা মানিয়া লওয়া যায় না; দুঃখপ্রিয়তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুর নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যদি কোনো একটি মূল সুর নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা নিসর্গ। প্রকৃতির সহিত কবির যে-অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাঁহার কাব্যের মধ্যে আমরা

তাহারই স্তরে স্তরে বিকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার কৈশোরের কবিতায় এই পরিচয়ের প্রথম স্ফূর্ত্তি প্রথম প্রণয়ের মতোই দীপ্ত ও নবীন ; 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য় ইহা গাঢ়তর হইয়াছে ; 'বলাকা' ও 'পূরবী'তে ইহা অসীম জগতের ও অনন্ত কালের মধ্যে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহার সকল বয়সের কবিতাতেই এই দৃশ্যমান্ জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে মুগ্ধ করে; কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সুদূরপ্রসারী কল্পনার মধ্য দিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপান্তর লাভ করিয়াছে। তাই তাঁহার সকল বয়সের কবিতার মধ্যেই এক অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতের আভাস পাওয়া যায়, যদিও তাঁহার শেষ বয়সের, বিশেষত 'বলাকা' ও 'পূরবী'র, কবিতায় এই আভাস অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বলাকা' ও 'পূরবী'তে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—

·········transcending these
Far other worlds and other seas.

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই চরম পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্বপতিবাবু তাঁহার পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের তিনি নাম দিয়াছেন 'অরূপ'। নামটি অসঙ্গত হয় নাই। বিশ্বপতিবাবু সর্ব্বপ্রথম 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি পুস্তকের কবিতার সহিত বৈষ্ণব কবিতার তুলনা করিয়া অনেকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ অস্পষ্টতার যে-অভিযোগ আনে তাহার উত্তর দিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবুর উত্তরের মর্ম্ম এই যে বৈষ্ণব কবিদের ভগবান মানুষের রূপে এবং মানুষের পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেবতাকে মানুষের রূপে কল্পনা করা চলে না এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে স্থান-কালের সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই। তাহা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতার যাহা ভিত্তি তাহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত। তাই বৈষ্ণব কবিরা জানিতেন যে "ভগবানকে কাব্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা যত নিকটেই আনুন না কেন, তাঁহার আর একটি দিক্ পাঠকেরা পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসংস্কারবশে আপনা হইতে মনের মধ্যে ধারণা করিয়া লইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাগবত-উপলব্ধির পশ্চাতে সেরূপ কোনো পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত নাই।" ইহা সুযুক্তি। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে না বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনেন, বিশ্বপতিবাবু তাঁহাদের সদুত্তর দিয়াছেন। তবে 'ভাগবত-উপলব্ধি' কথাটি অনুমোদন করা যায়না ; অরূপের বা অসীমের উপলব্ধি ও ভাগবত-উপলব্ধি ঠিক এক জিনিষ নহে। বিশ্বপতিবাবু কিন্তু আরও একটি কথা বলিতে পারিতেন—যাঁহাদের রসবোধ নাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্পষ্ট না অস্পষ্ট তাহা বিচারের প্রয়াস তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।

'অরূপ' অধ্যায়ে বিশ্বপতিবাবু অতঃপর যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে শুধু রসবিচারের ও তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রয়াস নাই, অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড দ্বারা রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের অনেক কবিতার রসের ও তত্ত্বের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্দ্দেশের চেষ্টা আছে। এই চেষ্টার ফলে বিশ্বপতিবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যে "গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির মধ্যে একদিকে যেমন প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি আমরা পাই, অপরদিকে তেমনি এমন অনেক কবিতাও পাই যেগুলি রসসৃষ্টি হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য নয়।" নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বপতিবাবু যে-উদাহরণগুলি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উক্তি প্রমাণিত হয়না। 'সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন তুই

সহজ হবি', 'মোর মরণে তোমার হবে জয়,' 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে'—এইগুলি কবিতা নয়, গান। তত্ত্ব বা রস এইগুলির মধ্যে কোন্‌টি বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা মনকে স্পর্শ করে শুধু কথার ভিতর দিয়া নয়, সুরের ভিতর দিয়া। বিশ্বপতিবাবু বোধ হয় এই গানগুলি শোনেন নাই, তাই রসসৃষ্টি হিসাবে ইহাদের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে চান্ না ; যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন এইগুলি তত্ত্বের ব্যাখান নয়, রসসৃষ্টি। অতএব রসসৃষ্টি হিসাবেই ইহাদের বিচার করিতে হইবে ; ভালো লাগা না-লাগা ব্যক্তিগত রুচির কথা।

তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রয়াস যে বিশ্বপতিবাবুর পুস্তকে কিরূপ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ 'বলাকা'-সম্বন্ধে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন যে বলাকায় দেখা যায় "কবি দুইভাবে তাঁর তত্ত্বটিকে রূপবান করিয়া তুলিতে পারেন,—তত্ত্বটিকে কোনো একটি পরিচিত, সমধর্ম্মী বাস্তবরূপের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়া, অথবা এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া যাহার মধ্যে তত্ত্বটি আপনা হইতে রূপবান হইয়া উঠে।" অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে কি ভাবে এই আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, বিশ্বপতিবাবু তাহার একটি রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"যেমন যদি কেহ এক ভীষণ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রজনীর বর্ণনা করেন এবং তারপর বলেন যে এ হেন দুর্য্যোগের রাত্রে পথ চলিতে চলিতে বিদ্যুতের চকিত আলোকে তিনি উক্ত হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হইতে দেখিয়াছেন, অমনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় সংবাদের রূপ ত্যাগ করিয়া রসরূপ ধারণ করিয়া বসে"—যেমন করিয়া, ঠিক তেমন করিয়াই নিরাকার তত্ত্ব সাকার হইয়া উঠে।

আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি "আজকাল," অর্থাৎ 'বলাকা' লিখিবার সময়ে, "নিজের চিন্তাধারাটি পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে চান, তাই তাঁহার চিন্তাপদ্ধতিটি পর্য্যন্ত কবিতার মধ্যে রূপবান হইয়া উঠে।" বিশ্বপতিবাবু ইহার একাধিক প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। 'বলাকা'র 'বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি' এবং 'এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর সাজাহান' এই দুইটি কবিতায় কবি নাকি 'দস্তুরমত চিন্তা করিয়াছেন'। আমার দুর্ভাগ্য কিম্বা কবির দুর্ভাগ্য জানিনা, 'কবির দস্তুরমত চিন্তা' আমার নিকট পরিস্ফুট নয়, এবং বোধ হয় এই কারণেই আমি 'বলাকা' উপভোগ করি, তত্ত্বের যাচাই না করিয়াও।

বিশ্বপতিবাবুর তত্ত্ববিশ্লেষণের ও রসবিচারের যে-নমুনাগুলি উদ্ধৃত হইল, তাহাই সব নয়। তাঁহার সমস্ত মতামতের আলোচনা করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের আলোচনা করিতে হয়, কিন্তু সাময়িক পত্রের পরিসরের মধ্যে তাহা সম্ভব নয়। তাঁহার সহিত সকল বিষয়েই যে সমালোচকের মত-বিরোধ আছে বা যথার্থ রসগ্রাহিতার পরিচয় তাঁহার পুস্তকে যে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে। তাঁহার পুস্তকের প্রধান ত্রুটি এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রম-পরিণতির ধারা অনুসরণ না করিয়া তাহার রসবিচারের ও তত্ত্ববিশ্লেষণের যে-চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফল হইয়াছে কতকগুলি অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ মন্তব্যের সমষ্টি। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত সুপরিচিত নন্, এই মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোনো ধারণা হইবে না।

সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি দুঃসাহসিক কাজ। এই কাজে সাফল্যের জন্য যে-দুর্লভ শক্তির প্রয়োজন, বিশ্বপতিবাবুর রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বিচার ও বিশ্লেষণ না করিয়াও সাহিত্যালোচনা চলে। কেহ যদি কোনো রচনা পাঠ করিয়া আনন্দ পান এবং এই আনন্দানুভূতি যদি নিজের লেখনীর সাহায্যে অপরের মনে সঞ্চার করিতে পারেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহাব বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্য-সমালোচনা রসসৃষ্টিরই সমান। দুঃখের বিষয়, বিশ্বপতিবাবুর রসবোধ থাকিলেও রসসৃষ্টির ক্ষমতা নাই—তাঁহার রচনাভঙ্গী মনকে স্পর্শ করে না, তত্ত্বের গুরুভারে তাহা ক্লিষ্ট। তাই তাঁহার লেখা পড়িবার সময় বারম্বার মনে হয় যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম গুরুমহাশয় নির্ব্বোধ ছাত্রগণকে দুরূহ পাঠ্য বুঝাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Philosophy of a Biologist—SIR LEONARD HILL, F.R.S., (Edward Arnold & Co.), **The Nature of Living Matter**—L. HOGBEN. Professor of Social Biology, London University (Kegan Paul), **Mind at the Crossway**—C. LLOYD MORGAN (Williams Norgate), **The Biological Basis of Human Nature**—H. S. JENNINGS (Faber & Faber), **Science and Religion**—B. B. C. TALKS (Howe, 1931), **The Making of Man —An outline of Anthropology** ;—EDITED BY V. F. CALVERTON, (The Modern Library), **Life : Outlines of General Biology**—SIR J. A. THOMASON & PROF. PATRICK GEDDES (2 Vols., Williams Norgate).

কিছুদিন পূর্ব্বে এডিংটন্, জীন্‌স্ ও মিলিক্যান্ পড়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করি—বৈজ্ঞানিকেরা মানুষ ছাড়া অতিমানুষ নন্। তাঁরাও মানুষের মতন নিজেদের পাতিহাঁসকে রাজহংস বিবেচনা করেন, এবং মানুষেব মতনই নিজেদের বিশেষ আলোচনার বহির্ভূত বিষয় নিয়ে বকৃতে গেলেই বেজায় বোকামি করে বসেন। তাঁদের এই 'মানুষিক' ব্যবহার দেখে ভারি আনন্দ হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে তাঁদের উপর রাগ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁদের ব্যুৎপত্তিকে হিংসা করতাম, মনে হ'ত সূত্রগুলো মন্ত্রের মতনই লোক ঠকাবার যন্ত্র মাত্র। প্রায়ই ভাবতাম, অঙ্কের হাত থেকে কি পরিত্রাণ নেই? নানান্ রকমের বিজ্ঞান রয়েছে, নতুন নতুন বিজ্ঞান তৈরি হচ্ছে, সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ কোন জবরদস্তী নেই, তাদের বিষয়বস্তু শিশি-বোতলেব মধ্যে, বাগানে, চিড়িয়াখানায়, বনজঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছে, সংখ্যার কবলে পড়েনি, ধ্যানরসিকদের মস্তিষ্কের মধ্যে বন্দী হ'য়ে তাদের পূর্ণসত্তা এখনও বিধ্বস্ত ও বিখণ্ডিত হয়নি, কবে সেগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে, কবে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সুসজ্জিত হ'য়ে ভদ্রলোকের পাঠ্য হবে? কবে সেই পরীক্ষক বৈজ্ঞানিকের সাধনা সম্পূর্ণ হবে, কবে তাঁরা প্রয়োগাগার থেকে বেরিয়ে, মুক্ত হাওয়াতে দাঁড়িয়ে জগতের সম্মুখে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করবেন? তাঁদের উপরই সমাজতাত্ত্বিকের ভরসা, কেননা, আমরা না পারি পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিতে, না পারি সাংখ্যিক সূত্র খাটাতে, অথচ জ্ঞানের অভাবে সমাজ রয়েছে অনেক পিছনে

প'ড়ে। আমি জানতাম যে, এই সব বিজ্ঞান বয়সে শিশু, তাদের সাধনা অসম্পূর্ণ, যতটুকু হ'য়েছে তার প্রচারও ভাল রকম হয়নি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির তুলনায়। আমি জনতাম যে, সাধনার প্রথম স্তরে মন্ত্রগুপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন থাকে। আমাদের শিক্ষাও এত একপেশে হয়েছে যে নব্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানবার শক্তি ও ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু মনে মনে আমার ভয় ঘোচেনি, একটা সন্দেহ বরাবরই ছিল যে, আজ না হয় কাল এ-সব বিদ্যাও সংখ্যাতত্ত্বের অধীনে আসবেই আসবে। কারণ, ভবিষ্যৎবাণী করাই যদি বিজ্ঞানের চরম সামাজিক সার্থকতা হয়, সমাজের মঙ্গলবিধানই যদি বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য, বিশেষত এই সব নতুন বিজ্ঞানের অব্যবহিত লক্ষ্য হয়, তাহলে ভবিষ্যৎবাণীগুলো সঠিক করার জন্যে সংখ্যা ছাড়া আর কি উপায় আছে? সংখ্যার দৌত্যেই ভবিষ্যৎবাণী সত্যের সখ্যলাভ করে। কিন্তু আবার ঐ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিকেরাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংখ্যামূলক সামান্য গুণের একটা স্বাতন্ত্র্য ও বড় রকমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, সত্তার সঙ্গে তার কোন সাম্য কি সাদৃশ্য, সালোক্য কি সাযুজ্য, সাজাত্য কি স্বারূপ্য কিছু নেই, আছে শুধু সার্ষ্টি, অর্থাৎ সত্তার সমান ঐশ্বর্য্য, ও সারথ্য। কিন্তু কায়া বাদ দিয়ে ছায়া নিয়ে প'ড়ে থাকলে মানুষের চলে না। আমার কারবার মানুষ নিয়ে, মানুষের সমাজ নিয়ে, যেখানে মানুষ বিচিত্র ও খেয়ালি, বিশেষ ক'রে যেখানে একটা গড়পড়তা গতির বিবরণ ও ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া নিয়মের অন্য অর্থ ও মূল্য নেই। আমার ব্যবসা সমাজতত্ত্ব নিয়ে, যার তত্ত্বকথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্বন্ধের ভেতরে ও অন্তরালে, সংস্কারের ব্যাপ্তিতে যে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে তাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলা। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাস করার মতন যৌগিক দুঃসাহস আমার ছিল না। আমি জানতাম যে, পদ্ধতি জিনিষটাই একটা সামাজিক ব্যবস্থা, অতএব ইতিহাসে তার একটা স্থান ও কর্ত্তব্য আছে। যেমন পূর্ব্বে ম্যাজিক ছিল, এখন তেমনি লজিক হয়েছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নানা রকমের সুবিধা ও অধিকতর সমস্যার সমাধান সম্ভব হ'য়েছে, অতএব তার প্রতিপত্তি অমান্য করবার স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা আমার কখনই ছিল না। এ-যুগে জন্মে, এ-যুগের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। বোধহয়, বিশ্বাসের মাত্রাধিক্যটুকু যুক্তিতর্কের দ্বারা মার্জ্জনাও করেছি। যে-পদ্ধতিতে নানা কারণে বিশ্বাস করতাম, সেই পদ্ধতির মূলে সংখ্যা থাকার জন্য পূর্ব্বে কোন সন্দেহই উঠ্‌ত না। যখন সংখ্যার কারচুপীতে সংশয় এল, তখন ঘট্‌ল বিপদ। এ-বৎসর সন্দেহের দোলাতেই দুলছি। এক-একবার ইচ্ছে হয়, এডিংটন্‌, জীন্‌সের বৈজ্ঞানিক মন্তব্যগুলি যাচিয়ে নিই, অথচ সে বিদ্যা নেই। তাই মনে হ'ল, যে-বিজ্ঞান সংখ্যার ওপর পূরোপূরি প্রতিষ্ঠিত নয়। তারই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্‌। জীবতত্ত্বকে বেছে নিলাম প্রধানত ঐ কারণে। তা ছাড়া আমার ধারণা ছিল এই, যে-কালে তত্ত্বটির গোড়ায় জীব কথাটি রয়েছে, আব আমরা যখন জীববিশেষ, অর্থাৎ আমাদেরও যখন অন্যান্য জীবের মতন জীবন রয়েছে, তখন পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে জীবতত্ত্বের কাছে জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করাই সঙ্গত হবে। সেইজন্য খানকয়েক নামজাদা জীবতাত্ত্বিকের নতুন বই পড়লাম। বলা বাহুল্য, সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান হ'ল না। জীবতত্ত্বের বই পড়ে ভাল ক'রে জীবন চালাবার বিশেষ কোন

সুবিধা হয়নি। কেন হ'ল না তাই লিখছি। গোটাকয়েক কারণ মাত্র নির্দ্দেশ করতে পারব।

প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান জীবতত্ত্ব সংখ্যার নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছে, দেখলাম। এতদিন ধরে জীববিজ্ঞান একটা না একটা মতের আশ্রয়ে বেড়ে উঠছিল, এবং সেই মতের যুক্তি খোঁজবার ভার নিয়েছিলেন এমেচারের দল। সেই জন্য অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। ডারুইন্ সাহেবের প্রধান কাজ ছিল শ্রেণীভাগ ও শ্রেণীর ভৌগলিক বিভাগ করা। শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাসটা তাঁর অব্যবহিত অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সীমার বাইরে ছিল। তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন তাঁর মতটা উৎপত্তির ইতিহাসে খাটাতে লাগলেন, তাঁর বই-এর নামের দোহাই দিয়ে, তখন নানা বাধা-বিঘ্ন এসে হাজির হ'ল। একটি মত সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না, অন্য একটি মতের দ্বারা। সেইজন্য যে-লামার্কিয়ান মতের খানিকটা ডারুইন্ নিজেই গ্রহণ করেছিলেন সেটার উজ্জীবনে জীববিজ্ঞানের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ল না। অ-বৈজ্ঞানিকের হাত থেকে জীবের মুক্তি বাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। এই সময় আবিষ্কৃত হল মেণ্ডেলের বইটা। তারই সহায়তায় জীবতত্ত্ব প্রয়োগাগারে প্রবেশ লাভ করলে। "ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে।" কিন্তু বারব্যাঙ্কের মত empiricist-এর দল ভারী ছিল না, তাই জীবতত্ত্ব পড়লো অধ্যাপকের হাতে এসে। সে হাতে এলে আর রক্ষা নেই। মেণ্ডেলের পাঠিগণিত হ'য়ে উঠল বীজগণিত—টম্‌সন্, গেড্ডিস্ বলছেন আইনষ্টাইনের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা জীবতত্ত্বের যথেষ্ট রয়েছে। লিওনার্ড হিল্ বিশদভাবে দেখালেন যে, পরমাণুর সঙ্গে জীবকোষের গঠন-সাদৃশ্য খুব বেশি। অন্যধারে আবার, পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে, হোয়াইট্‌হেড্ চাইছেন যে, পরমাণুর আন্তর্জাতিক (interatomic) সম্বন্ধটি বীজকোষের পরস্পর ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা হোক্। হগ্‌বেন্ বলেন, জীবতত্ত্বে physico-chemical reaction-এর দ্বারা যতদূর ব্যাখ্যা চলে তার মধ্যে প্রাণবাদ আনবার কোন দরকার নেই। তাঁর মতে, বাঙ্‌ময় জগতে, সামাজিক আলোচনার আসরে, mechanistic পদ্ধতিই একমাত্র উপায়; সাধারণের আদান-প্রদানের হাটে, ব্যক্তিগত গোপন কথা, গোপন ব্যথা প্রকাশ করা আগে যেমন ছিল অভদ্র রুচি, এখন তেমনি হ'য়ে উঠেছে অবৈজ্ঞানিক, অযুক্তিসঙ্গত। নব্য-নৈয়ায়িকদের মত এতদূর পর্য্যন্ত বলতে তিনি রাজি নন যে, যা প্রকাশ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু অব্যক্তের আপেক্ষিক মূল্য নিশ্চয়ই কম এতটা পর্য্যন্ত তিনি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয়—বিশেষত ধর্ম্ম ও আর্টের আবেদনের আলোচনা প'ড়ে। যদি জীবতত্ত্বকে প্রয়োগাগারের পরীক্ষার ওপর দাঁড় করান যায়, তাহলেও mathematical physicist-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় রয়েছে মনে হয় না। পরীক্ষা করতে গিয়েই অধ্যাপকেরা জীবতত্ত্বকে উচ্চাঙ্গের অঙ্কে এনে ফেলেছেন। এখন জীবের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অঙ্কশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলেই মানতে হবে। সব বিজ্ঞানই কি শেষে আইনষ্টাইনের দাসত্ব করবে, যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারুইনের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটনের দাসত্ব করেছিল? আইনষ্টাইনের মৃত্যুর পর জগৎ কিছু পিছু হটবে না। Corpuscular theory-তে ফিরে যাবার কথা শুনলে দুষ্টু ঘোড়ার দৌড়বার সময় চাট মারার কথা মনে হয়। ওটা বিজ্ঞানের retroactive action, back-kick, কাজের কথা নয়, কাজের কাজ হচ্ছে এগিয়ে চলা।

দ্বিতীয় কারণ এই,—একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন, বিশ্বটা হ'ল ধ্বংসাভিমুখী, সাবানের বুদ্বুদের মতন বাড়তে বাড়তে কোনদিন ফেটে যাবে। এক পাদ্রীসাহেব অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বটা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, আবার আর একজন অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, কড়াভাজা রুটির মতন তার ধারগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আবার একজন 'বিশ্ব-রশ্মির' সন্ধান পেয়ে অভয় দিচ্ছেন যে, বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতিপূরণ চলছে। এই ঝগড়ার মিটমাটের উপর জীববিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস অনেকটা নির্ভর করছে। যদি বিশ্বই যায় নষ্ট হ'য়ে, তাহলে অভিব্যক্তি নিরর্থক হ'ল, যদি না মানুষে গীতার ধর্ম্মানুসারে নিষ্কাম হ'য়ে 'মা ফলেষু কদাচন' মন্ত্র জপ করে। ও মন্ত্রে আশ্বস্ত হওয়া আমাদের মতন দূরদর্শী লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ঘুম হয় না, রাবণ দশটা মাথা নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরিতেন কি ক'রে, তাই ভেবে। যদি বিকীর্ণ শক্তির পুনঃসঞ্চয় সম্ভব হয়, তাহলে জীবতাত্ত্বিক উল্লসিত হ'য়ে অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসীকে জেলে দিতে পারবেন, খুন করতে পারবেন এই এক আশা ও সান্ত্বনা রয়েছে। কিন্তু আজতারিখ পর্য্যন্ত ঝগড়া মিট্‌ল না, অবিশ্বাসীরাও বেঁচে রইলেন। গণৎকারঠাকুর ঠিকুজি দেখে, যে-ছেলের অল্পবয়সে ফাঁড়া আছে বলেছেন, তাকে স্কুল পাঠশালে পাঠাতে ইচ্ছা না হওয়াই বাপ-মার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই জন্যই মাদুলী শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানতে হয়।

তৃতীয় কারণ,—দেখতে পাচ্ছি যে, জীবতাত্ত্বিকের মধ্যে দু'টি দল পাকিয়ে উঠেছে। তাঁরা নিজেদের অন্য আখ্যা দিলেও তাঁদেরকে mechanist ও vitalist বলা যেতে পারে। আজকালকার বাজারে বিশুদ্ধ mechanism ও বিশুদ্ধ vitalism-এর খাতির কমেছে। হগ্‌বেন্ নিজেকে বলছেন mechanist publicist, লয়েড্ মর্গ্যান্ নিজেকে emergent evolutionist পূর্ব্ব থেকেই বলেছেন, সেই মতের একটু অদল-বদল করে সেনাপতি স্মাট্‌স্ নিজেকে হোলিষ্ট (Holist) বললেন, জে, এস্ হল্‌ডেন্ ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে এসে, respiratory pigment-এর রিসার্চ্চ ছেড়ে দিয়ে, বেতারের মারফৎ জগৎকে জানালেন যে, হোলিজ্‌ম্ মানা ছাড়া জীবতাত্ত্বিকের কোন উপায় নেই। জেনিংস, যে জেনিংস নিতান্ত মাথা ঠাণ্ডা লোক, তিনিও emergent evolution-এর তরফদারি ক'রে তাঁর পুস্তক সমাপ্ত করলেন। মোদ্দা কথা এই দাঁড়িয়েছে, লয়েড্ মর্গ্যানের মত নেবো, না নেবো না। তাঁর প্রধান বক্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করেছেন, এবার মনো-জগতে সে মতটি প্রয়োগ করেছেন একটু বিস্তৃতভাবে। তিনি বলছেন, দেখা যাচ্ছে যে জগতে গোটা কয়েক পরিষ্কার স্তর রয়েছে, অজীব, জীব, মন, প্রত্যেকটির মধ্যে ব্যবধান, সান্তরতা রয়েছে যেটা পার হ'তে গেলে লাফাতে হয়, প্রত্যেক স্তরে এমন একটি নতুন গুণের আবির্ভাব হচ্ছে যার সম্বন্ধে পূর্ব্বের ধাপ থেকে কোন প্রকার ভবিষ্যৎবাণীই করা যায় না। এখন মজা হ'ল এই যে, এ-ধরণের উদ্‌গতিবাদে বিশ্বাস করলে অনেক সুবিধা হয়। অজীব, জীব, মন—বিবর্ত্তনের এই মোটা ধারাটি মানলেই আত্মতৃপ্তি আসে—কেননা, যেটি শেষে প্রকাশিত সেইটিই সব চেয়ে উন্নত, আর যেটি উন্নত, অনুন্নতের উপর একটা স্বাভাবিক দাবী তার থেকেই যায়। তার উপর, ধর্ম্ম-রক্ষাও হয়। যদি মন পর্য্যন্ত এসে থাকে তাহলে মনের ওপারে যাবে না কেন? আর ওপারে গেলেই ধর্ম্ম, আত্মা, ভগবান প্রভৃতির মধ্যে একটা কিছুতে পৌছাতেই হবে।

দার্শনিকের সেরা দার্শনিক আলেক্‌জাণ্ডার এই বিশ্বাস করেন। আমরা ত বিশ্বাস করবই, তাঁর মাত্র একটা deity, আমাদের ত্রেত্রিশ কোটি ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার চেয়ে মাত্র কিছু কম, অহিন্দুদের দেবতা নেই কিনা! ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের লয়েড্ মর্গ্যান্ ভারী সুবিধা ক'রে দিয়েছেন। শুধু কি তাই? যাঁরা মানুষ নিয়ে কারবার করেন, যেমন কবি ও সমাজতাত্ত্বিক, তিনি তাঁদেরও পূজার্হ। মানুষ আগে ছিল বীজ, এখন হ'য়ে উঠল এক আজব চীজ। তার মনুষ্যত্বই হ'ল তার নতুনত্ব, তার বৈশিষ্ট্য, তার খেয়ালই হ'ল তার সব, তার কোন নিয়ম-কানুন নেই, অতএব আর অঙ্ক কষতে হবেনা, শুধু মজার মজার বিবরণ দিলেই চলবে, তার ভয় ভাবনা, আশা ভরসা, আদর্শ অভিলাষ যখন তাকে জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবেই পৃথক্ করেছে, তখন আর তাকে পায় কে? আর একটি লাফ আর দেবত্ব হাতে হাতে। সেই জন্য বলি, এই নতুনত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে, এই বড় বড় ফাঁকগুলো আরো বড় ক'রে দেখাতে গিয়ে, স্থিতি ও গতি থেকে মতির পার্থক্য ফোটাতে গিয়ে, মানুষের দাম্ভিকতা লয়েড্ মর্গ্যান্ বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যৌক্তিকতার সাতত্য রক্ষা করতে পারেননি। এ-সব মত শুনলে মানুষের মতিগতি ফিরে আসে, আত্মার দিকে। লেমায়তারকে পরিত্যাগ করে চণ্ডীদাসের বুলি আওড়ান যায়; মানুষই হ'য়ে ওঠে মানুষের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ gossiping চলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি school for scandal-এ প্রকাশ্য ভাবেই পরিণত হয়; এতদিন পরে mechanistic ও vitalistic ব্যাখ্যার প্রকৃত সমন্বয় হয়। যে প্রাকৃতিক সমাবেশে পৃথিবী উৎপন্ন হ'য়েছে, যে দুর্ঘটনায় মানুষের মত মানুষের 'সহসা উদয়' হ'য়েছে, তার পুনরাবৃত্তির যখন তিলমাত্র সম্ভাবনাও নেই, যখন মানুষের মনটা একেবারে আজব চীজ, যখন প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার তৈরি হ'তে হ'তে চলেছে, তখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সব গোলমাল চুকে গেল, প্রকৃতিদেবীর পূর্ব্ব হ'তেই রচিত সিংহাসনে মানুষ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হ'ল। তার পর শুধু 'জয় মা' ব'লে লাফ দেওয়া। Mind is an emergent বলাও যা, মানুষকে দেবতা বলাও তা।

কিন্তু কেমন যেন ভয় হয়, কোথায় যেন খট্‌কা লাগে। ধরলাম লেমায়তার, এডিংটন্, জীন্‌স্ ভুল বলেছেন। তবু খট্‌কা থেকেই যায়। অবশ্য লয়েড মর্গ্যানের মত গ্রহণ করলে বিজ্ঞানকে বাদ দিতে হয় না। বরঞ্চ বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের ওপর আস্থাবান হ'তেই তিনি বলছেন। শুধু নতুন অবস্থান, নতুন গঠন, নতুন শৃঙ্খলা, নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার সৃষ্টি হচ্ছে মানলেই যে পূর্ব্বাবস্থার ঘটনা ও নিয়মাবলীর উপর পরের অবস্থার নির্ভরশীলতা অস্বীকার করতে হবে, তাও নয়। জেনিংস্ এই কথা বলছেন। বলছেন খুবই ভাল ক'রে, কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে।

প্রথম প্রশ্ন ওঠে 'নতুন' কথাটির মানে নিয়ে। যেটা আগে ছিল অথচ জানতাম না তাকে নতুন বলা হয়। বলা বাহুল্য, লয়েড্ মর্গ্যান্ এ অর্থে কথাটি ব্যবহার করেননি। অন্য অর্থ হচ্ছে আগে ছিল না এখন হয়েছে। হয়েছে, অর্থাৎ ফুটে উঠেছে, এক নতুন গঠনে, নতুন সজ্জায়, নতুন শৃঙ্খলায়। এ-রকম আক্‌ছার হয়। কিন্তু কি হয়, নতুন fact হয়, নতুন event হয়, না নতুন relation হয়? নতুন সম্বন্ধই হয়। লয়েড্ মর্গ্যান্ বলছেন, সব কিছুই নতুন হয়। সব কিছুই নতুন হয়, স্বীকার করা চলতে পারে, যদি relation-কেই fact ও event গণ্য করা হয়। তাতে আপত্তি থাকতে পারে না—যদি সেই সঙ্গে মানা হয় যে, fact কিম্বা event-

রূপী relation-টারও, অন্যান্য fact ও event-এর মতনই, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব; অর্থাৎ যদি সেই সঙ্গে মানা হয়, জীবজগতের নতুনত্বটা, মনোজগতের নতুনত্বটা, অজীবজগতের নতুন ঘটনার মতনই, সেই একই উপায়ে বুঝতে হবে, অন্য উপায়ের প্রয়োজন নেই। লয়েড্ মর্গ্যান্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হ'তে পারেন, কিন্তু সে পদ্ধতির ধারাবাহিকতা তিনি মানেন না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, তাঁর হাতে যুক্তির মালা ছিঁড়ে গিয়েছে। নতুনত্ব ও নতুন যদি এক না হয়, যদি 'নতুনত্ব' হয় এক প্রকারের সম্বন্ধ, আর 'নতুন' হয় ঘটনা, তা হ'লেও ন্যায়ের ধারাবাহিকতা মানতে হবে। তাও তিনি মানছেন না। বিজ্ঞান যুক্তির বাইরে নয়, যুক্তিতর্ক পূর্ব্বাপর পরম্পরা মেনে চলে—তাও অতিপূর্ব্ব নয়, জোর দুটি আগের ধাপ, যার থেকে 'নতুন' emerge করেছে, এবং প্রত্যেক ধাপটি অন্যের সঙ্গে সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা। অতএব সেই ধাপের ফাঁকে অশ্বত্থগাছ জন্মাচ্ছে শুনলে সিমেণ্টেরই দোষ মনে হয়। সে সিমেণ্ট ফেটে গিয়েছে, সে ফাটলের মধ্যে অশ্বত্থগাছের বীজই পড়েছে, তার মধ্যে কোন emergent quality-র বীজ পড়েনি।

অন্য প্রশ্ন ওঠে। নতুন কি হিসাবে পুরাতনের চেয়ে বড়? নতুনত্বই কি তার একমাত্র দাবী? এক যদি নতুন পুরাতনের অপেক্ষা বহুলাঙ্গ হয় তাহলে দাবী খাটে। কিন্তু গঠনচাতুর্য্যের দিক থেকে অণু পরমাণু জীবকোষের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই, এই ত শুনছি। লয়েড্ মর্গ্যানের মনস্তত্ত্বে নীতিশাস্ত্রের বীজ রয়েছে। সেটা কতদূর বাঞ্ছনীয় বুঝতে পারি না।

সন্দেহ আবার ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি physico-chemical method মনের রাজ্যে এতই অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে হল্‌ডেন্-স্মাট্‌স্-সংবাদের পূর্ব্বে কোন পদ্ধতির সাহায্যে হল্‌ডেনের রিসার্চ্চে এত নাম হ'ল, যার খাতিরেই তিনি গিফোর্ড লেকচারার, বেতার-বক্তা হলেন? তিনি কি কখনও physiology-তে physico-chemical method অবলম্বন করেননি? তাঁর চোখের সামনে কি প্রত্যেক সমগ্রতাটি ল্যাবরেটারীতে যাবার পূর্ব্বেই ফুটে উঠত? জগদীশবাবুর ঐ রকম ফুটে ওঠে শুনেছি, বক্তৃতামঞ্চে ও লেখাতে তাইবলেছেন, কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটারীতে গেলে তাঁর চোখ দেখে ত তা মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টি reagent ও তার প্রতিক্রিয়ার ওপর নিবদ্ধ থাকে। ফিজিয়লজির প্রথম উপদেশ, ভাল ক'রে খেয়ে আত্মরক্ষা করা—সেটাও তিনি পালন করেন না। আবার মজা এই যে, হল্‌ডেন্‌সাহেব লয়েড্ মর্গ্যানের মতকে অশ্রদ্ধা করেন। তিনি Holism-এর প্রতি নিতান্তই আস্থাবান। কিন্তু whole-টাই যদি একটা emergent quality হয়? হওয়া খুবই সম্ভব, তাঁর তর্কপদ্ধতি অনুসারে, রিসার্চপদ্ধতি অনুসারে নয়। ব্যাপারখানা এই—হল্‌ডেন্ ও মর্গ্যান্ দুজনেই সাধারণ যুক্তির ধারাবাহিকতা মানে না।

ইতিপূর্ব্বে প্যাভ্‌লভ্ পড়ি, বুঝতে পারিনি সব কথা, শেষে তার সম্বন্ধে দু-একখানি বই পড়লাম। ওয়াট্‌সন্ বোঝা যায়। তাঁদের লেখা পড়ে আমার লয়েড্ মর্গ্যান্ ও হল্‌ডেনের বিপক্ষে আপত্তি জোর পেয়েছে। প্যাভ্‌লভ্ হচ্ছেন physiologist, অতএব মানুষ জীবজন্তু থেকে কোথায় ও কতটুকু পৃথক ও এক, এইটা আবিষ্কার করাই হ'ল তাঁর কাজ। মানুষের আছে forebrain যার জন্যই সে অন্যান্য জন্তুর

মতন জড়প্রকৃতির ক্রীতদাস নয়, স্বাধীন। মস্তিষ্কের এই সামনের অংশটাই হচ্ছে conditioned behaviour-এর কাঠামো। অতএব মানুষ পৃথক হ'ল এই হিসেবে যে সে অন্যান্য জন্তুর চেয়ে বেশী সংখ্যক conditioned behaviour গ্রহণ করে অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তিনি মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করেননি—পরীক্ষা করেছেন কুকুর নিয়ে। তাতে তাঁর সিদ্ধান্তের কিছুই আসে যায় না, বরঞ্চ ভালই হয়—জুলিয়ান্ হাক্সলি ও ওয়েল্স্ অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখিয়েছেন। প্যাভ্লভের পরীক্ষায় কুকুরটা প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা এই যে, ব্যবহারের কার্য্যকারণ ঠিক হচ্ছে physico-chemical process-এর দ্বারা, এবং পরীক্ষাগারে কুকুরে মানুষে তফাৎ নেই। পরীক্ষার ভেতর তাঁর কোন অসাবধানতা আছে কেউ বলেছেন শুনিনি। গোল বাঁধে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমাজতত্ত্বে খাটাতে গিয়ে। প্যাভ্লভের মতে শিক্ষিত হবার ক্ষমতাই যখন মানুষকে পৃথক করে, তখন সমাজের অনেক কর্ত্তব্য জুটল, আমাদের উন্নতিতে আমাদের অনেক হাত আছে ভাবাই আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠল। ওয়াট্সন্ একবার বলেছিলেন—আমি যে কোন শিশুকে জোয়াকিমের মত বাজিয়ে ক'রে তুলতে পারি। আমাদের এখনকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অন্য কথা বলেন। আমেরিকায় কি হয় জানি না, তবে ভারতবর্ষের কোন শিক্ষক conditioning-এ অতটা বিশ্বাসী হ'তে পারেন না। পাকা idiot-কে ওয়াট্সনের মতন অধ্যাপকও করা যায় না। মোদ্দা কথা, inheritance মানতেই হবে। হাঁসপাতালের শিশু মা বাপের কোলের খোকাও নয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত আমরা করবই করব, তবে আমাদের ভুল বৈজ্ঞানিকের ঘাড়ে না চাপালেই হ'ল। ওয়াট্সনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি—তাঁর রিসার্চ্চএর একটা news-value হয়েছে। ভাগ্যিস প্যাভ্লভ্ রাশিয়ায় জন্মেছিলেন—যে দেশের সবই খারাপ, তাই রক্ষে! সেইজন্য তাঁর কাজে খাদ মিশতে পায়নি, তাঁকে Gifford Lectures দিতেও ইংরেজ ডাকেনি। তাঁর কৃতিত্ব হ'ল এই যে, জীবজগতের ব্যবহারের অনুসন্ধানে তিনি সেই পুরাতন mechanistic রীতি নীতি পদ্ধতি ছাড়েননি, physiological functioning মস্তিষ্কের বিচিত্র ব্যবহারের ব্যাখ্যাতে physico-chemical reaction-এর ওপর নির্ভর করেন, কোন emergent value তিনি লক্ষ্য করেননি, অতএব মানেননি, জীবের আর অজীবের মধ্যে ব্যবধান আছে স্বীকার করেও নতুন পদ্ধতি, নতুন যুক্তি গ্রহণ করেননি, সব যেন একসূত্রে বাঁধা এই ভেবেই তিনি কাজ ক'রে আসছেন। সেইজন্য, যদিও তাঁর কুকুর পোষা, ল্যাজ নাড়ে, মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে, তবুও তাঁর পরীক্ষায় কোন গলদ কেউ পায়নি, এবং তাঁর মতের এতটা সামাজিক মূল্য আছে। কি করে তাঁর মত সমাজে খাটাব—সে কথা হচ্ছে না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, অন্য বিদ্যা এখনও পেছিয়ে রয়েছে। জীবতাত্ত্বিকের প্রকৃতিভক্তিকে তিনি নাড়া দিয়েছেন, কিম্বা ভাইসম্যানের genetic determinismকে তিনি খণ্ডন করেছেন বলে তিনি মস্তলোক নাও হ'তে পারেন। আমার তরফ থেকে তাঁর মহান কীর্ত্তি হ'ল এই যে, তিনি, ডারুইনের মতনই, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের মধ্যের নালাটির ওপর সেতু তৈরি করেছেন। ডারুইন যা করবার সুযোগ পান নি, তিনি এ যুগে বেঁচে তাই পেয়েছেন—তাঁর সেতুটি নিতান্তই mechanistic method-এ তৈরি। এ সেতুর ওপর জোর করে হাঁটা যায়, তার ওপর দিয়ে সৈন্য চালিয়ে অজ্ঞানতার রাজ্য আক্রমণ

করা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের ভৌগলিক সীমা বাড়ান যায়। এই সমালোচনার দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব হ'ল এই যে, ব্যবহারের mechanistic ব্যাখ্যা ক'রে তার জন্য phisico-chemical পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে, লয়েড্ মর্গ্যান্, হল্ডেন্ ও স্মাট্সের ইমারৎ তিনি ধূলিসাৎ করেছেন।

এ ত গেল ওঁদের বিপক্ষে আপত্তি। পুরাতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বপক্ষের উক্তিও আছে। ধরা যাক, ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, প্রত্যেক স্তরের বিশেষ গুণ প্রকাশিত হচ্ছে টের পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলে নিম্নস্তরের পদ্ধতি (physico-chemical, mechanistic method) উচ্চস্তরে খাটবে না প্রমাণিত হয় কি ক'রে? Mechanistic ব্যাখ্যাতে কি বলে নতুন কিছু হ'তেই পারে না, কিম্বা যখন নতুন কিছু হয় তখন তাকে সে ব্যাখ্যা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়, নেই নেই ক'রে, সাপের বিষের মতন? রসায়ন-শাস্ত্রে যখন কার্ব্বনের ক্রিয়া বোঝা যায়নি, তখন অর্গানিক কেমিষ্ট্রির জন্য কি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল? Urea-র ব্যবহারও কি তখন emergent মনে হয়নি? হেনরী সাহেবের মনে হয়েছিল তাই, তবু Wohler তাকে synthesise করবার সময় তার প্রত্যেক উপাদানটি বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই পুরাতন উপায়েই, নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনও অনুভব করেননি।

শুধু তাই নয়, স্তরই যদি মানতে হয়, তাহলে ভাল করেই মানা যাক্। অণু ও পরমাণুকেও দুই স্তরে ভাগ করা যায়, প্রত্যেকটি নিয়ে বিশেষ বিজ্ঞান রয়েছে। আবার পরমাণুর মধ্যেও ইলেক্‌ট্রণ, তার মধ্যে প্রোটোন পদার্থ ও তার কক্ষ রয়েছে—প্রত্যেকের খেয়াল আলাদা আলাদা সকলে বলেছিল। প্রত্যেকটাই নতুন বলে প্রত্যেকটির ব্যাখ্যার জন্য কি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? তা করা হচ্ছে না। না ক'রেও পদার্থ বিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে। তাহলে দাঁড়াল এই যে, প্রত্যেক জিনিষেরই একটা বিশেষত্ব আছে,—কে এ কথা অস্বীকার করছে? কেননা, স্বীকার করলে কারুর বুদ্ধিতে টান পড়ছে না। এর মানে, প্রত্যেকের প্রত্যেকত্ব আছে। কথাটা খুব দামী নয়—tautology মাত্র। এই সব কারণেই মনে হয় Emergent Evolution, Holism প্রভৃতি গালভরা নাম নিজেদের অজ্ঞানতা ঢাকবার আবরণ মাত্র। অজ্ঞানতা একটা মানসিক অবস্থা, যেটি fact, ব্যাখ্যা নয়। বিজ্ঞানও ব্যাখ্যার একটা পদ্ধতি মাত্র, এ যুগের সব চেয়ে ভাল ও ব্যাপক পদ্ধতি। সেটা আর কিছু নয়। সৌজাত্য বিত্থার বই খুলে সুপ্রজনন সম্ভব নয়, সোনার চাঁদ ছেলে কোলে আসে না—এলে পরে তার দ্বারা উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় মাত্র।

যদি ব্যাখ্যার বেলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিতান্তই অসম্পূর্ণ হয়, প্রত্যেক স্তরে নতুন নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় (পদার্থের বেলায় এক রকম, আর মানুষের বেলায় dramatic—যেটা বস্তুত animistic ছাড়া অন্য কিছু নয়) তাহলে এতদিন mechanistic ব্যাখ্যার দ্বারা এতগুলি ভিন্ন ধরণের ও গঠনের ব্যাখ্যা হল কি করে—এ-প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক যদি তোলেন, তাহলে ভাল উত্তর বোধ হয় এঁদের কাছে পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানের আদৎ কথা logical continuity, পদ্ধতির সাতত্য, অবিচ্ছিন্নতা। দর্শনের গূঢ় কথা, প্রত্যেক বাক্যের assumption-গুলি যুক্তিতে টেঁকে কিনা তাই দেখা। সে জন্য হয়ত নব্য ন্যায়ের দরকার হবে, হয়েওছে। কিন্তু তার পদ্ধতিও কি বিচ্ছিন্ন, বিরত, সান্তর? তাও নয়। Mechanistic ব্যাখ্যার জয়জয়কার যুক্তির

সাতত্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানে সান্তরতার ছড়াছড়ি হয়েছিল, কয়েকদিন পূর্ব্বে, এখন উল্‌টো সুরও গাওয়া হচ্ছে। সে যাই হোক, ব্যাখ্যার মধ্যে অর্থাৎ Conceptual জগতে Continuity রাখতেই হবে। আমার এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে লয়েড্ মর্গ্যান্, জেনিংস্, হল্‌ডেনের মতের ওপর Occam's razor চালাবার প্রয়োজন রয়েছে।

মোদ্দা কথা এই যে, তর্কের দ্বারা mechanistic explanation-কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার vitalistic, holistic কি emergent evolution-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করা যায় না। Mechanistic explanation, আর দর্শনের জড়ত্ব কি দেহাত্মবাদ এক নয় মানতে হয়, এবং মানলেই আপাতত বাকীটা বেশ চলে যায়। সমাজতত্ত্বে কিন্তু ঐ প্রকার physico-chemical, কি mechanistic ব্যাখ্যা খাটাতে পারি না। অন্যে যে কারণে খাটাতে রাজি হন্ না, আমি হয়ত ঠিক সে কারণে গররাজি নই। আমার গোলমাল বাঁধে অজ্ঞানতা, সাধনার অসম্পূর্ণতায়। পরে হয়ত সে ব্যাখ্যা সামাজিক ব্যবহারেও চলবে, কিন্তু ততদিন হয়ত বিশ্ব ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। ততদিন কি করা যায়? এক উপায় আছে—ডি, এল্, রায়ের বুড়োবুড়ীর ঝগড়ার মতন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কি Humanism-এর কলহকে লঘুক্রিয়া বলে ছেড়ে দেওয়া। বই পড়ে তাও পারি না, সব কিছুকেই গম্ভীরভাবে নিতে হয়, এমন কি বৈজ্ঞানিকের দার্শনিক মতকেও। এ-সব বইএর একমাত্র সমালোচনা হচ্ছে হেসে উড়িয়ে দেওয়া। আর এক উপায়, চুপ করে রিসার্চ্চ করা, তাতে কিন্তু ঘাম ঝরে। সেই জন্য সন্দেহ-দোলাতেই ঝুলতে হয়।

পাকা মাতালরা সকাল বেলা আর এক চুমুক টেনে গত রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতার খোঁয়াড়ি ভাঙে। মহাজনদের পন্থা অনুসরণ ক'রে, Calverton-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। মতটাকে রীতি নীতি ও মতির মতনই দরকারি মনে করা সমাজতাত্ত্বিকের নেশা ও পেশা। লোকে কেন একটি মত ছেড়ে অন্য মত বরণ করে আমাদেরকে দেখতে হয়। তাই দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোক বলছেন Cultural Complex-এর পিছনে যে শক্তি কাজ করে সেটা vested interest-এর। "It is not what has usually been called the truth of their doctrine which makes them so powerful, but their adaptability to other interests, class-interests in the main, which they subserve. It is these other, these more basic, interests that turn these ideas into cultural compulsives." "The cultural compulsive represents the group-interest in its psychological form"। এ মন্তব্যে অনেকটা সত্য নিহিত রয়েছে। বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়েষ্টারমর্কের মতামত ভিকটোরীয়ান যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোমত হয়েছিল বলেই তার বহুল প্রচার হ'ল, আবার ঐ সম্বন্ধে মর্গ্যানের মত সোশিয়ালিষ্টরা গ্রহণ করলো নিজেদের শ্রেণীর আশানুযায়ী সম্পত্তিবিভাগের সমর্থন হয় ব'লে। আজ যদি পৃথিবীতে অর্থকষ্ট না থাকত, তাহলে কার্ল মার্কসের ইকনমিক ব্যাখ্যা কেউ গ্রহণ করত কি? মনোকষ্ট পেলে লোকে ধার্ম্মিক হয়, সে মনোকষ্টের প্রকৃতির উপর ভগবান আকার হবেন কি নিরাকার হবেন নির্ভর করে। তার উপর আবার মানুষের স্বভাবে চরিত্রগত

পার্থক্য রয়েছে। Extravert না হ'লে হগ্‌বেনের publicist point of view গ্রহণ করা যায় ? আমেরিকাতেই ওয়াট্‌সন্, মিলিক্যানের optimism, বেলজিয়মেই লেমায়তার-এর pessimism, war weary পৃথিবীতেই এডিংটন্, জীন্‌সের মত খাপ খায়, আর ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের মধ্যে তাঁদের মতের প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়। যে কোন মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মতৃপ্তি, ভয়ভাবনা, আশাভরসা, প্রভৃতি বাজে জিনিষের খাদ এত মেশান থাকে যে, তার কতটুকু সত্য, আর কতটুকু মিথ্যা বলা একরকম অসম্ভব। হগ্‌বেনের ভাষায় বলতে গেলে,—কাঠগড়ায় এখনও মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিচার এখনও চলছে, রায় বেরোবার আগে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা নিয়ে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করলে Contempt of Reason হবে।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Sound and the Fury—WILLIAM FAULKNER (Chatto & Windus), **All Passions Spent**—V. SACKVILLE WEST (The Hogarth Press), **The Grasshoppers Come**—DAVID GARNETT (Chatto & Windus).

উইলিয়ম্ ফক্‌নারের দ্বিতীয় পুস্তক "দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি" একটি দুঃস্থ পরিবারের অধঃপতনের ইতিহাস। বাপ মাতাল, মা চিরকগ্ন স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ, এক ছেলে জন্মমূঢ়, আরেক ছেলে আত্মঘাতী, তৃতীযটি সয়তান, মেয়ে স্বৈরিণী, দৌহিত্রী হট্টচারিণী, আত্মীয়স্বজন পরান্নজীবী, পরিচারকবর্গ নিগ্রোজাতীয়, অশিক্ষিত ও উৎপীড়িত। উপন্যাসখানির মধ্যমণি হচ্ছে মেয়ে ক্যাডি; লোকনিন্দার ভয়ে গর্ভবতী ক্যাডি একটি অভাজনকে বিয়ে করে; কিন্তু বেশিদিন তাকে স্বামী-ঘরে থাকতে হয়নি, কুইন্‌টিনের জন্মের খবর যখন আর ছাপা রাখা গেলো না, তখন সে শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই মুখ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ওই অসাধারণ পরিবারটির দুর্দ্দশার ইতিবৃত্ত চার পর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড ক্যাডির অবোধ ভাইটির লালায়িত প্রলাপ। তার মনে কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা নেই, অতীত আর অধুনা হরিহর আত্মা, আত্মীয় ও পর দু দলই সমান অনিষ্টকারী। এই অসম্বদ্ধ প্রাণের উন্মাত্র নির্ব্বুদ্ধিতার একমাত্র আধারবিন্দু হচ্ছে ক্যাডি। তাই বেন্‌জি কিছুতে মানতে চায় না যে, ক্যাডি এখন অজ্ঞাতবাসিনী, ক্যাডি এখন মধ্যবয়সে পা দিয়েছে, ক্যাডি আর কখনো তার পিতৃগৃহে ফিরবে না। সেই জন্যেই সন্ধ্যাবেলা স্কুলের মেয়েরা যখন ঘরে ফেরে, বেন্‌জি তখন বাগানের রেলিঙের ভিতরে মুক্তিকামী পশুর মতো ছুটোছুটি করতে করতে ভাবে, তার বোনও বুঝি সেই মেয়ের দলে লুকিয়ে আছে; সেই জন্যেই গল্‌ফ্‌কোর্সে খেলোয়াড়েরা যখন অনুগামী 'ক্যাডি'কে ডাকে, তখন তেত্রিশ বছরের বেন্‌জি ককিয়ে কেঁদে ওঠে পাঁচ বছরের ছেলের মতন।

দ্বিতীয়ভাগে ক্যাডির আত্মঘাতী ভাইটির চরমোক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুমূর্ষুদের মনেও কালসংজ্ঞা খুব সতেজ নয়, তাই এ-খণ্ডও নৈয়ায়িক পরম্পরার কোনো ধার

ধারে না। মৃত্যুর প্রদোষান্ধকারে নিত্যনৈমিত্তিকের সীমাসন্ধি লুপ্ত হয়ে এসেছে, চাক্ষুষ ঘটনার স্রোত স্মৃতির উন্মন্থনে আবিল, বক্ষের মধ্যে চলেছে কান্নাহাসির মল্লযুদ্ধ। কুইন্‌টিনের প্রাণও ক্যাডিগত, সেইজন্যে ক্যাডির চরণচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনও শিথিলবৃন্ত হয়ে পড়ে,—এর পরে, মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু একটা কথা এখানে অবশ্যবক্তব্য, কুইন্‌টিনের আত্মহত্যার মূলে অবিমিশ্র ভ্রাতৃভাব না-ও থাকতে পারে।

তৃতীয়কাণ্ডের উত্তমপুরুষ ক্যাডির কনিষ্ঠভ্রাতা জেসন্। এখানেও পিছন ফিরে সিংহাবলোকনের অভাব নেই, কিন্তু মুখ্য ব্যাপারটা সদ্যস্তন। এ-অধ্যায়ের প্রধান পাত্রী আর ক্যাডি নয়, ক্যাডির কানীন কন্যা কুইন্‌টিন্। ক্যাডি এখন সুদূরপরাহত ঝড়ের মতো, তার তর্জ্জনগর্জ্জনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে কানে বাজে বটে, কিন্তু তার বিদ্যুৎবিলাসে চোখ আর ঝলসে যায় না। না, উপমাটা ঠিক হলো না; সে সুদূর হতে পারে, কিন্তু পরাহত কোনোমতেই নয়ঃ যুগযোজনের আড়াল থেকে তারি ঋষ্টি এই পরিবারটিকে ধ্বংসপথের পথিক ক'রে রেখেছে। ক্যাডির কন্যা কুইন্‌টিন্ উপলক্ষ মাত্র, জেসনের অদ্ভুত প্রতিহিংসা আসলে ক্যাডিকেই আঘাত করতে চায়। এ-পরিচ্ছেদটায় কালের গতি সহজ, সঙ্গতি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তবু সমস্ত দুষ্পাঠ্য বইখানার মধ্যে এই অংশটাই বোধহয় সব চেয়ে কষ্টপাঠ্য। জেসনের সমান সয়তান জীবনে তো বিরল বটেই, এমন কি সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়, কিন্তু তার হাবভাব-ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন একটা বাস্তবিকতার ছাপ আছে যে, মনে হয় ও-রকমের মানুষের পরিচয় আমরা পথে ঘাটে প্রায়ই পেয়ে থাকি। পাঠকের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ভয়ে ভয়ে নিজের অন্তরে অন্বেষণ ক'রে দেখে ওই অমানুবিকতার মূল আপনার মধ্যেও নিহিত আছে কিনা।

আখ্যায়িকার উপসংহার ধ্রুপদী নাটকের মতো নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু শেষাঙ্কের সূত্রধার নিগ্রোপরিচারিকা ডিলসি, তারি কণ্ঠের নেপথ্যে লাঞ্ছিত, নির্জ্জিত ও নির্ব্বল বিশ্ব আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। লেখকের আবেগ সংরক্ত হলেও অসংযত নয়। ফলে তিনি নিগ্রোনিগ্রহের বিষয়ে এখানে ওখানে যে ইঙ্গিত করেছেন, তা কখনো আর্টভ্রষ্ট হয়ে হিতৈষিণার ভাবালু পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নি। কারণ এই সকল মন্তব্যের মধ্যে তর্কের কোনো চেষ্টা নেই, আছে কেবল অনুকম্পনের ঝঙ্কার, আছে কেবল আবেগের ছন্দ। এই জন্যেই বোধহয় বইখানার ভিতরে এমন অনেক বচন আছে, যেগুলোকে গদ্য বলা চলেনা, কাব্য আখ্যা দিতে হয়, কারণ মনের দরবারে গদ্যের আবেদন পৌঁছয় যুক্তির মারফতে, কিন্তু কাব্যের দাবি মধ্যস্থের তোয়াক্কা রাখে না, মোক্তারকে ডিঙিয়ে বিচারকের চিত্ততন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে।

"দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি"র মতো বইয়ের সারসংগ্রহ করতে যাওয়ায় দুঃসাহসিকতা আছে, উপরোক্ত সংক্ষেপ সম্পূর্ণতার গর্ব্ব করে না, ওটা আংশিক, অত্যন্ত আংশিক। মূল গল্পটি ঋজু হলেও, পুস্তকখানি গ্রন্থিল, তাতে শাখা-প্রশাখার অভাব তো নেই-ই, বরং ডালপালার আধিক্যে পাঠক প্রায়ই দিশা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই বাহুল্যকে অবান্তর ব'লে ভাবলে অন্যায় হবে। মণিশিল্পীর হাতে নিটোল হীরে যখন শতমুখী হয়ে ওঠে তখন তার দাম যেমন বাড়ে বই কমেনা, রূপকারের স্পর্শে গল্পের অবস্থাও হয় তেমনি,—শত বাতায়ন দিয়ে সহস্র রশ্মি এসে গল্পের অন্তম ঐক্যটিকে

উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। উপন্যাসের এই অদ্বৈত সাধিত হয় অবৈকল্যের গুণে। এই অবৈকল্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটির কোনো সংস্রব নেই, এটা তার লেখার একটা সাত্ত্বিক গুণ যার আশীর্ব্বাদে অতিবড় আষাঢ়ে গল্পও পাঠকের মনে সত্য ঘটনার পাশে আসন পায়। এই অসাধ্য সাধন যুক্তির পৃষ্ঠপোষণে সিদ্ধ হয় না, সম্ভব হয় আবেগের অনুকম্পনে। ফক্‌নার এই দুর্লভ সিদ্ধিতে অধিকারী।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের দিনে অসাধারণ শব্দটার অপপ্রয়োগ সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উইলিয়ম্ ফক্‌নারের লিপিনৈপুণ্যসম্বন্ধে ওইটাই একমাত্র বিশেষণ। এই আপাত-উচ্ছৃঙ্খল বইখানির সংযম ও মাত্রাজ্ঞান সত্যই বিস্ময়কর। লেখকের হাতে কলম কেবল শব্দগঠনের উপকরণ নয়, একেবারে অলক্ষ্যভেদী বাণ। তার নিষ্কম্প নির্ণয়ে অন্তরের নিভৃততম অন্তঃপুর পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। এই গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস "দি সোল্‌জারস্ পে" পড়ে আর্ণল্‌ড্ বেনেট্ বলেছিলেন, ফক্‌নার্ কথাসাহিত্যের ভাবী সম্রাট্। সে ভবিষ্যদ্বাণী "দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি"তে হয়তো সফল হয়নি কিন্তু পুস্তকখানির প্রতিঅক্ষরে যে-মহান প্রচেষ্টার পরিচয় আছে, তার সামনে সাহিত্যসেবীমাত্রকেই মাথা নোয়াতে হবে। মানুষের চৈতন্যস্রোতের চালনে যত উপন্যাস সম্প্রতি অকূলে ভেলা ভাসিয়েছে, তাদের মধ্যে এইখানির গতিই সব চেয়ে দ্বিধাবিরহিত। গতির নিশ্চয়তা অবশ্য গন্তব্যে পৌছনোর নামান্তর নয়। উপরন্তু গল্পটি বীভৎস, এত কুৎসিত গল্প গত কয়েক বছরের মধ্যে পড়েছি ব'লে মনে হয় না; এবং রচনারীতির ঐচ্ছিক দুরূহতায় আখ্যানভাগের ভয়ঙ্করতা বেড়েছে বই কমেনি। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উপন্যাসকে যাঁরা অবসরের সাথী ব'লে বিবেচনা করেন, কল্পনার বৈচিত্র্যময় রোমহর্ষণে জীবনের নির্ব্বিকার গ্লানিকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে চান, চিন্তার জ্বালা জুড়তে ডুব দেন কথাসরিৎসাগরে, এ-বই তাঁদের হাতে না-পড়াই ভালো। কিন্তু যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তার ভক্ত, সাধনাকে যাঁরা সিদ্ধির চেয়ে বড় ক'রে দেখেন, উপাখ্যানের ঊর্ণাতন্তুর অবলম্বন খোঁজেন জীবনসৌধের কোণে কানাচে, তাঁরা হয়তো মানব-মনের অন্ধকার মহলে এই ক্ষণিক প্রদীপ জালানোর জন্যে উইলিয়ম্ ফক্‌নার্‌কে ধন্যবাদ জানাবেন।

"দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি" শেষ করার পরে "অল প্যাসন্‌স্ স্পেণ্ট্" বইখানি হাতে নেওয়া ঝঞ্ঝাবাতের উন্মত্ত কোলাহল থেকে নিবাত নিষ্কম্প্র দীপালোকে আসার মতো। শ্রীমতী সাক্‌ভিল্ ওয়েষ্টের শেষ উপন্যাসখানিতে একটা প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞার সাড়া মিলে যেটা সত্যসত্যই সমস্ত চিত্তবেগকে অতিক্রম ক'রে গেছে। শুনেছি লেখিকার বয়স খুব বেশি নয়, তবে তিনি এই বানপ্রস্থ-নির্ব্বাণের সন্ধান পেলেন কোথা থেকে? বইখানি একটি অশীতিপর বৃদ্ধার মানসজীবনের ইতিহাস। লেডি শ্লেনের স্বামী কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার সম্মুখে কোনো দ্বার বন্ধ থাকেনি, ভারতের উপরাজত্ব থেকে সুরু ক'রে ইংলণ্ডের প্রধান সচিবের গদী পর্য্যন্ত সমস্ত পদই তিনি একদিন-না-একদিন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিতা পূর্ণ পরিণতি পেলো বটে কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণীর ব্যক্তিস্বরূপ সমাহিত হলো, কারণ লেডি শ্লেনের প্রতিভা ছিলো তাঁর স্বামীর বিপরীত, অর্থাৎ ভাবয়িত্রী। বিবাহের পূর্ব্বে লেডি শ্লেনের ইচ্ছা ছিলো চিত্রকর হবার; কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা যখন ভাবী স্বামীর কানে

পৌঁছলো, তখন প্লেন উত্তর দিলেন যে, শিল্পনিপুণা মেয়েদেরই তিনি পছন্দ ক'রে থাকেন, এবং তাঁর স্ত্রী যদি তাঁদের পর্য্যটনকালে বিদেশের উধাও স্মৃতিগুলিকে চিত্রার্পিত ক'রে রাখতে পারেন তাহলে স্বামী খুসিই হবেন। এর জবাবে লেডি প্লেন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তিনি যে-ধরণের ছবি আঁকতে চান, তা দিয়ে সচিত্র ডায়েরি লেখা অসম্ভব ; কিন্তু প্লেন হেসে তাঁকে-আশ্বাস দিয়েছিলেন, অবিলম্বেই অন্য রকমের এত সৃষ্টির ভার তাঁর উপরে অর্পিত হবে, যে আসল কলাচর্চ্চার প্রবৃত্তি বা অবকাশ তাঁর থাকবে না। এর পবে চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না এবং শীঘ্রই সন্তানসন্ততির অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় লেডি প্লেনের শৈশবস্বপ্ন আর মাথা তোলার ফাঁক পেলোনা। কিন্তু বিরতি আর বিলুপ্তি এক কথা নয়, কাজেই বিরাশী বছর বয়সে লেডি প্লেন যখন বিধবা হলেন তখন তিনি মৃত্যুর কবল থেকে চিত্রবিদ্যা শেখার উপযুক্ত সময় ছিনিয়ে নিতে না-পারলেও, পুত্রপরিজনের আগল থেকে আপনার পিঞ্জরিত স্মৃতিকে মুক্তি দিতে ইতস্তত করলেন না। ফলে তিনি খামখেয়ালী ব'লে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করলেন বটে কিন্তু যে-কটি দুর্লভ বন্ধুর সন্ধান পেলেন তাদের কল্যাণে আজন্মের দুধের পিপাসা না-মিটলেও, ঘোল যে ভূরি পরিমাণে পাওয়া গেলো, তাতে আর সন্দেহ রইলো না।

এই কাহিনীটির পিছনে যদি কোনো মতামতের সূত্র থাকে, তবে তা শ্রীমতী ভারজিনিয়া উল্‌ফের "এ-রুম্‌ অফ্‌ ওয়ান্‌স্‌ ওন্‌"-নামক প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্যের অনুরূপ। এইজন্যেই অনেক সমালোচক এই উপন্যাসটির উপরে শ্রীমতী উল্‌ফের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমার মতে "অল্‌ প্যাসন্‌স্‌ স্পেণ্ট্‌"-কে "এ-রুম্‌ অফ্‌ ওয়ান্‌স্‌ ওন" হতে ব্যুৎপন্ন বলা অন্যায়, কেননা শ্রীমতী উল্‌ফের উক্ত সন্দর্ভ স্বকীয়তার কোনো দাবি করতে পারে না। কয়েক বছর থেকে নারীজাগরণের যে-সাড়া শোনা যাচ্ছে, উভয় পুস্তকই সেই সাড়ার প্রতিধ্বনিতে মুখর। দুই লেখকই সমসাময়িক, সমজাতীয় এবং সমান ভাবে সচেতন ; কাজেই এঁদের মনের একটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভিতরের মিল প্রকাশ পায় অভিব্যক্তির রীতিতে, এখানে এঁদের দুজনের ধরণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা বোধ করি তর্কাতীত। শ্রীমতী উল্‌ফের মন অধিকরণনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রীমতী স্যাক্‌ভিল্‌ ওয়েষ্ট্‌ অন্বয়ধর্ম্মী, অর্থাৎ প্রথমা মানসচারিণী কিন্তু দ্বিতীয়া মানুষপন্থী, একজন বিকলনে সিদ্ধহস্ত, অন্যজন সঙ্কলনে অদ্বিতীয়।

আসলে উল্লিখিত পুস্তক-দুখানির মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচারবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো ঐক্য খুঁজে বার করা দুষ্কর। কিন্তু এই অতিরেকটুকু বাদ দিয়ে যদি কেবল আখ্যান-বস্তুটিকে নেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় "অল্‌ প্যাসন্‌স্‌ স্পেণ্টে"র পূর্ব্বগামীকে আবিষ্কার করা সহজ হয়। আমি যে লেখিকার কথা ভাবছি, তিনি, যত দূর জানি, মাত্র একখানি বই লিখেছেন। কাজেই সেই অখ্যাতকুলশীল ঔপন্যাসিকটির সঙ্গে শ্রীমতী ওয়েষ্টের মতো লব্ধকীর্ত্তি কবির তুলনা করতে সমালোচকেরা সম্ভবত দ্বিধা বোধ করেছেন। কিন্তু লর্ণা রিয়ার 'সিক্‌স্‌ মিসেস্‌ গ্রীন্‌' যিনি পড়েছেন, তিনিই আমার কথায় সায় দেবেন। অবশ্য, শ্রীমতী ওয়েষ্টের হাত আরো পাকা, তিনি ইতিপূর্ব্বে 'এডোয়ার্ডিয়ান্‌স্‌'-নামক পুস্তকে তার ঔপন্যাসিক প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু তাই ব'লে প্রথম মিসেস্‌ গ্রীনের সঙ্গে লেডি প্লেনের রক্তের সম্বন্ধ শিথিল নয়। প্লেন-পরিবারের অন্যান্য চরিত্রগুলিও গ্রীন-পরিবাবের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মতো অহংসর্ব্বস্ব

বাগ্‌জীবন ও উপহাস্য। এবং লেডি শ্লেনের প্রপৌত্রীর পাশে কনিষ্ঠ গ্রীনের তরুণী ভার্য্যাকে বসালে, প্রথমার প্রতি কোনো অবিচার করা হয় না। অবশ্য লর্ণা রিয়ার উপন্যাসে "অল্‌ প্যাসন্‌স্‌ স্পেণ্টে"র গভীর দার্শনিকতা নেই, কিন্তু উভয় লেখিকাই তরুণিমাকে একমাত্র আশা ভরসা ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন, এটা নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য।

কথাপ্রসঙ্গে উপরে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত রচনার উল্লেখ করেছি। শ্রীমতী স্যাক্‌ভিল্‌ ওয়েষ্ট্‌ ও উইলিয়ম্‌ ফক্‌নার, এঁরা দুজনেই কাহিনীর পাত্রপাত্রী হতে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করেছেন এবং মাত্রাভেদে কৃতকার্য্যও হয়েছেন। কিন্তু আসলে ওই দুটি ধ্রুপদী গুণের পূর্ণ পরিণতি দেখতে চাইলে আজকের দিনে এক ডেভিড্‌ গার্ণেট্‌ ছাড়া গতি নেই। আজকালকার ইংরেজ কথকদের মধ্যে বোধহয় কেবল তিনিই তাঁর রচনার আভ্যন্তরিক স্বায়ত্তশাসনে এমন কোনো ছিদ্র রাখেন না, যার ভিতর দিয়ে বহির্বর্ত্তী বুদ্ধির শনি সে-অন্তর্লোকে প্রবিষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ একা তাঁর গল্পই গল্প, গল্পের ছদ্মবেশে আত্মজীবনী অথবা সামাজিক নিবন্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই রকমের পবিত্রতা বর্ত্তমান জগতে এতই বিরল যে, অধিকাংশ সমালোচকই গার্ণেট্‌কে তাঁর প্রাপ্যটুকু দিতেও কুণ্ঠিত। তাঁদের মতে গার্ণেটের প্রথম দুটি গল্প "লেডি ইন্‌টু ফক্‌স্‌" ও "দি ম্যান্‌ ইন্‌ দি জু"-তে যে উৎকর্ষের সূচনা ছিলো এখনো পর্য্যন্ত তা সিদ্ধিতে পরিণত হয়নি। এঁদের বিবেচনায় "এ সেলার্স্‌ রিটার্ণ্‌", "গো শি মাষ্ট্‌", "নো লাভ্‌" ইত্যাদি পুস্তকগুলির রচনারীতি নিখুঁত ও অনাড়ম্বর হলেও, ও-গুলির আখ্যানভাগ কেমন যেন কুয়াসাচ্ছন্ন, অর্থাৎ তাঁর লেখার চুনকামকরা সাদা দেওয়াল-গুলির পিছনে কি আছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দুষ্কর। যদি বলা যায় সেজানের মতো ডেভিড্‌ গার্ণেট্‌ও সাদা দেওয়ালের অবিকল ছবি আঁকতে পারলেই তুষ্ট, দেওয়ালের পিছনের রূপকথার রাজকন্যার প্রতি তাঁর নজর নেই, তাহলে এঁরা লেখকের প্রথম কাহিনী দুটির দোহাই দিয়ে ব'লে থাকেন গার্ণেট্‌ রূপকরচয়িতা, অতএব তাঁর শুক্তির ভিতরে যুক্তির মুক্তা থাকতে বাধ্য।

অবশ্য মানতেই হবে যে, কল্পনাপ্রধান সাহিত্যমাত্রেই এক হিসেবে রূপক, অর্থাৎ কল্পনার জাদুতে পারিপার্শ্বিক বস্তুই রূপান্তরিত হয়ে কলাতে পরিণত হয়। এদিক দিয়ে দেখলে ডিফোর "রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো" এবং গার্ণেটের "দি গ্রাস্‌হপার্‌স্‌ কাম্‌" এ-দুই গল্পই রূপক। কিন্তু আমার মতে আসল রূপকের প্রবর্ত্তনা আর শিশুমনকে চিনির পাকে নিম খাওয়ানোর ইচ্ছা, ও দুইই এক পর্য্যায়ের জিনিষ। "রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো" অথবা "দি গ্রাস্‌হপারস্‌ কাম্‌" ও-রকমের লোকশিক্ষার কোনো তাগিদ নিয়ে জন্মায়নি, এ-কথা আশা করি রসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। পক্ষপাত-ব্যতিরেকে শিক্ষক হওয়া অসম্ভব, এবং গার্ণেটের আর যা-ই দোষ থাকুক, তিনি পক্ষপাতবিবর্জ্জিত, তা-ও বোধহয় সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এ-গুণটি আজকের দিনে এতই দুর্লভ যে, ওটিকে আমরা বিনাবাক্যে গ্রহণ করতে পারি না। গার্ণেটের স্বচ্ছ উপাখ্যানগুলি আড়াল থেকে একটা গুরুগম্ভীর লোকশিক্ষার প্রবৃত্তিকে টেনে বার করার ব্যর্থ চেষ্টার ব্যাখ্যা বোধহয় এইখানে।

গার্ণেটের রচনা সরল, স্বল্পাঙ্গ ও অহংজ্ঞানশূন্য ব'লে তাতে ওজনের অভাব আছে, এমন কথা ভাবলে খুবই অন্যায় হবে। "দি গ্রাস্‌হপার্‌স্‌ কাম্‌" বইখানির গল্পটি

অবশ্য অত্যন্ত লঘু। একজন স্বল্পমতি নারী স্থির করলেন যে, তিনি বিমানপথে বিনাবিরামে ইংলণ্ড থেকে হঙ্কঙ পর্য্যন্ত উড়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে একটি একচক্ষু পাইলট্ নিযুক্ত হলো এবং এই পাইলটের তত্ত্বাবধানে শুভদিনে তিনি ও তাঁর প্রণয়ী বিমানবিহারে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম রাত্রি বেশ নিরাপদে কাটলো, কিন্তু পরের দিন প্রত্যুষে এনজিনের দোষে এয়ারোপ্লেনখানি ধরাশায়ী হলো। পাইলট্ ওস্তাদ ছিলো, তাই যাত্রীদুটির গায়ে আঁচড়টি লাগলো না। কিন্তু তার নিজের পা গেলো ভেঙে। ভাণ্ডারে খাদ্যাভাব, নিকটে লোকের বসতি নেই, চারপাশে চৈনিক মরুর ঊষরতা। কাজেই রমণীটি তাঁর প্রেমিকের হাত ধ'রে লোকালয়ের সন্ধানে চ'লে গেলেন; বিমানপোতে অন্নজলের যেটুকু ব্যবস্থা ছিলো, তা-ও তাঁরা ছেড়ে যেতে পারলেন না। পাইলট্ রইলো একা, বিনাখাদ্যে, আহত পায়ের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছাপন্ন। বলাই বাহুল্য, সে-স্ত্রীপুরুষ দুটির আর কোনো সন্ধানই মিললোনা, এবং পাইলট্টি অনশনে কণ্ঠাগতপ্রাণ হবার পরে, একদল পঙ্গপালের হঠাৎ সমাগমে, জন্ দি ব্যাপ্টিষ্টের দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে কোনোক্রমে আবার শক্তি ফিরে পেলো। এর অল্প পরেই একটি মাঙ্গলীয় এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে সে আবার মনুষ্যসমাজে ফিরতে পারলো।

এ-গল্প নিশ্চয়ই খুব হালকা। সেই জন্যেই বিস্মিত মন জিজ্ঞাসা করে, এর উপরে এত অভিজ্ঞতার ভর সইলো কেমন ক'রে? কাহিনীর আয়তন এক শ পাতা, আয়ু সপ্তাহ মাত্র, পাত্রপাত্রী তিনটি, অথচ বইখানি শেষ করবার পরে শুধু এই তিনটি ব্যক্তি নয়, জগতের অনেক জিনিসের সম্বন্ধেই পাঠকের অজ্ঞানান্ধকার পাৎলা হয়ে আসে। আর এ-পরিচয় কেবল মৌখিক নয়; গার্ণেটের ভাষা শুধু বস্তুমাত্রাকে জড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু সে-অবেষ্টন এতই নিবিড় যে তার সূত্রে প্রাণের নিগূঢ়তম স্পন্দন সুদ্ধ সঞ্চারিত হয়। একেই বলে অনুকম্পন। এ-অনুকম্পন স্বপ্রধান লেখকের মধ্যে কখনো দেখা যায়না, একে পাওয়া যায় আত্মবিসর্জ্জনের ফলে। দর্শক ও দৃশ্যের মধ্যে যখন সকল ব্যবধান অন্তর্হিত হয়, প্রবৃত্তি আর প্রবর্ত্তকের মধ্যে তিলার্দ্ধ স্থান থাকেনা, তখনই এই অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়, নৈমিত্তিকের ঔরসে তখনই হয় নিত্যের জন্ম। 'দি গ্রাস্‌হপার্‌স্ কাম্'-এর মতো ক্ষীণাঙ্গ পুস্তক সম্বন্ধে এত বড় কথা না-খাটলেও, তার প্রণেতার মহৎ মনের সম্বন্ধে এ-প্রশংসা নিশ্চয়ই অতিকথন নয়। এ-বইখানি অমৃতের অধিকারী না-হতে পারে, কিন্তু যিনি এটির পরিকল্পনা করেছেন তাঁর ভাণ্ডারে সে-সনাতন ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মেঘ-মল্লার—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,—প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী।

গুটিকয়েক ছোট গল্পের সমষ্টি। এঁর লেখা এই প্রথম পড়লাম—এবং একবার প'ড়েই চমৎকৃত হ'তে হয়েছে। উঁচুদরের গল্পলেখার যে প্রতিভা—যা

আমাদের দেশে দুর্ল্ভ,—এই বইখানির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া গেল। উৎসর্গ থেকে জানা যায়,—শরৎ বাবু লেখকের মামা। তাঁর ভাষাসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে হয়তো ইনি পেয়ে থাকবেন,—রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রভাব এবং প্রভাতবাবুর ঘটনা-বিন্যাসের পারিপাট্যও হয়তো গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু তা ছাড়াও অনেক নূতন জিনিষ আছে যা অপূর্ব্ব। এঁর ভাষায়, ভাবে এবং ধরণ-ধারণে এমন একটা উচ্চ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে যা একেবারে নূতন, স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয়,—যা অতঃপর দেখবামাত্রেই চিনে নিতে বিলম্ব হবে না, এবং সাহিত্যের নূতন সম্পদ হিসাবে যার বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করা যাবে। এ-কথা বলবার অনেক কারণ আছে।

প্রথমতঃ ভাষার উপর এঁর সহজ ও পাকা দখল। যেখানে যে রকম আবহাওয়া, যে রকম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে চান, অনায়াসে তাই করতে পারেন এবং তাতে প্রাণ দিতে পারেন,—কখনো ব্যর্থ হ'তে হয় না। যেখানে যেমন অবস্থা, সেখানে উচিত কথা জোগাবার এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। সময়ের প্রয়োজনমত ভাষা কোথাও সমুদ্র-গর্জ্জনের মত গম্ভীর; কোথাও তটিনীর মত মৃদুগুঞ্জী; কোথাও মহান্ কল্পনার সঙ্গে তুচ্ছ কথার পাশাপাশি অপূর্ব্ব সমাবেশ। ভাষার উপর এমন অধিকার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং দৈবাৎ হয়তো আরো এক-আধজন ছাড়া আর কারো নেই,—একখানি মাত্র বই পড়ে এত বড় কথা বলতেও মনে দ্বিধা হয় না।

এঁর সবিশেষ কৃতিত্ব প্রকৃতির বর্ণনাতে। ওস্তাদ গায়কের গানের মাঝে থেকে থেকে যেমন তান-গিটকিরির দানা ছড়িয়ে সুরের খেলা এবং সেইটুকুই বড় মধুর, গল্পের মধ্যে তেমনি থেকে থেকে বাহ্যপ্রকৃতির অল্প একটু অবান্তর ছবি আঁকার খেলা। কোথাও দু-চার লাইনের বেশী বর্ণনার দরকার হয়নি—অল্প কথায়, অল্প উপকরণে এমন সব মনোরম ছবি স্থানে স্থানে খাপ্ খাইয়ে বসানো যে পড়তে পড়তে শতবার বাহবা দিতে হয়। এক-একটি বর্ণনা থেকে এক-একখানি বিভিন্ন Landscape Painting তৈরি করা চলে। গ্রাম্য ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, নদীর ধার এঁর বড় প্রিয়। এই সব দৃশ্য অপর্য্যাপ্তভাবে লেখার মধ্যে এমন ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, পাঠকের অনুভূতির মধ্যে পল্লীপ্রকৃতির সুপরিচিত স্পর্শ ও গন্ধ প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। পল্লীসৌন্দর্য্য ইনি যে চোখে দেখেছেন, সে চোখ দিয়ে আমরা কখনো দেখিনি। যে সব ফুলে সাজি ভ'রে ইনি বাণীর অর্চ্চনা করেছেন, আগে কোনো সাধক সে ফুলে দেবীর পূজা করেনি। দ্রোণ, কাঞ্চন, ঘেঁটু, সজ্‌নে প্রভৃতি যাদের কাব্যে কখনো স্থান ছিল না, তারা যেন আজ নূতনরূপে ধরা পড়লো। শুধু তাই নয়। রসানুভূতির কোনো দিকই বাদ যায় নি। ভাষার মধ্য দিয়ে বর্ণ, গন্ধ, সুর, স্বাদ প্রভৃতি এমন নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন যে, সকলেই তৃপ্ত হবে।

আর এক নূতনত্ব এই যে, নরনারীর যৌনসম্পর্কের কথা, অর্থাৎ প্রেমের কথা এই বইখানির কোনোখানেই নেই। যে ভালবাসার কথা না হ'লে আজকাল গল্প লেখা হয় না,—আর হ'লেও জমে না,—তা এর মধ্যে একেবারেই নেই। কেন এমন করলেন সে তাঁর অভিরুচি,—কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে, গল্পে তিনি যে নিরামিষ রচনা করেছেন তা চমৎকার। নারীচরিত্রের কামের দিকটা ছেড়ে দিলেও তার মধ্যে স্নেহ,

মমতা, করুণা প্রভৃতি আরো অনেক কিছু থাকে। মেয়েদের এই সব অনাবিল কোমল মনোবৃত্তি নিয়েও যে উৎকৃষ্ট কাব্য বা কথাসাহিত্য রচনা করা যায় তা ইনি বেশ ভাল করেই দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "অতিথি" প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে এর উল্লেখ আছে, কিন্তু ইনি মেয়েদের এই স্নেহশীলতাটাকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখেন এবং বিশেষ ক'রে দেখাতে চান। এঁর "পথের পাঁচালী"র সমালোচনা পড়ে বুঝেছি তাতেও এই বিষয়ে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং অসমাপ্ত "অপরাজিত" নামক উপন্যাস "প্রবাসী"র দুই-এক সংখ্যাতে পড়েও এই করুণাময়ী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। প্রেম না হ'লে যে রোমান্স হ'তে পারে না সে কথা ইনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রমাণ করেছেন।

রূপক হিসাবে এই কথাটারই আভাস দিয়েছে প্রথম গল্প "মেঘ-মল্লার"। গায়কের মেঘ-মল্লার গানে মুগ্ধা সরস্বতী আবির্ভূতা হ'য়ে বর দিতে চাইলেন, গায়ক সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রার্থনা করলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গী গুণাঢ্য দেবীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই কামনা ক'রে বসলেন। তাঁকে না পেয়ে তান্ত্রিক গুরুর কাছে বন্ধনমন্ত্র শিখলেন এবং এক তরুণ গায়কের দ্বারা দেবীকে আহ্বান ক'রে তাঁকে সেই মন্ত্রে বেঁধে ফেললেন। কিন্তু তাঁকে পেয়েও কামনাতৃপ্তির সুবিধা হোলো না। দেবী মোহে আচ্ছন্ন, গুণাঢ্যের মনেও অশান্তি। সুতরাং গুরুর কাছে আবার মুক্তিমন্ত্র শিখতে হলো। তরুণ গায়ক দেবীকে এ-বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধ-পরিকর। সে সন্ধান পেয়ে এই মুক্তিমন্ত্রের জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে তাঁকে কামনাবন্ধন থেকে মুক্তি দিলে, কিন্তু তার ফলে নিজে পাষাণ হ'য়ে গেল। তবু তার এই ভেবে সুখ যে, "বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার" সে পেয়েছে। কেউ চায় বাঁধতে, কেউ চায় মুক্তি দিতে। তাতে যদি পাষাণই হ'তে হয়,—তবু পাষাণের বুক থেকে কত যে নির্ঝরিণীর ধারা ঝরে, তার প্রমাণ এই বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকেও এঁর বিশেষত্ব কম নয়। যে-সকল চরিত্র ইনি এঁকেছেন, সংসারে জগতে তাদের সাক্ষাৎ নিত্যই পাই, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তাদের পক্ষে অবজ্ঞাপ্রসূ হয়নি। সুপরিচিত হ'লেও "উমারাণী," "পুঁইমাচা" "খুকীর কাণ্ড" ইত্যাদি গল্পগুলির পাত্রপাত্রীদের সহজে ভোলবার কোনো উপায় নেই, লেখকের দরদ তাদের শাশ্বত সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"উপেক্ষিতা"-সম্বন্ধে লেখক বিনয় ক'রে বলেছেন যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম রচনা ব'লেই ওটিকে বইয়ে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমার মতে রসসৃষ্টি-হিসাবে এইটাই শ্রেষ্ঠ রচনা। এ তো গল্প নয়, একখানা ছবি। ভাষার তুলিতে মমতাবৃত্তিকে মূর্ত্তিদান। চিত্র হিসাবে এর নাম দেওয়া যেতে পারে, A portrait study—a life sketch with a perspective background। এ-ছবিতে শুধু একখানি মুখ, বাংলাদেশের পল্লীবধূর। ঘোমটায় মুখ ঢেকে নিত্য পুকুরঘাটে জল নিতে আসেন, তাঁর অন্য কোনো পরিচয় জানা নেই, তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক, কুটুম্বিতা নেই— "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"। পথে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে জড়সড় হ'য়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু সাহস-ভরে একবার সামনে গিয়ে বলো, "আমি আপনার ছোট ভাই, আপনি আমার দিদি," তাহলেই আত্মীয়তা ঘনিয়ে উঠবে। এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো অতি সহজ, স্নেহ দেবার জন্য এঁরা উন্মুক্ত হ'য়ে আছেন। একবার

পরিচয় হ'যে যাক, তার পর ভাইফোঁটা, মিষ্টিমুখ, এমন কি পয়সাকড়ি পর্য্যন্ত লাভ হওয়া বিচিত্র নয়।

"উপেক্ষিতা" এমনি একটী দিদির ছবি। ঘোমটা কতকটা খসেছে, তার মধ্যে দিয়ে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাই যথেষ্ট, বাকিটা ঢাকাই থাক। উপনিষদকার যেমন রুদ্রের দক্ষিণমুখই কামনা করেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনি এই পরিচয়টুকুই চেয়েছেন, অন্য কিছু দেখতে চান না। এই আধো পরিচয়ের পরে অনেক দিন কেটে গেলো, ইতিমধ্যে নায়ক বিলেত, এমেরিকা, জাপান, কত দেশ ঘুরে এলেন। তার পর একদিন আরব সাগরের উপকূলে বসে সেই লক্ষ্মী, সেই স্নেহময়ী পল্লীবধূর স্মৃতি হঠাৎ মনে জেগে উঠলো। আনন্দের রঙে মাত্র কয়েকটি কথার আঁচড় টেনে সমস্ত জীবনের একটা দিগন্তবিস্তৃত আব্ছা পরিপ্রেক্ষিত গড়া হলো। "ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ ক'রে দেখলাম একি মধু! কত নতুন দেশ, কত জ্যোৎস্নারাত্রি, নতুন বনঝোপের নতুন ফুল, কত যুঁইফুলের মত শুভ্র নির্ম্মল হৃদয়, কান্না-জড়ানো কত সে দূর স্মৃতি।" নায়ক হঠাৎ উদ্বেল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন, "তুমি আজও কি আছ, আজও কি সেই রকম ভাঙ্গাঘাটে জল আনতে যাও?" পটভূমি পিছনে ফেলে ছবি উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো। "নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শাণবাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠেছে আর্দ্রবসনা তরুণী। মাটির পথের বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত জলসিক্ত পা দুখানির রেখা! স্নেহভরা বুকখানি জগৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অজ্ঞানতায় ভরা। তার পর যেন কোন্ খড়ের ঘর···মিটমিটে প্রদীপের আলো···মৌন সন্ধ্যা, শান্ত আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চমূলে মঙ্গলপ্রার্থিনী প্রণাম-নিরতা।"

এ যেন সেই impressionist school-এর ছবি, কয়েকটিমাত্র রেখা, মাঝে অনেকটা ফাঁক। চিত্রকর যত নিপুণ, রেখাও তত অল্প, তার মধ্য দিয়ে ছবিও তত স্পষ্টতর। না, এ শুধু চিত্র নয়। একেবারে দর্পণ। আমাদের মেয়েরা একবার পড়লেই নিজেদের এই দক্ষিণমুখটি দেখতে পাবেন। তা ছাড়া গল্পটির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যে-দার্শনিকতাটুকু আছে, তাও বড় মর্ম্মস্পর্শী। "জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ-ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্নের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্ততঃ বর্দ্ধিত অযত্নসম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরি—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে।"

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

The Foundations of Experimental Psychology—International University series in Psychology. EDITED BY CLARK MURCHISON. Clark University Press, Worcester, Massachusetts. Second Printing.

মার্কিনবাসীদের মত উদ্যমশীল বোধ হয় আর কোন জাতিই নহে। তাহাদের ঐশ্বর্য্যও প্রচুর, সহায়সম্পদও যথেষ্ট। নূতন নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদের এতটুকুও ইতস্ততঃ করিতে হয় না। এই International University Series

in Psychology আরম্ভ করা যে কিরূপ সাহসের কাজ তা যাঁরা এদেশে কোন একটা পারিভাষিক মাসিক, ত্রৈমাসিক কি চতুর্মাসিক পত্র চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁরাই অবগত আছেন। কিন্তু Prof. Murchison কাজ আরম্ভ করিয়াই আন্তর্জাতিক মনোবিদদিগের সাহায্যে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য পুস্তক তাহাদেরই একখানি।

মানুষের মন যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধারণাই লোকে করিতে পারিত না। এখনও অনেকে সে ধারণাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু অভ্যস্ত চিন্তাধারার বিপক্ষে যাইলেও, ১৮৭৫ সালে জার্ম্মান মনোবিদ্ Wundt লাইপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করিলেন, তখন এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। সেই অবধি এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। কোন মানসিক তথ্য অনুসন্ধানে এই পন্থা কতদূর সাফল্য দান করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপে অগ্রসর হইলে অধিকতর সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে তাহারই আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে।

ইহাতে ২৩টী অধ্যায়ে, বংশানুক্রম, হৃদয়াবেগ, কর্ম্মপ্রবণতা, শিক্ষা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সামাজিক ব্যবহার, সংস্কৃতি, মনোবিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রভৃতির অধ্যাপক ও শিক্ষক, কেবল দুইজন Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

মনের সহিত দেহের যে একটী যোগ আছে একথা সাধারণভাবে সকলেই জানেন। কিন্তু এই যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ এবং মনোভাবের ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের সহিত দেহের স্নায়ুগ্রন্থি প্রভৃতির কিরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হয় তাহা কেবল মনোবিদ্‌রাই জানেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাঁহারা মনের কার্য্যকলাপ অধ্যয়ন করিতে অগ্রসর হন দেহমনের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহাদের কাছে একটী গোড়ার কথা। দেহতত্ত্বের আলোচনা মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে, কারণ দেহের ভিতর দিয়াই মনের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু তাই বলিয়া দেহতত্ত্ব আলোচনা করাই মনস্তত্ত্ব আলোচনার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃষ্ট পন্থা, এ-রূপ ধারণা নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু যে প্রবন্ধগুলি Murchison এই পুস্তকে একত্রিত করিয়াছেন সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে হয়, তিনি ঐ মতই পোষণ করেন। কারণ প্রায় সমস্তগুলিই "Physiological substrata of mind"-এর আলোচনা। বইখানিকে Foundation of Experimental Psychology না বলিয়া Foundations of Physiological Psychology বলিলেই অধিকতর সমীচীন হইত। শরীরসংক্রান্ত মনোব্যাখ্যা যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু, মানসিক কার্য্যকলাপের দিক্ দিয়া মনের ব্যাখ্যা করাই প্রকৃত মনোবিদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই পুস্তকে সেই চেষ্টাব একান্ত অভাব। Titchener এবং Freud যে দিক্ দিয়া মনোবৃত্তি অধ্যয়নে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই দিক্ দিয়া কেহই আলোচনা করেন নাই।

কিন্তু যে কল্পনাকে মূলমন্ত্র করিয়া প্রবন্ধ গুলির সমাবেশ সাধিত হইয়াছে সেইদিক্ হইতে বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বইখানি মনোবিজ্ঞানের একখানি

মূল্যবান গ্রন্থ। প্রত্যেক প্রবন্ধই নূতন তথ্যের নূতন ইঙ্গিতের এবং নূতন পথের সন্ধান বলিয়া দেয়।

T. H. Morgan বিশদ্‌ভাবে ও বহু উদাহরণের সাহায্যে The Mechanism and Laws of Heredity ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও বংশানুক্রমবিধির সাহায্যে সমস্যার কতদূর সমাধান হইতে পারে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহার বিচার করিয়া সত্য হইতে অসত্যকে ও বাস্তব হইতে কল্পনাকে বিভিন্ন করিয়া আমাদের জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Forbes দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার জন্য কোন বিশেষ প্রাণশক্তির কল্পনা অনাবশ্যক। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র-নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সকল সমস্যারই সমাধান হইতে পারে। শরীরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উৎপত্তিস্থান কোথায় এবং কোন অঙ্গের কিরূপ অবস্থার উপর উহাদের আবির্ভাব নির্ভর করে Cannon তাহা অতি সুন্দর ও সহজভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কোন মানসিক আবেগ প্রবল হইলে তাহা শরীরের ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। আমরা দুঃখ হইলে কাঁদি, আনন্দে হাসি। বহুদিন পূর্ব্বে William James এই সম্বন্ধে এক নূতন মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে এ বিষয়ে সাধারণের ধারণা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে ভাবে আমাদের দুঃখ হয় তাই কাঁদি, আনন্দ হয় তাই হাসি কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। আমরা কাঁদি তাই দুঃখ হয়, হাসি তাই আনন্দ হয়। যে জিনিষে আমরা ভয় পাই, সেই জিনিষ প্রথমে আমাদের শরীরের উপর কার্য্য করে, যাহার ফলে হৃদ্‌কম্প প্রভৃতি হয়; তাহার পর সঙ্গাবহা নাড়ীর সাহায্যে এই কম্পন প্রভৃতির বার্ত্তা মস্তিষ্কে পৌছায়, তখন আমাদের আবেগ জাগে। বস্তুতঃ এই সমস্ত শারীরিক স্পন্দন প্রভৃতিরই নাম Emotion। Philip Bard এই মতের কতকটা সমর্থন করিয়াছেন, কেবল James কথিত স্নায়ুগ্রন্থি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে Thalamus-কেই আবেগের ভিত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। Lashley শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়া বলিলেন যে 'conditioned reflex'-এর সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝা যায় না। পরের প্রবন্ধে Hunter দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন conditioned reflex pricnple ধরিয়া লইলে সব শিক্ষাপ্রণালীই হৃদয়ঙ্গম হয়। শেষ কয়টী প্রবন্ধে শিশুজীবন, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিপরীক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি কিরূপে অধ্যয়ন করা উচিত তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বইখানি মূল্যবান বই কিন্তু মনোবৃত্তি সমূহের যে একটী নিজস্ব সত্তা আছে, একথা সময়মত মনে করিয়া সম্পাদক যদি সে-বিশ্বাসের সমর্থকরূপে আরো কয়েকটী প্রবন্ধকে পুস্তকখানিতে স্থান দিতেন তাহা হইলে বইখানির দাম যে আরও বাড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

পাঠকগোষ্ঠী

["পরিচয়ে" প্রকাশিত প্রবন্ধাদি-সম্বন্ধে পাঠক-গোষ্ঠীর মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই এই পরিচ্ছেদের সূচনা। সমালোচনা পত্রাকারে ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।]

'পরিচয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনাদের পত্রিকা একখণ্ড কিনিয়া পড়িয়া আমার মনোভাব জানাইবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলাম না। অবশ্য এ-কথাও জানি যে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতামতে আপনাদের কিছু যায় আসে না—তবুও যে তাহা জানাইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা আন্তরিকভাবেই করিয়াছি। আপনাদের পত্রিকা কিনিয়া পড়িয়াছি, এ কথা দশজনের সম্মুখে বলিতে আমার কোন কুণ্ঠা নাই—কারণ আমি সে দলের পেশাদার লেখক নয়, যাঁহারা কোন পত্রিকা উপহারস্বরূপে না পাইয়াও তাহা কিনিয়া সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন না।

যাহা হউক, আপনারা যদি আমাকে একখণ্ড 'পরিচয়' উপহারস্বরূপ ডাকযোগে পাঠাইতেন তাহা হইলে আমি তাহা সানন্দেই গ্রহণ করিতাম ও কৃতজ্ঞতা জানাইতাম। অম্লানবদনে পত্রিকা গ্রহণ করিয়া কোন মন্তব্য করিতাম না। এই আচরণের দ্বারায় কেহ যে নিজের বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ ইঙ্গিত করিতেছি না—তবে আমার বন্ধুমহলে দু'একজন ঐরূপ করিতে পারিতেন বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।

আপনাদের পত্রিকায় অশ্লীলতা আছে, এ-কথাও আমার বন্ধুমহলে উঠিয়াছে, কারণ তাঁহাদের কাহারো কাহারো দৃষ্টি ধূর্জ্জটিপ্রসাদের "প্রেমপত্র" ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় 'বাটি' শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। আর্টিষ্ট যখন ছবি আঁকেন তখন সে 'বাটি' তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া থাকেন—তবে কিনা ভাষার আর্টেই তাহার অভিব্যক্তি দোষাবহ। সমালোচক ত আর আর্ট খোঁজেন না, কারণ "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।"

যাহা হউক, বাংলা সাহিত্যে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সমালোচনা হইতে পারে তাহার প্রমাণ আপনাদের 'পুস্তক পরিচয়ের' প্রতি পত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় যত সমালোচনা পড়িয়াছি তাহাতে বড় একটা সুস্থ বিচার-শক্তির পরিচয় পাই নাই—আপনারাই যে ইহার পথ প্রথম দেখাইলেন তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কোন পত্রিকাই এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দিবার ভার ল'ন নাই—আপনারা তাহা করিয়া যে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জর্ম্মাণ ও ফরাসী পুস্তকের পরিচয় পড়িয়া দু'একটী কথা মনে হইয়াছে। আমরা জর্ম্মাণ না জানিয়াও মণীন্দ্রবাবুর Karl und Anna পুস্তকের আলোচনা বুঝিয়াছি ও তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি। কিন্তু সুধীন্দ্রবাবুর ফরাসী পুস্তক-পরিচয় পড়িয়া মনে হইল তাহা আমাদের ন্যায় মূর্খ পাঠকের জন্য লেখা হয় নাই, কারণ ফরাসী ভাষা শিখিয়া পুস্তকগুলির বিশেষ পরিচয় না রাখিলে সুধীন্দ্রবাবুর

আলোচনা বোঝা শক্ত। আর যদি বলেন যে, আমাদের ন্যায় মূর্খ পাঠকের জন্য তিনি ইহা লেখেন নাই, তাহা হইলে 'ঠগ্ বাছিতে গাঁ উজাড়' হইবে—শুধু বাদ থাকিবেন পরিচয়ের লেখকগোষ্ঠী। সেই লেখকগোষ্ঠীর জন্যই যে আপনারা পত্রিকা বাহির করিতেছেন এমন কথা বলিতে পারেন না। সেইজন্যই মনে হয়, সুধীন্দ্রবাবু যদি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রতি পুস্তকের একটু বিশদ পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আমরা অল্প আয়াসেই তাঁহার আলোচনা বুঝিতে পারিতাম। তিনি ফরাসী নামগুলি শুধু বাংলা অক্ষরে দিয়া আমাদের আরও বিপদে ফেলিয়াছেন—"জেরোম, উ সোওয়া-সাঁৎ দেগ্রে লাতিতুদ নর", "লেসম্ (?) দ লা রুৎ", "আঁদ্রে শাঁস", "ল পেসর (?) দাম" প্রভৃতি নামের ভিতর অনেক বাংলা শব্দের রূপ দেখিতে পাইয়াই আমরা 'হরেকরকম্বা'রূপ ধাঁধায় পড়িয়াছি। আর Confidence (পৃঃ ১৩৭) এর উচ্চারণ যদি "কঁফিয়াঁস্ (পৃঃ ১৪১) হয় তাহা হইলে উদ্বাহু বামনের মত ফরাসী ভাষা শিখিবার আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।

আপনাদের প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছি এবং সেগুলিতে যে শিক্ষিত পাঠকের তিন মাসের খোরাক রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষা যে বাঁধনহীন ও অসংলগ্ন বকুনি নয় তাহার প্রমাণ সব প্রবন্ধেই পাইয়াছি, যদিও সুবোধবাবুর "সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য-অনুভব-যোগ্যতা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে" (পৃঃ ৬৯) প্রথমতঃ ভয় পাইয়াছিলাম—হাইফেনগুলিই সে ভয়ের প্রধান কারণ। তবে সুবোধবাবু যে উদ্ধৃত ফরাসী ও সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ না দিয়া আমাদের শিল্পীর ব্যথা-বোধে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন তাহা বলিতে বাধ্য। প্রবোধবাবু বলিয়াছেন যে "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কবীর প্রভৃতির ভিতর প্রাচীন সহজসিদ্ধদের ভাব ও রূপ পরিস্ফুট" হইয়াছিল পৃঃ ২৩) তাহা আরও প্রমাণ সাপেক্ষ। তাঁহার প্রবন্ধে "অসদি" (পৃঃ ২০), "বুদ্ধঘোষ" (পৃঃ ২১) ও "উদ্মাড্যি" (পৃঃ ২৩) মুদ্রাকরপ্রমাদ নয় কি ? তাঁহার বিষয় অবতারণা হইতেই মনে হইল যে, ঐগুলির বদলে "অসঙ্গ," "অশ্বঘোষ" ও উঘাড্যি হওয়া উচিত।

এইবার শব্দবিভ্রাটের কথা বলিব। আপনারা অনেক ইংরাজী শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ স্থির করিয়াছেন—ইহাতে যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আপনাদের ব্যবহৃত সকল প্রতিশব্দই যে চলিবে এ-ভরসা রাখি না—আপনারাও রাখিতে পারেন না। মুকুটিত (পৃঃ ১১৪) চলিলেই আকস্মিকতা (পৃঃ ১১৫) চলিবে কি ? অম্লজান উদজান অচল হইয়া চলিলেও ধনাত্মক ঋণাত্মক (পৃঃ ৫৬) চলিবে কি ? 'হাঁসপাতাল' বলা অভিপ্রেত না হইলেও চলিতেছে—কিন্তু "ষ্টীল্‌নীল" (পৃঃ ১০০) চলিবে কি ? অবশ্য কালপ্রবাহই ইহার নিয়ন্তা। ব্যবহার করিবার হাত আপনাদের, চালাইবার নহে।

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিতে হইলে সংস্কৃত হইতেও যে অনেক কথা আমদানী করা আবশ্যক তাহা আপনারা বুঝিয়াছেন ও দক্ষতার সহিতই তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সংস্কৃত অভিধান নিকটে রাখিয়া আমাদের বাংলা পড়িতে বলেন তাহা হইলে আমাদের উপর অন্যায় করিবেন—বাংলা ভাষার উপরও যে ন্যায় করিবেন সে কথা সর্ব্বতোভাবে বলিতে পারি না। 'অতিমর্ত্ত্য,' 'আধিদৈবিক' (পৃঃ ৬), 'বৈফল্য,' 'অতিবাদ' (পৃঃ ২৮) ও 'ঐতিহ্যবিপ্লব' (পৃঃ ৩১) সহজেই বুঝিতে

পারি কিন্তু 'স্বসম্বেদ্য,' 'সার্ব্বিক' (পৃঃ ৩০), 'অন্বিষ্ট,' 'উল্বণ,' (পৃঃ ৪১), 'প্রত্নতাত্ত্বিক উল্লেখনী' ও 'আপতিক ভিত্তি' সহজ কেন—বিশেষ কষ্ট করিয়াও বুঝিতে পারি কি ?

যাহা হউক আপনাদের লেখার অবিনীত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে—সাধারণ পাঠক হিসাবে আপনাদের প্রবন্ধ পড়িতে যে সব বাধা অনুভব করিয়াছি তাহাই জানাইলাম। আপনারা বাংলা সাহিত্যের যে অচিরেই ভাষা ও ভাব সম্পদে শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারিবেন তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু, যাঁহার মতামতের মূল্য আছে, তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। তিনি মনে করেন যে, আপনাদের পত্রিকায় আধুনিক বৈঠকখানার ফ্যাকাসে রং ফুটিয়া উঠিয়াছে (তাঁহার এই মতই নাকি সাময়িক কোন কাগজে এক সমালোচক বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন)। বৈঠকখানায় যে আপনারা বসেন তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না, তবে তাহার রং ফ্যাকাসে কিনা জানি না। আপনারা বস্তীতে যে বসেন না সে কথা নিশ্চয়, কারণ 'পরিচয়ের' পত্রে কোন বস্তী-কাব্যের পূতিগন্ধের আঘ্রাণ পাই নাই ও "শনিবারের চিঠিও" এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। দোকানের কেনা চপ্-কটলেটের গন্ধে ভরপূর মাছি ভন্‌ভন্ করা—প্রেসের পাশের এঁদোঘর বা গোচারণের মাঠেও আপনারা যে যান না তাহা জানি—কারণ সেখানে মক্ষিকা, সমালোচক ও 'কবিতা' লেখক ব্যতীত অন্যের গতিবিধি নাই। এ অবস্থায় আপনাদের হয় ত্রিশঙ্কুরের ন্যায় অন্তরালে থাকিতে হইবে—না হয় বৈঠকখানায় বসিয়া দরদ দিয়া এমন প্রবন্ধ লিখিতে হইবে যাহাতে আপনাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে। আপনারা যে দরদ দিয়া লিখিয়াই যাইবেন তাহাতে আমার আর সন্দেহ নাই—আমার বন্ধু আপনাদের লেখায় যে রংই দেখুন না কেন। কারণ প্রবন্ধের ভাষায় যদি কোন রংই না ফুটিয়া উঠে তাহা হইলে পাঠকের মন অনুরঞ্জিত হইবে কি করিয়া। ইতি—

বিনীত

শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * * *

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রীতিভাজনেষু,

গত সংখ্যার 'পরিচয়ে' শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বন্দীর বন্দনা" সম্বন্ধে সমালোচনাটি বোধহয় রসগ্রাহীমাত্রেই উপভোগ করবেন। বাংলাদেশে শ্রীবুদ্ধদেব বসু আজ খ্যাতিলাভ করেছেন, কিন্তু বোধহয় গিরিজাপতি বাবুর মতন দরদ দিয়ে ইতিপূর্ব্বে তাঁর কাব্যের মূল ধারাটি কেউ বুঝতে চেষ্টা করেন নি। বুদ্ধদেবের মতন অসামান্য তরুণ প্রতিভাকে যে রসিক বাঙ্গালী এতদিন ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেনি (যেখানে তাঁর শতাংশের একাংশও প্রতিভা যাঁদের নেই তাঁদের ঝঙ্কার মাত্র সম্বল উৎকটতায় দশদিক মুখরিত বললেই হয়) এতে ক'রে রসিক বাঙ্গালীর রসজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না। বুদ্ধদেবের ত্রুটি সম্বন্ধে আমি পূর্ণভাবে সচেতন—কিন্তু কবির বিচার তার ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা দিয়ে ত নয়—"The greatness of a man is the greatness of his greatest moments"—এবং যেখানে বুদ্ধদেবের প্রেরণা

সত্য, সেখানে তিনি সত্যিই বড়, এই-ই আমার বলবার কথা। গিরিজাপতি বাবু বুদ্ধদেবের এই মহত্ত্বের দিকটা বেশ দেখিয়েছেন, যদিও বড্ড সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবল একটি প্রশ্ন আমি আপনাদের পত্রাধ্যায়ে করতে চাই, গিরিজাপতি বাবুর সুললিত সমালোচনাটির সম্পর্কে। সেটি এই যে, বুদ্ধদেব যে ধরণীকে মৃতা জ্ঞান ক'রে এ-গ্রহকে ছেড়ে অন্য কোনো লোকোত্তর ভাস্করে তাঁর কাব্যাসন পাততে চান, এ ধারণা গিরিজাপতি বাবুর হ'ল কোথা থেকে? বোধহয় বুদ্ধদেব আমাদের এ সুন্দরী ধরণীকে বার বার "মৃতা" ব'লেছেন ব'লেই ক্ষুব্ধ হ'য়ে গিরিজাপতি বাবুর মনে এ ধারণাটি জন্মেছে। জন্মানো অসম্ভবও নয়। মানে, প্রথম দর্শনে বুদ্ধদেবের আক্ষেপকে নিছক্ ধরা-ঘৃণা বা নিরাশ হওয়ার দরুণ ব্যক্তিগত ক্ষোভ ব'লে মনে হওয়াটা হয়ত খুব বিচিত্র নয়। কারণ তাঁর অনেক লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ষোভ আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিরিজাপতি বাবু যদি আর একটু মনোনিবেশ ক'রে বুদ্ধদেবের "বন্দীর বন্দনা" পড়তেন—তাহ'লে দেখতে পেতেন যে "বন্দীর বন্দনায়" বুদ্ধদেবের যে ধরা-বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে সেটা ধরণী "as-she-is"-এর 'পরে—ধরণী as-she-could-be বা ought-to-be-র 'পরে নয়, এবং এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে আমাদের জন্মভূমির দুই মূর্ত্তি দেখিয়েছেন—"মা কি হইয়াছেন" ও "মা কি হইবেন।" সেখানে মার বাস্তব মূর্ত্তিকে দীনা রিক্তা কঙ্কালসারা করেছেন জননীর সঙ্গীতমুখরা সালঙ্করা বিপুলবৈভবা মূর্ত্তিকেই বড় করতে। বুদ্ধদেবও তাঁর 'বন্দীর বন্দনা'য় এই contrast—বৈষম্য—ফোটাতেই চেষ্টা করেছেন, ধরণীর কী (বাস্তব) রূপকে আমরা ভালবেসে থাকি ও কী (স্বপ্ন) রূপকে ভালবাসা উচিত ও কী রূপ ধরণী পরিগ্রহ করবেন—কবির আবাহনে, স্বপ্নে, সাধনায়। একথার স্বপক্ষে অজস্র উদাহরণ "বন্দীর বন্দনা"র প্রতি কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করতে পারি। কিন্তু পত্র সংক্ষেপ হওয়ার দরকার ব'লে মাত্র দু-তিনটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।—

> "পৃথিবী গিয়েছে ম'রে মোরা তারে বাঁচাইবো ফিরে
> মোদের নয়নে আছে যে বিরল আলোক ভাণ্ডার,
> সে-ই মৃত সঞ্জীবনী, তারি স্পর্শে বাঁচিবে ধরণী।" (৩৩ পৃষ্ঠা)

তাঁর "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতাটিতে কবি যে দুটি অপূর্ব্ব প্রেমউচ্ছ্বসিত গান গেয়েছেন, সে দুটির ছত্রে ছত্রে কবির অনুপম বেদনার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাঁর এই অভীপ্সাই ফুটে উঠেছে যে—

> "কোরো না মানা
> দুরাশা আমার বুকে দিতেছে হানা,
> কবিরা করেছে শোক অশ্রুভারে
> ছোঁয়ায়ে আমার চোখ বাঁচাবো তারে
> পৃথিবী উঠিবে জেগে চির-অজানা।" (৩৩ পৃষ্ঠা)

বুদ্ধদেব বিশেষ ক'রে তাঁর "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতাটির বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় তাঁর কবিহৃদয়ের স্বপনী-হৃদয়ের দ্রষ্টা-হৃদয়ের নিহিত কামনাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন কবির স্বপ্ন কত মহৎ। ভূমি ও নারী রাজেন্দ্রেরও কাম্য, কিন্তু

কবির নয়। কবি মর, কিন্তু তাঁর কাব্য-প্রেরণা অমর। এই কাব্য-প্রেরণারই কবির কাছে দাবী এই, যেন কবি বল্‌তে পারেন উচ্চকণ্ঠে সগৌরবে—

"বিধাতার নির্ব্বাচিত মোরা,
কবিতা মোদের প্রিয়া, আমরা চাহিনা সিংহাসন
চাহিনা সহস্র নারী ; মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি' ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।"

কেন ? না,

"আমাদের তপস্যায় পৃথিবীর নবজন্ম হবে।" (৩৫ পৃষ্ঠা)

কাজেই তাঁর তপস্যা মৃতা ধরণীকে পায়ে ঠেলে যাওয়া নয়, তাঁর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—

"আকাশবিস্তৃত প্রাণ, উদার, উন্মুক্ত অজস্রতা,
স্বপ্নসমুজ্জ্বল পরমায়ু"

যাতে করে

"মোদের তপস্যা ফলে
নূতন গগনাঙ্গনে নবজন্ম লভিবে পৃথিবী।"

এই পৃথিবীর নবজন্মের পরিপ্রেক্ষিতই বুদ্ধদেবকে শিখিয়েছে বাস্তবের সঙ্কীর্ণ দিগন্তকে অবজ্ঞা করতে—বর্জ্জন করতে। কিন্তু তাই ব'লে তাকে দলিত ক'রে দূরে অস্পৃশ্যের মতন বর্জ্জন করতে নয়। তাকে রূপান্তরিত করতে।

তাঁর কবি-স্বপ্ন মনে করিয়ে দেয় শ্রীঅরবিন্দের "The Life Divine"-এর একটি প্রতীতি—

"Not to abandon the lower to itself, but to transfigure it in the light of the higher to which we have attained is divinity of nature."

বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা'র স্বপ্ন ঠিক সমশ্রেণীর বলিনা—কিন্তু তা স্বপ্নে-ভরা—উর্দ্ধ-আরাধনায় ওতপ্রোত—মানুষের দেবত্বে উন্নীত হওয়ার কামনায় দীপ্যমান্, এই-ই আমার বক্তব্য। ছত্রে ছত্রে মুগ্ধ করে তাঁর এই অভীপ্সা, মনে করিয়ে দেয় শেলির কবি-আকূতি,

The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow.

মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের—

মোর কিছুধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে—নিভৃত স্বপনে

মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষ যে অমৃতের পুত্র একথা সে ভুলতেই পারে না, বাস্তবের গভীরতম অপমানেও না। তাই বুদ্ধদেব গেয়েছেন—

"মানুষ দেখে না কভু যে আকাশ,
আমরা সেথায়
রচিবো অদৃশ্য চক্র দীর্ঘপক্ষ করিয়া বিস্তার"

তাই তিনি দেখেছেন—

"অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি।" (৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু হায়রে, মানুষ এত সেন্টিমেণ্টাল, এত স্বল্পসুখী এত পূজোপচারবিলাসী! তার প্রতি দুর্ব্বলতা, পিছুটান, কামনার গ্লানি, ভয়, নিষ্ঠুরতা, সাম্রাজ্যবাদ, কুসংস্কার, কাড়াকাড়ি—এমন কি ঈর্ষাকেও সে চায় কাব্যে ছন্দে আদর্শে সমর্থন করতে, বড় ক'রে দেখাতে। যদি কেউ বলে যে—না, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতার সিংহাসন এ-গ্লানির এ-আবর্জ্জনার ও সম্ভ্রমহীনতার মধ্যে নয়; যদি কেউ বলে—

"Ich liebe die groszen Verachtenden, weil sie die groszen Verchren-den sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer."*

যদি কেউ অনুপম প্রেরণায় ওজস্বিনী ভাষায় বলে যে, মানুষের সব চেয়ে বড় অপমান,

"বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দ্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর
রক্তের আরক্ত লাজে উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি!"

(বন্দীর বন্দনা, ২০ পৃষ্ঠা)

তাহ'লেই লোকে মহাদুঃখিত হ'য়ে বলে, হায়, হায়, হায়,—কবির বাণী ত এ নয়, কবির বাণী হচ্ছে মানুষের চরম গ্লানির কঙ্কালকেও ঢেকেঢুকে রাঙতা দিয়ে মুড়ে, আত্মপ্রবঞ্চনার চণ্ডীমণ্ডপে এনে প্রতিষ্ঠা ক'রে, আত্মপ্রসাদের অগুরু চন্দন দিয়ে পূজা করা। অর্থাৎ এক কথায় আত্মাবমাননাকে দরদ, অনুকম্পা, মানবপ্রেম প্রভৃতি নাম দিয়ে নানা ছন্দে মিলে জাহির করা, তর্পণ করা, পুতুলনাচ নাচানো। বুদ্ধদেব বোধহয় বাঙালীর মধ্যে প্রথম "ঘৃণার কবি"—মানে, দীন ঈর্ষার ঘৃণা নয়,—সেই ঘৃণার, যে বলে—

[ঘৃণা কথাটা একটু শুনতে খারাপ, আমি ঘৃণা বলতে বুঝছি, বিতৃষ্ণা, তীব্র বিতৃষ্ণা—অহঙ্কারমূলক অবজ্ঞা নয়।]

"Was ist das Groszte, das ihr erleben Konnt? Das ist die Stunde der groszen Verachtung. Die Stunde, in der euch euer Gluck zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend."†

আশা করি, এ কয়টি কথা পরিচয়ে ছাপ্‌বেন। ছাপ্‌বার প্রয়োজন আছে এইজন্যে যে, কাব্যামোদীদের পক্ষে (বিশেষ ক'রে ভাববিলাসী নিস্তেজ বাঙালীর পক্ষে) বুদ্ধদেবকে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই পনেরো আনা। মানুষ চায় তোষামোদের ধূপারতি, অর্থাৎ সহজ সুলভকে বড় করে দেখতে পারে এমন amiable কবির স্তুতিবাদ। কারণ আত্মাদর (amour-proper) নইলে মানুষ বাঁচতে পারে না; কাজেই যেখানে তার ধূলিপ্রীতি তার অন্তরের দেবতাকে নিত্য অপমান করে সেখানে সে ধূলিকেই

---

* "হৃদয় যে তীব্র ঘৃণা বহে—আমি অনুরাগী তারি,
সেই ভাবে মহৎ পূজারী
যাহার আত্মার দূরমুখী শর মর্ত্ত্যে বারম্বার—
ধায় লক্ষ্যি অলখ বেলার পার।"
নীট্‌শে—Also Sprach Zarathustra

† "কোন লগ্ন আনে বহি জীবনের শ্রেষ্ঠতম ধ্বনি?—
যে-লগ্নে মানব তার পুঞ্জীভূত ঘৃণাতূরী স্বনি
সুলভ সুখেরে গণে—ম্লান দীন হেয়
যুক্তিতর্ক পুণ্য-সম্পদেও গণে—তুচ্ছ অবজ্ঞেয়।"
নীট্‌শে—Zarathustra.

রজঃ ব'লে তার স্তবমুখর হ'য়ে ওঠে, যেহেতু তাতে ক'রে সবচেয়ে কম দরে মেলে এই আত্মাদর।

খুব কম কবিই বিধাতার কাছ থেকে "নাল্পে"-র অভীপ্সা নিয়ে জন্মান—ধূলির গ্লানিকে গ্লানি ব'লে অমৃতের সন্ধানে ছোটেন। যে দু' একজন কথনো কথনো আমাদের মধ্যে এই অমর ধূলি-বিরাগ নিয়ে আসেন, যাঁরা spade-কে spade বলতে সক্ষম, ছোটতে যাঁদের মন ভরে না তাঁদের প্রাপ্য—আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, প্রীতির তর্পণ, কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য—

সে কবি বলতে সক্ষম যে,

"আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিৎ দংশন
জিঘংসার কুটিল কুশ্রীতা!
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সবে ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায় লজ্জায়
ভুলিয়া থাকিতে চাই;—ক্ষণতরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য উচ্ছ্বাসে
তবু হায় পারিনে ভুলিতে।"

(বন্দীর বন্দনা, ২০ পৃষ্ঠা)

ইতি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

শুদ্ধিপত্র

(গত সংখ্যায় কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছিল, সে গুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইল)

পৃষ্ঠ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	কণ্ঠা	কণ্ঠ
২০	অসাদি	অসঙ্গ
২১	বুদ্ধঘোষ	অশ্বঘোষ
২৩	উদ্মাড্যি	উঘাড্যি
৪৪	(১৮৭৬-১৮৭৮)	(১৮৭৭-১৮৭৮)
৪৫	(১৮৫৪-১৮৮১)	(১৮৫৫-১৮৮১)
৪৮	প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠা
৪৯	First International	First Congress
৫৩	পাইয়া	লইয়া
৫৭	নিরানব্বই	বিরানব্বই
৯৬	আজ	আন
১১৬	দলাদলিই	দালালিই
১৫২	অস্বীকার	অঙ্গীকার

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

"পরিচয়ের" আদর্শ প্রথম সংখ্যার মুখপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে স্থরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪।০, প্রতি সংখ্যা ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার।

প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

ঠিকানা ও ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "পরিচয়",
রুম নং ১৭, ষ্টিফেন হাউস,
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ ১৩৩৮

পরিচয়

ছন্দের হসন্ত হলন্ত

দিলীপকুমার আশ্বিনের উত্তরায় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্ব্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে কথা বলতে চেয়েচি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েচেন যে নিম্নলিখিত কবিতায় আমি "একেকটি" শব্দটাকে চারমাত্রার ওজন দিয়েচি—

ইচ্ছা করে অবিরত   আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এদিকে নীরেনবাবুর রচনায় "এক্‌টি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে "এক্‌টি" শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করিনি ব'লে তিনি দ্বিধা বোধ করচেন। তর্ক না ক'রে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

একটি কথার লাগি   তিনটি রজনী জাগি
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে,   কথা যেন বন্যা ছোটে,
গোলমালে তোলপাড় পাড়া ॥

"এক্‌টি" "তিন্‌টি" "এক্‌টু" শব্দগুলি হসন্তমধ্য, "গোলমাল" "তোলপাড়"-ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনি-লাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিনমাত্রা চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন কেবলমাত্র অক্ষর গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েচে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তা হ'লেই

ছন্দে ধ্বনির কম্‌তি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌লের চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে ঃ—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

ব'লে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মত-সংশয় নিবারণের উদ্দেশে,—এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন।

আরো একটা ঃ—

একৃটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি।
এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌কপাটি॥

অথবা

একৃটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ নাই জোটে স্বুট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায় কিন্তু তাই ব'লেই যে পয়ার ছন্দের নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব ক'রে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি। কেননা, তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয় কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হোলো মনোরঞ্জন; খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি ক'রে তারপরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির রাজ্যে গোঁয়ার্ত্তমি ক'রে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার? চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েচে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করচি যে আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিম্বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন জল শব্দটা দিয়ে জল পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয় তাহ'লে খোঁড়া হসন্তবর্ণকে কখনো আধমাত্রা কখনো পূরোমাত্রার পদবীতে বসানো হয় কেন? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও পংক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনি-মাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হ'য়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে

বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ ব'লেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি "এইরে", আবার তাকে টান্‌লে ডবল ক'রে বলতে পারি "এ-ইরে"। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্ম্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সঙ্কোচন প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্ত্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুস্কিল বাধে; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এই জন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা ক'রে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালীর আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যস্ত। বাংলার প্রাকৃতছন্দ ধ'রে তার প্রমাণ দেওয়া যাক্,—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোওয়ায় সের-ওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোওয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্চে তিনের।

বৃষ্‌টি। পড়ে -। টাপুর। টুপুর। নদেয়। এল -। বা - ন।
শিবুঠা। কুরের। বিয়ে -। হবে -। তিন্‌ক। ন্‌না -। দা - ন।

দেখা যাচ্চে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্ত্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত ক'রে সেই পোড়ো জায়গা দখল ক'রে নিয়েচে। এত সহজে যে, হাজার হাজার ছেলে মেয়ে এই ছড়া আউড়েচে, তবু ছন্দের কোনো গর্ত্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয়নি। ফাঁকগুলো যদি ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন—দোহাই দিচ্চি না করেন যেন—তবে এই রকম দাঁড়াবে ঃ—

বৃষ্টি পড়চে টাপুর টুপুর নদেয় আস্‌চে বন্যা,
শিবুঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে ঃ—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখ-বাঁধা বলদের মতো।

এটাও তিন মাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা - আ। মায় ঘু। রাবি -। কত -।

ফাঁক ভরাট করতে হ'লে হবে এই চেহারা ঃ—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষু-বদ্ধ বৃষেরই মতোই।

যাঁরা অক্ষর গণনা ক'রে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মীড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ—সে সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

"হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।"

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

১ ২ ৩ ৪
হারিয়ে ফেলা—। বাঁশি আমা-র। পালিয়েছিল। বুঝি—।
৫ ৬
লুকোচুরী-র। ছলে—।

কিছু বৈচিত্র্যও দেখচি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ গিয়ে একেবারে চতুর্থভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েচে। পাঠক "হারিয়ে ফেলার" পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ ক'রে দেন তবে ভালোই শুন্‌তে হবে।

কিন্তু যদি বেফাঁক ঠাস্‌-বুনানির বিশেষ ফরমাস থাকে তা হ'লে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না ঃ—

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণ-যাত্রীদলে,
স্বর্ণবরণ কুজ্ঝটিকায় অস্ত-শিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে॥

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক্ পাঠ করতে বাঙালী পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছেরে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালী নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ত-এর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে পড়বে। আবার যেম্‌নি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও শর্ষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা বাঁটা,
যত্ন ক'রে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা—

অমনি প্রাক্-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হবে না। এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, এ'কে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট ক'রে তাকে সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত—এ মত চালালে বাংলাভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুক্‌নো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশী তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষা,—যাকে আমরা সাধুভাষা বলি,—তার মধ্যে প'ড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আট্‌কা পড়ে গেল? তার কারণ সংস্কৃত-বাংলা কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায় কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দ্দিষ্ট, কারো বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়—কিন্তু গোণাগণতি চৌকি, সীমা নির্দ্দিষ্ট। যদি ফরাসে বসতে হ'ত তাহলে কলেবরের তারতম্য ধ'রে পরস্পরের আসনের সীমানায় কমি-বেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটত। কিন্তু সভ্যতার মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাঁধা নিয়মে পাকা ক'রে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্য্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেই জন্যেই সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্য্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরাণীর সৌন্দর্য্য ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্য্যাদার আদর্শ সকল রাজরাণীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরী নয়, রাজসমাজের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ ওটা প্রাকৃত নয় সংস্কৃত। তাই দুষ্মন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় ক'রে তুল্‌তে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয়নি। তাই আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালী ঐ গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপড়ে ফেলে। সে যদি কবি হ'ত, সাধু ভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে জাতীয়

ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্চে পয়ার জাতীয় ছন্দ। এখানে ফাঁক ফাঁক নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে চড়ানো নিরাপদ। এখানে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরকে বাহন ক'রে যুগ্ম অযুগ্ম নানা রকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

কাব্যলীলা একদিন যখন সুরু করেছিলেম তখন বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা কাটা পীঁড়িতে ভাগকরা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমানদরের একক ব'লে ধ'রে নিতে বারম্বার কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জ্জন করবার একটা দুর্ব্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বস্‌ছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল ক'রে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় পেরে উঠিনি কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। ছবি ও গান-এ রাহুর প্রেম কবিতা পড়লে দেখা যাবে, যুক্ত অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে তবু তারা পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হ'য়ে রইল। তাই যখন লিখেছিলুম ঃ—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি—কিন্তু তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক। কেননা পাঠকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় ব'লে মনেও করেনি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী ব'লে প্রবোধচন্দ্র বাঙালী কবিদেরকে যে দোষ দিয়েচেন সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলেনা। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি ব'লে সাহিত্যসমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ, পয়ার জাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্য জাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবী সেদিন বিধিবদ্ধ হয়নি।

তারপরে মানসী লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য্য রাখতে পারচেনা। একথা তখন নিশ্চিত বুঝেচি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি; অথচ এটাও জানচি যে পয়ার সম্প্রদায়ের বাইরে নির্ব্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না। "রয়েছি পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা" এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধা প্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেচে, তিনমাত্রার স্কন্ধকে চারমাত্রার বোঝা বইতে হচ্চে। সেই মানসী লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েচি।

প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করেছিলুম। অনতিকাল পরেই দেখা গেল তার প্রয়োজন নেই। পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে। (এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ার জাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই পয়ার নাম দিচ্চি।)

পয়ারে ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্চে ৩+৩+২+৩+৩ যথা :—

নিখিল আকাশ ভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে লভিল প্রতিমা।

অন্য রকম, যথা

তপনের পানে চেয়ে সাগরের ঢেউ
বলে ওই পুতলিরে এনে দে-না কেউ।

অথবা

রাখি যাহা তার বোঝা কাঁধে চেপে রহে।
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

অথবা

সারা দিবসের হায় যত কিছু আশা
রজনীর কারাগারে হারাবে কি ভাষা॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্ত্তন হয়েচে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হ'লে সে পদ্য হ'লেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো, যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হাল্কা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপানো যাক্—

স্বরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে
মন্দার মঞ্জরী তোলে চঞ্চল কঙ্কণে।
বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
স্বর্গবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া।

আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘপয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরের লাইন-ডিঙোনো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচ-কাওয়াজ করানো যায়।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা। স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে। বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
সেই নির্ঝরিণী ধারা। রবিকর স্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে। অন্তহীন আনন্দের গীতা॥

বাঙলায় এই আর একটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলা কাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে ছুলে হাল্কা কাজে লাগানো যায় যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহ-সংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়—অর্থাৎ হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু—তাকে নিয়ে মাল বওয়ানোও যায়, বাচ খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের দেহ-সংস্থান এর উল্টো—তার প্রথমভাগে আট শেষভাগে দশ—তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত হ'য়ে উঠেচে। ছোট পয়ারের ছিব্‌লেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক্—

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিট্‌ফাট্,
তক্‌রার হ'লে আর নাই মিট্‌মাট্।
চষ্‌মায় চম্‌কায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এর ভাগগুলোকে কাটা কাটা ছোটো ছোটো ক'রে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘন ঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেচে। এখানে

এটা পাৎলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজ্‌বুৎ ক'রে খাঁড়া ক'রে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্ল সজ্জাশালী।
তর্ক যুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রূকুটী প্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়॥

যেখানে সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এ রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে ব'লে আমি তো জানিনে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায় তখন দেখি পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভার সামঞ্জস্য হ'য়ে থাকে।

নিঃস্বতা-সঙ্কোচে দিন। অবসন্ন হ'লে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা। নেয় তারে কোলে।

গণনা ক'রে দেখলে ধরা পড়ে এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাৎ হ'য়ে পড়ে না, তার কারণ, ডাইনে বাঁয়ে যতির লগির ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেই রকম। পয়ারের প্রকৃতরূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্ত্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষভাগে যেখানে ক্ষীণ-কটি সেখানেও আর একটা। এই বিভক্ত ভারের দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারেরও সেইরকম বিশেষভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেলতে ফেলতে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হোতো যে, কোনো জানোয়ারের পা দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তা হ'লে তার চলনে স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হোত—সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাকত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

তরণী বেয়ে শেষে। এসেচি ভাঙা-ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই। জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দ অক্ষর—এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবু ওকে পয়ার বলবার জো নেই। ওর পা ফেলার ভাগ অসমান।

তরণী । বেয়ে শেষে ॥ এসেচি । ভাঙা ঘাটে ॥

এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা ক'রে যতি আছে, কিন্তু বেজোড় অঙ্কের অসাম্য ঐ যতিতে পূরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে যে পর্য্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এই রকম ছন্দের রচনা। এর পিঠের উপর যেমন তেমন ক'রে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়—সায়াহ্ন অন্ধকারে এসেচি ভগ্ন ঘাটে—তা হ'লে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয় তা হ'লে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা ক'রে দিতে হ'বে। পয়ারের মত উদারভাবে যেমন খুসি ভার চাপিয়ে দিলেই হোলো না।

অন্ধরাতে যবে বন্ধ হোলো দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে উঠে বিপুল হাহাকার।

মনে রাখা দরকার এই ছন্দের প্রত্যেক ভাগে আরম্ভে ঝোঁক না দিয়ে যদি শেষে ঝোঁক দেওয়া হয় অর্থাৎ "অন্ধ" ও "বন্ধ" শব্দের উপর ঝোঁক না পড়ে' যদি সেটা পড়ে "যবে" ও "দ্বার"-এরউ পর তা হ'লে এটা আরেক ছন্দ হ'য়ে যাবে। এ'কে নিম্নলিখিত রকম ভাগ করে পড়তে হ'বে,—

অন্ধ । রাতে যবে ॥ বন্ধ । হোলো দ্বার ॥
ঝঞ্ঝা । বাতে উঠে ॥ বিপুল । হাহাকার ॥

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা-কে কেবল যে চলতে হয় তা নয় দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম আছে ব'লে বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আজ পর্য্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্ত্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হ'ল না। কেননা চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে—চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুই মূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিন মূলক অসম মাত্রায় চাকার চাল। দুই পা-ওয়ালা জীব উঁচু নীচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চ'লে যায়।—পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর যাতে বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হ'বে।

অধীর বাতাস এল সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিন শেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে
লতারে কাঙাল ক'রে ঠকালে।

এ ছন্দ পয়ার জাতীয়—টেনিস্ খেলোয়াড়ের আধা পায়জামার মত বহরটা নীচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুসি চলে।

নবারুণ চন্দনের তিলকে
দিক্-ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
ঊষা এলো সুপ্রভাতে
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

কিন্তু

শরতে শিশির বাতাস লেগে
জল ভরে আসে উদাসী মেঘে।
বরষণ তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

এখানে তিনমাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেচে—চাকার চাল, পা ফেলার চাল নয়, তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করিনি হেলা
ভুলিয়া ছিলাম ফসল কাটার বেলা।

পয়ারের মতোই চোদ্দটা অক্ষরে পদ—কিন্তু জাত আলাদা। তিনমাত্রার চাকায় চলেচে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামল ঘন　বকুল বন　ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর　বাজে মধুব পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দ অক্ষর—কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সম মাত্রার পদচারণের শান্তি নেই ব'লে বিষম মাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো—যতক্ষণ না লক্ষ্য স্থানে গিয়ে বসে পড়ে থেমেও ভালো ক'রে থামতে পারে না।

বাংলা চল্তি ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণই কোনোটা আধখানা কোনোটা পূরোপূরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হ'য়ে গেচে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে,—সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হ'য়ে পড়ে। চলিত এবং চল্তি, ঘৃণা এবং

ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য এইটেই হোলো ছুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনি-সঙ্গীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসঙ্গীতে প্রভূত প্রভেদ। এই ছুইয়েরই বিশেষ মূল্য আছে—বাঙালী কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে ছুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক ব'লেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রাকৃত বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখ্‌তে পাই তার ছন্দ তিনমাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেচে। অর্থাৎ তার তালটা স্বভাবতই একতালা জাতীয়, কাওয়ালি জাতীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় এই "তাল" শব্দটা ছুই সিলেব্‌লের—বাংলায় ল আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেচে, তার জায়গায় টি বা টা যোগ ক'রে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টায়ের ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

—রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি—

এটা সংস্কৃত বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত ক'রে ফাঁক ভর্ত্তি ক'রে নিয়েচে। "রূপ" এবং "ডুব" আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। "সাগরের" শব্দ আপন একারকে পরবর্ত্তী হসন্ত র-য়ের পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েচে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে চলেচে। অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে ছুইমাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ ক'রে তার ধ্বনি সমারোহ বাড়িয়ে তুল্‌লে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হোলো রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত বাংলা দেখা যাক্ ঃ—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েচি অরূপ রতন আশা ক'রে"—এখানে "রূপ" আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে "সাগরে"র সা-টাকে টেনে আপন ক'রে নিয়েচে, মাঝে ব্যবধান থাক্‌তে দেয়নি। "রূপ-সা" তাই আপনিই তিনমাত্রা হ'য়ে গেল। "সাগরের" বাকি টুক্‌রো রইল "গরে"। সে

আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে "রে"-টাকে দিলে লম্বা ক'রে, তিনমাত্রা পূরল। "ডুব্", আপনার হসন্তর টানে "দিয়েচি"র দি-টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি ক'রে আগাগোড়া তিনমাত্রা জমে উঠল। হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিনমাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেচি। এমন কি, যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ঐ একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হ'য়ে মজ্জাগত হ'য়ে গেচে। যেমন ঃ—

অচে - । তনে - । ছিলেম । ভালো - ।
আমায় । চেতন । করলি । কেনে - ।

প্রাকৃত বাংলার এই তিনমাত্রার ভঙ্গী চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেচেন। যেমন ঃ—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
　　মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
　　পথের নিকটে রয়।

কিন্তু প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুট্‌ল ঊর্দ্ধশ্বাসে,
ঘূর্ণীবেগে উড়্‌ল ধূলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

কিম্বা—

ছুট্‌ল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুট্‌ল কেন উর্ব্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ লুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে॥

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে ?

প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে উড়্‌ল ছুট্‌ল টুট্‌ল ঢাক্‌ল প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এই রকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধ'রে নিতে হ'বে ঐ ছড়াগুলি প্রাকৃত বাংলাতেই লেখা হচ্চে। আমি যে প্রবন্ধ লিখ্‌চি এও প্রাকৃত বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হ'ত তা হ'লে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাৎ থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাস দোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত কিন্তু কখনোই "করিয়াছিল" "গিয়াছে" ধরণের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত বাংলায় ব্যবহার করাও চলে না। প্রবোধচন্দ্র "বিচিত্রা"য় লিখেচেন যে, বাঙালী কবিরা সাহস ক'রে

কবিতায় করিব চলিব প্রভৃতি প্রয়োগ না ক'রে কেন কর্‌ব চল্‌ব প্রয়োগ না করেন? যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথা স্থানে কেন করিনে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন যথাস্থানেও কেন করিনে তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে ক'রে থাকি।

যে তর্ক নিয়ে লেখা সুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক্‌। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোয় কয় মাত্রা গণনা করা হ'বে তাই নিয়ে সংশয় উঠেচে।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দের মাঝখানে হসন্তবর্ণ যুক্তবর্ণের রূপ ধ'রে সাধুভাষায় অনায়াসেই আপন স্থান পেয়েচে। একমাত্র খণ্ড ৎ অক্ষর মহলে আপন অনুবর্ত্তী জুড়ির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। প্রাকৃত বাংলায় শব্দমধ্যবর্ত্তী হসন্তবর্ণ আপন বিচ্ছিন্ন অক্ষর রূপ রক্ষা ক'রে রয়ে গেচে। তার অধিকাংশই ক্রিয়াপদ।

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করেচি। বলেচি নিয়মের বিকল্প চলে; কেননা বাঙালীর কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেচে। এ ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমি-বেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাক্‌রুণ।

অন্তত চিম্‌নিকে দুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয় নি। আবার

চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিণী সরোষ
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর নাই কোনো দোষ।

এ রকম বিপর্য্যয়ও চলে। একই ছড়ায় চিম্‌নিকে একমাত্রা গ্রেস মার্কা দেওয়া হয়েচে অথচ ঠাক্‌রুণকে খর্ব্ব ক'রে তিনমাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেচে ব'লে মনে করিনি।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধরে
জল ছিটাইয়া দাও ধূলা যাক মরে।

অপর পক্ষে

রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
একটা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজন মতো এটাও চলে ওটাও চলে।

নিখ্‌তির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্চে,—

—পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেঁষি—

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁৎ একমাত্রা, সবশুদ্ধ চোদ্দটা। রাস্তা কুস্তি প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায় তবুও বহুসহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ঐটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বল্‌লেই চলে। বাংলা সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে বসে গেচে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেষণকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলে নিরামিষ না আমিষ, সে বল্‌লে, দ্বৌকর্ত্তব্যৌ। তেমনি শব্দ বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত বাংলাকে প্রশ্ন করা যায়, কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ? সে বল্‌বে দ্বৌকর্ত্তব্যৌ। তার জাতবিচার নেই বল্‌লেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসী সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে।

আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধ্‌বে না—

রূপ-যৌবন উপঢৌকন
　　দেবেন কন্যা তাহারে
তাই পরেচেন চীনাংশুকের
　　পট্টবসন বাহারে।

নন্‌-কো-অপরেশনের দিনেও ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হোলো বুঝি, এইবার মোলো,
অক্‌সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত বাংলায় বাচবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছু কিছু সয়ে গেচে, কিন্তু সেটুকু বড়ো জোর বাইরের রোয়াকে—ভিতরমহলে রীতরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুম্‌কাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গ-সজ্জা সমাধানে ভূরি মেহন্নৎ।

এটাকে প্রহসন ব'লে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় এই রকম ভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায় তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্য প্রবন্ধ পড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন।

কিন্তু এটাও দেখে থাক্‌বেন এটার মধ্যে করিব করিয়াছে করিয়াছিল প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি— তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময় লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি দ্বৈকর্ত্তব্যৌ। কারণ ছন্দের এই দ্বিবিধরসেই আমার রসনার লোভ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

১

জড়বাদ *Vs.* জীববাদ

কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে, দার্শনিক মতকে মোটামুটি দুইটি বিরোধী কোঠায় স্থাপন করা যাইতে পারে—এক জড়বাদ (Materialism), অন্য জীববাদ (Spiritualism)। জড়বাদীর মতে—এই বিবিধ-বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব, জড়-শক্তিতাড়িত অন্ধ পরমাণুপুঞ্জের যদৃচ্ছাজাত সংঘাত মাত্র—যাহাকে 'fortuitous concourse of atoms' বলে। জীববাদী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—না, ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্—জগদ্-রচনার পশ্চাতে ঈক্ষা (অভিসন্ধি, Purpose) লক্ষ্য করা যাইতেছে—অতএব 'অশব্দ' (জড় = Matter) ইহার মূল কারণ হইতে পারে না।

আত্মা বা ইদমেক অগ্র আসীৎ× ×স ঈক্ষত—ঐতরেয়, ১।১

'আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন—তাঁহার 'ঈক্ষা' হইতেই বিশ্বের বিবর্ত্তন।' অর্থাৎ

'Universal Mind has to appear before there can be manifestation.'

জড়বাদী বলেন—'Life and Mind are merely bye-products of the world-process'—প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্ব ব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র। জীববাদী বলেন—সে কি কথা? Mind is behind matter—জড় হইতে জীব নহে—জীব হইতেই জড়।

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

'তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের প্রভেদ করিলেন'। আর প্রাণ?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং, প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ, ৬।২

'এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহা প্রাণের প্রেরণায় নিঃসৃত হইয়াছে' এবং প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রশ্ন, ২।৬

অতএব 'the origin of forms is Life,' which as Elan Vital has 'carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies.'

অধিকন্তু এই প্রাণ = প্রজ্ঞাত্মা—উহা অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ।

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ—কৌষীতকী, ১।৮

জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না—দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। তিনি বলেন চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ', জড় অণু-পরমাণুর Chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র,—সেইজন্য দেহের নাশের সহিত চৈতন্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। Survival of man বাজে কথা—

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?

আর চিন্তা ? চিন্তা ত মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is a function of the Brain। যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—As the liver secretes bile, so the brain secretes thougtht। অতএব কামনা, ভাবনা, চেষ্টনা, (Emotion, Intellection, Conation—Feeling, Thinking, Willing) এ সমস্তই মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ (vibrations of the brain-cells)।

জীববাদী জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ, 'Consciousness is the absolute world-enigma' (James)—সম্বিৎ (চৈতন্য) বিশ্বের প্রধানতম প্রহেলিকা! সেই অদ্ভুত, আজব ব্যাপারকে তুমি এক নিঃশ্বাসে সমাধান করিয়া ফেলিলে! জান না কি ? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer).

আত্মার কি জন্ম মৃত্যু আছে ?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

আত্মা যে, অজর অমর অক্ষর বস্তু—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—কঠ, ২।১৮

দেহের নাশে জীবের বিনাশ হইবে কিরূপে ?

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে—ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩

জীবের অপগমে শরীরেরই নাশ হয়—জীবের কখনও বিনাশ হয় না —'For him the hour shall never strike'। এই যে শরীর—অশরীরী আত্মার ইহা অধিষ্ঠান মাত্র—

—তদ্ অস্য অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্— ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

শরীর সম্বিতের জনক নহে, জনিত। 'It takes a soul to make a body' (Browning)—শরীরত্বায় দেহিনঃ (কঠ, ৫।৭)। আর তোমার ভরসার সর্ব্বস্ব ঐ মস্তিষ্ক—সে ত মনের করণমাত্র—The brain is an organ of the mind—অতএব ভঙ্গুর ভেলায় ভর করিও না। আরও দেখ, এই যে সম্বিৎ (যাহাকে তুমি মস্তিষ্কের বিকার বলিতে চাও), সে সম্বিৎ স্বয়ংপ্রভা—তাহার উদয়াস্ত নাই—সে চিরন্তন, সনাতন।

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সম্বিদ্ এষা স্বয়ংপ্রভা ॥—পঞ্চদশী

জীব-সম্বিৎ সেই বিশ্ব-সম্বিতেরই ভগ্নাংশ, সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু, (a fragment of the Divine Consciousness)—

' Each of us is only a partial incarnation of a larger self.'
—(Frederick Myer)

' We are each of us larger than we know ' (Sir Oliver lodge).

বস্তুতঃ আমরা অমৃতের পুত্র—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ) —আত্মবিস্মৃত হইয়া শোক-মোহের অধীন হইয়া আছি—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪।৭)—'We are really gods in exile'—এখানে অজ্ঞাতবাসে রহিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে 'Our birth is but a sleep and a forgetting' (Wordsworth)—ঐ বিস্মৃতির অতল মথিয়া কখনও কখনও পূর্ব্বকাহিনী জাগ্রত হয়। তখন কবিরের সহিত সুর মিলাইয়া প্রশ্ন উঠে—

শুন হংসা পুরাতন বাত।
কোন মুলুকসে আয়সি হংসা
উৎরঙ্গে কোন ঘাট ?

কারণ, সত্য সত্যই

Trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.—Wordsworth.

তখন মেষের দলে প্রবিষ্ট সিংহ-শিশু 'স্মৃতিলম্ভে' গর্জ্জন করিয়া বলে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং তেন কিং কুর্য্যাম্—বৃহ, ২।৪।৩

এবং

জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্য মীশম্
অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ—মুণ্ডক, ৩।১।২

—স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বীতশোক হয়। ইহাই জীবের প্রকৃত নিয়তি—দেহের সহিত সারূপ্য করিয়া সংসার-পঙ্কে শূকরবৃত্তি জীবের নিয়তি নহে।

জড়বাদী বলেন, যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রকৃতির বিবর্ত্তনে প্রাণিশরীরে ইন্দ্রিয়ের উদ্গম হইলে, তবে দর্শন-স্পর্শনরূপ মনোবৃত্তির উদয় হইতে পারে। অর্থাৎ এ মতে, আগে ইন্দ্রিয়—পরে ব্যাপার (Organ precedes Function)। জীববাদী এ কথা অস্বীকার করেন; তিনি ফরাশি জৈববিজ্ঞানবিৎ লামার্কের মতের পোষকতা করিয়া বলেন—Function precedes Organ—অর্থাৎ আগে ব্যাপার—পরে, ব্যাপারের সৌকর্য্যের জন্য ইন্দ্রিয়।

দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদ ইদম্ জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদ ইদম্ অভিব্যাহরাণি ইতি স আত্মা, অভিব্যাহরণায় বাক্। অথ যো বেদ ইদম্ শৃণবানি ইতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৪

অর্থাৎ

আত্মার দর্শনের ইচ্ছা হইলে চক্ষুঃ, ঘ্রাণের ইচ্ছা হইলে নাসিকা, বচনের ইচ্ছা হইলে বাক্, শ্রবণের ইচ্ছা হইলে শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়।

ঐ ঐ ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাধকমাত্র, জনক নহে। কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির অদ্বিতীয় উৎস সেই আত্মা—

অকৃৎস্নোহি সঃ। প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ মনঃ। তানি এতানি কর্ম্মনামানি এব—বৃহ, ১।৪।৭

'সেই আত্মা অকৃৎস্ন (যেন divided)। প্রাণনকালে তিনি প্রাণ, বচনকালে বাক্, দর্শনকালে চক্ষুঃ, শ্রবণকালে শ্রোত্র, মননকালে মনঃ। এ সমস্ত তাঁহার কর্ম্মনাম মাত্র (names for his functionings)।

সেই জন্য জীববাদীর মতে প্রাণিদেহস্থ করণগুলি (organs) ইন্দ্রিয়-দ্বার মাত্র—ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র আত্মায়। অতএব,

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ, ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ, ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ, ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যাৎ, ন রসং বিজিজ্ঞাসীত রসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ, ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্ত্তারং বিদ্যাৎ × × ন মনো বিজিজ্ঞাসীত, মন্তারং বিদ্যাৎ—কৌষীতকী, ১।৮

'বাক্যকে নয় বক্তাকে, ঘ্রাণকে নয় ঘ্রাতাকে, রূপকে নয় দ্রষ্টাকে, শব্দকে নয় শ্রোতাকে, রসকে নয় রসয়িতাকে, কর্ম্মকে নয় কর্ত্তাকে, মনকে নয় মন্তাকে জানিতে হয়।'

অতএব দেখা গেল,

জড়বাদ জীববাদে বহুত অন্তর
এক অন্ধ তমঃ অন্য নির্ম্মল ভাস্কর।

এই মতদ্বৈধ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত কোন্ পক্ষের অনুকূল?

অদ্বৈতবাদে জীবজড়ের স্থান

কিন্তু এ কথা আলোচনার পূর্ব্বে, পাঠককে একটা বিষয়ে সতর্ক করিতে চাই। আমরা জানি, যাজ্ঞবল্ক্য অকুণ্ঠ অদ্বৈতবাদী—তিনি uncompromising Idealist। তাঁহার নিপট নির্ভীক অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনিই পরমার্থ, অ-প্রতিদ্বন্দ্বী সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্। যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে, জীব ও জড় মায়ার বিজৃম্ভণ—অলীক, অবস্তু, প্রতিভাস, ভাণমাত্র—'The individual soul is an apparition as the external world is an appearance'। কারণ, তাঁহার মতে, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।† কিন্তু দ্বৈতের সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া, অবিদ্যাগ্রস্ত মানবচিত্ত কতক্ষণ এই অদ্বৈতের তুঙ্গ ভূমিতে সুস্থিত থাকিতে পারে? সেখানে উঠিলে, অচিরে তাহার গা 'ছমছম' করে, তাহার চিন্তার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। মানুষের এই স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতের উচ্চ ব্যোম হইতে দ্বৈতের উপত্যকায় অবতরণ করিয়া, তবে—as a concession or accommodation to the empircal consciousness—জড় ও জীব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।* এই উপদেশ আলোচনার সময়, আমরা যেন কদাচ বিস্মৃত না হই যে, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, জড় তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র এবং জীব উপাধি-উপহিত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণে না রাখিলে, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীববাদের গহন মধ্যে আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তাই শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ আমাদিগকে এত সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

---

† The Atman is the sole reality; there can be nothing beside it. * * From this point of view, no creation of the universe by the Atman can be taught, for there is no universe outside of the Atman. * * The Individual Atmans are not properly distinct from the Supreme Atman. Each of them is in full and complete measure the Supreme Atman himself. * * Accordingly the entire individual soul as such has no reality.—Deussen. pp 183 & 256.

* The loftiness of this metaphysical conception forbade its maintenance in the presence of the empirical consciousness, which teaches the existence of a real universe. It was necessary to concede the reality of the universe and to reconcile this with the idealistic dogma of the sole reality of the Atman, by asserting that the universe exists but is in truth nothing but the Atman. * * * The same spirit of accommodation lies at the basis of the form assumed by the doctrine of the Brahman as the psychical principle viz., that, Brahman having created the universe enters into it as the Individual Soul. * * It then however more and more stiffens into an actual realism.—Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp 184 & 171.

উপদেশাদ্ অয়ং বাদঃ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। × ×
উপায়ঃ সোবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।
—মাণ্ডূক্য-কারিকা ১।১৮,৩।১৫

'শাস্ত্রে যে সৃষ্টি প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মন্দবুদ্ধি শিষ্যের উপদেশের জন্য —কেবল বুদ্ধিপ্রবেশের উপায় রূপে। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা দ্বৈত, নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।'

মৃদাদি দৃষ্টান্তৈ র্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বং বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি—৪।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ 'শাস্ত্র যে ক্ষিত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা জগতের বাস্তবিক সৃষ্ট্যাদি উপদিষ্ট হয় নাই।'

জগৎ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের কি বক্তব্য, 'পরিচয়ে'র কার্তিক সংখ্যায় তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মবাদের বিবরণে, আমরা মোটামুটি তাহা জানিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার মতে 'the obtrusive reality of the manifold universe is merely Maya। এখন তাঁহার জীববাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কিংজ্যোতিঃ পুরুষঃ ?

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিঃ অয়ং পুরুষঃ—এই যে পুরুষ বা জীব, কি ইহাঁর জ্যোতিঃ? কাহার জ্যোতিতে ইনি জ্যোতিষ্মান্, কাহার দ্যুতিতে দ্যুতিমান্?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'আদিত্যই ইহার জ্যোতিঃ—আদিত্যেনৈব অয়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি—আদিত্যরূপ জ্যোতিঃদ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, প্রতিগমন করে।' জনক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু অস্তমিতে আদিত্যে? আদিত্য অস্তমিত হইলে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তখন চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতি, চন্দ্রমা ইহার জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন, 'অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য! চন্দ্রমসি অস্তমিতে, কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই অস্তমিত হইলে অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন—'তা বটে, কিন্তু অগ্নি স্তিমিত হইলে শান্তে অগ্নৌ কিংজ্যোতিঃ এবায়ং পুরুষঃ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তখন বাক্যই ইহার জ্যোতিঃ হয়—বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি।' জনক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু শান্তে অগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ? অগ্নি স্তিমিত হইলে, বাক্য স্থগিত হইলে, তখন পুরুষের কি জ্যোতিঃ হয়?' এইবার যাজ্ঞবল্ক্য চরম উত্তর দিলেন—'আত্মৈব অস্য জ্যোতির্ভবতি—তখন আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়—আত্মনা এবায়ং

জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি—আত্মারূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, প্রতিগমন করে।' অর্থাৎ জীবের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ব্যাপারের পশ্চাতে এই আত্মা।

কতমঃ আত্মা ?

তখনি প্রশ্ন উঠিল 'কতমঃ আত্মা ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

'যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি প্রাণ-সমূহের পশ্চাতে (behind the organs of sense), হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ।'

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীববাদের ইহাই মর্ম্ম কথা—এ কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে তাঁহার অভিমত জীবতত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না। এই কথা বুঝাইবার জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য জীবের উৎক্রান্তি ও পরলোকগতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের পরিচয় দিয়া অবসানে বলিয়াছেন,—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—বৃহ, ৪।৪।২২

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদে আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদ্ এষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় স এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

শুধু তাই কেন? উপনিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝিতে পারা যায়, সমগ্র উপনিষৎ এই কথার ঝঙ্কারে মুখরিত। এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি ?

একোঽহং বহুঃ স্যাম্

উপনিষদের মুখ্য বাণী—একমেবাদ্বিতীয়ের বহুরূপে আত্মপ্রকাশ।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩

পুরুষো হবৈ নারায়ণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি।—নারায়ণ, ১

ইহা তাঁহার 'লীলাকৈবল্য'—ইচ্ছাময়ের 'খামখেয়াল'।

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ—মৈত্রী, ৭।১১

কিন্তু বহু হইলেও সেই অদ্বিতীয়ের একত্ব কখনও ব্যাহত হয় না—তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, বহুর মধ্যে একরূপে সর্ব্বদা

সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। উপনিষদ্ নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে এই কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা × × সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

'যেমন অগ্নি হইতে বহুতর ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ (sparks) নির্গত হয়, তেমনি সেই পরমাত্মা হইতে এই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে'। অতএব ব্রহ্মের পরিচয় এই—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (তৈত্তি, ৩।১) —'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতের উদ্ভব হইয়াছে।' মুণ্ডকের উপদেশ ইহারই অনুরূপ।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—২।১।১
[ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্কর]

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সরূপ (সমান-রূপ) বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি কল্পারম্ভে সেই অ-ক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব আবির্ভূত হয় এবং (কল্পান্তে) তাঁহাতে তিরোহিত হয়।'*

সেই জন্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ৬) —সমস্ত জীবের প্রভব ও প্রলয়ের স্থান—কবি বিদ্যাপতির ভাষায়,

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা।

জলে যেমন বুদ্বুদ, সমুদ্রে তেমন তরঙ্গ, ব্রহ্মে তেমনি জীবের ব্যক্তি ও অব্যক্তি—আবির্ভাব ও তিরোভাব।

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চাব্যক্ততাং যযুঃ।
পশ্যন্তি ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব ॥—চুলিকা, ১৮

যাজ্ঞবল্ক্য এই তত্ত্বই একটু ভিন্ন রকমের উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন— সর্ব্বানি চ ভূতানি অস্যৈব (মহতো ভূতস্য) এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি —বৃহ ৪।৫।১১

'এই সমস্ত ভূত, সেই মহৎ ভূত (পরমাত্মারই) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস'— কারণ, তিনিই আনীৎ অবাতম্ (ঋগ্বেদ)—The 'Great Breath' breathed,—but without breath—ফলতঃ জীবের আবির্ভাব তাঁহার

---

* The spark hangs from the flame by the finest thread of Fohat.
—Book of Dzyan.

The Sun Divine throws off *spark*-suns charged with all His attributes * * * sparks of Divinity to be fanned into flames through this great process of Evolution.—Dr. G. S. Arundale's 'Nirvana'.

প্রশ্বাস (outbreathing) এবং জীবের তিরোভাব তাঁহার নিঃশ্বাস (inbreathing)। অতএব জীব হইতেছে a 'Divine fragment' —'a portion of the Universal consciousness thought into separation as an individual entity'।

জীব—ব্রহ্মের অংশ

সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, জলের সহিত বুদ্‌বুদের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশ—সেই চিৎসিন্ধুর বিন্দু। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণেরও ঐ উপদেশ—

অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ—২।৩।৪৩

অংশ ও অংশীর তত্ত্বতঃ (essentially) কোন প্রভেদ নাই, থাকিতে পারে না, কারণ, উভয়েই 'সরূপ'—সমানরূপ—'God made man in His own image' (Genesis, I,27)—শঙ্করের ভাষায়, অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব।

ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তি, ২।১।১) —তখন তদংশ জীবও সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ * —পঞ্চদশী, ৩।২৮

সেইজন্য কি ঋগ্বেদ, কি যজুর্বেদ, কি সামবেদ, কি অথর্ব্ববেদ— সকল বেদের মহাবাক্য সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ ঘোষণা করিয়াছে—

সোহম্, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি।

বিজ্ঞানাত্মা বা Monad

বিশেষভাবে ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন (বৃহ ৪।৫।১৩)—কবিরের কথায়, 'সদ্‌গুর নুর তামাম'। তিনি চিন্ময়—সেইজন্য তাঁহার একটি সংজ্ঞা

---

* This Divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the triple nature of the Logos himself and the evolution of man as man consists in the gradual manifestation of these three aspects, their development from latency into activity.—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom pp. 213-4.

Man is made in the image of God * * The Divine spark of the spirit in man is seen to be triple in its appearance.

—C. W. Leadbeater's Man, Visible and Invisible.

'চিদাকাশ'। তদংশ জীব চিৎকণ (জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব)—অতএব তাঁহার সার্থক নাম 'চিন্মাত্র'। ইনিই পাশ্চাত্য দার্শনিকের 'Mönad'।

যে হেতু 'বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম', সেই জন্য তদংশ 'চিন্মাত্র' জীবের পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—অর্থাৎ The Monad is the knowing subject apart from object.

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মোন্যাডকে মুণ্ডক 'বিজ্ঞানময় আত্মা' এবং প্রশ্ন 'বিজ্ঞানাত্মা' বলিয়াছেন—

কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২
বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ—প্রশ্ন, ৪।১১

উপনিষদে 'আত্মা'-শব্দ ব্রহ্ম ও জীব, উভয়েরই প্রতিশব্দরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম = পরমাত্মা (Oversoul), তদংশ জীব (Monad বা Individual Soul) = প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা।

কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্—কঠ, ৪।১
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—কঠ, ৬।১৬

জীবব্রহ্মের অভেদ

এই অন্তরাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—সেই জন্য কঠ-উপনিষদ্ অন্তরাত্মার উল্লেখ করিয়া একই নিঃশ্বাসে বলিলেন—তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্—'তিনিই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা।' যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা প্রত্যগাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার সহিত তাঁহার অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন*—

এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—বৃহ, ৩।৭।৩-২৩
যঃ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বান্তরঃ × × এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ
—বৃহ, ৩।৪।১,৩।৫।১

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম—বৃহ, ৪।৪।৫

ছান্দোগ্যেরও ঐ এক কথা—

তৎ সত্যং স আত্মা তৎত্বমসি—ছা, ৬।৭।৭
এষ তে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতৎ ব্রহ্ম—ছা, ৩।১৪।৪

---

* অন্যত্র বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ (৩।৩।২)। এই ব্যষ্টি বায়ু=জীব ও সমষ্টি বায়ু=ব্রহ্ম এবং উভয়ে অভিন্ন। সমষ্টি বায়ু সেই সূত্র, যদ্দ্বারা সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত বিধৃত—বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং যেন অয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণিচ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি—৩।৭।২। এই সমষ্টি-বায়ুই সেই সূত্রাত্মা (ব্রহ্ম)—ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব (গীতা)। আর ব্যষ্টি বায়ু জীব, 'বায়ুঃ অনিলম্ অমৃতম্' (ঈশ-উপনিষদ্)—দেহান্তে অমৃত বায়ুতে (ব্রহ্মে) মিলিত হয়।

মোন্যাডের স-দেহত্ব

ঐ ব্রহ্মবিন্দু, চিৎকণ, স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব বা ব্যাবহারিক ভেদ (phenomenal separation) সিদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শরীর গ্রহণ করেন।

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এইরূপে অংশ-জীব অংশী ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন এবং তাঁহার স-দেহত্ব হয়। সেইজন্য উপনিষদের স্থানে স্থানে তাঁহার নাম 'দেহী।'

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২ (দেহী-বিজ্ঞানাত্মা—শঙ্কর)

ইহার অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্তা অ্যানিবেসাণ্ট তাঁহার 'A study in Consciousness' গ্রন্থে মোন্যাড বা প্রত্যগাত্মার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন —'A fragment of the Divine Life, separated off into an individual entity by rarest film of matter, এবং প্রত্যগাত্মার দেহের—ঐ 'rarest film of matter'এর নাম দিয়াছেন 'Auric body'। মৈত্রায়ণী-উপনিষদ্ ইহাকে 'হৃদ্যাকাশময় কোশ' বলিয়াছেন—

হৃদ্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্—এই কোশই জীবের পরম আলয়—চরম দেহ ; এবং জীবরূপী ব্রহ্মের আবাস বলিয়া ঐ সুসূক্ষ্ম কোশের নাম ব্রহ্মকোশ।

ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা × × এবং ব্রহ্মশালাং বিশেৎ ততশ্চ চতুর্জ্জালং ব্রহ্মকোশং প্রণুদেৎ। ততঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ × × স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—মৈত্র, ৬।২৮

'ওঁকাররূপ নৌকায় অন্তর্হৃদয়াকাশের পারে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মশালায় প্রবেশ করিবে। পরে শুদ্ধ পূত শূন্য হইয়া ব্রহ্মকোশ ভেদ করিয়া স্ব মহিমায় অবস্থিত হইবে।'

এই ব্রহ্মকোশ-উপস্থিত ব্রহ্মচৈতন্যই জীব—

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্—পঞ্চদশী।

এই চরমালয় ব্রহ্মকোশ ('rarest film of matter') কি উপাদানে গঠিত ? প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমের পরমাণু দ্বারা।* ইহাকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

* এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—This body (ব্রহ্ম কোশ) is said to be composed of nonprakritic matter (অর্থাৎ পরব্যোম) which does not belong to our system at all—matter which has not been modified by the life of our Logos, but belongs to and forms part of the general store of Cosmic matter, a portion of which has been appropriated by our Logos for the purposes of our system. It is this auric body which separates the *jiva* into an individual.

নীলতোয়দমধ্যস্থ-বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবার-শূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা ॥

'এই কোশ অতি সূক্ষ্ম, নবজাত ধান্যাগ্রের মত তনু এবং নীলঘনস্থ বিদ্যুৎ তুল্য ভাস্বর।'

ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্হৃদয়াকাশ—য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে।

ইহাকেই উপনিষদ্ কোথাও কোথাও 'গুহা', 'গহ্বর', 'হৃৎ', 'হৃদয়', 'হৃৎপদ্ম' বলিয়াছেন—

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ২।১২
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ২।২০
হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্—ছা, ৮।৩।৩। হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭
মনোময়োয়ং পুরুষঃ ভাঃসত্যঃ তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা—বৃহ, ৫।৬।১

ঐ পরব্যোমের পরমাণু-নির্ম্মিত হৃদ্যাকাশময় দেহের অণুত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে ব্রীহি ও যবের উপমা প্রযুক্ত হইল। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা—৩।১৪।৩

'অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সরিষার অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক-তণ্ডুলের অপেক্ষা অণু।'* সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা, দ্যুলোকের অপেক্ষা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা বৃহৎ।

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবঃ জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ—ছা, ৩।১৪।৩

কারণ, এই প্রত্যগাত্মাই ত পরমাত্মা। সেই জন্য তিনি সকলেরই উপাস্য—

মধ্যে বামনমাসীনং সর্ব্বে দেবা উপাসতে—কঠ, ৫।৩

দেহরূপ রথে (শরীরং রথমেবচ—কঠ, ৩।৩) এই 'বামন'কে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না—

রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

---

* সেই জন্যই ইহাঁকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' 'বালাগ্রমাত্র' 'আরাগ্রমাত্র' বলা হয়—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি—কঠ ৪।১২

আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোপি দৃষ্টঃ—শ্বেত ৫।৮। আরাগ্য=সূচ্যগ্র (Needle's point)
বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে—অথর্ব্বশিরঃ।
এ সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

চিন্মাত্র=চিদাকাশ

ছান্দোগ্য-উপনিষদের দহর-বিদ্যায় এই তত্ত্ব সুবিশদ করা হইয়াছে।

যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ। তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্—৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে একটি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশের যাহা অন্তঃস্থিত, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে।'

কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে যৎ অন্বেষ্টব্যম্?

'সেখানে কি বস্তু আছে যাহা অন্বেষ্টব্য?'

এই প্রশ্নের উত্তরে ছান্দোগ্য বলিলেন—

এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা—সেখানে সেই অপাপবিদ্ধ অন্তরাত্মার স্থান—যিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ, তাবান্ এষ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ—সেই 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যেমন বৃহৎ, এই 'অণুরেষ আত্মা' ক্ষুদ্র দহরাকাশও তেমনি বৃহৎ। কারণ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্য্যাচন্দ্রমসা বুভৌ বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি, যৎ চাস্য ইহ অস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্—ছান্দোগ্য ৮।১।৩

'উভয় দ্যৌ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রনিচয়—বিশ্বে যে কিছু আছে, যে কিছু নাই—সমস্তই উহার অন্তঃস্থিত।'

নারায়ণ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকং
তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদুপাসিতব্যম্॥

"দেহরূপ পুরমধ্যে এক অতিক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকের অন্তরাকাশে যে পরম দেবতা শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিবে।' উপাসনা করিবে—কেননা, ঐ অন্তরাত্মাই পরমাত্মা।

বৃহদারণ্যক এই কথাই আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—সেই অন্তরাত্মা বা অন্তর্হৃদয়ে স্থিত পুরুষ—

স এষ সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ—৫।৬।১

'তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, যাহা কিছু আছে সকলেরই শাসক।'

মাণ্ডূক্য-উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি—

এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষঃ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—৬। এখানে এষ=বিজ্ঞানাত্মা (Monad)।

এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা Monad-এর পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অবশেষে বলিলেন—

—যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ × × য এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ— ন স সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণে এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়—বৃহ, ৪।৪।২২।

'সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ (Monad)—যিনি হার্দ্দাকাশে শয়িত, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি—সাধুকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি ভূতপতি, তিনি ভূতপাল, তিনি সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু।'

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য এই বিজ্ঞানাত্মা (চিন্ময়) পুরুষের বর্ণনা করিতে গিয়া দুইটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ (তদ্ এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি) বলিলেন—ইনিই 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ।' ঋগ্বেদের সেই 'হংসঃ শুচিষৎ'—এষ হি খলু আত্মা হংসঃ (মৈত্র, ৬।৮)—যিনি—হংসো লেলায়তি বহিঃ—যিনি চরাচর সমস্ত লোকের প্রভু—বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ—(শ্বেত, ৩।১৮)

অর্থাৎ এই যেMonad রূপী Individual Soul, it 'is in no respect different from Brahman but is very Brahman complete and entire'. পুনশ্চ Brahman is not in part only but undivided, completely and as a whole present in that which I with true insight find within me as my own self, my ego, my soul '—(Deussen).

কেন শরীর-গ্রহণ ?

এই 'হিরণ্ময় একহংস' অশরীরী প্রত্যগাত্মা কেন শরীর গ্রহণ করেন? ইহা দর্শন শাস্ত্রের অতি-প্রশ্ন, চরম সমস্যা। বিদেহী পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মা-রূপে কেন সদেহ হন ? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥—৩।১৮

দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা: কার্য্যকরণোপাধিঃ সন্ হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়—শঙ্কর

'চরাচরলোকের প্রভু পরমাত্মা, দেহী (বিজ্ঞানাত্মা) হইয়া বিষয়গ্রহণের জন্য চালিত হন।'

মৈত্র-উপনিষদের ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি—

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ।

পতঞ্জলি বলেন, দেহযোগের উদ্দেশ্য—স্বরূপোপলব্ধি—Self-realisation *—স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ (যোগসূত্র, ২।২৩)।

* পুরুষস্য দর্শনার্থম্—সাংখ্যকারিকা। ' You must awaken to a knowledge of your real being —Prof James.

এই প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য মনীষীর একটি সুচিন্তিত বাণী আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

The value of 'incarnation' is to isolate it and sereen it from its pristine cosmic surroundings and enable it to develop individuality. ইহাকেই বলে 'Out of the everywhere into here.'

এই যে কেন্দ্রীকরণ, এই যে ব্যক্তিত্ব-সাধন, এই যে স্বাতন্ত্র্যের পোষণ—ইহা শরীর গ্রহণ ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, শরীর গ্রহণের দ্বারাই জীব জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সংস্পর্শের ফলে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বর্হিমুখ হইয়া ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত হয়। বাইবেলের ভাষায় He is sown in weakness in order to be raised in power। উপনিষদে জীবের উপভোগ্য জগৎকে আবসথ বা লোক বলা হইয়াছে। এই লোক সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষা কি ?

জীবের আবসথ (Environments)

মনীষী ফ্রেড্‌রিক্ মায়্যার তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ 'Human Personality'-তে অনেক আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'Man lives in three environments—the physical, the ethereal and the met-etherial, that which is called the heaven world.'

অর্থাৎ জীবের ভোগ্য ভূমিকা তিনটি—স্থূল, সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন শিক্ষার অনুকূল। উপনিষদেও আমরা 'ত্রয়ঃ আবসথাঃ'র উল্লেখ পাই (ঐত, ১।৩)।* যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বলের প্রশ্নের উত্তরে এই তিন আবসথ বা environments-এর নাম দিয়াছেন—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক (বৃহ, ৩।১।৮)। অন্যত্র ইহাদিগকে পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষ-লোক ও দ্যুলোক বলা হইয়াছে (বৃহ, ১।৫।১৬, ৫।১৪।১ ; ছান্দোগ্য, ৪।১৭।১)। অর্থাৎ জড়বাদীর অভিমত ইহলোকই জীবের সর্ব্বস্ব নহে—আরও উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর লোক আছে। বস্তুতঃ যাজ্ঞবল্ক্য ইহলোককে 'মৃত্যোঃ রূপাণি' বলিয়াছেন। †

---

* ঐতরেয় এই তিন 'আবসথ'কে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিয়াছেন—তস্য (আত্মনঃ) ত্রয় আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ—ননু জাগরিতং প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবং, স্বপ্ন এব। কথং ? পরমার্থ-স্বাত্মপ্রবোধাভাবাৎ, স্বপ্নবৎ অসদ্-বস্তু দর্শনাৎ চ।

অর্থাৎ 'Waking, like dreaming is a delusion, since it reflects for us a manifold universe. ইহার সহিত কবি শেলির উক্তি তুলনীয়—'Can Death be sleep when life itself is dream ?'

† ইমং লোকম অতিক্রামতি মৃত্যোঃ রূপাণি—বৃহ, ৪।৩।৭।—ইহার সহিত খৃষ্টীয় সাধুর নিম্নোক্তি তুলনীয়—Oh wretched man that I am—who shall deliver me from this body of death.

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক মিলিয়া 'ত্রিলোকী'—ইহাদিগের পারিভাষিক নাম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। ইহাই গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতি—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি। স্বঃ বা স্বর্গলোক (মায়্যার যাহাকে Met-etherial বা Heaven world বলিয়াছেন)—তাহার উপর মহর্লোক। ইহাকে প্রজাপতিলোক বলে। প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতির উপর মহঃ চতুর্থী ব্যাহৃতি।

ভূর্ভুবঃ স্বরিতি বা এতাঃ তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসাম্ উ হ স্মৈতাং চতুর্থীম্ × × মহঃ ইতি—১।৪

মহঃ বা প্রজাপতিলোকের উপর ব্রহ্মলোক—উহাই ঊর্দ্ধতন লোক। সাধকের দেবযান-গতি বর্ণনা করিয়া কৌষীতকী বলিয়াছেন,

স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্—১।২।৩

যাজ্ঞবল্ক্যও জনকের নিকট ব্রহ্মানন্দের বিবরণ করিতে গিয়া পর পর মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও দেবলোকের উপরে প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

অথ যে শতম্ আজানদেবানাম্ আনন্দাঃ স একঃ প্রজাপতি-লোকে আনন্দঃ × × অথ যে শতং প্রজাপতি-লোকে আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোকে আনন্দঃ × × এষ এব পরম আনন্দঃ এষ ব্রহ্মলোকঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পরবর্ত্তী কালে এই ব্রহ্মলোকের তিনটি স্তর বা ভূমিকা উল্লিখিত হইত—ব্রাহ্মঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ। ইহাদিগের নাম—জনঃ, তপঃ, ও সত্যম্। অতএব ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্—মিলিয়া সপ্তলোক।

আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১।২।৩
সপ্ত ইমে লোকাঃ যেষু চরন্তি প্রাণাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৮

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।২৭-৮) ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি ঐ সপ্তলোকের স্পষ্ট নাম নির্দ্দেশ আছে। ভূর্লোকই যাজ্ঞবল্ক্যের মনুষ্যলোক; তাঁহার পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোক মিলিয়া ভুবর্লোক; তাঁহার দেবলোকই স্বর্লোক; তাঁহার প্রজাপতিলোকই মহর্লোক; এবং জনঃ তপঃ ও সত্যলোক তাঁহার ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক।

উপনিষদে আমরা পঞ্চভূতের উল্লেখ পাই—

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১।১

পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত এই যে পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—উক্ত পঞ্চ লোক ঐ ঐ তত্ত্বের উপাদানে গঠিত। ভূর্লোকের

উপাদান ক্ষিতিতত্ত্ব, ভুবর্লোকের উপাদান অপ্‌তত্ত্ব, স্বর্লোকের উপাদান তেজঃতত্ত্ব, মহর্লোকের উপাদান বায়ুতত্ত্ব এবং ব্রহ্মলোকের উপাদান ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব। এই পাঁচটী লোক যখন জীবের লীলাক্ষেত্র, তখন জীবের প্রত্যেক লোকে বিহরণের উপযোগী শরীর থাকা আবশ্যক। কারণ, যে ভূমিতে যে যখন বিচরণ করিবে, তাহার উপযোগী যানবাহন নহিলে চলিবে কিরূপে ? স্থলে চলিতে রথ হইলেই চলে কিন্তু জলে নৌকা চাই ; আর আকাশে ভ্রমণ জন্য বেলুন বা ব্যোমযানের প্রয়োজন। এই জন্য দেহীকে (Monad) বহুবিধ শরীর রচনা করিতে হয়।*

জীবের বিবিধ শরীর

এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—৫।১২

'দেহী (প্রত্যগাত্মা) স্থূল সূক্ষ্ম বহু শরীর স্বগুণ দ্বারা রচনা করে।' ঐ সকল শরীরই আমাদের পরিচিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ।

উদ্ধৃত শ্লোকের 'বিবরণে' স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ লিখিয়াছেন,

স্থূলানি পার্থিবানি শরীরাণি ভূর্লোকবর্ত্তীনি, ততঃ সূক্ষ্মাণি অপ্‌ময়ানি ভুবর্লোক-বর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি তৈজসানি স্বর্লোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি বায়বীয়ানি মহর্লোক-জনোলোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি শরীরাণি বিয়ন্ময়ানি তপঃসত্যলোকবর্ত্তীনি × × তৎতৎলোকবর্ত্তি-তৎতৎ শরীরারম্ভে তৎতদ্ভূতপ্রাধান্যমেব উক্তম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্। × × বহূনি অনেকানি অনেকরূপাণি শরীরাণি দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈঃ × × বৃণোতি সংভজতে।

অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা (Monad) কয়েকটি শরীর আশ্রয় করে—ক্ষিতিতত্ত্বে রচিত ভূর্লোকের উপযোগী পার্থিব শরীর (অন্নময় কোশ), অপ্‌তত্ত্বে রচিত ভুবর্লোকের উপযোগী অপ্‌-ময় শরীর (প্রাণময় কোশ), তেজস্তত্ত্বে রচিত স্বর্লোকের উপযোগী তৈজস শরীর (মনোময় কোশ), বায়ুতত্ত্বে রচিত মহর্লোকের উপযোগী বায়বীয় শরীর (বিজ্ঞানময় কোশ) এবং আকাশতত্ত্বে রচিত ব্রহ্মলোকের উপযোগী আকাশীয় শরীর (আনন্দময় কোশ)।

ঐ ঐ শরীর সেই সেই উপাদানে প্রধানতঃ গঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ ক্ষিতিতত্ত্বে, প্রাণময় কোশ অপ্‌তত্ত্বে, মনোময় কোশ তেজস্তত্ত্বে, বিজ্ঞানময় কোশ বায়ুতত্ত্বে এবং আনন্দময় কোশ আকাশতত্ত্বে। সুতরাং জীব অন্নময় কোশের বাহনে ভূর্লোকের সহিত, প্রাণময় কোশের বাহনে ভুবর্লোকের সহিত, মনোময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের সহিত, বিজ্ঞানময়

---

* The Soul of man has not one body but many bodies.
—C. W. Leadbeater.

কোশের বাহনে মহর্লোকের সহিত এবং আনন্দময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ বিহরণ ও বিচরণের যান ঐ ঐ শরীর।

ত্রি-পুরুষ—ত্রিবিধ আত্মা

এই পঞ্চকোশকে অন্যভাবে বিভক্ত করিতে পারা যায়। অন্নময় কোশ জীবের স্থূল-শরীর, প্রাণময় ও মনোময় কোশ মিলিয়া জীবের সূক্ষ্ম-শরীর এবং বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ মিলিয়া জীবের কারণ-শরীর। এ ভাবে জীব ত্রি-শরীর—তং বা এতং ত্রি-শরীরমাত্মানম্ (নৃসিংহ-উত্তর, ১ খণ্ড)। স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে যাজ্ঞবল্ক্য 'শারীর' আত্মা বলিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৩৫ ও ৪।২।৩)। সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার নাম 'তৈজস'—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'প্রবিবিক্তাহারতর'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—

তস্মাৎ এষ প্রবিবিক্তাহারতর ইব এব ভবতি অস্মাৎ শারীরাৎ আত্মনঃ—বৃহ, ৪।২।৩

এবং কারণ-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার যাজ্ঞবল্ক্য নাম দিয়াছেন 'প্রাজ্ঞ' আত্মা।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ—বৃহ, ৪।৩।২১ ও ৩৫

এই 'প্রাজ্ঞ' আত্মাকে ছান্দোগ্য 'উত্তম পুরুষ' বলিয়াছেন—স উত্তমঃ পুরুষ (৮।১২।৩)।

শারীর আত্মা অধম পুরুষ, তাহার তুলনায় তৈজস আত্মা 'উত্তর' পুরুষ; কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই 'উত্তম' পুরুষ। এই প্রাজ্ঞ আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্য সংযুক্ত। সেই জন্য প্রশ্ন-উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

স (বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ) পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে—প্রশ্ন, ৪।১

'বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ সেই অক্ষর (যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে তৎ অক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহার প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ) পরমাত্মায় সংপ্রতিষ্ঠিত।'

এই শারীর আত্মা = the corporeal self of the Materialist,

এই তৈজস আত্মা = the individual soul of the Realist,

এবং এই প্রাজ্ঞ আত্মা = the Supreme soul of the Idealist কারণ, একটু নিবিড়ভাবে দেখিলে এই প্রাজ্ঞ আত্মা প্রত্যগাত্মার অতি সন্নিকট—প্রায় অভিন্ন।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীবের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির আলোচনায় একথা আরও বিশদ হইবে। এখানে আমাদের লক্ষ্যের বিষয়

এই যে, ছান্দোগ্য-উপনিষদে রক্ষিত ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে ঐ ত্রিবিধ আত্মার বিবরণ এই ভাবেই প্রস্ফুট হইয়াছে।

একদা দেবগণের প্রতিনিধি রূপে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া শিষ্যভাবে প্রজাপতির সমীপে গিয়া প্রশ্ন করিলেন—'শুনিয়াছি অপহতপাপ্‌মা বি-জর বি-মৃত্যু বি-শোক ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন সত্যকাম সত্যসংকল্প যে আত্মা স অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—তাহার অন্বেষণ, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ঐ আত্মা কে?' (ছান্দোগ্য, ৮।৭—১২)। প্রজাপতি বলিলেন 'য এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে এষ আত্মা—চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়*, যাহার প্রতিবিম্ব জলে বা দর্পণে দেখা যায়—সেই আত্মা।' বিরোচন জড়বাদীর (materialist) এই উত্তরেই তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ অসুর-প্রকৃতি লোকের ইহাই অভিমত আত্মা—'দেহমাত্রমেব আত্মা'—আসুরো বতেতি অসুরাণাম্ হ্যেষা উপনিষৎ (বৃহ, ৮।৮।৫) (gospel of demoniac men)। ইন্দ্র কিন্তু এ উত্তরে তুষ্ট হইতে পারিলেন না—অথ হ ইন্দ্রঃ এতৎ ভয়ং দদর্শ। তিনি ভাবিলেন—'এই যদি আত্মা, তবে ত দেহ ব্যাধিত হইলে আত্মা ব্যাহত হয়, অন্ধ হইলে অন্ধ হয়, ছিন্ন হইলে ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয়—নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।' তিনি প্রজাপতিকে আবার প্রশ্ন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন 'বেসক', ঠিক বটে, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। আত্মা সে, যে স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি—স্বপ্নে মহিমা অনুভব করে। ইহাই Realist-এর উত্তর। ইন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, এ উত্তরও পর্য্যাপ্ত নহে—কারণ, স্বাপ্ন আত্মাও দুঃখভোগ করে, শোকমোহের অধীন হয়। অতএব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি। তিনি প্রজাপতিকে আবার প্রশ্ন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, বেসক, ঠিক বটে, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। আত্মা তিনি, যিনি স্বপ্নাতীত, সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি। ইহাই Idealist-এর উত্তর। কারণ ঐ অবস্থায় 'There is no duality, no subject and no object'—বিষয়-বিষয়ীর ভেদ স্তম্ভিত হইয়া অদ্বৈতের অনুভূতি হয়।

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন

আমাদের আলোচ্য চিন্মাত্র বা প্রত্যগাত্মা সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে। যিনি প্রত্যগাত্মা, তিনি নিরঞ্জন—নিরবদ্যং নিরঞ্জনং (শ্বেত, ৬।১৯)। তিনি অপহত-পাপ্‌মা (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১)।

* সেই জন্য ইহার নাম 'চাক্ষুষ'। যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে (বৃহ, ৪।৪।১, ছা ৮।১২)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—ইন্ধো হবৈ নাম এষ যোঽয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ (বৃহ, ৪।২।২)

স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ (বৃহ, ৪।৪।২২)—সাধু কর্ম্ম দ্বারা তিনি উপচিত কিংবা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা অপচিত হন না। সেই 'নিরঞ্জন' দেহ-রূপ-পুরবাসী হইয়া 'পুরঞ্জন' হইয়া পড়েন। তখন পুণ্যপাপ, প্রিয়াপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে।

দৃষ্ট্বা চ পুণ্যং চ পাপং চ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৭
শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

এ সমস্তই দেহযোগের ফল।

দেহযোগাদ্ বা সোপি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬*
আত্তোবৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্ × × অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

কস্মাৎ পুনঃ জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সন্ তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? (পরমাত্মার অংশ জীব—তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয় কিরূপে?) সোপিতু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্য-তিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাৎ ভবতি—'জীবের ঐ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-তিরোভাবের হেতু দেহযোগ—দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-বিষয়বেদনাদি যোগ।'

অর্থাৎ মোহাৎ অনীশতাংপ্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি—পঞ্চদশী

১।১৬৪।২০ ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন উপমা—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে—'এক বৃক্ষে দুটি পাখী—একজন দ্রষ্টা একজন ভোক্তা—

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব অত্তি
অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি—মুণ্ডক ৩।১।১

—ঐ উপমা এ তত্ত্বই বিশদ করিতেছে। এই নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়াই শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ—শ্বেত, ১।৯

'একজন প্রাজ্ঞ, একজন অজ্ঞ—একজন ঈশ, একজন অনীশ।'

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥—মুণ্ডক, ৩।১।২

ইহাকেই বলে উপাধির উৎপাত—এই উপাধি-জন্যই জীবের শোকমোহ।

তথাপি নিরঞ্জন পুরঞ্জনের নিত্য সখা, সত্য সখা—সযুজা সখায়া—উভয়ের শাশ্বত সংযোগ। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

* Life like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.—Shelley.

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ (বৃহ, ৪।৩।১৫, ২২)। তিনি অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন (বৃহ, ৪।৩।২২)—তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত—অসঙ্গ, নির্লেপ।

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ—কঠ, ৫।১১
শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে—গীতা, ১৩।৩২

এবম্ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপহিতে জীবাখ্যে অংশে দুঃখায়মানেঽপি ন তদ্বান্ ঈশ্বরো দুঃখায়তে—শঙ্কর

অর্থাৎ Our own metaphysical I, our divine self, persisting in untarnished purity, through all the aberrations of human nature, eternal blessed.—(Deussen)

সেইজন্য সকল বালাই-এর মূল যে শরীর, (উপনিষদ্ বলেন) সেই শরীর হইতে বিবিক্ত হওয়াই ('spirit casting off its dust') জীবের পরমার্থ—চরম সার্থকতা।

এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪,৮।১২।৩

অতএব উপনিষদে বিবৃত আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতে আমরা জানিলাম যে, সর্ব্বোপরি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, যিনি চিদাকাশ, যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Absolute বা God। তারপর তদংশ (Divine fragment) প্রত্যগাত্মা, যিনি চিন্মাত্র, চিৎকণ, কূটস্থ, অক্ষর (কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে—গীতা), নির্বিকার নিরঞ্জন—যিনি গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ—পরব্যোমের পরমাণু বা হৃদ্যাকাশময় দেহ (ব্রহ্মকোশ) যাঁহার উপাধি—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Monad। তারপর ঐ চিন্মাত্রের আভা বা কিরণ (Radiation)—বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের সমবায়ে যে কারণ-শরীর (যাহা কল্পান্তস্থায়ী) ঐ শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহাকে জীবাত্মা বলে—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Ego বা Individuality। এবং সর্ব্বশেষে ঐ জীবাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব (Reflection)—মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশরূপ যে ত্রিতয় (Triad) (যাহা জন্মে জন্মে জীববৃক্ষে নবপল্লবিত হয়)—ঐ ত্রিতয়ে প্রতিফলিত চিৎছায়া—যাহাকে 'ভূতাত্মা' বলা হয়—যাহার নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাহার নাম দিয়াছেন অনাত্মা—যাহা পাশ্চাত্য দর্শনের Personality বা Animal soul।*

---

* The group of *temporary* lower vehicles which a soul assumes when he descends into incarnation.—C. W. Leadbeater. এই temporary lower vehicles-ই বেদান্তের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ। অথ যো বাব শরীরম্ ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্ (মৈত্র, ৩।২)।

এই ভূতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন

আভাস এব চ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫০

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

'জলে যেমন সূর্য্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব ইহাও তদ্রূপ।' এই প্রতিবিম্ব বা Reflection সম্বন্ধে (যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্ এতদ্ আয়তম্—প্রশ্ন ৩।৩) স্বামী শুভরাও কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য।

Suppose, for instance, we compare the Logos itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror, say upon a polished metallic plate and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have 'three' images, one being clearer than the other and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to Karana Sharira, the metallic plate to the astral body and the wall to the physical body. In each case a definite bimbam is formed and that bimbam or reflected image is for the time being considered as the self. The bimbam formed in the astral body gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body ; the bimbam formed in the Karana Sharira gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.—Notes on the Bhagabat Gita p 19.

উদ্ধৃত বচনে শুভরাও যে উপমানের প্রয়োগ করিলেন, তদ্দারা উপনিষদের অনুমোদিত ত্রি-পুরুষতত্ত্ব বেশ সুবিশদ হইল।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল অথচ জীববাদ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের সকল বক্তব্য বলা হইল না। আগামীবারে অবশিষ্ট কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছেলেপিলের ভয়ডর না থাকাটা সেকালে যে একটা গুণের মধ্যে গণ্য হ'ত তা নয়। বরঞ্চ আমার বাবার আমলের ইংরেজীনবিশদের আদর্শ ছিল বিলেতের ভিক্টোরীয় যুগের Upper Ten-এর (অভিজাত মণ্ডলীর) অতিভব্যতা। সেই আদর্শে নিজেদের গ'ড়ে তুলতে তাঁরা একমনে সাধনা করেছিলেন, আর কবুল করতে হয় যে তাঁদের ঐ আন্তরিক সাধনা অনেকাংশে সফল হ'য়েছিল। লাঠিবাজী দেশ থেকে লোপ পেয়ে গেল। চিরদিনের ডানপিটে জমীদারের ছেলেরাও ক্রমশঃ শান্তশিষ্টভাবে পড়া মুখস্থ করতে লাগ্‌ল। মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি লাঠিয়ালের হাত থেকে এটর্ণীর হাতে গিয়ে পড়তে আরম্ভ হ'ল। এতে সরকারের খুসী হওয়ারই কথা, কারণ শান্তিরক্ষার খরচ অনেক কমে গেল। কিন্তু ফলে তা হ'ল না। সাহেবরাই আমাদের মোহ ভাঙ্গলেন। তাঁরা এই সুসভ্য চোস্ত ভালমানুষ নব্য বাঙ্গালী বাবুর কদর বুঝলেন না। কথায় কথায় কাবুলী বেলুচী গুর্খার সঙ্গে এঁদের তুলনা ক'রে টিট্‌কারী দিতে লাগলেন। বাবুগুলো কি মানুষ যাদের কেবল চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করা যায়, এ কি একটা দেশ যেখানে সারা বছরে একটা বন্দুক ছুঁড়তে হয় না! টেবিলে খেতে গিয়ে এরা ছুরী দেখে টেবিলের নীচে গিয়ে লুকোয়, এই রকম কত কথাই শুন্‌তে হ'ত। আমাদের তরফে উন্নতির কাজ জোরে চল্‌ল, ইজের কোর্ত্তা পরা হ'ল, সমাজ সংস্কার আরম্ভ হ'ল ইংরেজী ধরণের রাজনীতি চর্চ্চারও গোড়া পত্তন হ'ল, কিন্তু ইংরেজের অবজ্ঞার হাসি থাম্‌ল না। অশন-বসন, ধরণ-ধারণ, সবেতেই দেশের লোককে পেছনে ফেলে ছুটতে লাগ্‌লাম। কিন্তু যার লাগি চুরি করি সেই বলে চোর, সাহেবের মন পেলাম না। তখন আস্তে আস্তে হাওয়া ফিরল। নূতন slogan (মন্ত্র) হ'ল, চুলোয় যাক্ উন্নতি, আগে ইজ্জৎ বাঁচাও। রাজনারায়ণবাবু, বঙ্কিমবাবু, এঁরা পাগলামির গতিরোধ করতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এখন নবীন যুগকবি সেই কাজে লেগে গেলেন। "বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণ" যে কি হাস্যাস্পদ জিনিষ তা কবি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। "দিগন্তে বিলীন বিশাল মরুর" মাঝে ঘোড়সওয়ার আরব বেদুইনের ছবি এঁকে সামনে ধরে সবাইকে বল্লেন, কি সুন্দর এই ছবি, কি সুন্দর এই আরব যার "বর্শা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ।" পৃথিবী

জুড়ে বিষাণ বেজেছে, সবাই নিশান নিয়ে এসেছে, "কইরে বাঙ্গালী কই?" বঙ্গমাতাকে প্রার্থনা কর্‌লেন তোমার ছেলেদের গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে দাও, এদের বাঙ্গালী ক'রে রেখেছ মানুষ ক'রে দাও। কবির এই বজ্রকণ্ঠে ডাক, মার কাছে ব্যাকুল অনুযোগ, এই শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা বড় হ'লাম। কিন্তু তখনও দেশের ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই। আমাদের মধ্যে মনে মনে দেশপ্রেমিক অনেক তৈরী হ'লেন বটে, এমন ভাবুকও অনেক উঠলেন যাঁরা নিজেদের বীরত্বে আরব বেছুইন মনে কর্‌তেন, কিন্তু তাঁরা ঘোড়ায় দূরে থাক্ গাধায় চড়তেও শিখলেন না। কাজেই একপুরুষ আমরা দেশেরও কোন উপকার করলাম না, বিদেশী রাজারও কোন ক্ষতি করলাম না। এখন দেখি হাওয়া একেবারে ঘুরে গেছে। কবির বাঙ্গলা দেশে "শান্তিতে শয়ন" শেষ হ'য়ে আসছে। গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়ার দল বেড়েই চলেছে। বর্শা হাতে না থাকলেও ভরসা প্রাণে একরকম নিরুদ্দেশ হ'য়েছে। ভাল হ'য়েছে কি মন্দ হ'য়েছে এই যুগের রাজনৈতিকরা ঠিক করবেন। আমরা নির্দ্দোষ, কেননা নিষ্ক্রিয়। আমাদের দৌড় ছিল বড় জোর, "কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্"। গীতা আমাদের জন্য একটা বিশেষ রকমের জাহান্নামের ব্যবস্থা ক'রে থাকলেও, আইনের চোখে আমরা বেকসুর খালাস।

এইবার একটু পুরানো গল্প ব'লে বাঙ্গালী ও সাহেবের মধ্যে সম্বন্ধটার আভাস দিতে চেষ্টা করি। ১৮৮৮ সালে বাবার সঙ্গে পূজার ছুটিতে দার্জ্জিলিঙ গেছলাম। লোক সমাগম খুব হ'য়েছিল, তবে সাহেবই বেশী। বাঙ্গালীদের অধিকাংশই নব-প্রতিষ্ঠিত সানিটেরিয়মে জমা হ'য়েছিলেন। জজ চন্দ্রমাধববাবু, বর্দ্ধমানের উকীল নলিনাক্ষবাবু ও তারাপ্রসন্নবাবু, পাটনার গুরুপ্রসাদবাবু এই রকম অনেক গণ্যমান্য লোক সে-বছর এসেছিলেন। তাছাড়া রাজদ্বারে প্রসাদপ্রার্থী বড়লোকের আনাগোনা ত ছিলই। কিন্তু এতগুলি বাঙ্গালী, এঁদের আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। রবিবার দিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা তবু সমাজে গিয়ে দুদণ্ড কাটাতেন। দার্জ্জিলিঙের পুরানো বাসিন্দা মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী আমাদের বৈঠক ছিল। যখন তখন আমরা ছেলেরা সেখানে যেতাম ও সে বাড়ীর রান্না পরীক্ষা ক'রে আস্‌তাম। বড়রা চৌরাস্তায় ব'সে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে জটলা ক'রে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতেন। সাহেবদের নাচ গান থিয়েটার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁদের ক্লাবও সদা সরগরম। কিন্তু এক কুচবেহারের মহারাজ ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ডাকতেন না।

হঠাৎ একদিন আমাদের বড়ীতে বহু জনসমাগম হ'ল। আমি

নিতান্ত ছোট ছিলাম তাই দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার এক দাদা উঁকি মেরে সন্ধান নিয়ে এলেন যে, কর্ত্তারা মহা উত্তেজিত হ'য়েছেন, শুনেছেন যে, পরের দিন লাট বেলী সাহেব টাউন হলে এক বক্তৃতা ক'রে বাঙ্গালীদের গালাগালি দেবেন। অবজ্ঞা ক'রে দূরে ঠেলে রাখা এক কথা আর প্রকাশ্যে গায়ে প'ড়ে গালাগাল আর-এক কথা। ঠিক হ'ল যে, নীরবে সহ্য করা হবে না, বর্দ্ধমানের তারাপ্রসন্নবাবু বাঙ্গালীদের তরফে চোখা চোখা কথায় জবাব দেবেন। আর আমাদের শক্ত তাগিদ দেওয়া হ'ল যে, আমরা ছেলেরা টাউন হলে কোনও অসভ্যতা না করি। কিন্তু ব্যাপারটা পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মত হ'ল। বেলী সাহেব বক্তৃতা করলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের নিন্দাবাদ করলেন না। ভয়ে নয়, কারণ আমরা বালকবীরের দল সেখানে যাই নাই। যা হোক্, সকলেই এটা মনে ক'রে আশ্বস্ত হ'লেন যে, সাহেবরা বাঙ্গালীদের অপমান করতে সত্যি চা'ন না।

কিন্তু এ স্বস্তির ভাব বজায় রইল না। একদিন ম্যাল রাস্তার উপর গোরাদের ঘোড়া, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে খেলার এক বিরাট আয়োজন হ'ল। সার্ব্বজনিক রাস্তাটা ঘেরে বন্ধ ক'রে দিলে। তাই আমাদের বিশ্বাস হ'ল যে, সবাই খেলা দেখ্তে পা'ব। সাজ-গোজ ক'রে কর্ত্তারা গেলেন, আমরাও সঙ্গে গেলাম। কিন্তু লালমুখো দৌবারিকের দল সাহেব ছাড়া কাউকে ভেতরে ছাড়ল না, দুই-একটা ঠাট্টা টিটকারীর কথাও বল্‌লে। বিরক্ত হ'য়ে কর্ত্তারা ফিরে গেলেন। আমার দাদা ও আমি কিন্তু কৌশলে প্রবেশলাভ ক'রে, একেবারে মেমসাহেবদের মধ্যস্থলে ব'সে, জাতীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখলাম। এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। জরীর বক্লু পরা একজন পাহাড়ী জমীদার ঘোড়ায় চ'ড়ে ফটক পর্য্যন্ত এসে, এক লাফে নেমে ভেতরে ঢুক্‌তে গেলেন। যেই ঢুক্‌তে গেছেন, চকিতের মত দুটো জিনিস হ'য়ে গেল। লালমুখো প্রহরীটা জমীদারের ঘাড়ে হাত দিলে, আর অমনি জমীদারের কুক্‌রীটা খাপ থেকে ফোঁস ক'রে গোখরো সাপের ফণার মত বেরিয়ে পড়ল। ফণা দেখেই প্রহরীর হাত কাঁধ থেকে খ'সে পড়ল। জমীদার গম্ভীর চালে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমাদের কাছে তিনি আসতেই সসম্ভ্রমে তাঁকে স্থান ক'রে দিলাম। নিজে মার না খেয়ে বীরত্বের মর্য্যাদা বজায় রাখার এমন সুযোগ কি আমরা ছাড়তে পারি? মনে একটু অব্যক্ত আনন্দের ভার নিয়ে বেলাটা খুব উপভোগ করলাম। বাড়ী গিয়ে খুব আহ্লাদ ক'রে সব বর্ণনা করলাম। কিন্তু কর্ত্তাদের রাগ গেল না। পরদিন ফের বৈঠক বস্‌ল আমাদের বাড়ী। ফলে কয়েকদিন পরে মহা ধুমধাম ক'রে সেনিটেরিয়মে বিজয়া-সম্মিলনী হ'ল। তিন ঘণ্টা ধ'রে নানা রকম আমোদ-প্রমোদ, দৌড়-ঝাঁপ ও খাওয়া-দাওয়া হ'ল। সাহেব

শেষ পর্য্যন্ত কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, যদিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ হ'য়েছিল। মনের আবেগে আমার দাদা ও আমি ইংরেজী বাঙ্গলা তু'রকম জলখাবারই ভরপূর খেলাম। এই বিজয়া-সম্মিলনী সেই থেকে প্রতিবৎসরই হয় কিন্তু এখন আর সেরকম উৎসাহ নেই। কা'কে কষ্ট দেওয়ার জন্য আর উৎসব। সাহেবরা ত পাহাড় একরকম আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের বড় সাধের ক্লাবটিও কাল সাদা দাবার ছকের মত হ'য়ে গেছে। অনেক মনের তুঃখে সেদিন এক ইংরেজী কাগজ লিখেছিল যে, দার্জ্জিলিঙ ক্রমশঃ নেটিব্‌ ও মশকের লীলাভূমি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, as bad as the plains (প্রায় নীচের মতই)।

সাহেব ত চিরদিনই নানা রকমের হয়। বড় সাহেব, ছোট সাহেব, কটা সাহেব, মেটে সাহেব ও বাঙ্গালী সাহেব। যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখন এই শেষোক্ত সাহেবদেরও উৎপাত কম ছিল না। তবে জাত সাহেবদের হাতে বেচারাদের তুর্গতিও যথেষ্ট হ'ত। ভালই হ'ত, নইলে কংগ্রেসাদি ব্যাপারের অনেক দেরী পড়ে যেত। একবার এক জজ সাহেব (ইনি ঠিক বাঙ্গালী ছিলেন না) পাহাড়ে গিয়ে সাহেব-দের খুব বড় হোটেলে উঠেছিলেন। সচরাচর সে হোটেলে বিশুদ্ধ শুভ্র ছাড়া অন্য বর্ণের সাহেব স্থান পেত না। এই রকম পাকা বিলেতী ব্যাপার ব'লে, সেখানে তু-চারজন মেম চাকরাণীও ছিল। আমাদের জজ বাহাতুরের শ্বশুড়বাড়ী বিলেতে হওয়ার দরুণ তিনি কয়েকটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে একটা এই যে, এ রকম নির্ম্মল ভদ্র হোটেলে তিনি ঢুক্‌তে পেতেন। হোটেলের কর্ম্মকর্ত্তা তাই এঁকে এবারও না বল্‌তে পারেন নাই, কিন্তু কয়েকজন ছোকরা চা-বাগানের সাহেব ভয়ানক চ'টে গিয়েছিল। তারা স্থির করলে যে নিগারকে তাড়াতেই হবে। খুব গোপনে তারা ষড়যন্ত্র করলে হোটেলের এক মেম ঝির সঙ্গে। তার পরদিন সকালে চা-পানি খাওয়ার পর সবাই বারান্দায় ব'সে আছেন। সস্ত্রীক জজ সাহেবও রয়েছেন। এমন সময় চাকরাণীটা ময়লা জলে ভরা এক মুখ ধোবার গামলা এনে ঠক্‌ ক'রে সেখানে নামিয়ে রেখে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মেনেজারকে বল্‌লে, "স্যার, স্যার, কাঁচা রং, উঠে আসছে।" সমবেত সাহেব-মেমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে মুচকে হাসতে লাগলেন। জজ বাহাতুরের মুখ বেগুনে হ'য়ে উঠল। তিনি সেই দিনই অন্যত্র উঠে গেলেন। এ অনেক দিনের কথা। আজ-কাল ত শুনতে পাই যে, শ্বশুর বাড়ী বাপের বাড়ী তুই ভারতবর্ষে এমন সাহেবও সব হোটেলেই স্থান পা'ন। কে বলে দেশের উন্নতি হয় নাই।

আগে কটা সাহেবে মেটে সাহেবেও ভয়ানক মন কষাকষি ছিল। এখন Loyalist সভা Royalist সভা ইত্যাদি উপলক্ষে কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করবার জন্য কতকটা সদ্ভাব হ'য়েছে। রাজনৈতিক চাল চালাবার জন্য যে মৈত্রী, সেটা কত অদ্ভুত হ'তে পারে তা আমাদের এই কল্‌কাতার নগর-পঞ্চায়তেই দেখা যায়। প্রায় ৪৫ বৎসর আগেকার একটা গল্প বলি। তখন সাহেবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল। আমার এক জ্যাঠা মহাশয় সিমলা যাচ্ছিলেন। সহযাত্রী ছিলেন একজন মেটে সাহেব। প্রয়াগে লালমুখ প্রকাণ্ড দেহ এক পল্টনের সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন। সঙ্গে চাকর-বাকর, লোক-লস্কর, তলোয়ার-বন্দুক। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, যাকে বড় সাহেব বলে, এ সেই ব্যাপার। জ্যাঠামহাশয় ও মেটে সাহেব মহাশয় দুজনেই আগন্তুককে দেখে একটু সঙ্কুচিত হ'লেন। অর্থাৎ কেবল মনের সঙ্কোচ নয়, শরীরও যথেষ্ট সঙ্কুচিত ক'রে বড় সাহেবের আরামে বসার জায়গা ক'রে দিলেন। বড় সাহেব কিন্তু মেটে মহাশয়ের দিকে একবার তাকিয়েই, আমার জ্যাঠার পাশে এসে বস্‌লেন। খুব আদব-কায়দা ক'রে "Good Morning, Babu" ব'লে গল্প জুড়ে দিলেন। জ্যাঠামহাশয় ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য হ'লেন যে, সাহেব সাহেবের কাছে না ব'সে তাঁর কাছে এসে বস্‌লেন। খানিকক্ষণ আলাপের পর সে-ই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্‌লেন। তা'তে জঙ্গী সাহেব খুব চেঁচিয়েই বল্‌লেন, "ওদের সাহেব বলো না, বাবু। ওরা অতি ছোট জাত। আগে জানতাম না। কি ক'রে আমার শিক্ষা হ'ল, বলি শোন।" ব'লে এক গল্প বল্‌লেন। কয়েক বছর আগে তিনি একবার রেলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিলেন। মাঝখানে ব'সেছিল দুই মেটে সাহেব। অপর দিকে ব'সেছিলেন এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী বাবু ও তাঁর এক অল্প বয়স্কা মেয়ে। বাবুটি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ সাহেবের সেদিকে নজর পড়াতে দেখলেন যে, মেয়েটির মুখ ভয়ে সাদা হ'য়ে গেছে আর নিতান্ত জড়সড় হ'য়ে ক্রমাগত একবার এদিক একবার ওদিক সরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে, ফিরিঙ্গী দুটো পা দিয়ে মেয়েটির পা ঠেল্‌ছে। তার অভিভাবক তখনও কাগজ পড়ছেন, আর দেখ্‌তে পাচ্ছেন না নয়, দেখেও দেখছেন না। দুর্ব্বলের উপর এই অত্যাচার দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাগে সাহেবের রক্ত মাথায় চ'ড়ে গেল। এক-লাফে উঠে, কোনও কথা না ব'লে, সেই দুই ফিরিঙ্গী-নন্দনের ঘাড় ধ'রে তাদিকে নীচে ফেলে দিলেন আর পরের ষ্টেশনে দূর ক'রে দিলেন। তারা নেমে যাওয়ার পর, বৃদ্ধ বাবুটি ছোটো-খাটো এক বক্তৃতা ক'রে সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। গল্পটা ব'লে সাহেব জোর গলায় জ্যাঠামহাশয়কে

জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তোমার ফিরিঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে কেন বসলাম না, বুঝতে পারলে বাবু?" এ গল্প শুনেছি শৈশবে। তার পর অনেক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বন্ধু ব'লে মেনে নিয়েছে। সুতরাং এ জাতের নিন্দা করায় আমার কোনও আনন্দ নেই। এরা আমাদেরই আপনার লোক, সাহেবদের নয়। আর সত্যি বড় দুর্ভাগ্য জাত। আপনার বল্‌তে কেউ নেই। বড়লোকে মিষ্টি কথা ব'লে গরীব আত্মীয়দের দিয়ে ঘরের ছোট কাজগুলো করিয়ে নেয়, তালুক-মুলুক কিনে দেয় না। এই সহজ সত্যটাও এরা বোঝে না, এমনই নির্ব্বোধ। নির্ব্বোধ আমরাও ত বড় কম নয়। আপনার লোককে পর ক'রে দেওয়াতে আমরা সিদ্ধহস্ত হ'য়ে উঠ্‌ছি।

সাহেব বাঙ্গালীর কথা বল্‌তে বল্‌তে অনেক দূর এসে পড়েছি। পাঠককে আবার কুচবেহারে ফিরে যেতে হবে। একটা কথা বোঝাতে চাই যে, আমাদের কুচবেহারের আবহাওয়া অন্য শহরের আবহাওয়ার থেকে একটু আলাদা রকমের ছিল। একে ত দেশী রাজ্য, তায় একেবারে সীমান্তের উপর। প্রথম থেকেই কতকগুলো জিনিস আমরা দেখতাম যা অন্য জেলার বাঙ্গালী ছেলেদের নজরে আস্‌ত না। রাজ্যটি এখন ছোট বটে, কিন্তু গৌরবে এ রাজবংশ কারও কাছে খাটো ছিল না। রাজপুতানার বাহিরে খুব কম রাজ্যই আছে যাদের জন্ম কুচবেহারের আগে। আকবরের সময় এ রাজ্য যে বেশ বড় ছিল, আইন-ই-আকবরী দেখলেই জানা যায়। প্রথম রাজা বিশ্বনাথ হ'তে ধারাবাহিকভাবে এই নারায়ণী বংশের রাজারা হনুমান-দন্তের নীচে ব'সে উত্তর বঙ্গ শাসন ক'রে এসেছেন। ইতিহাসের চোখে কুচবেহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যেরই রূপান্তর। আর কামরূপ যে কত পুরানো তা ইতিহাস প'ড়েও বোঝবার জো নাই। কুচবেহারের কিম্বদন্তীর দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে, প্রথম মহারাজ স্বয়ং মহাদেবের বংশসম্ভূত, ভুটানের দেবরাজের আত্মীয়। পুরাকালে দেবাদিদেব একবার তরাইয়ের বনে বেড়াতে এসে, হিরা ও জিরা ব'লে দুই বোনের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। দুই বোনের গর্ভে যে দুই সন্তান হয়, তারা ভুটান ও বেহারের আদিপুরুষ। দুই রাজবংশই এই পুরানো আত্মীয়তা মেনে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কতবার দেখেছি ভুটানের দূত নানা উপহার নিয়ে এল। তারা উপহার পাঠাত নানা রকমের পাহাড়ের তৈরী জিনিস ও ঘোড়া। আমাদের এ দিক্ থেকে যেত ঘড়ী, কলের বাজনা, বিলেতী বনাত, Sheffield-এর ছোরা ছুরী, ইংরেজী ধরণের ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি। আগে আগে ভুটীয়ারা দল বেঁধে শীতকালে ব্যবসা করতেও আস্‌ত। তাদের পণ্য

প্রধানতঃ ছিল ঘোড়া ও কম্বল। আশে-পাশের সরকারী জেলার লোকও এই উপলক্ষে অনেক আস্‌ত। আগেকার দিনে কুচবেহার ছিল উত্তর-বঙ্গের একটা কেন্দ্রস্থান। রাজ্য এক সময় পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রঙ্গপুর জলপাইগুড়ীর জমীদাররা কুচবেহারকে কর দিতেন। ভুটানের কথা ত বলেছি। নেপালের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কুচবেহারের এক রাজকুমারী নেপালের রাণী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়, মোগল বাদশাহীতে ঘুণ ধরার আগে, সেনাপতি মীরজুমলা এই প্রদেশ জয় করতে আসেন। কুচবেহারকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে দক্ষিণ সীমান্তে ফৌজ রেখে তিনি আসামের দিকে দিগ্বিজয়ে চ'লে যান। যেই বেরিয়ে গেলেন প্রজারা দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌লে, এইবার মোগলদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া যাক্। ভীরু-স্বভাব রাজা (বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণ) রাজী হ'লেন না। তখন প্রজারা তাঁকে কয়েদ ক'রে রেখে নিজেরা দিল্লীর ফৌজ তাড়িয়ে দিয়ে এল। এর পরিণাম কত ভয়ানক হ'তে পারত, তা এই মূর্খগুলো একবারও ভাবল না। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াল না, কেননা মীরজুমলা সাহেব আসামেই মারা গেলেন, আর তাঁর যোদ্ধারা কালাজ্বর ইত্যাদির সঙ্গে যুঝ্‌তে না পেরে অন্য পথে বাড়ী ফিরলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংগ্‌স্ লাটের সময় কোম্পানীর সঙ্গে কুচবেহারের সন্ধি হয়। তার পরেও অনেকদিন এ রাজ্যের কতকটা কদর ছিল, কারণ শেষ ভুটান যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রীতিমত যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এঁরা রাখতে পেতেন। সেটা আমার সময়ের আগে। আমি যে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য দেখেছি সে নিতান্তই খেলাঘরের ফৌজের মত। যে সব কথা ইতিহাসের ছলে আমি ব'লে যাচ্ছি এগুলো কেউ যেন যথাযথ ব'লে না নেন। এ সব আমার মনের বিশ্বাস; আমার কাছে সত্য হ'লেও অন্যের পক্ষে গল্পমাত্র। মোট কথাটা এই যে, আমাদের রূপকথার মশলা জোগাবার জিনিস অনেক ছিল। যেখানে ভুটান নেপাল, পাহাড় জঙ্গল নিয়ে কারবার সেখানে ইংরেজের সঙ্গে বন্ধনটা আমাদের চোখে খুব মুগুর-মারা গোছের সত্য ব'লে লাগ্‌ত না। মহারাজ বিলেত গেলে মনে দুঃখও হ'ত, আবার বিলেতের বাদশাহী বংশের কাছে তাঁর মান আদরের কথা শুনে গর্ব্বও হ'ত।

ভুটীয়াদের সম্বন্ধে একটা শোনা গল্প বলি। উত্তরে পাহাড়ের কোলে একজায়গায় তিন সীমান্ত একত্র মিলেছিল, ভুটানের, ব্রিটিশ বক্সাদুয়ারের ও কুচবেহারের। একবার আমার বাবা ভুটানের রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, সীমান্তে গিয়ে তাঁদের এক রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে। জাঁকজমক ক'রে, চোপদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে গেলেন। তখন রেল ছিল না। যেতে একটু কষ্টই হ'ল। সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছেন তখন

ইংরেজদের কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনিও দেবরাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছিলেন। দুজনেই মনে করলেন একটা খুব বড় রকমের উৎসবে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেন যে, উত্তর দিকে পাহাড়ের উপর একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ঠিক সেই সময় এক ভুটীয়া ছোট পাহাড়ী টাট্টু চ'ড়ে এসে দুজনকে দুই চিঠি দিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাল। চিঠিতে লেখা ছিল যে, "ইংরেজ সরকার আমাদের ভুটানের সীমার মধ্যে বিনা হুকুমে এক বাঙলা বাঁধিয়াছেন, দেবরাজের হুকুমে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, তোমরা সাক্ষী রহিলে।" দুজনকেই আতসবাজী দেখে ফিরে যেতে হ'ল। দুজনেই জানতেন যে, এই সামান্য বিষয় নিয়ে সরকার যুদ্ধ করবেন না।

আমাদের চাপরাসী বরকন্দাজদের মধ্যে কেউ কেউ ভুটান যুদ্ধে সিপাই ছিল। তাদের কাছে ছেলেবেলায় ভুটানের অসীম বলের কথা কত কি শুনতাম। দেশ দুর্গম, পাহাড়ীরা পাহাড়ের আড়াল থেকে কি রকম পা দিয়ে ধনুক ধ'রে একসঙ্গে দশ-দশটা তীর ছোঁড়ে, বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে দিয়ে সিপাইদের ব্যূহ নষ্ট ক'রে দেয়, বেছে বেছে গোলন্দাজদের তীর মারে, এই সব নানা গল্প শুন্‌তাম। হয়ত তার অর্দ্ধেক গাঁজাখুরী, কিন্তু আমরা ঠিক সত্যি মনে করতাম। ভূগোল পড়তে যখন আরম্ভ করলাম, দেখলাম যে ভুটানের পেছনে তিব্বত আর তিব্বতের পেছনে চীন, সব বৌদ্ধ, কাজেই ধ'রে নিলাম যে, চীনকে না হারিয়ে সাহেবরা কোনদিন ভুটান দখল কর্‌তে পারবে না। এই নিয়ে ছেলে বুড়ো চাকর মনিব সবাই একটু আনন্দ পেতাম। কিন্তু এ আনন্দ কেন তা বোঝা শক্ত, কারণ ভুটীয়াদের সঙ্গে আমাদের জাত ধর্ম্ম ভাষা কিছুরই মিল ছিল না। বর্ম্মার রাজ্য গেল যখন, তখন আমরা বালক হ'লেও এটুকু জানতাম যে, বর্ম্মা ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ। তবু আমরা সত্যি বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সে বছর ভয়ানক উল্কাপাত হ'য়েছিল। লোকে সহজেই এই ব্যাপারের সঙ্গে থিবো রাজার পতনের যোগ দেখ্‌তে পেল। দেশে কি ধীরে ধীরে সমগ্র এসিয়ার একত্বজ্ঞান আস্‌ছিল? যাই হোক্, সরকার সীমান্ত সম্বন্ধে চিরদিন অতি সাবধান ছিলেন। একবার কুচবেহারে ভুটীয়া দূতদের সামান্য কিছু বারুদ ও ছররা জোগাড় ক'রে দেওয়ার অভিযোগে একজন প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে অনেক নিগ্রহ ভোগ কর্‌তে হ'য়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক ছাড়া পেলেন, ও ওকালতী করবার অনুমতি পেয়ে উকিল হ'লেন। কতকটা স্বাধীন হ'য়ে তিনি প্রজাদের কল্যাণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন।

প্রজারা অশিক্ষিত সরল প্রকৃতির লোক ছিল। তাদের একটা স্বতন্ত্র

মত বা public opinion ছিল না। উকিল মোক্তার, হাকিম আমলা, বেশীর ভাগই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমের রেষারেষি ভাব ছিল না, কারণ দু'দলই বাইরের লোক, গরজ একই। খাস কুচবেহারী বল্‌তে বোঝাত, রাজবংশী ও ঐ-দেশী মুসলমান। পুরানো বাসিন্দা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জমীদার যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কুচবেহারী ব'লে গণ্য হ'তেন। বাইরের বাঙ্গালীদের নাম ছিল ভাটিয়া। রাজগণেরা (কুমার সাহেবেরা) অধিকাংশ কিছু কর্‌তেন না। যে দু-চারজন হাকিমী কর্‌তেন তাঁরা যোগ্য সজ্জন ছিলেন। তাঁদের ভাটিয়া বিদ্বেষ ছিল না। রাজগণেরা বরাবরই বাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে কর্‌তেন আর নিজেদের সুখ দুঃখের সকল কথাই বল্‌তে আসতেন। আমি বড় হওয়ার পর আমাকে কুচবেহারে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ এঁদেরই বেশী ছিল। খাস কলিকাতার যে কয় ঘর ছিলেন, তাঁরা মহারাজের শ্বশুর বাড়ীর দেশের লোক ব'লে একটু আলাদা আলাদা থাক্‌তেন কিন্তু সেটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মোটের উপর কুচবেহার শহরটা ছিল যেন একটা বৃহৎ পরিবার। সর্ব্বত্র আমাদের অবাধ গতি ছিল। সব বাড়ীতেই দৌরাত্ম্য আবদার চল্‌ত। কার্য্যতঃ জাতিভেদের বালাই বড় একটা ছিল না, তাই অনেক বয়স পর্য্যন্ত আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব আবছায়া রকমেরই ছিল। অথচ এমন নয় যে, আমরা সবাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছিলাম। তন্তুবায়, পরামাণিক, সুবর্ণবণিক, শাহা প্রভৃতি সব বর্ণই আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ছিল। কিছুদিন বুন্দেলা রাজপুত এক ভদ্রলোক চাকরী কর্‌তে এসেছিলেন, কখনও কখনও মুসলমান দুই-একজনও ছিলেন কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়ায় পংক্তিভেদ দেখি নাই। গোঁড়া হিন্দু দুই-একটি যা হাকিম মহলে ছিলেন, তাঁরাও একটা বেখাপ্পা কিছু কর্‌তেন না, কোন রকমে নিজের জাতটা বজায় রাখ্‌তেন। কারও কারও আবার জাতিভেদ সন্ধ্যার পর থাক্‌ত না। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে বৈঠক বস্‌ত, তাশ-পাশা খেলা হ'ত, জলযোগ নানা রকমের হ'ত, তা'তে বড় একটা কারও আপত্তি ছিল ব'লে মনে নাই। এ সব সন্ধ্যা-বৈঠক ছেড়ে দিলেও একটা বেশ সার্ব্বজনীন ভাব দেখা যেত যা অন্যত্র দুর্লভ ছিল। হয়ত এটা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা। ছোট-বড় অনেকই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। বাবা সাধারণ সমাজের সভাপতি বরাবরই ছিলেন যদিও তিনি আচারঅনুষ্ঠানে পূরোপূরি ব্রাহ্ম কোনদিন হ'ন নাই। খাগড়া বাড়ীর পণ্ডিত-মণ্ডলী বা অন্য গোঁড়া ধরণের লোকেরা এই কারণে কিন্তু কোনদিন তাঁর বিরোধী ছিলেন না। মহারাজ সস্ত্রীক নববিধান সমাজভুক্ত ছিলেন। দুই সমাজের মধ্যে কুচবেহারে বা অন্যত্র

সদ্ভাব ছিল বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু মহারাজ সকল রাজগুণের অধিকারী ছিলেন, ধর্ম্মমতের জন্য বিরোধ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহুকাল পরে, এক ক্লাব স্থাপনের চেষ্টায় গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রবাবু ও আমি মহারাজের কাছে গেছলাম। মহারাজ সব রকমে আমাদের সাহায্য কর্‌তে রাজী হ'লেন। বল্লেন যে নগদ টাকা দেবেন, সাজ-সরঞ্জাম দেবেন, শেখাবার জন্য বিলেত থেকে খেলোয়াড় আনিয়ে দেবেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, ক্লাবে কোন রকম জাত কি সম্প্রদায় ভেদ থাক্‌লে আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখ্‌বেন না। রাজধানীতে গির্জ্জা, মসজিদ, ব্রাহ্মমন্দির, হিন্দুমন্দির সবই ছিল। সবাই রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত।

রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন। আগে ঠাকুরবাড়ী ছিল রাজবাড়ীর সামনেই। মহারাজ যখন নাবালক, তখন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হটন্‌ সাহেব ঠাকুরকে দূরে সরাবার মতলব করেন, কিন্তু হঠাৎ রাত্রে সাহেবের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় তাঁকে সে মতলব ত্যাগ কর্‌তে হয়, এই রকম জনশ্রুতি। তবে সাহেবের ভয় হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করা রীতিবিরুদ্ধ। মহারাজ গদীনশীন হওয়ার পর, অনেক খরচ-পত্র ক'রে সম্পূর্ণ ফরাসী ধরণের নূতন রাজবাড়ী উঠ্‌ল। রাজবাড়ীর হাতাটা বিলেতী জমীদার বাড়ীর পার্কের মত করা হ'তে লাগ্‌ল, অর্থাৎ অাঁকা বাঁকা ঝিল আর চারিদিকে উঁচু নীচু ঢেউ-খেলানো ঘাসের জমী। পুরানো ঠাকুরবাড়ী সেখানটায় আর মোটেই খাপ খেত না। তাই দূরে সহরের মাঝখানে এক পুকুরের পাড় জুড়ে মদনমোহন দেবের নূতন আবাস তৈরী হ'ল। বড় মন্দিরটি সুন্দর হ'লেও নূতন ধরণের লাগ্‌ত, কেননা বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দির না ক'রে, ফার্গুসনের কেতাব দেখে পশ্চিমের পুরানো হিন্দু মন্দিরের নকল করা হয়েছিল। কেন যে এরকম করা হ'ল আমি জানিনা। কেন যে এই গরীব বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দিরের শোভা আমাদের চোখে পড়ে না, কেন যে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার কোন গুণই আমরা দেখ্‌তে পাই না, কি বুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে আজ আমরা মাথায় সাদা টুপী প'রে, হিন্দী বলতে বল্‌তে, দেশ উদ্ধার কর্‌তে সকলের পেছনে চলেছি, তা বোঝা ভারী শক্ত। আমাদের কুচবেহারের মহারাজ গৌরব ক'রে বল্‌তেন, "আমি কোচ, আমি অনার্য্য, আমার আর্য্য ব'লে গণ্য হবার কোন সাধই নাই।" আমিও সেই রকম বল্‌ছি, "ভাই বাঙ্গালী, তুমি আর্য্য নও, তুমি অনার্য্য, তোমার দেশে এলে আর্য্যদের জাত যেত। তুমি কুরুপাণ্ডবদের বংশধর ব'লে নিজেকে জাহির ক'রে হাস্যাস্পদ হয়ো না। তোমার পূর্ব্বপুরুষ নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, যারা সমুদ্রগর্ভ হ'তে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার

ক'রে তোমার দেশের শস্যশ্যামলা নাম সার্থক ক'রেছে। তোমার পূর্ব্বজ গারো, কোচ, মেচ, যারা গভীর জঙ্গল কেটে উত্তরবঙ্গ মানুষের বাসের উপযোগী ক'রেছে। তোমার ডিঙ্গা, ময়ূরপঙ্খী নাও নিয়ে তোমার যে মাল্লারা সাগরে পাড়ি দিত তারা তোমার পূর্ব্বপুরুষ, ভীম অর্জ্জুন নয়। সত্যি বল্‌তে কি, তোমার অতীতের দিকে চাওয়া বিড়ম্বনা, তোমার ইতিহাস বর্ত্তমানে ও সম্মুখে। রাজা রামমোহনের শতাব্দীতে তুমি দেখিয়েছ তোমার কদর। এই শতাব্দী আরও তোমার কত কীর্ত্তি দেখবে। ভয় নেই। পাঁজী পুঁথিগুলো ছিঁড়ে ফেলে কেবল এগিয়ে চল।"

এক মন্দিরের কথা নিয়ে কি বক্তৃতাই না করলাম। পাঠকের কাছে মাপ চাইছি। নূতন মন্দির তৈরী হ'লে, এক শুভদিনে, হাতী ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত, রসনচৌকী, ইংরেজী ব্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল ক'রে, মদনমোহন গৃহপ্রবেশ করলেন। সঙ্গে রাজ্যের সব কর্ম্মচারী, সাহেব পর্য্যন্ত। মহারাজ পাটহাতীতে চ'ড়ে মিছিলের আগে আগে গেলেন যদিও তিনি ব্রাহ্ম আচার্য্যের জামাতা। রাজা তিনি, রাজধর্ম্ম যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চেয়ে অনেক বড় তা তিনি বুঝতেন। নূতন মন্দিরের জন্য কাশী থেকে অনেক খরচপত্র ক'রে নহবৎ এল, দেবতুষ্টির জন্য আরও অনেক রকম ব্যবস্থাও হ'ল। মোটের উপর, মদনমোহন বোধ হয় খুসী হ'য়েই বাড়ী বদল করলেন, কারণ এবার কারও মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না। বৈরাগীদীঘির শোভা বৃদ্ধি হ'ল।

কুচবেহার সহরটী ছোট হ'লেও ভারী সুন্দর। একেবারে নূতন। রাস্তাগুলি সব সহরের এক প্রান্ত হ'তে আর অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সোজা চলে গেছে। লাল লাল রাস্তা, দুধারে সবুজ ঘাস। মাটি এত রসাল যে ঘাস কখনও শুকোয় না। সব জিনিসটা যেন রুলার গজকাঠি নিয়ে মেপে তৈরী। আমাদের বাড়ী ছিল সাগরদীঘির পশ্চিম পাড়ে এক টিলার উপর। উত্তর দিকে তাকালেই হিমালয়ের নীলরেখা দেখা যেত। ভোরের আলোয় সেই নীলরেখার উপর কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতরাজের শুভ্র কিরীটের মত দেখাত। ছেলেবেলা থেকে এই ছবির মত পাহাড়ের দৃশ্য দেখা অভ্যাস, কাজেই যখন বারোবছর বয়সে প্রথম পাহাড়ে গিয়ে তার এবড়ো খেবড়ো গড়ন, এলোমেলো রং দেখলাম, তখন নিতান্তই নিরাশ হ'লাম। তারপর ত কত পাহাড়ই দেখেছি, কিন্তু কাছের পাহাড় আজও ভাল লাগল না। অনেক দূরে ঘন নীল পাহাড়ের চূড়ার শোভাই সব চেয়ে চমৎকার বোধ হয়। তার পরেই লাগে ভাল অন্ধকার অস্পষ্ট গভীর খদের তলা। অর্থাৎ দুটোই দূরের জিনিস আর দূরের বলেই idealised। এই যে সাবেক কালের কথাগুলো বলতে নিজেরই এত

আনন্দ হচ্ছে এ কেবল সে কালটা এত দূরে ব'লে। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু আমরা, কত পালিশ করা আমাদের ভাব ভঙ্গী, অথচ আমাদের এত ভাল লাগে বৈদিক যুগের আদিম অপরিণত সভ্যতার কথা। দূর বলেই ত ? উপরে বলেছি যে কুচবেহার সহরটী খুব আধুনিক ও ভারী সুন্দর। ছেলেবেলায় কিন্তু তার চেয়ে আমাদেব অনেক ভাল লাগত সাবেক রাজধানী ফলতাপুরের ধ্বংসাবশেষ। বাড়ীগুলো ছিল সব পাথরের, সহরের চারিদিকে কেল্লা ও গড়, দেখলে মনে হ'ত, হাঁ কুচবেহার পুরানো রাজ্য বটে। নূতন মদনমোহন বাড়ীর চেয়ে অনেক ভাল লাগত ফলতাপুরের কাছের প্রাচীন দেবীমন্দির। এই মন্দিরের নাম গোসানীমারীর মন্দির। জাগ্রত দেবতা। এখানকার কচি পাঁঠার মাংসের প্রসাদ লোভনীয় জিনিস ছিল। একটা কথা জানানো দরকার যে, আমাদের সেকালের ভাষায় মায়ের প্রসাদের নাম ছিল চরু। আমাদের বাড়ী যে প্রসাদ কালীবাড়ী থেকে নিত্য-বরাদ্দ ছিল সেটা একটা পা (leg)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যখন পড়লাম যে দশরথের নিঃসন্তান রাণীদের চরুভক্ষণ করানো হ'ল, নিশ্চয় ভাবলাম যে তাঁদের পাঁঠার চরণ খাওয়ান হ'ল। বড় হ'য়ে অমরকোষ ইত্যাদি প'ড়ে তবে ভুল ভাঙ্গল। গোসানীমারীর যে মন্দিরের কথা বলছিলাম সেটা একটা পীঠস্থান, নাম রত্নপীঠ, প্রমাণ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ঐ মন্দিরে কুচবেহারের রাজারা কখনও যান না। দেবীর অভিশাপ আছে। এ সম্বন্ধে গল্পটা এই যে, বৎসরের কোন এক অমাবস্যার রাত্রে এই মন্দিরের মধ্যে দেবী দিগম্বরীবেশে নৃত্য করেন। নৃত্যের সময় মন্দিরের সমস্ত দরওয়াজা বন্ধ থাকে। আগেকার এক মহারাজ পুরোহিতদের উপর জুলুম ক'রে সেই নাচের সময় ভেতরে উঁকি মারেন আর ফলে দেবীর শাপে তৎক্ষণাৎ ম'রে যান। সেই থেকে কোনো রাজা গোসানীমারীর মন্দিরে যান না।

রাজধানীর উত্তরে আর এক পুরানো মন্দির আছে, বাণেশ্বরদেবের। ঐ মন্দির যে পুরানো তাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ সেটা দেবতাদের খাদ্যাখাদ্য বিধি স্থির হওয়ার আগের প্রতিষ্ঠান। আমিও আগে এতটা জানতাম না। বড় হওয়ার পরে, অর্থাৎ বন্দুক চালাবার হুকুম পাওয়ার পরে, একবার শিবরাত্রির দিন আমরা শিকার ক'রে সেই পথে ফিরছিলাম। প্রায় জনা ছয়েক ছিলাম, আর সকলের কাঁধে কাঠিতে বাঁধা মরা হাঁস। বেলা বারোটা। এমন সময় দেখি যে মন্দিরের একজন ছোকরা পুরোহিত সেই দিকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। আমার ভয় হ'ল যে, আমরা একটা কিছু অব্রাহ্মণ্য কাজ ক'রে ফেলেছি। এসব ঋষিকুমারদের শিকারী নিগ্রহের বিষয়ে উৎসাহ সেই মহাভারতের যুগ থেকে। ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ঠাকুর ? আর একটু হ'লেই

জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলেছিলাম আর কি, "আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? রাক্ষসাদির কোন উপদ্রব নাই ত? নীবার ধান্যের অবস্থা ভাল ত"; হঠাৎ স্মরণ হ'ল যে, এ কলিযুগ, মৃগয়ারত হ'লেও আমরা ক্ষত্রিয় নই যবনবেশী শূদ্রমাত্র, আর ঋষিকুমারটী একজন শাস্ত্রবিষয়ে একান্ত বিগতস্পৃহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিত আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "জয়োঽস্তু আপনাদের আজ মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে। বাবা বিশেষ ক'রে বলেছেন।" একে শিবমন্দির, তায় শিবরাত্রি, প্রসাদ পেয়ে প্রসন্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই মনে ক'রে বল্‌লাম যে, আমাদের রক্তমাখা কাপড় চোপড়, গায়ে বারুদের গন্ধ, এ অবস্থায় মন্দিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ব্রাহ্মণকুমার ছাড়লেন না, টেনে হিঁচড়েই একরকম আমাদের নিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস্ জিদ ক'রে বাড়ী চলে যাই নাই। সেখানে গিয়ে দেখি, প্রসাদ মানে খাসির মাংসের কালিয়া ও কবুতরের চচ্চড়ি। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর, গাছপান ও সুপারি খাওয়ার সময় একটু প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা নিয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, বাণেশ্বরদেবের কাছে বলিদান কি ক'রে হ'ল। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, বলিদান মোটেই হয় নাই, খাসিটা ঠেঙ্গিয়ে মারা হয়েছিল আর পায়রাগুলোর গলা টেপা হয়েছিল, রক্তপাত আদবে হয় নাই।

সমস্যার সমাধান হ'ল। যাক্, এখানে ত রক্তপাত হ'ল না, কিন্তু দার্জ্জিলিঙে মহাকাল বাবার সামনে বলির জীব ঠেঙ্গিয়ে মারার কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে সনাতন নিয়মে গলাকাটা হয়। এরা সবাই হিন্দু, পণ্ডিতজী স্বীকার করুন আর নাই করুন। বাঙ্গলা দেশে দশভূজার সামনে অনেক বাড়ীতে পাঁঠা বলি দেওয়া হয় না, কুমড়ো খাঁড়া দিয়ে কেটে তাইতে সিঁদুর দিয়ে খানিকটা নকল রক্ত তৈরী ক'রে নিয়ে পূজা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা হয়। এ সিঁদুর যেন আমাদের একেলে নিরামিষ ভোজের মোচার চপ্ ও ইচড়ের কাট্‌লেট্। আমার যেন মনে হয় যে, এই সব ব্যাপারগুলো খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে বাঙ্গালীর সভ্যতা বা অ-সভ্যতা নানা স্থান থেকে কুড়ানো, শুধু প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। ধর্ম্মপূজা ও শূন্যপুরাণের কথাও বলিতে পারতাম, যদি সে বিষয়ে বিদ্যার একান্ত অভাব না হ'ত। গম্ভীরা নাম, মনসার ভাসান, কুচবেহারের বিষহরির গান ও মদনকামের পূজা, এ সব শ্রুতিজাত মনে করার কারণ আছে কি? আর একটা ছোট গল্প এই সম্পর্কে বলি। কুচবেহারের মদনমোহনদেব সোনার বংশীধারী মূর্ত্তি, তাঁর মন্দিরের দুধারে কালী ও তারাদেবীর মন্দির। তিন মন্দিরই এক ইমারতের মধ্যে। দেবীর সামনে রোজ পাঁঠা বলি হয়। পরোক্ষে এই

মাংস খাওয়ার অপরাধে বছরে একবার ক'রে মদনমোহন ঠাকুরের বিচার হ'ত। বাণেশ্বর পাল্কী ক'রে এসে বিচার ক'রে এক টাকা জরিমানা ক'রে যেতেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে শ্রুতিস্মৃতির সম্বন্ধ আমি ত ঠিক কর্‌তে পারি নাই। পাঠক চেষ্টা কর্‌বেন, নয়ত আজকালকার হিন্দুসভাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

ঠাকুরমন্দিরের কথা একটু বেশী হ'য়ে গেল। তবু আর একটা ছোট্ট গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। গল্পটা হাল্কা রকমের তবু ভাবুক পাঠক-এর ভেতরে তত্ত্বকথা পাবেন। তা ছাড়া, রচয়িতা একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়ায় গল্পটা অশাস্ত্রীয় বলা যেতে পারে না। গল্পের স্থান, এক নির্জ্জন প্রান্তরে ভাঙ্গা শিবালয়। সময়, শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যাবেলা। আকাশজোড়া মেঘ আর ঝুপঝুপ বৃষ্টি, অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে। পথশ্রান্ত এক ফকীর সেই পথে যাচ্ছিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে হায়রান হ'য়ে, তিনি মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। ফকীর বিধর্ম্মী, হিন্দুদের ঠাকুর সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু জানা ছিল না। শুকনো জায়গা পেয়ে শিবলিঙ্গের মাথার উপরেই ব'সে পড়লেন। বেশ ক'রে ব'সে তাঁর ঢিলে জামার ভেতর থেকে কাঠি-কাবাব বের ক'রে তিনি জঠরাগ্নির পূজা আরম্ভ কর্‌লেন। ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোয়, শিবলিঙ্গে অধিরূঢ় সাদাদাড়ী ফকীরবাবাকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছিল। ঝড় উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এমন সময় এক হিন্দু চাষা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তার পা'ময় কাদা, সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরছে। মন্দিরে নূতন দেবতা অধিষ্ঠিত দেখে সে ভয়ে অভিভূত হ'য়ে গেল। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোনমতে নিজেকে ঝড়ের ঝাপটা হ'তে বাঁচাতে লাগল। ফকীর কিছু বল্লেন না বটে, কিন্তু দেবতার দয়া হ'ল না। মূর্ত্তির ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ হ'ল, "মোল্লা বাবা, একবার পা-টা সরাও ত, হিন্দু ব্যাটার ঘাড়টা মটকে দিই। ব্যাটা ছোটলোক, তুমি কাদা পায়ে নোংরা কাপড়ে মন্দিরে ঢোক ?" তারপর কি হ'ল শুনি নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

পথের পাঁচালী

De jour en jour l'art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réatité extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre non pas ce qu'il rêve, mais ce qu'it voit. Cependant c'est un bonheur de rêver, et c'était une gloire d'exprimer ce qu'on voit.

বাস্তবেরে নমি'—ধীরে শিল্পের গৌরব করে ক্ষুণ্ণ রূপকার ;
যাচে না ত চিত্রী হায় ! রূপায়িতে স্বর্ণদেহে স্বপন তাহার !
আকাঙ্ক্ষে চিত্রিতে মূঢ়—শুধু দৃশ্যমানে, ভুলে—আনন্দ পরম
রাজে স্বপ্নলোকে,—যারে মূর্ত্তি দানি' লভে শিল্পী কীর্ত্তি নিরুপম।

Curiosités Esthétiques . . . . . Baudelaire.

(খোলা চিঠি)

শ্রীসোমনাথ মৈত্র প্রিয়বরেষু—

আজ "পথের পাঁচালী" নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আনন্দ করব। কারণ ? কারণ এতে রসের সরসতা বিচিত্রতর হ'য়ে ওঠে। ভেবে দেখ, তা যদি না উঠ্‌ত তবে সমসাময়িকদের মধ্যে "সমানধর্ম্মী"-কে না পেলে কি দরদীর জন্যে কবিকে "নিরবধি কালে"-র দোহাই পাড়তে হ'ত, না "বিপুলা পৃথ্বীর" কাছে হাত পাততে হ'ত ?

আর বিশেষ ক'রে তোমার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আনন্দ করতে চাওয়ার কারণ, প্রথমতঃ ওই বইটি প'ড়ে আমার মতন তুমিও মুগ্ধ হয়েছ, ও দ্বিতীয়তঃ তুমি হচ্ছ সেই শ্রেণীর দরদী যার দেখা সব দেশেই কম মেলে, অর্থাৎ—রসিকসুজন। তাই-না, কি গানের রসগ্রহণে, কি কাব্যরসাস্বাদনে, কি প্রকৃতির উপভোগে—তুমি চাও শুধু সেই বস্তুরই সাক্ষাৎকার যা কম লোকেই প্রবুদ্ধভাবে চায়—অর্থাৎ ঐ 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য' রসের। এমন মানুষের কাছেই হৃদয়-দুয়ার খুলে আনন্দ আছে যে সত্য রসম্রিতা, যে মেকিতে ভোলে না, যে নতুন কিছু দেখ্‌লেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে না—যদি না তার মধ্যে ঐ রসবস্তুর দেখা পায়। কে না জানে বল যে সব দেশেই একদল তথাকথিত সমালোচক আছেন যাঁরা নতুন কিছু দেখ্‌লেই গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠেন, বলেন "ওরিজিন্যাল !"—সুতরাং "ক্যাপিটাল !! ওয়ণ্ডরফুল !!!" এঁদের মনস্তত্ত্ব কী রকম ? না, শিশুর। শিশু প্রতিপদে চমককেই ভাবে জীবনের সর্ব্বোত্তম রস, নিত্য সুন্দরকে ভুলে বরণমালা দেয় বিস্ময়োদ্দীপককে। তুমি জানো ওস্তাদি গানের অধিকাংশ ভক্তই ওস্তাদির এই 'প্লীহাচমকপ্রদ' গুণকেই রাগশিল্প ব'লে ভুল ক'রে থাকেন।

সাহিত্যেও তাই। শুধু সাহিত্যে কেন, সব ললিতশিল্পেই তাই। রোমহর্ষণকে পুলকোচ্ছ্বাস ব'লে ঠিকে-ভুল-করাটা হচ্ছে মানবমনের একটা চিরন্তন দুর্ব্বলতা—অনভিজ্ঞের শাশ্বত পাথেয়। বদ্‌লেয়ার এই শ্রেণীর চমকপ্রদ শিল্পীদের পরে বেশ একটি কটাক্ষ ক'রেছেন—"Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est tonjours beau"। * এবং এ ধরণের হসনীয় কথা বেরোয় কেবল তাঁদের মুখ থেকে যাঁরা বিস্ময়ের আতিশয্যে চট ক'রে ভুলে যান যে, শুধু ওরিজিন্যালিটির চমক রসসভার ছাড়পত্র হ'তে পারে না—ওরিজিন্যালিটির লক্ষ গুণ সত্বেও না।

কিন্তু সে যাক্‌গে। আমার এ চিঠি তোমাকে লেখার প্রধান কারণ এই যে, তুমি এই দলের লোক নও, তোমার রসিক মনের খাঁটি নিকষ-পাথরে উত্তেজনার লম্ফঝম্ফ দাগটিও ফেল্‌তে পারে না। তোমার সুকুমার হৃদয়টি শ্রদ্ধাপ্রবণ—অথচ অপাত্রে শ্রদ্ধার নির্ম্মাল্য দিয়ে দেবতার ও অর্ঘ্যের অপমান করে না। কিছুদিন আগে শ্রীমতী আশালতা 'উত্তরা'য় মধ্যবর্ত্তিনী ব'লে একটি প্রবন্ধে বড় সুন্দর ক'রে লিখেছিলেন যে, এই শ্রেণীর গ্রহীতা একদিক দিয়ে স্রষ্টাও—যেহেতু তিনি স্রষ্টার সৃষ্টিশক্তিকে নিত্যনিয়ত উদ্বুদ্ধ করেন।

তুমি লিখেছ "পথের পাঁচালীর মতন বই বাংলা ভাষায় ক'টাই বা আছে?" খুব সত্য কথা। আমার বার বার মনে হ'য়েছে যে, বর্ত্তমান তরুণ যুগে যে কয়খানি কাব্যে সত্যই স্থায়ী রস ফুটে উঠেছে তাদের মধ্যে "পথের পাঁচালী" ও "বন্দীর বন্দনা"-র স্থান খুব উচ্চে। † কারণ এ দুটি কাব্যের মূল প্রেরণাটির উদ্ভব সত্য রসানুভূতি হ'তে—সৃষ্টির আনন্দ হ'তে—সাময়িকতার উত্তেজনা হ'তে না। গোড়ায়ই বদ্‌লেয়ারের যে-কথাটি উদ্ধৃত ক'রেছি "পথের পাঁচালী" পড়তে পড়তে মনে হয় না কি সে কথাটি কত সত্য? মনে হয় না কি যে কবি যখন বাস্তব নিপুণ দৃষ্টির সঙ্গে 'অবাস্তব' স্বপ্নকায়ার আভাস দিতে সক্ষম হ'ন কেবল তখনই তাঁর সৃষ্টি নিবিড়তম রসসৃষ্টি করে? মানবমনের চিরন্তন অভীপ্সা (aspiration) :—

"উধাও আগ্রহভরে উর্দ্ধ নভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্র-সভায়" ‡

---

* সুন্দর বিস্ময়োদ্দীপক ব'লে একথা বলা হসনীয় যে বিস্ময়োদ্দীপক মাত্রেই সুন্দর।

† অবশ্য "বন্দীর বন্দনা"র সব কবিতাগুলিই সমশ্রেণীর নয়। কিন্তু ক'টা কাব্যপুস্তকের নাম করতে পার যার সব কবিতাগুলিই রসোত্তীর্ণ?

‡ বন্দীর বন্দনা—বুদ্ধদেব বসু।

"পথের পাঁচালী"-র পাতায় পাতায় এই নভোপিপাসা, স্বপ্নাবেশের দেখা পাই। পাঠকের চোখের সাম্‌নে চিত্রের পর চিত্র, রেখার পর রেখা, রঙের পর রঙ ফুটে ওঠে তাদের অন্তর্লীন আনন্দঘন রসটি নিয়ে—পুলক-বেদনায়, আশা-নিরাশায়, হাসি-অশ্রুতে সলীল হ'য়ে শ্যামল হ'য়ে মেদুর হ'য়ে। আর রসিক মন কৃতজ্ঞ অন্তরে শিল্পীর সোনার কাটিকে অভিবাদন করে—যার স্পর্শে পাতালপুরীর সুপ্ত রাজকন্যা জেগে ওঠে, তুচ্ছ সার্থক হ'য়ে ফুটে ওঠে, মর-স্পন্দন কালজয়ী নীলিমার বর্ণে দীপ্ত হ'য়ে ভেসে ওঠে। ওঠে—কেননা "পথের পাঁচলী"-র কবি শিল্পী, রূপকার, ছন্দকৌশলী।

বস্তুতঃ "পথের পাঁচালী" পড়তে না পড়তে সব আগে মন মুগ্ধ হয় গ্রন্থকারের গদ্যের মধ্যে এই কাব্যরসে—এই ছন্দে। প্রথম সংখ্যার "পরিচয়"-এ শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ললিত গদ্য পদ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ভাষার ক্রমবিকাশে ছন্দের স্থান সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত কথা লিখেছেন। তাঁর বক্তব্যটি আর একটু স্ফুট ক'রে তুল্‌লে তিনি ভাল করতেন, কিন্তু তা না করলেও তাঁর গোড়াকার কথাটি যে সত্য তা রসিক মাত্রেই অনুভব করতে বাধ্য। একথাটা সংক্ষেপে একটু বলি আগে, বিশেষ যখন "পথের পাঁচালী" পড়তে পড়তে মনে বেশি ক'রেই উদয় হয় এর সত্যতা। কথাটা এই যে, সাহিত্যের রস অপেক্ষা রাখে শুধু ভাবের বা চিন্তার নয়—ছন্দেরও। ছন্দ বল্‌তে আমরা প্রায়ই গোলমাল ক'রে ফেলি—তার বাহ্য বাহনটিকেই একান্ত ক'রে দেখি। অর্থাৎ ছন্দ বল্‌তে আমাদের মনে সর্ব্বাগ্রেই জাগে metre এর-কথা। ইংরাজীতে metre ও rhythm দুটো আলাদা কথা আছে। ছন্দের গভীরতম অর্থ—এই rhythm ; metre-এর আলাদা বাংলা নেই ব'লেই মনে হয়, তাই সাঙ্গীতিক পরিভাষায় ওকে "তাল" ব'লে অনুবাদ করাই বোধ হয় সবচেয়ে সুষ্ঠু হবে।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, ললিত-সৃষ্টিতে মানুষ প্রায়ই ছন্দের এই বাহ্য পাদপূরণকে—এই তালকে—একান্ত ক'রে দেখে ভুল ক'রে বসে। কিন্তু একটু গভীরভাবে প্রণিধান ক'রে দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তাল ললিত-সৃষ্টিকে সুগ্রথিত করলেও—সলীল করলেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তথা ললিত-সৃষ্টিতে "এহ বাহ্য"। মানে, তাল অনবদ্য হ'লেও তাতে ক'রে গানে বা কাব্যে ছন্দের অন্তর্গূঢ় সেই নিহিত কিঙ্কিণীটি, সেই গোপন কল্লোলটি না বেজে উঠ্‌তে পারে। ধ্বনির মধ্যে এই যে রলরোল, গতির মধ্যে এই যে কিঙ্কিণী, বাক্যবিন্যাশের মধ্যে এই যে নিগূঢ় উদাত্ত সমুদ্রগর্জ্জন এ ফুটে ওঠে কেবল ছন্দের নিবিড়তম অনুভূতিতে, দুর্ব্বার প্লাবনাসারে—তখন সৃষ্টি ওঠে রসঘন হ'য়ে—যাকে বলি—"জ'মে-ওঠা"। শ্রীঅরবিন্দ

সেদিন তাঁর একটি চিঠিতে ছন্দের এ অদৃশ্য ও দৃশ্যমান রূপের বড় সুন্দর আভাস দিয়েছেন—সংক্ষেপে। সেইটুকু উদ্ধৃত ক'রে এ ভূমিকার ইতি করি। শ্রীঅরবিন্দ লিখ্‌ছেন:

"There are two factors in poetic rhythm,—the technique (the variation of movement without spoiling the fundamental structure, right management of vowel and consonantal assonances and dissonances, the masterful combination of the musical element of stress with the less obvious element of quantity), and the secret soul of rhythm which uses but exceeds these things. The first you can learn, if you read with your ear always in a tapasya of vigilant attention to these constituents; but without the second what you achieve may be technically faultless and even skilful, but poetically a dead letter. This soul of rhythm can only be found by listening in to what is behind the music of words and sounds and things. You can get something of it by listening for that subtler element in great poetry, but mostly it must either grow or suddenly open in yourself."

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধে প্রথম সংখ্যার "পরিচয়ে" এই কথাটিই ব'লেছেন দু'একটি উদাহরণ দিয়ে। তাঁর মোট কথাটি (১) "কাব্যের শব্দ আবেগবাহী" ও (২) "আবেগপ্রবণ গদ্য আর কাব্য অভিন্নাত্মা"—খুবই সত্য কথা।)

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র ভাষার ছত্রে ছত্রে এই দুর্লভ "soul of rhythm"-এর ঝঙ্কার পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায়, এই অশ্রুত ছন্দের কান তাঁর তৈরী হ'য়ে গেছে। নিপুণ গায়ক যেমন জানেন কোন্ আবেগটি কী সুরে সব চেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে, কোথাও তিনি লাগান মিড়, কোথাও বিজ্‌লি-তান, কোথাও গম্ভীর গমক, কোথাও উদাত্ত স্বরস্থিতি,—'পথের পাঁচালী'র কবি-গায়কও তেম্‌নি জানেন কোথায় ভাষাকে কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অপূ বা দুর্গার কলকাকলি শুন্‌তে শুন্‌তে চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে শিশুর আত্মার সরল প্রাণকাড়া সৌন্দর্য্য; সর্ব্বজয়ার স্নেহ-আদর, বকুনি-ঝকুনি, আশা-আকাঙ্ক্ষা শুন্‌তে শুন্‌তে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে পল্লীগ্রামের নিরক্ষরা স্নেহশীলা জননীর স্নেহদুর্ব্বলতার সজল ছবি; তাঁর গলগ্রহ বৃদ্ধা ননদ ইন্দির ঠাক্‌রুণের মিনতি শুন্‌তে শুন্‌তে হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে আমাদের দেশের বিধবার গভীর অসহায়তায়; নদীঘাট, তরুলতা, ফুলফল, মাঠঝোপ, বনবাদাড়, ঝড়বৃষ্টি সবেরই চিত্রণের মধ্য দিয়ে ঝ'রে পড়তে থাকে—ঐ যে বল্‌লাম যেন গুণীর "সুরের সুরধুনী"—যিনি জানেন "কেমন ক'রে গান করতে হয়।" যেখানে যে-সুরের যে-মোচড়টি দরকার ঐ শোনো, ঠিক্ সময়ে সেইটি বাজছে, আর তার যথাযথ ওজন নিয়ে, ছন্দ নিয়ে, ব্যঞ্জনা নিয়ে;—এতটুকু বেশি না, এতটুকু কম না। বস্তুতঃ বইটির আদ্যন্ত সুরেলা—এতটুকু বেসুর কোথাও কানকে প্রতিহত করে না।

আর ততোধিক তুর্লভ দৃষ্টি!—পথের প্রতি বাঁকেই ত দেখার জিনিষের অফুরন্ত মেলা বিছিয়ে প্রকৃতিদেবী আবহমান কাল ডাক্‌ছেন আমাদের শিশুপ্রবৃত্তির সদাসজাগ কৌতূহলকে। কিন্তু সে নিমন্ত্রণে সাড়া দেয় ক'জন? দেখে ক'জন? যে-সব অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়ে অথচ চির অচেনাই থেকে যায় 'পথের পাঁচালী'র কবি তাদের নিকট-পরিচয়ের আনন্দেই আত্মহারা, সমীপ-স্পর্শেই বিভোর। ঘটনার জাঁকজমক, অভাবনীয়তার হৃৎস্তম্ভন, অবিশ্বাস্য নাটুকেপনা, সস্তা রোমহর্ষকতা —এসব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি কখনো। তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর জীবনের অকৃত্রিম বাণীটি সম্বন্ধে: "আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান্ নই। দৈনন্দিন ছোটো-খাটো সুখত্বঃখের মধ্যে দিয়ে যে-জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থরবেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চ'লেচে—আসল জিনিষটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো—প্যাঁচ্ কসা, কৃত্রিম 'সিটুয়েশন' তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হ'বে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি—শুধু টেক্‌নিকের বেসাতি হ'য়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না।"

অবশ্য কথাগুলির মধ্যে খানিকটা একদেশদর্শিতা যে নেই তা বলি না। জীবন জ্যামিতির সরলরেখায় চলে না, কোনো একটা মূলসূত্র দিয়ে তার ইতি করা যায় না। "বড় ঘটনা" "বড়" ব'লেই "কৃত্রিম" হবে কেন? জীবননাট্যের অঙ্কগুলি সব ত সমান নয়। তার সব খাদে, সব পরিখায়, সব ক্ষেত্রে একই "ছোটো-খাটো সুখত্বঃখের নদী" বইবে কেন? সেখানে কলস্বনা নদীও আছে—উত্তাল পারাবারও আছে, ছায়ানিরালা নীড়ও আছে—নিরাশ্রয় ধূ ধূ মরুও আছে, মলয়হিল্লোলও আছে—ভীষণ প্লাবনও আছে, "দৈনন্দিন" দিনগতপাপক্ষয়ও আছে—আবার সঙ্কটের বিশ্বরূপে "কালানলসন্নিভ" "দংষ্ট্রাকরাল"ও আছে। এই ধূলাবালির জীবনে শুধু স্বপ্নে-মগ্ন পৌরজনের ক্ষুদ্র ভাঙাগড়াই ত নেই, রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় এমন বুদ্ধও দেখা দেয়, যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এমন চৈতন্যও প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়ে যান। প্রতি মানুষের মধ্যেই একজন বীর আছে—তুরাশী আছে—দিগ্বিজয়ী আছে। কাজেই "আসল জিনিষটা" শুধু যে "প্রতিদিনের অমূল্য দানের" মধ্যেই উপ্ত, বিপুল তুরভিসারের মধ্যে নয়—সর্ব্বত্যাগী অসীমাশের মধ্যে নয় একথা বল্‌লে জীবনকে একটু ছোট ক'রে দেখা হয়। কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে, বিভূতিভূষণ একটা গভীর সত্যের পরিচয় পেয়েছেন তাঁর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। সে-

উপলব্ধি এই যে, জীবনে তুচ্ছতমের মধ্যেও সেই "মাধ্বী-ধারা" প্রবহমান যার বারতা ঋগ্বেদের ঋষিরা তাঁদের প্রতি ঋকে বহন ক'রে এনেছেন। অবশ্য বলাই বেশি যে, নিতান্ত একঘেয়ে আটপৌরে ঘটনাবলীর মধ্যেও এই অন্তঃসলিলা "মাধ্বী-ধারা"র হদিশ পেতে হ'লে চাই বিধাতার কৃপা, বাণীর অঞ্জন, মহেশের তৃতীয় নয়ন। কিন্তু তা ব'লে বলা চলে না যে, এ তৃতীয় নয়নে মানুষ যে-স্বপ্নসত্যের স্পর্শ পায় তা কবিকল্পনা, অলীক। "পথের পাঁচালী"-র প্রতি পৃষ্ঠায় মেলে এর পরিচয়। কবির দেখার ভঙ্গী ও আঁকার নৈপুণ্যে প্রতিপদে মনটা ভ'রে ওঠে। আর বিশেষ ক'রে আনন্দ হয় দেখে যে "পথের পাঁচালী"র কবি অনাড়ম্বর সহজ বিকাশের পথ ধ'রেই চ'লেছেন—তাঁর আন্তরিকতার মুগ্ধকর আবেদনটিকে মাঝপথে জলাঞ্জলি দেন নি, কুশ্রী মৌলিকতার প্রাপ্য সস্তা অর্ঘ্যে প্রলুব্ধ হ'ন নি। থ্যাকারে তাঁর অপূর্ব্ব উপন্যাস "পেন্‌ডেনিসের" ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি যা জানেন তারই বর্ণনা করেছেন, সত্য কথাই বল্‌তে চেয়েছেন,—অভাবনীয় যোগাযোগের বাহ্বাস্ফোটে পাঁচজনের তাক্ লাগাতে যান নি। "পথের পাঁচালী"র চারণকবিও ঠিক এই কথা কয়টি তাঁর ভূমিকায় গর্ব্ব ক'রেই বল্‌তে পারতেন।—তিনি যাকে তাঁর সমগ্র চেতনা দিয়ে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন, ও সে ভালোবাসার স্নিগ্ধ অঞ্জনে মেদুররূপে দেখেছেন—নিত্য-নতুন ঢঙে, নিত্য-নতুন রঙে, নিত্য-নতুন আবেশবিহ্বলতায়—তার বেদিকামূলেই তিনি বার বার তাঁর প্রাণের নৈবেদ্য বিছিয়েছেন, সুন্দরকেই দিয়েছেন বরণমালা, দরদকেই ক'রে চ'লেছেন তাঁর পাথেয়। উদাত্ত তারকাঙ্কিত আকাশ, নদীর উচ্ছল উল্লোল, উষার স্মিত শিশিরস্নিগ্ধ হাসি, অস্তগোধূলির ম্লান বিদায়-মৌন চাহনি—এই সবেকেই তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর আরতিপাত্রের অর্ঘ্যরূপে, তাঁর ধূপাধারের ধূপরূপে, তাঁর মানসী-প্রতিমার উপচাররূপে। গ্লানির মাদকতা, ক্লেদের উত্তেজনা, আবর্জ্জনার প্রলোভন তাঁকে দলে টান্‌তে পারে নি। সে-বাস্তবতাকে তিনি প্রশ্রয় দিন নি যে-বাস্তবতা "subjects man's life and psychology to the scalpel and the microscope, exaggerates all that strikes the outward view of him, his littlenesses, imperfections, uglinesses, morbidities and comes easily to regard these things as the whole or greater part of him and to treate life as if it were a psychological and physiological disease, a fungoid growth upon material nature।"* বিভূতিভূষণ মানুষের

*The Future Poetry.

ক্ষুদ্রতাকে কোথাও ভোলেন নি, নানা ছন্দে তারই ধুয়ায় ফিরে এসে কর্কশ বাস্তবতার জয়গান করেন নি। তিনি জানেন যে, এ-ধরণের বিজ্ঞম্মন্য দার্শনিকতা "falsifies the true measure of the ideal, which is a part of the totality of human life and nature, by bringing the idealism in man down to the level of his normal daily littlenesses।* "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"-তে অপূর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আকাশকুসুম স্বপ্নভঙ্গ, ভাঙা-গড়া, কল্পনা-কুহক দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয় যে লেখক জানেন—"the truth of the ideal consists essentially in its aspiration beyond the limitations of its immediate actuality, in what our strain towards self-exceeding figures, and not in the moment's failure to accomplish।* মনে হয় ভাগ্‌নারের বাণী ঃ "আর্টে আমরা সেই স্বপ্নই খুঁজি—যা জীবনে পদে পদে ভঙ্গ হয়—ব্যর্থ হয় —লুণ্ঠিত হয়।" † মনে হয় কবির অপরাজেয় আত্মসম্মান যেন গেয়ে চলেছে—

> Thoughts hardly to be packed
> Into a narrow act,
> Fancies that broke through language and escaped,
> All I could never be,
> All men ignored in me,
> This was I worth to God whose wheel the pitcher shaped.

বইখানি পড়তে পড়তে আর-একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। সেটা এই যে, ওরিজিন্যালিটির ভূত যাদের ঘাড়ে না চাপে তারাই সত্য ওরিজিন্যাল হ'তে জানে—ওরিজিন্যাল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা যার সে হ'য়ে উঠতে পারে কেবল—উৎকট। মনে হয়, ওরিজিন্যালিটি-বস্তুটি মিষ্টি হাসির মতন ; —আপনা থেকে ফুটে উঠ্‌লে তবেই সে প্রাণ কাড়ে, চেষ্টা ক'রে যারা মিষ্টি হাসে তাদেরই বলে ককেট্‌।

প্রমাণ—শিশুর চোখে জগতকে দেখার এ-ধরণের বই বাংলাভাষায় কখনো পড়া যায় নি। এক রোলাঁর জন ক্রিশ্‌টফারে অনেকটা এই ধরণের রস পাওয়া যায়। দৃশ্যের পর দৃশ্য প্রবর্দ্ধমান বালকের সাম্‌নে দিয়ে অভিনীত হ'য়ে যাচ্ছে আর তাকে পথচলায় একটু একটু ক'রে এগিয়ে দিচ্ছে। কবি নিজে পিছনেই র'য়েছেন, জগৎকে শিশুর চোখে দেখেই তিনি ক্ষান্ত। টেক্‌নিকটি অবশ্য নতুন নয়—কিন্তু যেভাবে তিনি বালক অপূ ও বালিকা দুর্গার চোখ দিয়ে গ্রামকে দেখেছেন তার প্রতি তুলিপাতে

*The Future Poetry. †Musiciens d'Autrefois—Rolland. ‡Browning.

তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতেই হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলাই ভালো, ফুল ছিঁড়ে বাগানের সৌন্দর্য্য দেখাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবু দু'একটি দৃষ্টান্ত না দিয়েই পারছি না।

"এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে; ঠিক্ দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছেব মাথার উপর হইতে গাঙ চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত ছোটো খাটো দুঃখসুখ শান্তিদ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে শরৎমধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা নীলনির্জ্জন আকাশ-পথে এক উদাস গৃহবিরাগী পথিকদেবতার সুকণ্ঠেব অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।"

আর একটি ছবি ঃ

"উত্তর মাঠের কলা-বেগুনেব ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, কেউ থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত বসতিশূন্য অজানা দেশে। চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনামুগ্ধ অবোধ বালকেব উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্দ্ধমান উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

"তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভবিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবন-শীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায় ডালে-পাতায় চিক্ চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্তে ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়ত এক ঝলক হাওয়া সোঁদালিব ডাল দুলাইয়া তেলাকুচো ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া চলিয়া যায়।"

আশ্চর্য্য এই যে, লেখক এ-রকম সবল দীপ্ত ভাষার জের টেনে চলেছেন বইখানির গোড়া থেকে শেষ অবধি। কৃতী লেখকমাত্রেরই লেখার মাঝে মাঝে দীপ্তি ফুটে ওঠে—কিন্তু সে-দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য এ-রকম সমান তালে বজায় রেখে চলা সম্ভব কেবল সত্য শিল্পীর পক্ষে। আমি উদ্ধৃতাংশ ক'টি বেছে নিয়েছি খেয়ালমত বইটির যে-কোনো পাতা উল্টে—খুঁজে পেতে না। উপন্যাসটির আদ্যোপান্ত এই শ্রেণীর মনোজ্ঞ বর্ণনা "সূত্রে মণিগণা ইব" গাঁথা। কখনও সে-মণিমালা মৃদুহাস্যে মধুর, কখনও অশ্রুতে সজল, কখনও প্রশান্তিতে স্তব্ধ, কখনো উদাস দীর্ঘশ্বাসে নিষিক্ত। বীণাপাণির বীণার অনাবিল সুর যেন লেখকের হৃদয়ের তারে তারে অধীর আগ্রহে ঘা দিয়েছে—এম্‌নিই সরল, এম্‌নিই প্রশান্ত, এম্‌নি স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাঁর নিসর্গচিত্র! ("অপরাজিতে" মধ্যভারতের বন্যশোভা চিত্রণে লেখকের

এ-নিসর্গচিত্র আরও উদাত্ত আরও অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। কী গম্ভীর দৃষ্টি সে! কী স্বপ্নময়! অথচ কী বাস্তব! প্রতি কাঁকরটি অবধি ফুটে উঠেছে—কবি তাকে সমগ্র চেতনা দিয়ে দেখ্‌তে পেরেছেন ব'লে।)

আর আশ্চর্য্য এই যে, এ-ধরণের গ্রাম্য বর্ণনা বইখানির মধ্যে অজস্র সম্ভারে ঢেলে দেওয়া সত্ত্বেও কোথাও একঘেয়ে মনে হয় না। কোথাও মনে হয় না লেখক বর্ণনার জন্যেই বর্ণনা কর্‌তে চেয়েছেন। মনে হয় তাঁর স্বপ্নাবিষ্ট চোখের সাম্‌নে যেন বাণীর ছায়া-অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ছবির পর ছবি ভেসে উঠ্‌ছে আর তিনি স্রষ্টার তুলি দিয়ে সেগুলিকে একের পর এক ফুটিয়ে তুলেছেন। আর কী অজস্র ছবি! কী অফুরন্ত সম্ভার!

Art conceals art কথাটি যে কত সত্য তা 'পথের পাঁচালী'র ছত্রে ছত্রে দীপ্ত হ'য়ে প্রমাণ হয়েছে যেন। শুধু একবার ক'রে অঙ্কনীয় বিষয়টির দিকে তাকানোর অপেক্ষা। তারপর দুটো আঁচড়—তিনটে ফুট্‌কি—একটু chiaroscuro অম্‌নি সমগ্র ছবিটা ফুটে ওঠে। মনে বিস্ময় লাগে! প্রশ্ন জাগে—দুটো রেখায়, একটুখানি আলোছায়ায়, কয়েকটি বিন্দুতে একটা পূর্ণ ছবিকে এমন ভাবে মূর্ত্ত করে শিল্পী কোন্ যাদুতে!··· আর শুধু কি ছবি! শুধু কি মানুষটা। তার হাস্‌বার বিচিত্র ভঙ্গীটুকু, তার ঠোঁটের আব্‌ছা কুঞ্চনটুকু, তার ললাটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিরেখাটি—সমস্তই কি এমন ভাবে ধরা প'ড়ে যায়! যে অতি-পরিচিতকে সাদাচোখে নিত্যই দেখেছি অথচ কখনো ভুলেও তিলার্দ্ধ অসাধারণ ঠেকে নি, দুটি আখরেই কি সে হ'য়ে ওঠে গন্ধর্ব্বকুমারের চেয়েও চিত্তাকর্ষী, অচিন্তনীয়তম যোগাযোগের চেয়েও চিত্তহরা! সাধে কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতন গুণী 'পথের পাঁচালী'র "উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি" ক'রেছেন!

দুর্গা ও অপুর যা যা ভাল লাগে যা নিয়ে তাদের সমস্ত জীবন—গ্রাম্য বনস্থলীর সে-ছবিটি ত সকলেই চল্‌তে ফির্‌তে দেখেছেন। কিন্তু এমন ক'রে দেখেছেন কয়জন? গুহার মধ্যে দিনের আলোয় ছায়ান্ধকার কার না চোখে প'ড়েছে? কিন্তু তার মধ্যে হিমালয়ের আশ্রয়দান-গৌরব কল্পনা কর্‌তে পারে কে? বল্‌তে পারে—

> দিবাকরা দ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
> ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাংসতীব ?*

মেঘ কে না দেখে প্রতিদিন? কিন্তু তার নীলাভায় নীলাঞ্জন পর্‌তে পারে ক'জন? বল্‌তে পারে—

> "নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে নয়নে লেগেছে।"

---

* গুহালীন ভীত আঁধারে দিবায় দিবাকর হ'তে বাঁচান নিতি;
আশ্রিত সৎ-অসতে সমান মমতা—মহদাশয়েরি রীতি। (কুমারসম্ভব)

বুল্‌বুলের গান কে না শুনে? কিন্তু তার স্বরলহরীতে কার নয়নে ঢেউ তোলে ঃ—

> Charm'd magic casements, opening on the foam
> Of perilous seas, in faery lands forlorn? †

প্রকৃতির তুচ্ছতম দৃশ্যের মধ্যেও ছবি দেখার, গান শোনার, মধুস্বাদের এ-পরিচয় "পথের পাঁচালী"র ছত্রে ছত্রে মেলে।

ধর—"চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার ঝুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধ পোড়া কটা দুর্ব্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জ্জন······নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা। ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ······(শিশু দুটির) বড় ভাল লাগে।"

শুধু কি এই দুটি শিশুরই ভাল লাগে? সে "স্নিগ্ধ হাওয়া" সে "হাল্‌কা আনন্দভরা দিনগুলি"-তে আকস্মিক খুসির বার্ত্তা কি শুধু এই গ্রামশিশু দুটিরই মনে পৌঁছিয়ে দেয়? পাঠকও কি তাদের এ সহজ অনাবিল আনন্দ-ঐশ্বর্য্যের সরিক না হ'য়ে পারেন? পাঠক যখন শোনেন যে বালিকা "দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতি-পরিচিত গ্রামের অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁক্‌ড়াইয়া ধরিতেছে;" যখন শোনেন "আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে;" যখন শোনেন দুর্গার ছোট্ট ভাইটি "অপূ—তাহার সোনার খোকা ভাইটি—যাহাকে একবেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূরে চলিয়া যাইবে!"—তখন তাঁর মনটাও কি হু-হু ক'রে ওঠে না? দুর্গা কোথায়—কোন্ দেশে যাবে কল্পনা ক'রে? এই সামান্য গ্রাম্য বালিকার "আসন্ন বিরহের বিষাদে" তাঁর নিজের চোখদুটিও কি অশ্রু-আভাসে সাড়া দেয় না? "ছায়াভরা নদীর ঘাটটিকে···পরিচিত গ্রামটির অন্ধিসন্ধিকে" কি তিনিও এই বন্য হরিণীর মতন আঁকড়ে ধরেন না? ইচ্ছা জাগে না তার কাছে গিয়ে তাকে শুধাতে—কার জন্যে তার ছোট্ট বুকে এত বেদনা, এত মধু, কার তরে তার এই অতৃপ্ত স্নেহতৃষ্ণা? হৃদয়ের তারে তার জন্যে এই সান্ত্বনাটি কি বেজে ওঠে না ঃ "ওগো ছোট্ট মেয়েটি, এ জীবনের ভিড়ে নাম-না-জানা ভয়েও ত তুমি একলা নও। আমরা যে এ পান্থ-শালায় প্রত্যেকেই তোমার সুখে সুখী, খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী। মনে কি নেই তোমার যে তোমাদের বেগুনপোড়া ও অর্দ্ধপক্ক অন্নের চড়ুই ভাতিতে আমরাও তোমার সঙ্গে নিত্যই পাত পাতি? জান না

† Ode to a Nightingale—Keats.

কি যে তোমার টোক্‌লা মাথায় বাঁশবন ঝোপঝাড় কুলগাছ আমের গুটির অভিসারে আমরাও তোমার নিত্য-সঙ্গী, নিত্য-অভিসারী? তোমার গাব পাড়া, নোনা আনা, বেগুনবীচি জড় করা, নিত্য "মিষ্টি যেন গুড়" কামরাঙা পাকার খবর রাখা, সেজদির বাগান থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিতাড়িত হ'য়ে অপুকে ভরসা দিয়ে অন্যত্র ঝোড়ো আম কুড়ুতে চলা, লোভে প'ড়ে সোনার সিঁদুরকৌটো চুরি ক'রে দেয়ালে মাথাঠুকুনি খেয়ে রক্তপাত হওয়া, সহুরে যুবক নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পূজোর সময় নিরালায় বালিকা-হৃদয়ে তাকেই কামনা করা, বর্ষায় জলভরা ঘরে সিক্ত বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরের মধ্যেও রেলগাড়ীর স্বপ্ন দেখা,—শেষটায় কুঁড়িতেই ঝ'রে যাওয়া—ওসবেই যে আমরাও তোমার চিরসাথী! কে বলে তুমি এক্‌লা? কে বলে—তুমি অকালে ঝ'রে গেছ? তুমি যে সমাপ্তিহীন ঝঙ্কারে অণুক্ষণ বাজো আমাদের স্মৃতিবীণার তারে। বিশ্বের যেখানেই দরদীর ছোট্ট দরদটুকু ধুক্ ধুক্ করে, যেখানেই স্নেহের ছোট্ট উত্তাপটুকু স্পন্দিত হয়, যেখানেই শান্তির ছোট্ট পিদিমখানি নিরালা আশ্রয়ের মধ্যে স্নিগ্ধ আলো বিছিয়ে দেয়, সেখানে যে সব মানুষেরই প্রবেশ অধিকার। সেখানে যে আমরা সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। যা কিছু ফোটে, চিরদিনের জন্যেই ফোটে না কি? গন্ধ বর্ণ রেশ তরঙ্গ মিলিয়ে যায়—কিন্তু লোপ পায় কে বলে? লক্ষ যোজন দূরের তারার একটি সূক্ষ্ম রশ্মিও পথহারা হয় না—বৃত্তাকারে ফিরে আসে। শুধু যে-চেতনায় সব আলো অনুস্যূত, সব গান গাঁথা, সব ছবি আঁকা, সব স্বপ্ন বোনা সেই চেতনাই মর—সান্ত? কবি জানেন যে এ হ'তে পারে না। মনস্বী সুকবি মোহিতলাল সেদিন আমাকে একটি চিঠিতে যথার্থই লিখেছেন যে—"বিভূতিভূষণের কল্পনার মূলে আছে সৃষ্টির প্রাণলীলার অসীম রহস্যে আত্মহারা শিশু-মানবের সুস্থ অনুভূতি,—দারিদ্র্য শোক তাপ এমন কি মৃত্যুবিভীষিকাও যে জীবনানন্দকে দমন করতে পারে না—সেই 'অপরাজিত' হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বস্তুর সচেতনা; অসীম কৌতূহল, যাপ্য রূপপিপাসা। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যেন শক্তিপরীক্ষা চ'লেছে—বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, দুঃখের সঙ্গে আনন্দের। একটি আত্মনির্লিপ্ত বা আত্মহারা রসচৈতন্য নিয়তির ওপরেও জয়ী হচ্ছে। সর্ব্বস্ব হারিয়েও চিত্ত-গহনের কোনখান থেকে নিরন্তর সান্ত্বনা কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।"*

এই সূত্রে "পথের পাঁচালী"র কবি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিহৃদয়ের আর-একটি নিবিড়তম অনুরাগ—তাঁর গ্রামপ্রীতি।

* লেখককে লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

গ্রামের জীবনকে কবি হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছেন। গ্রামের আনাচে কানাচে তাঁর পরিচিত। আর কী নিবিড় সে পরিচয়! গাছপালা, লতাপাতা, ফলফুল, ঝোপঝাপ, তৃণশষ্প প্রতিটির সূক্ষ্মতম আকৃতিটিও তাঁর চেনা। তাদের মৃদুতম হাসিটিও তাঁর রক্তে দোলা দেয়। তাদের প্রতি কটাক্ষ, প্রতি ইঙ্গিত, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে তিনি সাড়া দিতে জানেন। এক প্রেমিকই প্রেমাস্পদকে এভাবে "হাজাররূপে দেখে বারে বারে।" তাই গ্রাম্যলক্ষ্মী তাঁর দয়িতা, ঋতুচক্রে বনশ্রীর চিরপুরাতন উৎসব তাঁর চোখে চিরনূতন; তাই এ জৈবলীলার সাঙ্গহীন আলোছায়া তাঁর প্রাণতটে চির-কল্লোলময়ী; তাই একই দৈনন্দিন একটানা জীবন তাঁর কানে কানে কথা কয়—নিতুই নব আগমনী শুনিয়ে। অতি তুচ্ছ তৃণাঞ্চিত মাঠও তাঁর কাছে নগণ্য নয়, অতি সামান্য ঘটনাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর নয়, অতি একঘেয়ে ব্যাপারও তাঁর কাছে সাদামাটা নয়। জীবনের প্রতি বর্ণের সূক্ষ্মতম তন্তুও তাঁর কাছে অনন্ত রহস্যময়—দুর্ভেদ্য। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই কবি গেয়ে ওঠেন "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!" এ সম্ভব হ'য়েছে শুধু এই জন্যে যে, দ্রষ্টার তৃতীয় নয়ন বিভূতিভূষণের সহজাত। তাই তীব্র বেদনার মধ্যেও তাঁর অনুভূতি কখনো মুহূর্ত্তের জন্যেও ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়নি—গভীর শোকের মধ্যেও তিনি কখনো উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি করেন নি—নিবিড় নিরাশার মধ্যেও বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গান নি। কারণ তিনি যে কবি—ভুল্‌বেন কেমন ক'রে যে কবির বাণী সস্তা হাহুতাশ নয়। কেঁদে করুণা জাগাতে চায় সেই যার অন্য সম্বল নেই। যার হাতের তার নেই সেই বেশি মশ্‌লার কাঙাল।

সত্য সংযমে অদ্বিতীয় শরৎচন্দ্রের পরে এ-শ্রেণীর লিপি-সংযম, এ-শ্রেণীর ওজনজ্ঞান বড় একটা চোখে পড়ে না। যা সাময়িক তাকে বিভূতিভূষণ কোথাও উচ্ছ্বাসের কুয়াশা দিয়ে চিরন্তন দাঁড় করাতে ছোটেন নি, যা অবশ্যম্ভাবী তার দিকে কখনো বিজ্ঞ সিনিসিজিম্‌-এর সস্তা বাণ নিক্ষেপ করেন নি, যা রুদ্র তাকে নিয়ে থেকে থেকে বুক চাপ্‌ড়ে হাহাকার করেন নি। তাঁর সমস্ত কারুণ্য, অনুকম্পা, ব্যথা, দরদ তিনি মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন, ছোট ছোট পেলব রেখাপাতে। তিনি ছবি এঁকে গেছেন, সুর বুনে গেছেন, গান গেয়ে গেছেন। আর যেটা সব চেয়ে স্পর্শ করে সেটা এই যে, এ গান আসক্তির গান নয়—অনাসক্তির গান; ঘরের গান নয়—পথের গান; অচলায়তনের গান নয়—চলার গান। জীবন যে চলচঞ্চল, গতি-উচ্ছল, আনন্দ-বেদনা-হাসি-অশ্রু-ছলছল, মায়ারসে অভিষিক্ত সেই রসই কবির পথের একমাত্র পাথেয়। সেই ছন্দেই কবির গীতিকাব্য আদ্যন্ত গ্রথিত। তাই দার্শনিক তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনে অনেক স্থলে কবির লিপিদৌর্ব্বল্য প্রকাশ

পেলেও—(এইখানেই তাঁর একমাত্র গুরুতর দৌর্ব্বল্য)—রস-পরিবেষণের সময় তাঁর কবিদৃষ্টি কখনো ব্যাহত হয় নি। আর মুগ্ধ করে তাঁর অনুপম আন্তরিকতা। তিনি যা বুকের দরদ দিয়ে দেখেছেন তাই এঁকেছেন, কোথাও বিজ্ঞম্মন্যতার খধূপমোহে শূন্যবাদে পথহারা হ'ন নি। এক কথায়, তাঁর রচনাটি হ'য়ে উঠেছে একটি সৃষ্টি—গদ্যকাব্য, ছন্দে, রূপে, রসে, কারুণ্যে, মৃদুহাস্যে, সংযত অশ্রুতে—বিচিত্র সমগ্রতায়।

বলেছি, বইটি আদ্যন্ত লেখা—শিশুর দৃষ্টিতে। প্রথমে বালিকা দুর্গা ও পরে তার প্রিয়দর্শন ছোট্ট ভাই অপুর চোখ দিয়ে সংসারটাকে দেখা। এদিক্ দিয়ে—অর্থাৎ শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়ে ঠিক্ ওরিজিন্যালিটি যাকে বলে তার হয়ত তিনি দাবী করতে পারেন না। রোলাঁর বালক ক্রিস্‌টফারের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ হয়ত বেশি ওরিজিন্যাল, নিপুণ ও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মাতার ও শিশুর মন সম্বন্ধে হয়ত বেশি গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি প্রকৃতি-চিত্রণেও বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয় নন্। রবীন্দ্রনাথের "ছিন্ন পত্রের" নানা বর্ণনা সূক্ষ্মতায়, দার্শনিকতায়, উপমায়, কারুকার্য্যে ও চিন্তার প্রসারে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চিত্রণের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে অন্ধকার, নদী, ঝড়, নৌকাচিত্র, শ্মশানের গল্প প্রভৃতি নানা বর্ণনা, তাঁর অপূর্ব্ব বর্ণনভঙ্গী, সংযম ও সংহত গাম্ভীর্য্যের পটভূমিকার পরে 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতি-বর্ণনার চেয়ে গরীয়ান্ হ'য়ে ফুটেছে। কিন্তু যেখানে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা অন্য কারুর চেয়েই ছোট না সেটা হচ্ছে গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাঁর দরদ। রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন—কিন্তু তার মূলে আছে তাঁর বিপুল কবিকল্পনা। দিগন্তপ্রসারী তাঁর কবিদৃষ্টি। রবি শশী তারা, মেঘ জল মাটি, ফল ফুল লতা, নদী চর বন—সবই তাঁকে বিশ্বোৎসবের বিরাটত্বের দিকেই বিশেষ ক'রে চোখ মেলতে শিখিয়েছে। শরৎচন্দ্রও গ্রামকে প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন—কিন্তু তার মূলে আছে তাঁর অতল বেদনা। গ্রাম্যজীবনের সমস্ত বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ তিনি। তাই গ্রামের বনশ্রী তাঁর চোখকে মুগ্ধ করলেও হৃদয়কে বন্দী করতে পারে নি। গ্রামকে বড় করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু গ্রামের প্রকৃতিকে নয়, সমাজকে। সেইজন্য গ্রামের সঙ্কীর্ণতা, ব্যাধি, ঈর্ষা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অন্ধতা, তামসিকতা—এসবে তাঁর অশ্রুও ঝরেছে, প্রেমও দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের গ্রামপ্রীতির প্রকৃতি অন্যরূপ। তিনি সব জড়িয়ে গ্রামকে ভালবেসেছেন। গ্রামের জীবনকে উদার-পরিসর করবার জন্যে তিনি ব্যস্ত নন্। গ্রামের ইদানীন্তন ছোট্ট এইটুকুখানি দিক্-চক্রবালেই তিনি আত্মহারা। গ্রাম্যশ্রীর স্নিগ্ধতা তার সব অভাবের ক্ষতিপূরণ ক'রেছে তাঁর চোখে। একথা বলার

উদ্দেশ্য নয় যে, প্রকৃতির বিরাটরূপে তিনি সাড়া দেন না, শুধু পেলব রূপেই দেন। 'অপরাধী'তে নিবিড় বনের গাম্ভীর্য্য বর্ণনায় বা 'পথের পাঁচালী'তে দু-একস্থলে ঝড়বৃষ্টিপ্লাবনের বর্ণনায় তাঁর চিত্রীর তুলি সর্ব্বাংশেই জয়শ্রী-মণ্ডিত হ'য়েছে। গ্রামের অপূর্ণতার সম্বন্ধেও যে তিনি সচেতন নন্ তাও বলি না। তাঁর নানা ছোটখাট চিত্রে গ্রামবাসীদের দৈন্য, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা ও সঙ্কীর্ণতার একটু-আধটু ভাসা-ভাসা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির বিরাটরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতন ডুবে যেতে চান্ না—গ্রামের তামসিকতায় তিনি শরৎচন্দ্রের মতন অসহ বেদনা অনুভব করেন না। তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র এ দুইয়ের একটাও নয়। তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র হচ্ছে ঃ—"অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না।" এইখানেই তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর গ্রামপ্রীতি ঠিক্ গ্রাম্যজীবনের প্রীতি নয়, তাঁর প্রকৃতিপূজা ঠিক্ প্রকৃতির চির-রম্যোৎসবের ঐকান্তিক পূজা নয়—তাঁর ভালবাসা এই "মাটির" ভালবাসা। মাটির ওপরে জন্মায় যে "সাঁইবাব্লা, গাবগাছ, টোপাকুল, আশ্সেওড়া, জগড়ুমুর, ঠেঁচিপোপ, বাঁশবন, সোঁদালিফুল," তাদেরই তিনি একজন। তাই সহরের ধূলোকাদায় অপু নিজেকে খুঁজে পায় না, পায় ঐ "কাঁচামাটির গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত চওড়া পথটার" ডাকে ; সহরের নানা উৎসব সভায় স্থায়ী আসন পাত্তে সক্ষম হয় না, মনটা তৃষিত থাকে—তার ঐ "চিরকালের রহস্যভরা সোনাডাঙার মাঠের" ধূসর নিমন্ত্রণের জন্যে। আর এসব তার কাছে দূর থেকে উপভোগ কর্বার বস্তুও নয়,—আঁক্ড়ে ধ'রে থাক্বার বস্তু! 'এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি' এই যে অপুর অন্তরের অন্তরতম কামনা। তাই সে নিত্য স্বপ্ন দেখে ঃ "বেলাশেষের স্বপ্নপটে শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া"-র। তাই সে মানসনেত্রে নিত্য চারণ করে সেই "আষাঢ়ের হাটে" যেখানে হাটুরেরা রোজ "কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, খেজুর গুড়ের আড়তের সাম্নে বহু গরুর গাড়ীর ভিড়...দু'ধারে নীলকুঠির সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ···সারাপথটা প্রাচীন বটের সারি ঝুরি দোলানে রক্তাভ জ্যোস্না-লাগা স্বচ্ছ কচিপাতার রাশি।" তাই সে শুন্তে পায় ঃ "সেক্রার দোকানের ঠুক্ঠাক্", "শঙ্খচিলের টানিয়া টানিয়া ডাকা", "পথিপার্শ্বের বট অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোকিলের ডাকিয়া-ডাকিয়া-সারা-হওয়া।" গন্ধ পায় ঃ "সোঁদা সোঁদা ভিজে মাটির", "নত-পল্লব নাগকেশরের অজস্র ফুলের", "বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ দক্ষিণ হাওয়ার।" আর মনে পড়ে ঃ "এক ঘন বর্ষার রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে রোগশয্যাগ্রস্ত এক গ্রাম্য বালিকার কথা—'অপু,

সেরে উঠ্‌লে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি ?' " কিন্তু হায় রে, এ গরীব ঘরের মেয়েটি—তার শৈশবের সাথী, স্নেহময়ী খেলার সঙ্গিনী ছোট্ট দিদিটি মুকুলেই ঝ'রে যায়—সেরে ওঠে না,—তাকে রেলগাড়ী দেখানো বাকি থেকে যায়। অপূর বুকটা কেমন ক'রে ওঠে! সে সহরের পাকাবাড়ীর একতলায় আস্তাবলের কাছের একটা ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখে তার দিদির, তাদের নদীর, তাদের সোনাডাঙার মাঠের, তাদের বিশালাক্ষীর মন্দিরের—ওই "আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূবদিকে বহুদূরে তাদের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের।" এই গ্রামের স্বপ্নই কবি এঁকেছেন তাঁর হৃদয়ের কবোষ্ণ রক্তের শেষ বিন্দুটি দিয়ে। নইলে কি সমস্ত গ্রামটাই থেকে থেকে অপূর স্বপ্নচোখের মধ্যে দিয়ে এমন প্রাণকাড়া ডাক ডাক্‌তে পার্‌ত ? ডাকে কেন ?···তা কি বল্‌তে হবে ?

"এতদিনে যে সেখানে তাহাদের ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় যে জল উঠিয়াছে। ঝোপে-ঝাপে যে নাটাকাঁটার ফুল ধরিয়াছে। বন-অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা যে ছাওয়া।"

আর না গেলে কি চলে ? বনলক্ষ্মীর বাঁশি যে বাজে !···

"কতদিন যে সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই !—তিন—বৎসর ! কতকাল !

"সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে রাতে সব সময়ে ডাকে, শাঁখারী পুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েরের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।"

শুধু কি তাই !···

"পোড়া ভিটার মিষ্ট লেবুফুলের গন্ধে সজ্‌নেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি ? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর পিছনে শিরীশ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক ? মাঠের মধ্যে রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য্য অস্ত যাওয়া ? ঠাকুরঝি পুকুরের সেই বটগাছটা যেখানে ঝাঁকড়া চুল দস্যুর মত দিগন্তের মধ্যে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—সেখানে ?"

কবে সে সেখানে ফিরে যাবে ? সহরের ক্লেদ, মালিন্য, সিমেণ্ট, ইঁট, চুন, সুরকি, ঘর্ঘর, গোলমাল, ব্যস্ততা—এসব থেকে কবে সে ফিরে যাবে ঐ বনশ্রীর স্নিগ্ধ অঙ্গনে ! যাবে কি ? যদি না যায় ? যদি সহরের দাবী তাকে পল্লীজননীর কোলছাড়া করে ?···উঃ, সে কথা কি ভাবা যায় ?

তা'হলে যে

"তাহাদের সে-ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে-সন্ধ্যায় কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না।···জনহীন ভিটার উঠানভরা কালমেঘের জঙ্গলে—দিদির সেই কাঁচপোকাটা যেখানে উড়িত—সেখানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।···

ক্রমে আরও দিন চলিয়া যাইবে, সারা বাড়ী জঙ্গলে ঢাকিয়া ফেলিবে, কেহ কোনোদিন সেদিক্‌ মাড়াইবে না, কেহ কোনোদিন পা দিবে না সে-ভিটায়! ওড়কলমী ফুল ফুটিয়া আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে। কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, বনের ধারে সেই অপূর্ব্ব বৈকালগুলি মিছামিছি নামিবে, হল্‌দে ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।"

"মায়ের হাতের যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা কোথায় কোন্‌ জঙ্গলে চাপা পড়িয়া যাইবে, কেহ সন্ধানও পাইবে না কোনো দিন।"

"ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে।"

পাঠকেরও কি ওঠে না? লেখকের জ্ঞাতসারে কি-না জানি না—এই সূত্রে তাঁর কথাচিত্রের মধ্যে একটি সমাজ-সমস্যাও ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। জানি না বইটির পাতার মধ্যে দিয়ে এ-সমস্যাটি তোমার চোখের সাম্‌নেও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে কি-না। কিন্তু শেষের দিক্‌টায় যেখানে অপূর বাবা-মা তাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সহরে গেল ও অপূর বাবার মৃত্যুর পর তার মাকে রাঁধুনীবৃত্তি অবলম্বন ক'রে সহরে জীবন যাপন কর্‌তে হ'ল সেখানে গ্রাম বনাম সহর সমস্যাটি বড় অপূর্ব্বভাবে আপনা আপনি ফুটে উঠেছে। হয়ত লেখক সমস্যার প্রশ্ন ওঠাতে মোটেই চান নি—কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির তুলিকাপাতে বাস্তবের নানা ট্রাজিডি অনেক সময়েই স্বতঃ উৎসারিত হ'য়ে উঠে থাকে, নয় কি! "পথের পাঁচালী"র গান হয়ত পথেরই গান কিন্তু এখানে-সেখানে সমাজচিত্রও তার মধ্যে ফুটে না উঠে পারে নি। সহুরে জীবন যখন পল্লীর রক্ত-সম্বন্ধকে অস্বীকার কর্‌তে ছোটে—তখন প্রাকৃত বনশ্রীর দুর্ভিক্ষ যে সে-জীবনকে শান্তিবিধুর ক'রে তোলে, কী পঙ্কিল ক'রে তোলে, কী অনামা ক্ষুধায় বুভুক্ষু ক'রে তোলে, নাগরিক সভ্যতার সে বিয়োগগাথা কবির বাঁশিতে বড় করুণ, বড় সজল, বড় মধুর হ'য়েই ফুটেছে। এ যান্ত্রিকতার যুগে জগতের সব দেশে বনলক্ষ্মীর যে-বিসর্জ্জনী গাওয়া সুরু হ'য়েছে, তার বিদায়-পূরবী যেন কবির প্রতি মিড়টিতে ফুটে উঠ্‌তে চাইছে। গ্রামের কান্ত শ্যামলিমা, শান্ত কাকলি, মিষ্ট কুলুধ্বনি, অনবগুণ্ঠ দিগন্তকে ছেড়ে স্বর্ণকিরীটিনী বৈরোচনী সভ্যতার বিবর্দ্ধমান কর্ম্মধূম, শ্রান্তিহীন উৎকণ্ঠা, উচ্চণ্ড সমারোহ ও লেলিহান গৃধ্নুতার বাহুপাশে এসে যে মানুষ তার চিরবাঞ্ছিতকে পাবার পথে এক পা-ও অগ্রসর হয় নি, তার কোজাগরব্রত বরলাভের পথে এক তিলও এগোয় নি,—শুধু একটা গভীরায়মান ব্যর্থতার মসীকৃষ্ণ ছায়া দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে তার অন্তরের মৃত সঞ্জীবনী রসধারাকে নিঃস্রোত ক'রে তুল্‌ছে, আবিল ক'রে তুল্‌ছে, বিবর্ণ ক'রে তুল্‌ছে,—'পথের পাঁচালী'র ভাটিয়ালির নানা মূর্চ্ছনায়ই নানা সারিগানই এ ইঙ্গিতটি দীর্ঘশ্বাসের ছন্দে এক অপূর্ব্ব মধুর বিষাদরাগিণী সৃষ্টি ক'রেছে।

সে বিষাদগাথার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে গত শতাব্দীর এক ভাবুক দার্শনিকের অনুরূপ দীর্ঘশ্বাস।

"Les progrès de la civilization sont marqués par un recul du bonheur. Plus l'appareil de la vie est compliqué, plus il y a des raisons de malheur. La sensibilite à la douleur devient plus grande, et la refle'xion croissante perce plus facilement les illusions. La civilization laisse grandir plus vite les besoins que les moyens de les satisfaire."*

আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এই প্রশ্নটি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়, কোথায় পথ? গ্রাম্যজীবনের বিসর্জ্জনী কি এখন মানুষকে গাইতেই হবে? বরণ ক'রে নিতেই হবে এই অর্থহীন ইঁটকাঠের বোঝা, ঠোকাঠুকির চক্‌মকি, উত্তেজনার হর্‌রা, কর্ম্মযজ্ঞের ধুম? লীলার চরম সার্থকতা নিহিত কি এই শ্রীহীন বৈচিত্র্যে,—অর্থহীন জটিলতায়? মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নাড়ীর টান, হৃদয়ের রসের সঙ্গে নীরবতার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মনের কুঞ্জে ফুল ফোটানোর সঙ্গে শিশিরবর্ষী অবসরস্নিগ্ধ সমাহিত জীবনের যে অপরিহার্য্য যোগসূত্র—সে-সবকে কি নির্দ্দয় হ'য়ে ছিন্ন না করলেই চল্‌বে না? এই-ই কি এখনকার নিষ্করুণ যুগধর্ম্ম? শান্তির সঙ্গে গতির কি কোনো সন্ধি, কোনো সামঞ্জস্যই সম্ভব হবে না, হ'তে পারে না? সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের? মানুষের সঞ্চলমান জীবনের লক্ষশত নিত্য-নূতন দাবীদাওয়ার সঙ্গে তার অন্তরতম অচঞ্চল রসদীপ্তির? 'পথের পাঁচালী'র কবি এ-সব প্রশ্নের সমাধান নিয়ে মাথা ঘামান নি, "বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্য তিলক" পথিকের "ললাটে পরিয়েই" যাত্রা শেষ করতে চেয়েছেন। "পথের দেবতা" যে আমাদের চিরদিন "ঘরছাড়া ক'রে"ই আনেন এই বারতা বহন ক'রে এনেই তাঁর ছবিটির সমাপ্তি টেনেছেন। ঘরছাড়া মানুষ যদি পথের মরীচিকায় লুব্ধ হ'য়ে বেরিয়ে এসে পুনরায় তার ছায়ানিবিড় নীড়ে ফিরে যেতে চায় তাহ'লে তার গতি কী হবে সে-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন্ নি। তবে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, তাহ'লে তার গতিকটা বড় সুবিধের হবে না। কিন্তু বলা বাহুল্য, এটা দুঃখবাদীর বিয়োগগাথা মাত্র—শিবনেত্রী দার্শনিকের প্রাতিভ জ্ঞান নয়। এখন দেখা যাক্ "অপরাজিতে" কবি কী সুরে এর পরিণতি দেন?

---

* ভাবার্থ:—সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সুখের হয় অধোগতি। জীবনের সাজ-সরঞ্জাম যতই জটিল হ'য়ে ওঠে, অশান্তির কারণ ততই বেড়ে ওঠে। বেদনার অনুভূতি উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণই হ'যে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার সচেতনতা বেড়ে-ওঠার দরুণ নিজেকে ভুলিয়ে রাখাও উত্তরোত্তর কঠিন হ'য়ে ওঠে। ফল হয় এই যে, সভ্যতার প্রতি পদক্ষেপে অভাব যত দ্রুত ফুলে ওঠে, তার পূরণের উপায় তত দ্রুত বেড়ে উঠ্‌তে পারে না।

বস্তুতঃ 'পথের পাঁচালী'র সব চেয়ে দুর্ব্বল স্থান বোধ হয় তার শেষ কয়টি ছত্র—যেখানে কবি তাঁর দৃষ্টির সম্বল ছেড়ে দার্শনিকের চিন্তায় সান্ত্বনা পেতে গিয়েছেন। তাই বল্‌ছিলাম "পথের পাঁচালী"র লেখক কবি—দার্শনিক নন্, স্রষ্টা—গবেষক নন্, চিত্রী—ভাষ্যকার নন্। তুলি ধরাই তাঁর স্বধর্ম্ম—আলডুস হাক্‌স্‌লি বা ডি এইচ লরেন্স বা রবীন্দ্রনাথ বা রোলাঁর মতন জীবনচিত্র থেকে কোনো গভীর suggestive দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌছতে তিনি সিদ্ধহস্ত নন্। ও তাঁর পরধর্ম্ম্। হোক্। যায় আসে না। কারণ স্রষ্টা যে মুহূর্ত্তে সত্য স্রষ্টা হ'য়ে ফুটে ওঠে সে মুহূর্ত্তে তাঁর শত ত্রুটিও নগণ্য হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। তা ছাড়া তাঁর মধ্যে কী নেই তা দিয়ে কবির বিচার করা চলে না—কী আছে সেই দিয়েই তাঁকে বিচার করতে হবে। "The greatness of a man is the greatness of his greatest moments" তাই "পথের পাঁচালী"র মধ্যে যে কোনো বৃহৎ দিগ্বলয়ের পরিচয় নেই, শিশু চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়াস নেই, ঘটনার বৈচিত্র্য নেই, কল্পনার সুদূর বিস্তীর্ণতা নেই, চিন্তার গভীরতা নেই—এ সবে খুব বেশি আসে যায় না। কারণ তার মধ্যে আছে একটি সেরার-সেরা বস্তু—আছে রস, যা হচ্ছে—"a concentrated taste, a spiritual essence of emotion, an essential aesthesis, the soul's pleasure in the pure perfect sources of feeling."* বিশেষ ক'রে শিল্পসৃষ্টিতে রূপায়নে এই রসই—এই essential aesthesis-ই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। যেখানে শিল্পের মাঝ দিয়ে আমরা, "রসো বৈ সঃ" এই গভীরতম সত্যকে ছুঁই সেখানেই শিল্পানন্দ সার্থকতম হ'য়ে ওঠে। যেখানে না ছুঁই সেখানে রচনা "সৃষ্টির" কোথায় পড়ে না—তার অন্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও। অবশ্য রসের ওপরেও যদি দার্শনিকতার দ্যোতনা থাকে, চিন্তার গভীরতা থাকে, বুদ্ধির দীপ্তি থাকে, তবে সেটা শুধু উপরি লাভ নয়—তাতে রসের বৈচিত্র্য, সমগ্রতা ও সমৃদ্ধি বাড়তে বাধ্য। এবং এই জন্যেই আমি সেই শ্রেণীর উপন্যাসেরই বেশি পক্ষপাতী যাতে শুধু আমাদের গল্পপ্রিয় শিশুমনেরই খোরাক নয়—প্রবর্দ্ধমান ভাবুকতারও খোরাক মেলে—যে কারণে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে নিকৃষ্ট না হ'য়েও সব জড়িয়ে 'গোরা'র চেয়ে 'চোখের বালি' ছোট, 'শ্রীকান্তের' চেয়ে 'চন্দ্রনাথ', Brothers Karamajov-এর চেয়ে Poor Folk, Virgin Soil-এর চেয়ে Smoke ইত্যাদি। আমরা যে "Sons of an intellectural ape" একথা গায়ের জোরে অস্বীকার ক'রে আগেকার যুগের নিছক্ রূপসৃষ্টিতে পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারিনা।

* The Future Poetry.

যুগধর্ম্মকে আত্মসাৎ আমাদের করতেই হবে ;—কাজেই বুদ্ধির মধ্যে দিয়েও সেই "রসো বৈ সঃ"-র দেখা পেতেই হবে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টিতে চিন্তার গভীরতা কাম্য হ'লেও কখনো শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে না, মুখ্য হ'তে পারে না, এই আমার বলবার কথা। শিল্পকারুতে সবচেয়ে বড়—রস, আনন্দ, যে-আনন্দ হ'তে 'খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" কাজেই মানুষের যে-কীর্ত্তি এই আনন্দের স্পন্দনে স্পন্দিত, রসের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, গানের আত্ম-উৎসারণে মহিমময় সেই-কীর্ত্তিই রসোত্তীর্ণ—মৃত্যুঞ্জয়। 'পথের পাঁচালী'র ছত্রে ছত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে এই অনাসক্ত আনন্দের শান্ত দীপ্তি, unheard melody-র উচ্ছল প্রবাহ, "Le phosphore que les poetes ont au bout des doigts." *। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীদিলীপকুমার রায়

---

* সেই স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ যা কবির একান্ত ইচ্ছাধীন—Les Contemporains.—Jules Lematlre.

প্রগতি

মানুষের সত্যসত্যই ক্রমিক উন্নতি হইয়াছে কি? জীবনের পথে বরাবর সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? কি হিসাবে, কোন্ দিকে, কতখানি?

এক সময়ে এই উন্নতি—আধুনিক ভাষায়, এই প্রগতির কথাটা খুব জোর গলায় ঘোষণা করা হইয়াছিল। মানুষ যে অতি দ্রুত আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া চলিয়াছে, মনকে প্রাণকে শুদ্ধ শাণিত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সত্বরই সে যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পূর্ণ জীব হইয়া উঠিবে—এ-সম্বন্ধে রোমান্টিক্ যুগের প্রথম স্বপ্নালুদের কোন সন্দেহই ছিলনা। প্রাচীনতর যুগের মানুষ হইতে আধুনিকেরা কত দিকে কত ভাবে কত দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আধুনিকের তুলনায় প্রাচীনেরা যে মোটের উপর শিশু—এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর জড়বিজ্ঞান যখন তাহার অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও শক্তি সব মানুষের হাতের মধ্যে আনিয়া দিল তখন ত আর দ্বিরুক্তি করিবার কিছুই রহিল না।

বিজ্ঞান তাহার বিবর্ত্তনবাদে এই সত্য আবিষ্কার করিল যে, সমস্ত সৃষ্টিই ক্রমিক উন্নতির পথে চলিয়াছে—প্রথমে ছিল কেবল জড়, পরে আসিল জীবন, তারপরে চেতনা ও মন বুদ্ধি; আদিতে ছিল আগুন উত্তাপ, তারপর জলবায়ু, তারপর গাছপালা, তারপর জীবজন্তু—সকলের শেষে আবির্ভাব মানুষের। মানুষও প্রথমে ছিল বন-মানুষ, বন-মানুষ ক্রমে হইল আদিম অসভ্য মানুষ, আদিম অসভ্য মানুষ উন্নত হইতে হইতে আধুনিক সভ্য মানুষে পরিণত হইয়াছে। উন্নতি আর কাহাকে বলে? শীঘ্রই যে মানুষ আকাশ ফুঁড়িয়া এক দেবলোকে উঠিয়া বসিবে, তাহারও আশু সম্ভাবনায় অনেকে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রথম যুগের এই সরল অনাবিল আস্থা ও উৎসাহ কিন্তু বেশিদিন টিঁকিয়া রহিল না। অতীতের ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান যতই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে লাগিল, অতীতকে যতই গভীরতর ব্যাপকতর ভাবে খুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া চলিতে লাগিল, ততই সে দেখিল উন্নতি যদি বাস্তবিকই হইয়া থাকে তবে ও জিনিষটি সোজা একটানা পথে অল্প মেয়াদে—দুই-চার সহস্র বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই। মানুষের উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়া আমরা ক্রমেই দূর হইতে দূর অতীতে চলিয়া যাইতেছি। মানুষ দূরের কথা, সভ্য মানুষেরই গোড়া পাওয়া যায় না। সভ্যতার পশ্চাতে সভ্যতার ক্রম যে কত অতীতে প্রসারিত, তাহার হিসাব লওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জগতে আজও তথাকথিত আদিম অসভ্য মানুষ আছে—কিন্তু কবে সমগ্র মানবজাতিই ছিল আদিম অসভ্য? তাই অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতে সুরু

করিয়াছেন, আদিম অসভ্য নামে আজ যাহাদিগকে আমরা অভিহিত করি, তাহারা একটা প্রাচীন সুমহান সভ্যতার বিকৃত ধ্বংসাবশেষ মাত্র। জ্ঞাত অতীতের ওদিকে ধীরে ধীরে আমরা যতই চলি না কেন, দেখি কোন না কোন মানব-সঙ্ঘ তাহার সভ্যতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, এইসব সভ্যতা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে মোটের উপর প্রায় একই ধরণের ছিল। অতি-আধুনিক আমরা, আমাদের অশন বসন ব্যসনের যত উপচার লইয়াই গর্ব্ব করি না কেন—তদনুরূপ দ্রব্যসম্ভারই আজ আমরা আবিষ্কার করিতেছি মিশরের ভূগর্ভে, গোবিমরুর বালুতলে, ইরাকের ক্রীটের সিন্ধুর মাটির অন্তরালে। হাতে-কলমে প্রমাণ পাইতেছি, আজ আমরা যত যত্নে নৈপুণ্যে প্রসাধন করি, প্রেম করি, শিল্প রচনা করি, রাজ্যশাসন করি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ মোটের উপর একই ভাবে ঐ একই জিনিষে অভ্যস্ত ছিল।

তবুও অতীতে ও অধুনায় যদি কিছু বা যাহা কিছু পার্থক্য আসিয়া থাকে, তবে তাহা দেখাইতে হইলে যাইতে হয় বিজ্ঞানেরই দুয়ারে। জড়বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির উপর মানুষ যে কর্তৃত্ব পাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা জীবনযাত্রার প্রণালীকে যতখানি সুগম সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাই আধুনিকের বিশেষত্ব। প্রকৃতিকে আমরা করায়ত্ত করিয়াছি, প্রকৃতিকে দিয়াই প্রকৃতিকে আমরা বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছি মানুষের সেবায়। অবশ্য এখানেও বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির উপর আধুনিকের দখল আকারে বা পরিমাণে যতই বিপুল হোক্ না কেন, প্রকারে বা গুণ হিসাবে তাহা যে প্রাচীনের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা সন্দেহের বিষয়। আগে যে কাজের জন্য সহস্র লোক খাটিত, এখন হয়ত একটি কি দুটি লোক আছে একটি যন্ত্র লইয়া। আগে শত শত প্রদীপ যেখানে প্রয়োজন হইত, এখন তাহার কাজ করিতেছে দুই চারিটি বৈদ্যুতিক আলো। আগে যাহা সম্পন্ন করিতে লাগিত বৎসর, এখন তাহাতে মাস বা সপ্তাহই যথেষ্ট। মাস মাস ধরিয়া পূর্ব্বে যে-পথ অতিবাহন করিতাম, এখন সেখানে যাই তিন ঘণ্টায় উড়িয়া। এই ভাবে যন্ত্রপাতির কল-কারখানার কল্যাণে আমাদের সকল কার্য্য সংহত ক্ষিপ্র ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যের আকৃতি নয় প্রকৃতি, জীবনের রূপ নয় ছন্দ তাহাতে কতখানি পরিবর্ত্তিত? জড়বিজ্ঞান জীবনের কাঠামো অনেকখানি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নতুন করিয়া গড়িতেছে, কিন্তু জীবনের অন্তঃস্থলে মর্ম্মে কতখানি স্পর্শ করিয়াছে—মানুষের চেতনায় আনিয়াছে কোন্ নূতন দর্শন, নূতন গতি?

এই ভাবে এক দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয় মানুষের আসল উন্নতি দূরের

কথা, বিশেষ পরিবর্ত্তনও কিছু ঘটিয়াছে কি-না সন্দেহ—মানুষ আছে স্থাণুবৎ যথাপূর্ব্বং তথাপরং।

কিন্তু তাহা নয়, আরও গভীরতর দৃষ্টিতে দেখিব মানুষের পরিবর্ত্তন, উন্নতি, প্রগতি ঘটিয়াছে, ভিতরের দিক্ দিয়াই—মতিগতির, চেতনারই হিসাবে। চেতনারই বিকাশ বা বৃদ্ধি হওয়াই সেই পরিবর্ত্তনের লক্ষণ; সেই প্রগতির মূল কথা এই যে, মানুষ দিনে দিনে বেশি সচেতন হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বহির্জীবনে, কর্ম্মের আয়তনে মানুষ যে বর্দ্ধিত জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহা এই বর্দ্ধিত চেতনার ফল—বাহিরে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ততখানি প্রসার পাইয়াছে, ভিতরে যতখানি তাহার চেতনা জাগিয়াছে বাড়িয়াছে। জ্ঞান এবং শক্তি হইতেছে চেতনারই বাহ্য প্রকাশ ও প্রয়োগ। মানুষ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে নিজের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে—নিজেকে নিজে ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, জগৎকে ছুঁইয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া চালিয়াছে। চেতনা বাড়িয়া যাইতেছে, অর্থ এমন নয় যে, মানুষ নৈতিক হিসাবে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নৈতিক উন্নতি বা স্বভাবের শুদ্ধি হইতেছে চেতনার ঊর্দ্ধমুখী গতি—আমরা এখানে বলিতেছি চেতনার তির্য্যক্ গতির কথা। মানুষের চেতনা প্রসারিত হইয়াছে—বিস্তৃতির সাথে সাথে তাহা আবার বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে—"চিত্র প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।"* এই প্রসারণ ও সমৃদ্ধির অর্থ সৃষ্টির ভালমন্দ দুই রকম বৃত্তিকেই আলিঙ্গন করা—হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ভাল অপেক্ষা বেশির ভাগ মন্দকেই বরণ করা। বাইবেলের মতে, মানুষ ত আগে নিষ্পাপই ছিল, যখন তাহার ছিল শিশুসুলভ সারল্য ও অজ্ঞান; সয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল সেদিন যেদিন তাহার জাগিল কৌতূহল, সে পাইল জ্ঞানের আস্বাদ।

জ্ঞানের প্রসারণ অর্থে সাধারণতঃ বুঝি নূতন নূতন অনেকানেক বিষয়কে ক্ষেত্রকে বুদ্ধির, প্রত্যয়ের গোচর করিয়া তোলা। এই দিক্ দিয়া আধুনিকের জ্ঞানের প্রসার অনেক হইয়াছে, সন্দেহ নাই—অন্ততঃ বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে। জড়প্রকৃতির নব নব বহুতর রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, এক দিকে অণোরণীয়ান্ অন্যদিকে মহতো মহীয়ান্ কতরূপ কত গতিবিধি আমরা উদ্ঘাটিত করিয়াছি। প্রাচীনের তুলনায় এই পথে আমরা অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছি। তবে, অন্তরের জগৎ সম্বন্ধে সে কথা কতটুকু বলিতে পারি তাহা বিচার্য্য—ভিতরের চেতনায় নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন তথ্য খুব বেশি যে আমরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহা বোধ

* উষার সাথে সাথে এক জ্ঞান "বহুমুখী ও বিশ্বব্যাপী হইয়া জন্মিল" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, সূ ১১৩—১)।

হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও এক হিসাবে প্রাচীনের সাথে আধুনিকের বিশেষ পার্থক্য ফুটিয়া উঠিতেছে—এবং সেখানেও দেখি ঘটিয়াছে জ্ঞানের প্রসারণ চেতনার বিস্তৃতি।

আগে মানুষ—যে মানুষ বুদ্ধির স্তরে উঠিয়াছে, শিক্ষায়-দীক্ষায় মার্জ্জিত হইয়াছে সে—তাহার ব্যক্তরূপ বা আধারকে অর্থাৎ দেহকে প্রাণকে ও মনকে, এবং প্রকৃতিরও এই ত্রিধা ভূমিকে, দেখিত বুঝিত বিষয় হিসাবে। জ্ঞাতার চক্ষে—কর্ত্তার হাতের ত কথাই নাই, সমস্ত সৃষ্টিই ছিল জড় বস্তু। কর্ম্মীর, কাজের কাজীর স্থূল চক্ষুই হৌক্, দার্শনিকের বুদ্ধি-বিচারের চক্ষুই হৌক্, কিম্বা যোগীর অন্তরস্থ চৈতন্য-পুরুষের চক্ষুই হৌক্—যে চক্ষু দিয়াই আমরা জগৎকে এ যাবৎ দেখিয়াছি তাহাতে সর্ব্বত্র বিষয়ের জড়ত্বই ধরিয়া লইয়াছি—দেহের, প্রাণের বা মনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য চেতনা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সাংখ্যের জবাব ত স্পষ্ট; বেদান্তের সিদ্ধান্তও তদনুরূপ—প্রকৃতি জগৎ জড় অচেতন, অবিদ্যা অজ্ঞান। প্রকাশের মধ্যে—প্রকৃতিতে জগতে, যদি চেতনার আভাস পাই তবে তাহা প্রকৃতির জগতের উপরে অতীতে যে পুরুষ বা ব্রহ্ম তাঁহারই চেতনার সংক্রমণ বা আরোপ বা প্রতিচ্ছায়া। নিজের নিজের রূপে ব্যক্তরূপ সব স্বভাবতই জড় অজ্ঞান—ব্যক্তরূপের গণ্ডী মুছিয়া ফেলিয়া যতখানি অরূপে তাহারা মিশিয়া যাইতেছে ততখানিই তাহারা হইতেছে চৈতন্যময়—নিজেকে হারাইয়া তবে তাহারা পাইতেছে তাহাদের জ্ঞানময় আদি সত্তা।

আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্যই এইখানে যে, তাহার কল্যাণে মানুষ আপন ব্যক্ত প্রকৃতিরই মধ্যে, স্থূল রূপায়নকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহারই মধ্যে সজ্ঞান সচেতন হইয়া উঠিতেছে। মন প্রাণ, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত, নিজে নিজের পরিচয় লইতেছে—তাহারা কেবল জড় বিষয় নয়, বিষয়ীর স্বভাবও তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে। আগে বড় জোর মনই ছিল একাধারে বিষয় ও বিষয়ী—মনই দেখিত প্রাণকে দেহকে এবং নিজেকে—মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেঠ্‌ঠা মনোময়া; কিন্তু এখন মন ত মনকে জানিতেছেই প্রাণও জানিতেছে প্রাণকে, দেহও জানিতেছে দেহকে—ইহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের চেতনা আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই সম্বুদ্ধ সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আজকালকার বিজ্ঞান জড়ের সম্বন্ধে এই ভাবেই না সত্যের সন্ধান করিতেছে, যাহাতে বস্তু নিজেই নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্য ব্যক্ত করিয়া ধরে? জগদীশচন্দ্রের যাদুবলে গাছ-পালা আজ নিজেরাই নিজেদের জীবনের গুপ্ত কাহিনী লিখিয়া চলিয়াছে। এ সকল কি ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশ বা ইঙ্গিত নয়? প্রাণের ক্ষেত্রেও দেখি, আমরা ঐ একই প্রণালী অনুসরণ করিতে সুরু করিয়াছি। প্রাণকে

বুঝা যায় প্রাণ দিয়া প্রাণকে প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া, প্রাণের চেতনায় জাগিয়া। তাই বের্গসন বলিতেছেন, সাক্ষাৎ অনুভূতি (Intuition) হইতেছে একটা সহ-অনুভূতি (Sympathy)।

মনের ক্ষেত্রেও মন যে রকমে আত্ম-চেতনায় সম্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, আত্ম-ছন্দে আপনাকে চালিত করিতেছে তাহাও দেখাইতেছে আধুনিকের বৈশিষ্ট্য। মন অবশ্য চিরকালই মনকে দেখিতে এবং বুঝিতে অভ্যস্ত— কিন্তু সে যেন ছিল মনকে মনের বাহিরে স্থাপিত করিয়া, জড়বস্তু হিসাবে দেখিয়া। আজকাল মনের জ্ঞান পাইতেছি মনকে মনের সাথে মিশাইয়া ধরিয়া—এখানেও একাত্মতাই হইয়াছে জ্ঞানের পন্থা। মনের মধ্যে মনোময় পুরুষ তন্ময় হইয়া গিয়াছে—এই এক মানসিক সমাধির সহায়ে আপন অন্তর হইতে ঊর্ণনাভের মত সে যেন আবিষ্কার করিতেছে, রচনা করিতেছে অনুভূতির প্রতীতির, ভাবের প্রত্যয়ের, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র তথ্যাবলী সূত্রাবলী ; আধুনিক সাহিত্যের ইহা একটা বিশেষ ধারা (Proust, Valery, Gide, Jean Giraudoux)।

আগের আগের যুগে দেহ প্রাণ মন—মানুষের সমগ্র আধারটি অনেকটা অবুঝের মত, অন্ধের মত, নির্ব্বিচারে একটা আদর্শকে ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইত, মানিয়া চলিত—যুগভেদে দেশভেদে কখন কোথাও তাহা হইয়াছে দেহগত ধর্ম্ম, কখন কোথাও প্রাণগত, আবার কখন কোথাও মনোগত ধর্ম্ম। তখন সতীর যেমন সংস্কার ছিল পতির পদতলে আত্মবলি দিয়াই তাহার সকল সার্থকতা—তেমনি মানুষের আধারেও এই শিক্ষা দীক্ষা ছিল, সর্ব্বথা আপনাকে অনুগত করিয়া রাখা। রীতি, নীতি, আচার, ইষ্ট, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি নানা নামে ও রূপে তাহার প্রভুকে সম্মুখে স্থাপন করা হইত।

কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের আধার, আধারের প্রতি স্তর তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—শ্রীরাধার মত তাহারা তাদের প্রভুকে মুখ ফুটিয়া বলিতেছে—

শুন মানব রাধা স্বাধীনা ভেল।

বাহিরের কোন একটা আদর্শ বা ব্যবস্থা তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে আর চাপিয়া বা দাবাইয়া রাখিতে পারিতেছে না—অন্য কোথাও হইতে আরোপিত মানদণ্ড অনুসারে তাহারা নিজেকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহিতেছে না। প্রতি অঙ্গ আজকালকার যুগে পাইতেছে এক স্বাতন্ত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য, আত্ম-সংস্থা (self determination)। তাহারা নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতেছে, নিজের পথে নিজের সত্য ও ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিতেছে।

আজকাল সর্ব্বত্র যে একটা স্বেচ্ছাচার, অনাচার, যে নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে তাহার নিদান এইখানে। মানুষের ইতরা বা অপরা প্রকৃতির স্তরে স্তরে একটা আত্মসম্বিতের আলো, স্পন্দন প্রকাশ পাইতেছে। এই আত্মজাগরণের প্রথম ফল হইয়াছে যে পুরাতনের অন্ধ সংস্কারের শৃঙ্খলা টুটিয়া গিয়াছে কিন্তু নূতনের পূর্ণ চেতনার শৃঙ্খলা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান হইতেছে সন্ধিকাল—পরিবর্ত্তনের যুগ—স্থিতির নয়।

মানুষের অঙ্গে অঙ্গে, তাহার সত্তার স্তরে স্তরে এই যে স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-চেতনার সূত্রপাত তাহাকেই পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি চেতনার তির্য্যক্ গতি বা সম্প্রসারণ। অবশ্য প্রসারণের পশ্চাতে, অন্তরালে আছে হয়ত একটা ঊর্দ্ধলোক হইতে জ্যোতির ক্রমিক অবতরণ—এবং ফলে নূতন একটা ঊর্দ্ধায়নের আরোহণের প্রেরণা; কিন্তু এ সকল প্রচ্ছন্নলোকের শক্তি, আমাদের জাগ্রত চেতনায় তাহা আসিয়া এখনও ধরা দেয় নাই—তাহাতে হয়ত রহিয়াছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা; কিন্তু বর্ত্তমানে রূপায়িত ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছে চেতনার বহির্ম্মুখী বহুধা গতি।

পূর্ব্বতন যুগে মানুষের মধ্যে একটা অন্তর্ম্মুখী, ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণাই হয়ত অধিকতর স্পষ্ট জাগ্রত ছিল; কিন্তু সে প্রেরণা চলিত সরল রেখায়, একটিমাত্র ধারা অবলম্বন করিয়া। যেমন, মনকে আশ্রয় করিয়া কি মানসিক চেতনার একটি সূত্র ধরিয়া উপরে মানসাতীত লোকে মানুষ উঠিয়া যাইত—কিম্বা হৃদয়েব মধ্যে নামিয়া তেমনিভাবে ডুবিয়া তলাইয়া যাইত একটি অতীন্দ্রিয় চেতনায়। বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে এই ধরণের উপলব্ধি তেমন সহজ ও সুলভ নয়; সে ডুবিয়াও যায় না, উপরে উঠিয়াও চলে না—সে দেয় আপনাকে সমানভাবে চারিদিকে প্রসারিত করিয়া।

তাই বর্ত্তমান যুগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মানুষ জিনিষকে, নিজেকে কেবল একদিক্ হইতে নয়—সে দিক্ যতই উপরের বা গভীরের হোক্ না কেন—সে দেখিতে বুঝিতে চাহে নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে। শুধু নিজের চক্ষু দিয়া নয়, পরের চক্ষু দিয়া, সকলের চক্ষু দিয়া জিনিষ দেখিতে কি রকম তাহাও জানিতে সে চায়। এমন কি, একটির পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে নয়, কিন্তু যুগপৎ সকল দিক্ হইতে দেখিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেছে। শিল্পে Cubism ও Futurism-এর উদ্ভব হইয়াছিল এই প্রেরণায়। প্রাচীনের শিল্পের রীতি ছিল এক জিনিষকে এক সময়ে একই স্থান হইতে, একই দৃষ্টি দিয়া দেখা—সে দৃষ্টি স্থূল চক্ষুর হোক্ আর অন্তরের অনুভব হোক্। কিন্তু বর্ত্তমানে দৃষ্টির এই একনিষ্ঠা—এই unity of

apperception—আমরা বাতিল করিয়া দিয়াছি। দৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছি—জিনিষের বহুধা বিচিত্ররূপ দেখিতে।

সর্ব্বাঙ্গে আত্মচেতনার ফলেই যেন মানুষ এইভাবে আপনাকে কেবল পাশাপাশিই প্রসারিত করিয়া দিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রতি অঙ্গ জিনিষকে ধরিতে ছুঁইতে চাহিতেছে আপন আপন ভাবে ভঙ্গীতে—মন চাহিতেছে এক ধারায়, প্রাণ আর এক ধারায়, দেহ তৃতীয় আর এক ধারায়; এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধারাকে চাহিতেছে ঐকান্তিক, আত্যন্তিক ভাবে। আর এই জন্যই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সজ্ঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছে এবং মানুষের মধ্যে দেখা দিয়াছে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা।

চেতনার এই যে বিস্তার, যে বিক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহা মূলতঃ বৃহতের দিকে অস্পৃহার ও প্রগতির ফল। কিন্তু সত্যকার বৃহৎ চেতনা মানুষের আসিবে তখনই, যখন এই তির্য্যক্ গতির সহিত যোগ করিয়া দিতে পারিবে অথবা এই তির্য্যক্ গতিকে প্রকাশ করিবে, রূপ দিতে থাকিবে একটা ঊর্দ্ধমুখী অন্তর্ম্মুখী গতি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রুষ-বিপ্লবের ইতিবৃত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

বিদেশের সহিত যোগের কথা আলোচনা করিবার সময় তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিকসঙ্ঘের (Third International) নাম স্বতঃই মনে আসে। এই প্রতিষ্ঠানের একটু ইতিহাস আছে।

১৮৪৭ সালের সাম্যবাদের ঘোষণাপত্রে মার্ক্স্ বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদিগকে একতার জন্য অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে লণ্ডন নগরে প্রথম সার্ব্বভৌমিক শ্রমিকসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশে দেশে তখনও শ্রমিক্-আন্দোলন প্রবল না হওয়াতে এবং মার্ক্স্ ও বাকুনিনের মতের অনৈক্যের ফলে ইহার অকালমৃত্যু ঘটে। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় সার্ব্বভৌমিক সঙ্ঘের উৎপত্তি। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সোসিয়ালিষ্ট দলগুলি এই সময় হইতে তিন বৎসর পরে পরে মহাসভায় সম্মিলিত হইত বটে কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে নাই। এমন কি, মহাযুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ সোসিয়ালিষ্ট্ই অসঙ্কোচে নিজ নিজ দেশের শাসকদের সহিত যোগদান করিয়াছিল।

রুষবিপ্লবের অব্যবহিত পরে কমিন্টার্ণ্ বা তৃতীয় সঙ্ঘটি স্থাপিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত সাম্যবাদীদলগুলিকে বল্‌শেভিক্‌দের নেতৃত্বে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রফিন্টার্ণ্ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ট্রেড্ ইউনিয়ন্‌গুলির সমষ্টি মাত্র। জগতের যাবতীয় শ্রমিকদল এখন আমষ্টার্-ডামের দ্বিতীয় সঙ্ঘ ও মস্কোস্থিত তৃতীয় সঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত।

জগদ্ব্যাপী বিপ্লব আনয়ন করাই তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিকসঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ইহার নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের মধ্যে অন্যতম। এইজন্য বিদেশের লোকে স্বভাবতই রাশিয়ার শাসকবর্গকে এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অন্যদেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পথে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ অন্তরায়। চীনের সহিত সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের প্রথমে অতি সদ্ভাব হয়—কেননা বল্‌শেভিকেরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে চীনদেশে তাহাদের সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৭-এর পর বল্‌শেভিক্-বাদ প্রচারের ফলে চীনের জাতীয় দল ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সাম্যবাদীগণ অন্যদেশেও বিশেষ সাফল্যলাভ করে নাই এবং সেইজন্য বোধহয় সম্প্রতি সঙ্ঘের প্রভাব ও কার্য্যপদ্ধতির আর তেমন প্রসার হইতেছে না। রাশিয়ার জাতিগত স্বার্থের খাতিরে জগদ্ব্যাপী

বিপ্লবের আদর্শ হয়ত খর্ব্ব করা হইবে। কিন্তু তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক-সঙ্ঘ বল্‌শেভিক্-বাদের একটি প্রধান অঙ্গ—ইহাকে ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে।

৭

নবীন রাশিয়ায় বল্‌শেভিক্ বা সাম্যবাদীদলই সর্ব্বশক্তিমান। অতএব ইহাদের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

রাশিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা একজনের অধিক সাম্যবাদী নাই। রুষবিপ্লবের বহুপূর্ব্ব হইতেই সংখ্যাবৃদ্ধির অপেক্ষা উপযুক্ত সভ্য সংগ্রহের প্রতিই নেতারা অধিক মনোযোগ দিয়া আসিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত কিছুদিন পরে পরে সভ্যদিগের মধ্যে বাছাই করা হয়। দুর্ব্বলচেতা ও অবাধ্য লোকদিগকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য একটি বিশেষ সমিতি আছে। কম্‌সোমল্ ও পাওনিয়ার্স্ সাম্যপন্থী যুবক ও কিশোরদের দুইটি স্বতন্ত্র সমিতি। তাহাদের সভ্যেরা অন্যদের অপেক্ষা সহজে মূল দলে প্রবেশ করিতে পারে।

রাশিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ও কারখানাগুলিতে সাম্যবাদীদের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই মহাসভা গঠিত। সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ এই সভার কাজ। অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সভ্যেরা স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে কিন্তু অধিকাংশের মতানুসারে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইবামাত্র সকল সভ্যই তাহা মান্য করিতে বাধ্য। কেহ এ-নিয়মের অন্যথা করিলে তাহাকে দলত্যাগ করিতে হয়।

দেশের শাসনযন্ত্রে প্রধান প্রধান যে পদগুলি আছে তাহার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন সাম্যবাদী অধিষ্ঠিত। তাহারা সকলে মহা-সভার আদেশ অনুসরণ করিতে বাধ্য। সুতরাং সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবস্থা সাম্যবাদীদলের অধিকাংশের মতানুসারে চলে। লেনিনের মতবাদে শ্রমিক-নেতৃত্বের যে কথা পাওয়া যায় কার্য্যতঃ তাহা সাম্যবাদীদের প্রভুত্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহা না হইলে রাশিয়ায় নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। সভ্যগণ শ্রমিক ও কৃষকবৃন্দের সহিত সর্ব্বদা মিশিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারে বলিয়াই তাহাদের হস্তে নেতৃত্ব অবাধে সমর্পিত হইতেছে।

সাম্যবাদী মহাসভা হইতে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি নির্ব্বাচিত হয়। তাহারা আবার একটি কর্ম্মসমিতি গঠন করিয়া সমস্ত কার্য্যভার তাহার উপর অর্পণ করে। নয়জন সভ্যে গঠিত এই কর্ম্মসমিতিটিই বস্তুতঃ রাশিয়ার

ভাগ্যবিধাতা। বর্ত্তমান কর্ম্মসচিব ষ্টালিন্ রাশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি।

সাম্যবাদীদিগের সর্ব্বব্যাপী কর্ত্তৃত্বের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নহে। দেশের সর্ব্বত্র তাহাদের দলের লোকেরা প্রধান প্রধান পদে ও নেতার আসনে বিরাজ করিতেছে। দলের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সকল আদেশ পালন করিবার কঠোর অভ্যাসই যে তাহাদের কর্ম্মকুশলী ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্যবাদীরা কখনও জনসাধারণের সহিত যোগ হারায় না—দলের কর্ম্মপ্রণালী সোভিয়েটে প্রকাশিত লোকমত অনুসারে বারম্বার পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্য এখন পর্য্যন্ত তাহাদের উপর জনগণের আস্থা আছে। বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর যতটুকু লাভ হইয়াছে তাহার মূলে সাম্যবাদীদল, এ-কথা তাহারা ভুলে নাই। কৃষকদিগের সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু সন্দেহ আছে—বল্‌শেভিক্-তন্ত্রের প্রধান ভয়ের কারণ এই কৃষক-সম্প্রদায়। মনে রাখিতে হইবে যে, রাশিয়াতে অন্য কোন দলের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা নাই। বল্‌শেভিক্-দিগের মতে, নূতন রাষ্ট্র গঠনের সময়ে কোনপ্রকার অসাবধানতা বা শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য বিরোধী মত ছাপাইবার বা বক্তৃতায় প্রচার করিবার স্বাধীনতা রাশিয়াতে নাই। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে নির্ম্মম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সাম্যবাদ অনুসারে, দেশে যতদিন শ্রেণীবিভাগ ও ধনতন্ত্রের চিহ্নমাত্র থাকিবে ততদিন এই কঠোর নিয়ম ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

৮

বল্‌শেভিক্‌দিগের মধ্যে নানা বিষয়ে বহুবার মতভেদ হইয়াছে। মতান্তর দলের জীবনী-শক্তির পরিচায়ক। সাম্যবাদের পণ্ডিতদিগের মতে শ্রমিকশ্রেণীর নানা বিভিন্ন চিন্তাধারা দলের মধ্যে প্রকাশ পাইতে বাধ্য। সাম্যবাদের মূল আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বল্‌শেভিক্‌দের মধ্যে এতই সুদৃঢ় যে, মতদ্বৈধ কখনও দলভঙ্গে পরিণত হয় নাই।

রুষবিপ্লবের পূর্ব্বে লেনিনের সহিত জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভের মতের পার্থক্য হয়। তাঁহারা নভেম্বরের বিপ্লবচেষ্টার বিরোধী ছিলেন কিন্তু লেনিন্ ও ট্রট্স্কি সে চেষ্টায় আশাতীতভাবে সফল হইবার পর তাঁহারা ভুল স্বীকার করেন।

বিপ্লবের পরে, ১৯১৮ সালের প্রারম্ভে, লেনিনের সাবধানতা বুকারিন্, রাডেক্ প্রভৃতির নিকট কাপুরুষতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সামরিক সাম্যতন্ত্রের যুগে ইঁহাদের মতকেই লেনিন্ সময়োপযোগী মনে করিলেন। নেপের আমলে চরমপন্থীরা আবার অসন্তুষ্ট হইল।

১৯২৩ সালে লেনিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ১৯২৪-এর জানুয়ারীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সহকর্ম্মিদিগের মধ্যে ট্রট্স্কি বহির্জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইলেও নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইলেন না। ট্রট্স্কি বল্‌শেভিক্‌দলে নবাগত—১৯১৭ সালের পূর্ব্বে তিনি মেন্‌শেভিক্ ছিলেন বলিয়া প্রবীণ বল্‌শেভিকেরা তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। লেনিনের তিরোধানে রাইকভ্ প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু বস্তুতঃ নেতৃত্ব রহিল অন্য তিন জনের হাতে—সাম্যবাদীদলের কর্ম্মসচিব ষ্টালিন্, লেনিন্‌গ্রাড্ সোভিয়েট্ ও তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সভাপতি জিনোভিয়েভ্, এবং মস্কো সোভিয়েটের অধ্যক্ষ কামেনেভ্। ইঁহারাই এই সময়ে ত্রয়ী নামে সুপরিচিত ছিলেন। ট্রট্স্কির সহিত ইঁহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

১৯২৬ সালে অকস্মাৎ জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ পূর্ব্ববৈরী ট্রট্স্কির সহিত যোগ দিয়া ষ্টালিনের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই দ্বন্দ্ব চলে। ট্রট্স্কির মতে বল্‌শেভিক্ নীতি বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া সংকীর্ণ জাতীয়তায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। কেবল একটি দেশকে অবলম্বন করিয়া সোসিয়ালিষ্ট সমাজ গড়িয়া তোলা স্বপ্নমাত্র। রাশিয়ার কৃষকদিগের প্রতি যে-অন্যায় যত্ন অতি-মাত্রায় দেখানো হইতেছিল তাহা ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস। ফরাসী-বিপ্লবের সময় থার্ম্মিডর্‌-যুগে যে ভাবে বিপ্লবের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল, ষ্টালিনের নেতৃত্বে তাহাই যেন রাশিয়ায় পুনরভিনীত হইতেছে। কিন্তু ষ্টালিন্ ও তাঁহার সমর্থক সাম্যবাদীদলের অধিকাংশের মতে এই অভিযোগ-গুলি অমূলক; অন্যদেশে বিপ্লব না ঘটিলেও রাশিয়াতে সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্, রাকভ্স্কি প্রভৃতি সুবিখ্যাত নেতাগণ সাম্যবাদীদল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অন্য সকলে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্রমে ক্রমে দলে ফিরিয়া আসেন কিন্তু নিজ মতে অবিচলিত থাকার দোষে ট্রট্স্কির নির্ব্বাসনদণ্ড হয় (১৯২৯)।

চরমপন্থীদিগের পতনের পর অন্য এক মতের সহিত ষ্টালিনের সঙ্ঘর্ষ হইল। অচিরে সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, বুকারিন, টম্স্কি, রাইকভ্ প্রভৃতি নেতারা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অবস্থাপন্ন কৃষকদিগকে অধিক উৎসাহদানের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কিন্তু এবারেও দলের অধিকাংশের পৃষ্ঠপোষণে ষ্টালিনেরই জয় হইল

(১৯২৮)। বিপ্লবের পর লেনিন্ যেমন সাম্যবাদীদলকে মধ্যপন্থায় চালিত করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে, ষ্টালিন্ও ঠিক সেই ভাবে নেতৃত্ব করিতে সমর্থ।

৯

রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির বসবাস। সম্রাট্দিগের যুগে সংখ্যান্যূন জাতিদিগের উপর অনেক অত্যাচার হয়। বল্শেভিকেরা কিন্তু প্রথম হইতে ইহাদের স্বায়ত্ত-শাসন সমর্থন করে। বিপ্লবের পর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন যে স্বাধীন রাজ্যগুলির উদ্ভব হইল, তাহাদের অনেকের সহিত বল্শেভিকেরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। ঘটনাচক্রে যে সমস্ত রাজ্যে সাম্যবাদীদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা ১৯২৩ সালে এক বিরাট সংহত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।
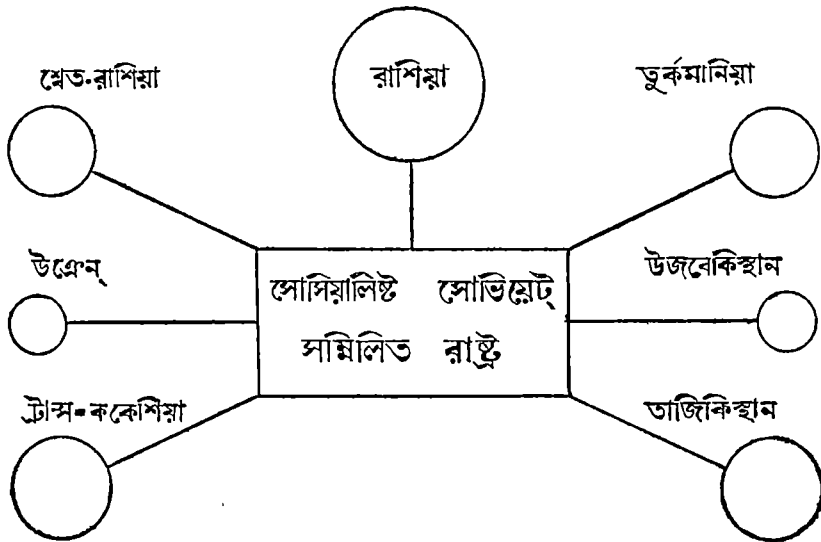
সাতটি ভিন্ন ভিন্ন সোভিয়েট্ সাধারণতন্ত্র একত্র হইয়া যুক্তরাষ্ট্রটি গঠন করে। ইহাদের মধ্যেও আবার অনেকগুলির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্ত-শাসিত খণ্ডরাজ্য আছে। এক রাশিয়ার মধ্যেই তেইশটি প্রদেশ এইভাবে আত্মশাসিত।

ফেডারেশন্ হওয়া সত্ত্বেও কার্য্যতঃ সোভিয়েট্ যুক্তরাষ্ট্রটি একই রাজ্য। একই বিরাট্ দলে সন্নিবিষ্ট সাম্যপন্থীগণ ইহার প্রতি অংশে প্রভুত্ব করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার নামোল্লেখ না থাকিলেও অর্থ ও

জনবলে রাশিয়া অন্য ছয়টি রাজ্যের দ্বিগুণ। ভবিষ্যতে অন্য দেশও এই রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারে এই আশাতে সম্ভবতঃ এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়ার প্রভাব জার্ম্মানীর সহিত প্রাশিয়ার সম্বন্ধের অনুরূপ। যুদ্ধ, বিদেশী বাণিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে ফেডারেশনের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাধারণতন্ত্রগুলির কোনপ্রকার স্বাধীনতা নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

সোভিয়েট্ শাসন-পদ্ধতি এই যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। নগরে নগরে ও পল্লীসমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোভিয়েট্ বা সমিতি আছে। তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সোভিয়েট্ কংগ্রেসের হাতে দেশশাসনের ভার। এই কংগ্রেসের অধিবেশন সাধারণতঃ দুই বৎসরে একবার হয়।

সোভিয়েট্ কংগ্রেস্ একটি কেন্দ্রীয় সমিতি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে। ইহার একটি শাখা সম্মিলিত রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাতে গঠিত—অন্যটি বিভিন্ন জাতি-সমূহের প্রতিনিধির সমষ্টি। কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে প্রেসিডিয়াম্ বা ক্ষুদ্র একটি চালক-সমিতি গঠিত হয়—ব্যবস্থাবিধির সকল ভার বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহার হস্তেই ন্যস্ত থাকে। শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি অন্য একটি মন্ত্রিপরিষদও নিযুক্ত করে।
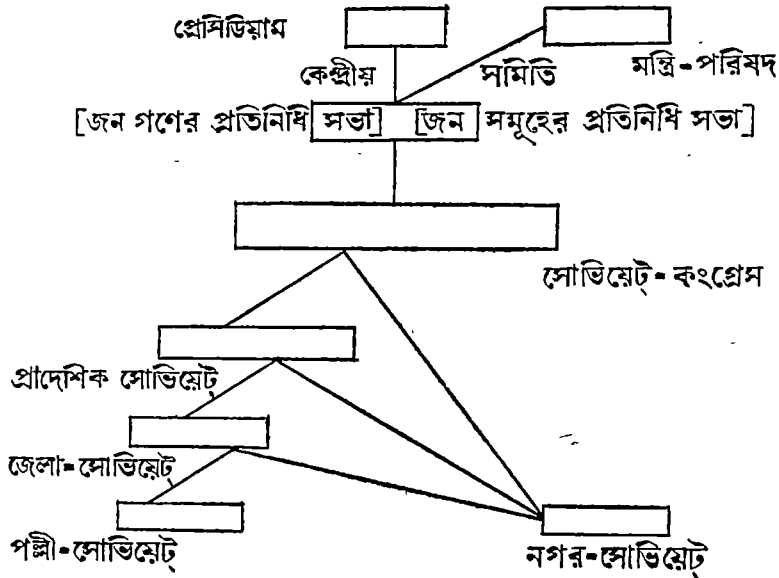
নির্ব্বাচন প্রথা সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা প্রয়োজন।

১০

সোভিয়েট্‌-তন্ত্রে সকলের ভোট্‌ দিবার অধিকার নাই, একথা সত্য। যাহারা মজুর খাটায়, সুদভোগ যাহাদের জীবিকা, যাহাদের স্বাধীন কারবার আছে, পৌরহিত্যে যাহাদের ব্যবসায়—এই সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা রাশিয়াতে ভোট্‌ দিতে পারে না। জগতের প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন শ্রেণীর লোক ভোট্‌ হইতে বঞ্চিত। সোভিয়েট্‌ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, জনসাধারণের ভোটে অধিকার আছে অথচ ধনীদিগের নাই।

রাশিয়াতে আইনতঃ সাম্যবাদী ভিন্ন অন্যদলের কোনো অস্তিত্ব নাই। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে জনসাধারণকে দলের উদ্দেশ্য ও মতামত বুঝাইবার জন্য স্থানীয় বলশেভিকদলের নির্ব্বাচন-সমিতি-সমূহ সভা আহ্বান করে। ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করিবার ভারও তাহাদের উপর। গুপ্ত-নির্ব্বাচন প্রথা না থাকায় সাম্যবাদী বা নিরপেক্ষ (non-party) ব্যতীত কাহারও নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই।

পল্লীগ্রামে অধিবাসীরা সমবেত হইয়া পল্লী-সোভিয়েট্‌ গঠন করে। বিভিন্ন কারখানা, বিবিধ কর্ম্মস্থল ইত্যাদিই নগরগুলির নির্ব্বাচন-কেন্দ্র, ইহার সহিত নগরের পল্লী-বিভাগের কোনো সম্বন্ধ নাই।

প্রতি জেলার অন্তর্গত গ্রামের ও নগর-সোভিয়েট্‌গুলির প্রতিনিধি লইয়া এক-একটি জেলা-সোভিয়েট্‌ গঠিত হয়। প্রাদেশিক সোভিয়েটে কিন্তু শুধু জেলা-সোভিয়েটের প্রতিনিধি থাকে না, নগর-সোভিয়েট্‌গুলি হইতেও কতকগুলি প্রতিনিধি সেখানে আসে। এইরূপে আবার সোভিয়েট্‌ কংগ্রেস্‌ গঠনের সময়েও, প্রাদেশিক সোভিয়েটের প্রতিনিধি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলির তৃতীয়বার নির্ব্বাচনের অধিকার রহিয়াছে।

সোভিয়েট্‌ কংগ্রেস্‌ নির্ব্বাচনের সময়, নগর সমুদয় হইতে প্রতি ২৫,০০০ নির্ব্বাচক একজন প্রতিনিধি পাঠায় কিন্তু প্রাদেশিক সোভিয়েট্‌ হইতে ১,২৫,০০০ অধিবাসীর জন্য একজন প্রতিনিধি মাত্র আসিতে পারে।

কৃষকদিগের প্রভাব কমাইবার এই দুই উপায়ের অর্থ এই যে, রাশিয়াতে কৃষকদের সংখ্যা শ্রমিকদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী অথচ সাম্যবাদে কৃষকশ্রেণীর উৎসাহ নাই। নগরবাসী শ্রমিকেরা উন্নতির সহায়, গ্রামের কৃষকেরা তাহার পরিপন্থী—এই বিশ্বাসে, শ্রমিক-কর্ত্তৃত্ব অটুট রাখিবার অভিপ্রায়ে, নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতে তাহাদের অতিরিক্ত অধিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯২১ সালে সামরিক সাম্যতন্ত্রের অবসানের সময় সকলে ভাবিয়াছিল যে, রাশিয়াতে সমষ্টিবাদ ব্যর্থ হইল। ১৯২৮ সালে চরমপন্থী

ট্রট্‌স্কির পরাজয়ের সময় সেই সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু সেই বৎসরেই ভবিষ্যদ্বক্তাদের অপ্রস্তুত করিয়া বল্‌শেভিকেরা নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে।

এই নূতন নীতির নাম পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ১৯২৮-এর অক্টোবর হইতে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচবৎসর কালব্যাপী এক বিপুল প্রচেষ্টার আরম্ভ রাশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন পরিচ্ছেদের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

ট্রট্‌স্কি-আন্দোলনের মূল কথা ছিল, তুইটি বিশ্ববিপ্লব ব্যতীত রাশিয়ার নূতন সমাজ গঠনের আশা স্বল্পমাত্র; এবং অবস্থাপন্ন কৃষক বা 'কুলাক্'-দিগকে অযথা আদর দিয়া রাশিয়াতে সাম্যতন্ত্রের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করা উচিত নহে। প্রথম মতের যাথার্থ্য ষ্টালিন্ স্বীকার করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন ব্যবস্থার একটি সংকল্প এই যে, নানা উপায়ে একত্রিক কৃষিপদ্ধতির প্রচার করিতে হইবে। কোন কোন অঞ্চলে প্রথম হইতে ষ্টেট্-পরিচালিত কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। এখন কৃষকেরা যাহাতে সমবেত কৃষিকার্য্যে যোগ দেয় তাহার বিধিমত চেষ্টা চলিতেছে। জমি ভাড়া লইবার স্বাধীনতা থাকায় রাশিয়াতে 'কুলাক্' শ্রেণী আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন নানা প্রকারে তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করাই শাসকদিগের উদ্দেশ্য।

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বহুলভাবে বৃদ্ধি নব-পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বল্‌শেভিক্‌দের আশা আছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির সমান হইয়া দাঁড়াইবে।

বিদেশ হইতে ঋণ পাওয়ার উপায় নাই বলিয়া এই প্রয়াসের মধ্যে রাশিয়ার অধিবাসীদিগকে অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া সংকল্প সাধনের অর্থ জোগাইতে হইতেছে। শ্রমিকদিগের তাহাতে অসন্তোষ নাই, কেননা তাহাদের স্বার্থের জন্যই এই উদ্যম।

বল্‌শেভিক্‌বাদের সমালোচকেরাও স্বীকার করিবেন যে, জনসাধারণের উন্নতির জন্য এইরূপ পরিশ্রম ও চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে নিতান্ত বিরল।

শ্রীসুশোভন সরকার

বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(২)

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র

যে-বিপুল বৌদ্ধসাহিত্যের পরিচয় দিয়েছি তা'র তুলনামূলক আলোচনা কর্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, বুদ্ধের নিজের ধর্ম্মমত পরবর্ত্তীকালে নানা সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। যে কোন শক্তিশালী ধর্ম্মমতের ক্রম-বিকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না। বুদ্ধের ধর্ম্মমত সঙ্কীর্ণ ছিল না—সেইজন্যই বহু শতাব্দী ধ'রে সে-ধর্ম্মমত প্রসারলাভ করেছিল। প্রতিভাবান বৌদ্ধ আচার্য্যদের যুক্তিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সে-ধর্ম্মমত নিত্য নূতন ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালের এই পল্লবিত বৌদ্ধধর্ম্ম বিচার কর্‌বার পূর্ব্বে আমরা বুদ্ধের নিজের ধর্ম্মমতের আভাস দেবার চেষ্টা কর্‌ব।

বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড মান্‌তেন না সত্য—কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট করাই যে তাঁর ধর্ম্মের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা বলা চলে না। কেউ কেউ বুদ্ধকে সোসিয়ালিষ্ট্‌ আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বা প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন যে, বুদ্ধ বর্ণবিভাগ ভেঙ্গে দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করেছিলেন, আবার অনেকে দেখিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন পতিতপাবন, কারণ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নীচজাতীয়। এ-সকল মতের কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ সোসিয়ালিষ্ট্‌ বা 'পতিতপাবন' কিছুই ছিলেন না। কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান তাঁর ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল না—মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ খুঁজে বে'র করবার জন্যই তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় সে-পথের সন্ধান পেয়ে দশজনকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছিল। এই মুক্তিমার্গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ—কোন বিশিষ্ট বর্ণের নিজস্ব নয়। বস্তুতঃ এই মার্গ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বানপ্রস্থ ও যতিরই রূপান্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ সার্ব্বজনীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বানপ্রস্থধর্ম্মে জাতি বা বর্ণ বিচার নেই—তাই বুদ্ধের ধর্ম্মেও তা' নেই।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এমন কথাও ঠিক নয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সব চেয়ে প্রাচীন বইতে ব্রাহ্মণের প্রশংসাই রয়েছে। অবশ্য এ ব্রাহ্মণ সত্যকার ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করলেই এ ব্রাহ্মণ হয় না। উপনিষদের ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্রাহ্মণই এই ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মপদে বুদ্ধ বল্‌ছেন—সূর্য্য যেরূপ দিনে, চন্দ্র রাত্রে, ও রাজা সেনানী

পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রদীপ্ত হ'ন, ব্রাহ্মণ সেইরূপ ধ্যান বলে প্রদীপ্ত হ'ন। যিনি পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাঁর অন্তর ও বাইরের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ দমিত, যাঁর আত্মপর জ্ঞান নষ্ট হ'য়ে সমদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, যিনি মানসিক ক্লেশ, সংযোগ বা আসক্তিশূন্য তিনিই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, বা তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারকে বুদ্ধ গর্হিত কাজ মনে করেছেন।

বুদ্ধ যে ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা'কে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চল্‌তে হ'ত। পরিধেয় বস্ত্র, পান ভোজন, ভিক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি বাইরের ব্যাপারে ভিক্ষুর নিজের স্বাধীনতা ছিল না। বুদ্ধ-প্রদর্শিত বিনয়-ব্যবহারের দ্বারাই এগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'ত। এই বিনয়-ব্যবহারকে বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিপুল বিনয়-পিটকের সৃষ্টি। কিন্তু এই বিনয়ের মূলসূত্রগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম বা বুদ্ধের নিজস্ব মনে করা অসঙ্গত হবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিগুলির ওপরই বৌদ্ধ-বিনয়-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য্য পালন করা, সত্য কথা বলা, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করা উভয় ধর্ম্মেরই মূলসূত্র। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লব্ধ ভিক্ষায় দেহপোষণ করা, সকল প্রাণীর ওপর সমদৃষ্টি, অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণায় সময় অতিবাহিত ক'রে মুক্তিকামনা বৌদ্ধভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য। সুতরাং বাইরের আচার ব্যবহারের দিক্ দিয়ে যে বুদ্ধের ধর্ম্মের একটা বিশিষ্টতা ছিল এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। অনেকে এই সব ভ্রান্ত মতকেই পল্লবিত ক'রে বল্‌তে চেয়েছেন যে, বুদ্ধের সময়ে উত্তর ভারতে যে-সব (কল্পিত ?) গণতন্ত্র বা রিপাব্লিক ছিল বুদ্ধ তা'রই আদর্শে নিজের সঙ্ঘকে তৈরী করেছিলেন—অর্থাৎ বুদ্ধের স্থাপিত বৌদ্ধসঙ্ঘও নাকি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র। এ-কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভিক্ষু হচ্ছে মুক্তিকামী বা মুক্ত। নিজের গুরু ব্যতীত আর কোন ব্যক্তির আদেশ তা'কে মান্‌তে হয় না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এই গুরু ছিলেন বুদ্ধ—পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘনায়কেরা। বুদ্ধ নিজে কা'রো নির্ব্বাচনের অপেক্ষা করেন নি। সঙ্ঘনায়কেরা নির্ব্বাচিত হ'তেন ভোটে নয়—অধ্যাত্ম-সাধনায় যে উৎকর্ষলাভ করতেন তা'রই বলে।

তাহ'লে প্রশ্ন উঠ্‌বে, বুদ্ধের ধর্ম্মে বৈশিষ্ট্য কোথায় ? এ-বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বা দর্শনে। গল্পের কথায় বল্‌তে গেলে বুদ্ধ মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখেই প্রথম দুঃখে অভিভূত হ'ন ; সেই সার্ব্বজনীন দুঃখের কারণ ও উপশমের উপায় নির্দ্ধারণ করবার জন্যই গৃহত্যাগ করেন। দ্বাদশ বৎসর সাধনার পর তিনি যে বোধিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্‌লেন—তা'তেই জগতের সকল রহস্য তাঁ'র সাম্‌নে উদ্ভাসিত হ'ল ও তিনি দুঃখের কারণ ও তা'র উপশমের উপায় নির্দ্ধারণ

করতে সমর্থ হলেন। এই দুঃখবাদ আলোচনা করবার পূর্ব্বে জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধ কি ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন দেখা যাক্।

উপনিষদের শিক্ষার সার মর্ম্ম হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের পেছনে কোন আত্যন্তিক সত্য নেই—জীব ও প্রকৃতি শুধু প্রতিভাস মাত্র—কল্পলোকের সৃষ্টি। আত্যন্তিক সত্য হচ্ছে—ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মেই জীবাত্মার একমাত্র অস্তিত্ব। বুদ্ধ এই অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথমটা মান্‌লেন—কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা বর্জ্জন কর্‌লেন। বুদ্ধের দর্শনেও জীব ও প্রকৃতি বা জগৎ প্রতিভাসমাত্র। কল্পলোকের 'অনিত্য' বা অস্থায়ী রচনা। বুদ্ধের ভাষায়—জীব ও জগৎ কতকগুলি 'ধর্ম্ম' ও 'সংস্কারের' প্রবাহমাত্র। এখানে ধর্ম্ম ও সংস্কার বিশেষ অর্থে বুঝ্‌তে হ'বে। ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে—'যা' ধারণ করে' আর সংস্কারের অর্থ হচ্ছে—'যাদের একসঙ্গে (সমীকৃত) করা যায়'।

তাই ধর্ম্মের অনুবাদ করা হয়েছে formation বা presentation এবং সংস্কারের অনুবাদ হয়েছে—mental aggregate বা coefficient। মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের যে সতত সংযোগ, তা'তেই বহির্জগত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই এই সংযোগ বাদ দিলে বহির্জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সংযোগ নিত্য নয়—প্রতিমুহূর্ত্তে সেই সংযোগেরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়ের এই গ্রহণ করবার ব্যাপারকেই ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ধর্ম্ম অনিত্য ও বিনাশশীল। প্রথম মুহূর্ত্তে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হচ্ছে, তার বিনাশ হ'য়ে পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি সাধিত হচ্ছে। নানা মুহূর্ত্তের ধর্ম্মের সমীকরণ ক'রে যে কল্পলোক সৃষ্ট হচ্ছে তাই হ'ল সংস্কার। সুতরাং এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম ও সংস্কারের প্রবাহেই বহির্জগতের অস্তিত্ব। অন্য সত্তা তা'র নেই। তাই বুদ্ধ বল্‌লেন—"সর্ব্বম্ অনিত্যম্ সর্ব্বম্ শূন্যম্"—সমস্তই অনিত্য ও শূন্য অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা। উপনিষদের শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধের মতের ঐক্য এই পর্য্যন্ত—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—এ সবের অস্তিত্ব বুদ্ধ মানেন নি। জীবাত্মাই যদি না থাক্‌লো তবে 'আমি' কোথায়—কে এই মিথ্যা জগতের রচনা করছে?

এই কথাই দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক রাজা মিলিন্দ (Menander) বৌদ্ধআচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মিলিন্দ নাগসেনের নাম জিজ্ঞাসা করতে নাগসেন তা'র উত্তরে বল্‌লেন—লোকে তাঁকে নাগসেন বলে। বস্তুতঃ সেটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র—তা'তে কোন 'পুদ্গল' বা জীবাত্মা বুঝায় না। তা'তে মিলিন্দ বল্‌লেন—একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে কে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে তাঁকে

পাত্র চীবর শয়নাসন ও ভিক্ষা দিচ্ছে—কেই বা সংঘের নিয়ম প্রতিপালন ক'রে সাধনায় রত হচ্ছে ও নির্ব্বাণলাভ করছে। একথা সত্য হ'লে পাপ পুণ্য থাক্‌ছে না—পুণ্য কাজও কেউ কর্‌ছে না, লোককে পীড়নও কেউ কর্‌ছে না। নাগসেন যখন সংজ্ঞা মাত্র তখন সত্যকার নাগসেন কে? লোম, নখ, মাংস, দন্ত প্রভৃতি নাগসেন নয়, 'রূপ' নাগসেন নয়, 'বেদনা' নাগসেন নয়, 'সংজ্ঞা বিজ্ঞান সংস্কার' প্রভৃতিও নাগসেন নয়—তাহ'লে নাগসেন নেই! তা'র উত্তরে নাগসেন বল্‌লেন—মহারাজ, আপনি রথে চ'ড়ে এসেছেন—রথ কি? চক্রকে রথ বল্‌বেন কি? যুগকাষ্ঠকে রথ বল্‌বেন কি? বা দণ্ড, রশ্মি, প্রতোলী প্রভৃতিকে রথ বল্‌বেন কি? এ গুলি যখন রথ নয় তখন রথ নেই—আপনি রথে চড়ে এসেছেন, এ মিথ্যা কথা।

উভয়ে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন যে—চক্র, দণ্ড, রশ্মি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে যা'কে 'রথ' এই ব্যাবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা'কেই রথ বলা হয়। সেইরূপ লোম নখ মাংস প্রভৃতি ও 'রূপ বেদনা সংস্কার সংজ্ঞা বিজ্ঞান' প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে নাগসেন এই ব্যাবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—ইহা নাম মাত্র। পারমার্থিক হিসাবে দেখ্‌লে নাগসেন ব'লে কোন পুদ্গল বা জীবাত্মা নেই। আছে শুধু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিজ্ঞান বা চিৎশক্তির প্রবাহ। এই বিজ্ঞান-সন্তান বা বিজ্ঞান প্রবাহেই জীবের বৈশিষ্ট্য বা আমিত্ব নিবদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্য যতক্ষণ থাক্‌ছে যতক্ষণ 'ধর্ম্ম' ও 'সংস্কারের' উৎপত্তি ও লয় অর্থাৎ মিথ্যা জগতের রচনা চল্‌ছে ততক্ষণই 'দুঃখের' অনুভূতি হচ্ছে।

জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে বুদ্ধ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলেই প্রথমে তাঁর দুঃখবাদ প্রচার করেন। এই দুঃখবাদকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাষায় আর্য্যসত্য (চত্বারি আর্য্যসত্যানি) বলা হয়। এই চারটি সত্য হচ্ছে দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধের উপায়। এই সত্যই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলসূত্র। সাধনায় বুদ্ধ যে জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করলেন তা'তে দেখতে পেলেন যে, জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তির নির্দ্ধারণ ক'রে সেই সব হেতুকে নষ্ট কর্‌বার উপায়ও তাঁকে বের কর্‌তে হ'ল। সত্যকথা বল্‌তে গেলে এই বিশ্লেষণ প্রণালী বুদ্ধের নিজের নয়। এ হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রের চিরন্তন প্রথা—যোগ শাস্ত্রেও এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসক রোগ দেখে প্রথমে তা'র হেতু নির্দ্ধারণ করেন, আরোগ্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও আরোগ্যের একমাত্র উপায় ভৈষজ্য প্রয়োগ করেন। যোগশাস্ত্রেরও মূলসূত্র হচ্ছে সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ

ও মোক্ষোপায়। জীব দুঃখবহুল সংসারে পতিত, তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ, সেই সংযোগের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ, মোক্ষের উপায় হচ্ছে সম্যক্ অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভ করা। বুদ্ধও তাই দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখ নিরোধ ও নিরোধোপায় স্থির করাই তাঁর নূতন ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য মনে কর্‌লেন।

[যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্ঃ রোগো রোগহেতুরারোগ্যম্ ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রম্ চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ, সংসারহেতুর্মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধান পুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্ হানোপায়ঃ সম্যগদর্শনম্।]

তাঁর মতে জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ আট প্রকারের—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয়-বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। জীবমাত্রেই এই আট প্রকারের দুঃখে অভিভূত, প্রত্যেকেরই জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ আছে, প্রত্যেককেই প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ভোগ কর্‌তে ও অপ্রিয়জনের সংস্পর্শেও আস্‌তে হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব সময় সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুও সব দুঃখজনক।

এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি কোথায়? দুঃখের উৎপত্তি আলোচনা কর্‌তে গিয়ে বুদ্ধ কতকগুলি কার্য্য-কারণের পরম্পরা নির্দ্ধারণ করেছেন—তা'কে বৌদ্ধধর্ম্মের ভাষায় বলা হয় 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে একের অবলম্বনে অন্যের উৎপত্তি,—সেই জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুবাদ হয়েছে chain of dependant causation। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখা করা হয়েছে—অস্মিন্ সতীদং ভবতি, অস্যোৎপাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে—অর্থাৎ একটী কারণ ঘট্‌লে অন্যটী ঘটে, একের উৎপত্তি হ'লে অন্যের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ দুঃখসমুদয়ের কারণ দেখিয়েছেন বারোটী—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ।

অবিদ্যা হচ্ছে, অন্তরের ও বাইরের অ-জ্ঞান। জগৎ দুঃখময়, সে দুঃখের স্বভাব, দুঃখের কারণ, দুঃখোৎপত্তির কারণকে বন্ধ করার আবশ্যকতা ও তা'র উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই হচ্ছে অবিদ্যা। কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য ও বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে সমস্ত ধর্ম্মের (formation) উৎপত্তি হচ্ছে তা' না জানাও অবিদ্যা।

এই অবিদ্যার থেকেই সংস্কারের উৎপত্তি হচ্ছে। বহির্জগতের সঙ্গে দেহ বাক্য ও মনের যে প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় তা'তেই সংস্কারের উৎপত্তি। এই সংস্কারের উৎপত্তির সঙ্গেই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য আরম্ভ

হয় ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। যখনই প্রকৃতির সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রি য়ও মনের সম্পূর্ণ যোগ স্থাপিত হয় তখনই নামরূপের উৎপত্তি হয়। বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকেই 'নাম' ও চারটি মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ) ও চতুর্মহাভূতাত্মক বস্তুকেই 'রূপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই উভয়ের উৎপত্তিতেই পুদ্গল বা বিশিষ্ট জীবের উদ্ভব। এই নামরূপ উৎপন্ন হ'লেই জীবের ষড়ায়তন বা চক্ষু, কর্ণ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলির এই আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয় তখনই প্রথম বহির্জগতের সঙ্গে তাদের স্পর্শ বা সংযোগ সাধিত হয়। এই সংস্পর্শেই নানারূপ দুঃখ, অদুঃখ বা সুখময় 'বেদনা' বা অনুভূতির উৎপত্তি। সেই বেদনা বা অনুভূতিই হ'ল তৃষ্ণার কারণ। তৃষ্ণা তিন প্রকারের—কামতৃষ্ণা (sensual), রূপতৃষ্ণা (formal) ও অরূপ তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা থেকেই উপাদান বা গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা আসে। উপাদানই হচ্ছে 'ভব' বা জন্মগ্রহণ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষার কারণ। এই কারণ ঘটলেই জীব 'জাতি' বা জন্মান্তর গ্রহণ করে ও জরামরণ প্রভৃতিতে অভিভূত হয়। সুতরাং জীবের এই দুঃখময় সংসার (transmigration) বা আসা-যাওয়ার মূলে রয়েছে এই কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল। এই সব কারণের নিরোধ বা নিবৃত্তিতেই সকল দুঃখের অবসান।

দুঃখের এই হেতু নিরোধের উপায় হচ্ছে নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই বৌদ্ধসাধকের প্রধান কাম্য। তাই নির্ব্বাণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ কর্‌তে গিয়েই যত তর্কবিতর্কের অবতারণা ও নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ভিতর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। নির্ব্বাণের ধাতুগত অর্থ সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। নির্ব্বাণের এই অর্থ গ্রহণ করেই অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মকে দুঃখবাদ মনে করেছেন। সংসার যখন দুঃখময়, ইহজগতে বা পরজগতে যখন এমন কিছুই নেই যাকে অবলম্বন ক'রে মানুষ চিরানন্দ উপভোগ কর্‌তে পারে তখন এই দুঃখময় সংসার থেকে অব্যাহতি লাভ কর্‌বার একমাত্র উপায় দেহের বিনাশ বা নির্ব্বাপণ। কিন্তু নির্ব্বাণ যে তা' নয় সে কথা সব চেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। নির্ব্বাণ দেহের বিনাশে নয় প্রবৃত্তির বিনাশে। তাই ধর্ম্মপদে বুদ্ধ বল্‌ছেন—

"সারথি যেরূপ অশ্বকে দমন করে সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কে শান্ত করেছেন—যিনি নিরভিমান ও কলুষহীন—দেবতারাও তাঁকে ঈর্ষ্যা করেন।"

"যিনি সম্যক্‌ব্রতধারী, শত্রুমিত্রে ও শুভাশুভে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ ও বিরাগশূন্য তিনি পঙ্কহীন হ্রদের মত নির্ম্মল ও শান্ত। তাঁর সংসার বা আসা-যাওয়া নেই।"

এই সমভাব ও শান্তির অবস্থাই হচ্ছে নির্ব্বাণ। এ অবস্থা আনন্দের, নিরানন্দের নয়, তাই ধম্মপদে নিবৃত্ত বুদ্ধ বল্‌ছেন—

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো ॥
সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনাতুরা ॥
সুসুখং বত জীবাম উস্‌সুকেসু অনুস্‌সকা।
উস্‌সুকেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনুস্‌সুকা ॥
সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্কা ভবিস্‌সাম দেবা আভস্‌সরা যথা ॥

"বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরিহীন হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করব, বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হ'য়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশরহিত হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আমাদের মধ্যে যা'দের কোন আসক্তি নেই তা'রা ভাস্বর দেবগণের ন্যায় প্রীতিভক্ষা বা আনন্দভাজ হ'য়ে সুখে জীবনযাপন কর্‌বে।"

সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্‌স সন্তচিত্তস্‌স ভিক্‌খুনো।
অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্‌সতো ॥

"যিনি শূন্যাগারে প্রবিষ্ট বা আসক্তিশূন্য হয়েছেন, যিনি শান্তচিত্ত, ও ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ দেখ্‌তে পেয়েছেন সেই ভিক্ষু অমানুষী রতি বা দিব্য আনন্দ লাভ ক'রে থাকেন।

নির্ব্বাণ যে আনন্দময় সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজা মিলিন্দও এই সন্দেহ করেছিলেন। রাজা মিলিন্দ ছিলেন গ্রীক্, তাঁর মনও সম্পূর্ণ গ্রীসীয় মন। তাই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনকে বল্‌লেন—নাগসেন, আপনি যে বল্‌লেন নির্ব্বাণ সর্ব্বতো-ভাবে সুখময় তা' আমার মনে হয় না। নির্ব্বাণ নিশ্চয়ই দুঃখমিশ্রিত। তার কারণ আপনিই বলেছেন যে, যাঁরা নির্ব্বাণলাভ করেন তাঁরা দেহ ও চিত্ত ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, বাসস্থান, শয়ন, আহার প্রভৃতি বর্জ্জন করেন, আয়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিনাশ করেন ও ধনধান্য এবং প্রিয়তম জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করেন। তা'ই যদি নির্ব্বাণের অবস্থা হয়, তাহ'লে আর নির্ব্বাণে আনন্দ কোথায়। জগতে সুখই যাঁদের কাম্য ও যাঁরা সত্যই সুখী তাঁরা আয়তনকে অবলম্বন করেই সুখভোগ করেন। রূপময় সৌন্দর্য্যকে চক্ষুদ্বারা, শব্দময় গীতিবাদ্যকে শ্রবণের দ্বারা, ফুলফল প্রভৃতি গন্ধময় দ্রব্যকে ঘ্রাণের দ্বারা, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি সুমধুর দ্রব্যকে স্পর্শের দ্বারা শুভাশুভ—বিতর্ক ও মনসিকারের দ্বারা উপভোগ করেন। আর আপনারা চক্ষু শ্রবণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন প্রভৃতিকে হনন ক'রে, ছেদন ক'রে ও রোধ ক'রে সুখ ভোগ কর্‌তে চান—এতে দেহ ও চিত্তই শুধু পীড়িত

হয়, আনন্দলাভ হয় না। তাই আপনাদের নির্ব্বাণ যে দুঃখমিশ্রিত তা'তে আর সন্দেহ কি।

এর উত্তরে নাগসেন বল্‌লেন—একথা ঠিক নয় মহারাজ, নির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবেই আনন্দময়। আপনি যা'কে নির্ব্বাণ মনে করেছেন সে শুধু নির্ব্বাণের পূর্ব্বভাগ, সেই অবস্থাতেই ভিক্ষু দেহ ও চিত্তকে ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আয়তনের বিনাশ সাধন করেন, কিন্তু ঠিক নির্ব্বাণের অবস্থা তা' নয়। আপনি যে রাজ্যসুখ উপভোগ করেন—সে সুখকে দুঃখমিশ্রিত বলা ভুল হ'বে। এ কথা সত্য, আপনাকে প্রত্যন্ত রাজাদের দমন কর্‌তে হয়, মন্ত্রী অমাত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রবাস যাপন কর্‌তে হয়, ও রাজ্যপালনের জন্য আরও বহুবিধ ক্লেশভোগ কর্‌তে হয়, কিন্তু এ সব হচ্ছে রাজ্যসুখের পূর্ব্বাংশ মাত্র। এ সমস্ত কষ্টভোগ কর্‌বার পর আপনি রাজ্যসুখ উপভোগ করেন। সে সুখ তখন আর দুঃখমিশ্রিত নয়, নির্ব্বাণের অবস্থাও তেমনি দুঃখমিশ্রিত নয়, সর্ব্বতোভাবে আনন্দময়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

তিনরাত্রি

তর্ক তুমুল হইয়া উঠিয়াছে সতীত্ব লইয়া। বক্তারা সকলেই আধুনিক, অর্থাৎ তার্কিক, অর্থাৎ স্বল্প অভিজ্ঞতায় বড় বড় সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র। বিষয়টীও মনোমদ, কারণ সতীত্ব কথাটা সুধু নারীর বেলায়ই প্রযোজ্য, পুরুষের নহে। তাই পুরুষের প্রতি নারীর মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত, তাহারই একটা পাকাপাকি মীমাংসা এই কয়জন যুবকে মিলিয়া স্থির করিতে চায়।

শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইত্যাদির ঠেলায় মূল বক্তব্যটী ক্রমাগত পাক খাইয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় শৈলেন সমস্ত তর্কের মোহ কাটাইয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্‌ছি, তর্ক কোরে এর কোন শেষ পাওয়া যাচ্ছে না। সুবোধ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে দমাইয়া রাখিয়া শৈলেন বলিতে লাগিল—থামো তোমরা, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। আমি বল্‌তে চাই, আমার সতীত্বের আদর্শকে আমি কথার বাঁধনে বাঁধ্‌তে পার্‌ছি না বটে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমার ভুল হয় না। যেমন মিষ্টতা কাকে বলে তা বর্ণনা কোরে বোঝান না গেলেও, কোনো জিনিস মিষ্টি কি-না, তা সহজেই ঠিক করা যায়।

সুবোধ বলিল,—তার মানে কি এই বুঝ্‌তে হবে যে, তোমাকে যদি কোন রমণীর কাহিনী শোনানো যায়, তাহ'লে তুমি তার ভালমন্দ বিচার কোরে দাম ঠিক কোরে দিতে পার?

শৈলেনের অসন্দিগ্ধ উত্তর আসিল,—হাঁ, পারি বৈকি!

রমেন বলিল—তাহ'লে আমি তোমাদের একটা গল্প বলি শোন।

পরেশ হাঁকিয়া কহিল—গল্প হ'লে হবে না, সত্যি হওয়া চাই।

শৈলেন বলিল—পরেশটা ত আচ্ছা নিরেট। আমার মত-পরীক্ষার জন্য সত্য উদাহরণের কি দরকার? অসম্ভব না হলেই হোল।

সুবোধ বলিল—তাছাড়া, নিছক সত্য অতি শুক্‌নো জিনিস। রমেন, তুই যা বল্‌তে চাচ্ছিস্‌, বল্‌, কিন্তু তা যদি গল্প না হয়, তাহ'লে কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দেব।

রমেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কিন্তু আমি যা বল্‌তে চাচ্ছি, তা যদি বেশীর ভাগই সত্য হয়—

সুবোধ বলিল—আমি কি তোকে সত্যি বল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমি বল্‌ছি-কি, তোর গল্পে সত্যি থাকে থাক্‌ কিন্তু সেই সত্যকে কল্পনার জারক রসে জীর্ণ কোরে নিতে হবে। নইলে গল্প সরস হবে কেন? শুধু সত্যে ত কোন রস নেই; রস মানুষের কল্পনায়।

পরেশ বলিল—তাহ'লে গল্পটা কি সত্যিও হবে না, মিথ্যেও হবে না?

সুবোধ বলিল—এতক্ষণে তুই ঠিক বুঝেচিস্, পরেশ। যা গল্প, তা সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়; তা, সত্য-মিথ্যার অতীত এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। তার নিয়ম-কানুন আলাদা, আর সে-জগতের একমাত্র দেবী,—সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী স্বয়ং।

শৈলেন অসহিষ্ণুভাবে কহিল—সুবোধ, তোর আর্ট-এর ব্যাখ্যা এখন রাখ্। রমেন, বল্ তোর গল্প বল্; কথা দিচ্ছি, আমি তোকে জিজ্ঞাসাও কোরব না, তোর গল্প সত্যি কি মিথ্যে।

রমেন আরম্ভ করিল—একটী ছেলে। ধর তার নাম, এক্স্। কল্কাতায় থাকে, কলেজে পড়ে। 'দেশ' একটা আছে, দোল-দুর্গোৎসবও হয়। কিন্তু তারা বড় যায় না। দেশের আত্মীয়দের হাতেই সব ভার। কিন্তু সে-বার পরীক্ষার বছর। দেবদ্বিজে ভক্তি দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠল। তাই পূজোয় সে দেশে গেল, একাই।

দেশের বাড়ী আত্মীয়-স্বজনে ভরপুর। খুড়তুতো, জ্যাঠ্তুতো, পিস্তুতো ইত্যাদি বৌদিই আট-দশ জন। কেউ বা তার মায়ের সমবয়সী; আবার কেউ কেউ সম্পর্কে বড় হ'লেও, বয়সে প্রায় কাছাকাছি ব'লে সামনে বেরোন না। অবশ্য এমন চার-পাঁচ জন ছিলেন যাদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে রঙ্গ-রহস্য করা যায়।

এক্স্ প্রায় দেশে যায় না। এবার দিনকয়েকের জন্য গিয়েছে। কাজেই তাকে নিয়ে ছেলে ও মেয়েমহলেও বেশ একটু সোরগোল প'ড়ে গেল।

এক্স্-এর স্বভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে, সে দলের মধ্যে মুখচোরা। অথচ যার সঙ্গে তার জ'মে যায় তার সঙ্গে কথার শেষ থাকেনা।

সে বেশ বুঝ্তে পারল, তার স্বভাবের এই রহস্যটী অন্ততঃ একজন ধরে ফেলেছে। সে তার এক পিস্তুতো বৌদিদি। ইনিও পূজা উপলক্ষে অতিথি। তবে ইনি একবার কল্কাতায় এদের বাড়ী বেড়িয়ে গেছেন। তাই আগে থেকেই পরিচয় ছিল।

বাড়ীভরা লোকজন, চারিদিকে হট্টগোল, কাজকর্ম্ম; অথচ তার মধ্যেই যে কেমন কোরে এই দুটি প্রাণী নিজেদের বিচ্ছিন্ন কোরে নিয়ে গল্পে মেতে যেতো, তা যদি তোমরা বুঝে নিতে না পার, ত কেউই বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

বাড়ীর অন্যান্য বৌদিরা মাঝে মাঝে বলেন—কী, তোমার 'হাসি-বৌদি'কে পেয়ে যে আমাদের একেবারেই ভুলে গেলে!

সে একটু হেসে, একটু অপরাধী বোধ কোরে, বলে,—কি করি; আপনারা যা দুষ্প্রাপ্য। কাজ আর আপনাদের ফুরোতে চায় না।

একটু হিংসার সুরে একজন বল্লেন—ওর সঙ্গে কার কথা? কাচ্চা বাচ্চার বালাই ত নেই। ছোট্টবেলায় একটী হ'য়ে এখন বড় হ'য়ে গেছে। তা-ও আবার সে তোমার পিসীমারই কোল-ঘেঁসা। মাকে সে পোছেও না, মা-ও তার খবর রাখে না। কাজেই উনি বেশ পটের বিবিটী সেজে হেসেখেলে বেড়াতে পারেন। ঠাকুরপো, তুমি জহুরী ভাল; কি লাগসৈ নামই দিয়েছ—'হাসি-বৌদি', যেন ঠিক হাঁড়ির মুখে সরাখানি।

আর একটু সুর চড়িয়ে আর একজন ধরলেন—যার কপাল ভাল, তার কি সবই ভাল? কর্ত্তাটীও কেমন জুটেছে—যেন কল্‌কাতার রাস্তার জলের কল; টেপো—জল দিচ্ছি; না টেপো—চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে আছি।

হাসি-বৌদি বল্‌লেন—লোভ হচ্ছে না কি, নতুনদি। চান্ ত লিখে প'ড়ে দান কোরে দিতে রাজী আছি।

নতুন-বৌদি রঙ্গ কোরে বল্লেন—লোভ যে হয় না, তা-নয়; তবে কি-না কাউকে বদল দিতে পারবো না; সে আমার সইবে না ভাই, তা সে আমার তিনি যতই মন্দই হোন্।

হাসি-বৌদি বল্‌লেন—জানিগো জানি, নতুন-ভাসুর তোমায় গুণ কোরেছেন। তা ভাই, আমিও বদল চাইনে। আর বদল নিতে গেলে বড়র দিকে ওঠার চাইতে ছোটর দিকে নামাই ভাল। কি বল, ঠাকুরপো?

সাধারণতঃ এ ধরণের রসিকতায় এক্‌স্ যোগদান কোর্‌তে পারে না, অনভ্যস্ত ব'লে। কিন্তু একেবারে যে খারাপ লাগে, তা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সে এবারে বল্লে—আপনি বুঝি সাক্ষী মানার আর কোন লোক পেলেন না?

হাসি-বৌদি বল্‌লেন—কোথায় আর পাবো? আমার দেবর বল্‌তেও তুমি, ননদ বল্‌তেও তুমি। ভেবে দেখ, তোমার দাদার তিন কুলে ছোট ভাই-বোন কেউ নেই, এক তুমি ছাড়া। তাই ত তোমাকে ক'দিন পেয়ে আশ মিটিয়ে নিতে চাচ্ছি। এঁদের ত অনেক আছে, তবু এদের সয় না কেন, বল ত?

নতুন-বৌদি বল্‌লেন—দেখ্‌লে ঠাকুরপো দেখ্‌লে, তোমার সামনেই আমাদের গাল দিচ্ছে; বল্‌ছে—আমরা হিংসুটে।

এক্‌স্ একটু হেসে বল্লে—হোলই বা। উনি যে আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রিতা।

পরেশ আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—তোর দিনগুলো তাহ'লে বেশ কেটেছিল বল্ ?

সুবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল—ও-কে কোথায় পেলি রে ? এ ত একস্-এর গল্প হচ্ছিল।

শৈলেন অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া কহিল—তা'তে আমার কিচ্ছু এসে যাচ্ছে না। আমার কাছে রমুও যা, এক্স্-ও তাই।

রমেন অপ্রতিভ না হইয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—এখন থেকে তাহ'লে উত্তম পুরুষেই বলা যাক্। পরেশ সত্যি কথাই বল্‌ছিল, ক'দিন যে কেমন কোরে কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারি নি। তারপর ফির্‌বার সময় হোল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি। আমাদেরই বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে দেশের সখের দলের থিয়েটার হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। খানিকটা জায়গা চিক দিয়ে আড়াল করা মেয়েদের জন্য। সেখানে লোকসংখ্যা বড় কম নয়। রাত যখন প্রায় বারোটা বাজে, আমি উঠে পড়্‌লাম। তার পরের দিন সকালেই ফির্‌তে হবে, তাই রাত্রে একটু ঘুমের দরকার ছিল।

চিক-ঘেরা জায়গার কাছে এসে ডেকে বল্‌লাম, জ্যাঠাইমা, আমি এখন শুতে যাচ্ছি।

জ্যাঠাইমা বল্‌লেন—চল্, তোর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি। ধরো ত বৌমা এই খুকীটাকে। অত নেড়ো না, ঘুম ভেঙে যাবে, তাহ'লে আর কারো দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে না।

চট্ কোরে হাসি-বৌদি উঠে পড়ে বল্লেন—আপনার উঠ্‌তে হবে না, বড়মামীমা। আমি ঠিক্‌ঠাক্ কোরে দিয়ে আসছি।

দুজনে একটা খোলা জায়গা পার হ'য়ে আসছি। শরতের গাঢ়নীল আকাশ যেন জ্যোৎস্নার আড়ালে লুকিয়েছে। প্রায় সব তারাই অদৃশ্য, কেবল এদিকে ওদিকে কয়েকটা বড় বড় তারার অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস চোখে পড়ে। মাথার উপরেই চাঁদ ; তাই ছায়াগুলিও যতদূর সম্ভব ছোট হ'য়ে গেছে। তাদের ঘন কাল রং যেন তাদের লজ্জার রূপ—আলোর কাছে পরাজয়ের লজ্জা। হাল্‌কা দু-একখানা সাদা মেঘ আকাশের বিস্তীর্ণতায় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বল্লাম—হাসি-বৌদি, অত জোরে চলেছেন কেন ? চেয়ে দেখুন না একবার আলোর বান ডেকে, সমস্ত আকাশটা যেন থই থই কোরছে।

—যদি একটা মেঘের ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়ান যেত—কিন্তু কল্পনা ত কখনও সত্যি হয় না।

—কেন হয় না। হয় বৈ কি।

বৌদি কি রকম একটু উত্তেজিত স্বরে বল্লেন—হয় ? ঠিক বল্‌ছ !

আমি বল্লাম—হয়, তবে তখ্‌খুনি হয় না। সময় লাগে, অপেক্ষা কোরতে হয়।

বৌদি কেমন যেন নিবে গিয়ে বল্লেন—ওটী আমার দ্বারা হবে না। হয়, ত এখনই চাই, নইলে দরকার নেই।

আমি একটু হেসে বল্লাম—তাহ'লে আপনার ভাগ্যে পাওয়া নেই।

আমার মুখের দিকে রহস্যভরে তাকিয়ে বৌদি বল্লেন—ইস্, দেখা যাবে।

ভিতর-বাড়ীর চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। কেউ কোনোদিকে নেই, সব বাইরের উঠানে থিয়েটারে ব্যস্ত।

মশারি ফেলে দিয়ে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে বৌদি বল্লেন—তুমি ত বল্‌ছিলে তুমি নাকি খুব রাত জেগে পড়ো ?

—হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ একথা যে ?

—আর খানিকক্ষণ না হয় জাগ্‌লে—সবে ত বারোটা; কাল সকালেই ত যাচ্ছ।

—বেশ ত, আসুন না ভিতরে।

বৌদি ভিতরে ঢুকে বল্লেন—আবার কতকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?

—কেন, আপনি কি আর এর মধ্যে কল্‌কাতায় যাবেন না ?

—তুমি নিয়ে গেলেই পার ?

—আচ্ছা, আমি গিয়ে মাকে বল্‌ব।

—কি বল্‌বে ?

—যে আপনি আমাদের কাছে আস্‌তে চান।

—কেন, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও এটা বল্‌তে বুঝি লজ্জা কোরবে ?

কথাটা শুনে সত্যিই একটু লজ্জা এল। তা চেপে বল্লাম—

বাঃ, লজ্জা কিসের ? সত্যি, আপনাকে এবার আমার এত ভাল লেগেছে।

—কেন বল ত ?

—আপনার সঙ্গে আমার বেশ মনের মিল আছে।

—আমার মন কি তুমি সবটা দেখ্‌তে পেয়েছ যে ওকথা বল্‌ছ ?

তারপর আমায় একটু নাড়া দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বল্লেন, ওগো আমাদের মন বোঝা অত সোজা কাজ নয়। ও সুধু দুখান বই প'ড়ে হয় না। অনেক সাধনা করা চাই।

একটু থেমে আবার বল্লেন—আবার এমন বোকাও অনেক আছে যে, বুঝিয়ে দিলেও বুঝ্‌তে পারে না।

—আমায় যেন সে দলে ফেল্‌বেন না, দয়া কোরে।

অন্যমনস্ক উত্তর এলো—কি জানি, তা এখনও ঠিক বল্‌তে পারছি না।

একটা ঘণ্টা-বাজার শব্দ এলো। বল্লাম—প্লে আবার আরম্ভ হ'য়ে গেল কিন্তু।

—হোক্‌ গে, ও বই আমার দেখা আছে। তাছাড়া বইটা আমার ভালো লাগে না।

—কি রকম? 'চন্দ্রগুপ্ত' আপনার ভাল লাগে না?

—না, শেষটা আমার ভালো লাগেনি। ও রকম জোর কোরে একজনের দুটো বিয়ে দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না; মেয়েদের ভালোবাসাটা যেন ফেল্‌না—যে একপুরুষ দুজনেরটাই ভোগ কোরবেন।

—আপনি কি বল্‌তে চান, দুজন নারী একই পুরুষকে ভালবাসতে পারে না?

—বাসে বাসুক, কিন্তু তাদের বিয়ে দিয়ে সতীন করা কেন? তা না হ'লে হয়ত মেয়েদুটীও পরস্পরকে শ্রদ্ধা কোর্‌তে পারত?

কথাটা আমার নতুন লেগেছিল। আমি এদিক থেকে ব্যাপারটা কখনও ভাবিনি। তাই একটু চুপ্‌ কোরে রইলাম।

বৌদি বেশ একটু ঝাঁজ দিয়ে বল্লেন—আমার হাতে কলম থাক্‌লে আমি একটা মেয়ের দুটো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেখ্‌তাম, পুরুষদের কেমন লাগে?

—তাতে আপনার স্বজাতীয়রাই আপনাকে সব থেকে বেশী ছি-ছি কোর্‌তেন। আর গল্প ভাল হ'লে, পুরুষদের মধ্যে অন্ততঃ আমি আপত্তি কোর্‌তাম না। আমি নরনারীর সমান অধিকারে বিশ্বাস করি।

—তুমি,—তুমি তাহ'লে আপত্তি করো না? এমন এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তিনি এই কথাগুলি বল্লেন যে, আমার গা-টা যেন শিউরে উঠল। তার পরেই দেখি আমি তাঁর উন্মত্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এ ক'দিন অনেক গল্প, অনেক রহস্য করেছি বটে, কিন্তু এ কথা ত কখনও মনে আসে নি। আমার চেয়ে সম্পর্কে ত বড়ই, বয়সেও দু-তিন বছরের বড় হবেন। গুরুজন ব'লে সম্মান ক'রে চলেছি। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আমার কেমন ভয়ে কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল। মনে হোল, আমিই যেন কি একটা মস্ত অপরাধ, তাঁকে যেন অসম্মান, ক'রে ফেলেছি।

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফির্‌তে ফির্‌তে বল্লাম—আমার বড় ঘুম আস্‌ছে। আমি ঘুমুই।

কিছুক্ষণ কোন কথা নাই। সুধু দ্রুত নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ।

—নেহাৎ কাঁচা; সুধু মুখ-সর্ব্বস্ব। এই ব'লে তিনি উঠে গেলেন।

রমেন থামিল। আর সকলেও চুপ্‌চাপ্‌। সুবোধের মুখ দেখিলে মনে হয়, গল্পটীর মধ্যে সে জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু শৈলেন মোটেই শুনিতেছে কি-না, তাহাও স্পষ্ট বুঝিবার জো নাই। পরেশই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

—সে রাত্রে তুই ঘুমুতে পেরেছিলি?

রমেন বলিল—না পারার কথা ত মনে পড়ছে না।

সুবোধ বলিল—এই রকম ঈডিয়ট্‌ ছিলি?

রমেন বলিল—ঈডিয়ট্‌ কি আবার? আমার অবস্থায় পড়লে তুই-ই বা কি করতিস্‌?

দেখা গেল গল্পটী শুনিবার আগ্রহ শৈলেনেরই সব থেকে বেশী। সে চেঁচাইয়া বলিল—তোরা কি ভাবছিস্‌ গল্পটা শেষ হ'য়ে গেছে? রমু, থাম্‌লি কেন?

রমেন আবার সুরু করিল—পরের দিন উঠ্‌তে দেরী হ'য়ে গেল; ঘুম ভেঙে চোখ মেলেই দেখি—হাসি-বৌদি। স্নান সারা হ'য়ে গেছে; চওড়া পাড়ের সাদা সাড়ীখানা যেন তাঁর সর্ব্বদেহের স্নিগ্ধ-সুষমার প্রতিরূপ। বেশ সহজ সুরে আমায় বল্লেন—উঠেছ? আমি ভাব্‌ছিলাম, আমার সমস্ত আয়োজন বুঝি ব্যর্থ হয়।

অত্যন্ত দ্বিধাভাবে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—আয়োজন? আমার জন্যে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নইলে আজ কল্‌কাতায় যাচ্ছি কি আমি? বাড়ীর সকলে ত এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছেন—কাল রাত জাগার পর। আমি উঠে যোগাড় কোরে না রাখ্‌লে আজ তোমার যাওয়াই হোত না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম—আপনি কী ভাল লোক, বৌদি, আপনাকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছে করছে।

বৌদি কিছু না ব'লে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হোল যেন নেবানো টর্চ্চ-লাইট্‌। কাল রাত্রে এঁর মধ্যে যে বিদ্যুৎ-বহ্নির বিকাশ হয়েছিল, আজ এঁকে দেখে কে তা বুঝ্‌তে পারে?

পরেশ বলিল—সে টর্চ্চ-লাইট্‌ কি আর জ্বলে নি?

শৈলেন বলিল—ছ্যাখ্ পরেশ, তোর কি একটু সবুর সয় না ?

সুবোধ বলিল—আমার কিন্তু গল্পের শেষ জান্‌তে মোটেই আগ্রহ হয় না ; যেখানেই থাম না কেন, আমি নিজের মনের মত শেষ কোরে নিতে পারি।

রমেন বলিল—তাহ'লে আমি এখন থামি ; তুই তোর ইচ্ছামত শেষ কর।

সুবোধ বলিল—স্বচ্ছন্দে। দাঁড়া, একটু ভেবে নিই।

শৈলেন বলিল—দোহাই সুবোধ, বারওয়ারী গল্পের পালা আর একদিন হবে। আজ রমেনই শেষ করুক ?

পরেশ বলিল—সেই ভাল, নইলে রমুর গল্পকে সুবোধ মাটী ক'রে দিত।

রমেন বলিল—দিনকয়েক পরে এক চিঠি পেলাম। তার আসল বক্তব্য এইরূপ—আমার কাছে তোমার ফাউণ্টেন পেন্ ফেলে গেছ, মনে পড়ছে কি ? ক'দিনের মধ্যে খোঁজও করলে না ! আমায় ত সেটা উপহার দিয়ে যাও নি, তাই আজ ডাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রাপ্তি সংবাদ দিতে ভুলো না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কি শুভক্ষণে কলমটা ফেলে এসেছিলাম। আমাদের চিঠি-লেখালিখি আরম্ভ হোল।

আমার তখন সেই বয়স যখন মন প্রথম মেয়েদের সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে ওঠে। কাব্যনাটকের নায়িকারা মুগ্ধ কোরলেও, তৃপ্ত করে না ; বন্ধুপ্রীতিও অসম্পূর্ণ লাগে। মন তখন একটী সজীব নারীর হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শের জন্য আকুল থাকে। স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, যথেষ্ট বোধ হয় না, সখীত্বের অভাব যেন কিছুতেই মেটে না। এ অভাব পূরণ হওয়া আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত সুকঠিন। কিন্তু হাসি-বৌদি আমায় সে সুযোগ দিয়েছিলেন। চিঠির মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যের বন্ধন সৃষ্ট হোল। কী ভালোই লাগ্‌ত, চিঠি লিখ্‌তে আর চিঠি পেতে। যা খুসী লিখে যেতাম—কবিতা, গল্প, উচ্ছ্বাস, খেয়াল ; বন্ধু-বান্ধব, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ,—সব বিষয়। কত সময় বুঝ্‌তে পারতুম তাঁর বিদ্যের বাইরে যাচ্ছি ; কিন্তু তবু না লিখে স্বস্তি ছিলনা। পেতাম রহস্যের উত্তরে রহস্য, ভাবের বদলে ভাব, আমার বই-পড়া বিদ্যের পরিবর্ত্তে চোখে-দেখা সংসারের অভিজ্ঞতা। হাতের লেখাটী পরিচ্ছন্ন হ'লেও বানান ভুল, ব্যাকরণের ত্রুটি অজস্র। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকখানি চিঠি একটী সজীব মেয়েলি মনের 'কালি-কলম' ছবির মত। সোজা খোলাখুলি চিঠি—মাঝে

মাঝে অনেকেই পড়তেন ও উপভোগ কোর্‌তেন। সপ্তাহে একখানা, তুখানা, তিনখানা—যেন দূরে থেকে ফুল-ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা। এমন কোরে বছর খানেক কাট্‌ল।

সুবোধ বলিল—তারপর পূজোর সময় তুই আবার দেশে গেলি ?

রমেন বলিল—না, পূজোয় যাওয়া হোল না, কিন্তু গেলাম গরমের ছুটিতে। দেশে খুব আম হয়েছিল, তাই জ্যেঠাইমা নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি গ্রাম ফাঁকা ; কেননা, বেশীর ভাগ লোকই বিদেশে কাজকর্ম্ম বা লেখাপড়া উপলক্ষে। তুর্গাপূজায় প্রায় সবাই দেশে আসেন, ও তখন বেশ সরগরম হ'য়ে ওঠে। বড় হ'য়ে অবধি আমি পূজোয় ছাড়া অন্য কখনও দেশে যাইনি। কমল-বিলাসীর দেশ যে কাল্পনিক নয়, পরিপূর্ণ কুঁড়েমি যে বাস্তবজীবনে সম্ভব, তার চাক্ষুষ প্রমাণ এবার পেলাম। কোন সুস্থ পুরুষ যে কেবল তামাক খেয়ে, ঘুমিয়ে ও গাড়ু হাতে কোরে মাঠে গিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। আমি ত হাঁপিয়ে উঠলাম। তুপুর বেলা কাটানো এক সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌ল। বই সঙ্গে ছিল, কিন্তু এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে, খুলতেও ইচ্ছা কোর্‌ত না। ভাল লাগ্‌ত শুধু একটা কাজ—চিঠি লেখা। তাই চারিদিকে বড় বড় চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লাম ; বৌদিকে ত বটেই।

পরেশ বলিল—হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে।

রমেন বলিল—একদিন হঠাৎ জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম যে—ন-পিসিমার বাড়ী কত দূর।

জ্যেঠাইমা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, সেখানে যাবি নাকি ? বৌ যেতে লিখেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ তেমনি লোক ! আমিই যেতে চাচ্ছি। তুমি আমার যাবার ব্যবস্থা কোরে দাও।

—এই রোদ্দুরে, অনেকটা হাঁট্‌তে হবে—তুই ত আবার গরুর গাড়ী চড়তে পারিস্‌ নে। ক'দিনের জন্যেই বা এসেছিস্‌! এবার থাক্‌, অন্যবারে যাস্‌।

—না, জ্যাঠাইমা, তা হবে না। আবার কবে যে দেশে আসব, তার ঠিক নেই। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে, তু-একদিনের বেশী থাক্‌ব না।

—যেদিন যাবি, তার পরের দিনই ফিরিস্‌ ত যেতে দিই।

অগত্যা তাতেই রাজী হ'য়ে সহজ সুরের ভানে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—আচ্ছা, জ্যাঠাইমা, তাতে বুঝি রোদ্দুর কম লাগ্‌বে ?

জ্যাঠাইমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—থাম্‌, পাজির বেটা পাজি।

একদিন সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জ্যাঠাইমা সঙ্গে একজন লোক দিলেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ও পরের দিনই ফিরিয়ে আন্‌তে।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, জন-বিরল পথে, বাংলাদেশের গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে এই যাওয়াটা আমার কাছে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। এতদিন পরে আজ তার অনেক স্মৃতিই ম্লান হ'য়ে এসেছে। যেটুকু স্পষ্ট তা আমাদের অক্ষমতার, অযোগ্যতার ছবি। বিধাতা ত দু'হাত দিয়েই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা দু'হাত দিয়ে তা রাখ্‌তে পার্‌লাম কৈ? যা-কিছু বিধাতার, তা অপূর্ব্ব—গাছ, ফল, মাঠ, আকাশ, আলো-ছায়া; যা-কিছু মানুষের, তা অতি কদর্য্য—ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, বাগান-পুকুর। আমরা ভুলে যাই যে অশক্ত সুধু দানে বঞ্চিত নয়, গ্রহণেও অসমর্থ।

শেষ কথাগুলি রমেন বেশ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল।

পরেশ বলিল—এ কি কাণ্ড, প্রেমের গল্প বল্‌তে বল্‌তে এ-যে রাজনীতি এনে ফেল্‌লি।

সুবোধ বলিল—রমুর গল্প মাদ্রাজীদের খাবারের মত। শুনেছি তারা নাকি সন্দেশেও লঙ্কার গুঁড়ো মেশায়।

শৈলেন হাসিতে হাসিতে বলিল—সুবোধ, তোর মুখ কি উপমার শ্লট্‌-মেসিন যে টান্‌লেই একটা বেরিয়ে আসে?

সুবোধ উত্তরে বলিল—তোর এটির মত অদ্ভুত উপমা আমি মাথা খুঁড়লেও পেতাম না। রমু, পলিটিক্‌স্‌ বাদ দিয়ে তোর গল্প আবার চালা।

রমেন বলিল—বেলা তখন পড়-পড়, অথচ আকাশে যথেষ্ট আলো। গাছের ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ অবসরের পর, গ্রামে আবার প্রাণ-চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে উঠেছে, এমন সময় গিয়ে পৌঁছলুম। পথ সংক্ষেপ করার জন্য খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি—বৌদি একটা ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছেন অত্যন্ত আন্‌মনার মত। বিস্রস্ত বেশ, মুখে চোখে সদ্য ঘুম-ভাঙার অলস-মাধুরী। আমাকে দেখেই হঠাৎ চম্‌কে উঠে চট্‌ কোরে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন; কিন্তু তার মধ্যেই লক্ষ্য করা গেল, তাঁর সমস্ত দেহের কম্পিত আবেগ ও দীপ্ত আভা।

পরেশ বলিল—টর্চ্চ-লাইট্‌টা আবার জ্বল্‌লো বুঝি।

সুবোধ বলিল—বাঃ বেড়ে বলেছিস্ পরেশ !

রমেন কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—আমি কিন্তু হতভম্ব হ'য়ে গেলাম—আমাকে দেখে তিনি পালালেন কেন ? খবর না দিয়ে এসেছি, তাই কি রাগ কোর্‌লেন ? তাঁর মধ্যে যে ভাবাবেগ দেখ্‌লাম—তা প্রীতির, না বিরক্তির ?

বিশ্লেষণ করার বেশী সময় পেলাম না। খোকা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কাকাবাবু এয়েছে রে। বাড়ীর মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেল।

তারপর ভদ্রতার আত্মীয়তার পালা। পিসিমা ও দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও জলযোগের পর তাঁদের বাড়ীর অন্যান্য লোক ও গ্রামবৃদ্ধদের মধ্যে গিয়ে বস্‌তে হোল। এখানে আমি পল্লীজীবনের আর-এক দৃশ্য দেখ্‌লাম। কথা আর ফুরাতে চায় না। অসঙ্গত প্রশ্নের আর অবধি নেই। সব থেকে চোখে পড়ল—তাঁদের সঙ্কীর্ণ জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা-গুলিকে শোনাবার অধীর আগ্রহ। আর তাঁদের অভ্রভেদী আত্মম্ভরিতা। এ-হেন বিষয় নেই যে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দৃঢ়বদ্ধ ও চরম নয়। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌লেও পালাবার পথ নেই। শেষে একটা মিথ্যে ছল কোরে খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েই জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—তোর মা কোথায় রে ?

—বোধ হয়, রান্নাঘরে।

—চল্, সেখানে যাই।

হাঁড়ি-কুঁড়ি, কোটা-তরকারি, ঘি-ময়দা ইত্যাদির মধ্যে ব'সে—বৌদি। মুখ লাল—বোধ হয় আগুনের তাপে। আমাকে দেখেই ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—তুমি এখানে কেন ? বাইরে যাও।

—কেন, দেশে ত রান্নাঘরে ব'সে কত গল্প করেছি।

—কিন্তু এখানে আমার জায়েরা তোমার সাম্‌নে আস্‌বেন কেন ? তুমি কি কচি খোকা ?

সুকঠিন সত্য, রসলেশহীন। বেত্রাহত কুকুরের মত বেরিয়ে এলাম। মন অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌ল—কেন এলাম, কেন এলাম, এ প্রশ্ন চিত্তের অন্ধকার আকাশে বারবার বিদ্যুতের মত জ্বালা বর্ষণ করতে লাগ্‌ল।

গ্রামের একদল ছেলের সঙ্গে ফুটবল ক্লাব ও থিয়েটারের আখড়া ঘুরে যখন ফিরলাম, তখন খাবার সময় হয়েছে। খেতে ব'সে আমার সমস্ত সন্দেহ কেটে গেল। বুঝতে পার্‌লুম আমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। বৌদিকে দেখে মনে হোল যেন তিনি হৃদয়ের আবেগে টলমল কোর্‌ছেন। সংযমের সমস্ত আবরণ ভেদ ক'রেও আনন্দের দীপ্তশিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্তরের অনির্ব্বাণ প্রলয়াগ্নি যেমন নিরন্তর নিজেকে শ্যামলে

সবুজে প্রকাশ করে, তেমনি কোরেই তাঁর অন্তরের সুতীব্র বাসনা ব্যবহারের মাধুর্য্যে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে গেলেন—ঘুমিয়ো না, আস্‌ছি। অপেক্ষায় রইলাম। একটা বড় দালানকে দুভাগ করা দুটি ঘর, মাঝে দরজা। বড় ঘরটায় দাদা, ছোট ঘরে আমি। মাথার বালিশটা একটু নাড়তে গিয়ে দেখি, তার তলায় একতাড়া চিঠি। মশারির বাইরে হারিকেন জ্বলছিল। দেখ্‌লাম আমারই চিঠিগুলো, অতি যত্নে তারিখ অনুযায়ী পরপর সাজান। সময় কাটানোর জন্য পড়তে আরম্ভ কোর্‌লাম।

মশারি তুলে বিছানায় ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বৌদি বল্লেন—চোর!

আমি বল্লাম—আমার চিঠি আমি পড়ছি, তাতে চোরও হ'তে হবে?

বৌদি বল্‌লেন—চিঠি যে লেখে তার না, যাকে লেখা হয় তার?

আমি বল্লাম—সমস্যা বটে; বেতাল পঞ্চ-বিংশতিতে স্থান পাবার যোগ্য।

বৌদি বল্‌লেন—উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ; উত্তর ত দিতে পার্‌লে না!

আমি বল্লাম—কি কোর্‌ব বলুন; কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি।

বৌদি বল্‌লেন—তবে আমার কাছে শেখো। চিঠি কারো একলার নয়, দুজনেরই, ছেলে যেমন বাপ-মায়ের।

আমি বল্লাম—তবে আমার চুরিটা কোথা হোল?

বৌদি বল্‌লেন—অর্থাৎ তুমি পিতৃত্বের দাবী কোর্‌ছ। কিন্তু ছেলে যদি মায়ের কাছে থাকে, তবে বাপেরও উচিত, আগে মায়ের অনুমতি নেওয়া।

আমি হাতের চিঠিখানা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বল্লাম—আপনার ছেলেরা আপনার কাছেই থাক্, আমি এদের ত্যজ্যপুত্র কোর্‌লাম।

বৌদি বল্লেন—আহা, ষাট্ ষাট্, বাছাদের আমার অনাথ করো না।

তাঁর অভিনয়ের ভঙ্গীতে আমি হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লাম।

তারপর দুজনে মিলে চিঠি পড়া আরম্ভ হোল। অনেকদিন পরে নিজের চিঠি পড়ার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে, বিশেষতঃ যাকে লেখা হয়েছিল, সেও যদি কাছে থাকে। অতীত দিনগুলি আবার সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল। কতকথা, যা আগে বল্‌তে গিয়ে বলা হয় নি, আজ তা দুজনেই বল্‌তে লাগ্‌লুম। পুরানো রসিকতায় আবার হাস্‌লুম; পুরাণো তর্ক আবার ঘোরালো হ'য়ে ওঠে আর কি! একটা মাথার বালিশে বুক রেখে আমরা দুজনে শুয়ে। দেহ দুটী সমান্তরাল ভাবে লম্বিত। মুখ অত্যন্ত কাছাকাছি। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস জড়িয়ে যাচ্ছে।

আমরা মশ্‌গুল হ'য়ে পড়ছি, এমন সময় মাঝের দরজা খুলে দাদা ঘরে এসে বল্‌লেন—তোমাদের কথা কি এখনও ফুরোয় নি ? রাত যে ছুটো বেজে গেল।

বৌদি তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কীগো বল, কাকে চাও ? ঘুমকে, না আমাকে ?

লজ্জায় আমি কোন উত্তর দেবার আগে দাদাকে বল্লেন—

—ওকে একটু রাতজাগা অভ্যাস করিয়ে দিচ্ছি, যাতে আর একজন কষ্ট না পায়। তোমার ঘুমের জ্বালায় আমার কথা কয়ে তৃপ্তি হয় নি। একটু থেমেই আবার বল্‌তে লাগলেন—তাই বলে ভেবো না যেন তোমার কাছে আমার যা কিছু পাওনা, সব তোমার ভাইয়ের কাছে দাবী কর্‌ছি।

দাদা ত ভয়ে ঘর ছেড়ে দৌড়—পাছে আরো কিছু শুন্‌তে হয়, ছোট ভায়ের সাম্‌নে। আমি বল্লাম—আপনি কী ভয়ানক ছুষ্টু!

বৌদি বল্লেন—বেশ ত, তোমার বেলায় একটা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এনে দেওয়া যাবে।

আমি বল্লাম—তাতে আমার কি, আপনারই ঝঞ্ঝাট বেশী।

বৌদি বল্লেন—কেন ?

আমি বল্লাম—আমি তাকে আপনার কাছে রেখে দেব, ছুষ্টুমি শিখ্‌তে।

বৌদি বল্লেন—তাহ'লে এখন তুমি সেই চিন্তাই করো। আমি যাই, নইলে তোমার দাদা আবার বিরহে রোগা হ'য়ে যাবেন।

চোখের ওপর কোমল ছুটী করের স্নিগ্ধ স্পর্শে পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্‌ল। আর কানের কাছে সে কী মিষ্ট স্বর—"ওঠো, ওঠো, আর কত ঘুমোবে ?" এরই মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে, কেশে বেশে সযত্ন পারিপাট্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এক ঝুড়ি তেঁতুল ও বঁটি নিয়ে এসে চেপে বস্‌লেন। শ্বশুরবাড়ীতে কথা কইতে গেলেও কাজের অছিলা চাই, তাই এ আয়োজন। পিসীমা দেখে হেসে বল্লেন—হাঁ বৌমা, সকাল বেলায় তুমি আর কাজ খুঁজে পেলে না ? দেওরকে কি আজ তেঁতুলবীচি খাইয়েই বিদায় দেবে না কি ?

বৌদি আমার মুখের দিকে চাইতেই আমি পিসীমাকে উত্তর দিলাম, আজ তুমি রাঁধগে পিসীমা, আজ তোমার রান্না খাব। বৌদিকে দেখিয়ে বল্লাম, ওঁর যা রান্নার বিছে, তা কাল রাতেই পরিচয় পাওয়া গেছে।

পিসিমা বৌদিকে বল্লেন—ননদের গঞ্জনা ত সইতে হোল না, এখন দেওরের চিম্‌টি সহ্য করো।

পরীক্ষার 'হলে'-ও সময় এত তাড়াতাড়ি কাটে না। হঠাৎ দেখি বিকেল হ'য়ে গেছে। জ্যাঠাইমার লোক তাড়া দিচ্ছে। আর না বেরলেই নয়।

যাবার আগে কিছু জলযোগ। বৌদিকে বল্লাম—জল। খাবার জল, না হাত ধোবার জল বুঝ্তে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি জল চাই?

হঠাৎ উত্তর দিয়ে ফেল্লাম—চোখের জল নয়। তা-ই কিন্তু পেলাম। তাঁর চোখ চক্‌চক্ কোরে উঠ্‌ল; আঁখিতারা বিস্ফারিত, চোখের কোণে চঞ্চল দুটী মুক্তাবিন্দু। দুঃখ অসহ হ'তে পারে, কিন্তু তার প্রকাশ কি মধুর!

মুগ্ধ হ'য়ে বল্লাম—বৌদি, আপনাকে মোটে বোঝা যায় না!

তিনি বল্লেন—কেন?

আমি বল্লাম—কাল এসেই আপনার যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম, আজ তার এই পরিণতি হবে, কে জান্‌ত?

উদাস কণ্ঠে উত্তর এল—আমি দুর্ব্বোধ না তুমি নির্ব্বোধ! বোঝ না, অপ্রকাশিত সুখ, বেদনারই মত দুঃসহ? তাকে সইয়ে নিতে সময় লাগে।

সমস্ত পথ ভাব্‌তে ভাব্‌তে এলাম—সজল দুটী চোখ ও চোখের কোণে চঞ্চল দুটী মুক্তাবিন্দু।

রমেন থামিল। শ্রোতৃবর্গের এতক্ষণ পরে আবার যেন নিঃশ্বাস ফেলার কথা মনে পড়িল। একটা কৃত্রিম দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবোধ বলিল—এত আয়োজন, সব ফাঁকা। দুটো জলভরা মেঘ মুখোমুখি এল, ভাবলুম, নাজানি কত বজ্র ও কত বিদ্যুৎ-ই হবে। তা নয়, কেবল দুফোঁটা বৃষ্টিতেই শেষ!

শৈলেন বিজ্ঞভাবে বলিল—আবহাওয়া-শাস্ত্রে লেখে, অমনতর হয়!

কাব্য-লোক হইতে নামিয়া আসিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর সঙ্গে আর তোর দেখা হয় নি?

—হ্যাঁ হয়েছিল, বছর দুই পরে।

—ইতিমধ্যে চিঠি চল্‌ছিল ত?

—নিশ্চয়, তবে চিঠির ধারা এবার নতুন খাতে বইতে লাগ্‌ল। এই সময়টা জার্ম্মান-যুদ্ধ বেধে গেল! একটা চিঠিতে বৌদি লিখ্‌লেন,—শুন্‌ছি, খুব যুদ্ধ বেধেছে। ছেলেবেলায় সামান্য ইতিহাস ভূগোল যা প'ড়েছিলাম তা ত মনে রাখার জন্য পড়ি নি, তাই কিছু বিশেষ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি আমায় যুদ্ধের কথা লিখো। যুদ্ধ আমার বড় ভাল লাগে। আমি ওদেশের লোক হ'লে নিশ্চয়ই যুদ্ধে যেতাম। যারা মরার অপেক্ষায় না থেকে জীবনের মাঝপথেই মরণকে ধর্‌তে চায়, কি জানি কেন আমি তাদের বড় ভালবাসি।

শৈলেন বলিল—বলিস্ কি, একথা লিখেছিলেন ? খুব অদ্ভুত ত !

পরেশ বলিল—এমন মেয়ে আরো গোটাকতক হ'লে দেশ উদ্ধার হ'য়ে যেত।

সুবোধ বলিল—আবার পলিটিক্স্ ? রমেন, ব'লে যা।

রমেন বলিল—যুদ্ধের কথা থেকে নানা বিষয়ের আলোচনা উঠ্ত,—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় বন্ধন-মুক্তি শেষ পর্য্যন্ত ভগবান নিয়ে টানাটানি। বেপরোয়াভাবেই মতামত প্রকাশ করা হোত, পরস্পরকে আক্রমণও কম হোত না। রাত জেগে জেগে এ-সব চিঠি লেখার মধ্যে কী প্রবল মোহই ছিল !

আবার দেখা হোল পিসীমার বাড়ীতেই। দেশে গিয়েছিলাম, বৌদি যেতে লিখ্লেন। এবারে আর সঙ্গে কোন লোক নিলাম না, কিন্তু জ্যাঠাইমা যাবার সময় ব'লে দিলেন, কুটুমবাড়ী বেশী থাকা ভাল দেখাবে না, তার পরের দিনই যেন চলে আসি।

সে বাড়ীতে পিসীমা, বৌদি ও খোকা ছাড়া আর সকলেই বিদেশে। যেতে না যেতেই গল্প জমে গেল। বাড়ীর মধ্যের গাছে চড়ে ফল্সা পাড়া, একসঙ্গে পুকুরে নাওয়া, রান্নাঘরেই আড্ডা জমানো—দুটী উন্মুখ মনের নিবিড় সংযোগ।

এবারে দাদার খাটের বিছানায় শুলাম আমি, ও পাশের ঘরে আমার জায়গায় বৌদি, খোকা দাদার ঘরের মেঝেয়। পিসীমা অন্য ঘরে।

আমাকে শুইয়ে দিয়ে বল্লেন—আজ ত ঢের গল্প হোল ; এখন শোও।

আমি বল্লাম—সেকি, এর মধ্যে।

বৌদি মশারির বাইরে বস্লেন।

আমি বল্লাম—বড় অসুবিধা ! ভেতরে আসুন। তিনি বল্লেন—না।

হাত ধ'রে টানাটানি কোর্তে লাগ্লুম। কিছুতেই এলেন না। শেষে অভিমান ক'রে বল্লাম—তবে আপনি যান।

বৌদি উঠ্লেন।

আমি বল্লাম—আগের বারে ত এসেছিলেন ?

তিনি বল্লেন—সেবারে তোমার দাদা ছিলেন। ব'লে আলো নিবিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলেন। সেই অন্ধকারে আমার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল। যে দুর্নিবার আকর্ষণ আদিম কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের সমস্ত নরনারীকে একই বাঁধনে বেঁধেছে, যাকে দমন করার জন্য মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠ্ছে আর বারবার পরাজিত হ'য়ে ধূলিসাৎ

হ'য়ে যাচ্ছে, তার রুদ্ররূপ সেদিন প্রত্যক্ষ কোর্‌লাম। মনে হোল, এতদিন সুধু জীবন নিয়ে খেলা ক'রে এসেছি—এই-ই আমার অস্তিত্বের পরমতম মুহূর্ত্ত। আমার বিক্ষিপ্ত এলোমেলো জীবনের সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি একটী ঋজু সবল অখণ্ডিত মূর্ত্তিতে চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। এতদিনে যেন বেঁচে থাকার অর্থ বোঝা গেল।

ধীরে ধীরে চুপে চুপে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে হাৎড়াতে হাৎড়াতে বৌদির বিছানায় এলাম। ঘুম-জড়ানস্বরে বৌদি বল্লেন,—এসো।

উত্তর না দিয়ে এমনভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম যে, আমার অন্তরের প্রচণ্ড আবেগ ও উন্মত্ত বাসনা একেবারে অনাবৃত স্পষ্টতায় প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। তিনি বল্লেন—ওকি! আমি বল্লুম—আমি ছাড়ব না।

তিনি বল্লেন—আস্‌চি। কণ্ঠস্বর বজ্রের মত অমোঘ, বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ। মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেড়ে দিলাম।

তিনজনে সমস্বরে প্রশ্ন করিল—তারপর?

রমেন বলিল—তারপর? তারপর তিনি ধীরে ধীরে উঠে এসে বেশ সংযত ক'রে নিয়ে, খোকার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তিনজনে একত্র বলিয়া উঠিল—সেকি?

রমেন বলিতে লাগিল—আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তখনি ভূমিকম্প হ'য়ে পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে গেলে কিছুমাত্র দুঃখিত হতাম না। তা যে হবে না, আবার যে সকালে মুখ দেখাতে হবে, এই দুর্ব্বিষহ লজ্জাই আহত ভুজঙ্গের মত বারবার দংশন কোর্‌তে লাগ্‌ল। গভীর রাতে চোরের মত নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, অনেক বেলা হয়েছে তবু চোখ মেলা যাচ্ছে না। খোকা, পিসীমা কয়েকবার এসে না ডেকে ফিরে গেলেন—ঘুমোচ্ছি মনে ক'রে।

—আর শুয়ে থাক্‌তে হবে না, ওঠো। এই বলে বৌদি আমাকে তুলে দিলেন। তারপর খোকার সঙ্গে গ্রামের মধ্যে একটু ঘুর্‌তে গেলাম।

দুপুর বেলা খাওয়া শেষ হলেই পিসীমাকে বল্লাম, এখনি বেরিয়ে পড়ি, নইলে রাত হ'য়ে যাবে, পথ খুঁজে নিতে কষ্ট হবে।

পিসীমা বল্লেন—দাঁড়া, আমাদের খাওয়াটা হোক্।

কি আর করি, অপেক্ষা কোর্‌তে হোল।

ঘর অন্ধকার কোরে খাটে পড়ে আছি, বৌদি এসে পাশে বস্‌লেন। আমি চোখ বুজে চুপটী কোরে রইলাম। আমাকে একটা নাড়া দিয়ে তিনি বল্লেন—অমন মুখ গোম্‌সা ক'রে রয়েছ কেন ? কী এমন ঘটেছে ?

দুহাতে মুখ ঢেকে আমি উপুড় হ'য়ে পড়লাম। আমার মাথাটা তাঁর কোলের ওপর তুলে নিয়ে সস্নেহে আমার চুলগুলি চিরতে চিরতে বল্লেন—ঠাকুরপো, বিশ্বাস কর আমার কথা ; আমি তোমায় দোষী মনে করছি না। যে প্রবল টানে কাল তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাই তোমায় ভুল বোঝা বা তুচ্ছ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি তেমনই চুপ্ কোরে প'ড়ে রইলাম। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—তুমি জান, এমন একদিন গেছে যখন তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমার কাছে সকলের চেয়ে কাম্য ছিল। কিন্তু সুধু দিতে চাইলেই ত এ ব্যাপার সম্পূর্ণ হয় না ; যে নেবে, তারও তৈরী থাকা চাই। তাই আজ যদি তোমার ডাকে আমার মনে সাড়া না জাগে, তাহ'লে কি আমার ওপর রাগ করা তোমার উচিত ?

এই ব'লে তিনি আমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কপালে গভীর স্নেহচুম্বন দিলেন।

পরেশ বলিয়া উঠিল—বোগাস্ !

সুবোধ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—অর্থাৎ ?

পরেশ বলিল—অর্থাৎ শেষটা সত্যি নয়। নিজের সাধুত্ব বজায় রাখার জন্য রমু সত্যকে বিকৃত কোর্‌ছে।

শৈলেন বলিল—যে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত কোরে দেখাতে পারে, সে যে মিথ্যে বলেছে, তা আমার মনে হয় না। পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কি আছে ?

সুবোধ বলিল—তাছাড়া, রমু ত আর সত্যি বলার জন্য হলফ্ পড়েনি। সে গল্প বলেছে। আমার আপত্তি, গল্প হিসাবে শেষটা ঠিক খাপ খায় নি। অত এগিয়ে এসে তাঁর পিছিয়ে যাবার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শৈলেন বলিল—মানুষের সব কাজেরই কি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়—জীবনে ?

সুবোধ বলিল—জীবনে না যাক্, গল্পে পাওয়া চাই। জীবনে যা অসংবদ্ধ তাকে সুসংবদ্ধ করা আর্টের প্রধান কাজ।

রমেন মৃদুস্বরে বলিল—আমি কি বলেছি যে আমার কথা শেষ হয়েছে ?

তিনজনেই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

শৈলেন বলিল,— সত্যি তো, বল তার পর কি হোলো ?

রমেন আরম্ভ করিল—তারপরেই দেখি তিনি হাস্‌ছেন। বল্‌লেন—কি ভাব্‌ছ ? দুধের বদলে ঘোল দিয়ে এ অপমান করা কেন ?

আমি বিপন্নের মত আর্ত্তস্বরে বল্লাম—আমায় রেহাই দিন্, বৌদি। আমার অন্যায় হয়েছে। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না।

কণ্ঠস্বর বদলে নিয়ে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—অন্যায় ? অন্যায় কোথায় ? এ বিষয়ে কি যে ন্যায় আর কি অন্যায়, তার মাপকাঠি আমি আজও খুঁজে পাইনি। শুধু এটুকু বুঝেছি, যেখানে দেহের মিলন হয় অথচ অন্তরের মিল নেই, সেখানেই অন্যায়, তা হোক্ না কেন সে মিলন স্বামীর সঙ্গেই। কিন্তু কেন যে একসময়ে একজনের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, অন্য সময়ে করে না, এ এক অতি দুর্ভেদ্য রহস্য। আগের বারে তুমি যদি আমায় চাইতে, আমি নিজেকে উজাড় কোরে ঢেলে দিতাম। কিন্তু তুমিও ডাক্‌লে না, আমিও ডাকার মত জোর পেলাম না। অথচ কাল কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারি নি। তোমার দাদা এখানে নেই, এটা কোন কারণই নয়, ও কেবল বড় কথার আড়ালে নিজেকে লুকানোর ছল মাত্র। আসল কথা, তুমি এবার আমায় তেমন কোরে টান্‌তে পারো নি, যেমন প্রথমবারে পেরেছিলে, যেবারে আমি তোমায় টলাতে পারিনি আমার সমস্ত আবেগ দিয়েও।

রমেন থামিল। সুবোধ বলিল—চমৎকার শেষ হয়েছে রমু, এরপরে যদি কিছু থাকে, তা আমি শুন্‌তে চাইনে।

শৈলেন বলিল,—তাহ'লে ত আমার সমালোচনা আরম্ভ কোর্‌তে হয়।

রমেন বলিল—তাই হোক্।

শৈলেন রমেনের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—তুই ভাবছিস্ খুব একটা জটিল চরিত্রের অবতারণা করেছিস্। আমার কাছে তা মোটেই মনে হয় না। আমি দেখ্‌ছি, তিনি প্রবল শক্তির আধার। নীতি-বাগীশেরা তাঁর প্রথম রাত্রির উচ্ছ্বাসটাকেই দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু তাঁর সুকঠোর সংযম ও তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ তাদের চোখে পড়বে না। তন্ন তন্ন কোরে নিজেকে খুঁজে দেখ্‌তে পাবার চেয়ে শক্ত কাজ মানুষের আর নেই, এ শক্তি যাঁর আছে, আমি তাঁকে প্রণাম করি।

•

রমেন রহস্যময় ভাবে হাসিতে লাগিল। পরেশ বলিল—তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায় না? তিনি আজকাল কোথায়?

রমেন আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে, মারা গেছেন?

শান্তভাবেই রমেন বলিল—হ্যাঁ, আত্মহত্যা কোরে।

সমস্বরে প্রশ্নবর্ষণ হইল—কেন? কেন?

রমেন বলিল—তাঁর এক গুপ্ত প্রণয়লীলা প্রকাশ পাওয়ায়।

শৈলেন টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুবোধ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—Clean bowled.

সেদিনকার মত তর্ক অমীমাংসিত রহিয়া গেল।

শ্রীধীরাজকুমার হালদার

———

কবিতাগুচ্ছ

মাঘের আশ্বাস

জানিলাম এ হৃদয় একেবারে মরু না,
ঋতুপতি আজো দেখি করে তা'রে করুণা।
মাঘে তা'র সুরু হোলো অনুকূল কর দান,
কোন্ মায়া-মন্তরে অন্তরে বরদান,
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পুলকে পলাশবীথি স্মৃতিরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলেনি মোর বয়সের কথা সে।
ঐ দেখো অশোকের শ্যাম ঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই ফাগুনের রাঙিনায়;
সৌরভ-গরবিণী তারা-মণি লতা সে
আমার ললাট 'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পক তরু মোরে প্রিয় সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকর-বন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নত শাখে মুখে চাহে কহ কার;
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে;
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে।

পিক-রবে সাড়া যবে দেয় পিক-বনিতা,
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভনিতা।
বোবা দক্ষিণ হাওয়া ফেরে হেথা সেথা হায়,
আমি না রহিলে বলো কথা দেবে কে তাহায়!
পুষ্পচয়িনী বধূ কঙ্কণ-ক্বণিতা,
অকথিতা বাণী তা'র কার সুরে ধ্বনিতা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প্ আমি ফেলিয়াছি ;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে !

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার ;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন !
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে ;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার ;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে !
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন !
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আব্ছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নকটার্ণ্ —।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের ;
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।

ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
…মাংস-খাওয়া হ'ল তবু শেষ ?
…কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে ?
তাদের মতন নই আমিও কি ?

কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মত ?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

দোনলার শব্দ শুনি ।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয় ।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে ।

এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।

বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মত
আমরা সবাই।

শ্রীজীবনানন্দ দাস

মৃন্ময়ী

মৃন্ময়ী আমার!
ধূলিম্লান ধরার দুলালী।
ক্ষণিক লহরীলীলা শাশ্বত কালের পারাবারে!
তোমারি ক্ষুধিত প্রতীক্ষায়
মন মোর ব'সে আছে সারা দিন সারা রাত্রি ধরি
ইন্দ্রিয়-দুয়ারে
আমার দেহের কুঞ্জগেহে;
এসো অভিসারে,—
মোদের অনবকাশ সম্ভোগের বসন্ত-উৎসবে
জাগ্রত লুটাবে ঘুমে, তন্দ্রাহত উঠিবে জাগিয়া!

তোমার আমার মাঝে যে-বিরহ রাজে
তা'রি অন্তরালে
অনন্ত আনন্দলোক!
পাষাণ যবনি
টুটিয়া ফেলিতে হবে।
অয়ি মোর মুক্তিবীজ, দীপ্তিমতী কামিনীর রূপে
একবার এসো তুমি, প্রিয়া।
বাসনার পদ্মাসনে
তোমার আমার যোগ সিদ্ধ হোক্ পরিপূর্ণ হোক্।
—তারপর বিসর্জ্জন!
কা'র?
তোমার আমার—
চির-অর্দ্ধ জাগরিত নারীপুরুষের!

আমার বক্ষের মাঝে যে তুমি হারায়ে আছ যুগযুগান্তর,
তা'রে আমি পাবো ;
তোমারো অন্তরলোকে যে আমারে তুমি চেন নাই,
তুমিও পাইবে তা'রে !
তুমি পূর্ণ, আমি পূর্ণ—
প্রত্যেকের সার্থকতা প্রত্যেকের মাঝে
অখণ্ড মিলনে !···

এসো মোর ক্ষণিকা মৃন্ময়ী !
এসো মোর অনাগতা চিরন্তন যুগের চিন্ময়ী !

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

উর্ব্বশী

আমি নহি পুরুরবা, হে উর্ব্বশী
ক্ষণিকের মরঅলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে জানো গড়িয়াছি আমার ভুবন ?
এসো তুমি সে ভুবনে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়ায়ে
রহো ক্ষণকাল সেথা
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরিতে সময় নাই—শুধু তুমি রহো ক্ষণকাল
ক্ষণিকের আনন্দআলোয়
অন্ধকার আকাশসভায়
নগ্নতা-প্রদীপ্ত তনু জ্বালাইয়া দাও আজ নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।
আর রাত্রি, র'বে কি উর্ব্বশী
আকাশের নক্ষত্রসভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে মোর বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক ?
আমি নহি পুরুরবা, হে উর্ব্বশী
আমরণ আসঙ্গলোলুপ
আমি জানি আকাশ পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।

শ্রীবিষ্ণু দে

সন্ধ্যায়

কিসের তানে পাগল পারা এমনি হ'য়ে আপন হারা
সন্ধ্যেকালে আকাশ চেয়ে থাকে,
কোন্ বেদনার মধু পিয়ে সান্ধ্য সুনীল আকাশ দিয়ে
সাঁঝের পাখী এমনি ক'রে ডাকে !
ওই ওপারে নদীর তীরে চখা চখী ঘুরে ফিরে
আপন প্রাণের প্রণয়-ব্যথা জাগায়,
নদীর স্রোতে জলের তানে কার বা কুহক-ভরা গানে
আকুল-করা কি সুর যেন লাগায় ;
তাল শুপুরীর ফাঁকে ফাঁকে অস্ত-রবি রশ্মি রাখে,
দূরে দূরে আঁধার বাসা বাঁধে,
এম্‌নি সাঁঝের মুখরতায় কি সুর লাগে কি কব তায়,
প্রাণ যে আমার গাইতে গিয়ে কাঁদে !

* * * *

সে বুঝি কোন সাগর-পারে, আকুল-কাঁদা নদীর ধারে
শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে-দেওয়া মেয়ে,
সারা দিনের ঘোম্‌টা-ঢাকা চোখ দুটোতে বিষাদ মাখা,
কতই কাঁদন বুকটী আছে ছেয়ে ;
সেই সাগরের পারের বালা গলায় দোলে দুখের মালা
আকাশ-পথে শ্বশুর-বাড়ী যায়,
তার বুঝি বা আঁচল হ'তে একখানি সুর নদীর স্রোতে
পড়ল খ'সে—বাজ্‌ল সকল গাঁ'য় ।
তা'র বুঝি বা চুলের বাসে কতই নিবিড় ব্যথা ভাসে,
কতই আঁধার-করা জাগে গান,
তাই বুঝি আজ সন্ধ্যেকালে ওই আকাশের ভালে ভালে
সেই ব্যথাতে ভর্‌ল জগৎখান ।
সে কোন চির দুখের পালা, আঁখির পাতে বিষাদ ঢালা,
চিকণ চাঁচর আঁধার-মসী মাখা,
তার ব্যথাতে আকাশ কাঁদে, আঁধার ধীরে বাসা বাঁধে,
সাঁঝের ঘোরে যেন বাদুড়-পাখা ।

* * * *

এম্‌নি করুণ কোমল সাঁঝে দেয় ভুলায়ে সকল কাজে,
দেয় ভুলায়ে প্রাণের সমারোহ,
একটী কথা মনে মনে শুধুই জাগে ক্ষণে ক্ষণে—
ছিন্ন বুঝি জীবনের সব মোহ।
জীবন-উষার সাতটী রঙে বাঁধবে না আর আলিঙ্গনে
প্রাণের-তলের রঙিন দেবতারে ;
অশ্রুজলের একটা নদী বইবে কি রে নিরবধি
মিথ্যা করি সুখের বারতারে।
এম্‌নি ব্যথায় ভরা সাঁঝে শেষ পূরবীর বাঁশি বাজে,
জ্বালায় যেন জীবনের শেষ চিতা,
কোথায় প্রাণের উচ্চ আশা, প্রিয়ার কানে মিষ্টি ভাষা,
কোথায় স্বজন বন্ধু প্রাণের মিতা ;
কোথায় ঝুলন, কোথায় দোলা, প্রখর দিনের আপন-ভোলা
গভীর কিম্বা হাল্‌কা সে-সব বাণী,
হঠাৎ দেখি আঁধার ঘেরে জেগে উঠি শুন্‌তে যে রে
আকাশ-ভরা তারার কানাকানি।

* * * *

সুধাই একটী তারার কানে স্বপন মাঝে সে কি জানে
ধরাতলের একটী ছোট মেয়ে,
কোন্ সে সাগর পারের বালা গলায় দোলে দুখের মালা,
কতই কাঁদন বুকটী আছে ছেয়ে।
সে কি জানে মর্ত্ত্যমনে যে-রস আছে সঙ্গোপনে,
যে-ফুল ফোটে ধরার হিয়া ভেদি,
যে-গান জাগে চোখের কোণে, ঠোঁটের হাসি যে-সুর বোনে
সকল ভীতি সংশয়েরে ছেদি';—
সে কি জানে—জানে?—জানে? যেথায় সহজ প্রাণের গানে
সরম ছাপি' উঠেছে এক গেহ,
দুইটী আঁখি একটী হিয়া উচ্ছ্বসিয়া উন্মুখিয়া
আছে ধরি শ্রদ্ধা প্রেম ও স্নেহ!

* * * *

লক্ষ তারার কানে কানে সুধাই তাদের কেউ কি জানে
মহীর 'পরে একটী ছোট প্রিয়া,

হেলেন কিম্বা বেয়াত্রিচে যাহার কাছে সবাই মিছে
মিছে লয়লা জুলিয়েতের হিয়া ;
ক্লিওপেট্রার সকল মোহ, শেবার রাণীর সমারোহ
খিন্ন যাহার একটী হাঁসির টানে,—
মোনা লিসার ঠোঁটের হাঁসি, আফ্রেদিতের দেহের বাঁশি
মিলাল যার একটী দিঠির গানে।
বিশাল মরুভূমির বুকে স্বচ্ছ শীতল উৎস-মুখে
একটী যেন ফোটা-ফুলের কলি,
ওই আকাশের কোন তীরে ইহার তুল্য আছে কি রে
এম্‌নি মায়া কোথাও ওঠে ছলি !
লক্ষ তারার কানে কানে সুধাই তাদের কেউ কি জানে
এম্‌নি মহীর একটী ছোট প্রিয়া,—
হেলেন লয়লা বেয়াত্রিচে জুলিয়েত ও মোনালিসে
সৃষ্টি যাহার সবায় মিশাইয়া !

* * * ০

ওই আকাশের দিকে দিকে চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
অবশেষে সুধাই কোটী তারায় ঃ—
সেই নীলিমার স্বচ্ছ স্রোতে রঙিন্‌ মুখে কোথাও হতে
তৃণের একটী ফুলও কি হাত বাড়ায় ?

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

লীলা-প্রেম

আমারে তুমি ভালো যে বাসো একথা শুনি যবে,
হাসিনা মনে মনে,
পাছে সে হাসি পড়ে গো ধরা মনের কলরবে,
আমার আঁখি-কোণে।
তোমারে আমি বেসেছি ভালো একথা তবু মুখে
কহি গো অবকাশে ;

আমারি কানে ফিরিয়া যেন মধুর কৌতুকে
আমারে পরিহাসে।
তথাপি এই প্রেমাভিনয়ে আছে কি মধু জানি
"ভালো কি বাসো ? বাসি গো ভালো" চলিছে কানাকানি ॥

এমনি কথা এমনি সুরে আগে যে গেছে ক'য়ে,
তারে কি পড়ে মনে ?
দু'দিনে খেলা ফুরাবে যবে স্মৃতির ভার ব'য়ে
র'বে কি অকারণে ?
যাহারে পরে বাসিবে ভালো, বল সে কেন চুপে
সহিবে এত হেলা ?
এমনি চলে জীবন ভরি' ভালোবাসার রূপে
ভালোবাসার খেলা।
তবু সে খেলা মনের মাঝে কী যেন মধু ঢালে,
মিথ্যা, তবু পলকে প্রাণে প্রেমের দীপ জ্বালে ॥

বরণ তুমি করেছ মোরে এবার মোর বেলা
ভুলেছ তুমি যারে,
আমার মাঝে তাহারে তুমি করোনি অবহেলা
জানাই বারে বারে।
যে নবরূপে আমার প্রাণে বিছাও তব মায়া
নবীনতর সাজে ;
যে গেল আজ অতীতে মিশি এ তারি শুধু ছায়া
ভাবিতে মরি লাজে।
তাহারে আজ তোমার মাঝে টানি না অবমানে
প্রেমের খেলা অতীতে-চাওয়া-বিরহ নাহি জানে ॥

রুদ্ধ খেলাঘরের কোণে আড়ালে সদা রহি'
রচিনা কারাগারে,
ফুল্ল মুখে, হৃদয় তলে পাষাণ ভার বহি'
দহিনা আপনারে।
খেলায় যদি শ্রান্তি লাগে সহজে ভাঙ্গি খেলা,
করি না মিছে ভান ;
আহত-অভিমানের ছলে আরোপি' অবহেলা
খুঁজিনা পরিত্রাণ।

নূতন যদি সহজে আসি' চিত্ত করে জয়,
আদরে তারে বরিয়া লই করি না মিছে ভয়॥

জীবন মোর সরণে বাঁধা মরণে ঘেরা সীমা,
তাহারো পরে যদি
চিরদিনের বাঁধনে মোর ক্ষণিক মধুরিমা
বাঁধো গো নিরবধি ;
বরণময়ী ধরণী হ'তে তোমারে যদি আমি
আবরি চিরদিন,
স্মৃতির হিম সমাধি রচি' চির দিবস-যামী
আঁধারে র'বে লীন।
দোঁহার দোঁহে মরণ হানি' করি না অবমান,
মুক্তি-প্রাণ প্রেমের খেলা মোদের অবদান॥

মরণে মোরা করেছি জয় স্মরণে নাহি রাখি
ভাবনা নাহি মনে ;
জীবনে, মৃত পাষাণ ভারে, নিজেরে দিয়ে ফাঁকি,
বহিনা অকারণে।
খেলার বেলা ফুরালে মিছে অবোধ অভিমানে
মরিনা কভু শোকে
বিরহ ব্যথা করুণ সুরে রচি না বসি' গানে
অশ্রুভরা চোখে।
প্রাণের বেগে সমুখে চলি নূতন পরিচয়ে
জীবন মাঝে লভেছি মোরা মরণহীন জয়ে॥

দিলদার হুসেন

তবু তোমারেই ভালোবাসি মোর সর্ব্বনাশা

নিঃশেষে আজ ভাঙ্গিয়াছ মোর সকল আশা
তবু যে তোমারে কেন ভালবাসি, সর্ব্বনাশা !
এ কী রহস্য ! এ কী বিচিত্র তোমার লীলা !
তব প্রেম তবু প্রাণে জাগে মোর অন্তঃশিলা
জানাতে তোমারে তাই বারে বারে হারাই ভাষা
সর্ব্বনাশা !

বসন্ত কবে এসেছিল মনে পুষ্পসাজে ;
তোমারি লাগিয়া অর্ঘ্য রচিনু সভয়-লাজে।
রঙীন বাসর-সঙ্গীতে মোর উদাস হিয়া ;
হৃদয়-সায়র উঠেছিল সুখে উচ্ছলিয়া ;
গন্ধধূপের সোহাগ জাগিল চিত্ত মাঝে,
স্নিগ্ধলাজে।

ভয়ে ভয়ে যবে চাহিনু তোমার ঘোম্‌টা খুলে
মোহন আবেশে উঠিল মুগ্ধ হৃদয় দুলে
যত কথা আমি রচেছিনু বসি নিরালা জাগি'
সব এলোমেলো হয়ে গেল হায়, কিসের লাগি'।
থমকি দাঁড়ানু তোমার রূপের সরসী-কূলে
চিত্ত দুলে !

আমার আনন উপরে তোমার নয়ন রাখি'
হত-অভিমানে চাহিলে হানিয়া রুদ্র আঁখি।
ভাষাহারা মোর বেপথু-চিত্ত সন্ধানিয়া
কী বুঝিলে ওগো ! এখনো শ্রবণে উঠে রণিয়া
তোমার নিঠুর মধু কণ্ঠের ভৎ র্সনা কি,
দীপ্ত আঁখি ?

স্বপ্নে যেন সে নির্ম্মম বাণী বাজিল কানে
"জানো কি পুরুষ, এনেছ অর্ঘ্য কী সন্ধানে ?
মোর 'রূপ' চাহি 'আমারে' সহজে করিলে হেলা !
রূপ চাহ ? হায়, হের এ ধরণী রূপেরই মেলা।
আমারে উপেখি' আসিয়াছ এই মাটির টানে
কী সন্ধানে ?"

কহিলাম "নারী, তোমারি রূপের রূপকে গড়া
নিখিল জগৎ ; তাই মধুময় বসুন্ধরা।
তোমার রূপের মাধুরী জাগিছে সন্ধ্যারাগে,
প্রভাত-অরুণ-স্বপনে তোমারি মাধুরী লাগে,
তব যৌবনে তরিয়াছে সুখে মৃত্যুজরা
বসুন্ধরা।

পুরুষ হইয়া হেরেছ কি তুমি আপন ছবি,
যে মোহন রূপে তোমারে হেরিছে মুগ্ধ কবি ?
নিজেরে কখনো পুরুষ হইয়া বেঁধেছ বুকে,
তুই বাহু পাশে ? কেমনে জানিবে কী মধু সুখে
হ'য়েছে উতল তব রূপ-লীলা-ছন্দ লভি'
মুগ্ধ কবি ?

তোমারেই আমি বাসিয়াছি ভালো, সত্যকথা ;
অপরূপ সেই তোমার রূপের সার্থকতা
তোমার দেহের দেউলে তোমারি অর্ঘ্য আনি,
দেবতা তুমিই, তব রূপখানি স্বর্গ মানি,
এ নহে গো মোর লুব্ধ প্রাণের আর্ত্তকথা
স্বার্থকথা।"

ক্ষণেক নীরবে শুনিলে আমার করুণ বাণী,
বুঝিবা বারেক কপোলে ছোঁয়ালে অরুণ পাণি,
আবেশে আশায় সকল চেতনা মুদিল আঁখি,
ক্ষণেকের আশা ; হেরিলাম চেয়ে সকলি ফাঁকি।
মরীচিকা প্রায় মিলালে, জীবনে তৃষ্ণা হানি
হায় পাষাণি।

নির্ম্মূল তুমি করেছ আমার সকল আশা ;
তবু তোমারেই ভালো বাসিয়াছি, সর্ব্বনাশা !
আমার দগ্ধ-চিত্তের এই এক মুঠো ছাই
তোমারেই আজ দিলাম কুড়ায়ে ; আর কিছু নাই।
তোমারি আগুনে পুড়িয়া নিভেছে সব পিপাসা
সর্ব্বনাশা !

দিল্‌দার হুসেন

অনুবাদ

বৃষ্টি পাইনের বনে

(গাব্রিয়েলে ডান্নুন্‌ডসিও্‌র মূল ইটালীয়ান কবিতা হইতে)

থাম। আজ বনানীর
প্রান্তদেশে, শুনিতে না পাই
কোনো কানাকানি কোনো
মানবের স্বরে। শুনি শুধু
দূরে কোন্ কথা
বৃষ্টি-ফোঁটা, পল্লবেতে
বলাবলি করে।
শোন, বৃষ্টি ঝরে
খণ্ড মেঘ হ'তে।
শোন, বন্ধ্যা টামোরিকো পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরি।
কণ্টকিত পাইনের পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর ধারে।
মিরটোরে নাড়া দিয়ে
বৃষ্টি ঝরে পড়ে।
মঞ্জরিত জিনেষ্ট্রোর পরে
বৃষ্টি এসে নামে।
জিনেপ্রোর ফলে-ভরা শাখায় থমকে
বৃষ্টি বারে বারে।
বৃষ্টি ঝরে ঝর ঝর
মুখে আমাদের
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুরফুরে
বসনের পরে।
বৃষ্টি ঝরে খুলে-ধরা
মনের চিন্তায়।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের সুরে
কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি
ভুলেছি ছলনে,
অয়ি এরমিওনে।

শুনিতে কি পাও? বৃষ্টি ঝরে
সঙ্গীহীন
তৃণপরে।
বৃষ্টি ধ্বনি কমে বাড়ে
বদলায় বায়ু-পথে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার পরে।
শোন, ঐ বৃষ্টির কান্নার
উত্তর দিতেছে
সঙ্গীত ঝিল্লীর।
যে ঝিল্লী
দখিনের বর্ষার বিলাপে
নাহি পায় ভয়।
ধূসর গগন হেরি যার নাহি ভয়।
পাইনের তরু
এক সুরে গান গায়। অন্য সুরে
গাহিছে মিরটো। জিনেপ্রোও
গেয়ে চলে আপনার সুরে।
নানা যন্ত্র যেন
বেজে ওঠে শত শত অঙ্গুলি পরশে।
মোরা দোঁহে ডুবে গেছি
বনানীর
প্রাণপূর্ণ অন্তরের তলে।
তব মুখ বৃষ্টি পিয়ে
হয়েছে মাতাল, সিক্ত সুকোমল
পল্লবের মত।
তব কেশ
ঝলসিছে আলোকিত
জিনেষ্ট্রোর মত।
হে ভুবন-বালা
যে নামেতে সবে তোমা' জানে,
সে যে—এরমিওনে।

শোন, শোন,
বাতাস-ঝিল্লির গান
মূক হ'য়ে আসে
বর্ষণের বেড়ে চলা
ক্রন্দনের তলে।
তারি সাথে মেশে এসে
নিম্নে ঐ উপত্যকা হ'তে
দূরের ছায়ার সুর
ভগন কণ্ঠেতে।
ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর,
শেষে থেমে যায়।
শুধু এক সুর
কেঁপে ওঠে পুনঃ, নিবে যায়,
জ্বলে ওঠে, কেঁপে মরে, শেষে যায়
নিবে।
সিন্ধুধ্বনি শোনা নাহি যায়।
শুধু শুনি পল্লবের পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরে।
বৃষ্টি সে রূপালি।
বৃষ্টি সে নির্ম্মল।
বৃষ্টি-ধ্বনি কমে বাড়ে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার পরে।
শোন,
মূক এবে
বায়ুর বলয়।
কিন্তু ঐ সুদূরের
জলার নন্দিনী
দাদুরী সে
গায় ঘন ছায়াতল হ'তে।
সে কোথায়? সে কোথায়?
নয়নপল্লবে তব নামে বরিষণে,
অয়ি এরমিওনে।

বৃষ্টি পড়ে তব কালো আঁখি পত্রপরে
যেন তুমি কাঁদিতেছ
সুখভরে, শুভ্র অশ্রু নয়।
যেন প্রায় কালো অশ্রু-রূপে
বাহিরিয়া আসিয়াছ তব দেহ হ'তে।
বিশ্বভরা প্রাণ আছে আমাদের
নবীন দেহেতে।
বক্ষমাঝে প্রাণ আছে
অখণ্ড ফলের মত।
আঁখি-পাতা মাঝে আঁখি দুটি
যেন তৃণ মাঝে ঝরণার ধারা।
ওষ্ঠ মাঝে দন্ত পংক্তিগুলি
যেন তিক্ত বাদামের মত।
হাতে হাতে ধ'রে মোরা চলি।
কভু চলি দূরে সরে, কভু কাছে ঘেঁসে।
মালিওলো
সবুজ শক্তির স্পর্দ্ধা ভরে
জড়াইয়া ধরে
জানু।
কি কহে সে? কি কহে সে?
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝরে
মুখে আমাদের।
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুর্‌ফুরে
বসনের পরে।
বৃষ্টি পড়ে খুলে-ধরা
মনের চিন্তাতে।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের সুরে
কাল তুমি ভুলেছিলে,
আজ আমি ভুলেছি ছলনে,
অয়ি এরমিওনে ॥

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুস্তক-পরিচয়

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা—শ্রীঅনিলবরণ রায় (শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত A Defence of Indian Culture-এর কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ)।

এই বইখানি শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী প্রবন্ধের বাঙ্গলা তরজমা। ভাষান্তর করেছেন তাঁর শিষ্য স্বনামখ্যাত অনিলবরণবাবু। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সহজ নয়, তাই ভাষা কতকটা কঠিন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তরজমা করার মুখ্য উদ্দেশ্য ভুললে ত চলবে না। যাঁরা ইংরেজী জানেন না, যাঁরা আসল বইখানা পড়তে পারেন না, প্রধানতঃ তাঁদের জন্য এই বই। সেদিক্ দিয়ে দেখ্তে গেলে, ভাষা আরও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল, ভাবও যতদূর সম্ভব সোজা ক'রে দেওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় না যে, তা'তে কিছু গাম্ভীর্য্যের হানি হ'ত।

এ রকম বই বের হওয়ার দরকার সম্বন্ধে মতভেদ হ'তে পারে না। অনেক লোকের আজও বিশ্বাস যে, এত কালের পুরানো এই দেশটায় শম, দম, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি রাজনীতি যথেষ্ট ছিল কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কখনও ছিল না, প্রবল-প্রতাপ একচ্ছত্রী রাজা বাদশাহ ছিল কিন্তু গণতন্ত্র ছিল না। তাঁরা কবুল করেন যে, ভারতের সাবেক রাজত্বগুলোয় অত্যাচার অনাচার বড় একটা হ'ত না, মোটের উপর স্বরাজ্য জিনিসটাই বেশী পরিচিত ছিল, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই মান্তে চা'ন না যে, এই স্বরাজ্যের পেছনে জনমত কি জনশক্তি ছিল। একথাটা ধ'রে নেওয়া যায় যে, একটা কিছুর ভয় না থাক্লে রাজারা খামখেয়ালী হ'য়ে থাকেন, কেননা এটা মানুষের স্বভাব। পরকালের ভয় সকলেরই থাকে বা থাকা উচিত, সেটা বেশী দূর যায় না। ইহকালের কোন রকম ভয় থাক্লেই রাজার মেজাজ ঠিক থাকে। আমাদের সেকালের রাজাদের এ রকম কোন ভয় ছিল কি? শত শত পুরানো গল্পে আমরা দেখ্তে পাই যে, রাজারা মুনি-ঋষির শাপকে বড় ভয় করতেন। দুর্ব্বাসার ত কথাই নেই, যে কোনও ঋষি সাম্নে এলেই তাঁরা অস্থির হ'য়ে উঠতেন। আজকালকার রাজারা লাট সাহেবকে যা ভয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশী সে ভয়। ঋষিরা মোটের উপর শান্ত-স্বভাব ছিলেন, আর যা আদেশ করতেন বা উপদেশ দিতেন তা ধর্ম্মের দিক্ থেকে। তাঁদের একটা কাজই ছিল যে, ভারতের রাজ্যগুলো ধর্ম্ম-রাজ্য নামের উপযুক্ত হয় এটা দেখা। আর এই দেখ্তেই মাঝে মাঝে হঠাৎ রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে রাজাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যেতেন। আশ্চর্য্য যে, এই অতি পুরানো কাজের ধারা একালেও দেখা গেছে। শিবাজীর ছেলে শম্ভাজী যখন রাজা হ'য়ে অত্যাচারী যথেচ্ছাচারীর মত সব কাজ করতে আরম্ভ করলেন তখন গুরু রামদাস তাঁর মঠ থেকে এক চিঠি লিখে তাঁকে সাবধান ক'রে দিলেন। সে চিঠি আজও আছে, পড়তে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য সে চিঠি, প'ড়ে শম্ভাজীর মত দাম্ভিক খামখেয়ালী রাজা ভয়ে কাঁপ্তে লাগ্লেন। পুরাকালে সব রাজ্যের সেরা ছিল কোশল রাজ্য, কেউ কি ভাবতে পারেন যে, এই কোশলের রাজারা বশিষ্ঠদেবের মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ কখনও করেছেন? শূদ্র তপস্যা কর্‌তে বস্‌ল, রামচন্দ্র তার মাথা কেটে ফেল্‌লেন। সে শূদ্র কিছু বিদ্রোহী নানাসাহেব ছিল না, যে তার প্রাণদণ্ড রাজার দেওয়াই চাই। রামও কিছু এমন

স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না যে, নিরো বাদশার রোম পোড়ানোর মত, কেবল মজা দেখ্বার জন্য শূদ্রের মাথা কাটলেন। তবে হ'ল কি? রাম ঋষির আদেশ পালন করলেন, প্রেরণা এল ধর্ম্মের দিক্ থেকে; গীতার ভাষায় রাম হলেন নিমিত্ত মাত্র। হিন্দু রাজার আদর্শ এই রকমই ছিল, আর একালেও শিবাজী যে গুরুর গেরুয়া চাদরকে রাজনিশান ক'রে নিয়েছিলেন সেও এই পুরানো আদর্শ মনে রেখে। তার পর ধরা যাক্ রামের সীতা বর্জ্জন, সে কাজের মূলে কি ভাব ছিল? রাম ত আর সাহেবদের অষ্টম হেন্‌রী ছিলেন না যে, এক স্ত্রীকে দূর ক'রে দিয়ে আর-একটা বিয়ে করবেন। সীতাকে বনে দিয়ে রামের কি অবস্থা হয়েছিল তা ত কত কবি বর্ণনা ক'রে গেছেন। রাম তবে একাজ করলেন কেন? রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ, কবির এই টীকা রাজা-শব্দের। দুর্ম্মুখ এসে রাজাকে জানালেন প্রজাদের ইচ্ছা কি। প্রজাবৎসল রাজা অমনি অন্য সব কথা ভুলে প্রজার সেই ইচ্ছার মত কাজ করলেন। প্রজাদের চোখ রাঙাতে হ'ল না, দরখাস্ত করতেও হ'ল না। কিন্তু রাজা প্রজার মন রাখবার জন্য নিজের মনে এত বড় ঘা মারলেন কেন? তিনি স্থির জানতেন যে, এই তাঁর ধর্ম্ম, যদি এই ধর্ম্মের অনুযায়ী কাজ তখন না করেন ত প্রজার ইচ্ছা পরে বশিষ্ঠদেবের মুখ দিয়ে তাঁর কাছে পৌছলে তখন তা পালন করতেই হবে, উপরন্তু কিছু তিরস্কার তাঁর ভাগ্যে ঘটবে। ধর্ম্মশাস্ত্র তাহ'লে কার কি কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে দিয়েছে দেখা উচিত। প্রজা রাজাকে পিতার মত, দেবতার মত দেখ্‌বে। রাজা প্রজাকে পুত্রের মত দেখ্‌বেন। পরস্পরের এই সম্বন্ধ বজায় থাকে সেটা দেখ্‌বার ভার ঋষিদের উপর। এই অবস্থার মাঝে যে রাজারা রাজ্য চালাতেন, তাঁদের শক্তিকে অসীম কি অবাধ গতি কিছুতেই বলা যায় না। এই ছিল পুরানো হিন্দুরাজ্য।

পুরানো কিম্বা এখনকার ইউরোপীয় ধরণের গণতন্ত্রও যে এদেশে জানা ছিল না, তাও নয়। শ্রীঅরবিন্দ এগুলোর কথাও পাঠকদের বলেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে ছোট ছোট এরকম গণতন্ত্র অনেক ছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা লিচ্ছবীদের রাজ্য। অন্য দু'তিনটে নামও পাওয়া যায়, যেমন ক্ষুদ্রক, মালবক, যৌধেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো লোপ পায়। আমার নিজের মনে হয় যে, এই ধরণের রাষ্ট্র ভারতের নিজস্ব নয়, সম্ভবতঃ ভারতের উত্তর হ'তে এসে ঢুকেছিল। এদেশে কোনও চিহ্ন রেখে যেতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতে চোল দেশে রাষ্ট্রের যে ধারা ছিল তা অন্য রকমের। শিলালিপি থেকে এই চোলনগুলের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা'তে বোঝা যায় যে, রাজশক্তির সঙ্গে গণশক্তির কি অপরূপ সমন্বয় এই চোল রাষ্ট্রে হয়েছিল। দক্ষিণে এই গণতন্ত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল, প্রায় মহম্মদ ঘোরীর আসা পর্য্যন্ত।

আর্য্য-রাষ্ট্রনীতির প্রধান কীর্ত্তিই হচ্ছে এই সমন্বয়। প্রজারা রাজাকে বাপের মত ভক্তি করত বটে, কিন্তু রাজা তাঁর প্রজাদের নাবালক ছেলের মত দেখ্‌তেন না। কি নগরে, কি পল্লীতে, লোকে পাঁচজনে মিলে নিজেদের দরকারী সমস্ত কাজ নিজেরাই করত। তা ছাড়া আরও কত রকমের সঙ্ঘ ছিল, যেমন এক-একটা জাতের, এক-এক শ্রেণীর ব্যবসাদারদের ইত্যাদি, তারাও আপন আপন ব্যবস্থা আপনি করত। রাজা বা রাষ্ট্রপতির ভার ছিল এই সমস্ত ছোট ছোট সঙ্ঘগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা। এ কাজটাও কঠিন ছিল না। রাজা তাই প্রধানতঃ অন্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ, সন্ধি

ইত্যাদি ব্যাপার নিয়েই থাকতেন। অর্থাৎ একালের ভাষায় রাজা Foreign Ministry ও War Ministry নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, Home Department-এর কাজ প্রজারাই চালাত। সবাই নিজের নিজের কাজ ক'রে যেত, নিজের অভাব পূরণ করার ভার নিজেরাই নিয়েছিল। একটা বিরাট ধর্ম্মভাব সবাইকে এক ক'রে রেখেছিল। এই জন্য সেকালে জাতে জাতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ হ'য়ে রাজ্য ছারেখারে যেত না। সেদিন এক বাউলের গান শুন্‌লাম, তার ভাবটা এই যে, ফলের মধ্যে মধুর রসের সঞ্চার হ'লে, বাইরে বিচিত্র রং আপনি ফুটে ওঠে, কিন্তু কাঁচা ফলের উপর তুলি দিয়ে রঙ্গ ক'রে, অতি বড় নিপুণ চিত্রকরও ফল পাকাতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতিতেও এ কথাটা বড় সত্যি। হিন্দুরা তা বুঝেছিলেন, তাই একেবারে ভেতরে স্বতন্ত্রতার স্বচ্ছন্দতার রস সঞ্চার করেছিলেন। আর আমরা বুঝি না ব'লেই বাইরে তুলি দিয়ে রঙ্গ ফলাচ্ছি। হিন্দু সভ্যতার অতি বড় দুর্দ্দিনেও Metcalfe (মেট্‌কাফ্‌) প্রভৃতি সাহেবরা এদেশের গ্রাম-পঞ্চায়েৎ দেখে অবাক্ হয়েছিলেন। তাঁরা গ্রাম-গুলোকে republic বা গণতন্ত্র নাম দিয়ে গেছেন আর বর্ণনা ক'রে গেছেন যে, কি সুন্দরভাবে তারা নিজেদের সব রকম কাজ চালাত।

উত্তর ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলি সেকন্দর বাদশার দিগ্বিজয়ের পর আস্তে আস্তে লোপ পেল, আর তার জায়গায় একটার পর একটা বড় সাম্রাজ্য দেখা দিতে লাগ্‌ল। এই সব সাম্রাজ্যের কথা ইতিহাসের বইতে দু'চার পৃষ্ঠাতেই শেষ করা হয়, কিন্তু ব্যাপারটা চলেছিল আট নয় শতাব্দী ধ'রে। হিন্দু সভ্যতাকে বিদেশীর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর দরকার যখন হ'ল, তখন এই সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীরা দেখা দিলেন। ছোট ছোট রাজারা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও সেকন্দরের গতিরোধ করতে পারেন নি। মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত এই ব্যাপার দেখলেন আর বুঝলেন কোনখানটায় ভারতের গলদ। চাণক্যকে সহায় ক'রে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন আর গ্রীক্‌দের ভারতে ঢোকবার পথ বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পরে এল, শক, হুন ইত্যাদি কত আধা জঙ্গলী জাত। আগেকার দিন হ'লে তারা হিন্দুসভ্যতা চুরমার ক'রে দিত। কিন্তু এই মহাবল সম্রাটদের জন্য তারা কিছুই করতে পারলে না। যা কিছু গোলমাল কর্‌ল উত্তর পশ্চিমে, বেশী দূর দাঁত বস্‌ল না। ভেতরে যারা ঢুক্‌ল তারা কিছুদিন যেতে না যেতে ঘরের ছেলে হ'য়ে গেল। ভারতমাতা তাদের কোলে তুলে নিলেন।

এই সাম্রাজ্যের যুগের প্রথমের দিক্‌টায় ধর্ম্মরাজ্যের ভাব বজায় ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সেটা কমে গিয়ে একটা স্বার্থপর, নির্ম্মম ধরণের নীতি রাজধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়াল। নানা শ্রেণীর প্রজাদের যে সব সঙ্ঘ ছিল কতক বা উঠে গেল, কতক বা বিগড়ে গিয়ে কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে গেল। এক মাত্র বেঁচে রইল গ্রাম-পঞ্চায়েৎগুলো। আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা গ্রামের লোকের কল্যাণ কর্‌তে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু একটা মস্ত বড় রাষ্ট্রের ভিত্তি ব'লে আর তারা রইল না।

রাষ্ট্রনীতি বিচার করতে গিয়ে ইতিহাসকে ত আর ভোলা যায় না। ক্রমশঃ হিন্দু সাম্রাজ্যগুলোর শেষ দিন এল। পাঠানরা এসে ভারত জয় কর্‌ল। হিন্দু সভ্যতার প্রশংসা যে করবে তাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে হিন্দুর সর্ব্বনাশ কেন হ'ল। গ্রন্থকার সে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি বলেছেন, ভারত আজও মরে নি, আজও তার কাজ শেষ হয় নি। ঘোর অন্ধকার বটে, কিন্তু ভোরের আলো উঁকি

মারছে। এ কি "Poet of Patriotism"-এর কথা না "Prophet of Nationalism"-এর কথা? শ্রীঅরবিন্দ একদিন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, আজ তিনি সিদ্ধ পুরুষ, তাঁর কথার আলোচনা করতে পারি, কিন্তু সমালোচনা করা আমার কাজ নয়।

প্রথমেই অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য জানিয়েছি, আর-একটা কথা শুধু বলার আছে। বইখানায় ছাপার ভুল অনেক রয়ে গেছে, আর কোনও কোনও ভুল বিশ্রী রকমের।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিবাহের চেয়ে বড়ো—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন
অসমাপিকা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
অকর্ম্মণ্য—শ্রীবুদ্ধদেব বসু (ডি, এম্, লাইব্রেরী)

"বিবাহের চেয়ে বড়ো" উপন্যাসে অচিন্ত্যকুমার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সমালোচক-বৃন্দের সম্মিলিত কীর্ত্তির চেয়েও বড়ো কোন কীর্ত্তি রেখে যাবার জন্যই বোধ হয় অভিযান করেছেন। এর ওপর সমাজ ও যৌনতত্ত্বের টীকাকারদের পরাস্ত করতেও তিনি বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতগুলি প্রসঙ্গের ঠেসাঠেসিতে তাঁর সে অভিযান নিতান্তই অন্ধকূপ-হত্যায় পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে মতামতের অবতারণা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় হয়তো অসঙ্গত নয়, তবে সে মতামত ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ গ্রন্থকর্ত্তার নিজের জবানীতে না-হয়ে, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্রসঙ্গত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু চরিত্রগুলিও অনর্গল বকে যাবে, আবার গ্রন্থকার নিজেও উঁচু গলায় স্ব মত জাহির করবেন, এটা বরদাস্ত হবার নয়; কেননা, এতে রসবৈষম্য উপস্থিত হয়। অবশ্য রসের অধিকার ও রসবৈষম্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যা ধারণা,—অন্ততঃ তাঁর লেখায় যা প্রকাশ পেয়েছে—তা মেনে নিলে এ সমালোচনা-প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি করতে হয়। কেননা, তাঁর মতে পরিণতি, সঙ্গতি, সুষমা ইত্যাদি খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই ছেলেমানুষী সুতরাং পরিহার্য্য। তাঁর বিশ্বাস, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্র উপন্যাস লেখায় ফেল মেরেছেন। তাঁরা চেয়েছেন ঐ সব জিনিষ; তাঁরা করেছেন নায়ককে বীর, মহনীয়, সচ্চরিত্র, না হয় "দুর্দ্দাম বলিষ্ঠ", "জঘন্য হীন" বা এমনি একটা কিছু সুস্পষ্ট মানুষ। তাঁরা চেয়েছেন "গল্পে ঘটনা", তাঁরা চেয়েছেন "কবিতায় বোধ্যতা"। এর ওপরও রবীন্দ্রনাথ আবার ধমক খেয়েছেন, আত্মকাহিনী লিখতে গিয়ে তাঁর জীবনের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ না করার দোষে। "বায়রণ" থেকে "বঙ্কিম", "চরিত্রহীনের উপেন", শিশির ভাদুড়ীর "সীতা অভিনয়" "লুভারের মূর্ত্তি" ও "বিভূতি বাঁড়ুয্যের পথের পাঁচালী" ইত্যাদি যে-জিনিষগুলি সাধারণের কাছে ভিন্নভাবাপন্ন, সে-সমস্তই তাঁর কাছে এক—অর্থাৎ, একই দোষে দুষ্ট,—সে-সমস্তই একটা বিশেষ কিছু করবার, একটা বিশেষ কিছু হ'য়ে দাঁড়াবার অভিলাষী। প্রকারান্তরে লেখকের মত এই যে, প্রকৃষ্ট চরিত্র সৃজন হবে অস্পষ্ট, অবোধ্য, অসংলগ্ন, অসম্ভাব্য। "আমি যা আমি তাই"—এই হবে

চরিত্রের প্রকৃত পরিচয়। অসঙ্কোচে এই সব মত গ্রন্থকার স্পষ্ট কথায় উপন্যাসের মধ্যেই ব্যক্ত কবেছেন। বোধ হয় এ-তত্ত্বের সেরা উদাহরণ তাঁর নায়িকা অশ্রুর পরিকল্পনা। কিন্তু কোনমতেই আমি এ চরিত্রকে মর্য্যাদা দিতে পার্‌ব না। কেননা, চরিত্রটি বোধগম্য হয় নি। অবশ্য বোধগম্য হওয়াটাই আদর্শ নয়, এই হ'ল গ্রন্থকারের মত—এইখানেই আমাদের মধ্যে আসমান জমীর তফাৎ। আমি সেই দলের যারা মনে করে চরিত্রের একটা কিছু হওয়া চাই,—লম্পট হোক্, কামুক হোক্, ভীরু হোক্, বীর হোক্, বিদ্রোহী হোক্, প্রণয়ী হোক্, অথবা তার মনোগত বা চরিত্রগত দ্বন্দ্ব থাকুক্—একটা কিছু স্বরূপ চাই। কিন্তু কিছুই না হওয়াকে বা গ্রন্থকারের পাতায়-পাতায় লিপিবদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে পার্‌ব না।

গল্পটির এইখানে পরিচয় দিতে হ'ল, যদিও বিস্তর অসংলগ্ন বাক্যজালে ও পাত্রপাত্রিদের অসংলগ্ন ক্রিয়াজালে গল্পটি এমন বিজড়িত যে, তার পরিচয় দেওয়া এক অতীব দুরূহ ব্যাপার। নায়িকা অশ্রু জলপাইগুড়িতে টিচারি করে—গ্রন্থকার নায়িকার আর কোন পরিচয় না দিয়ে পাঠকের ওপর ভার দিয়েছেন এই থেকে অনুমান ক'রে নেবার যে, নায়িকা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। নায়ক প্রভাত আপন বিবাহের জন্য তার দিদিকে সি-পি থেকে আন্‌তে গিয়ে অশ্রুর সাক্ষাৎ পায়, তাতেই হয় আলাপ ও প্রেম। সে প্রেমে বাধা প'ড়ে অশ্রুর পিতা অশ্রুর বিয়ে দেবার আয়োজন করায়, তাই বিবাহে সে মত দিলেও পাছে "বিয়েটা সুভোগ্য না হয়" এই আশঙ্কায় অশ্রু করে গৃহত্যাগ ও জলপাইগুড়িতে টিচারি গ্রহণ, সুতরাং নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নায়কেরও "বিয়ে অতএব হ'ল না"। এর পর যবনিকা ;—তিন বছর পরে তার উন্মোচন। এই তিন বছরের মধ্যে সামান্য একটু ঘটনা ঘটেছিল। অশ্রু নির্ম্মলকে জীবন নয়—তার যৌবন নিবেদন কর্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু নির্ম্মল "বিবাহের চেয়ে বড়ো" এই অধিকারের মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে সম্ভোগের ডালি প্রত্যাখান করে। তখন অশ্রু প্রভাতকে পুনঃস্মরণ ক'রে চিঠি লিখে ডেকে পাঠায় তার সঙ্গে "বেরিয়ে যাবে" ব'লে। প্রভাত মাত্র ষাট টাকা মাইনের কেরাণী কিন্তু লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত। রুশো ভল্‌টেয়ার, বাইরণ থেকে জেমস্ জইস, এড্‌গার ওয়ালেস্ থেকে মারি ষ্টোপস্, মায় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া তার দখলে। তাই সে অশ্রুর চিঠি পেয়ে মাকে দেখাল ও মার অনুমতি নিয়ে অশ্রুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। মা সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, সে যেন ছুটি নিয়ে যায়, নয়ত চাকরী খোয়া যাবে, তাই প্রভাত তিন দিনের ছুটি নিয়েছিল। তিন বছর পরে প্রেমিক প্রেমিকার দেখা, কিন্তু প্রেমালাপ তেমন কিছু হ'ল না, হ'ল তর্কালাপ। প্রভাত অবশ্য মনে মনে আশা করেছিল যে, প্রেম-জোয়ারে ভেসে সে অশ্রুর দেহকূলে এসে উত্তীর্ণ হবে কিন্তু নির্ম্মলের ভাগ্যে যা হ'তে পার্‌ত প্রভাতের ভাগ্যে তা জুট্‌লো না। শুধু ট্রেণে আস্‌বার সময় কামরায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক যাত্রীকে দেখিয়ে ও জানিয়ে হ'ল একটু "নিষ্ঠুর ওষ্ঠাধর সম্মিলন", একটু কাঁধে মাথা রাখা আর আলো নিবিয়ে দুজনের একটু নিবিড় বাহুবন্ধন। কল্‌কাতায় এসে অশ্রু গ্রাণ্ড্ হোটেলেই উঠ্‌ত ও হয়ত তার "কোন সাহেবের সঙ্গে বন্ধুতা কর্‌বার সুযোগো মিলে যেতো" কিন্তু তাতে বেজায় খরচ (!) তাই সে ক্যাল্‌কাটা হোটেলেই উঠ্‌ল। সেখানে অবশ্য প্রভাত শুধু দিনের বেলায় আস্‌তে পারে। কেননা, রাত্রে আসা হোটেলের ম্যানেজার "নিশ্চয় allow করবে না"। এলেন অশ্রুর কাকা,

অশ্রুর অপরাধ কবুল করাতে, কিন্তু তাতে পরাস্ত হ'য়ে প্রভাতকে ডেকে অশ্রুকে বিবাহ কর্‌তে বলায় নায়ক নায়িকা এই বর্ব্বর প্রস্তাবের জন্য তাঁকে দিলেন এমন বিদ্রূপের ধাক্কা যে, তিনি গেলেন "হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গায়" প'ড়ে। পাছে পাঠকের মনে এতে আঘাত লাগে তাই গ্রন্থকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাকাবাবু গঙ্গায় প'ড়ে গেলেও ডোবেন নি, কূল পেয়েছিলেন। তারপর অশ্রু গেল বেড়াতে, পাটনায় ব্রেক্ জর্নি ক'রে এলাহাবাদে, এবং কথা রইল যে, প্রভাত ছুটি নিয়ে দু'দিন পরে সেখানে এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে যাবে লাহোরে। প্রভাত একবার আপত্তি করেছিল যে, এ যেন ফংচু হ'য়ে কামস্কাট্‌কায় যাত্রা, কিন্তু অশ্রু প্রভাতের আপত্তিতে কর্ণপাত করে নি। এলাহাবাদে থাক্‌ত অশ্রুর পুরাতন প্রেমিক নির্ম্মল,—ইতিমধ্যে সে আবার অশ্রুরই কলেজের সহপাঠী ইন্দিরাকে বিবাহ করেছিল। অশ্রুর সেখানে যাবার উদ্দেশ্য ছিল তার সেই "অন্যতম শিকার" নির্ম্মলের জন্যে একটু "ওৎপেতে থাকার" ও তার পুরাতন প্রেম একটু তাতিয়ে নেবার। সে কথা ইন্দিরাকে সে খুলেই বলেছিল কিন্তু আসলে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। কেন যে গোলমাল হ'য়ে গেল তা গ্রন্থকার নিজে ভাল ক'রে ব্যক্ত না ক'রে পাঠকের ওপরই ভার দিয়েছেন বুঝে নেবার জন্য। ব্যাপারটা মোটামুটি এই,—অশ্রু গিয়ে ইন্দিরার ডায়রি প'ড়ে জান্‌তে পারে যে, ইন্দিরার পূর্ব্বপ্রণয়ী রমাপতি এখনও ইন্দিরার হৃদয়-মন জুড়ে আছে কিন্তু পাছে স্বামী তা সন্দেহ করেন এই কারণে সে স্বামী সেবার ভান করে। আর-একটি জিনিষ অশ্রু দেখ্‌লে যে, ইন্দিরা "বন্দিনী তার দেহের কারাগারে" অর্থাৎ সে গর্ভবতী। অশ্রুর সঙ্গে ইন্দিরার এই নিয়ে অনেক তর্ক হ'ল। সে বল্লে, কেন ইন্দিরা রমাপতির সঙ্গে না হোক্ নিজেই বেরিয়ে যায় নি, কি অধিকার আছে তার স্বামীর তাকে তার দেহ-কারাগারে বন্দী কর্‌বার ইত্যাদি। রাত্রে কিন্তু নির্ম্মল বাড়ী এলে তার প্রতি অশ্রুর মনোভাব বিচার ক'রে স্বামী-প্রতারক ইন্দিরা হঠাৎ অত্যন্ত স্বামী-অনুরক্তা হ'য়ে পড়ল। কিন্তু সেজন্য নয়, আর-একটি কারণে অশ্রুর লাহোরযাত্রা ও জীবনযাত্রা বদলে গেল,—সে কারণ হচ্ছে নির্ম্মল অশ্রুকে প্রশ্ন করেছিল যে, সে কি প্রভাতকে ভালবাসে। অশ্রুর আর লাহোরের টিকিট কেনা হ'ল না। তা ছাড়া প্রভাত লিখেছিল যে, ভালবাসার জন্য চাকরী ছাড়তে হবে এমন ভালবাসা সে কাটিয়ে উঠেছে। সুতরাং অশ্রু কল্‌কাতায় ফির্‌ল, ও উঠ্‌ল গিয়ে প্রভাতেরই বাড়ী। সেখানে পৌঁছেই চা বানিয়ে ও নর্দ্দামা ধোবার সময় স্বয়ং মেথরাণীকে জল জুগিয়ে সে প্রভাতের মাকে একেবারে বশ ক'রে নিল। কিছু দিন যায়, রাত্রে সকল কাজ শেষ হ'লে ও সকলের শোয়া হ'লে সে প্রভাতের শয্যায় বসে তার সঙ্গে বিশ্রান্তালাপ শেষ ক'রে তাকে চুমু দিয়ে সে মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এই দুটি কপোত কপোতীকে দেখে খুসী হ'য়ে মা অশ্রুর কাছে প্রস্তাব করলেন তার সঙ্গে প্রভাতের বিবাহের। এইখানেই হ'ল যত গণ্ডগোল—এই প্রাচীন বর্ব্বর প্রস্তাবে অশ্রু উল্লসিত অথচ সশঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কেননা, স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ও দৈহিক মিলন হ'লে তার যৌবনের সমুন্নত মহিমা যে বিনষ্ট হবে। অগত্যা তাকে বিবাহ অস্বীকার কর্‌তে হ'ল,—হতাশ হ'য়ে মা চলে গেলেন কাশী আর অশ্রু গেল ফিরে জলপাইগুড়িতে। যাবার আগে সে প্রভাতকে এই কথা বলে গেল যে, তার কাছে প্রভাতের অবারিত নিমন্ত্রণ; কিন্তু বিবাহের নয়, সম্ভোগের নয়। এ কিসের অবারিত নিমন্ত্রণ সে সমস্যার সমাধান করার ভার রইল পাঠকের ওপর।

এইখানে এই আখ্যানের শেষ,—কিন্তু একথা কি ব'লে দিতে হবে যে, এটা চিত্রও হয়নি চরিত্রও হয়নি, হয়েছে আবর্জ্জনা ; সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে অনাসৃষ্টি। গ্রন্থকার অশ্রুকে নিয়ে কি করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে ক'রে তুলেছেন স্ত্রী-পুরুষের, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর, মিলন-সম্ভোগের বিরোধী, সন্তানলাভের বিরোধী। মন্ত্রশক্তির নায়িকাও বিবাহ ও সম্ভোগের বিরোধী ছিলেন, তবে কি অশ্রু ছিল তার মত সংযমী, ব্রতচারিণী বা পূজারিণী? তা নয়, কেননা এদিকে অশ্রু নায়কের চুম্বন-আলিঙ্গনে সদাই উন্মত্ত, ওদিকে পূর্ব্ব প্রণয়ী নির্ম্মলের আসক্তি উজ্জীবিত করতে সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে এলাহাবাদে ছুটে আসতে ও নির্ম্মলেরই স্ত্রীর সহযোগিতা প্রার্থনা করতে কসুর করে না। এরকম উত্তেজনা-বিলাস ডাক্তারি শাস্ত্রে স্নায়বিক ব্যাধি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয় অশ্রুকে ব্যাধিগ্রস্তা প্রচার করা। প্রকাশ্যে বলা হয়েছে, অশ্রু বিদ্রোহিনী কিন্তু তার বিদ্রোহ বুলির বিদ্রোহ, তার বিদ্রোহ ঘটনা-প্রমাদের নামান্তর। রোহিণী, শৈবলিনী, বিনোদিনী, কিরণময়ী—এঁরাও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে ছিলো সামাজিক শাসনের চেয়েও অধিক বলশালী কোনো শক্তির প্রণোদনা—কাম-উন্মাদনা, ব্যর্থতা বা নারীহৃদয়ের প্রহেলিকাময় কোনো নিগূঢ় কর্ম্মক্ষমতা। "লা গার্সনে"র নায়িকা "মোনিক" অসংযমের রসাতলে নেমে গিয়েছিলেন কিন্তু সে একরূপ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য, স্পর্দ্ধা জানাবার জন্য। এ সব বিদ্রোহে আছে বাঞ্ছিতের জন্যে দুঃখ বা লাঞ্ছনা বরণ। কিন্তু অশ্রুর কাম্য কি, প্ররোচনা কি? সে কাম্য সে প্ররোচনার পিছনে শক্তি কিসের? অশ্রুর বিদ্রোহজনিত দুঃখ কই, লাঞ্ছনা কই, সমাজ কই, শাসন কই? বিদ্রোহিনী অশ্রু সমস্তই বজায় রেখেছেন—আত্মপ্রসাদ, চরিত্র, নিষ্ঠা, চাকরী, প্রতিষ্ঠা! সমস্ত উপন্যাসটিতে, তার সমস্ত চরিত্রে, তার সকল স্থানে এই রকম অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন ভ্রান্তিবিলাস। বাক্যের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি নেই, ভাবের সঙ্গে কার্য্যের সঙ্গতি নেই, কার্য্যের সঙ্গে ফলাফলের সঙ্গতি নেই। জলপাইগুড়ি, কলিকাতা, এলাহাবাদ, পাটনা, ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, বৃক্ষ-লতা—অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্টিতে এসকলের প্রকৃতি বিলুপ্ত, মানুষ জীবনহীন, উদ্দেশ্যহীন—মেস্‌ম্যারাইজ্‌ড্‌। আছে যা না হ'লে অচিন্ত্যকুমারের লেখা সাঙ্গ হয় না,—নিরর্থক হত্যা, নিরর্থক মৃত্যু। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে পদদলিত করবার আস্ফালন!

সাহিত্যে যাঁদের কথা প্রণিধানযোগ্য তাঁরা এই শ্রেণীর লেখকদের বহুবার বলেছেন যে, রুচি-সঙ্গত হোক্ অশ্লীল হোক্ গল্পে, উপন্যাসে ও চরিত্রে রসসৃষ্টি হওয়া চাই ; কিন্তু সমস্তই বৃথা, সে-কথা আজও এই লেখকদের জ্ঞানগোচরে পৌঁছাল না। আরও স্থূল ভাষায় এঁদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, অঙ্ককষার মত উপন্যাস রচনায় শুধু উত্তরটি রাইট্ হলেই হয় না, তার প্রণালীও রাইট্ হওয়া চাই। চরিত্র বা ঘটনা সংস্থাপন লেখকের রচনা কৌশলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রচনার সাহায্যে তিনি যা দাঁড় করাতে পারেন নি, শুধু বুলির সাহায্যে পাঠকের কাছ থেকে নম্বর আদায় করতে পারবেন না। দার্জ্জিলিং মেলে রেস্তরাঁ কার থাকে না, থাকলেও কেউ রাত্রি ১ টার সময় গিয়ে তাতে মাংসের ডিশ খেতে পায় না, ডাউন মেলের পথে পোড়াদহের পর সান্তাহার পড়ে না, আলো নেবানো কামরায় হাতের লেখা পড়া যায় না, সতেরো বছরের ছেলে মান্যপদস্থ স্ত্রীলোকের কাছে প্রথম দর্শনেই যমুনায় নৌকাবিহারে সখীসঙ্গের

লীলাকীর্ত্তন করে না,—প্রণয়িনীর প্রেমপত্র, বিশেষতঃ প্রেমাভিসারের আহ্বানপত্র কোন পুত্রই মাকে দেখায় না—ভাবরাজ্যেও না, ভূভারতেও না। সধবার একাদশীতে মা পুত্রের জন্য বেশ্যা আনিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সধবার একাদশী প্রহসন, তা ছাড়া আবার স্থূল ক'রে বল্‌তে হচ্ছে, সধবার একাদশীতে পাত্রপাত্রীর ব্যাভিচারের জন্য গ্রন্থকার পথ তৈরী করেছিলেন। "বিবাহের চেয়ে বড়ো"র গ্রন্থকার তা কর্‌তে পারেন নি। এ-উপন্যাসের চেয়ে রামশ্যাম সিরিজের অগণিত উপন্যাস ঢের বেশী রাইট্‌, ঢের বেশী উপভোগ্য।

দেখা যাচ্ছে, অশ্রু-চরিত্র বাংলা উপন্যাসে শাশ্বত হ'তে চল্ল। 'অসমাপিকা' অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনা কিন্তু এ উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চেও নায়িকারূপে অশ্রুকেই উপস্থিত দেখ্‌তে পাই, অবশ্য ভিন্ন বেশে। অশ্রু বিবাহ কর্‌তে চায়নি। অসমাপিকার নায়িকা সুরুচি বিবাহিতা হ'য়েও বিবাহ কর্‌তে চায়—এই রকমের একটা-দুটো প্রভেদ আছে মাত্র। যখন দেখি সুরুচিও, অশ্রুর মত, যার জন্য গৃহত্যাগ করে তারই সাথে মিলনে বিমুখ হয়েছে তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, যে-খামখেয়ালের বশে অশ্রুর উদ্ভব সেই খামখেয়ালেই সুরুচির জন্ম। একথা এইখানে বলা দরকার যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালী জীবনের যে-সমস্যাসৃজনের প্রয়াস করেছেন তা খুবই সমীচীন, কিন্তু সমস্যাটিকে তিনি ঠিকমত উপস্থিত কর্‌তে পারেন নি, বা তার সমাধান কর্‌তে পারেন নি। সুরুচির গৃহত্যাগ ও স্বামীত্যাগ নাকি পরপুরুষ-প্রণয়মূলক নয়, উদ্দেশ্যমূলক। কেননা, স্বামী ছিলেন অন্য-স্ত্রী-আসক্ত ও সুরুচির গর্ভস্থ সন্তান স্বামীর জবরদস্তির ফল, প্রেমের নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা উপন্যাসে গল্পে Sex problem ও Romance হাত পা-ছড়াবার জন্যে বেশি জায়গা পায় না, এ-ক্ষেত্রে সে-সনাতন প্রব্লেম উত্থাপন ক'রে অন্নদাশঙ্কর হয়তো বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু প্রব্লেম শুধু উল্লেখ করলেই হয় না, তার সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়াও লেখকের কর্ত্তব্য। কিন্তু অসমাপিকায় সুরুচির স্বামীঘটিত দুর্গতির কথার উল্লেখ আছে বটে, তার সাক্ষাৎ নেই ; সুরুচির নব প্রেমিক সুচারুর সঙ্গে প্রেম-আলাপনের মধ্যে বিজ্ঞতার শিরশ্চালনটুকু আছে কিন্তু ঐকান্তিকতা নেই। উপন্যাসের রাজ্যে এমন দেখা যায় যে, সারা বইটির মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা হ'ল মাত্র একবার, হয়ত তা মুহূর্ত্তেকের জন্য, হয়ত বা উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তারই অবসর হয় নি, অথচ লেখকের যাদুস্পর্শে সেই নির্ব্বাক ক্ষণিক সাক্ষাৎই প্রেমের অমৃতরসে সরস হ'য়ে উঠেছে। অসমাপিকায় কিন্তু সুরুচির সঙ্গে সুচারুর একহাজার একশো বার সাক্ষাৎ হ'লেও এবং সুরুচির সঙ্কোচহীনতার অশেষ বাড়াবাড়ি থাক্‌লেও লেখকের যাদুস্পর্শের অভাবে প্রেম সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠেনি। ফলে অনেক প্রকার প্রেমসঙ্কল্প ক'রে সুরুচি প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও পণ করলেন যে, প্রেমিকের সাথে কোনো রকমের অবৈধ মিলন তাঁ'র ঘট্‌বে না। এদিকে সুচারুও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, সন্তানবিবহিত প্রণয় তার কাছে কখনো আমল পাবে না। ফলে সুরুচিও অশ্রুর মত চরিত্র ও নিষ্ঠা বজায় রেখে গৃহত্যাগের কীর্ত্তি মাথায় ক'রে পাঠককে হতভম্ব ক'রে দিলেন। এক-একবার সন্দেহ হয়, গ্রন্থকার প্রেমের গল্পই ঠিক লিখ্‌তে চেয়েছেন ত? আবার সন্দেহ হয় যে, বাংলার আধুনিক শিক্ষিত যুবক-যুবতী কি এমনি একটা সৃষ্টিছাড়া অপূর্ব্ব জিনিষ যে, শুধু ভান ক'রেই তারা প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে? হয়ত কেউ

বলবেন যে, নায়িকাচরিত্র ও তার সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে আমি শুধু বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রই এই, সমস্ত বইটিই লেখকের অমনোযোগিতায় বা অক্ষমতায় ভরা। পার্শ্বচরিত্রগুলি এক-একটি ভাঁড়। উমা,—একটি ছোট মেয়ে,—বয়স পাঁচ কি পনেরো বোঝবার উপায় নেই, সুচারুর লক্ষ্মণসম সঙ্গী প্রবীর একটি মর্কট, তার প্রেমাভিসারিকা বাঘিনীসম মালিনী অসহ্য, সুচারু ও সুরুচির ফিরিঙ্গী ছদ্মবেশ হাস্যাস্পদ, ঘটনাবিন্যাস খেলো, কথোপকথন অযথা রূঢ় ও কুরুচিপূর্ণ।

আমি আগে লিখেছিলাম নারীচরিত্র সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের গল্পরচনা ও কবিতা একদেশদর্শিতারই আভাস দিয়েছে। অকর্ম্মণ্যে বুদ্ধদেব নারীচরিত্রের অন্য এক অংশ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কেননা বাহ্যতঃ নায়ককে বাংলা সাহিত্যের রুডিন্ পদবাচ্য ক'রে ফুটিয়ে তোলাই অকর্ম্মণ্যের উদ্দেশ্য হ'লেও কার্য্যতঃ সেটা তেমন সফল হয় নি, প্রাধান্যলাভ করেছে নায়িকাদ্বয়ের মনোবৃত্তি। যে নারী-মনোবৃত্তি আপন নিগূঢ়তায় প্রহেলিকা দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি করে, বুদ্ধদেব তাঁর পুরাতন নারীপ্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে এবার সেই মনোবৃত্তিকে উপাদান-রূপে ব্যবহার করেছেন। নায়িকাদ্বয় দুই সহোদরা ভগ্নী, জ্যেষ্ঠা অনসূয়া ধীর শান্ত, কনিষ্ঠা রিণি প্রগল্ভ, সপ্রতিভ, উদ্দাম ও অতি আধুনিক। যে সুখ যে সম্পদ নগৎ নগৎ পাওয়া যায় তাই তার কাম্য। উভয়েই গৃহাগত অতিথি শশাঙ্কের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু শশাঙ্ক প্রয়াসপরাঙ্মুখ 'রুডিন্'—অনসূয়া বা রিণি কারোর প্রতিই তার পক্ষপাত দেখা গেল না। এই সংস্থাপনের ওপর ভিত্তি ক'রে উপন্যাসে দুই ভগ্নীর চিন্তাধারা খুব প্রকটিত হয়েছে অনসূয়ার স্বগতোক্তিতে আর রিণির ডায়রী লেখায়। তার সঙ্গে আর-একটি চিন্তাধারা এসে যোগ দিয়েছে পাত্র-পাত্রিদের রিণিকে নিয়ে মুখে মুখে গল্প রচনায়। এই স্বতন্ত্র চিন্তাধারার চিত্রণে গল্পটির কথোপকথনে ও রিণির আপাতঃ-দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকলাপে লেখক যে technique-এর পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয় এবং সেটি বুদ্ধদেবের নিজস্ব সম্পদ। তাঁর ভাষাও সমকক্ষহীন।

কিন্তু আসল জিনিষের সাক্ষাৎ নেই, সমস্ত দীপ্তি ভাষায় ও রচনায়; চরিত্রে নয় বা গল্পের আন্তরিক ঐক্যে নয়। মনে এমন সন্দেহেরও উদয় হয় যে, লেখকের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে, তাই এবারও তাঁর অঙ্কিত নারীমূর্ত্তি প্রাণবন্ত হ'তে পারে নি। অতি স্মার্ট ক'রে সম্পদশালী গৃহস্থের চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক ভুল করেন। পিতার পুত্র-আগমন-আশায় আয়োজন উদ্যোগ, বাবুর্চির নোংরামি, ডিনার-টেবিলের ব্যবস্থা, সতেরো বছরের রিণির পিয়ানো-সিদ্ধি ও Mozart এবং অখ্যাতনামা "স্যাঁ স্যাঁজ"-এ পারদর্শিতা—এগুলি নিতান্ত অবান্তর, এগুলি সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করার ফলেই লেখক শুধু প্রহসন ও বিকার তৈরী করেছেন। মোট কথা, খুব স্মার্ট হয়েছে বইখানি কিন্তু সার্থক হয় নি। বুদ্ধদেবের গল্প রচনায় যে দক্ষতার ইসারা পাওয়া গিয়েছিল তাঁর উপন্যাস রচনায় এখনও সে-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল না। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের সঙ্গে বুদ্ধদেবের উপন্যাসের সিদ্ধিতে বড় প্রভেদ নেই, তবে প্রভেদ এই যে, একজন বার বার তাঁর লেখায় নিকৃষ্টতারই পরিচয় দিয়েছেন, আর-একজনের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আস্থাবান।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Music At Night, The World of Light, The Cicadas
By Aldous Huxley (Chatto & Windus).

অল্ডুস্ হাক্স্‌লি সম্বন্ধে যে কথা বহুবার বলা হয়েছে, সে হচ্ছে প্রশংসার—most promising বা ঐ জাতীয় কোনো কথা। কিন্তু বাইশখানি বই প্রকাশ করার পরে প্রমিসিং হওয়া কিছু অসার্থক মনে হয়। পনেরো বছর আগে সবাই আশা করেছিল যে, বাইশ বছরের এই ক্ষমতাশালী বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লেখক বয়সে প্রথম-শ্রেণীর সাহিত্যিকে পরিণত হবেন। Music At Night, The Cicadas, The World of Light, Brief Candles, Vulgarity in Literature প'ড়েও শুধু সেই সাধু আশাই পোষণ করতে হয়। এরকম রসাল গল্প, এরকম সুখপাঠ্য সুলিখিত প্রবন্ধ, এরকম স্বচ্ছন্দ নাটক, এরকম মিষ্টশ্রব কবিতা খুব কম লোকেই লিখ্‌তে পারে। এরকম ভাষার উপর দখল, কথার কায়দা, স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা সত্যই দুর্লভ। এরকম বহুমুখী বিদ্যাও কম পাওয়া যায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা—চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, আস্‌বাবপত্র,—বিজ্ঞান, ফরাসী ও ইটালিয়ান্, এবং য়ুরোপের ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে এত বিশেষজ্ঞতা সত্যই আশ্চর্য্য। কিন্তু এ সার্কাস্ বেশ লাগলেও ও দেখানো শক্তিসাপেক্ষ হ'লেও হাক্স্‌লির সম্বন্ধে আমাদের আশা এতে অপূর্ণ।

Music At Night বেরোবে জেনে মনে হয়েছিল Do What You Will-এরই বিকশিত ও পরিণত ফলই বুঝি এতে পাওয়া যাবে। কিংকর্ত্তব্যধারণাহীন যুদ্ধান্তের শিক্ষিত মানুষের সমস্যায় আজকাল সবাই ভারগ্রস্ত। শ্রদ্ধাহীনতা ও নিরাশ্রয়তা এই নতুন পৃথিবীর ব্যাধি। এই ব্যাধির জ্বালা, বুদ্ধিদীপ্ত ঔদ্ধত্য, প্রীতিকর ব্যঙ্গ হাক্স্‌লির গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধকে অলঙ্কৃত করেছে। ভাবা গিয়েছিল Do What You Will-এ এই সমস্যা যে রূপ নিয়েছিল, তার সমাধান আসন্ন। টি, এস্, এলিয়টের মতো হাক্স্‌লিও রাত্রির বাহুল্যহীনতায় প্রশ্নের উত্তর সঙ্গীত বুঝি শুন্‌লেন। দেখা গেল, Music At Night হাক্স্‌লির Do What You Will-এর পরের বই না হ'য়ে On the Margin বা The Jesting Pilate-এর উত্তরাধিকারী। ব্রিলিয়ান্ট্, ক্লেভার। আর যা শোনা গেল, সে What The Thunder Said নয়, সে সমুদ্রতীরে কবিত্বময় সন্ধ্যায় Beethoven-এর রেকর্ড্ বাজানো সঙ্গীত। অবশ্য সে সঙ্গীত 'can tell us with any precision what Beethoven's conception of the blessedness at the heart of things actually was।' দুঃখের বিষয় এ কন্‌সেপ্‌শন্ হাক্স্‌লির কানেই আছে, রচনায় তার অস্তিত্ব নেই।

বইটীতে ছোটবড়ো অনেক প্রবন্ধ আছে। কয়েকটী আছে সাহিত্য-ব্যাপার নিয়ে। অতি সারবান্ সত্য কথা। পড়লে অনেকেরই জ্ঞানলাভ হবে। ট্রাজেডিতে যে জীবনের আংশিক সত্য থাকে, হোমর্ যে ট্রাজেডিয়ান্ নয়; প্রুস্ত্, জিদ্, কাফ্‌কা, লরেন্স্ যে জীবনের সমগ্র রূপকে ধর্‌তে চেয়েছেন, প্রথম প্রবন্ধে হাক্স্‌লি এ কথা খুব চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন। Tragedy and the Whole Truth ছাড়া, The Rest is Silence, Art and the Obvious, Ethics in Andulasia, Obstacle Race, The New Romanticism, and

Wanton Optics Roll the Melting Eye ইত্যাদি প্রবন্ধও সাহিত্য-সম্বন্ধে। শিল্প সম্বন্ধেও হাক্‌স্‌লি লিখেছেন। এল্ গ্রেকোর উপর লেখাটী পড়লে সত্যই এ অদ্ভুত অসাধারণ শিল্পী সম্বন্ধে অজ্ঞেরও একটা ধারণা (যদিচ অসম্পূর্ণ ধারণা) হয় এবং হাক্‌স্‌লি যাকে ধর্ম্মের বিকার মনে ক'রে নানা জায়গায় নানা ভাবে ঠাট্টা করেছেন, সে সম্বন্ধে হাক্‌স্‌লির মত আরেকবার বেশ ভালো ভাবে জানা যায় কিন্তু এল্ গ্রেকো যে ধর্ম্মমোহে অসুস্থ সে কথা বল্লেই কি সব বলা হয়? তা সে যতই সুন্দর ক'রে খাসা ইংরেজিতে বলা হোক্ না। আর খৃষ্টান সাধুদের দুর্ব্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গই কি বিংশশতাব্দীর মুক্তিমার্গ? আর এল্ গ্রেকোর প্রধান বিশেষত্ব কি শুধুই 'religious experience in its raw physiological state'? হাক্‌স্‌লির মতো raw mental state, যাতে কখনো গড্, কখনো আফ্রোডিটি, কখনো ব্যাকাসের উদয় হয় (এ কন্‌ফেশ্রন্ হাক্‌স্‌লিই গম্ভীরভাবে করেছেন) সে অবস্থা কি কাল্পনিক নয়? এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা—যে তিনি মুক্তপুরুষ সুতরাং তিনি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের মতো ইংলণ্ডে ও কিছুকাল ধ'রে দক্ষিণ য়ুরোপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ফ্যাশানেব্‌ল্ সহরে বাস ক'রে মোটর হাঁকিয়ে বই প'ড়ে ভালো খেয়ে, ধারালো রসালো লেখা লিখে লিখে বিখ্যাত হবেন অথচ ফিলিষ্টাইন্ বল্‌বেন না (এ সবই হাক্‌স্‌লিই জানেন), সে ধারণাই যে ঠিক তা কে বল্‌বে? On Grace নামক প্রবন্ধে তিনি যে এক জায়গায় বলেছেন 'For normal men and women a consciousness of having behaved in a, humanly speaking, meritorious fashion is, in many cases, a necessary prerequisite to this salvation [অর্থাৎ 'a certain sentiment of personal integrity and fulfilment, a profoundly satisfying consciousness of being 'in order'. *(In sua volontade e nostra pace)'] But by no means in all cases. One can feel fulfilled and in order for no better reason than that the morning happens to be fine' ইত্যাদি এবং 'It is possible for us to be harmonized gratuitously—in orthodox language, to be saved by God's grace!' এবং এই করুণা যে কার উপরে পড়েছে—বুঝ্‌ছেন ত—বিনয় ব'লে একটা তথাকথিত গুণ। আর যদি তর্ক করেন, সন্দেহই করেন তার জবাবও আছে—'Those, on the contrary, who have talents are given success; but . . . . . they are not given salvation, or given it only grudgingly. It is almost as difficult for the spiritually rich to enter the Kingdom of Heaven as it is for the materially rich!' এ রকম specialist-এর লেখা পড়া সৌভাগ্য নিশ্চয়ই, বিশেষ যখন প্লেটনিস্‌ম্, খৃষ্ট, সেন্ট্ ফ্রান্‌সিস্, টেরেসা, এল্ গ্রেকো, দি হিন্দুস্ প্রভৃতির দুর্ব্বলতা এ কক্‌শ্যুর বিশেষজ্ঞের নেই।

কথা উঠ্‌তে পারে, তাহ'লে অল্‌ডুস্ হাক্‌স্‌লি সাহেবের সযত্নবিস্রস্ত-চুল মাথা নেড়ে এত অতৃপ্তি, এত নিরাশ্রয় চাঞ্চল্য, এত অশান্ত ব্যঙ্গহাস্য কেন? কথা উঠ্‌তে পারে বটে। কিন্তু এর উত্তর দেবার ধৃষ্টতা কার আছে? হয়ত মুক্তিলাভের পরের লীলা এই। কিম্বা হয়ত যুদ্ধের পরে সৌখীন ভদ্রসমাজের অশান্তি-ফ্যাশ্যনের

* Dante-র Paradiso-র Piccarda-র এ কথা Temple Classics-এ আছে—'la sua volontate e' nostra pace', Eliot-এর Dante-তে আছে 'la sua volontade e' nostra pace,' Arnold-এ আছে In sua volontade e' nostra pace.' অর্থ His will is our peace. ইটালিয়ান-অভিজ্ঞই কোন্‌টা ঠিক জানেন।

থাতিরেই এই স্মার্ট্ দীপ্তি। হয়ত হাক্স্লির পিতামহ টি, এচ, হাক্স্লির ধাবাই এই। কিম্বা বোধ হয় তাঁর মাতৃকুলের আত্মীয় পরলোকগত ম্যাথ্যু আর্নল্ড্কে চটাবার জন্যই বালকবয়সে এ অভ্যাস পরিশীলিত হয়। কিম্বা আত্মীয়া মিসেস্ হাম্ফ্রি ওয়ার্ড্কে।

তা সে যাই হোক্, হাক্স্লি লেখেন ভালো। এত ভালো লেখবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। পিতামহের মধ্যে যে বুদ্ধির প্রখরতা ও স্পষ্টতা ছিল, সে গুণ হাক্স্লি পেয়েছেন, পান্ নি (পান্ নি কি ?) পিতামহের গ্রাম্যতাদোষ— urbanity-র অভাব। যে ব্লুম্স্বেরি জগতের বিস্ময়, সেই হিমালয়েও হাক্স্লি একটি উচ্চ চূড়া। আর, সবাইকেই যে টি, এস্, এলিয়ট্, লরেন্স্, রাসেল্ হ'তে হবে তারও কোনো মানে নেই। তদুপরি Music At Night-এ হাক্স্লি—বিখ্যাত বড়োলোক—নিজের কথা মাঝে মাঝে মজার ক'রে বলেছেন। পঁচিশটী সুখপাঠ্য প্রবন্ধের কয়েকটী ভারি হাল্কা ও প্রীতিকর। দেশের এই দুর্দ্দিনে আর্থিক অভাবেও The Beauty Industry কেমন চল্‌ছে, মেয়েরা সাজগোজের জন্য কত পয়সা খরচ ক'রে যাচ্ছেন, সে ভাব্‌লে সত্যই নারী-প্রকৃতির প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পায়। ঐ নামে প্রবন্ধ ছাড়াও আরো হাল্কা লেখা বইটীতে আছে। ছোটছেলে, বৃদ্ধ ও মহিলারা ছাড়া আমাদের সবারই হাক্স্লি পড়া উচিত। অন্তত সময়োপযোগী হ'তে। হাক্স্লি নাকি য়ুরোপের ব্যারোমিটর অন্তত স্মার্ট্ মোরোয়া সাহেব ত তাই বলেন।

(২)

নাটকের যা প্রধান গুণ,—স্বচ্ছন্দ গতি, The World of Light-এ সে-গুণ পাওয়া যায়। The World of Light একেবারে স্বেচ্ছায় প'ড়ে ফেলা যায়। এ-গুণের মূল্য বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, স্বচ্ছন্দ গতি ছাড়া নাটকীয় অন্য সম্পদও হাক্স্লির আছে—দীর্ঘতার মাত্রাজ্ঞান। সরস বাক্যালাপেও তিনটী অঙ্কের পঠনীয়তা বৃদ্ধিই পেয়েছে। গল্পটী হচ্ছে কেম্ব্রিজের এক দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ প্লেটো-শিক্ষকের প্রেম। মেয়েটীর সঙ্গে হিউগোর আবাল্য জানা শোনা। মেয়েটী ভালোবাসে, বেশ জোরের সহিত, শিশুকে মা যেমন, অনেকটা তেম্নি। ছেলেটী বাসে না, কিন্তু তার মা-সৎমা ও মজার বয়স্ক বাপের মতে তারও ভালোবাসা বা নিদেন বিয়ে করা উচিত। বাগ্দান যেই হ'ল, সেই সময়েই হিউগোর বেপরোয়া স্ফূর্ত্তিবাজ অভিজাত বন্ধু (নাটকের একটীমাত্র সহনীয় ও প্রীতিকর মানুষ) হিউগোকে হুইস্কি খাইয়ে সেই দুপুর রাতেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিয়ে চল্‌ল। এয়্রোপ্লেনে তারা দক্ষিণ আমেরিকায় কোথায় ঘুরতে গিয়ে আর খবর দিলে না। বাড়ীতে স্থির হ'ল, তারা মরেছে—প্রেতবিশ্বাসী হিউগোর পিতা দস্তুরমতো মিডিয়ামের মারফৎ হিউগোর চিঠিপত্র পেতে লাগ্‌লেন। মিডিয়াম ছোকবাও ইনিডের প্রেমে প'ড়ে ঘনঘন খবর আন্‌তে লাগ্‌ল। বইও লেখা হ'য়ে গেল, হিউগোর বাপ কয়েক হাজার পাউণ্ড পেয়ে গেলেন। এ হেন প্রেত-রাজত্বে অকস্মাৎ seance-এর রসভঙ্গ ক'রে দরজা খুলে ঢুক্‌ল হিউগো ও আলো জেলে দিলে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হ'ল দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। তারপরে ভূমিকম্প। এবং সে বিচলনে স্থিতি আন্‌তে, বাপ ও প্রিয়ার দুঃখদূরীকরণার্থে হিউগোর পুনর্পলায়ন ও যবনিকা।

যাঁরা বিশ্বাস করেন সাহিত্যের বিচার শুধু লেখার ভালোমন্দে, মতামতে বা বিষয়বস্তুতে নয়, তাঁদের সেকেলে ও-ভুল ধারণা বজায় থাকুক্। কিন্তু এ-নাটক প্রেমের গল্প কি প্রেতের গল্প সে-একটা সমস্যা। বাস্তবিক ত আর ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব, আত্মার মৃত্যুহীনতা হাক্‌স্‌লি ঠাট্টা কর্‌লেই চুকে যায় না। এ প্রশ্ন অনেকের কাছেই গভীর ও আন্তরিক সমস্যা। এবং হিউগোকে ঠাট্টা কর্‌তে গিয়ে সাইকিক্যাল্ রিসার্চ্‌কে ঠাট্টা ক'রে—মানছি, বেশ সরসভাবেই ঠাট্টা ক'রে—অল্‌ডুস্ হাক্‌স্‌লি শুধু বাহাদুরীই করলেন। তবে তার জন্য ত আমরা কোয়ার্ডই পড়ি। হাক্‌স্‌লির বুদ্ধির খ্যাতি এ-নাটকে বাড়্‌ল না। তাছাড়া হাক্‌স্‌লির সব গল্প উপন্যাসের মতোই এ নাটকের মানুষেরাও কি রকম অসম্পূর্ণ, কি রকম যেন অভিনেতা-ভাবাপন্ন, যেন হাক্‌স্‌লির ব্যঙ্গ—মারিওনেটের পুতুলমাত্র। তাদের আলাপ সরস, তাদের ব্যবহার স্বচ্ছন্দ, তারা যে তরুণ কবির কল্পনা নয়, তাও বোঝা যায়। ডিকেন্‌স্ আমি পছন্দ করি নে। কিন্তু এ বিষয়ে ডিকেন্‌স্ হাক্‌স্‌লির চেয়ে বহু শ্রেষ্ঠ। কিম্বা আমাদের শরৎবাবু। এই মনুষ্যত্বের অভাবে—নৈতিক নয়, শিল্পগত,—হাক্‌স্‌লির আর্ট সর্ব্বদাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে আট্‌কে থাকে। আর একটী অভাবও আছে হাক্‌স্‌লির—তাঁর বারো বছর আগের কবিতার ভাষায় সে হচ্ছে—

'What could he find
Beyond the dim and stifling now and here
Beneath the unsettled turmoil of his mind?
Oh there were nameless depths: he shrank from fear.'

বহুকাল আগে উৎকৃষ্ট সমালোচক হাক্‌স্‌লি ষ্ট্রেচির সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'One cannot imagine Mr. Strachey coping with Dostoevsky or with any of the other great explorers of the soul. One cannot imagine him writing a life of Beethoven।' সমালোচক হিসাবে, পাঠক হিসাবে হাক্‌স্‌লির সম্বন্ধে এ-কথা তেমন না খাট্‌লেও স্রষ্টা হিসাবে বোধ হয় খাটে। হাক্‌স্‌লি পল্লবগ্রাহী, খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক, কিন্তু সীমাবদ্ধ।

(৩)

Discontent-এর ফ্যাশন্ হাক্‌স্‌লিকে চঞ্চল ও অতৃপ্ত করেছে, কি তিনি সত্যই অন্বেষী বৈরাগী, সে সন্দেহ আমার বরাবর হয়েছে। মনে হয়েছে, হাক্‌স্‌লি লেখেন চমৎকার ও তাঁর বই পড়্‌তে ভালো লাগে কিন্তু ভিতরে কি তিনি ঘৃতচিক্কণ পুষ্ট তৃপ্ত মানুষই নন্? এই বিদ্রোহবেশ কি অল্পবয়সে খ্যাতিলিপ্সুরই মানায় না? অথচ এ কথাও সত্য যে, হাক্‌স্‌লির মধ্যে সেকালের মরালিষ্টের উল্টানো মূর্ত্তি আছে, সমাজসংস্কারের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক। কিন্তু এও ত স্পষ্ট যে, লরেন্স্, এলিয়েট্, এমন কি মিড্‌ল্‌টন্ মারির অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসার কাছে হাক্‌স্‌লির ডিস্‌কন্‌টেন্ট্ স্থূল ও চেষ্টাকৃত।

সে যাক্, The Cicadas নামক কবিতাপুস্তকে হাক্‌স্‌লির বিদ্রোহ কাব্যে ও কবিয়ানায় চাপা পড়েছে। মোটা অথচ মসৃণ কাগজ ব'লেই হোক্, কি কাব্যগত কারণেই হোক্, এ সব কবিতা দ্রুত মনে ঢোকে না, ঢোকে গড়িয়ে গড়িয়ে, বা ঢোকেই না হয়ত। ভাষার উপর এরকম দখল, ছন্দ মিলের নিপুণতা,

কল্পনার মুক্তি, উপমার প্রাচুর্য্য প্রভৃতি বিস্ময়কর। হাক্স্‌লির মতো শক্তি খুব কম কবিরই আছে, বাংলাদেশে বিশেষ মধুসূদন বা সত্যেন্দ্র দত্তের চেয়ে হাক্স্‌লি হীন নন্। এরকম শ্রুতিসুখকর মসৃণতা কবিতায় আন্‌তে কী শক্তি দরকার সে কবিযশপ্রার্থীরাই জানেন। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন, হাক্স্‌লি জন্ কীট্‌স্ নন, ইয়েট্‌স্‌ও নন। আর শ্রুতিসুখকরতা—তাতেও সুইন্‌বর্ণ্‌ হাক্স্‌লির চেয়ে ভালো। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, হাক্স্‌লির কি বিশেষত্ব যার জন্য আমরা তাঁর কবিতা পড়ব? এখন ত আর হাক্স্‌লি নবীন নব্য কবি নেই, এখন তিনি Frascati's রেস্তোরাঁর উপরে বা তাঁর পূর্ব্বপুরুষের spermatozoon—তাঁর জন্মকারণ নিয়ে ত আর কবিতা লেখেন না। এখন অলডুস্ হাক্স্‌লি ইংরেজী কবিতার ধারায় কবি। আর বিশেষত্ব তাঁর আছে, তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দমিলের ব্যবহারে নিজস্বতা আছে, সৌন্দর্য্য আছে। এবং পাঠে তাঁর কবিতা খারাপ লাগে না। অবশ্য তাঁর কবিতা দুবার পড়লেও মনে থাকে না, পিছলে প'ড়ে যায়। সেটা ত্রুটি। তাঁর মুদ্রাদোষও আছে—একটা কথা বারবার ব্যবহার। উদাহরণ দেওয়া গেল, হাক্স্‌লির নয়, বাংলার—

বোলো, বোলো, সেই কথা বোলো তারে বোলো
কেশগুচ্ছ কানে বোলো তার।

তারপরে, হাক্স্‌লির কবিতার বিশেষণ-দৌর্ব্বল্য। চমৎকার ও অজস্র নতুন ভালো বিশেষণ ব্যবহার করা যার তার ক্ষমতা নয়। কিন্তু সম্ভবত আমার অক্ষমতাবশতই (হয়ত অন্য সময়ে আবার The Cicadas খুব ভালো লাগ্‌বে) মনে পড়ল এজ্‌রা পাউন্‌ডের উপদেশ—'Use no superfluous word, no adjective which does not reveal something. Don't use such an expression as 'Dim lands of peace.' It dulls the image. ইত্যাদি।

নিজস্ব প্রোসোডি The Cicadas-এ সব কবিতাতেই হাক্স্‌লি রেখেছেন। প্রথম কবিতা এক Theatre of Varieties-এর পদ্যবর্ণনা। কয়েকটী নিপুণ সনেট্‌ও আছে। আনন্দে প'ড়ে যাওয়া যায়, প্রথমে অর্থের কথা মনে ওঠে না। তারপরে দেখা যায় অর্থ স্পষ্ট তবে মসৃণতায় ধরা কঠিন। এ কঠিনতা ব্রাঊনিঙের কঠিনতা বা ডনের কঠিনতা নয়। একটী কবিতা কিন্তু মনে থাকে, উষ্ণ উজ্জ্বল গন্ধে ভারী সে কবিতাটী। দুটী সুন্দরীর অসুস্থ প্রেমের কবিতা এটী—Femmes Damnees, শার্ল্ বোদলেয়রের ফরাসী হইতে। ক্রীড়াক্লান্ত এলায়িত হিপোলিটাকে যেখানে ডেল্‌ফিন্ সম্বোধন করছে, সেই অংশ একটু উদ্ধৃত ক'রে নিয়মরক্ষা করা যাক্—

'Calm at her (হিপোলিটার) feet and joyful, Delphine lay.
And gazed at her with ardent eyes and bright,
Like some strong beast that, having mauled its prey,
Draws back to mark the imprint of its bite.

Strong and yet bowed, superbly on her knees,
She snuffed her triumph, on that frailer grace
Poring voluptuously, as though to seize
The signs of thanks upon the other's face.

Gazing, she sought in her pale victim's eye
The speechless canticle that pleasure sings,
The infinite gratitude that, like a sigh,
Mounts slowly from the spirit's deepest springs.

'Now, now you understand (for love like ours
Is proof enough) that 'twere a sin to throw
The sacred holocaust of your first flowers
To those whose breath might parch them as they blow.

'Light falls my kiss, as the ephemeral wing
That scarcely stirs the shining of a lake.
What ruinous pain your lover's kiss would bring!
A plough that leaves a furrow in its wake.

'Over you, like a herd of ponderous kine,
Man's love will pass and his carresses fall
Like trampling hooves. Then turn your face to mine;
Turn, oh my heart, my half of me, my all!

'Turn, turn, that I may see their starry lights,
Your eyes of azure, turn. For one dear glance
I will reveal love's most obscure delights,
And you shall drowse in pleasure's endless trance'.

শেষ কথা। আজকালের লেখকদের মধ্যে হাক্স্লির মতো প্রতিভা, সর্ব্বগামী বুদ্ধি, লিপিদক্ষতা, বহুমুখিত্ব ও বিদ্যা আর কারো নেই। তাঁর সব বই-ই পঠনীয় ও পাঠ্য। বিশেষ ক'রে আমাদের। কারণ হাক্স্লির কমন্‌সেন্‌স্ ও তাঁর গদ্যের বৈদর্ভী রীতির উৎকর্ষ আমাদের মধ্যে দুর্ল্লভ। সামান্য নন্ বলেই হাক্স্লির সম্বন্ধে অনুযোগ ওঠে।

শ্রীবিষ্ণু দে

Portraits in Miniature—LYTTON STRACHEY,
(Chatto and Windus).

প্রথম যেদিন লিটন্ ষ্ট্রেচির "বুক্‌স্ এণ্ড্ ক্যারেক্টর্‌স্" পড়ি, সেদিন আমার মনোভাব কীট্‌স্-বর্ণিত কর্টেজের অনুকরণ করেছিলো। মনে হয়েছিলো মানুষ ও সাহিত্য-সম্বন্ধে এই অন্তর্দৃষ্টির জন্যেই আমাদের যুগ নির্নিমেষ প্রতীক্ষা করছিলো। উল্লসিত কল্পনাকে ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়ে দিয়ে ভেবেছিলুম, ভাবীকাল যখন বিংশ-শতাব্দীর কাছে তার বৈনাশিকতার জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করবে, তখন কেবল এই লোকটিকে আমাদের প্রতিনিধি ক'রে, আমরা বল্‌তে পারবো যে, সৃষ্টির চেয়ে প্রলয়েই আমরা দক্ষতা দেখিয়েছি, এ-কথা মিথ্যা; জীবচ্ছেদে আমাদের প্রসিদ্ধি হয়তো অন্য যুগের ঈর্ষার কারণ না-হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের শবচ্ছেদের প্রবৃত্তিই যে জীবন-

সম্বন্ধে অভিনব অভিজ্ঞতার সন্ধান এনেছে, তাও অতিশয় নিঃসন্দেহ। আর শুধু তাই নয়, আমাদের মধ্যে অন্তত এমন একজন আছেন, যিনি কেবল মড়ার উপরে খাঁড়া চালিয়েই ক্ষান্ত হননি, মর্ম্মন্বেষী অস্ত্রের কৌশলে অনায়াসেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, খুঁজ্তে জানলে যাদুঘরের মামির মধ্যেও প্রাণের অমর আকৃতি আবিষ্কার করা সম্ভব।

সেই সোৎসাহ ভক্তি হয়তো আর কারুর সম্বন্ধে কখনো অনুভব করবো না; কিন্তু সেদিনের পুলকিত বিস্ময়ের সমস্ত দায়িত্ব শুধু তারুণ্যের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াও দুঃসাধ্য। শেক্স্‌পীয়রের বিষয়ে অনেক মতামতই আজীবন প'ড়ে এবং শুনে আস্‌ছি, কিন্তু তাঁর শেষ পর্য্যায়ের নাটকসংক্রান্ত ষ্ট্রেচির প্রবন্ধটি আজও আমার কাছে অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত। সম্প্রতি বেডোস্-সম্বন্ধে বেশ একটু কানা-কানি চলেছে; কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, তার বিষয়ে তিনি শুধু নতুন কথা বলেননি, ওই অপরিচিত মহাকবির প্রসঙ্গে ষ্ট্রেচির অনুমান অপূর্ব্ব, শাশ্বত এবং সত্য। "বুক্স্ এণ্ড্ ক্যারেক্টর্‌সে"র ব্যাপক উৎকর্ষে এ-দুটি উদাহরণের কোনো বিশেষ পদবী নেই।

তার পরে "কুইন্ ভিক্টোরিয়া", "এমিনেণ্ট্ ভিক্টোরিয়ন্স্", "পোপ্" ইত্যাদি পুস্তক ও প্রবন্ধের প্রবর্ত্তনে আমার শ্রদ্ধা যখন প্রায় অসীমের উপকূলে এসে পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ "এলিসাবেথ্ এণ্ড্ এসেক্স্" নামক বইখানির আবির্ভাব হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় কে যেন এক অলক্ষ্য গণ্ডি টেনে দিলে; বইখানার বিরুদ্ধে কোনো বাঙ্ময় অভিযোগ খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু একটা অহৈতুক অস্বস্তিতে মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্ল; সন্দেহ হলো, যে-অনুকম্পার প্রসার বিশ্বব্যাপী ব'লে ভেবেছিলুম, বস্তুত তা হয়তো প্রাদেশিক। ষ্ট্রেচির নির্দ্দেশে বাগ্‌জীবন গ্লাড্ষ্টনের প্রহেলিকার তলে তলে নিঃস্বত্ব শূন্যের দিগন্তবিস্তার দেখা আমার পক্ষে শক্ত হয়নি; কিন্তু এলিসাবেথ্, এসেক্স্, বেকন্, র‍্যলে, সকল চরিত্রই যে এই সীমাশূন্য শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত এতদূর স্বীকার করা আমার মতো শূন্যবাদীর ক্ষেত্রেও সহজ হলো না। তবু আমার আপত্তিকে বাণী দিতে সাহসে কুলায়নি; তখনো পর্য্যন্ত ষ্ট্রেচি-প্রশস্তিই ছিলো বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠ পরোয়ানা।

সম্প্রতি ওই শৃগালী ঐক্যতানে একটা স্বরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করছি। আজকালকার বুদ্ধিঝলমল অতি-আধুনিকের দল বল্‌তে সুরু করেছেন যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে লিটন্ ষ্ট্রেচি নগণ্য তো বটেই, এমন কি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে দু ছত্র লিখ্‌তেও তিনি অপারগ। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণশুদ্ধি-সম্বন্ধে আমার মুখ স্বভাবতই বন্ধ, কাজেই এ-ক্ষেত্রে অযৌক্তিক উপজ্ঞার আশ্রয় নিয়ে এই ক্ষণজন্মা মহারসিকদের উদ্দেশে আমি মাত্র এইটুকু বল্‌তে অধিকারী যে, এতাদৃশ ব্যাকরণদুষ্ট উপাদানে তাঁরা যতদিন পর্য্যন্ত "কুইন্ ভিক্টোরিয়া"র মতো একখানা দ্বিতীয় পুস্তক সৃষ্টি না-করছেন, ততদিন তাঁদের গুরুনিপাতনী বিদ্যা শুধু অশোভন নয়, উপহাস্য।

কিন্তু এটা গেলো পক্ষপাতের কথা। ষ্ট্রেচি-সম্বন্ধে অতি-আধুনিক সমালোচনা অতিকথনে ভরা হ'লেও, তাঁর শেষ বই "পোর্ট্রেট্স্ ইন্ মিনিয়েচর্" পড়ার পরে, তরুণদের তরফে কোনো বক্তব্যই নেই, এমন সিদ্ধান্ত অমূলক হবে। আসলে যেটা ষ্ট্রেচির প্রধান গুণ, সেটাই কালেভদ্রে দোষ হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁর সিদ্ধি, এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ফলতা, এ-দুয়ের মূলেই আছে তাঁর অত্যুগ্র মাত্রাজ্ঞান। আমার জনৈক

সাহিত্য-বিলাসী বন্ধু, যাঁর রুচি ও স্বকীয়তা নিয়তই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তিনি "এলিসাবেথ্ এণ্ড্ এসেক্স্"-সম্বন্ধে আমার অভিযোগ শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিলেন যে, বিশেষ ক'রে ওই বইখানিই তাঁকে গ্রীক্ নাটকের মতো মুগ্ধ করেছে। কথাগুলো গোড়ায় বেশ একটু আষাঢ়ে ঠেক্‌লেও, যতই ভাব্‌ছি ততই এ-মন্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌ছে। গ্রীক্ মনীষার সামঞ্জস্যই যদি ওই জাতির অদ্বিতীয় মহত্ত্বের পাদপীঠ হয়, তবে লিটন্ ষ্ট্রেচি নিশ্চয়ই সেই অতুলনীয় মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী। গ্রীক্ ভাবুকদের মতো লিটন্ ষ্ট্রেচিও জানেন যে, মর্ত্ত্যসীমা বিস্মৃত হ'লে মহামানবেরও পতন অনিবার্য্য। গ্রীক্ নাট্যকারের সঙ্গে লিটন্ ষ্ট্রেচিও ঘোষণা করেন যে, মৃত্যুর নির্ব্বিঘ্ন অঙ্কে নিরাপদে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের সুখের গর্ব্ব, সৌভাগ্যের আত্মপ্রসাদ, সাফল্যের অহমিকা, সে-সমস্তই নিঃসার, সে সমস্তই অলীক। কিন্তু মনুষ্যত্বের সীমাবধারণের সঙ্গে সঙ্গে যে-দুর্লভ দিব্যদৃষ্টির আশীর্ব্বাদে গ্রীক্ কবি ঈডিপাসের নিষ্ঠুরতম নিষ্ফলতার মুহূর্ত্তেও তার অন্তস্থ দৈবত্বটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই মরমী সিদ্ধি ষ্ট্রেচির আয়ত্তাতীত। সেই জন্যেই ইংরেজী ইতিহাসের একমাত্র নাটকীয় পটভূমিকায় প্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এলিসাবেথ্, এসেক্স্ ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গগুলি যন্ত্রচালিত পাত্রপাত্রী হ'য়েই র'য়ে গেছেন, জীবন্ত নরনারী হ'তে পারেননি, অভিনয় শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু ট্রাজিডির মৌল সত্তা থেকে গেছে অন্তর্ভৌম।

কিন্তু এই সুমিতি এলিসাবেথের উন্মাত্র যুগে সর্ব্বতোভাবে সার্থক না-হলেও, ভিক্‌টোরীয় শতকের উপদেবতাদের সম্বন্ধে তার অমোঘ উপযোগিতা সর্ব্ববাদীসম্মত। উপরন্তু এই সজাগ মাত্রাজ্ঞানের কল্যাণেই ষ্ট্রেচির ভাষা অনুপম। এ-ভাষার অনন্যসাধারণ ওজঃ, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য, সে-সমস্ত গুণই শুধু সংযত সুবিন্যাস আর আয়াসসিদ্ধ তুলাসাম্যের ফল। ষ্ট্রেচি জানেন যে, ভাষা যখন মহান উপাধির দাবি করে, তখন তার মধ্যে আর অতিমার্জ্জিত ঔজ্জ্বল্যের চিহ্ন থাকে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের দৃষ্টান্ত থেকে তিনি শিখেছেন যে, প্রাণবন্ত ভাষায় উদ্ভটতার স্থান নেই। ষ্ট্রেচি দেখেছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভাষাকে স্ফীত ক'রেই নিঃশেষিত হয়, কিন্তু তাকে পরিপুষ্ট করে ব্যক্তিস্বরূপ। তাই ষ্ট্রেচির শ্রেষ্ঠতম রচনাকেও বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যায় যে, তার প্রত্যেক ভগ্নাংশই বৈশিষ্ট্যহীন, শব্দগুলি এতই অভিমানবর্জ্জিত যে, নিকৃষ্টতম সংবাদপত্রের নিরুদ্দেশেও তারা অক্লেশে আত্মগোপন ক'রে থাক্‌তে পারে। সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির সংস্পর্শেই এই অসার ধ্বনিপিণ্ড সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনাব্যঞ্জনার বিশ্বস্ত বাহনরূপে দেখা দেয়।

আজকের স্বার্থঘন ব্যক্তিবাদের দিনে ষ্ট্রেচির এই ধ্রুপদী আদর্শ উপেক্ষিত হ'তে বাধ্য। যে-বিশুদ্ধতার চালনায় তরুণেরা তাঁর ভাষাকে ব্যাকরণদুষ্ট মনে ক'রে থাকেন, তারি প্ররোচনায় তাঁরা বল্‌তে সুরু করেছেন যে, আসল মহত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো উদারতা ষ্ট্রেচির নেই। শুধু পুরানো পুস্তকগুলো নয়, সদ্যস্তন "পোর্টরেট্স্ ইন্ মিনিয়েচার"-ও এই অদ্ভুত মতবাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে। তবে এটা হয়তো সত্য যে, মহত্ত্বের সকল অভিব্যক্তি তাঁর কাছে সমান আদর পায় না। ষ্ট্রেচি বিশ্বাস করেন যে, সুবুদ্ধি, সুরুচি, সহনশীলতা ও একাগ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এই কটি সম্ভ্রান্ত লক্ষণই মানুষকে সভ্য ও সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলো। সেইজন্যে যে-যুগ বা ব্যক্তি এই গুণাবলীকে একান্ত আপন ক'রে নিয়েছিলো, ষ্ট্রেচির শ্রদ্ধাসমবেদনায় তারাই সর্ব্বপ্রথমে অধিকারী।

কিন্তু ভল্‌টেয়র্‌ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দী ষ্ট্রেচিকে বিস্ময়মুখর ক'রে তুল্‌লেও, তাঁর মাত্রাজ্ঞানে হস্তক্ষেপ কর্‌তে অক্ষম। হোমারের নির্দ্দেশে ষ্ট্রেচি দেখেছেন যে, স্বয়ং আকিলিস্‌ও একেবারে অভেদ্য ছিলেন না। এর পরে ক্ষেত্রবিশেষে ভল্‌টেয়রের অক্ষমতা, অপূর্ণতা স্বীকার করা তাঁর পক্ষে আর শক্ত হয় না। একে ছিদ্রান্বেষণ বল্‌লে অভিধানের অবমাননা করা হবে। চাঁদের কলঙ্ক মেনে নেওয়া এবং চন্দ্রকে দেখে কুকুরের মতো তারস্বরে চিৎকার করা যেমন এক নয়, মানুষকে সান্ত ভাবা এবং মহত্ত্বকে খর্ব্ব করাও তেমনি বিভিন্ন। অনেকের বিবেচনায় সম্পূর্ণতা মৃত্যুর নামান্তর। লিট্‌ন ষ্টেচিও সম্ভবত এই মতে আস্থাবান। রোঁদার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ষ্ট্রেচি মনে করেন যে, ঐতিহাসিক প্রস্তরমূর্ত্তিগুলোকে জীবন্ত ক'রে তুল্‌তে হ'লে ভাস্কর্য্য থেকে কর্কশতা ছেঁটে ফেলা শুধু দুষ্কর নয়, একেবারেই অসাধ্য। চার্ব্বাক যৌনবোধকে জীবনের একমাত্র সত্য ব'লে নির্ণয় করেছিলেন। অতটা বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী না-হ'য়েও ষ্ট্রেচি বিশ্বাস করেন যে, ওই প্রবৃত্তিটির মতো আরো কতিপয় তথাকথিত পাশবিকতার স্মৃতি চিত্তপট থেকে মুছে ফেল্‌লে, খেলাঘরের পুতুল অনায়াসেই গড়া যায়, কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু ষ্ট্রেচির সম্বন্ধে হাল আমলের মুখ্য অনুযোগটা অসঙ্গত ব'লে সেই অনুযোগের কতকগুলো শাখাপ্রশাখার ঔচিত্য অস্বীকার করা বৃথা। এক "বুক্‌স্‌ এণ্ড্‌ ক্যারেক্‌টর্‌স্‌" ও "এলিসাবেথ্‌ এণ্ড্‌ এসেক্‌স্‌" ছাড়া ষ্ট্রেচির আদানপ্রদান বিরাট্‌কে নিয়ে নয়, তাঁর ব্যবসা ক্ষুদ্রের আণবিক মহত্ত্বের পক্ষে ওকালতি করা। ষ্ট্রেচি একটি প্রবন্ধে কাব্যবিবেচকের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেছেন। তার থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে মহত্ত্ববিচার সমালোচনার কার্য্য নয়, সমালোচকের ব্রত হচ্ছে মহত্ত্ব আবিষ্কার। আমার বুদ্ধিতে এই অভিমতটি ভয়াবহ ব'লে ঠেকে। ক্ষুদ্রের মধ্যেও মহত্ত্বের বিদ্যুৎবিলাস মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু তাই ব'লে ক্ষুদ্রকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো বিপুল অবকাশ জগতের অধীনে নেই। ষ্ট্রেচির মতো ধীমান যে এই সাধারণ সত্যটাকে ধর্‌তে পারেননি, তা বিশ্বাস করা শক্ত। তাই আমার মনে হয়, এই প্রচ্ছন্ন মহত্ত্বের অবগুণ্ঠন মোচন, সে একটা উপলক্ষ্য মাত্র; ষ্ট্রেচির আসল অভিপ্রায় হচ্ছে শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে ভীষ্মকে নিপাত করা। অবশ্য সে-ভীষ্ম যদি ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়, তবে পদ্ধতিটা নিশ্চয়ই প্রশস্ত; শঠের সম্বন্ধে শাঠ্য স্মার্ত্তপণ্ডিতদের বিধানেও বাধে না। এই দিক্‌ থেকে দেখ্‌লে মেরি বেরির মারফতে হরাস্‌ ওয়াল্‌পোলের দর্পচূর্ণ করা শুধু শোভন নয়, সার্থক। কিন্তু যখন প্রেসিদাঁ দ ব্রোসেস্‌ স্বয়ং ভল্‌টেয়ারের উপরে টেক্কা দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ তাঁর আজন্ম বাঞ্ছিত পরিষদ অমরায় বঞ্চিত হয়েও, ষ্ট্রেচির মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার জোরে নিত্যের আসনে উঠে বসেন, তখন ভয় হয় বাস্‌কুটের মোহ বুঝি ষ্ট্রেচিকেও উন্মাত্রিক ক'রে তুল্‌লে।

এর জবাবে ষ্ট্রেচি অবশ্য বল্‌তে পারেন যে, ও-ধরণের লেখায় প্যারাডক্‌স্‌-প্রীতির নামগন্ধও নেই, আছে কেবল সত্যনিষ্ঠা। সত্যের স্বরূপ যে অনেক সময়েই স্ববিরোধী, তা আমরা জানি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের অজানা নেই যে, রবিবাসরিক পাঠশালা পরিচালনের ভার ষ্ট্রেচির উপরে না পড়াই ভালো। ষ্ট্রেচি ঐতিহাসিক ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন করেননি, তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন রূপকার হিসেবে। এবং এইখানেই তিনি অনুকরণীয়, এই জন্যেই তিনি ঈর্ষাভাজন। ইতিহাস

লেখা কঠিন হ'লেও তার জন্যে বোধ হয় কোনো জন্মগত প্রতিভার আবশ্যক করে না। ফ্রুড্, ক্রাইটন্, গিজো,—যাঁদের স্থাণু মাধ্যমিকতার প্রতি অভিজাত ষ্ট্রেচির অবজ্ঞা ও আক্রোশের অন্ত নেই, এমন কি তাঁরাও সত্যানুরাগে ষ্ট্রেচিকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছেন। ষ্ট্রেচি মিথ্যাবাদী এমন কথা ঘুণাক্ষরেও বল্‌তে চাইনা। কিন্তু যে জন্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নমস্য, সে হচ্ছে তাঁর সত্যকে, অন্তত ঐতিহাসিক সত্যকে, অতিক্রম করার ক্ষমতা। এই উপায়েই তিনি জীবনচরিতকে নীরস ঘটনা-তালিকার মরুভূমি থেকে উদ্ধার ক'রে অনির্ব্বচনীয় শিল্পলোকে অধিষ্ঠিত করেছেন। মানুষ নিয়ে যাদের কারবার তাদের মধ্যে লিটন্ ষ্ট্রেচিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন যে, চরিত্রচিত্রণে সত্যকে এড়িয়ে গেলেও হয়তো চলে কিন্তু সত্তাকে বাদ দিলেই মৃত্যু। ফলে যেখানে কোনো সামান্য সত্য একটা বিশাল সত্তার পূর্ণপ্রকাশের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, সেখানে তিনি সমগ্রতার খাতিরে ওই তুচ্ছ সত্যকে নির্ব্বাসনে পাঠাতে দ্বিধা করেন না। সত্যকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ প্রত্যাখ্যানের অধিকার আর্টিষ্টমাত্রেরই আছে; এবং ষ্ট্রেচি যতক্ষণ মনুষ্যজীবনকে ঐতিহাসিকের সমীপদর্শী চক্ষে না-দেখে রূপদক্ষের অবিকল দৃষ্টিতে দেখ্‌তে থাকবেন, ততক্ষণ সকল রসিকই তাঁর সত্যবিসর্জ্জনের সমর্থন করবে।

কিন্তু মর্য্যাদায় কেবল অখণ্ডতাই সত্যের অগ্রগণ্য। তাই যখন দেখি সত্যেরও মানরক্ষা হলোনা, অথচ অখণ্ডতাও অগোচরে র'য়ে গেলো, তখন তরুণদের দুরুক্তি-গুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে অবজ্ঞা করতে অক্ষম হই। 'এমিনেন্ট্ ভিক্টোরিয়ান্‌সে' নিউম্যানের অশ্রুমোচন ক্ষমা করা কঠিন নয়। সেখানে ঘটনাটার পরিণতি সুস্পষ্ট, আমাদের দরদও নিউম্যানেরই প্রাপ্য। কাজেই প্রকাশ্যে হাসবার চেষ্টা করলেও, অন্তরে আমরা নিউম্যানের কান্নাতে যোগ দিই। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেসনে লুপ্ত ব্যাগের শোকে ক্রাইটনের চাঞ্চল্য? সত্য কিংবা সমগ্রতা, কোনো দিক্ থেকেই এ ব্যাপারটার মূল্য অদ্যাবধি ধার্য্য করতে পারিনি। কারলাইলের প্রসঙ্গে ষ্ট্রেচি বলেছেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের বস্তুমাত্রা সমুদায় কিন্তু তার পরতে পরতে ছিলো কুশ্রীতা ও মালিন্য। এতাদৃশ বস্তুর ছবি আঁকা নিশ্চয়ই সহজ নয়। উপরন্তু এই ধরণের বৈকল্পিক স্বর্গনরকের মূর্ত্তি গড়তে গেলেই ডষ্টয়েভ্‌স্‌কির পদাঙ্ক চল্‌তে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ষ্ট্রেচির অবশ্যই নেই। তবু এই সাধনায় "পোর্ট্রেট্‌স্ ইন্ মিনিয়েচারে"র বৈহাসিকতাই অনন্য পন্থা এমন সিদ্ধান্তও অসম্ভব। লিটন্ ষ্ট্রেচির প্রতিভা অলোকসামান্য, তাঁর অতীত অবদানও অনবতুল। সেইজন্যই "পোর্ট্রেট্‌স্ ইন্ মিনিয়েচারে"র পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতে পাঠকের স্মৃতিবিহ্বল দৃষ্টি সাহিত্যের অক্ষয় স্বর্গে এমিনেন্ট্ ভিক্টোরিয়ানদের অভিসারে নিয়তই ছুটে চলে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা ও তাঁহারা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্।

দুই বিরোধী দলের আলাপের আকারে লেখা ছ'টি প্রবন্ধের সমষ্টি এই বই। 'আমরা' হচ্ছেন আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত (এবং শিক্ষাভিমানী), আত্ম-সচেতন, ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল সম্প্রদায়—যাঁরা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করেন, যাঁরা জন-আলোড়নের

উন্মাদনার বহির্ভূত, শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার যাঁরা অনুরক্ত—এক কথায়, বর্ত্তমান সমাজের যাঁরা কুলীন। আর, 'তাঁহারা' হচ্ছেন সংস্কৃত অর্থে 'ইতর' ব্যক্তি, যাঁরা নিতান্তই সাধারণ, অথচ নির্ব্বোধ নন্; 'পাব্লিক' বল্‌তে যাঁদেরকে বোঝায়; আধুনিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁদের রক্ষণশীলতায় চিড় ধরেছে—অথচ সংস্কারের নিশ্চিন্ত অন্তঃপুর থেকে ঠিক বেরিয়ে আস্‌বার সাহসও যাঁদের নেই। এঁরা ধ্রুপদ-খেয়ালের চাইতে কীর্ত্তন পছন্দ করেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্‌বার আশায় জেল খাটেন, নিজেদের ব্যক্তিগত বিকাশের চাইতে সমষ্টির কল্যাণের জন্যই বেশি ভাবেন—এঁরা দলে ভারি। দেশের নানা বর্ত্তমান সমস্যা নিয়ে এই দুই দল ১৪২ পৃষ্ঠা ভ'রে তর্ক কর্‌ছেন। ধূর্জ্জটিবাবু 'আমরা'র প্রতিনিধি হিসেবে নিজকে স্থাপিত করেছেন; এবং সে-প্রতিনিধিত্বের কাজ তিনি খুবই যোগ্যরূপে সম্পাদন করেছেন। ঠিক এই সময়ে বাঙ্‌লাদেশের নব-অভিজাতদের সঙ্গে জন-সাধারণের বিরোধ ক্রমশই প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ছে ব'লে মনে হয়; কার্য্যস্থলে 'আমরা'র দল প্রায়ই বাধ্য হন্ হার মান্‌তে—ভেতরে-ভেতরে গুমোট জ'মে ওঠে। সেই গুমোটকে ধূর্জ্জটিবাবুর প্রকাশ্য ও অকপট আলোচনা তীব্র নাড়া দিয়েছে; 'আমরা'র দলের সমস্ত অভিযোগের (এবং অভিমানের) কারণ বেরিয়ে এসেছে স্পষ্ট হ'য়ে; অনেক কথা—যা আমরা অনেকেই অনেকবার মনে-মনে ভেবেছি—ধূর্জ্জটিবাবু সে-গুলোকে সাহস ক'রে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। আমার মনে হয়, যাঁরা এ-বই পড়্‌বেন, তাঁরা বেশির ভাগই 'আমরা'র দলের; ধূর্জ্জটিবাবুর নির্ভীক অকপটতায় তাঁরা মুগ্ধ হ'বেন।

এ-কথা বল্‌লে বোধ হয় ভুল হয় না যে, ধূর্জ্জটিবাবু এ-বইয়ে আগাগোড়া ব্যক্তিত্ব-বাদ প্রচার করেছেন। এবং, আজকালকার দিনে আমাদের দেশে ব্যক্তিত্ববাদ প্রচারিত হওয়া দরকার—খুবই দরকার। অতিরিক্ত যান্ত্রিকতায় ইউরোপের আত্মা আজ পীড়িত; ডেমক্রেসির বৈশ্যবৃত্তি সেখানে ধর্ম্মের স্থান নিতে বসেছে;—এবং এই নতুন ম্যামন-পূজার পুরোহিত হচ্ছে আমেরিকা, যেখানে Success হচ্ছে প্রত্যেক লোকের জপমন্ত্র—একজন আমেরিকানেরই ভাষায়, 'That bitch-goddess, success'। সমস্ত মানুষের জীবন এক ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে যাচ্ছে; অধ্যয়ন মানে খবরের কাগজ, আমোদ মানে টকি কি রেডিয়ো, অবসর মানে অটোমোবিল-ট্রিপ, দীর্ঘ অবকাশ মানে কোনো-একটা জাহাজ-কোম্পানির পরিচালিত কোনো ক্রুজ্। সবি Standardized। মানুষকে নিজের মাথা খেলিয়ে কিছু কর্‌তে দে'য়া হ'বে না—কাজ তো নয়ই, নিজের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও নয়। প্রত্যেক মানুষের যে বিভিন্ন এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব—তা'র বিকাশকে কিছুমাত্র সাহায্য করা দূরে থাক্, বরং আপ্রাণ বাধা দে'য়া হয়—সবাই একভাবে না চল্‌লে, বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না কর্‌লে খবরের কাগজ না চল্‌লে ব্যবসা ফেঁপে ওঠে না, কোটি ছেড়ে লক্ষকোটিপতি হওয়া যায় না। ফোর্ডের কারখানায় তাই দুঃসময়ের প্রতিকার-হিসেবে প্রত্যেক বিবাহিত কর্ম্মচারীকে বাড়ির আঙিনায় সাধ্য-মত তরকারী উৎপন্ন কর্‌তে হ'বে—হ'বেই। কেউ যদি আর্থিক অভাব গ্রাহ্য না করে, কেউ যদি বিশ্রাম ভালোবাসে, কেউ যদি ফুলের চাষ কর্‌তে চায়, তাহ'লে তা'দের চল্‌তে পারে, কিন্তু ফোর্ড-সাহেবের চলে না। মানুষের যা শ্রেষ্ঠ অংশ—তা'র মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইচ্ছা, সেটাকে দমন না কর্‌লে যান্ত্রিকতা টিঁক্‌তে পারে না। গড়পড়্‌তা সব মানুষ এক হওয়া দরকার। জীবনের

এই Standardization-এর বিরুদ্ধে ইউরোপ থেকে আজ তীব্র প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে ; এ-ভাবে যে জীবন বাঁচে না, মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে 'আমি' হওয়াই যে সব চেয়ে বড় সাধনা, ইউরোপের কেউ-কেউ অন্তত এ-কথা উপলব্ধি করেছেন।

আমাদের দেশেও এ-বিপদ এসেছে—তবে অন্য দিক্ থেকে। যান্ত্রিকতা আমাদের দেশে এখনো তেমন প্রসারলাভ করে নি ; অর্থাতিশয্যেও আমরা কিছু মারা পড়্ছি না ; কিন্তু তবু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য জন-মনোভাবের অন্ধকারে মিশে যাবার আশঙ্কা দিন-দিনই বাড়্ছে। এর কারণ আর-কিছুই নয়, পলিটিক্স্। পলিটিক্স্-এর কুয়াশায় সমস্ত দেশ আজ আচ্ছন্ন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে এমন-ভাবে জুড়ে বসেছে যে, আমরা সমস্ত বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি ; সমস্ত জিনিষ একই মানে মাপ্ছি ; অথচ, ঠিক কী উপায় অবলম্বন করলে দেশের স্বাধীনতা আস্তে পারে, সে-বিষয়ে অনেকের মনেই স্পষ্ট ধারণা নেই। দেশ জুড়ে চলেছে হুজুগ, যে-জিনিষটা নিতান্তই নিম্নস্তরের। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে নিন্দা করতে-করতে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, কারো মাথায় অকালে টাক পড়্লেও সে-দোষ আমরা গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাতে চাই। আমরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, কুসংস্কারের মধ্যে ব'সে থাক্‌বো ; পরে যখন বহু সন্তান হ'বার ফলে দারিদ্র্য আস্‌বে, অর্থাভাবে একটা ছেলেও যখন মানুষ হ'বে না—অথচ দারিদ্র্যেরই অনিবার্য্য ফল হিসেবে সন্তানের সংখ্যা বাড়্তেই থাক্‌বে, তখন মন খুলে গালি-গালাজ করবো গভর্ণমেণ্টকে। আমাদের মনে এই রকম একটা ধারণা হয়েছে যে, কোনো রকমে একবার ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই আমরা হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবো। এবং সে-জন্য করা দরকার পিকেটিং ; মদ-সিগ্রেট, সমস্ত বিলাসিতা বর্জ্জন ; দরকার চরকায় (বা তকলিতে) প্রত্যহ সুতো-কাটা, সব খেজুর-গাছ কেটে-ফেলা। গান্ধীর এই বৈশ্যমনোভাব-প্রসূত বৈরাগ্যধর্ম্ম কার্য্যত না হোক্, বচনত দেশের বেশির ভাগ লোক গ্রহণ করেছে ; এবং সবাইকে এর ভেতর টেনে আন্‌বার দারুণ চেষ্টা চল্ছে। এর সঙ্গে মিশেছে ইউরোপীয় সোশ্যালিজ্‌ম্-এর এক সস্তা অনুকৃতি—যা'র উগ্র স্পর্দ্ধা মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ অস্বীকার করতে উদ্যত। দেশে আর মানুষ থাক্‌বার দরকার নেই ; বিশাল সাধারণের সমষ্টি নিয়ে প্রকাণ্ড এক জাতি থাক্‌লেই হ'ল। গান্ধীর আদর্শও এক ধরণের Standardization—দেশের সব সমস্যা তিনি এক কথায় মীমাংসা ক'রে দেন্—চরকা। চরকা কাটো—সুতো বেচে যা হবে, তা'তেই তোমার দিন চল্‌বে। দিন না হয় চল্‌লো—কিন্তু বাকি সময় নিয়ে কী করবো ? এখানে তিনি নিরুত্তর। সাউথ্ আমেরিকাও স্বাধীন, অস্ট্রেলিয়াও স্বাধীন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া কী আছে তা'দের ?

অবিশ্যি এ-কথা ঠিক যে, আমাদের জীবনের অনেক দৈন্যের কারণই খোঁজ করতে গেলে রাষ্ট্রীয় অধীনতাতে আস্তে হয়। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সব বিষয়েই আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখে নি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মুক্ত ; সেখানে আমরা ইচ্ছে করলেই জীবনে খানিকটা সমৃদ্ধি অন্তত আন্‌তে পারি। কিন্তু আমাদের চেষ্টা নেই, উৎসাহ নেই—এবং যা সব চেয়ে বড়—ইচ্ছাই নেই। অত্যন্ত হীন এক পরিতৃপ্তিতে আমরা আচ্ছন্ন। আমাদের হিন্দু সমাজের দিকে একবার তাকালেই কত যে বর্ব্বরতা আর মূঢ়তা চোখে পড়ে, তার ইয়ত্তা নেই। সমবেত ভাবে না হোক্, নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবারের গণ্ডীর ভেতর সে-সব অপনোদনের চেষ্টা আমরা ক'জন

করি? আমাদের মেয়েদের জীবন রান্নাঘরে আর শোবার ঘরে (এবং প্রসূতি-ঘরে) আবদ্ধ; আমাদের ছেলেমেয়েরা ছেলেবেলা থেকে নিতান্ত বর্ব্বর প্রণালীতে ইস্কুলে কুশিক্ষা পেতে থাকে; আমাদের বেশির ভাগ হিন্দু-বিবাহ নিছক প্রজনন-কল্পে ইন্দ্রিয়-মিলন ছাড়া কিছু নয়—এ-সব বিষয়ে আমরা কী না করতে পারি? অথচ কী করছি? ক'জনই বা এ-সব বিষয়ে সচেতন? সবাই সমাজ-সংস্কারক হ'তে পারে না, কিন্তু স্বগৃহের বেষ্টনীর মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করা কারুরই সাধ্যাতীত নয়। আর—নিজের জীবনের ওপর নিজেরই পরিপূর্ণ অধিকার—নিজের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সাধনায় বাইরের কোনো শক্তি কখনো বাধা দিতে পারে না—সমাজ, সংসার, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট—কেউ নয়। বাইরের স্থাপিত শক্তির প্রতিকূলতায় চললে দুঃখ পেতে হ'তে পারে, কিন্তু সেই দুঃখেও এ-আনন্দ কখনো ভোলবার নয় যে আমি কখনো হার মানি নি, পরের কাছে নিজকে বেচে দিই নি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণরূপে আমি 'আমি' হ'তে পেরেছি। এই দুঃসাহস আমাদের দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। আসলে আমরা মৃত, সব মৃত। তা'র ওপর, পলিটিক্সের প্রখর দাবী মেটাতে গিয়ে ব্যক্তিত্বকে ঘোষণা করা হয়েছে অবান্তর, নিষ্প্রয়োজনীয়—শুধু তা-ই নয়, দেশের প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী। ধূর্জ্জটিবাবু ঠিকই বলেছেন, 'দেশে আর মানুষ নেই।' এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বছরে আটমাস বিদেশে থাকেন; সেইজন্যই বাঙ্লার অনেক কৃতী পুরুষ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

> গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আমার এই আপত্তি যে, সে কেবলই আমার ছোট আমিকে Pander করছে, আমার Personality-র পথে অন্তরায় হয়েছে, কিম্বা বাধা-সৃষ্টি করছে। সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় লোভ অর্থাৎ ভয়। সব ধারেই কেবল জুজুর ভয় দেখাচ্ছে মশাই, কেবল জুজুর ভয়! আমি অন্য সম্প্রদায়ের কথা জানি না—তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, শিক্ষিত অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি মানুষ দেখিনি যিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাহস ক'রে সত্যপথ অবলম্বন করেছেন। চাকরী ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেবার কথা বলছি না। আমরা প্রত্যেকেই, একজনকেও বাদ দিয়ে বলছি না, অত্যন্ত সাবধানী, ভীরু ও অপদার্থ।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ভীরুতার অপসারণ করতে গিয়ে দেশের বর্ত্তমান নেতারা আর এক ভীরুতার প্রবর্ত্তন করছেন—সে বোধ হয় আরো বেশি ক্ষতিকর। সে হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে ভয়; নিজের অন্তরের তাগিদ অনুসারে গড়ে' ওঠ্‌বার সাহসের অভাব, স্বধর্ম্মে নিহত হ'বার ভয়ে পদে-পদে পরধর্ম্মকে আশ্রয় করা। এই আত্ম-হত্যাকারী ভীরুতার প্রতিবাদ-স্বরূপ ধূর্জ্জটিবাবুর বইখানা অত্যন্ত মূল্যবান।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

Dawn—THEODORE DREISER (Constable).

থিয়ডোর্ ড্রাইসার্-এর সঙ্গে যাদের পরিচয় আমার মতো পরস্মৈপদী, এ-বইখানি পড়া তাদেব অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈনিক সংবাদদাতাদের কৃপায় ড্রাইসার্-এর যে-ছবি আমার মনে অঙ্কিত হয়েছিলো, তার পরে তাঁর সাথে বিশ্রম্ভালাপের কোনো আকাঙ্ক্ষাই আমি অনুভব করিনি। আমার বিশ্বাস ছিলো, মানুষটি অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির; লোক-পরম্পরায় শুনেছিলুম, তাঁর সহিষ্ণুতার সীমা এতই সঙ্কীর্ণ যে, তর্কযুদ্ধে অকাট্য যুক্তির

চেয়ে বাহুবলকেই তিনি বড় মনে ক'রে থাকেন ; জানিনা কি কারণে অনুমান করে-ছিলুম, আধুনিক আখ্যাটা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য না-হ'লেও, সাম্প্রতবিদ্ উপাধিটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে চমৎকার খাপ খায়। কিন্তু এই ছ'শ পাতার আত্মজীবনীতে যে-ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ মিল্‌লো, তাকে উন্মুখর কোনো মতেই বলা চলে না। স্বপ্রতিষ্ঠা প্রতিপন্ন করা লেখকের এতই অনভিপ্রেত যে, মাঝে মাঝে পাঠকের সন্দেহ হয় পুস্তকটি রচনার মৌল প্রেরণা বুঝি আত্মদীনতা। অন্ততপক্ষে তাঁর কল্পিত যৌনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত অন্য কি উদ্দেশ্যে এখানে প্রবর্ত্তিত হ'য়ে থাকৃতে পারে, তা আমি এখনো বুঝিনি। অভিজ্ঞতাগুলি মামুলি, এতই মামুলি যে, সংবাদ-হিসেবে কিম্বা চরিত্রচিত্রণের বর্ণরূপে সেগুলি একেবারেই মূল্যহীন। তবু মনে হয় সেগুলিকে বাদ দিলে বইখানির লাভের চেয়ে লোকসানই হয়তো বেশি হতো। কারণ সংযম ও শালীনতার দিক্ দিয়ে ঘটনা-গুলি পরিহার্য্য হ'লেও, গ্রন্থকর্ত্তার বিনয় ও নির্লেপের নিদর্শনস্বরূপ ওগুলি মহার্ঘ। যে-ব্যক্তি নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটির অনতিরঞ্জিত তালিকা দিতে সদাই প্রস্তুত, আত্মীয়-পরিজনের ক্ষয়-পরাজয়ের কাহিনী তার মুখে আর ছিদ্রান্বেষের মতো শোনায় না।

উপরন্তু এই অতীতের শবচ্ছেদে সত্যই কোনো নিষ্ঠুরতার চিহ্ন নেই, আছে কেবল অনুসন্ধিৎসা। ড্রাইসারের অনুসন্ধান সর্ব্বত্রই সার্থক, তা অবশ্য বল্‌তে পারবো না। তাঁর শক্তির মূলে আছে তাঁর সহৃদয়তা ; বিশুদ্ধ চিন্তায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন নি ; কাজেই যে-সমস্যাকে নিষ্কাম ভাবুকতার সাহায্যে বুঝ্‌তে হয়, সে-প্রসঙ্গে ড্রাইসার্ অলজ্জ ভাবালুতার শরণ নিয়েছেন। স্থানে অস্থানে নিরর্থ শব্দের রিক্ত নির্ঘোষ বইখানিকে কষ্টপাঠ্য ক'রে তুলেছে বটে, কিন্তু মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি স্থায়ী অবিচার হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। ব্যতিক্রম ঘটেছে কেবল গ্রন্থকারের পিতার সম্বন্ধে। এখানেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি ; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লেখকের প্রকৃতিগত বিরোধ থাকায়, অসীম প্রয়াস, অপার সমবেদনা সত্ত্বেও, বৃদ্ধ ড্রাইসারের পরমার্থনিষ্ঠার অন্তর্নিহিত মহত্ত্বটুকু তাঁর পুত্রকে বিচলিত করেনি। বৃদ্ধের মধ্যে যদিও ট্রাজিডির বীজ ছিলো, তবু তাঁর পুত্রের কাহিনীতে তিনি প্রহসনের সঙ হয়েই রয়ে গেছেন, শোকাবহ নাটকের নায়করূপে দেখা দিতে পারেন নি।

এতে আপত্তি করা নিশ্চয়ই অন্যায়, কেননা ড্রাইসার্-জীবনীর প্রধান গুণ হচ্ছে তার গদ্যময় দৈনন্দিনতা। এই মনোবিকলনের যুগে অনেকেই আত্মচরিত লিখে থাকেন, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে খাটো ক'রে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ও পরিমণ্ডলকে শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চাদপদ নন্ ; কিন্তু যত দূর মনে পড়ছে, তাতে থিয়ডোর্ ড্রাইসার্‌ই বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি বিচক্ষণ যোগবিয়োগের সাহায্যে জীবন-চরিতকে নাটকের, অন্ততপক্ষে উপন্যাসের, রূপ দেওয়ার প্রলোভন এড়িয়ে গেছেন। তাঁর পিতামাতা, বারোটি ভাইবোন, অসংখ্য প্রতিবেশী, অগণ্য সহপাঠী, অস্থাবর বাসস্থল, অস্থায়ী উপজীবিকা, সনাতন দারিদ্র্য, পরিবর্ত্তনশীল অন্নদাতা, বর্দ্ধিষ্ণু এমেরিকার সুখ, দুঃখ, বৈচিত্র্য, এই সমস্তের মধ্যে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সম্ভাবনা প্রায় অনন্ত ছিলো বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়ে একটি অকিঞ্চিৎকর জীবনকে অপ্রমত্তভাবে চালানোর পিছনে যে-সুমহান সত্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পরে পুস্তকখানিকে নিষ্প্রয়োজন বা নগণ্য ব'লে ভাবার কোনোই উপায় থাকে না।

লেখক কয়েকবার জানিয়েছেন যে, এই আত্মীয়-বান্ধবদের তিনি ইতিপূর্ব্বেই উপন্যাসের উপাদান-হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর পরে তাদের নিয়ে আবার উপন্যাস না-রচাই হয়তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া এটাও বোধ হয় সত্য যে, ঘটনাবিশেষের নাটকীয় সম্পদ দর্শকেরা যতটা দেখ্‌তে পায়, নটেরা তার- কিছুই লক্ষ্য করে না। কিন্তু এই বাস্তবপন্থী নাটকে ড্রাইসার্ কেবল অভিনেতা নন্, সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিও তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। উপরন্তু তাঁর মারফতে এই অঘটনসংঘটন যদি না-ও হ'য়ে থাকে, তাঁর আত্মসংযম যদি আমার কল্পনামাত্রই হয়, তবু 'ডন্' বইটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যে-জীবনের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটার কবল থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা এমনি অসামান্য ব্যাপার যে, শুধু এইটুকু কৃতিত্বের জন্যেই ড্রাইসার্ আমাদের পূজ্য। এই জীবন-সম্বন্ধে 'ভয়ঙ্কর' বিশেষণটি অপলাপের মতো শোনায় না। কাজেই সাহিত্য-হিসেবে তুচ্ছ হ'লেও, অন্তত ইতিহাস-হিসেবে বইখানি আদরণীয়।

ড্রাইসারের পিতা এককালে অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু থিয়ডোর্ জন্মাবার অনতিপূর্ব্বে কারখানার কড়ি মাথায় প'ড়ে কিছু দিনের জন্যে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। এই সুযোগে কোনো এক ফন্দিবাজ পরিবারটির সর্ব্বনাশসাধনে কৃতকার্য্য হয়। সময়ে গৃহস্বামীর স্বাস্থ্য ফিরে এলো, কিন্তু অপহৃত সম্পত্তি ও অস্তমিত সম্ভ্রমের আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। ফলে ঐহিক সমৃদ্ধিকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মতো অস্থির জেনে, গোষ্ঠীপতি সহধর্ম্মিণীর উপরে অন্নসংস্থানের ভার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে, তাঁর সমস্ত অধ্যবসায় নিয়োগ করলেন পারত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য-সংগ্রহে। গৃহকর্ত্রী সুখে লালিত হয়েছিলেন; অতিমর্ত্ত্যের আকাঙ্ক্ষা স্বামীর চেয়ে তাঁর কম তো ছিলোই না, বরং মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে একটা দিব্যদৃষ্টির আভাস পাওয়া যেতো। তাহ'লেও তিনি জান্‌লেন যে, পারলৌকিক মঙ্গল ইহলৌকিক অনিষ্টের দ্বারা সাধিত হয় না; তিনি বুঝলেন যে, দেহ আর আত্মা একই অখণ্ডতার এ-পাশ আর ও-পাশ। তাই এই জীবন্ত মরণে তিনি তাঁর স্বামীর অনুগমন করতে পারলেন না, কায়মনবাক্যে চেষ্টা করলেন যাতে এই বৃহৎ পরিবার আবার তার স্বাধিকার ফিরিয়ে পায়। এর জন্যে কোনো উপায়কেই তিনি নিন্দনীয় মনে করলেন না; ভিক্ষা, দাসীবৃত্তি, নিরুদ্দেশযাত্রা ইত্যাদি তো চল্‌লোই, এমন কি চোখের আড়ালে যুবতী মেয়েদেয় স্বেচ্ছাকৃত দেহ-বিক্রয়েও তাঁর প্রতিবাদ বাক্‌বহুল হ'য়ে উঠলো না। উর্দ্ধজগতে এর জন্য তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে কিনা জানা নেই, কিন্তু এই ধূলির ধরায় তাঁকে যে-সাজা পেতে হয়েছে তার ফর্দ্দ সত্যই রোমহর্ষক। অকর্ম্মণ্য স্বামীর হিতোপদেশ, জ্যেষ্ঠ পুত্রদের কারাবাস, একটি কন্যার প্রকাশ্য কলঙ্ক ইত্যাদি প্রাত্যহিক দুর্ভাগ্যের বোঝা অনেক নিঃস্বকেই বইতে হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর কবরের অভাবে শোবার ঘরে পচার মতো অদৃষ্ট নিয়ে খুব কম লোকেই জন্মে থাকে। রোমক গির্জ্জার পাদ্রীসাহেবদের মারফতে ভাগ্যবিধাতার উৎকোচ-গ্রহণের অভ্যাসটা এখনো বদলায়নি ব'লেই ব্যাপারটায় শেষরক্ষা হলো, কিন্তু সে-ঘটনাটার দাগা লেখক বা পাঠকের মন থেকে সহজে মুছবে না।

থিয়ডোরের মা-ই হচ্ছেন 'ডনে'র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু দেবতার মতো তাঁর প্রভাব অনির্ব্বচনীয়, অলক্ষ্য; থিয়ডোরের জীবনকে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও

রমণীয় ক'রে থাকলেও এই জীবনের পরিণতি ও সার্থকতার জন্যে থিয়ডোর্ মুখ্যত সহজ ধৈর্য্য ও জাতিগত কৃচ্ছ্রসাধনের কাছেই ঋণী। অবশ্য দু'চার জন নিঃস্বার্থ শুভানুধ্যায়ী তারও যে না-মিলে ছিলো, এমন বল্‌লে মিথ্যা হবে; কিন্তু মোটের উপরে তার প্রধান সহায় ছিলো অদম্য অভীপ্সা এবং কঠোর একাগ্রতা। থিয়ডোর্ ড্রাইসার্ যদি এমেরিকার প্রাণবস্তুর প্রতিনিধি হন, তাহ'লে বোঝা শক্ত হবে না, এই দেশ আজকে জগতের শীর্ষস্থান কেন অধিকার করেছে। কী প্রচণ্ড পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন, তা সংক্ষেপে বলা অসম্ভব; উপরন্তু এই বইখানি তাঁর জীবনের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস মাত্র। তাই তাঁর পূর্ণ স্বরূপ এখানে অঙ্কিত করা আমার সাধ্যের অতীত। তবু উপসংহারে আমায় পুনরুক্তি করতেই হবে যে, দরদী পাঠক 'ডন্' রচয়িতাকে মহৎ লেখক ব'লে হয়তো না-ভাবতে পারেন, কিন্তু ড্রাইসার্‌কে তিনি মহৎ ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবেন না।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Road Back. BY ERICH MARIA REMARQUE. Translated from the German. G. P. Putnam's Sons.

Guests of the Nation. BY FRANK O'CONNOR. Macmillan & Co., Ltd.

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হয় তার সম্বন্ধে আজো বই-র শেষ হোলোনা। এই বইগুলির মধ্যে Erich Maria Remarque নামক জার্ম্মান লেখকের All Quiet on the Western Front বইখানি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। লেখক নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন বইখানিতে তারই বর্ণনা করেছেন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে ভিন্ন। সমরক্ষেত্র আর সংসারক্ষেত্র এক নয়। গোলাগুলির নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা মানুষের দেহমনের উপর যখন একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করে, তখন সংসারের সুখদুঃখবিজড়িত নিত্যকার জীবন, ভাঁটার জলের মতন, বহুদূরে স'রে যায়; শুধু মাঝে মাঝে তার ক্ষীণ তরঙ্গধ্বনি কানে এসে লাগে, তখন মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, আবার সেই আনন্দে ও বেদনায় ঘেরা সংসারের সহজ আবেষ্টনের মধ্যে ফিরে যেতে। হয়তো বা মাঝে মাঝে তার সুযোগও ঘটে, কিন্তু তা অতি অল্পকালের জন্য; তারপর আবার সেই যুদ্ধক্ষেত্র, সেই উন্মত্ত তাণ্ডব, দিনের পর দিন সেই নিষ্ঠুর মরণলীলা—এই হোলো একমাত্র বাস্তব, বাদবাকি যা কিছু সব স্বপ্ন। All Quiet on the Western Front বইটিতে যে-জগতের বর্ণনা আছে সে হোলো এই যুদ্ধক্ষেত্রের জগৎ। যারা এই জগতের অধিবাসী—মাত্র চার বৎসরের জন্যও—তাদের হালচাল, ধরণ-ধারণ আমাদের থেকে একবারে স্বতন্ত্র, তাই আমাদের রীতি-নীতির প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে তাদের বিচার করা চলেনা। কিন্তু এই জগৎটি চিরস্থায়ী নয়—একদিন দীর্ঘ চার বৎসরের অবসান হোলো, যারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের পর দিন কাটিয়েও মরণকে ফাঁকি দিয়েছে তাদের আবার ঘরে ফেরার সময় হোলো, আমাদের নিত্যকার পরিচিত জগতে তাদের আবার ডাক পড়্‌ল। তখন কি সেই চার

বৎসরব্যাপী ধ্বংসলীলা কঠিন বাস্তবের রূপ ছেড়ে অবাস্তব দুঃস্বপ্নের মূর্ত্তি ধর্‌ল আর যে-সহজ জীবনযাত্রা স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল তা আবার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সহজ হ'য়ে উঠ্‌ল?

যদি তাই হোতো, তাহ'লে যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আবার হয়তো শান্তি আস্‌ত। কিন্তু এই যে চার বৎসরব্যাপী মহাযুদ্ধ, তার অবসান অত সহজে হয়নি। গোলাগুলির পালা যখন ফুরালো তখন দেখা গেল যুদ্ধের প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়েছে। যারা পরিণত বয়সে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে এসে তাদের স্ত্রীপুত্রের মাঝখানে, তাদের পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের অভ্যস্ত স্থান আবার দখল কর্‌ল; কিন্তু অনেকেরেই ভাগ্যে ফিরে আসার পর জুট্‌ল শুধু দুঃখ ও লাঞ্ছনা—তারা দেখ্‌ল পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের স্থান অন্যে দখল করেছে, এমন কি হয়তো নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ বিরহের শূন্যতা পূরণের জন্য অন্য পুরুষকে হৃদয়ে বরণ ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু আরো একদল ছিল যারা বাল্য অবস্থা থেকে কৈশোরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মা বাবা ভাই বোন, তাদের পড়াশুনা খেলাধুলা ত্যাগ ক'রে সহসা যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। সংসারের সঙ্গে তাদের পরিচয় মোটেই পাকা হ'য়ে ওঠেনি—এমন কোনো অবলম্বন তাদের তখনো জোটেনি যা যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত উত্তেজনার মধ্য দিয়েও মনের উপর আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। যখন এরা ফিরে এল তখন আর এরা কিশোর নয়—যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এরা অনেকখানি বড় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এই এক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর অন্য কোনো অভিজ্ঞতাই তাদের নাই, তাই তারা যখন ফিরে এল তখন কোথাও আর নিজেদের থাপ খাওয়াতে পার্‌লনা। হঠাৎ একদিন বন্যার জলের মতন যুদ্ধ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই উত্তাল জলরাশিতে তাদের অনেকে তলিয়ে গেল, যারা থাক্‌ল তারা এক সর্ব্বগ্রাসী বিপদের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হোলো। তারপর আবার একদিন হঠাৎ বন্যার জল সরে গেল, তখন তারা দেখ্‌ল তারা মাটিতে প'ড়ে, কিন্তু এ মাটি সেই পূর্ব্বপরিচিত মাটি নয়—বন্যায় তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। একদিন তারা ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি দেখেছিল, কিন্তু তা তাদের পরিচিত জীবনের আবেষ্টন থেকে বহুদূরে। কিন্তু এই পরিচিত জীবনের মধ্যে ফিরে এসেও যখন তারা দেখ্‌ল তার সমস্ত সম্পদ একেবারে লুপ্ত হয়েছে তখন তারা জান্‌ল তারা সত্যিই নিরাশ্রয়।

All Quiet বইটিতে এই দারুণ ট্রাজেডির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তা আভাসমাত্র—বইখানির মূল সুর সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। Remarque-এর দ্বিতীয় বই—The Road Back—এই ট্রাজেডি অবলম্বন ক'রেই লেখা। All Quiet বইটিতে যুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর ছবি লেখক এঁকেছেন তার পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র; যে ধ্বংসলীলার বর্ণনা তিনি করেছেন তা সাময়িক। কিন্তু The Road Back বইটির লেখক যে ঘটনাপরম্পরার বর্ণনা করেছেন তাদের স্থায়িত্ব যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের সমস্ত জীবনব্যাপী এবং তাদের পটভূমি আমাদের এই পরিচিত সংসারক্ষেত্র। এই সংসারে আর সকলেরি স্থান আছে কেবল যারা চার বৎসর অসীম দুঃখ সহ্য ক'রে প্রাণপণ শক্তিতে এর সমস্ত সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য শত্রুর সঙ্গে লড়েছিল,

তারাই শুধু এখানে অনাহূত অতিথির মত অনাদৃত। এই অনাদরের দুঃখ যুদ্ধক্ষেত্রের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার চাইতে অনেক বেশী মর্ম্মঘাতী। যখন এই মর্ম্মঘাতী দুঃখে জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠল তখন যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতির মধ্যে অনেকের মন আশ্রয় খুঁজল। সংসারে যখন কোনো আশ্রয়ই জুটলনা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছোট ও বড়—তরুণ ও প্রবীণ—সকলে যে-নিবিড় বন্ধুত্বের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল মনে হোলো জীবনে তাই একমাত্র সত্য ব'লে। কিন্তু নিষ্ঠুর সংসারের কঠিন সংঘাতে এই ঐক্যবন্ধনও চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেল; যারা একদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল তারাই ফিরে এসে স্বার্থের প্রবল দাবী উপেক্ষা করতে না পেরে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। এই রকম দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে কেউ গেল পাগল হ'য়ে, কেউ করল আত্মহত্যা। এই হোলো যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তীকালের ট্রাজেডি। ঘটনার পর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই ট্রাজেডিই The Road Back বইটিতে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির কথাই The Road Back বইটির সব কথা নয়। শত্রু ও মিত্রের বিরোধ, বিভিন্ন আদর্শের বিরোধ, বিচিত্র স্বার্থের বিরোধ—এই সকলকে বিরোধের বহু উপরে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ ভালোবাসার সম্বন্ধ আকাশব্যাপী অসীম নীলিমার মত সংসারের সমস্ত গ্লানিকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে, এই বইটির মধ্যে তা বারবার পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে; মানুষের জীবনের এই চিরন্তন সত্যের উপলব্ধিই এই বইটির প্রেরণা। যে-গভীর নৈরাশ্য এই বইখানি পড়তে পড়তে বারবার আমাদের মনকে অভিভূত করে, তার কুহেলিকাজাল ভেদ ক'রে এই আশ্বাস আমাদের মনে জাগে যে, সভ্যতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য যুদ্ধের প্রলয়-দাহনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু তবু মানুষের জীবনের যা একান্ত স্বকীয় সম্পদ তা অমলিন ও তা অমর এবং একদিন সকল বিরোধের অবসানে তার আলোকে মানুষের সমগ্র জীবন আবার উদ্ভাসিত হবে—

> Word over all, beautiful as the sky,
> Beautiful that war and all its deeds of carnage must in time be utterly lost,
> That the hands of the sisters Death and Night incessantly softly,
> Wash again, and ever again, this soiled world. . . . . .

Guests of the Nation বইটি উপন্যাস নয়, ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটির নামে বইটির নামকরণ হয়েছে। আয়ারলণ্ডের সিন্ ফেন্ দলের তরফ থেকে Michael Collins ও Arthur Griffith প্রভৃতি নেতৃবর্গ যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা ক'রে Dominion Status-এ রাজি হন্ এবং ফলে Irish Free State-এর সৃষ্টি হয়, তখন De Valera-র নেতৃত্বে সিন্ ফেন্ দলের অনেকে তার প্রবল প্রতিবাদ করেন, কেননা তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু স্বরাজ নয়, স্বাধীনতা। এইরূপে দুই দলের সৃষ্টি হোলো—Collins ও Griffith-এর নেতৃত্বে Free State-এর দল এবং De Valera-র নেতৃত্বে Republican দল। Free State-এর দলের হাতে ছিল রাজ্যশাসনের যা কিছু কলকব্জা, কিন্তু Republican দল পদে পদে তাদের বাধা দিতে লাগল। এই সংঘর্ষ খুনোখুনির মধ্য দিয়ে ভীষণ অন্তর্যুদ্ধে পরিণত হোলো এবং এই অন্তর্যুদ্ধে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে মর্ম্মান্তিক মতদ্বৈধ ঘটল তার সমাধান হোলো পরস্পরের রক্তপাত ক'রে। রক্তস্রোতের দুই পারে আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা দুই

ভাগে বিভক্ত হোলো। এই দ্বিখণ্ডিত আয়ারল্যাণ্ডের পটভূমিকার উপর নবীন লেখক Frank O'Connor তাঁর গল্পগুলির চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ করেছেন। আয়ারল্যাণ্ডের সহরে, গ্রামে, অলিতে গলিতে, কুটীরে কুটীরে, পাহাড়ে বনে প্রান্তরে Republican ও Free State দলের সংঘাত এই গল্পগুলির চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার চাইতেও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে মানুষের মনের যা চিরন্তন উপকরণ—দুর্ব্বলতা, শক্তি, আশা, ভয়, স্বার্থপরতা, ভালোবাসা। সাময়িক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কি ভাবে মানুষের মনের সম্পদ ও নিঃস্বতা আত্মপ্রকাশ করে এই গল্পগুলির মধ্যে আমরা তার অতি নিপুণ চিত্র পাই। এই চিত্র যিনি এঁকেছেন তাঁর দৃষ্টি শুধু আয়ারল্যাণ্ডের অন্তর্যুদ্ধের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে নিবদ্ধ নাই—এই সাময়িক ঘটনাধারার তলে তলে মানুষের মনের যে-নানা গভীর রহস্যের তিনি পরিচয় পেয়েছেন তা সকল কালের এবং সকল দেশের মানুষের মনের কথা।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ঝড়ের রাতে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত, শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্ত্তৃক নিয়োগীনিকেতন হইতে প্রকাশিত।

বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে যুগান্তরকারী অনেক ব্যাপারই অনেক বার ঘটেছে, কিন্তু কল্পান্তর এনে দেবার সৌভাগ্য নটনাথ স্থির ক'রে রেখেছিলেন ভক্ত শচীনবাবুর জন্যে। "ঝড়ের রাতে" সেই সৌভাগ্যের পরিচায়ক। দ্বিজেন্দ্রলালের খেদ এতদিনে মিটেছে। "একটা নতুন কিছু" এতদিনে পেলাম বটে। এই নাটকের বিজ্ঞাপন হিসাবে রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষেরা নাটকের গুণ গান ক'রে হ্যাণ্ডবিলে ছাপিয়েছিলেন "এ ছায়ার মায়া নহে—এ জীবিতের আবেদন—থ্রিল্, রোমান্স্, এড্ভেঞ্চার আর কি চাই?" কথাগুলো বর্ণে বর্ণে ঠিক। এ যেন একেবারে কুল্পির হাঁড়ি—ডাব নেবু মালাই কৎবেল, যে কুল্পি চাও তাই পাবে।

ব্যাপারটা এই ঃ—উচ্চশিক্ষিতা "পুষ্পিত যৌবনা" নায়িকা বিজু পুরীতে সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে প্রায় ডুবে যান। এই দুঃসময়ে তাঁকে ত্রাণ করে প্রভঞ্জনের ব্যায়ামপুষ্ট পেশীবহুল বাহু। অমন সুন্দর বলিষ্ঠ অপরিচিত যুবকের আলিঙ্গনে বাঁধা থাকবার সুযোগ তিনি হেলায় হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি "সম্পূর্ণ চেতনা নিয়েও অচেতনের ভান করে" তাঁর "সমস্ত অঙ্গ দিয়ে" প্রভঞ্জনের অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ অনুভব করতে করতে তার কোলে চড়ে বাসায় এলেন। ক্রমে প্রেম গভীর হ'য়ে উঠলো। শেষে হাজারিবাগের এক পাহাড়ের উপর এক শুভ অপরাহ্ণে প্রভঞ্জন "ঠোঁটের বন্ধনী দিয়ে" বিজুর "স্ফুরিত অধর চেপে ধরলে"। প্রেমের চুক্তিপত্রে শীলমোহরের ছাপ প'ড়ে গেল কিন্তু কি কারণে সে চুক্তিভঙ্গ হ'ল নাট্যকার তা কিছু বলেন নি। পরে দেখা গেল যে, তিনি গেজেট খুলে সে বছরের সব চেয়ে ভালছেলেকে আবিষ্কার ক'রে বরমাল্য দিলেন তারি কণ্ঠে। বিজু মনে করেছিলেন যে, প্রশান্ত যখন এত বিষয়ে "উঁচু ডিগ্রি" পেয়েছেন তখন কাম শাস্ত্রেও তিনি নিশ্চয়ই পরম পণ্ডিত। ভুল

ভাঙলো যখন বছরের পর বছর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চল্‌লো অথচ স্বামী তাঁর যৌবন-জমীতে চাষ আবাদ কিছুই করলেন না। এই রকম ক'রে তাঁদের বিবাহের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব রজনী এসে পড়লো। স্বামী ভুলো মানুষ। আজ যে তাঁদের প্রেমের সাম্বৎসরিক সে কথা একেবারে খেয়ালই নেই। তিনি তখনও নর কঙ্কাল আর মড়ার খুলি নিয়ে নৃতত্ত্বের কোন গভীর গবেষণায় ব্যাস্ত। বড় রাগ, অভিমান, দুঃখ আরো কত কি, হ'ল বিজুর। এই 'পতিদেবতাকে' নিয়ে সে করবে কি? একি কোন দিনই রক্তমাংসের "মানুষ" হ'য়ে তার রক্তমাংসের দাবী মেটাবে না? ঝড় উঠলো—বাইরে ঝড়, বিজুর হৃদয়ে ঝড়। বিজু স্থির কর্‌লে এ দেবতা নিয়ে ঘর করা আর চলে না—মানুষ চাই। তার উচ্চ শিক্ষিত মন তাকে বার বার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, যে-স্বামী তাকে তার "পুষ্পিত যৌবনের" সুখ বুঝ্‌তে দিলে না তাকে ধ'রে রাখ্‌বার অধিকার সে স্বামীর আছে কি-না—সে স্বামীর কাছে বিজু মুক্তির দাবী কর্‌তে পারে কি-না। এই চিন্তায় যখন তার মন উদ্‌ভ্রান্ত এমন সময়ে সেই ঝড়ের রাতে তার পূর্ব্ব প্রেমিক প্রভঞ্জন নরহত্যাকারী ডাকাতের সুনাম নিয়ে পুলিশের হাত এড়িয়ে আশ্রয় নিলেন তারই বাড়ীতে। নামের সার্থকতা একেই বলে।

প্রভঞ্জন প্রশান্তর বাল্যবন্ধু কিন্তু তিনি যে বিজুরও অন্তরঙ্গ সে-কথা তখন গোপন রইল। উৎসব রজনীতে বিজুর যৌবনের সংক্রমণকে উপেক্ষা ক'রে স্বামী যখন বিছানার ভিতর নৃতত্ত্বে মস্‌গুল এবং অন্যত্রে প্রভঞ্জনের চোখেও ঘুম নেই, তখন হঠাৎ নিশুতি দুপুর-রাতে ঝড়-বিদ্যুতের মিলন ঘট্‌লো। প্রভঞ্জন "বিবাহের চেয়ে বড়ো" এক অধিকার সূত্রে বিজুকে জড়িয়ে ধ'রে প্রেমালাপের দাবী ক'রে বস্‌লো। আবেদন মঞ্জুর হ'তে বিলম্ব দেখা গেল না। থ্রিল্ রোমান্স্ এডভেঞ্চার আর কি চাই? বিজু বুঝ্‌লে এতদিনে মানুষ পাওয়া গেছে, এবার "দেবতা"কে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রভঞ্জনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করাই প্রশস্ত। প্রভঞ্জনের মাথা কোলের উপর টেনে নিয়ে, পুরাতন প্রেমের জাবর-কাটা-কাটী যখন খুব জুনে চল্‌ছে এমন সময়ে "ভৈরব-দা, আমার বন্দুক" ব'লে বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর আবির্ভাব হ'ল। বিজু বেশ ভাল ক'রেই তার স্বামীকে বুঝিয়ে দিলে যে, "এই বন্দীই তার প্রাণেশ্বর"। সারগর্ভ বক্তৃতা শুনে হোক্, কিম্বা গভীর প্রেমের ঠেলাতেই হোক্, স্বামীর হাত থেকে বন্দুক খসে পড়্‌লো, আর বিজু প্রভঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে হলেন বাড়ীর-বার। সদর দরজা পেরিয়েই কিন্তু বিজুর মনে হ'ল যে, এ-রকম ক'রে চলে গেলে লোকে বল্‌বে প্রভঞ্জনকে পেয়ে সে কুলে কালি দিয়েছে। উপরন্তু এ-উপায়ে যৌবনের ক্ষুধাই শুধু মিট্‌বে কিন্তু দশের দেশের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে না যে, স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার স্ত্রীর আজকাল জন্মেছে। কাজেই বিজু প্রভঞ্জনকে বিদায় দিলে। কিন্তু এই বিয়োগ ব্যাপারের মর্ম্মস্পর্শী আলাপ-প্রলাপ আধা নেপথ্যেই সমাধা হ'ল। আমরা কেবল দেখ্‌তে পেলুম "পড়ি ত কাদায় পড়্‌বো না—স্বামীর ভিটের উপরই পড়্‌বো" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে বিজু দেউড়ীতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ছেন। তার পর সেই মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে কোলে ক'রে ঘরে ফিরিয়ে এনে প্রশান্তর কী উৎকণ্ঠা কী শুশ্রূষা! স্ত্রী কিন্তু একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠেই কাকচড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুটকেস গুছিয়ে প্রস্তুত। গৃহত্যাগের আসল কারণ বিবৃত ক'রে ফটক পেরিয়ে যান আর কি, এমন সময়ে পুরানো চাকর ভৈরব-দা (যার স্ত্রীও কুল সমুজ্জ্বল ক'রে ইতিপূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করেছিল) মনিবকে

পরামর্শ দিলে মানুষোচিত দর্পে বৌমার চুলের মুঠি ধ'রে ঘরে পূরে তালা বন্ধ করতে। অমনি প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজুর হঠাৎ "বদলে গেল মতটা"। তাই মানুষ অন্বেষণ করার "পথটা" ছেড়ে দিয়ে "ওগো তাই কর গো তাই কর" বল্‌তে বল্‌তে এসে তিনি ঝাঁপ দিলেন তাঁর স্বামীর বুকে। এমনি ক'রে প্রভঞ্জনের চুক্তিভঙ্গের মামলাটা কন্‌সেণ্ট ডিক্রি ফাইল ক'রেই মিটে গেল এবং যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিরুদ্ধ আবেগও নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশের মূল্য বুঝ্‌লে।

রোমাঞ্চকারী ঘটনাবলীর সমাবেশও অভূতপূর্ব। মাত্র চার প্রহরের মধ্যে কি না হ'ল! মহত্তর উদ্দেশ্যে নরহত্যা ক'রে (অবশ্য মহত্তর উদ্দেশ্যটা যে কী তা নাট্যকার কোথাও ফাঁস করেননি) পূর্ব্বপ্রেমিকের দ্রুত মোটর হাঁকিয়ে পলায়ন; পথে বিজুর ননদ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা; পুলিসের গাড়ীর সঙ্গে রেস, পিস্তলের গুলিতে তরুণীদের টায়ার ফাটা; সেই গোলাগুলির মধ্যেও আধুনিকা ছুটির ডাকাতের চোখ দেখে হৃদয় হারিয়ে ফেলা; যাদের সঙ্গে আসনাই চলে অথচ বিয়ে অচল এমন ছুটি তরুণকে দিয়ে ভাঙা গাড়ি ঠেলিয়ে দাদাবৌদির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসা; উৎসবসভায় মাসীমার অবিবাহিত ননদের মারফতে উদ্বাহকে উদ্বন্ধনের নামান্তর ব'লে প্রমাণ করানো; "ডাক্তার প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী আছেন?" বলে হুঙ্কার ছেড়ে, এই বুঝি কোমরে দড়ি দিলে, এমন ভাব দেখিয়ে অমায়িক পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বুঝিয়ে দেওয়া যে, প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাউকে খুন করেননি, কেবল অন্য খুনির নিষ্প্রাণ বলিটির ওপর দিয়ে মোটার চালিয়ে এসে পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার অপরাধেই তিনি অপরাধী (বাড়ি বয়ে এসে নিরপরাধীদের আশ্বাস দিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা বোধ করি আজকালকার অর্ডিন্যান্‌সের শ্রেষ্ঠ সুফল); এবং এই দিলাসা পাওয়া সত্ত্বেও প্রভঞ্জনের নিজেকে খুনি বলে ঘোষণা করার ব্যর্থ চেষ্টা—ওঃ সে কি চমৎকার ব্যাপার! অবশ্য শেষকালটায় একটু নিরাশ হ'তে হয়, যখন জানা যায় যে, প্রভঞ্জনের খুন এই কলিযুগে আর ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডিত হয়না, কারণ তিনি মানুষ মারেননি হত্যা করেছেন প্রশান্তের সঙ্গে তাঁর আজন্মের বন্ধুত্বকে। কিন্তু তবু থ্রিলের অভাব নেই, রোমান্সের ভূরিভোজে শেষকালটায় গা গুল্‌তে থাকে।

মনস্তত্বে পরম পণ্ডিত শচীনবাবু অনেক দিক্ দিয়েই তাঁর অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনোবিকলন চরমে গিয়ে ঠেকেছে সেইখানে, যেখানে গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা বিজু শাশুড়ীর গহনার সেফ্‌টিপিনটি পর্য্যন্ত বুঝিয়ে দিয়ে সদর দরজায় পা দেবার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ীর লোকেদের জানিয়ে দেন যে, রাত্রে স্যানাটোজেন না-খেলে তাঁর স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। ক্লাইম্যাক্‌স্ আর কাকে বলে। এই অংশটার অভিনয় দেখে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলুম আর কি! কিন্তু আমার এক হালফ্যাসানেব বন্ধু আমায় ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে নাটকটি বিয়েগোন্ত মোটেই নয়, এ একরকম নতুন পর্য্যায়ের পুস্তক যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'ট্র্যাজিক ফার্স'। পবে ভেবে দেখেছি স্থানটি নববিধান রামায়ণের এক জায়গার সঙ্গে মেলে, যেখানে বনগমোনন্মুতা সীতার আঁচলে চায়ের মোড়ক বেঁধে দিতে দিতে সজলকণ্ঠে কৌশল্যা দর্শকদের জানান যে, বেড-টি-বিহনে তাঁর বাছনীর জীবনযাত্রা একেবারেই অচল। কাজেই মনে হয় স্যানাটোজেন-দৃশ্যটা হয়তো লোক হাসানোর জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে;

কিন্তু আমার মনের জরা এতই মৌরসি যে স্যানাটোজনের মতো টনিকের ধাক্কা খেয়েও তার সাশ্রু অবসাদ অটুট থেকে যায়।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

Regards Sur Le Monde Actuel—PAUL VALERY (Stock)
Paul Valéry—VALERY LARBAUD (Felix Alcan)

পল্ ভালেরি-র বহুমুখী প্রতিভার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রকাশ কাব্যে। ফরাসী পিতা ও ইটালিয়ান্ মাতার পুত্র ভালেরি তাঁহার নাবালক বয়স বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া, বাইশ বৎসরে প্যারিসে আসিয়াই সুপ্রসিদ্ধ কবি ষ্টেফান্ মালার্ম্মে-র সাহিত্যিক সহচর হইয়া পড়িলেন। তাই তাঁহার কাব্যে 'সিম্বলিষ্ট'-ধারার প্রভাব একান্ত সুস্পষ্ট। এ সত্ত্বেও তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু ভালেরি-র মনের গতি এমনই বিচিত্র যে, এ-সাফল্যে উল্লসিত না হইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ও কবিতা রচনা বন্ধ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে। ইতিমধ্যে তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তবুও লোকমত তাঁহাকে সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দিত করিল। অনেক বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচকের মতে ভালেরি কবি-প্রতিভায় রাসিন্, বোদলেয়ার বা মালার্ম্মে-র সমশ্রেণীর। তাঁহার প্রবন্ধাবলী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হইয়া 'ভারিয়েতে' নামে প্রকাশিত হইলে ফরাসী দেশ বুঝিল, ভালেরি শুধু কবি নহেন, তিনি এত বড় চিন্তাশীল দার্শনিক যে, তাঁহার তুলনা খুঁজিতে হইলে পাস্কাল্-এর শরণাপন্ন হইতে হয়। ১৯২৫ সালে আনাতোল ফ্রাঁসের মৃত্যুতে ফরাসী আকাদেমীর "চল্লিশ অমরের" ৩৮ সংখ্যক আসন শূন্য হয়। সেই শূন্য আসনের অবিসংবাদিত অধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া ১৯২৭ সালে ভালেরি আকাদেমীতে প্রবেশ করেন।

লারবো-র বইতে এই ৩৮ সংখ্যক আসনের ইতিহাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৬৩৫ সালে ফরাসী আকাদেমীর উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যাঁহারা ঐ আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী ফ্রাঁসের মুখে বসাইয়া তাঁহার বিশিষ্ট কথনচ্ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ভালেরি-র রচনার কালপঞ্জী, উড্ কাট্ মূর্ত্তিচিত্র ও হস্তলিখনের প্রতিলিপি বইটির সম্পদ বাড়াইয়া দিয়াছে। তথাপি পুস্তকখানির সব চেয়ে মূল্যবান অংশ, ভালেরি-র অপ্রকাশিত রচনাবলীর কিয়দংশ, ও লারবো-লিখিত ভালেরি-র অন্তর্জীবনবিকাশের ইতিহাস। লারবো ভালেরি-র অন্তরঙ্গ। মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও কথালাপে ও পত্রালাপে তিনি ভালেরি-র মনের অনেক গোপন কক্ষের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই তাঁহার নিবন্ধে তিনি পাঠককে দিতে চাহিয়াছেন—
" l'histoire de la formation de cette pensée, de cet esprit auquel nous devons, d' une part des poèmes qui sont parmi les plus beaux de toute la Lyrique francaise, et d'autre part des écrits en prose qui, s'ils ne nous offrent pas un système philosophique complet, nous invitent cependant à voir en leur auteur ce que je crois pouvoir et même devoir nommer: un grand moraliste de la vie intellectuelle."

(সেই মনীষা, সেই মেধার জন্মবৃত্তান্ত, যাহার প্রসাদে ভালেরি-র কবিতাকে আমরা ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করি, এবং যাহার কল্যাণে ভালেরি-র গদ্য রচনায় কোনো তত্ত্বদর্শনের সম্পূর্ণ ধারা দেখিতে না পাইলেও, সেই গদ্যের রচয়িতাকে আমরা বিচারপন্থার একজন প্রধান নীতিকার বলিতে বাধ্য)। তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিচিত্র চিন্তারত্নাবলীর কোষাগার ভালেরি-র রচনায় প্রবেশ করিতে তাঁহার এ চাবিটি পাঠকের অত্যন্ত সুখকর সহায়।

'রেগার.সিউর ল মদ্ আক্‌তুয়েল্', ভালেরি-র আধুনিকতম গ্রন্থ। নামেই প্রকাশ তিনি এ-গ্রন্থে বর্ত্তমান জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে 'বর্ত্তমান' অর্থে তিনি ধরিয়াছেন সমরোত্তর ইউরোপ ও তাহার প্রভাবান্বিত জীবলোক। ইউরোপের বৃহত্ত্ব ও বিনাশ, ফ্রান্সের মানসমূর্ত্তি, প্যারিসের প্রভাব, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, প্রগতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ একটি দীর্ঘ মুখবন্ধের সূত্র দিয়া মালার মত গাঁথা। সমরোত্তর ইউরোপীয় মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ জাতীয়তাবাদ। একাধিক ফরাসী লেখক ইহাকে আক্রমণ করিয়াছেন—রোলাঁ, বারবুস্, দুয়ামেল, বদাঁ, জালু প্রভৃতি। ভালেরিও আক্রমণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার রীতি বৈজ্ঞানিক। মনুষ্যহিতৈষণায় নহে, ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে অনুশীলন করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান জগতে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্থান নাই। Mais l'histoire mélodique n'est plus possible। এই নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-দৃষ্টি সুলভ নহে জানেন বলিয়াই তিনি বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে যাঁহারা কোনো পন্থা বা দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন; qui par là sont libres encore de douter de ce qui est douteux et de ne point rejeter ce qui ne l'est pas.

ভালেরি-র মতে আপাততঃ ইতিহাস পড়া বন্ধ করিয়া ভূগোল পড়াই বিশ্বমানবের কর্ত্তব্য। ইতিহাস জাতীয়তাবোধকে সংহত করিয়া তীব্র করিয়া তোলে। তা ছাড়া ইতিহাস অতীতের কাহিনী—বর্ত্তমানের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। কাজেই বর্ত্তমান জীবন গঠনে তাহা কোনই সহায়তা করিতে পারে না। অনেকের মতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জানিবার জন্যই ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন—কারণ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতের ফল। ইতিহাসের এই ভবিষ্যৎ-বেত্তার দাবী স্বীকার করিতে ভালেরি মোটেই প্রস্তুত নহেন। Rien n'a été plus ruiné par dernier guerre que la pretention de prevoir, বিগতযুদ্ধের ফলে ইতিহাসের গণৎকারির জারিজুরী যেমন ভাঙিয়াছে এমন আর কিছুই নহে।

অপরপক্ষে তিনি বলিতেছেন ভূগোল পড়িতে গিয়া পৃথিবীর মানচিত্রখানি খুলিলেই বর্ত্তমান বিশ্বের স্বরূপ চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। ভূমণ্ডলের এমন কোন অংশই নাই যাহা কোন না কোন জাতির এলাকাধীন নহে। কাজেই কোন জাতির নিজেকে ইচ্ছামত বিস্তৃত করিবার উপায় বা স্বাধীনতা নাই—অন্য কোন জাতির উন্নতির হন্তারক না হইয়া। এমন কি বিবদমান দুইটি জাতির মধ্যে একান্ত দ্বৈরথযুদ্ধ পলিচালনও আর বর্ত্তমান জগতে সম্ভব নহে—পৃথিবীর

অপর প্রান্তস্থিত জাতিসমূহের স্বার্থেও ঘা পড়িতেই হইবে; অতএব দ্বৈরথযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—বিশ্বব্যাপী মহাসমর। এই প্রতিপাদ্যটি তিনি একটি সহজ অথচ বৈজ্ঞানিক উপমার সাহায্যে অপরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—
" Il faut rappeler aux nations croissantes qu'il n'y a point d' arbre dans la nature qui, placé dans les meilleures conditions de lumiére, de sol et de terrain, puisse grandir et s'élargir indéfiniment. (বিবর্দ্ধমান জাতিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন বৃক্ষ নাই, উর্ব্বরতম ভূমি ও প্রচুরতম আলোকের আনুকূল্য সত্ত্বেও যাহার বৃদ্ধি অশেষ, যাহার পরিপুষ্টি অপরিসীম)।

ভালেরি-র বক্তব্যের এই চুম্বক-পরিচয়ে তাঁহার প্রতিভার অপমান করা হয়। বইখানি সমগ্রভাবে পড়িলে অভিভূত হইতে হয়, তাঁহার মনের প্রসারে ও জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে। ভালেরি-র লেখনী যে স্বভাবতঃই গমনকুণ্ঠ, তাহা তাঁহার বহুবর্ষের স্বেচ্ছাবৃত মৌনব্রত হইতেই বোঝা যায়। ফলে তাঁহার প্রবন্ধগুলির রূপ অনেকস্থলেই বিভিন্ন-সূত্রের সমষ্টির মতো। কিন্তু ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, জীবন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার অনুধাবনের পরিণত ফল তিনি এই সূত্রাকারেই ধনরত্নের মত বিতরণ করিয়াছেন। ঐকান্তিক মার্জ্জন ও সাধনে তাঁহার ভাষা সেই স্বচ্ছতা ও গাঢ়বন্ধত্ব লাভ করিয়াছে যাহা তিনি রাসিন্-এর রচনায় সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানবমনের সেই নিগূঢ় কেন্দ্রীয়শক্তি লেওনার্দোর আয়ত্তে ছিল যাহার প্রয়োগে বিজ্ঞান-সাধনা ও শিল্প-সাধনা সমান সম্ভব হইয়া উঠে। এ বর্ণনাটি ভালেরি-র সম্বন্ধেও সুপ্রযোজ্য মনে হয়। তাঁহার একটি সূত্র বলে—
Rien de plus proprement humain que l' effort intellectuel: c'est le caractère dècisif, (মানসিক উদ্যোগই মানুষের নিজস্ব ধর্ম্ম, ইহাই মনুষ্যত্বের ধ্রুব লক্ষণ)। এই একান্ত মানবোচিত প্রচেষ্টার অভাব তাঁহার রচনায় কোথাও দেখা যায় না, কোথাও মতের খাতিরে তথ্যকে বিকৃত করিবার প্রয়াস নাই—এই দিক্ দিয়া তিনি বিজ্ঞান-সিদ্ধ। অথচ জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাগুলিকে একটি প্রশস্ত ও সর্ব্বালিঙ্গী ঈক্ষণায় বাঁধিবার শক্তি তাঁহাকে দার্শনিক-শিল্পী করিয়া তুলিয়াছে।

ইউরোপের বিশিষ্ট মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—
Le jugement le plus pessimiste sur l' homme, et les choses, et la vie et sa valeur, s'accorde merveilleusement avec l' action et l' optimisme qu' elle exige.—Ceci est européan, (মানুষ, জগৎ, জীবন ও জীবনের মূল্য সম্বন্ধে আত্যন্তিক দুঃখবাদ, এবং কর্ম্ম ও যে-আশাবাদ ব্যতিরেকে কর্ম্ম অসম্ভব, এই দুই মনোভাবের মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ নাই, ইউরোপীয় প্রকৃতিতে এই বিপরীতমুখী প্রবর্ত্তনা দুটির সম্পূর্ণ সঙ্গম ঘটিয়াছে)। যে দৃষ্টির সহায়তায় একটি অতি-জটিল অতি-অস্পষ্ট বিষয়—বিভ্রান্ত অথচ কর্ম্মোন্মত্ত ইউরোপের বর্ত্তমান স্তোয়িক মনোভাব—এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার প্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইতেই হয়। মনে হয় ভালেরি বুঝি এই তীক্ষ্ণ-ধী-সর্ব্বস্ব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে তিনি মানবের অন্তর্জগত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন—

Dans nos desirs, dans nos regrets, dans nos recherches, dans nos émotions et passions, et jusque dans l' effort que nous faisons pour

nous connaître, nous sommes le jouet de choses absentes.” (আমাদের আশা-নিরাশা, অনুসন্ধিৎসা, ভাবাবেগ, এমন-কি আত্মপরিচয়ের প্রয়াস, এ-সমস্ততেই আমরা কোনো এক জ্ঞানাতীত শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়ণকমাত্র)।

কঠোর বিচারপন্থী ভালেরি-র মুখে এই কথা শুনিয়া শাশ্বত অখণ্ড ব্রহ্মবাদী প্রাচ্য মন কি শান্ত প্রফুল্লতার সহিত ভাবিতে পারে না যে, ভৌগলিক ও পরিশীলীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহাদের মর্ম্মগত ব্যবধান অলঙ্ঘ্য নহে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়

দুলালের দোলা।—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

লেখক প্রথমেই বলেছেন, গল্প তৈরী তাঁর উদ্দেশ্য নয়,—আসল উদ্দেশ্য ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করা। ভূমিকায় স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন "ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্ আর নাই থাক্, পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।" অর্থাৎ পল্লীগ্রামে গিয়ে কোনো ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন। আর গল্পটা অর্থাৎ ঘটনাটা এই—প্রবাসে প্রতিপালিত এক যুবক দেশে বেড়াতে এসে, প্রথমে পল্লী-সৌন্দর্য্য দেখে ও পিসিমার রান্না খেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্ছিল—কিন্তু পরে ঘরে ঘরে যে রকম জাতিভেদ আর ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার দেখ্‌লে, লোকের নানারকম কুকীর্ত্তির কাহিনী শুন্‌লে,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে তাকে থালা মেজে দিয়ে আসতেও হয়েছিল,—তাতে সে বড়ই বিরক্ত হ'য়ে অপর এক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কর্‌লে এবং দুকথা শুনিয়ে দিলে। এ-ব্রাহ্মণ ছিল চোরের সর্দ্দার, কাজেই এর ফলে চোরে সিঁদ কেটে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ-অমর্য্যাদার প্রতিফল হাতে হাতে পেয়ে তার দেশ ছেড়ে পালাতে বিলম্ব হোলো না। লেখকের ভাষা বেশ স্পষ্ট, অলঙ্কারবহুল, ভাবেরও অভাব নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এই সব ঘটনা কি সত্য বা সম্ভাব্য ব'লে মেনে নিতে হবে? নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের ছেলেকে পরম আপ্যায়িত ক'রে শেষে তাকে বাসন মাজতে বলা অস্বাভাবিক নয় কি? গ্রামে কি কলাপাতারও অভাব ছিল? এ-ছাড়া, পাড়াগাঁয়ে অবশ্য সহরের সভ্যসমাজের মত মিহি গলায় রকমারি সুরের "বর্ষামঙ্গলের" গান শোনা যায় না বটে কিন্তু লেখক যে রকম বিকৃত ভাষায় বিচিত্র ঢংয়ের গানের উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর শ্লেষ কর্‌বার বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু কোনো মজলিসে বাস্তবিক তেমন গান শোনা যায় না। পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত বা অশিষ্ট হ'তে পারে কিন্তু অভদ্র হয় না। হিন্দু ও মুসলমান দুটি চাষীকে উচ্চমনা ক'রে তাদের মুখে কত তত্ত্বকথা শোনালেন কিন্তু উচ্চবর্ণের গৃহস্থদের এত হীন ক'রে দেখালেন কেন বোঝা গেল না। আর শেষ কালে একটা সামান্য অজুহাতে practical joke স্বরূপ যে চুরির কাণ্ডটা ঘটালেন,—কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপারের অবতারণা করেন না। আর এক কথা, এক আশী বছরের বুড়ো চাষীর মুখে শোনালেন—"ধর্ম্মপত্নী কথার কোনো মানে নেই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল,—তার দেহটাই আসল।" এ কথা লেখকের মুখে শোভা পেতে পারে, কিন্তু ঐ বুড়োর মুখে নয়।

জাতিভেদ, প্রভৃতি পল্লীজীবনের এই দিক্‌টা নিয়ে অনেকটা এই ধরণের লেখা আর একটি গল্প অনেকদিন আগে বেরিয়েছিল—খ্যাতনামা নাট্যকার ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "চাঁদের আলো"। তাতেও গল্পের নায়ক গ্রামে নবাগত এক প্রবাসী বালক,—বাড়ী আগ্‌লে থাকেন এই রকম এক পিসিমা, ঘটনার মধ্যে এমনি জাতিবিচার ও ছোঁয়াছুঁয়ির গণ্ডগোল,—এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, তাতেও এক ধোপার মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সংশ্রব ও তার আত্মহত্যার কথা আছে। ভাষাও তেমনি অলঙ্কারবহুল।

অবশ্য অন্যান্য ঘটনায় বিস্তর প্রভেদ আছে,—আর সেটা আদিরস মিশ্রিত একটা নিছক গল্প, আর এটি গল্পচ্ছলে প্রবন্ধ। তবে তুলনা কর্‌লে বুঝা যায় যে, তাতে ঘটনার একটা সামঞ্জস্য আছে,—আর তাতে ছুৎমার্গের কেবল আচার-বিচারের কথাই নেই, তার একটা শেষ মীমাংসা আছে। যাই হোক্, এই বই লেখার সার্থকতা কি জানি না। প্রবাসী বাঙালীর কাছে দেশের এই চিত্র উপস্থিত করলে তারা আর দেশে ফির্‌বার কথা ভাবতেও ভয় পাবে। লেখকের ভাষা ও ভাব দুই বিষয়েই দখল আছে, কিন্তু ঘটনা বৈষম্যে আর সহজ বিবেচনাশক্তির অভাবে বইখানি গল্প হিসাবেও জমে নি, প্রবন্ধ হিসাবেও স্থান পেতে পারে না।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

বড় মা—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি এ, প্রণীত।

এতে কয়েকটি ছোট ছোট গল্প আছে। বেশ মিঠা মিঠা ঝর্‌ঝরে গল্প। এতে সাহিত্যস্থষ্টির উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—নেহাৎ গল্প বলার জন্যই গল্পগুলি লেখা। পড়তে কিছু কষ্ট হয় না, প্রত্যেকটিতেই মন খুসী হয়,—ভুলে যেতেও বেশী দেরী হয় না। মেয়েদের সময় কাটাবার পক্ষে বেশ বই,—মেয়েদেরই উপযুক্ত ক'রে লেখা।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

পাঁচমিশেলী—শ্রীঅবনীনাথ রায়, ডি, এম, লাইব্রেরী, মূল্য একটাকা।

কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন এই বইখানি। তবুও পাঁচমিশেলী নামটি ঠিক লাগসৈ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। কারণ, পাঁচমিশেলী নামে যতটা বৈচিত্র্য আশা করা যায়, তা এ বইতে নাই। সর্ব্বশুদ্ধ দশটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে, ও দুটি রবীন্দ্রনাথের; বাকী তিনটি বর্ত্তমান সমাজকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। কোন এক ৩০শে আশ্বিন তারিখে লেখক তাঁহার বাল্যকালে দুই বন্ধুর সহিত রাখীবন্ধন করিয়াছিলেন। রায় সাহেব খেতাব-লুব্ধ এক ভদ্রলোকের রিপোর্টের ফলে তাঁর ভাগ্যে জুটিয়াছিল রাষ্টিকেসন্। এই আপাতবিষম ফলটি পরিণামে মনোরম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবনীবাবু বোলপুর আশ্রমে ভর্ত্তি হন্ ও রবীন্দ্রনাথের নিকট সংস্পর্শে আসেন। "বোলপুরে থাকার সময়টা তাঁর কাছে কাছে থাকতুম। কবিতা লিখে তাঁকে দেখাতুম —তিনি কারেক্ট ক'রে দিতেন। দুপুরবেলা শান্তিনিকেতনের দোতলায় জাজিমের ওপর বসে শান্তিনিকেতন-সিরিজের থেকে প্রবন্ধ বুঝিয়ে নিতুম—কখনো বিরক্ত হ'তে দেখিনি—এক কথা পাঁচবার বুঝিয়ে বলতেন। ছুটির সময়ও বাড়ী না গিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতুম।" পরে দিল্লী-প্রবাসী হইয়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের মায়া কাটাইতে পাবেন নাই। তাঁহার সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলি কোন-না-কোন সাময়িক উপলক্ষে রচিত। কাজেই তাহার পূর্ণাঙ্গ ও মূলগত সমালোচনা আশা করা বৃথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত গ্রন্থের গল্পাংশ নিজের মত করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাঝে মাঝে কিছু কিছু মন্তব্য প্রক্ষেপ করিয়া। এ প্রথায় নাবালক মনের উপকার হইলেও সাবালক মন তুষ্ট হয় না। তবুও স্বীকার করা উচিত, সাহিত্য-

আলোচকের উপযুক্ত রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী অবনীবাবুর আছে। তাঁহার ভাষায় স্বচ্ছতা ও মাধুর্য্য, দুই-ই আছে; এ-দুয়ের সমাবেশ আধুনিক বাংলার অতি অল্প লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাংলাভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের দৈন্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ-অবস্থায় অবনীবাবুর সুলিখিত প্রবন্ধাবলীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

কারার ফুল—প্রথম স্তবক, সন্ধ্যামালতী; দ্বিতীয় স্তবক, রক্তজবা—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স।

কবি তাঁহার নিবেদনে জানাইতেছেন "এ কবিতা-গুচ্ছ পেশাদার কবির হাতের নহে। কারাবাসে রচিত; নানা সুখ, দুঃখ, বিপত্তির জালে জড়িত রাজবন্দীর জীবনের অবকাশের আওতায় একটী পরিণত ঋজু হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বেদনা ও আনন্দের স্বচ্ছ প্রকাশ মাত্র। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সমালোচনার তীব্র অঙ্কুশ দ্বারা প্রেমিক অন্তরের নির্য্যাস—এই কবিতার বিচার না করিয়া, রসসিক্ত হৃদয় এবং প্রেমাবিষ্ট বুদ্ধি লইয়া পাঠ করিলেই কবি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন।" কবির এ কথা না বলিলেও চলিত। কারণ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার অভ্যুদয় নূতন হইলেও তিনি বাঙ্গালীর অপরিচিত নহেন। দেশের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার যে তাঁহার স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই কোন বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাই তাঁহার কবিতা "সমালোচনার তীব্র অঙ্কুশ" দ্বারা বিচার না করিয়া রাজবন্দীর জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বেদনা ও আনন্দের প্রকাশই মনে করিবে। দুই স্তবকে মোট ৮৩টী কবিতা—নানা বিষয়ে লিখিত। সকলগুলিই যে উচ্চ কবিত্বের নিদর্শন এমন কথা বলা চলে না, তবে কখনো কখনো কবির হৃদয়ের বেদনা যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছন্দ হিসাবে এ কবিতার বিচার না করাই ভাল, কারণ কবি নিজেই বলিয়াছেন—

> আকাশধরার ছন্দবেগে
> নাই কি কোন যতির ভুল?
> আমার দুখের অস্তমেঘে
> ফুটবে না কো হীরার ফুল?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

সান্-ইয়াৎ-সেন—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মোস্লেম পব্লিশিং হাউস,

চীন ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা কতকটা একই প্রকারের। দুই দেশই বিশাল; ও প্রতি দেশেরই বিপুল অধিবাসীর মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি ও ভাষাগত ঐক্য নাই। সেই সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া নূতন জাতি গঠন উভয় দেশেরই কাম্য। ইহাতে বাধা বিস্তর, ভারতবর্ষ শুধু একটী ইউরোপীয় শক্তির হস্তগত, কিন্তু চীন বহু বিদেশীয় শক্তির মুষ্টিবদ্ধ। সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চীন কিভাবে তাহার জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতেছে তাহা ভারতবাসীর জানা দরকার।

সুতরাং নবীন চীন ও তাহার জাগরণের প্রধান সহায় সুন ইয়াৎ সেন সম্বন্ধে কোন তথ্য-পূর্ণ পুস্তকের প্রকাশ সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।

এ বইখানি সরস ভাষায় লিখিত। তবে লিখিবার প্রণালীতে দোষ আছে। লেখক নিজের বর্ণনার ভিতর মধ্যে মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সুন ইয়াৎ সেনের মুখ দিয়া তাঁহার আত্মচরিত শুনাইয়াছেন। চীনা নামগুলিরও সব সময়ে সঠিক উচ্চারণ দেওয়া হয় নাই। উচ্চারণ সান নহে সুন, কোয়াসিঙটাঙ নহে কুও-সিন্-তাং। বর্ত্তমান চীনের গণতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বেশী খবর দেওয়া উচিৎ ছিল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

The Yellow Placard—SYLVIA LYND (Gollancz).
Dear Judas—ROBINSON JEFFERS (Hogarth Press).
Deserted House—DOROTHEY WELLESLEY (Hogarth Press).
The Frozen Ocean—VIOLA MEYNELL (Seeker).

উপরি-উক্ত চারখানা কবিতার বই প'ড়ে সমসাময়িক ইংরেজি কবিতার সাধারণ উৎকৃষ্টতায় বিস্মিত হ'তে হয়। অনেকে ক্ষোভ করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে গত শতাব্দীর মত বিরাট কবি-প্রতিভা একজনেরও নেই; এখনকার কাব্য-ক্ষেত্র বহু চলনসই কবিতে সমাকীর্ণ। তা যদি হয়-ও (যদিও সে-বিষয়ে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়), তবু এ-কথা ঠিক যে, ছোটখাটো কবিরা আজকাল উৎকৃষ্টতার যে-স্তরে পৌছতে পারেন, অন্য-কোনো যুগে তা সম্ভব হ'ত না। বহু শতাব্দীর অনুশীলন ও সাধনা যে-ভাষা ও সাহিত্যকে নির্ম্মাণ করেছে, তা'র এম্‌নিই হয়। ইংরেজী ভাষা ও কাব্য-ধারা এমন সম্পদশালী যে, কণামাত্র ক্ষমতা থাকলেও কোনো ইংরেজের পক্ষে ভালো কবিতা না-লেখা অসম্ভব। ভালো, মানে পঠনীয়; মানে, উপভোগ্য। এই চার জন কবির একজনো 'বিখ্যাত' নন্, (সম্ভবত বয়েসও তাঁদের বেশি নয়), তাঁদের রচনা শুধু যে পঠনীয়, তা নয়; উপভোগ্য। কোনো সময়ে তাঁদের কোনো-না-কোনো কবিতা যে Oxford Book of English Verse-এ স্থান পাবে না, তা জোর ক'রে বলা যায় না। চারখানা বই বিভিন্ন ধরণের হ'লেও দুটি সাধারণ জিনিষ সহজেই বা'র ক'রে নে'য়া যায়; প্রকৃতির জন্য অনুভূতি আর বিষাদের সুর। প্রকৃতি-পূজার cult এমন সর্ব্বব্যাপক হ'য়ে রোমান্টিক্‌দের সময়েও ছড়ায় নি। যে-সব ইন্দ্রিয়গোচর জিনিষের ভেতর দিয়ে প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করেন, সে-সব জিনিষে আজ-কালকার লোকের মন—কবিতা দিয়ে যদি বিচার করতে হয়—অত্যন্ত বেশী সাড়া দেয়, খুব সহজেই সাড়া দেয়। আর, বিষাদ বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিতার বিশেষত্ব; জীবনের সব আনন্দের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সর্ব্বান্তে অনিবার্য্য মৃত্যু সম্বন্ধে এ-যুগের কবিরা তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। মনে হয়, Anglo-Saxon কবিতার গম্ভীর নিরানন্দ অনেক শতাব্দী অতিক্রম ক'রে আবার ফিরে' এসেছে। Anglo-Saxon কবিতা বাদ দিলে ইংরেজি কবিতার মূল সুর আনন্দ ব'লে ধরা যায়; চসার আনন্দের কবি, এলিজাবেথীয়েরা আনন্দের; ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিতায়—শেলি ও কীট্‌সে—একটি পলাতক, সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষাদের সুর বাজ্‌লো। কিন্তু এক অভিনব pagan pessimism আন্‌লেন প্রি-র‍্যাফেলাইটরা, বিশেষ ক'রে মরিস্ আর সুইন্‌বর্ণ্। সেই

থেকে ইংরেজি কাব্যের ধারা একটা মোচড় নিয়েছে, বলা যায়; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীব প্রথম দিকে যাঁরা লিখেছেন—হার্ডি, এ, ই, হাউস্‌ম্যান্‌, রুপার্ট ব্রুক্‌, ডি, লা মেয়ার—মৃত্যুর জল্পনায় এঁদের সবাকার কবিতাই বিষণ্ণ। সেই বিষাদের স্বর যে এখন পর্য্যন্ত চ'লে আস্‌ছে, এই অত্যন্ত আধুনিক কবিতাগুলো প'ড়ে তা'র পরিচয় পেলাম।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

শেলী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্‌ এণ্ড কোং প্রকাশিত।

শেলীর সমস্ত দুর্দ্দশার মূলে ছিলো তার জীবনকে কাব্যময় ক'রে তোলার শোচনীয় চেষ্টা। ভাবা গিয়েছিলো যে, সে বেঁচে থেকে যে-সঙ্করতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, অন্তত মরে তার সমাধান করবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের "শেলী" প'ড়ে সে-আশাকেও কুহকিনী ব'লে জেনেছি। শেলীর প্রথম জীবনী-সম্বন্ধে ম্যাথিউ আর্নল্‌ড্‌ যে-মন্তব্য করেছিলেন সে-টিপ্পনী এখনো অপ্রচল হয়নি; নৃপেন্দ্রবাবুর বিবরণেও "it is always a poetic child that is born and not a prosaic babe"। তবে কল্পনার প্রাখর্য্যে শেলীর শেষ জীবনীকার ডাউডনকেও হার মানিয়েছেন। নৃপেন্দ্রবাবু তৃতীয় জর্জ্জের ইংলণ্ডেও গ্যাস্‌ল্যাম্প্‌ ও ইলেক্‌ট্রিক্‌ ষ্টোভের সন্ধান পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরো আবিষ্কার করেছেন যে, শেলী ছিলেন ব্যারণ্‌ পৌত্র। আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা কিন্তু শেলীর পিতামহকে এতদিন একজন সামান্য ব্যারনেট্‌ ব'লেই ধ'রে রেখেছিলো। তবে এ-বিশ্বাস ভুল হওয়াই সম্ভব, কারণ সেকালের ভূগোলে সারপেণ্টাইনের পরিচয়ে নদীত্বের কোনো উল্লেখ থাকতো না; আমাদের অর্দ্ধ-শিক্ষিত গুরুমশাইদের ধারণা ছিলো যে, ওটি লণ্ডনের একটি ঝিল মাত্র। এই ধরণের গুটিকয়েক মৌলিক গবেষণা ছাড়া, ডরি লেন, অলিম্পাস, জ্যত্তোর মতো চিরাভ্যস্ত নামগুলির সংস্কার ক'রে নিয়ে, ও-গুলির স্থলে ডুরি লেন, অলিম্পিয়াস, গিওতো ইত্যাদির প্রবর্ত্তনেও নৃপেন্দ্রবাবুর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও প্রগাঢ় ইংরেজি-জ্ঞানের বিজ্ঞাপন আছে। হ্যাঁ, বইখানি নতুন বটে, এমন কি এর ভাষাও কল্পনাতীত। এমন অপূর্ব্ব রচনারীতি আর কোথাও লক্ষ্য করেছি ব'লে মনে পড়ে না। শুনেছি আধুনিক বাঙলা সংস্কৃত-ব্যাকরণের দাসত্ব করতে আর রাজি নয়। কিন্তু স্বরাজসাধনার অভিব্যক্তি হিসেবে লট্‌-লোট্‌-লঙ্‌-বিধিলিঙের এই অদ্ভুত ও অলজ্জ সংমিশ্রণ প্রশংসনীয় হ'লেও, "স্তিমিত কম্পন", "বেপথু তনুলতা", "অবিবাহিত দম্পতী," "কথার জীবন-প্রয়োগ", "রস-বুভুক্ষিত শতাব্দী", "সংযমের বাধ্যবাধকতা দিয়া যৌবনের দীপ্ত শিখাকে মেদুর" ক'রে তোলা, "সুন্দরের পূজায় রক্তপদ্মের মত হৃদয়-আহুতি" দেওয়া, "তৃষ্ণায় আতুর কৃষ্ণচক্ষের পল্লবে পল্লবে শ্রান্ত যৌবনের নিদ্রা" ইত্যাদি রোমহর্ষক পদবিন্যাসও কি ওই মুমুক্ষার পরিচায়ক? বেচারা শেলী! জীবন ও কাব্যের সীমাসন্ধি উপেক্ষা করা মহাপাতক বটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তেও তো একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২ দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

"পরিচয়ের" আদর্শ প্রথম সংখ্যার মুখপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪।০, প্রতি সংখ্যা ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার।

প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

ঠিকানা ও ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "পরিচয়",
রুম নং ১৭, ষ্টিফেন হাউস,
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৩৯

পরিচয়

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

২

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদের আলোচনা করিতেছিলাম। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছিলাম যে, পরমাত্মা (ব্রহ্ম) অংশী—আর প্রত্যগাত্মা (Monad) তাঁহার অংশ—পরমাত্মা চিদাকাশ, প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

এই অংশ (চিৎকণ প্রত্যগাত্মা) চিদ্‌ঘন পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যাবহারিক ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য দহরকোশরূপ 'হৃদাকাশময়' দেহ গ্রহণ করতঃ 'দেহী' হন।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ—শ্বেত, ৩।১৮

দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা, হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়

—শঙ্কর

আমরা আরও দেখিয়াছিলাম, চিন্মাত্র 'দেহী' জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ ব্যঞ্জিত করিবার জন্য ত্রিবিধ শরীর গ্রহণ করেন। তখন (বেদান্ত-পরিভাষায়) তাঁহার নাম হয়—প্রাজ্ঞ আত্মা, তৈজস আত্মা ও শারীর আত্মা। স্থূলভুক্ স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'শারীর', সূক্ষ্মভুক্ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'তৈজস', এবং আনন্দভুক্ কারণশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'প্রাজ্ঞ'।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

অতএব এ সম্পর্কে শরীরই মূলাধার।

মৃত্যু ও উৎক্রান্তি

'শরীর' অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। শরীর জীর্ণ হইলে জীব কি করে? বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় (গীতা)—জীর্ণ বাসের মত সেই জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে। এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

স যত্রায়ম্ অণিমানং ন্যেতি জরয়া বা উপতপতা বা অণিমানং নিগচ্ছতি, তদ্ যথা আম্রং বা উডুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ —বৃহ, ৪।৩।৩৬

'এই শরীর যখন জরাবশতঃ শীর্ণ হয় বা ব্যাধি জন্য জীর্ণ হয়, তখন (পক্ক) আম্র বা ডুমুর বা অশ্বত্থ ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (জীব) এই সমুদায় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হয়' এবং 'ভারাক্রান্ত শকট যেমন সশব্দে গমন করে, তেমনি "শারীর আত্মা" উর্দ্ধশ্বাসী হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে।'

তদ্ যথা অনঃ সুসমাহিতম্ উৎসর্জৎ যায়াৎ, এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন যাতি, যত্রৈতদ্ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩৫

ইহাকেই বলে মৃত্যু।—কিন্তু দেহই মরে, দেহী (জীব) মরে না— জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে। All of me does not die

জীব দেহ ছাড়িয়া গেলে, জীবাপেত শরীর স্ফীত হইয়া, আধ্মাত (inflated) হইয়া, সাপের খোলসের মত পড়িয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়,

স উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি আধ্মাতো মৃতঃ শেতে—বৃহ, ২।৩।১১

তদ্ যথা অহি-নির্ব্বয়ণী (সর্প-নির্মোক) বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতে—বৃহ, ৪।৪।৭

কিন্তু জীব ? অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব (বৃহ, ৪।৪।৭)—সে যে অমৃত, সে প্রাণ, সে ব্রহ্ম, সে তেজঃ—সে তো শরীর নহে।

মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়শক্তির কি অবস্থা ঘটে ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, তাহারা এতদিন বহির্মুখ ছিল, এখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ হয়—স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে (বৃহ ৪।৪।১)।

'তখন আত্মা যেন সংমোহ প্রাপ্ত হয় এবং এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়শক্তি) তাহার অভিমুখে সমাগত হইয়া হৃদয়ে সম্ভৃত হয়।'

স যত্রায়ম্ আত্মা অবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেতি, অথ এনম্ ইমে প্রাণা অভিসমায়ন্তি। স এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেব অন্ববক্রামতি—বৃহ, ৪।৪।১ *

সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া যায়।

একীভবতি ন পশ্যতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন শৃণোতি ইত্যাহুঃ,

---

* আর্ত্তভাগের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলিয়াছেন—যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উৎ অস্মাৎ প্রাণা ক্রামন্তি আহো নেতি ? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—বৃহ, ৩।২।১১। কারণ, প্রাণ-সমূহ যখন পুরুষে সমবেত হয়, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র উৎক্রমণ হইবে কিরূপে ?

একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ—বৃহ, ৪।৪।২

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মার সহিত একীভূত হওয়ায়, দর্শন শ্রবণ স্পর্শন বচন স্বাদন ঘ্রাণন মনন বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার স্থগিত হইয়া যায়।

কৌষীতকী-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,

যত্রৈতৎ পুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্ অবল্যং ন্যেত্য মোহং ন্যেতি, তদাহুঃ উদক্রমীৎ চিত্তং, ন পশ্যতি, ন শৃণোতি, ন বাচা বদতি। অথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি; তদা এনং বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি ইত্যাদি—৩।৩-৪

এ ঘটনা আমাদের সুপরিচিত, কারণ প্রতি রাত্রে নিদ্রাকালে এইরূপই ঘটে; তখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মায় উপসংহৃত হয়।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তঃ অভূৎ, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় * * তানি যদা গৃহ্লাতি অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম। তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি, গৃহীতা বাক্, গৃহীতং চক্ষুঃ, গৃহীতং শ্রোত্রং, গৃহীতং মনঃ—বৃহ, ২।১।১৭

অর্থাৎ নিদ্রার সময়, বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞান দ্বারা প্রাণ-সমূহের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। তখন ঘ্রাণ গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মনঃ গৃহীত হয়।

ছান্দোগ্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,

স যদা স্বপিতি, প্রাণমেব বাক্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ; প্রাণো হ্যেব এতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্ক্তে—৪।৩।৩

ইহা সুপ্তির বর্ণনা। জাগ্রত হইলে কি হয়?

স যদা প্রতিবুধ্যতে অস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিতিষ্ঠন্তে

—কৌষীতকী, ৩।৩

—'তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিসকল স্ব-স্ব আয়তনে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়'। বৃহদারণ্যক এই কথাই বলিয়াছেন—অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

কিন্তু আমরা মৃত্যুর কথা বলিতেছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, রাজার প্রত্যাগমনের কালে সূত, গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি যেমন তাঁহার চৌদিকে সমবেত হয়, তেমনি অন্তকালে ইন্দ্রিয়শক্তি (প্রাণসমূহ) আত্মাতে সম্ভৃত হয়।

তদ্ যথা রাজানং প্রযিযাসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি, এবমেব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩৮

তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয় এবং সেই দীপ্তিতে আত্মা শরীর হইতে চক্ষুঃদ্বারে, মূর্দ্ধাদ্বারে, বা অন্য দ্বারে উৎক্রমণ করেন। ইহাকেই বলে 'উৎক্রান্তি'।*

---

* স যাবৎ অস্মাৎ শরীরাৎ অনুৎক্রান্তো ভবতি, তাবৎ জানাতি—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৪

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রমতি, চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৪।২

বলা বাহুল্য, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, দেহের নাশে দেহীর নাশ হয় না। উৎক্রান্ত জীবের সঙ্গে কি গমন করে? তম্ উৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি * * তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ—বৃহ, ৪।৪।২—'উৎক্রান্ত জীবের অনুগমন করে—তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি (যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশিত ছিল) আর বিদ্যা ও কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা'। পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থে ইহজন্মে সঞ্চিত সংস্কার বা 'বাসনা' (traces, vestiges) —বুদ্ধদেব যাহাকে 'সঙ্খার' বলিয়াছেন—অনেক জাতি সঙ্খারং (জন্মেজন্মে সঞ্চিত সংস্কার)। সাংখ্য মত ইহার অনুবর্ত্তী।

তথা অশেষসংস্কারাধারত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৪২

ঐ অশেষ সংস্কারের আধার বলিয়াই জীবের চিত্ত Tabula Rasa নহে; উহা 'অসংখ্যেয় বাসনাভিঃ চিত্রম্ (যোগসূত্র, ৪।২৩)।

সংস্কার ছাড়া আর কি সঙ্গে যায়? বিদ্যা-কর্ম্মণী। বিদ্যা অর্থে ইহজন্মে উপার্জ্জিত জ্ঞান (Knowledge) আর কর্ম্ম—Work।

এই কর্ম্মের উপর যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষ 'ঝোক' দিয়াছেন। আর্ত্তভাগ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—মৃত পুরুষ কোথায় থাকে?—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন্ 'হে সোম্য! সজনে ইহা আলোচ্য নহে—উঠিয়া আইস, নির্জ্জনে আলাপ করিব।'

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে, তৌ হ যদ্ উচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদ্ উচতুঃ, অথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ—বৃহ, ৩।২।১৩

'তাঁহারা নিভৃতে যে আলাপ করিলেন, তাহা 'কর্ম্ম' সম্বন্ধে, তাঁহারা যাহার প্রশংসা করিলেন তাহা 'কর্ম্মের'ই।'

এ কর্ম্ম কেবল চেষ্টা (Action) মাত্র নহে—ভাবনা (Thought), কামনা (Desire), ও চেষ্টা (Action) সমস্তই। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন,

অথো খলু আহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদ্ অভিসম্পদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'পুরুষকে "কামময়" বলে। সে যেমন কামনাযুক্ত হয়, সেইমত তাহার ভাবনা (ক্রতু) হয়; যেমন ভাবনাযুক্ত হয়, সে সেইমত কর্ম্ম করে। সে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার অনুরূপ ফল পায়।'

কারণ, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩ —'লোকে পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, এবং পাপ কর্ম্মের ফলে পাপী হয়।'

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যেপ্রকার কার্য্য করে, আচরণ করে, সে সেই প্রকার হয় ; সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয় ; পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপের ফলে পাপী হয়।'

সুকৃত দুষ্কৃতের ইহাই সাধারণ ফল—As you sow, so shall you reap।

জীবের পরলোকগতি

ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া জীব পরলোকে গমন করে ; সেখানে 'আবসতে'র (environment) অনুযায়ী, তাহার নবতর কল্যাণতর রূপ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন,

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ 'যেমন জোঁক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেইমত এই আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া, অচেতন করাইয়া, অন্য দেহ গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত এই আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী, কিম্বা অন্য লোকের উপযোগী শরীর।'

এই যে জীব উৎক্রান্তির পর উচ্চাবচ ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করতঃ সেই সেই লোকের উপযোগী রূপ গ্রহণ করে, সেই তারতম্যের হেতু কি ? হেতু 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ (কঠ, ৫।৭)—যাহার যেমন কর্ম্ম, যাহার যেমন বিদ্যা।—এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্ (কৌষী, ১।২)। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'বিদ্যাকর্ম্মণী পূর্ব্ব প্রজ্ঞাচ'। এই তরতম্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র সাধারণভাবে বলিয়াছেন—কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ। ইহারই উপর পিতৃযান ও দেবযানের ভেদ প্রতিষ্ঠিত (গীতা যাহাকে কৃষ্ণা ও শুক্লা গতি বলিয়াছেন এবং যাহার সবিশেষ বিবরণ বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে)। কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যাহার যেমন অধিকার, তাহার সেইরূপ গতি হয়। যে নিম্নলোকের অধিকারী—যাহাকে অধঃত্রিলোকী বলা

হয় (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) সে নিম্নলোকে যায়—আর যে উচ্চলোকের অধিকারী—যাহাকে ঊর্দ্ধত্রিলোকী বলা হয় (মহর্লোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক) সে উচ্চলোকে যায়। সেইজন্য কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ ও বিদ্যয়া দেবলোকঃ।—আর যিনি উচ্চতম অধিকারী—মুণ্ডক যাঁহাকে 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিয়ম—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্
তং তং লোকং জয়তে তান্ চ কামান্।—মুণ্ডক ৩।১।১০

জীবের জন্মান্তর

এই সকল লোকে জীবের স্থিতি কি চিরস্থায়ী? যাজ্ঞবল্ক্য Eternal Heaven বা Hell স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥—বৃহ, ৪।৪।৬

'ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হইলে, জীব পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আসে—কর্ম্মণে—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য।' এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

এবমেবায়ং পুরুষঃ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি প্রাণায়—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'জীব এই দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া (পরলোকে ফলভোগের পর) বিলোম গতিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আইসে 'প্রাণায়'—নূতন প্রাণলাভ করিবার নিমিত্ত।' ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা (৫।১০।৫) অর্থাৎ জীবের তাবৎ পরলোকে স্থিতি, যাবৎ না কর্ম্মের ক্ষয় হয়—তার পর জন্মান্তর। কিন্তু (যাজ্ঞবল্ক্য বলেন) এ সমস্তই সকাম ব্যক্তির পক্ষে - ইতি নু কাময়মানঃ (৪।৪।৬); পরন্তু যে নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম? ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

যিনি পরমাত্মার সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি কিসের ইচ্ছায় কোন কামনায় এই শরীরে সন্তপ্ত হইবেন?

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শেষ কথা জীবের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির বিবরণ। ঐ বিবরণ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ আরও

উজ্জ্বল হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এই তিন অবস্থাকে অন্ত বা স্থান বলিয়াছেন।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ—ইদং চ পরলোকস্থানং চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি ইদং চ পরলোক স্থানং চ—বৃহ, ৪।৩।৯

স্বপ্নান্তং:জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি—কঠ, ২।৪

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা আমাদের সুপরিচিত। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ইহাকে Brain Consciousness বলে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সহযোগে শব্দাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ হয়। 'সর্ব্বসার'-উপনিষদ্ ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

মন আদি চতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈঃ আদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মনো জাগরণম্। That is, 'when it enjoys the world of 'material' objects.' কৈবল্য উপনিষদের ভাষায়, স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা, শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রী-অন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি—১২। 'জীব মায়ামোহিত হইয়া শরীর গ্রহণ করতঃ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং জাগ্রৎ অবস্থায় স্ত্রী-অন্ন-পানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে।'

এ অবস্থায় জীব 'প্রবুদ্ধ' থাকে—সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্যের পরিভাষায় ইহার নাম 'বুদ্ধান্ত'। স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩।১৭। মাণ্ডুক্য-উপনিষদ্ ইহাকে 'জাগরিত-স্থান' বলিয়াছেন। জাগরিত-স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ * * স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবের সংজ্ঞা 'বৈশ্বানর', যেহেতু বিশ্ব নরের স্থূলভোগ অভিন্ন ('Perhaps because all men in their waking hours have a world in common')।

জীবের স্বপ্নাবস্থা

জীব সুপ্ত হইলে, জাগরণের সময়ে অনুভূত ইহলোক অতিক্রম করে।

স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্ অতিক্রামতি—বৃহ, ৪।৩।৭

এই অবস্থা যাজ্ঞবল্ক্যের স্বপ্নান্ত বা স্বপ্নস্থান। জীব বুদ্ধান্ত হইতে স্বপ্নান্তে এবং স্বপ্নান্ত হইতে বুদ্ধান্তে সঞ্চরণ করে—জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নাবস্থায় এবং স্বপ্ন হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় গতাগতি করে—alternates between waking and dreaming।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব। * * * স বা এষ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নান্তায় এব—বৃহ, ৪।৩।১৬, ১৭

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যে জীবের এই গতি ও আগতি যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসংচরতি পূর্ব্বং চ অপরং চ, এবমেবায়ং পুরুষ এতৌ উভৌ অন্তৌ অনুসংচরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ—বৃহ, ৪।৩।১৮

'মহামৎস্য যেমন নদীর ঐ পার ও এই পার উভয় পারেই সংচরণ করে, তেমনি এই পুরুষ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত এই উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করে।'

সর্ব্বসার-উপনিষৎ স্বপ্নাবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

তদ্বাসনাসহিতৈঃ চতুঃকরণৈঃ (অর্থাৎ মনঃ বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার) শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মনঃ স্বপ্নম্। 'যে অবস্থায় স্থূল-ইন্দ্রিয় ব্যতীত তাহাদিগের 'বাসনা' (সংস্কার) মাত্র গ্রহণ করিয়া* জীব, মনঃ বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের অভাবেও বাসনাময় শব্দাদি উপভোগ করে, তাহাই জীবের স্বপ্নাবস্থা।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই মনোজ্ঞতর ভাষায় বলিয়াছেন—

ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্র আনন্দা মুদঃ প্রমুদঃ ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্তো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে। স হি কর্ত্তা। —বৃহ, ৪।৩।১০

'সে অবস্থায় রথ নাই, রথের বাহন নাই, পথ নাই—অথচ রথ, রথের বাহন, পথ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় আনন্দ মোদ প্রমোদ কিছুই নাই—অথচ আনন্দ মোদ প্রমোদ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় তড়াগ পুষ্করিণী নদী কিছুই নাই—অথচ তড়াগ পুষ্করিণী নদী সৃষ্টি করে। তিনিই কারক (কর্ত্তা)।'

এ সমুদায়ই বাসনার সৃষ্টি, কামনার রচনা। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ—কঠ, ৫।৮

স তত্র পর্য্যেতি—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩

'সে সেখানে যথেচ্ছ বিহরণ করে—ভোজন করে, ক্রীড়া করে, রমণ করে—স্ত্রীদিগের সহিত, যানের সহিত, জ্ঞাতিদিগের সহিত—শরীররূপ উপসর্গের কথা বিস্মৃত হইয়া।'

ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচম্ ঈয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো
জক্ষদ্ উতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্॥— বৃহ ৪।৩।১৩

* স্বপ্নের সময় স্থূল দশেন্দ্রিয় মনে একীভূত হয়। তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনসি একীভবতি। সেই জন্য নিদ্রাবস্থায় তাহাদের ব্যাপার স্তম্ভিত থাকে। তেন তর্হি এষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে—স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে—প্রশ্ন, ৪।২

'স্বপ্নাবস্থায় এই দেব (জীব) 'উচ্চাবচ'* প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রূপ সৃষ্টি করে—কখন রমণীর সহিত আমোদ করে, কখন ভোজন করে, কখন বা ভয় দর্শন করে।' এই ভয় দর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি (বৃহ, ৪।৩।২০)

'স্বপ্নে জীব মনে করে, যেন কেহ তাহাকে হত্যা করিতেছে, যেন বন্দী করিতেছে, যেন হস্তী তাহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে, যেন সে গর্ত্তে পতিত হইতেছে।' ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঃ—

ঘ্নন্তি ত্বিব এনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি অপি রোদিতীব—৮।১০।২

'যেন কে হত্যা করে, যেন বিদ্রুত হয়, যেন অপ্রিয়ভোগী হয়, যেন রোদন করে।

এই 'ইব' (যেন—As it were) লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ স্বপ্ন মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র—যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ (গৌড়পাদ)। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্যে বলিয়াছেন ঃ—

তথা বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, বিদ্রাবয়ন্তি ইব, তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তং অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি। অপি চ স্বয়মপি রোদিতি ইব। ননু অপ্রিয়ং বেত্তি এব কথং বেত্তা ইব ইতি? উচ্যতে নামৃতাভয়ত্ব বচনানুপপত্তে; 'ধ্যায়তি ইব' ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।

শঙ্কর এ স্থলে শ্রুতি বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধৃত করিলেন—'ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব'—'যেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে।'

অনেক সময় স্বপ্ন জাগ্রতেরই ছায়া মাত্র—যদেব জাগ্রদ্ ভয়ং পশ্যতি, তদ্ অত্র অবিদ্যয়া মন্যতে (বৃহ, ৪।৩।২০)।

অথো খলু আহুঃ জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি—যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইতি (বৃহ, ৪।৩।১৪)—'কেহ কেহ বলেন—এই (স্বপ্নদেশ) জাগরিতদেশই। (জীব) জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই দেখে।'

কিন্তু আবার অনেক সময় জাগ্রৎ অবস্থায় অননুভূত বিষয়েরও স্বপ্নে অনুভূতি হয়।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টম্ অনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থম্ অনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি। দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ অশ্রুতং চ, অনুভূতং চ অননুভূতং চ, সৎ চ অসৎ চ, সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি – প্রশ্ন, ৪।৬

'এই অবস্থায় সেই দেব মহিমা (বৈচিত্র্য) অনুভব করে। পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় আবার দর্শন করে, পূর্ব্বশ্রুতবিষয় আবার শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে অনুভূত বিষয় আবার অনুভব করে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ—সমস্ত হইয়া সমস্ত দর্শন করে।'

স্বপ্নাবস্থায় জীব কোথায় অবস্থান করে? কখনও ইন্দ্রিয়গণকে

* এই উচ্চাবচের কথা (অবচ=নিম্ন বা অধঃ)—আমরা অন্যত্রও শুনিতে পাই ঃ—স যত্রৈতৎ স্বপ্নায়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবতি উতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি।—বৃহ, ২।১।১৮

স্ববশে রাখিয়া শরীরের অভ্যন্তরেই বিচরণ করে—

স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেত এবমেব এষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে—বৃহ, ২।১।১৮

আবার কখন বা সূক্ষ্ম উপাধির সহযোগে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে কামনার বস্তু, সেখানে উপনীত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—তং নায়তং বোধয়েৎ—'সুপ্তকে সহসা প্রবুদ্ধ করা উচিত নয়।' কেন? দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যম্ এষ ন প্রতিপদ্যতে (৪।৩।১৪)—কারণ, '(ঐ স্থলে) জীব যদি দেহে ঠিক্ প্রত্যাগমন না করে, তবে দুশ্চিকিৎস্য হয়।' আরও

প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ং
বহিঃ কুলায়াদ্ অমৃতঃ চরিত্বা।
স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামং
হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥—বৃহ, ৪।৩।১২

'সেই অমৃত (জীব) এই অবর কুলায় (শরীররূপ নীড়কে) প্রাণের দ্বারা রক্ষা করতঃ নিজ কুলায়ের বহির্দ্দেশে গমন করিয়া যেখানে কামনার বস্তু, সেই হিরণ্ময় পুরুষ একহংস সেখানে বিচরণ করেন।'

'প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ম্'*—সেই জন্য 'কানি অস্মিন্ জাগ্রতি? সুপ্তির সময় কে জাগরিত থাকে?' ইহার উত্তরে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'প্রাণাগ্নয় এব অস্মিন্ পুরে জাগ্রতি (প্রশ্ন, ৪।৩)—এই পুরে প্রাণাগ্নিই জাগ্রৎ থাকে।'

এই স্বপ্নাবস্থ জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডুক্য বলিতেছেন—

স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ * * * প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয় পাদঃ।

স্বপ্নাবস্থায় জীবের সংজ্ঞা 'তৈজস' কেন? বোধ হয় স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষের যে তেজঃ (স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা—বৃহ, ৪।৩।৯) সেই তেজঃ দ্বারা উজ্জ্বলিত হয় বলিয়া।

পাশ্চাত্য New Psychology-র (মনোবিজ্ঞানের নূতন ধারার) সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা দেখিবেন, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে—বিশেষতঃ নিদ্রা ও স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদিগের অভিনব সিদ্ধান্তের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। †

---

* এই প্রাণ Vitalistদিগের Life Force বা জীবন শক্তি। অধ্যাপক হ্যারিশ, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এই জীবনশক্তি Physical Forces বা ভৌতিকশক্তি হইতে ভিন্ন জাতীয়।

† এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অধুনা আবিষ্কৃত Subliminal Consciousnessকে সবিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। Each of us is only a partial incarnation of a larger self × × Besides the consciousness of the ordinary field (অর্থাৎ Brain consciousness) there is a consciousness existing beyond the field—that is extra-marjinally and outside of the

জীবের সুষুপ্তি অবস্থা

সুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন তাহাকে সুষুপ্তি বলে। সে অবস্থায় কি হয়? অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, তদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯

'যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, তখন কোনকিছু জানে না।' এই অবস্থার বর্ণন করিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

তদ্ যথা অস্মিন্ আকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায় এব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি—বৃহ, ৪।৩।১৯

'যেমন শ্যেন বা বাজপক্ষী ঐ আকাশে বিহরণ করতঃ শ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় সংকুচিত করতঃ নিজ নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি এই পুরুষ সেই অন্তের প্রতি ধাবিত হন, সেখানে সুপ্ত হইয়া কোনও কামনা করেন না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করেন না।'

সর্ব্বসার-উপনিষদে এ অবস্থার বর্ণনা এইরূপ—

চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্ বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্ নোপলভতে তদ্ আত্মনঃ সুষুপ্তম্। 'যখন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের উপরমের (quiescence) ফলে বিশেষবিজ্ঞানের অভাববশতঃ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি হয় না—তাহাই আত্মার সুষুপ্তি।'

এই সুষুপ্তি-অবস্থাস্থিত জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডুক্য বলিয়াছেন—

সুষুপ্তস্থান একীভূত প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সুষুপ্তি অবস্থায় জীব বিষয়-বিগমে একীভূত হয়—তখন তাহার সংজ্ঞা প্রাজ্ঞ, যেহেতু সে তখন প্রজ্ঞানঘন, বিপশ্চিৎ † (all-knowing)।

অতএব জীবের তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। কিন্তু তাহা হইলেও জীব এক, তিন নহে—তিনে এক—Unity in Trinity।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু—ব্রহ্মবিন্দু, ১১

ঐ সুষুপ্তিকে যাজ্ঞবল্ক্য 'সংপ্রসাদ' বলিয়াছেন।

স বা এষ এতস্মিন্ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩

ছান্দোগ্যে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

তৎ যত্রৈতৎ সুপ্ত সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি—৮।১১।১ ও ৮।৬।৩

এমন কি ছান্দোগ্য এই সংপ্রসন্ন-অবস্থাস্থিত জীবের নাম দিয়াছেন 'সংপ্রসাদ'।

অথ য এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪, ৮।১২।৩

'সংপ্রসাদ' এ অবস্থাস্থ জীবের সার্থক নাম, কারণ, (যাজ্ঞবল্ক্যের

---

primary consciousness × × There are uprushes into the ordinary consciousness of energies originating in the subliminal parts of the mind See James's Varieties of Religious Experiences pp 233 & 234

† ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

ভাষায়) তীর্ণোহি তদা সর্ব্বান্ লোকান্ হৃদয়স্ত ভবতি (বৃহ ৪।৩।২২)—তখন জীব হৃদয়ের সমুদায় শোক উত্তীর্ণ হয়।

সুষুপ্তিতে জীবের 'স্থান'

সুষুপ্তির সময় জীব কোথায় অবস্থান করে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

তা বা অস্য এতা হিতা নাম নাড্যঃ, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ তাবতা অণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা—বৃহ, ৪।৩।২০

'ইহার হিতা নামক নাড়ীসমূহ আছে, যাহারা সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশের তুল্য এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ, লোহিতে পূর্ণ।' অন্যত্র বৃহদারণ্যক এই হিতা নাড়ীর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভি প্রতিষ্ঠন্তে। তাভিঃ প্রত্যবসৃত্য পুরীততি শেতে—বৃহ, ২।১।১৯

'হিতা নামক যে ৭২০০০ নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ (Pericardium)-অভিমুখে নির্গত হইয়াছে, ঐ নাড়ী বাহিয়া (জীব) পুরীততে শয়ন করে।' এই নাড়ী কি স্থূল শরীরের শিরা বা ধমনী এবং 'পুরীতৎ' কি স্থূল Pericardium? ছান্দোগ্যের বিবরণ হইতে এই অন্ধকারে আলোকপাত হয়। ছান্দোগ্য বলেন ঃ—

তা বা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাঃ পিঙ্গলস্য অণিম্নঃ তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষ শুক্লঃ এষ নীলঃ এষ পীতঃ এষ লোহিতঃ × × × এতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ × × অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ—ছান্দোগ্য, ৮।৬।১২

'এই যে হৃদয়ের নাড়ী (বৃহদারণ্যক যাহাকে 'হিতা' নাম দিয়াছেন), তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত অণিমায় (essence এ) পূর্ণ। ঐ যে আদিত্য, তাহা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত। সেই আদিত্য রশ্মি আদিত্য হইতে প্রসৃত হইয়া এই সকল ('হিতা') নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।'

সুষুপ্তির সময় জীব যখন সংহত, সংপ্রসন্ন হয়, তখন সে ঐ সকল নাড়ীতে প্রবেশ করে।

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি—ছান্দোগ্য ৮।৬।৩

কৌষীতকী ঐ 'হিতা' নাড়ীর বর্ণন করিয়া (হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যঃ হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি) এবং তাহারা সহস্রধা বিপাটিত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, একথা বলিয়া বলিতেছেন—

তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কশ্চন পশ্যতি—৪।১৯

'জীব সুষুপ্ত হইয়া স্বপ্নের ব্যতীত হইলে ঐ সকল নাড়ীতে বিশ্রান্ত হয়।' তখন কি হয়?

তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি, তেজসা হি তদা সংপন্নো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৩

'সে অবস্থায় কোন পাপ (evil) তাহাকে স্পর্শ করে না। সে তখন তেজের সহিত সংপন্ন হয়।' প্রশ্ন-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা তেজসা অভিভূতো ভবতি, অথ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি—৪।৬

'সে যখন তেজঃ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন সেই দেব স্বপ্ন দর্শন করে না।' এই 'তেজঃ' কি? শঙ্কর বলেন—সেই আদিত্যরশ্মি, যাহা হিতা নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।

সৌরেণ পিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতঃ অভিভূতো ভবতি (৪।৬ প্রশ্ন ভাষ্য)
যদা এবং সুপ্তঃ, সৌরেণ তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্ব্বতঃ সংপন্নো ব্যাপ্তো ভবতি—(৮।৬।৩ ছান্দোগ্য ভাষ্য)।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকের উক্তি স্মরণীয়।

যত্র এষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ × × য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ (আত্মা) অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ, সেই আকাশে শয়িত হন। (এই 'আকাশ' কি? এ কথার আমরা গত বারে আলোচনা করিয়াছি।) অতএব হিতা নাড়ী যে স্থূল শরীরের ধমনী বা শিরা নহে এবং পুরীতৎ যে মাংসপেশী Pericardium নহে—ইহা একরূপ নিঃসংশয়।

তুরীয়ে জীবের ব্রহ্ম-সাযুজ্য

সুষুপ্তি যখন নিবিড়তর হয়, সে অবস্থার বর্ণন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ, ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

'যেমন প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য-অন্তর কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তেমনি এই পুরুষ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা * কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানেন না।'

আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ জাগ্রৎ, দ্বিতীয় স্বপ্ন, এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নের উপর তৃতীয় অবস্থা সুষুপ্তি। সাধারণ সুষুপ্তি হইতে এই নিবিড়তর

* যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন, আমাদের 'শারীর' আত্মা (Corporeal self) ঐ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা কর্ত্তৃক অন্বারূঢ—এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢঃ (বৃহ, ৪।৩।৩৫)। ইহার সহিত কৌষীতকী, ৪।১৯ তুলনীয়। তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ × × এবমেব এষ প্রজ্ঞ আত্মা ইদং শারীরম্ আত্মানম্ অনুপ্রবিষ্টঃ আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ।

সুষুপ্তির প্রভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোন কোন উপনিষদ্ ইহাকে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা বলিয়াছেন।

অবস্থাত্রয় ভাবাভাবসাক্ষী * * নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যুচ্যতে।—সর্ব্বসার

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং * * প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য

নৃসিংহ-উত্তরতাপনীতে এই চারি অবস্থার নাম—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ এই চারি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

চাক্ষুষঃ স্বপ্নচারী চ সুপ্তঃ সুপ্তাৎ পরশ্চ যঃ।
ভেদাশ্চৈতেঽস্য চত্বারঃ তেভ্যঃ তুর্য্যং মহত্তরম্॥

'জীবের অবস্থার এই চারি ভেদ—চাক্ষুষ (শারীর বা জাগ্রৎ), স্বপ্নচারী, সুষুপ্ত এবং সুষুপ্তের পর। ইহার মধ্যে তুর্য্য বা চতুর্থই মহত্তর।' কেন মহত্তর? ইহার উত্তরে মৈত্রায়ণ বলেন—ত্রিষ্বেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম, ত্রিপাৎ চরতি উত্তরে—কারণ, 'প্রথম তিন অবস্থায় ব্রহ্মের একপাদ (one quarter) মাত্র প্রকাশিত কিন্তু এই তুরীয়ে তিন পাদ'।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে জীব প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হওয়াতে বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না। অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মার একাকার অনুভূতি হয়।

অস্মিন্ প্রাণে † এব একধা ভবতি—কৌষী, ৩।৩

কারণ, তখন—

সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি—স্বম্ অপীতো ভবতি। তস্মাৎ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১

'প্রগাঢ় নিদ্রায় জীব 'সতে'র সহিত (Pure Being-এর সহিত) একীভূত হয়, 'স্ব'তে অপীত (স্থিত) হয়। সেইজন্য লোকে বলে 'স্বপিতি'।'

এই কথার সমর্থন করিয়া ছান্দোগ্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'সেই সম্প্রসাদ (সুষুপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে (ব্রহ্মে) উপসন্ন হইয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হয়।' ইহাই পতঞ্জলির যোগ—তদা (অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তি নিরোধে) দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্।

---

† এই প্রাণ Vitalist এর Life নহে—ইহা অজর অমৃত 'প্রজ্ঞ' আত্মা—স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ (কৌষী, ১।৮)

ঐ অবস্থার বিবরণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস (পঞ্চম জাতি) অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

অর্থাৎ তখন সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—All distinctions are obliterated—ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং, সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করে আমিই এই বিশ্ব। ইহাই তাহার পরম অবস্থা। অর্থাৎ (অধ্যাপক ডয়সনের ভাষায়),

'It is the condition of deep sleep, in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore *without objects to contemplate* and consequently *without individual* consciousness,'

এ অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িকভাবে অদ্বৈতে অবস্থিতি হয়।* যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। ন হি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ। যদ্ বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে। নহি রসয়তুঃ রসয়তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ রসয়েৎ। যদ্ বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি। নহি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ বদেৎ। যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃন্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি। ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ। যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে। ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত। যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি। নহি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ। যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন

*The transition is described from the dream consciousness to the consciousness of deep sleep—from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all whereby subject and object become one—Deussen p 142

বিজানাতি। ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ৪।৩।২০-৩০

'ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না—দর্শন সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না বটে, কারণ উহা অবিনাশী—কিন্তু যখন বিভিন্ন দ্বিতীয় থাকে না, তখন কি দর্শন করিবেন ?

'ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না—আঘ্রাণ সত্ত্বেও আঘ্রাণ করেন না। ঘ্রাতার ঘ্রাণ বিলুপ্ত হয় না বটে, কারণ উহা অবিনাশী—কিন্তু যখন বিভিন্ন দ্বিতীয় থাকে না তখন কি আঘ্রাণ করিবেন ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু দর্শন ও ঘ্রাণ নহে—রসন, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিচারণ প্রভৃতি প্রত্যেক বৃত্তি ও ব্যাপার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ একই উপদেশ। আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

কিন্তু সেই গভীর সুষুপ্তিতে—যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীর ভেদ তিরোহিত হইয়া একাকার অবস্থা হয়—তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, স্পর্শন করিবে, রসন করিবে, ঘ্রাণন করিবে, মনন করিবে, বিচারণ করিবে ?

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৭।৩।৩১

'যে স্থলে যেন অন্য থাকে সেই স্থলেই একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে ঘ্রাণন করে, একে অপরকে স্বাদন করে, একে অপরকে বচন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শন করে, একে অপরকে বিচারণ করে।'

তাই যাজ্ঞবল্ক্য ঐ নিবিড়-সুষুপ্ত জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (৪।৩।৩২)—He becomes the pure objectless knowing Subject।

সর্ব্বসার-উপনিষদ্ এ অবস্থার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

অবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে। অর্থাৎ 'the spiritual subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things।'

মাণ্ডূক্য-উপনিষদের বর্ণনা আরও গভীর—

নান্তপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য, ৭

'(সে অবস্থায়) প্রজ্ঞা বহির্মুখও নহে, অন্তর্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; (তখন) আত্মা প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন—তিনি অ-দৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষ্য, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য—একাত্ম-প্রত্যয়সার (founded solely on the assurance of its own self) প্রপঞ্চাতীত (effacing the entire universe), শান্ত, শিব, অ-দ্বৈত। তাঁহাকে চতুর্থ (তুরীয়) বলা হয়।'

এই গভীর সুষুপ্তি বা তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্মের সহিত জীবের যে সাময়িক একীভাব হয়—সতা তদা সংপন্নো ভবতি—যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট ইহাকেই 'ব্রহ্মলোক' বলিয়াছেন।

এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্ ইতি হৈনম্ অনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন যে, এ স্থলে ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মের লোক (ব্রহ্মণঃ লোকঃ) নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ। ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে আমরা ইহারই সমর্থন পাই। প্রজাপতি বলিলেন, ঐ যে 'সমস্ত, সংপ্রসন্ন' জীব—উনিই আত্মা, উনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম—এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি—ছা, ৮।১১।১।

অন্যত্র ছান্দোগ্য ঐ 'সংপ্রসন্ন' জীবের অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।—৮।৩।২

'যেমন ক্ষেত্রে নিহিত হিরণ্যনিধির (hidden treasure) উপর প্রতিদিন সঞ্চরণ করিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান জানে না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (creatures) প্রতিদিন (সুষুপ্তিতে) 'ব্রহ্মলোকে' প্রবেশ করিলেও ব্রহ্মলোকের সন্ধান পায় না। কারণ, তাহারা অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যামোহিত)।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, গভীর সুষুপ্তিতে জীবের এই 'সংপ্রসন্ন' অবস্থাই তাঁহার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয় রূপ—তাঁহার ছন্দাতীত পাপাতীত ভয়াতীত রূপ—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম—(বৃহ, ৪।৩।২১)

—তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, শোকাতীত রূপ—

তদ্ বা অস্য এতৎ আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্—(বৃহ, ৪।৩।২১)। সুতরাং উহাই জীবের পরমা গতি, পরম সম্পৎ, পরম লোক, পরম আনন্দ—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষাস্য পরমো লোকঃ, এষোস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ—বৃহদারণ্যক অন্যত্রও (২।১।১৯) বলিয়াছেন,

—অতিঘ্নীম্ (acme) আনন্দস্য গত্বা × × এষ এতৎ শেতে। সেই জন্য সুষুপ্তিভঙ্গে জীব প্রবুদ্ধ হইয়া বলে—'সুখম্ অহম্ অস্বাপ্ সং ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্—সুখে সুপ্ত ছিলাম—কিছুই জানিতাম না।' সুষুপ্তির অবস্থা (আমরা জানিয়াছি) is 'existence as subject without object'—বিষয়-বিবর্জ্জিত বিষয়ীর স্থিতি।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, তদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯

অধিকন্তু, অথ তদা অস্মিন্ শরীরে সুখং ভবতি – প্রশ্ন, ৪।৮

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোভিভূতঃ সুখরূপম্ এতি—কৈবল্য, ১৩

'সুষুপ্তির সময় সমস্ত বিলীন হইলে জীব 'অভাবে'-স্থিত হইয়া সুখ অনুভব করে।' বলা বাহুল্য, এ সুখ বিষয়সংস্পর্শজ-বৃত্তিজাত সুখ নহে—ইহা আনন্দ—আনন্দং নন্দনাতীতম্—ইহা আনন্দময় জীবের স্বরূপে অবস্থান।

কিন্তু এই সুষুপ্তিতে প্রত্যগাত্মার সহিত (with the eternal knowing Subject) জীবের যে সংযোগ হয়, তাহা সাময়িক মাত্র—সে সংযোগ অস্থায়ী (a transient union)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

স বা এষ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা × × পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নায় এব—বৃহ, ৪।৩।১৫

যেমন স্বপ্নস্থান হইতে সুষুপ্তি-স্থানে সঞ্চরণ করিয়াছিল, জীব তেমনি আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নে অবতরণ করে এবং তথা হইতে জাগ্রতে। অতএব এ যোগ 'প্রভবাপ্যয়ৌ'—ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেই জন্য জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহা বাহ্য, পরে কহ আর'। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের তুঙ্গতম ভূমিতে আরোহণ করিয়া মোক্ষতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সুস্থিত, স্থায়ী ও চিরন্তন হয় (becomes fixed, established and permanent)। আগামী বারে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ মোক্ষবাদের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ

১

সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনায়ই পারিভাষিক শব্দগুলির একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে এবং আলোচনার আগাগোড়া সর্ব্বত্রই ওই নির্দ্দিষ্ট অর্থটিকে বজায় রাখা চাই। পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ যদি নির্দ্দিষ্ট এবং সর্ব্বত্র সমান না থাকে তবে অনেক সময়ই অর্থবিভ্রাট ঘটা সম্ভব। মাঘের "পরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটি প'ড়ে পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে কিছু সংশয় থেকে যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। উক্ত প্রবন্ধে তিনি 'যুক্ত অক্ষর,' 'যুগ্মধ্বনি,' 'যুগ্মস্বর' এবং 'যুগ্মবর্ণ'—এই চারটি শব্দকেই একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি কিন্তু এ শব্দ চারটিকে এক অর্থে ব্যবহার করিনে। যুক্তাক্ষর এবং যুগ্মবর্ণ এক হ'তে পারে; কিন্তু যুক্তাক্ষর এবং যুগ্মধ্বনি এক জিনিষ নয়। যেমন 'প্রতি' শব্দের 'প্র' যুক্তাক্ষর বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি নয়। 'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ'-কে যুক্তাক্ষর বল্‌ব কিন্তু যুগ্মধ্বনি বল্‌ব না। 'ছন্দ' শব্দে যে যুগ্মধ্বনি আছে সেটা আমার পরিভাষায় 'ন্দ'-এর মধ্যে নয়, 'ছন্‌'-এর মধ্যে; 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্‌' যুগ্মধ্বনি, 'দ' অযুগ্ম ধ্বনি। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; এ স্থলে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যুগ্মধ্বনি এবং যুগ্মস্বরও সম্পূর্ণরূপে এক জিনিষ নয়। যুগ্মস্বরমাত্রকেই যুগ্মধ্বনি বল্‌তে পারি; কিন্তু যুগ্মধ্বনিমাত্রকেই যুগ্মস্বর বল্‌তে পারিনে। পূর্ব্বোক্ত 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্‌' যুগ্মধ্বনি বটে, কিন্তু যুগ্মস্বর নয়। যে-সব যুগ্মধ্বনির অন্তর্গত আশ্রেতা ও আশ্রিত উভয়েই স্বরবর্ণ, সে-সব যুগ্মধ্বনিকেই যুগ্মস্বর বা diphthong বলেছি। যেমন অই্‌, আই্‌, অউ্‌, আউ্‌, ইউ্‌, এউ্‌, অও্‌, আও্‌, এও্‌ ইত্যাদি যুগ্মধ্বনিগুলিকে যুগ্মস্বরও বল্‌তে পারি; কেননা এখানে অ, আ, ই, এ এই আশ্রেতা ধ্বনিগুলিও স্বর এবং ই্‌, উ্‌, ও্‌ এই আশ্রিত ধ্বনিগুলিও স্বর।

ছন্দের আলোচনায় আমি 'অক্ষর' শব্দটিকে বর্জ্জন কর্‌তে চাই। কারণ ছন্দ তো অক্ষর নিয়ে কারবার করে না; অক্ষর যে-ধ্বনির প্রতীক ছন্দের কারবার সেই ধ্বনিটাকে নিয়ে, অক্ষরটাকে নিয়ে নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষীয় লিপিপদ্ধতিতে অক্ষরগুলি সব সময় যথার্থরূপে ধ্বনির প্রতিনিধিত্বও করে না। কারণ একেকটি অযুক্ত অক্ষর অনেক সময়ই একেকটি অযুগ্মধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিনিধি হ'লেও, একেকটি যুক্তাক্ষরকে কখনও একেকটি যুগ্মধ্বনির প্রতিনিধি বলা যায় না। যেমন 'প্রতি'

শব্দের 'প্র' এবং 'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ' যুক্তাক্ষর বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি নয়। পক্ষান্তরে 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্'-কে যুগ্মধ্বনি বল্‌ব, কিন্তু যুক্তাক্ষর বলা যায় না। এজন্যে আমি বিশেষভাবে যুক্তাক্ষর, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি শব্দকে ছন্দের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করার পক্ষপাতী। আর এজন্যেই সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায়ও আমি সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রকারদের থেকে একটু পৃথক্ প্রণালী অবলম্বন কর্‌তে চাই। যেমন, 'কশ্চিৎকান্তা' কথাটাকে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র-মতে বিশ্লেষণ করা হয় এ ভাবে,—ক-শ্চি-ৎকা-ন্তা; কারণ সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে সংযুক্তাক্ষর কথাটার ব্যবহার আছে, যুগ্মধ্বনি কথার ব্যবহার নেই। কিন্তু আমি ওই জিনিষটাকে বিশ্লেষণ কর্‌তে চাই এভাবে—কশ্‌-চিৎ-কান্‌-তা; কারণ আমি যুক্তাক্ষর কথাটি ব্যবহারের বিরোধী এবং যুগ্মধ্বনি শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। পূর্ব্বেই বলেছি 'অক্ষর' শব্দটিকেই ছন্দের আলোচনায় ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দটা এত বেশি প্রচলিত হ'য়ে গেছে যে ও-শব্দটাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা কঠিন। যাহোক্, বাংলা ছন্দের আলোচনায় ও-শব্দটাকে যদি ব্যবহার কর্‌তেই হয় তবে এই শব্দটার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন থাকা প্রয়োজন। অক্ষর শব্দটার তিনটি অর্থ আছে। এর বৈয়াকরণিক অর্থ বর্ণমালার বর্ণ অর্থাৎ letter। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে অক্ষর শব্দে একেকটি পূর্ণ ধ্বনি বা syllable বোঝায়। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দের অর্থের স্থিরতা নেই; বাংলা ছন্দে অক্ষর শব্দ দ্বারা কখনও letter, কখনও syllable বোঝায়। যেমন—বিদ্যুৎ, মহৎ শব্দ বাংলা ছন্দে তিন অক্ষরের শব্দ; প্রথম দুটি অক্ষরে দুটি সিলেব্‌ল্ (বি, দ্যু এবং ম, হ) বোঝাচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় অক্ষরটি একটি letter (খণ্ড-ৎ) বোঝাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে ও-দুটি দুই অক্ষর অর্থাৎ দুই সিলেব্‌ল্-এর বেশি মর্য্যাদা পাবে না, যদিও 'মাত্রা' হিসেবে বিদ্যুৎ শব্দে চার মাত্রা এবং মহৎ শব্দে তিন মাত্রা। তেম্‌নি পুণ্যবান্, শক্তিমান্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ছন্দে তিন অক্ষর ব'লে গণ্য হ'লেও বাংলা ছন্দে এগুলি চার অক্ষরের শব্দ ব'লেই গৃহীত হয়; কারণ হসন্ত ন্-কেও বাংলা ছন্দের প্রচলিত হিসাবে এক অক্ষর ব'লেই ধরা হয়। বাংলার প্রচলিত অর্থে 'মুস্কিল' শব্দে তিন অক্ষর বটে; কিন্তু যদি লিখি 'মুষ্‌কিল' তা হ'লে চার অক্ষর ব'লে ধরা হবে। যাহোক্, অক্ষর শব্দের পারিভাষিক অর্থ নিয়ে এস্থলে আর অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

ছন্দের আলোচনায় 'মাত্রা' কথাটির ব্যবহার সম্বন্ধেও একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ সঙ্গীতের পরিভাষায় মাত্রা শব্দটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রা কথাটি অবিকল সে-অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

সঙ্গীতে সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বদাই ধ্বনি-পরিমাণ (quantity) নিখুঁতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হয়, অর্থাৎ সঙ্গীত জিনিষটা সর্ব্বদাই quantitative বা মাত্রিক; কাজেই সঙ্গীতে ধ্বনি-পরিমাণের unit বা ব্যষ্টিও সর্ব্বদাই quantitative। আর ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র যে unit তারই পারিভাষিক নাম 'মাত্রা'। সুতরাং সঙ্গীতের unit বা ব্যষ্টিকে সর্ব্বদাই 'মাত্রা' বলা চলে। কিন্তু ছন্দ আর সঙ্গীত এক জিনিষ নয়। ছন্দমাত্রই মুখ্যত ধ্বনি-পরিমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ সমস্ত ছন্দই quantitative নয়। এমন অনেক ছন্দ আছে যা গৌণত quantitative হ'লেও ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity যার মুখ্য বা মূল কথা নয়। ইংরেজি ছন্দগুলি আসলে quantitative বা মাত্রাধর্ম্মী কি না এ বিষয়ে ছন্দোবিৎ-মহলে প্রচুর তর্ক হ'য়ে গেছে। এস্থলে ইংরেজী ছন্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অবান্তর। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সংস্কৃত ছন্দ-মাত্রই মূলে quantitative বা মাত্রিক নয়, এবিষয়ে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দোবিৎ-রাই একমত। ছন্দ-শাস্ত্রকার গঙ্গাদাস সংস্কৃত ছন্দগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥—ছন্দোমঞ্জরী, ১।৪

এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-ছন্দগুলি 'জাতি' শ্রেণীর অন্তর্গত শুধু সেগুলিই 'মাত্রাকৃত' বা quantitative, আর যে-ছন্দগুলি অক্ষর অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-সংখ্যাত সেগুলি মুখ্যত মাত্রাকৃত বা quantitative নয়, একথা বলাই উক্ত ছন্দ-শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। অন্যান্য ছন্দ-শাস্ত্রকাররাও এ বিষয়ে গঙ্গাদাসের সঙ্গে একমত। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখা দরকার যে, 'জাতি' ছন্দগুলি 'মাত্রাকৃত' ব'লে ছন্দ-শাস্ত্রে এগুলিকে অনেক সময় 'মাত্রাবৃত্ত' নামেও অভিহিত করা হয়; আর অক্ষর-সংখ্যাত 'বৃত্ত' ছন্দ-গুলিকেও ওই একই কারণে অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত নামও দেওয়া হ'য়ে থাকে। যাহোক্, আমরা দেখ্‌লুম যে, সংস্কৃত ছন্দোবিৎদের মতে একমাত্র জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দগুলিই মাত্রাকৃত অর্থাৎ quantitative; এসব ছন্দের unit বা একক হচ্ছে 'মাত্রা'। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দগুলি মাত্রাকৃত বা quantitative নয়; কারণ এসব ছন্দের unit মাত্রা নয়, এসব ছন্দের unit হচ্ছে 'অক্ষর'।

'মাত্রা' ও 'অক্ষর' এ দুটি পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলে বিষয়টা অনেকের পক্ষে সহজ হবে। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের 'অক্ষর' আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্ একই জিনিষ, ওশাস্ত্রে অক্ষর বল্‌তে ব্যাকরণের

বর্ণ অর্থাৎ letter বা হরফ বোঝায় না। আর 'মাত্রা' শব্দকে অর্থাৎ ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র unit-কে ইংরেজিতে বল্‌তে পারি metrical moment বা instant। কোলব্রুক সাহেবও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের আলোচনায় মাত্রা কথার ইংরেজি প্রতিশব্দরূপে moment এবং instant শব্দ ব্যবহার করেছেন (Colebrooke's Miscellaneous Essays, vol. II, pp. 62-166)। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রা কথার প্রতিশব্দরূপে স্থলবিশেষে 'কলা' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। এই 'কলা'-কে ইংরেজিতে metrical digit বল্‌তে পারি। ছন্দ-পরিভাষার 'মাত্রা' বা 'কলা'র আরেকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে *mora* (A. B Keith's History of Sanskrit Literature, ১৮৩ ও ৪১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। Metrical moment, instant বা digit শব্দের পরিবর্তে *mora* কথাটি ব্যবহার করাই সুবিধে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় সংস্কৃত মাত্রা বা কলা কথার প্রতিশব্দরূপে *mora* কথাটিই ব্যবহার করব।

২

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ উপলক্ষে সংস্কৃত ছন্দের শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করার সার্থকতা আছে। এস্থলে সে-বিষয়ে সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের বিখ্যাত টীকাকার হলায়ুধ সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে গণচ্ছন্দ, মাত্রাচ্ছন্দ ও অক্ষরচ্ছন্দ এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন (ছন্দঃসূত্রম্—৪।১১ টীকা)। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কেদারভট্ট (বৃত্তরত্নাকর-প্রণেতা), গঙ্গাদাস (ছন্দোমঞ্জরী-প্রণেতা) প্রভৃতি ছন্দোবিৎরা সংস্কৃত ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত (বা জাতি) এবং অক্ষরবৃত্ত এই দুটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; গণচ্ছন্দগুলিও আসলে মাত্রাকৃত বা quantitative ব'লে তাঁরা এ ছন্দগুলিকেও মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দের অন্তর্গত ব'লেই গণ্য করেছেন।

কিন্তু আমার মনে হয় এই দুরকম শ্রেণীবিভাগের কোনোটিই নির্দ্দোষ নয়। আমার বিবেচনায় সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে মাত্রিক, আক্ষরিক এবং অক্ষরমাত্রিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করাই সঙ্গত। যে-সমস্ত ছন্দ শুধু ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে বলা যায় মাত্রিক অর্থাৎ quantitative ছন্দ; যথা বৈতালীয়, ঔপচ্ছন্দসিক, মাত্রাসমক, আর্য্যা ইত্যাদি। যে-সমস্ত ছন্দ শুধু অক্ষর বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে বলা যায় আক্ষরিক অর্থাৎ syllabic ছন্দ; যথা—অনুষ্টুপ্ শ্লোক। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি সমস্ত বৈদিক ছন্দই এই আক্ষরিক বা syllabic শ্রেণীর অন্তর্গত; শুনতে পাই অবেস্তার

সমস্ত ছন্দই নাকি সম্পূর্ণরূপে আক্ষরিক প্রকৃতির। আর যে-সমস্ত সংস্কৃত ছন্দে যুগপৎ অক্ষরসংখ্যা এবং ধ্বনি-পরিমাণ (syllable and quantity) সুনির্দ্দিষ্ট থাকে সে-সব ছন্দকে অক্ষরমাত্রিক (syllabic-quantitative) নামে অভিহিত করা যায়। যে সমস্ত লৌকিক ছন্দকে শাস্ত্রকাররা বৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত নামে অভিহিত ক'রে থাকেন, একমাত্র অনুষ্টুপ্ শ্লোক ছাড়া সে সমস্ত ছন্দই আসলে এই অক্ষরমাত্রিক শ্রেণীর অন্তর্গত; ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি সমস্ত সুপরিচিত ছন্দই আসলে অক্ষরমাত্রিক, একথা সংস্কৃত কাব্যপাঠককে বলাই নিষ্প্রয়োজন। আর বৈদিক ছন্দগুলি আক্ষরিক (syllabic) বটে কিন্তু অক্ষরমাত্রিক নয়, আশা করি একথাও বলা বাহুল্য।

এবার অক্ষর (syllable) ও ধ্বনি-পরিমাণ (quantity), এই দুই তত্ত্বকে অবলম্বন ক'রে বাংলা ছন্দগুলিকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় তা দেখা যাক্। পূর্ব্বেই বলেছি যে বাংলায় অক্ষর বল্‌তে হরফ বা letter বোঝায়, সিলেব্‌ল্ বোঝায় না। তাই বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি সিলেব্‌ল্ কথার প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও ধ্বনি (যথা—যুগ্মধ্বনি, অযুগ্ম-ধ্বনি) এবং কোথাও স্বর (যথা—স্বরবৃত্ত, স্বরমাত্রিক) এ শব্দদুটি ব্যবহার করেছি, কারণ সিলেব্‌ল্-এর অন্তরের তত্ত্বই হচ্ছে একটি স্বর বা ধ্বনির অস্তিত্ব। কাজেই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় যাকে বলা হয় 'অক্ষর' বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি তাকেই বলেছি 'স্বর'। সুতরাং সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত এবং বাংলা স্বরবৃত্ত এ কথা দুটি আসলে অভিন্নার্থক। অর্থাৎ সংস্কৃত পরিভাষায় যাকে বলেছি আক্ষরিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বাংলা পরিভাষায় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দও বল্‌তে পারি; আর অক্ষরমাত্রিক এবং স্বরমাত্রিক এ শব্দ দুটিও একার্থবাচক। আমরা দেখেছি syllable ও quantity এই দুই তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রে সংস্কৃত ছন্দকে আক্ষরিক (syllabic), মাত্রিক (quantitative) এবং অক্ষরমাত্রিক (syllabic-quantitative) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ঠিক্ এই প্রণালী অবলম্বন ক'রে বাংলা ছন্দকে নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে বিভক্ত কর্‌তে পারি।—

১। মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ২। স্বরবৃত্ত (syllabic)
৩। যৌগিক (mixed) ৪। স্বরমাত্রিক (syllabic-quantitative)

বাংলা ছন্দের এই চার শ্রেণীর ইতিহাসটাও সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসের আদিযুগে 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দেরই প্রচলন দেখতে পাই; প্রমাণ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের শেষ যুগে অক্ষরমাত্রিক ছন্দের চেয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই অধিকতর প্রচলন একটি লক্ষ্য করার বিষয়। এই উক্তিটি যে বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষভাবে খাটে তার প্রমাণস্বরূপ লক্ষ্মণসেনের (খৃঃ ১১৭৮—১২০৫) সভাকবি জয়দেবের

গীতগোবিন্দ এবং আচার্য্য গোবর্দ্ধনের আর্য্যাসপ্তশতী এই দুখানি কাব্যের উল্লেখ করতে পারি। সংস্কৃত-যুগের পরবর্ত্তীকালের প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যেও মাত্রাবৃত্তেরই খুব বেশি প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির আদিযুগে স্বভাবতই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাব্যের প্রধান বাহন হয়েছিল। কাজেই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে মাত্রিক ছন্দের ব্যবহারে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগেও বৈষ্ণব পদাবলীগুলিতে ওই মাত্রিক ছন্দেরই প্রাধান্য। কিন্তু আদিযুগের বৌদ্ধ পদাবলী এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী উভয়ত্রই সংস্কৃত ও প্রাকৃত উচ্চারণ-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেই ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির করার প্রয়াস দেখা যায়। অথচ ওই উচ্চারণ-পদ্ধতি আধুনিক ভাষার প্রকৃতিবিরোধী। তাই আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে সংস্কৃত উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির একটা দ্বন্দ্ব দেখ্‌তে পাই এবং সেজন্যেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ছন্দ-পতনের এতটা প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্ত্তী যুগে বাংলা সাহিত্য থেকে মাত্রিক ছন্দ একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। তার পরে তিনি 'মানসী'-র যুগেই সর্ব্বপ্রথমে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণটিকে অব্যাহত রেখে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন করেছেন। তখন থেকেই এজাতীয় ছন্দ বাংলা কাব্যের, বিশেষত, গীতিকবিতার, একটি প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে।

বাংলা 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের ইতিহাসও কম ঔৎসুক্যকর নয়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, কাশীরামদাসের মহাভারত এবং এমন কি গোবিন্দদাসের পদাবলীতেও স্বরবৃত্ত ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। স্বরবৃত্ত হচ্ছে বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবিরা যে-সব ছন্দে কাব্য রচনা করতেন সেগুলি ছিল কৃত্রিম ছন্দ, তার ফলে আমাদের প্রাচীন কাব্যের সর্ব্বত্রই ওই স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ছন্দগুলির একটা চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন কাব্যে যে-সব স্থলে আমরা সাধারণত ছন্দ-পতন ঘটেছে মনে ক'রে থাকি সে-সব স্থলেই ওই দ্বন্দ্বের পরিচয় র'য়ে গেছে। আর প্রাচীন কবিদের কৃত্রিম ছন্দের বিরুদ্ধে বাংলার সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দের বিদ্রোহের ফলেই ওই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। তাই যে-সব স্থলে ছন্দ-পতনের আকারে ওই দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে তার মধ্যে সাধারণত প্রাচীন কৃত্রিম ছন্দের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাভাবিক নবীন স্বরবৃত্ত ছন্দেরই জয়ের আভাস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাংলা ছন্দের প্রাচীন ও নবীন ধারার এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসটি

বাস্তবিকই খুব বিস্ময়কর। যাহোক্, বাংলার এই স্বাভাবিক স্বরবৃত্ত ছন্দটি সর্ব্বপ্রথমে রামপ্রসাদের গানেই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তথাপি তখনকার দিনের কবিরা এছন্দের স্বরূপ ও মর্য্যাদা উপলব্ধি কর্তে পারেন নি। ভারতচন্দ্র থেকে হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেক কবির রচনায়ই এছন্দের অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু কারও হাতেই তা'র যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হয়নি; সর্ব্বত্রই তা'র অনাদর ঘটেছে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এছন্দের প্রকৃত মূল্য বুঝে তাকে বাংলা কাব্যের ছন্দ-ভাণ্ডারে সযত্নে অভিনন্দিত করেছেন। 'ছবি ও গান'-এই তিনি সর্ব্বপ্রথমে এছন্দের যথার্থ প্রকৃতিটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টা পরিশেষে 'ক্ষণিকা'-র যুগে সাফল্য লাভ করেছে। এ ছন্দটির যথার্থ মর্য্যাদা আবিষ্কারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভারতীর বীণায় যে একটি নবতন তন্ত্রী যোজনা কর্তে সমর্থ হয়েছেন, তার ধ্বনি-মাধুর্য্য অন্য কোনো ছন্দের চেয়ে কম নয়।

কিন্তু সব চেয়ে জটিল ইতিহাস হচ্ছে বাংলা 'যৌগিক' ছন্দের। এ ছন্দটিই হচ্ছে আমাদের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রধান বাহন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য এ ছন্দেই রচিত। কিন্তু তাঁদের কাব্যে এছন্দের প্রকৃত মূর্ত্তি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। এছন্দের উৎপত্তি কিরূপে হ'লো, আমার মনে হয় বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এটি একটি গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, এ ছন্দটির প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার কর্তে বাংলার কবিদের বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। মধ্যযুগে এছন্দটিকে একদিকে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত অপরদিকে বাংলার স্বাভাবিক স্বরবৃত্ত এদুটি ছন্দের আকর্ষণে একটি অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে দোলায়মান দেখা যায়। তার উপর সংস্কৃতজ্ঞ কবিদের হাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব, ফার্সী-নবীশ কবিদের হাতে ফার্সী ছন্দের প্রভাব এবং সমস্ত কবিতা-কেই গানের ভঙ্গিতে সুর ক'রে পড়ার প্রচলিত অভ্যাস, এসমস্তর ফলে এছন্দটি কোনো সুস্পষ্ট আকার ধারণ ক'রে উঠতে পারেনি। এই অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার বহু পরিচয় আমাদের প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে আমাদের কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহনটি যে একটি যৌগিক ছন্দের আকার ধারণ কর্ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের হাতে এছন্দটি একটি নতুন ধরণের 'অক্ষর'-বৃত্তের আকার ধারণ করে অর্থাৎ সে-সময় থেকে শুধু অক্ষরের সংখ্যার সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ছন্দ-রচনার প্রথা দেখা দেয়। কিন্তু এই 'অক্ষর' জিনিষটা সিলেব্‌ল্‌ও নয়, letterও নয়; স্থলবিশেষে সিলেব্‌ল্,

স্থলবিশেষে letter বা বর্ণ। এইটেই 'অক্ষর' শব্দের বাংলায় প্রচলিত অর্থ। কিন্তু এই অনিশ্চিতার্থক 'অক্ষর' কখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব কর্‌তে পারে না। অথচ ধ্বনিই ছন্দের মূলতত্ত্ব, অক্ষর নয়, একথা বলাই বাহুল্য। যাহোক্, যখন থেকে এই অক্ষর আমাদের কাব্য-ছন্দের মূল-তত্ত্বের স্থান দখল করেছে তখন থেকে আমাদের ছন্দে এক নতুন রকমের ত্রুটি দেখা গেল। সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে ভারতচন্দ্রের সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কাব্য-ছন্দের রাজ্যে ওই অনিশ্চিত প্রকৃতির অক্ষরেরই একাধিপত্য চলেছে। মেঘনাদবধের ছন্দ-বিচার কর্‌লে দেখা যাবে ওই কাব্যখানির আগাগোড়া প্রত্যেকটি পংক্তি চোদ্দ 'অক্ষরে' গাঁথা। সর্ব্বত্রই চোদ্দ অক্ষরের প্রয়োগ হয়েছে ; কোথাও ধ্বনি-ব্যষ্টির (metrical unit-এর) প্রতি লক্ষ্য নেই। আর অক্ষরই যে ওই ধ্বনি-ব্যষ্টির কাজ সর্ব্বত্র চালাতে পারে না একথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই ধ্বনিবিচারহীন অক্ষর সংখ্যার সাম্যরক্ষা ছন্দের পক্ষে অস্বাভাবিক ব'লেই আমি মনে করি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সহজ ছন্দ-প্রতিভার স্পর্শে এই 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দের যৌগিক প্রকৃতিটি আবিষ্কৃত হ'লো। তাঁরই রচনা থেকে সর্ব্বপ্রথমে দেখা গেল যে অক্ষর সংখ্যার সাম্যরক্ষা ছন্দের পক্ষে অবান্তর ; ধ্বনি-সাম্যই ছন্দ-রচনার মূল কথা। তাই তিনি শুধু ধ্বনি-সাম্য রক্ষা ক'রেই ছন্দ-রচনা করেছেন, অক্ষর সংখ্যার বৈষম্যে সঙ্কুচিত বা বিচলিত হন নি। অবশ্য তাঁরও অল্পবয়সের রচনায় অক্ষরসাম্যই দেখা যায় ; কিন্তু পরিণত বয়সের রচনায় তিনি ধ্বনি-সাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে অক্ষরসাম্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। এভাবে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ন্যায় আমাদের যৌগিক ছন্দটিও রবীন্দ্রনাথের হাতেই পরিণতি লাভ করেছে। [এ বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা "জয়ন্তী-উৎসর্গে"র 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামক প্রবন্ধে ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] আমাদের এই তথাকথিত 'অক্ষর'-বৃত্ত ছন্দটি যে আসলে একটি যৌগিক প্রকৃতির ছন্দ সে-বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ ছন্দের এই যৌগিক প্রকৃতিটি আধুনিক কালেও যথোচিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে ব'লে মনে হয় না।

আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দটিকে বল্‌তে পারি বাংলার বৈদিক ছন্দ। আর আমাদের মাত্রাবৃত্ত ছন্দটি হচ্ছে সংস্কৃতের 'মাত্রাবৃত্ত' জাতি ও গণচ্ছন্দের প্রতিনিধি। কিন্তু আমাদের যৌগিক ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ সংস্কৃতে নেই, এইটি একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ বাংলায় ছিল না। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন যে বাংলায়ও সংস্কৃত

অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের অনুরূপ ছন্দ রচনা করা যায়। তাঁর রচিত এই নতুন-জাতীয় ছন্দকেই আমি নাম দিয়েছি 'স্বর-মাত্রিক' ছন্দ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর ছন্দই আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহন। আর বাংলা ছন্দের ওই তিনটি শ্রেণীই রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিণতি লাভ করেছে; তা ছাড়া ওই তিন ছন্দেই তিনি এত বিচিত্র রকমের ছন্দোবন্ধের উদ্ভাবন করেছেন যা সত্যই বিস্ময়কর। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত স্বরমাত্রিক নামে যে চতুর্থ শ্রেণীর ছন্দের উল্লেখ করেছি বাংলা কাব্যসাহিত্যে তার পরিসর এখনও অতি সংকীর্ণ; এছন্দে রচিত বাংলা কবিতার সংখ্যাও খুবই কম। এছন্দ রচনায় খুব সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিচারের প্রয়োজন; কারণ এছন্দ রচনায় ধ্বনি-শিল্পের খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের দরকার হয়। তাই এই ছন্দে কবিতা রচনা কর্‌তে হ'লে কবির খুব তীক্ষ্ণ ধ্বনিবোধ এবং নিপুণ শিল্পপ্রতিভা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এত সূক্ষ্ম বিচার অনেক সময়ই কাব্যরচনার পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই ছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হ'লেও এ ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে এবং এর সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্প-পরিসর ব'লে মনে হয় না। তাই স্বর-মাত্রিক ছন্দটিকেও বাংলা ছন্দের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী ব'লে গণ্য করেছি।

৪

বাংলা ছন্দের যে চার ধারার কথা উল্লেখ কর্‌লুম এবার দৃষ্টান্তযোগে তাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করা যাক্।—

।। ।। ॥ ॥ ।। ।। ॥

(১) আহা আহা । চীৎকার ॥ করি রঘু । নাথ
ঝাঁপায়ে প । ড়িল জলে ॥ বাড়ায়ে দু । হাত।
আগ্রহে । যেন তার ॥ প্রাণমন । কায়
একখানি । বাহু হ'য়ে ॥ ধরিবারে । যায়!
—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এছন্দটির unit বা ব্যষ্টি সিলেব্‌ল্ বা স্বর নয়; সুতরাং এটিকে syllabic বা স্বরবৃত্ত ছন্দ বল্‌তে পারিনে। এর unit হচ্ছে মাত্রা বা *mora*. অতএব এ ছন্দটিকে বল্‌ব মাত্রাবৃত্ত বা quantitative ছন্দ। কেননা মাত্রা বা *mora* হচ্ছে ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-রই unit; আর এ ছন্দটিকে ধ্বনির পরিমাণ বা quantity-র উপরেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে যে, এখানে অযুগ্মধ্বনিকে

এক unit বা *mora* ব'লে ধরা হয়েছে আর যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয়েছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই মাত্রা বা *mora*। অযুগ্মদণ্ডের দ্বারা একমাত্রিক অযুগ্মধ্বনি আর যুগ্মদণ্ডের দ্বারা দ্বিমাত্রিক যুগ্মধ্বনি নির্দ্দেশ করা গেল। এ দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তি পর্ব্বে চার মাত্রা বা *mora* রয়েছে, তাই এ ছন্দের পূর্ণতর-পরিচয়সূচক নাম হচ্ছে চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দ। চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমাদের। ছোটনদী॥ চলে বাঁকে। বাঁকে,
বৈশাখ। মাসে তার॥ হাঁটুজল। থাকে।

* * * *

দুই কূলে। বনে বনে॥ প'ড়ে যায়। সাড়া,
বরষার। উৎসবে॥ জেগে উঠে। পাড়া।

—ছোটনদী, সহজপাঠ ১ম ভাগ, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্ত দুটিতে চীৎকার, আগ্রহে, বৈশাখ, এবং উৎসবে এই চারটি শব্দেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতিটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিতেই সমস্ত বাংলা ছন্দেরই বিশেষ প্রকাশটি ধরা দেয়। এবার বাংলা ছন্দের দ্বিতীয় ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

| | | | | | | | | | | | | |
(২) পাষাণ-গাঁথা। প্রাসাদ-'পরে॥ আছেন ভাগ্য-। মন্ত,
মেহাগিনির। মঞ্চ জুড়ি'॥ পঞ্চ হাজার। গ্রন্থ;
সোনার জলে। দাগ পড়ে না,॥ খোলে না কেউ। পাতা;
আস্বাদিত। মধু যেমন॥ যূথী অনা-। ঘ্রাতা।

—যথাস্থান, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে সিলেব্‌ল্ বা স্বর; সুতরাং এটিকে বল্‌ব স্বরবৃত্ত বা syllabic ছন্দ। এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে চারটি ক'রে স্বর আছে; তাই চতুঃস্বর-পর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ বল্‌লেই এটির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়। লক্ষ্য করার বিষয় এ দৃষ্টান্তটিতে অযুগ্ম-যুগ্ম-ভেদে ধ্বনি অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর মাত্রা বা quantity-র মুখ্যত কোনো পরিমাপ করা হয়নি। তাই এছন্দকে মাত্রিক বা quantitative ব'লে নির্দ্দেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবার বাংলা ছন্দের তৃতীয় ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

॥ | | | | | | | | ॥ | |
(৩) প্রাণ দিয়ে,। দুঃখ স'য়ে॥ আপনার হাতে
সংগ্রাম ক-। রিতে দাও॥ ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত। সাধু তব॥ পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে। গৃহছাড়া॥ লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।

—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি মাত্রা অর্থাৎ *mora*-ও নয়, স্বর বা syllable-ও নয়। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে এ ছন্দের unit কোথাও syllable, কোথাও *mora*। অযুগ্মধ্বনি সর্ব্বত্রই এক unit বটে; কিন্তু যুগ্মধ্বনি শব্দের মধ্যে থাক্‌লে এক unit আর শব্দের অন্তে থাক্‌লে দুই unit বা দুই *mora*। তাই এ ছন্দটিকে যৌগিক ছন্দ নামে অভিহিত করেছি; কারণ এ ছন্দের প্রকৃতি একই শব্দের একাংশে স্বরমূলক বা syllabic এবং অন্যাংশে মাত্রামূলক বা quantitative। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে চারটি ক'রে unit বা ব্যষ্টি আছে; সুতরাং এ ছন্দটিকে চতুর্ব্যষ্টি-পর্ব্বিক যৌগিক ছন্দ বল্‌তে পারি।

এস্থলে একথা বলা দরকার যে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ বিভিন্ন হ'লেও ছন্দোবন্ধ হিসেবে এগুলি বিভিন্ন নয়। লক্ষ্য কর্‌লেই টের পাওয়া যাবে যে, উপরের সবগুলি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে চোদ্দটি ক'রে unit বা ব্যষ্টি আছে এবং সর্ব্বত্রই আট unit-এর পরে একটি ক'রে ছেদযতি আছে। অর্থাৎ সবগুলি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তি আট এবং ছয় unit-এর দুই পদে বিভক্ত হয়েছে। আর একথা সকলেই জানে যে, যে-সব ছন্দোবন্ধে পংক্তিগুলি আট এবং ছয় unit-এর দুইভাগে বিভক্ত সে-সব ছন্দোবন্ধেরই নাম পয়ার। সুতরাং উপরের দৃষ্টান্তগুলি ছন্দহিসেবে বিভিন্ন হ'লেও ছন্দোবন্ধ হিসেবে অভিন্ন, কেননা ছন্দোবন্ধ হিসেবে এদের সবগুলিই পয়ার। প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে মাত্রিক (quantitative) পয়ার, দ্বিতীয়টি স্বরবৃত্ত (syllabic) পয়ার আর তৃতীয়টি যৌগিক (mixed) পয়ার। ছন্দ নির্ভর করে ধ্বনির unit-এর প্রকৃতির উপর; আর ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় ওই unit-এর সমাবেশ প্রণালী অর্থাৎ পর্ব্ব ও পদবিভাগ-প্রণালীর উপর।

এবার বাংলা ছন্দের চতুর্থ ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(৪)　তুহিন-লীন । কোন্ মুনির । ছিলাম কোন্ । স্বপ্নেতে !
জন্ম মোর । ককোন্ চোখের । টাক্কের । সঙ্কেতে !
কোন্ গিরির । হিম্-ললাট । ঘাম্‌ল মোর । উদ্ভবে,
কোন্ পরীর । টুট্‌ল হার । কোন্ নাচের । উৎসবে !

—ঝর্ণার গান, বিদায় আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিপর্ব্বে স্বরসংখ্যা (syllables) এবং মাত্রাসংখ্যা (*morae*) যুগপৎ স্থির আছে; কেননা প্রতি পর্ব্বেই তিনটি ক'রে স্বর বা সিলেব্‌ল্ এবং পাঁচটি ক'রে মাত্রা বা *mora* আছে। তাই এ ছন্দকে স্বর-মাত্রিক (syllabic-quantitative) আখ্যা দেওয়া যায়। এ ছন্দটির বিশেষ পরিচয় দিতে হ'লে বল্‌ব এটি ত্রিস্বর পঞ্চমাত্র-পর্ব্বিক ছন্দ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

হসন্তের পত্র

অশান্ত

বীণা রায়কে চেন? কখনও নাম শুনেছ? একটী বাঙালী ঘরের মেয়ে। কিন্তু এই বাঙালী মেয়েটী একেবারে কবি বায়রণের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বস্‌বার আসন ক'রে নিয়েছেন। কেননা, বায়রণের সম্বন্ধে গল্প আছে, একদিন তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে, তিনি বিখ্যাত হ'য়ে গেছেন। শ্রীমতী বীণা রায়ের অবস্থাও কতকটা ঐ বায়রণের মতো। তবে বায়রণ বিখ্যাত হয়েছিলেন লম্বা লম্বা কবিতা লিখে আর বীণা রায় বিখ্যাত হয়েছেন একটী মাত্র বাক্য লেখার জন্যে। সে বাক্যটী হচ্ছে—"কাহারও তাঁবে রহিব না।"

অবশ্য সৃষ্টি ব্যাপারটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। তাই বাঙালী মেয়ের ঐ রকম একটা কথায় অনেক বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ঘাব্‌ড়ে ও ভেব্‌ড়ে গেছেন এবং তাঁরা একটা ভীষণ হৈ চৈ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ঐ একই কথা যদি কোন বাঙালী মেয়ের মুখ থেকে না শুনে কোন বাঙালী ছেলের মুখ থেকে শুন্‌তেন তবে তাঁরা হয়ত অতটা ঘাব্‌ড়াতেন না, এমন কি কেউ কেউ হয়ত এ-পর্য্যন্ত মনে করতে পারতেন যে, ঐ মনোভাব জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে একটা মস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। আবার ঐ মনোভাবই যদি আমরা কোন ইংরেজ ছেলের মুখ থেকে শুনি তবে তা আমাদের কাছে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ বোধ হবে না—এমন কি, হয়ত আমরা কেউ কেউ মনে মনে বল্‌ব—হাঁ, ইংরেজ ছেলের উপযুক্ত কথা বটে। যখন আমরা পড়ি—Britons never shall be slaves, তখন আমাদের উপহাস করবার বা রুষ্ট হবার কথা মোটেই মনে ওঠে না। অথচ ওটা শুধুই "কাহারও তাঁবে রহিব না" এই কথাটারই পদ্য সংস্করণ এবং লেখা ইংরিজি ভাষায়। বীণা রায়ের কথা শুনে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেছি কিন্তু ঐ কথাই যদি আমাদের সাম্‌নে এসে গোবর পালোয়ান মোটা গলায় তাঁর বুকের ছাতি ফুলিয়ে, বাহুর বাইসেপস্‌ ও ডেল্‌টয়েড্‌ বেঁকিয়ে বলেন তবে নিশ্চয় আমরা তারিফ ক'রে বল্‌ব—আচ্ছা হ্যায়, ঠিক্‌ হ্যায়—এহি ত মরদানাকা বাত। আবেগে আমাদের মুখ দিয়ে হিন্দি পর্য্যন্ত বেরিয়ে যাবে। তাই বল্‌ছিলাম যে, সৃষ্টি ব্যাপারটাই হচ্ছে আপেক্ষিক।

সে যা হোক্‌, বীণা রায়ের কথা শুনে আমরা ঘাব্‌ড়েই যাই আর চায়ের পেয়ালাতে তুফানই তুলি, বাঙালী কোন মেয়ের মনে যে এই রকমের একটা কথা জেগেছে এবং জেগেছে কেবল তাই-ই নয়, তা যে "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ"র মতোই মর্ম্মতলে আবার মিশিয়ে না

গিয়ে মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে তা শুধু এই-ই প্রমাণ করে যে, বাংলার নারী-সমাজের অন্তরের অন্তরেতে পুরুষের চোখের আড়ালে—অনেক নারীর চোখের আড়ালেও—একটা প্রকাণ্ড ওলোট পালোট হচ্ছে। সে ওলোট পালোটে পুরুষ-সমাজ কি নারী-সমাজ দুয়ের কারোরই কল্যাণ নেই। কেননা, পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার যে-সম্বন্ধ সে-সম্বন্ধ রাম-শ্যাম-হরির মন-গড়া একটা সম্বন্ধ নয়—সে-সম্বন্ধ কেবল একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক বা পারিবারিক বা কেবল "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যাঃ" এই সম্বন্ধ নয়—সে-সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। প্রাণ ও আত্মা দিয়ে নর-নারী পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে আছে আজ লক্ষ লক্ষ বছর থেকে—এদের এক থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করবার মন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এবং আবিষ্কৃত হলেই যে সেটা একটা প্রকাণ্ড ঐশ্বর্য্য ব'লে মান্‌তে হবে তাও মনে কর্‌তে পারি নে। কেননা, এই যে মানব-সমাজ এই যে তাঁর সভ্যতা তা রসবন্ত হ'য়ে আছে পুরুষ ও নারীর দুয়ের মিলিত কণ্ঠ-সঙ্গীতে। এটা একটা প্রাণিক ও আধ্যাত্মিক সত্য যে, নারী ছাড়া পুরুষ টি্ঁকতে পারে না এবং পুরুষ ছাড়া নারী। আমার বিশ্বাস, সব নারীই যদি তারাবাই হ'য়ে পড়ে তবে সব পুরুষই পেলব রায় হ'য়ে উঠ্‌বে। অবশ্য যারা তুড়ী দিয়ে এই জগতটাকে উড়িয়ে দিতে চায় তাদের কথা আমি বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছি তাদের কথা যারা মনে প্রাণে বলে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

এ-জগতের খেলা হচ্ছে দ্বৈতের খেলা। এ-দ্বৈত হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ ও নারী।

মানুষ মানুষের গায়ে গায়ে আছে ব'লে মানুষ মানুষের অভাব বুঝ্‌তে পারছে না, মানুষ যে মানুষের কত প্রয়োজনের তা সে সজ্ঞানে উপলব্ধি কর্‌তে পারছে না। পুরুষ ও নারী সমাজে নানা ভাবে নানা দিক্ দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ পাচ্ছে ব'লে পুরুষ নারীর পক্ষে ও নারী পুরুষের পক্ষে যে কতখানি প্রয়োজন তা তারা সজ্ঞানে বুঝ্‌তে পারছে না। আজ যদি পৃথিবীর সমস্ত পুরুষগুলোকে একত্র ক'রে এদের এক দলকে অতলন্ত মহাসাগরের ওপারে আর অন্য দলকে উক্ত মহাসাগরের এপারে রাখা যায় তবে পুরুষ নারী দুয়ের চোখের দীপ্তিই নিবে যাবে—তখন পুরুষেরা দল বেঁধে দিনরাত সমস্বরে কেবলই গান গাইতে থাক্‌বে—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত,

আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত”

আর নারীরা দলবেঁধে হতাশ হৃদয়ে কতদিন সেই দিকে ছল্ ছল্ চোখে চেয়ে থাক্‌বে—তাদের চোখে পলক পড়বে না। "চিরকুমার সভা"র শেষ ফল কি দাঁড়িয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। "চিরকুমারী সমিতি"রই যে শেষ ফল অন্য রকম দাঁড়াবে তা মনে করবার মতো আজও তেমন কোন কারণ ঘটে নি। আর এতে অবশ্য কুমার-কুমারীদের কোন দোষ দেওয়াও চলে না। মানুষের জীবনে, নর-নারীর জীবনে, কিশোর-কিশোরীদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ ও তার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের এই পৃথিবীটার গায়ে রঙ্ লাগে, তার আকাশ-বাতাসে নেশা জাগে, তার পাখীর গান ফুলের গন্ধ সাঁঝের তারা জ্যোৎস্নার সুর বড় মিষ্টি হ'য়ে ওঠে, তার বসন্তের মায়া শরতের ছায়া বর্ষার বিরহ বড়ই স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে, আর তখন অন্তরীক্ষের কৌতুকপ্রিয় সেই দুষ্টু দেবতাটী তাঁর ফুলধনু হ'তে ফুলশর দিয়ে চারদিকে ফুল ছিটাতে থাকেন—বেচারী কিশোর কিশোরীরা!—তখন কি করবে তারা? তখন সদ্ভাব-শতক শূন্য হ'য়ে মিলিয়ে যায়, সুনীতি-দর্পণ পারা-ঝরা অবস্থায় মনো-মন্দিরের এক কোণে প'ড়ে থাকে, মোহ-মুদ্গর নিতান্তই তুলো দিয়ে তৈরী ব'লে মনে হয়—বেচারা কিশোর কিশোরীরা!—তখন তারা কি করবে? তখন সাধ্য কি তাদের প্রাণে প্রাণে নেশা না লাগে, চোখে চোখে অঞ্জন না লাগে, তাদের অন্তরে কার্য্য না জাগে, কণ্ঠে সঙ্গীত না ফোটে, জীবন একটা অনাস্বাদিত মধুর মধুর মধুর রসের মাধুর্য্যে ভ'রে উঠ্‌তে না চায়! তখন প্রহ্লাদের যেমন ক দেখে কৃষ্ণনাম মনে জেগেছিল তেম্‌নি যা দেখে তাতেই কিশোরের মনে পড়ে কিশোরীকে আর কিশোরীর মনে পড়ে কিশোরকে। একখানি ভজন গান, একটা মিষ্টি সুর, একটী মধুর কবিতা, একটু ফুলের গন্ধ, একটা আসন্ন সন্ধ্যা, চাঁদ্‌নী রাত, বরষার রিমিঝিমি সব খানি মনে করিয়ে দেয় কিশোরীকে কিশোর আর কিশোরকে কিশোরী। তারপর অবশেষে একদিন ব্যথা-থম্-থম্ হৃদয়ে কিশোর কিশোরীকে বলে—অয়ি আমার জন্ম জন্মান্তরের পথ-চাওয়া প্রেয়সি! আর অশ্রু-ছল্-ছল্ চোখে কিশোরী তার উত্তর দেয়—হে আমার অতীত ও অনাগতের কাণ্ডারী! বুড়ি পৃথিবীটার চোখে বুঝি একটু অশ্রু জেগে ওঠে—আনন্দাশ্রু। তার অন্তরে বুঝি একটা বাণী ধ্বনিত হ'তে থাকে—আশীর্ব্বাণী। বুঝি ভাবে সে সার্থক হ'ল—তার এত দিনের স্নেহ মায়া মমতা সফল হ'ল—তার বসন্তের অঙ্গসজ্জা, বর্ষার ব্যাকুলতা, শরতের হাতছানি কৃতার্থ হ'ল—বুঝি ভাবে তার মর্ত্ত্যের লজ্জা এতদিনে অমৃত-লোকের স্পর্শে ঢাকা পড়্‌ল।

কথার স্রোতে কলম ভাসিয়ে একটা অবান্তর বক্তৃতা দিয়ে নেওয়া গেল। মনে রেখো এটা বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠি। কোন প্রত্নতত্ত্ব-সমিতির সভ্যদের সামনে গবেষকের গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ নয়।

সে যা হোক্, বেচারী বাংলা ভাষায় "কাহারও তাঁবে রহিব না" এই যে কথাটা শুনে আমরা রুষ্ট হয়েছি ঐ কথাটাই যদি সংস্কৃত ক'রে বলি "সর্ব্ব আত্মবশং সুখম্" তবে নিশ্চয় জানি আমাদের সবার চিত্তই ভক্তি গদ্‌গদ হ'য়ে উঠে আমাদের নত মাথা আরও নত ক'রে দেবে। মনে কোরো না যে, ঐ সংস্কৃত বাক্যটী আমি ভট্টিকাব্য থেকে উদ্ধার করেছি। ওটা খাস উপনিষদের কথা।

কিন্তু অশান্ত, মানব-জীবনের ট্র্যাজিড়ি এ নয় যে মানুষ "কাহারও তাঁবে রহিব না" এই কথা বল্‌তে পেরেছে—আসল ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে এই যে সবাই ও-কথা জীবনে সত্য ক'রে তুল্‌তে পারে না—অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত পারে নি—কোন কোন মানুষ আর কোন কোন মানুষের তাঁবে থাক্‌বেই। কেবল থাক্‌বেই নয় থাক্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব—যেন থাক্‌তে পেলে ধন্য হ'য়ে যায়। ধনীর তাঁবে নির্ধন, পকেটভারীর তাঁবে ইয়ারবক্স, চালাকের তাঁবে বোকা, বুদ্ধিমানের তাঁবে বুদ্ধিহীন, জ্ঞানীর তাঁবে অজ্ঞানী থাক্‌বেই। আমি অতগুলো তালিকা দিলেম বটে এবং ঐ তালিকা আরও বাড়িয়ে অতীব সুদীর্ঘ ক'রে তোলা যায়—কিন্তু সেই সুদীর্ঘ তালিকা একটীমাত্র সংজ্ঞায় পর্য্যবসিত ক'রে বলা যেতে পারে—অর্থাৎ এ-সংসারে অহরহ শক্তিমানের তাঁবে শক্তিহীনেরা থাক্‌বেই। কেবল যে থাক্‌বেই তাই-ই নয় সুযোগ ও সুবিধা পেলেই আবার তারা খোল করতাল বাজিয়ে গান ধ'রে দেবে—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিও।"

অবশ্য অনেক ভ্যাবাগঙ্গারাম অনেক গডাচড় চন্দ্র রোমানফ্‌দের প্রতি অভিমান ক'রে লেনিনদের নামে দ্বিগুণ উৎসাহে জয় হে জয় হে জয় হে ব'লে তান ধ'রে মনে মনে ভাব্‌তে পারে যে, সত্যি সত্যি তাদের আত্মিক অধীনতার বুঝি অবসান হ'ল। কিন্তু এটা জানা কথা যে, ঢেঁকি যতক্ষণ ঢেঁকি ততক্ষণ তা স্বর্গে গেলেও ধান ভান্‌বে। প্রভেদ বড় জোর এইটুকু হবে, সেখানে এই মর্ত্ত্যবাসিনীদের বদলে তার পিঠে চরণ পড়বে অপ্সরীদের। রামী বামী ক্ষেমীর পরিবর্ত্তে তখন তাকে চরণাঘাত দেবে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা, সুবাহু সুকেশী সুমধ্যা, হেমা সোমা বিদ্যুৎপর্ণারা। এই নব পদকমল-সম্পাতে প্রথম প্রথম বেশ একটু মধুর নেশার আমেজ পাওয়া যেতে পারে বটে, এমন কি নন্দন-কাননের জল হাওয়ায় শরীরটাও দিব্যি চাকচক্যময় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে কিন্তু শেষাশেষি দেখা যাবে যে,

আসলে ঢেঁকির তাতে আত্মিক অবস্থার ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার কিছুমাত্র উনিশ বিশ হয় নি। অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে কঠোর তপস্যা ক'রে ঢেঁকি দ্বিজ হ'য়ে উঠে থাকে। আসলে সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্ এ-কথা সত্যি বটে কিন্তু ব্যাবহারিক হিসেবে সর্ব্বং পরবশং যে দুঃখম্, কারোও তাঁবে থাকাটা যে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় দুঃখের, সেটা প্রমাণ করা সহজ নয়। প্রমাণ করা সহজ নয়—কেননা তা সত্য নয়। সত্য নয় যে তার প্রমাণ কৃতদাস-প্রথা রহিত কর্‌বার যখন চেষ্টা চল্‌ছিল তখন সেই কৃতদাসদের মধ্য থেকেই একদল উঠেছিল যারা তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে, তারা চমৎকার আছে। দ্বিতীয় নিকোলাস যদি দ্বিতীয় নিকোলাস না হ'য়ে হেন্‌রি ফোর্ড হ'ত তবে লেনিনের দল রাশিয়াতে পাত্তা পেত কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আজ তুমি আমি ও-পাড়ায় হরিশ চাটুয্যে এ-পাড়ার গজেন বক্‌শী সবাই ব্রিটিশ শাসনে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছি কিন্তু রাজা ভোগ-বিলাস প্রসাদ সিং বাহাদুর, কে সি এস্ আই, জি সি এস্ আই, সি আই ই কে যদি এ-বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করো তবে দেখ্‌বে যে, আমাদের মতের সঙ্গে সে-মতের অনেকখানি গরমিল রয়েছে। আইনের দিক্ থেকে মানুষ মানুষকে আর সব মানুষের সঙ্গে সমান কর্‌তে পারে, কিন্তু আত্মার দিক্ থেকে সেটা একেবারে বিলকুল একটা আলাদা ব্যাপার, অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে a different proposition altogether। লেনিন রাশিয়ার শ্রমিকদের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যেরই সুবন্দোবস্ত করতে পারে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা আমোদ-প্রমোদও সহজ লভ্য ক'রে তুল্‌তে পারে কিন্তু তাদের কেমাল পাশা বা সুন্ ইয়াৎ সেন্ ক'রে তুল্‌তে পারে না। সমস্ত দুনিয়ার আজ বল্‌শেভিজ্‌ম্ সোশিয়ালিজ্‌ম্ বা-কমিউনিজ্‌ম্ তার জয়-পতাকা উড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু তা—ধর—যুবক ভারতের নয়া কবি বিনয়কুমার সরকারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে পারবে না। বনে বনে চন্দন নেই, গজে গজে মুক্তা নেই—ঘরে ঘরেও রাণা প্রতাপের জন্ম হয় না—যুগে যুগেও কম হয়—দেশে দেশে আরও কম।

আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখি ব'লে মনে কোরো না যে, এখন কল্পনা-সুন্দরী আমার স্কন্ধে ভর করেছেন এবং এই সব কথা আমি তোমাকে কাব্য হিসেবে বল্‌ছি—আমি বল্‌ছি তোমাকে এই সব কথা নিছক তত্ত্ব হিসেবে—ফ্যাক্ট্ হিসেবে অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগতের একটা অতি বাস্তব ব্যাপার হিসেবে। আর এই বাস্তব ব্যাপার যে আজকেই খালি সত্য হ'য়ে আছে তাই নয়, এ গত-কল্যও সত্য হ'য়ে ছিল, আগামী কল্যও সত্য হ'য়ে থাকবে। আসলে এই বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই আদিম কাল থেকে, যতদিন থেকে আমরা

মানুষকে জানি তার পরিবারকে জানি গোষ্ঠীকে জানি সমাজকে জানি —এবং চারিদিক্ দেখে শুনে এ-কথা কিছুতেই মনে কর্‌তে পারা যায় না যে, আগামী কাল হঠাৎ এটা ভীষণ রকম অসত্য ও অসম্ভব ও একেবারে একটা অতীতের ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌বে। ওয়েল্‌সের "মিষ্টার ব্লেট্‌স্‌ওয়ার্দ্দি অন্ র‍্যামপোল আইল্যাণ্ড্" পড়েছ? না প'ড়ে থাক্‌লে বইখানা পোড়ো। ভয় পেয়ো না। বইখানা উইলিয়াম ক্লিসোল্ডের জাত-ভাই নয়। অত বড়ও নয় আর ও-রকম বক্তৃতাও নেই এতে। সে যা হোক্, মিষ্টার ব্লেট্‌স্‌ওয়ার্দ্দির সেই র‍্যামপোল আইল্যাণ্ড হোক্ অথবা সিষ্টার ডিমোক্রাসির (ফরাসী মতে ডিমোক্রাসী হচ্ছে স্ত্রী-লিঙ্গ) রিপাবলিক্ ল্যাণ্ড্ই হোক্ এ-ছুই দেশেই এ সত্যের সাক্ষাৎ মেলে। তবে র‍্যামপোল আইল্যাণ্ডে এই সত্য একেবারে উলঙ্গ কঙ্কালের রূপে দেখে আমরা শিউরে উঠি আর রিপাব্‌লিক্ ল্যাণ্ডে তারই হ্যাট-ওয়েষ্টকোট্-কোট-পরা ভদ্র সংস্করণ দেখে আমাদের আনন্দে রোমহর্ষণ হ'তে থাকে। কিন্তু ভিতরের দিক্ থেকে দেখ্‌লে দেখা যাবে সেই এক কথা—কয়েকটা লোক আর কতকগুলো লোকের উপর মাতব্বরি কর্‌ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন হয়? কেন পৃথিবীর কতগুলো লোক —বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় বলা যেতে পারে—আর কতগুলো লোকের তাঁবে থাক্‌তে গররাজি নয়? আর কতগুলো লোকের তাঁবে থেকে তারা অসোয়াস্তিও বোধ করে না, অপমানও অনুভব করে না, বিদ্রোহও ঘোষণা করে না? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে সেটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু শোনাবে—কিন্তু তবুও উত্তরটা দিচ্ছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বাইরের হাজার চাকচক্য হাজার জুলুম হাজার বড় বড় কথার অন্তরালে এই কথাটাই সত্য হ'য়ে আছে যে, বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষই জীবনের বেশীর ভাগ সময়েই মানুষের সামান্য ধর্ম্মে ধর্ম্মী অর্থাৎ আহার নিদ্রা মৈথুন জীবনের এই তিন ব্যাপার সুচারু সহজ ও সুন্দররূপে হলেই তাদের প্রাণ ও আত্মা তৃপ্ত হয় ও পরিতৃপ্ত থাকে। লক্ষে একজন কি কোটীতে একজন তেমন মানুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় যার অন্তরে আমরা দেখ্‌তে পাই সেই অগ্নি যে-অগ্নি তাকে মানুষের সামান্য ধর্ম্মে সহজ হ'য়ে থাক্‌তে দেয় না— —যে-অগ্নি ঊর্দ্ধ-শিখ হয়ে ক্রমাগত তাকে তার সহজ জীবনে কষ্ট দিতে থাকে—ক্রমাগত তাকে বল্‌তে থাকে—আরাম তোমার এখানে নয়, বিশ্রাম তোমার এখন নয়—হে আত্মবিস্মৃত! তুমি যাত্রী তুমি বীর তুমি যোদ্ধা —হে যাত্রী তুমি যাত্রা কর আমার এই ঊর্দ্ধগামী শিখার আলোকে আলোকে —হে বীর হে যোদ্ধা তুমি গ্রহণ কর ঊর্দ্ধের ঐ আমন্ত্রণকে, আপনার কর ঊর্দ্ধলোকের ঐ সঙ্গীতকে, আপনার সিংহাসনকে স্থায়ী ক'রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ

ক'রে পাত ঊর্দ্ধের ঐ জগতে যেখানে দেবদেবীরা হাতে বিজয়-মাল্য ও কণ্ঠে আশীর্ব্বাণী নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন। সেইখানে—সেইখানে তোমার বিশ্রাম, সেইখানে তোমার সুখ শান্তি আরাম। এদেরই পক্ষে মানুষের সহজ জীবনে সুখী হওয়া সহজ নয়। এবং এদেরই অন্তরের ঐ অগ্নি-শিখায় সহজ মানুষের জীবন-মাত্রা কখনও বা আলোকিত হ'য়ে উঠেছে আবার কখনও বা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। গানে আছে—

"ওমা ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ"

এরাও কখনও বা বরাভয় বহন ক'রে এনেছে আবার কখনও বহন ক'রে এনেছে ধ্বংস—কখনও শান্তি আবার কখনও শাস্তি—এদের অন্তরের ঐ অগ্নি-শিখা কখনও ঘরে ঘরে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়েছে কোমল মধুর রাগিণীতে আবার কখনও ঘরে আগুন লাগিয়েছে ঘোর ভৈরব রাগে। সহজ মানুষের সংসারে এদের আবির্ভাব সব সময়ে সহজ মানুষের পক্ষে বড় আরামের হয়নি।

তাই দেখ্‌তে পাই বিশ্বমানবের যে-সভ্যতা সে-সভ্যতা রূপ পেয়েছে উপরের ঐ লোকগুলোর কল্যাণে—পৃথিবীর বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে বিশেষ যা কিছু তা ঘটেছে ঐ মুষ্টিমেয় লোকদের জন্যে। আজ আমরা জোর গলায় প্রচার করছি এবং প্রাণপণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করছি বটে যে দেশের ইতিহাস মানে হচ্ছে দশের ইতিহাস। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে দশের কোন ইতিহাস নেই—অর্থাৎ সে-ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯৩১ ও খৃষ্টপর ১৯৩১-এ বিশেষ কিছুই তারতম্য পাওয়া যাবে না—সুতরাং তা জানবারও কোন দরকার হবে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে গান ধরেছিলেন—

তোমারি গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমারি রূপে"

মানব-সভ্যতা যদি ঐ মুষ্টিমেয় মানুষদের উদ্দেশ্য ক'রে ঐ গান ধরে কিম্বা বিশাল জনসঙ্ঘ যদি ঐ লাইনটী একটু বদলিয়ে উপরিউক্ত মুষ্টিমেয় মানুষদের লক্ষ্য ক'রে গলা ছেড়ে সমস্বরে তান ধ'রে দেয়—

তোমারি গরবে গর্ব্বিত মোবা রূপবান তব রূপে

তবে তাতে কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ করা হবে না। এবং আমাদের অন্তরাত্মাও অন্তরে অন্তরে জানে এ-কথা। তাই মিষ্টার গোমেজ-প্রমুখ আমাদের সুহৃদ্‌বৃন্দের যখন ভয় ও ভক্তি উৎপাদন করতে চাই তখন আমরা "জয় ত্রিশ কোটী ভারতবাসীকি জয়" ব'লে চীৎকার করি নে—চীৎকার করি "জয় মহাত্‌মা গান্ধিকি জয়" ব'লে। বঙ্কিম অবশ্য লিখেছিলেন—

"সপ্ত কোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্ত কোটীভুর্জৈঃ ধৃত খর করবালে"

কিন্তু আমরা জানি যে যত কোটী তরবারীই হোক্ না-কেন তার প্রকৃত মূল্য প্রকাশ পায় তখন যখন তাদের মাথায় থাকে একজন আলেক-জান্দার বা একজন জুলিয়াস্ সিজার বা একজন নেপোলিয়ান। আমরা পাঁচ কোটী বাঙালী আজ সম্ভবতঃ বড় জোর পঞ্চাশটী বাঙালীর নাম নিয়ে গর্ব্ব কর্‌তে পারি।

আমার এই লম্বা বক্তৃতা শুনে তুমি হয়ত মনে মনে ভাব্‌ছ যে আমি কি বল্‌তে চাচ্ছি—অর্থাৎ what I am driving at। আমি বল্‌তে চাচ্ছি এই কথা যে আমাদের মধ্যে একটী মন আছে ও একটা বন আছে। তাই একটী মনের মানুষ আছে ও একটা বনের মানুষ আছে। এবং আমাদের মধ্যেকার এই বনের মানুষটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনমানুষ হ'য়ে ওঠে। এবং তখন তার কাছে এই বিরাট্ বিশ্বের পরিসমাপ্তি হয় আহার নিদ্রা ও মৈথুনে। এই থেকেই বাঁচবার জন্যে আমাদের মনের মন্দিরে ক্রমাগত নানা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ক'রে চল্‌তে হয়, নানা উচ্চ-আদর্শের ছবি টাঙিয়ে রাখতে হয়। এবং এই সব মন্ত্রেরই একটা প্রধান মন্ত্র হচ্ছে ঐ "কাহারও তাঁবে রহিব না"—অর্থাৎ স্বাধীনতার বাণী, মুক্তির সঙ্গীত, আত্মবশ হবার মন্ত্র। "কাহারও তাঁবে রহিব না" কথাটা খারাপ দেখায় ততক্ষণই যতক্ষণ তা জীবনে সত্য হয়ে ওঠে নি—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা সত্যি সত্যি সত্য হয়ে ওঠে সেই মুহূর্ত্ত থেকে ওর দীপ্তির আর সীমা থাকে না। এই দীপ্তির গুণে আশেপাশের ক্রোধ জল হ'য়ে পরিণত হয় ভক্তিতে, বিদ্রূপবাণী সুর বদ্‌লে পরিণত হয় চাটুবাক্যে। তাই এই ধরণের বাণী আমরা যতই ভাবি যতই শুনি যতই প্রচার করি ততই মঙ্গল—মানুষের পক্ষে, মানব-সভ্যতার পক্ষে। তবেই আমরা সব সময় সজাগ থাক্‌ব যাতে বনের মানুষটী তাঁর শরীর ফুলিয়ে মনের মানুষটীর টুঁটি চেপে না ধরে। সম্ভবতঃ "রাজা ও রাণী"রই একটা গানে আছে

"ওই শোন বাঁশি বাজে
মন মাঝে কি বন মাঝে"

কবি যে ও-গান কি মনে ক'রে লিখেছিলেন—কিম্বা আদৌ কিছু মনে ক'রে লিখেছিলেন কি না তা আমরা জানি নে। কিন্তু ঐ মন-মাঝের বাঁশি হচ্ছে মানুষের সভ্যতার বাঁশি—মানুষের চলার পথে এগিয়ে যাবার বাঁশি আর ঐ বনমাঝের বাঁশি হচ্ছে তার ব'সে পড়বার বাঁশি, তার সভ্যতার স্রোতকে থামিয়ে দেবার বাঁশি। মহাত্মা গান্ধি যখন দেশকে ব্রিটিশের শাসন-পাশ থেকে মুক্ত কর্‌তে চান তখন আমরা শুনি মনের বাঁশি কিন্তু যখন তিনি বলেন—চল চল সেই গরুর গাড়ীর সরল শান্তিময় যুগে ফিরে চল—তখন আমরা শুনি ঐ বনের বাঁশি। বনের

বাঁশি মিষ্টি হতে পারে—বৈষ্ণব পদাবলীর মতো মিষ্টি হতে পারে—কিম্বা—পদ্মার বুকে নৌকোর মাঝিদের ভাটিয়াল সুরে গান শুনেছ?—স্তব্ধ দুপুর বেলা—ঝাঁঝাঁ করছে রোদ—কোথাও একটি গাছের পাতা নড়ছে না—চারিদিকে কোথাও একটী জন প্রাণী নেই—রৌদ্র কিরণে পারের বালি চিক্ চিক্ করছে, জলে ছোট ছোট ঢেউগুলো চক্ চক্ ক'রে উঠ্‌ছে—একটা বক নিঃশব্দে কোথা থেকে উড়ে এসে জলের কিনারে নামল—মাঝগাঙ দিয়ে একটা নৌকো ভেসে চলেছে—তার দাঁড় ফেলার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ—আর সেই নৌকো থেকে মাঝিদের ভাটিয়াল সুরের গান ভেসে আস্‌ছে—যেন এক মুঠো সাদা কোমল পালক তোমার কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে—সব মিলে ভারি চমৎকার লাগে—যেন রূপকথার রাজ্যের একটা ছোট-টুক্‌রো কে ওই দুপুর বেলা সেই পদ্মার বুকে ফেলে গেছে—ফেরবার পথে আবার কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে যাবে!—সে যা হোক্, বনের বাঁশি বৈষ্ণব পদাবলীর মতো মিষ্টি হ'তে পারে—ঐ ভাটিয়াল সুরের মতো মিষ্টি হ'তে পারে—কিন্তু তা কোন হিসেবেই, কোন ক্রমেই, কোন দিক দিয়েই মানুষের সমগ্র জীবন নয়। তরুণ তরুণীর প্রণয়গুঞ্জন কত মিষ্টি কিন্তু তা পুরুষ-নারীর সমগ্র জীবন নয়। মানুষের জীবনকে সহজ সরল করবার ইচ্ছা হচ্ছে ক্লান্ত মন প্রাণের কথা। তুমি আমি বা পাড়ার স্মৃতিরত্ন মশায় ব্যক্তিবিশেষে ক্লান্ত হ'তে পারি, কোন জাতিবিশেষেরও মন ও প্রাণ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হ'তে পারে কিন্তু বিশ্ব-প্রাণ যেদিন ক্লান্ত হ'য়ে উঠ্‌বে সেদিন বিশ্বমানবেরও যে মৃত্যু আরম্ভ হ'য়ে যাবে। আর যতদিন বিশ্ব-প্রাণের স্রোত অব্যাহত থাক্‌বে—যতদিন ঐ 'ডাইনামো' অক্লান্তভাবে চল্‌তে থাক্‌বে ততদিন মানুষের সরল জীবন আশা করা হবে বাতুলতা—আসলে ততদিন বিশ্বমানবের জীবন জটিল হ'তে জটিলতরই হ'য়ে উঠতে বাধ্য। এই জটিলতার মধ্যেই মানুষকে খুঁজতে হবে শৃঙ্খলা। আসলে আসল প্রশ্নটা এ নয় যে কি ক'রে এই জটিলতাকে সরিয়ে দিয়ে মানুষের জীবন সহজ ও সরল ক'রে তোলা যায়—আসল প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে কি ক'রে এই জটিলতাকে অঙ্গীকার ক'রে মানুষের জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করা যায়। জটিল হ'লেই যে অসুস্থ হবে বা অসুন্দর হবে এ-কথা অভিধানে লেখে না।

কিন্তু সে যা হোক্, "কাহারও তাঁবে রহিব না" এ-কথাটা যত বড় স্বাধীনতার বাণীই হোক্ না-কেন, যত বড় নিগূঢ় মুক্তির মন্ত্রই হোক্ না কেন ও-কথার অর্থ কিন্তু কোনদিনই এ নয় যে "কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রহিবে না।" কেননা মানুষের অলৌকিক জীবন একলার জীবন হতে পারে, একটা grand isolation-এর জীবন হ'তে পারে কিন্তু তার

লৌকিক জীবন হচ্ছে সবকে নিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয় "নেতি" "নেতি" ক'রে কিন্তু বস্তু ও বিষয় জ্ঞান লাভ করতে হ'লে "ইতি" "ইতি" চাই। মানুষ যে খালি সামাজিক জীব তাই নয় সে পারিবারিক জীবও বটে। তাই পিতা-পুত্র ভাই-ভগ্নী স্বামী-স্ত্রী মাতা-সন্তান ইত্যাদি সম্বন্ধ মানব-সমাজে থাক্‌বেই। আর এই সব সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা বা অধী-নতার কোন কথা নেই কেননা এ-সব সম্বন্ধের জন্ম হয়েছে স্নেহ প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি থেকে। আর এই স্নেহ প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি মানুষের অন্তরের এমন সব অনুভূতি যে অনুভূতির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই— সুতরাং এ অনুভূতিগুলি তাদের আপন আপন রসের মধ্যেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। তাই কোন প্রকৃতিস্থ পিতাই ছেলেকে লালন পালন করেন না ছেলে তার তাঁবেদারী করবে ব'লে। কোন মার্জ্জিত যুবকই এ-কথা মনে করতে পারে না যে স্ত্রীটি তার কৃতদাসী। তবে পাঁচ বছরের শিশু যদি পিতার দিকে চেয়ে বলে—"কাহারও তাঁবে রহিব না" তবে সেটা তেমনি হাস্যকর হ'য়ে ওঠে যেমন দুঃখের বিষয় হ'য়ে ওঠে যদি পঁচিশ বছরের যুবক এই জগতের দিকে চেয়ে ও-কথা না বলে। তবে এমন মানুষ ত আছেই যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত পাঁচ বছর বয়েসকে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাদের যাবজ্জীবন পরের তাঁবে থাকা ছাড়া আর উপায় কি ?

এ সম্বন্ধে তোমাকে পাঁচ দশ পাতা বক্তৃতা দিতে না পারি তা নয় কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল যে এ-পত্রের পত্রাঙ্ক এসে পৌঁচেছে দশে। সুতরাং Brevity is the soul of wit ইংরিজি এই প্রবচন স্মরণ করবার সময় এসে গেছে। বিশেষতঃ বুদ্ধিমানের কাছে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সুতরাং আজকের মতো এইখানেই "আমার কথাটী ফুরোলো, নটে গাছটী মুড়োলো" করি। এর পরেও যদি প্রশ্ন কর "কেন রে নটে মুড়োলি ?

খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো,
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে।

সুর ক'রে এই গান ধরা ছাড়া আর উপায় থক্‌বে না। ইতি

তোমার

হসন্ত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশ্ব

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে। কি অর্থে এই কথাটি প্রয়োজ্য ভেবে দেখা উচিত। যাঁরা জ্ঞানী পাঠক তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন কাব্যের কোন উপকরণ দেশ ও কালের অতীত, কোন পদ্ধতি সার্ব্বভৌমিক, কোন লিখন-ভঙ্গী অমর। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে, তার উপাদানের ও উপাদান-সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলায় না। সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হ'তে গেলেই দেশ ও কালের ভেতরে থেকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তাঁর দেশ ও কাল উপায় মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাব্য-বস্তু ও কাব্যাবস্থান আমাদের সুপরিচিত না হলেও তাঁরা আমাদের নিতান্ত প্রিয়। তাঁদের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস-গ্রহণের মাত্রা হ্রাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটা দিক্ থেকে আমাদের কাছে দেশ ও কালের একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে অন্ততঃ দেখার আনন্দ হয়, যাকে চিনি না তার কাছে সঙ্কোচ বোধ করি, তাকে আপন করতে সময় লাগে, অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে আমরা ভয় করি, পরিহার করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতনই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। শক্তির এই 'অপ'-ব্যবহার, এই 'অপ-চয়' সহজ-আনন্দ-উপভোগে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। কারণ, অন্ততঃ পরিমাণের দিক্ থেকে বলা যায় যে, কোন এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্থূলভাবে দেখলেই মনে হয় যেন মন একটা বিশেষ ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অ-বিভিন্ন শক্তি বিকিরণ করছে। অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হ'লেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মত সহজ মানসিক কার্য্যের জন্য সাধারণ-পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জ্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায় খাটাতে অনিচ্ছুক হয়। এই অপচয়ের অনিচ্ছা এবং পূর্ব্ব পরিচিতের সাক্ষাৎ-জনিত সহজ-ভাব ও শক্তি-সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্য কোন বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশী মূল্য যদি নাই রইল, তা হলে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ হচ্ছে—দেশ ও কালের মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষের নিকট

কবির রস-সৃষ্টির সহজ-বোধ্যতা, সহজ-উপভোগ্যতা। বিশ্ব-কবি সর্ব্ব-সাধারণের কবি, সহজ কবি।

জ্ঞানী পাঠকদের বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত করা যায় না। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসুর কাছে বিশ্ব-কথাটির অর্থ প্রকাশ পায় তুলনা-মূলক বিচারের ফলে। অর্থাৎ বিশ্বের এই তাৎপর্য্য অর্জ্জন করতে হয়। এমন একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরী করা সম্ভব যার দ্বারা কবির প্রত্যেক কীর্ত্তিকে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালীন রূপসৃষ্টির ধারার সম্পর্কে আনা যেতে পারে। বিনয়াবনত মনে জ্ঞানার্জ্জনের ফলে সাহিত্য-রূপ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূল তথ্য ধরা পড়ে। পৃথিবীর সব বড় কবিই গোটাকয়েক সাধারণ গুণ ও নিয়ম মেনে চলেন। বাস্তবিক পক্ষে নিয়ম নেই, কিন্তু সুবিধার জন্য সাধারণ গুণগুলিকেই নিয়ম বলা হয়। কয়েকটি গুণের উল্লেখ রসিক সমালোচক ক'রে থাকেন, এই যেমন, প্রত্যেক কবি ও আর্টিস্টের অনুভূতি নিতান্তই গভীর ও সত্য হবে, সেই গভীর ও সত্য অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতে প্রত্যেকেই সুসমর্থ হবেন, পাঠকের মনে সেই সব অভিজ্ঞতাকে পুনর্জ্জীবিত করতে প্রত্যেকেই পারবেন; অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মনের ও নিজের মনের স্পষ্ট রূপের একটা মিল থাকবেই থাকবে। অতএব কি রকম ভাবে কাব্যের ও আর্টের সাধারণ নিয়মাবলী আর্টিষ্ট ও কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে জ্ঞানী পাঠক তাই দেখবেন। তুলনামূলক বিচার ক'রে সেই প্রকাশকে বোঝবার ও বুঝে আনন্দ পাবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-কথাটির অন্য একটি অর্থ সার্থক হ'তে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব-কথাটি যে ইঙ্গিত বহন করে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, তুলনামূলক বিচার এবং তারই ফলে 'সৎ'-সাহিত্যের চিরন্তন লক্ষণ-নির্দ্ধারণ।

পূর্ব্বেই বলেছি—একমাত্র সুবিধার জন্যই আর্টের সাধারণ লক্ষণ-গুলিকে নিয়ম বলা যেতে পারে। নিয়ম বল্‌লেই আইন-কানুন কিম্বা নীতি, অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কথা মনে হয়। এই রকম নিয়মে আর্টিষ্টের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় মনে করা স্বাভাবিক। কে না জানে যে আর্টিষ্টকে, কবিকে কেবলমাত্র ঐতিহ্যের সম্পর্কে এনে তার সৃষ্টিকে বিচার করলে, তার অন্য দিক্‌টা, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিগত সত্তার দিকটা ফাঁক পড়ে যায়? ঐতিহ্যের এই প্রকার ঐকান্তিক ধারাবাহিকতার ধারণার দ্বারা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও, সে উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের একটি মূল কথা প্রকাশ পায় না। সৎসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম মনে করা সুবিধাজনক ব'লে, এবং তারই ফলে নিয়মের ধারাবাহিকতা আর্টিষ্টের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে অনেক সময় বাধা

৬

দেয় ব'লে, রস-স্বষ্টির ও রসোপভোগের অন্য একটি ঐক্য-বিধায়ক মূল তত্ত্বের সন্ধান করা দরকার। (রবীন্দ্রনাথ সে সন্ধান নিজেই দিয়েছেন)। মূল তত্ত্বটি হ'ল পার্সন্যালিটি। ব্যক্তিত্বের এই সংজ্ঞাটিতে স্বষ্টির ভেতর ও বাইরের প্রধান তথ্যগুলি সূচিত হয়, ভেতরের স্বষ্টি-চাতুর্য্য এবং বাইরের সৎসাহিত্যের লক্ষণগুলি। কারণ দেশ ও কালকে যে ঐতিহ্যের ধারা প্রাণবন্ত ক'রে অতিক্রম করে তার মূলেও থাকে পাত্র। পাত্রটি শুধু কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার অন্য গুণ যথেষ্টই রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারার মধ্যেও এমন অনেক সাধারণ গুণ রয়েছে যাদেরকে ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে পৃথক ক'রে বাহ্য বিষয় ব'লে গণ্য করা অসম্ভব নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক—কারণ, প্রত্যেক সৎ-পুরুষের কার্য্যই হচ্ছে, নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্ব্বাত্মক ক'রে তোলা। পার্সন্যালিটির প্রধান লক্ষণই এই। (রবীন্দ্রনাথ একেই ক্রিয়েটিভ্ ইয়ুনিটি বলেন।) ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে মৈত্রীভাব রয়েছে। সে বিকাশের গোড়ার কথা এই—বিশেষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব স্বষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সকলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, এবং সেই জন্য ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। পাঠকের বৈশিষ্ট্য যত বিচিত্রই হোক না কেন, আর্টিষ্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে, তাঁর বিকাশ-ধারায় এসে, তাঁর ও অন্যের থেকে নিজের পার্থক্যটুকু হারিয়ে ফেলে, একত্র সম্পূর্ণ হয়। এই ধরণের সম্পূর্ণতাই হ'ল ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা। এক কথায়, আর্টিষ্টের স্বষ্টিতে ছোট আমিটা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হ'য়ে বড় আমিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক পাঠকেরই অভ্যন্তরে, নিজের অজানিত অবস্থায়, এই নতুন স্বষ্টি চলতে থাকে। অতএব এই স্বষ্টি কারুর নিজের সম্পত্তি নয়। তবুও লোকে ভাবে অন্য কথা—কেননা, সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম অভিজ্ঞতা তার নিজত্বটুকু নিয়ে। যদিও হয়ত কোন সম্পূর্ণ অর্থাৎ সৎপুরুষের সাহায্যে সেই নিজত্বকে লোপ পাওয়ানই তার শেষ অভিজ্ঞতা। কবির ব্যক্তিত্ব সমুদ্র-বিশেষ, তার মধ্যে সকল বিশেষের নদ-নদী সম্পূর্ণ হ'তে পারে। তিনি সৎ-পুরুষ, অতএব তিনি বিশ্বের।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি সাধারণের বেলা এবং রসগ্রাহী জ্ঞানী পাঠকের বেলাতেও খাটে। সত্য কথা এই যে মানুষই মানুষের প্রধান আগ্রহের বস্তু, তার আনন্দের প্রধান উপাদান। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে সম্পূর্ণ ও সার্থক হবার তাগিদ্ রয়েছে—সে জানুক, আর নাই জানুক—যে জানে, সেই তাগিদ সম্বন্ধে যে সচেতন, সেই জ্ঞানী, যে জানে না সেই সাধারণ। সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ হ'তে পারে না, অন্ধ-জীবনস্রোতে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলে। এর জন্য তার বরাবরই একটা ক্ষোভ থেকে

যায়। সে ক্ষোভ যখন ঈর্ষাতে পরিণত না হয়, তখনই কোন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশা মেটায়, ক্ষতিপূরণ করে। এটা হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, কিন্তু বুদ্ধি-নামক ইন্দ্রিয়টা সকলের থাকে না, যাদের থাকে তারা আর্টিষ্টের অসম্পূর্ণতা দেখাতেই ব্যস্ত। যাঁদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, তাঁরা সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতেই ব্যস্ত। নিজের আশা মেটান, অর্থাৎ নিজের অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ করা অন্ততঃ বহির্মুখী স্বভাবের রীতি। যাঁরা অন্তর্মুখী তাঁরা একটি মহান্ ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধা-সহকারে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রের বিশেষত্বটুকু বড় আধারের আশ্রয়ে সার্থক হয়। অতএব এই একীকরণ শুধু দেশ, কালের বাইরে নয়, পাত্রেরও বাইরে। আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব যদি সাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের তাগিদ কিম্বা ক্ষোভ মেটায়, তার মধ্যে প্রকাশ ক'রেই হোক, কিম্বা তাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রেই হোক, তাঁর সৃষ্টি যদি আমাদের সুপ্ত সৃজনী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে, তা হ'লে সেই আর্টিষ্টকে বিশ্ব-কবি নাম ছাড়া অন্য নাম দেওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব-বিকাশই হ'ল বিশ্বের মর্ম্মকথা।

অবশ্য একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্য অনেক। সাধারণের আধার ছোট, তার প্রেরণা দুর্ব্বল, তার তাগিদের জোর কম। কিন্তু কোথায় যেন একটা গভীর মিল থাকেই থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, যে জীবনী-শক্তির লীলা সকলের মধ্যেই চলছে, সেই জীবনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি পুনরাবৃত্ত হয়—তবে দ্রুততর ভাবে, সংক্ষেপে, অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। প্রত্যেক জীবেরই জীবনে তার শ্রেণীগত ইতিহাসের পুনরভিনয় হয়। যে সব জীবের জন্য শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হয়, তার মধ্যে জীবনী-শক্তি চৌদুনে চলে। মনে হয়, যেন জীবনের তাল ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে, সুর ও লয় ভ্রষ্ট হয়েছে, নতুন কিছু সংসাধিত হচ্ছে। মানসিক জগতেও এই নিয়মের বড় বেশী ব্যতিক্রম হয় না। মনের ইতিহাসে সাধারণ মানুষ এখনও যৌবনে, অর্থাৎ সভ্যতার স্তরে পদার্পণ করে নি। এখন যদি দেখি, কোন মানুষের সৃষ্টিতে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে সভ্যতার রাজটিকা পরান, শুধু তাই নয়, মনের ভবিষ্যৎ গতির একাধিক ইঙ্গিত তাঁর প্রত্যেক কর্ম্মে ও চিন্তায় নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে, তখনই সে মানুষের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি জুড়ে দিতে পারি। কেননা, মানসিক বিবর্ত্তন ঘটছে, এবং ঘটছে ব'লেই সেটি কোন বিশেষ যুগের ও দেশের সম্পত্তি নয়; কেননা স্থান ও কাল সেই বিবর্ত্তন বোঝবার সুবিধাজনক সঙ্কেত মাত্র। এই মানসিক বিবর্ত্তনের গতিকে নিজের আধারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করান, কিম্বা তার শক্তিতে শক্তিমান হওয়া যদি প্রত্যেক পাত্রের চরম

সার্থকতা হয়, তা হ'লে স্বাতন্ত্র্য হ'য়ে ওঠে বিশ্বজনীন। এবং যে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই গতি সুন্দরভাবে, অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হচ্ছে, তিনি হ'য়ে ওঠেন বিশ্ব-মানব।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রত্যেকেই, দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে, নিজের বিকাশমর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারে। এতে নিজের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না, সে বিশেষ শক্তি সার্থক, সম্পূর্ণ ও সঞ্চিত হয়। প্রত্যেকের বিশেষত্ব তাঁর বিশেষত্বের মধ্যে, তাঁর বিরাট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সঞ্জীবিত হ'য়ে শতদলের মতন ফুটে উঠতে পারে। প্রত্যেকের স্বভাব তাঁর সৃষ্টিতে চরিতার্থ হয়। স্বভাব কথাটির দুটি অর্থ আছে—একটি, মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, অন্যটি সেই দানেরই সার্থক মূর্ত্তি, পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমারৎ। এ দুটি অর্থ যেখানে এক হ'য়ে যায় সেইখানেই সার্ব্বজনীন পরিমাণ, সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়। (যেমন য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের পরিমাণ, পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়েছিল রোমান জুরিষ্টদের সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে।) সেই ভাবে যদি আমাদের দেশাত্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধে পরিণত হয়, তা হ'লে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন্, সকল দেশের। যদি বর্ত্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাঁর চিন্তায় ও কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট হয়, তা হ'লে তিনি ভবিষ্যৎকালের, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সম্পর্কে সকল কালের। যদি তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্য দেশের রস-সৃষ্টির ধারার প্রধান প্রধান পর্য্যায়গুলি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ গতি ইঙ্গিত করে, তা হ'লে তিনি কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের ঐতিহ্যে আবদ্ধ নন্—তিনি হন, সৎ-সাহিত্যিক, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যিক। যদি তাঁর সঙ্গীত-রচনায় আমার সঙ্গীত-প্রিয়তার, আমাদের ও অন্যদেশের সঙ্গীত-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তা হ'লে তিনি শুধু আমাদেরও নন, তাঁহাদেরও নন্, তিনি বিশ্বের। যদি তাঁর কাজের মধ্যে জীবনের সার-ধর্ম্ম অনুসৃত হচ্ছে দেখতে পাই, তা হ'লে তিনি সর্ব্ব-জীবনের। যদি তাঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের নিষ্কর্ষ-সাধন হচ্ছে মনে হয়, তা হ'লে তিনি সর্ব্ব-সাধারণের।

এই রস-সৃষ্টিধারার, এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, এই জীবন-ধর্ম্মের পুনরাবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে আমি বিশ্ব-কবি বলি। লোকেও তাই বলে। অতএব এই আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ান, সে দায়িত্ব-জ্ঞান দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হ'তে দেওয়া, এইটাই হ'ল প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান। নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড

দায়িত্ব লুকান থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হ'লে নামধারীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হয়। তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করেছেন, এখনও করবেন—তাঁর দায়িত্ব তাঁর নিজের প্রতি। তাঁর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। লিখে, চিন্তা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত, আমাদের সাধনার কিন্তু অবসান নেই। রস-সৃষ্টি ক'রে তিনি হন সারা, মোদের কিন্তু এই হ'ল সুরু।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গল্পগুলো শুনে পাঠক বুঝতেই পারছেন যে ছেলেবেলায় আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা একটু বিশেষ গোলমেলে রকমের হয়েছিল। প্রথম ইংরেজী শিখে একেবারে রাতারাতি সুসভ্য হওয়ার যে উৎসাহ দেশে জেগে উঠেছিল, সেটা আমাদের সময়ে অনেকটা মন্দা প'ড়ে গিয়েছিল। আগে যেটা হয়েছিল সেটা বান ডাকার মত। আমাদের সময় যা ছিল সেটা যেন নিত্যকার জোয়ার ভাঁটা। তার থেকে একটা উদ্দীপনা, মাদকতা সঞ্চয় করা বড় শক্ত কাজ। অথচ বাঙ্গালীর প্রাণ উদ্দাম আবেগের জন্য অপেক্ষা ক'রেই আছে। যাক্, নিজের কি হয়েছিল বলি, তাহ'লেই অবস্থাটা সবাই বুঝ্‌তে পারবেন। বাড়ীতে ঘটা ক'রে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হ'ত না। বাবা একেশ্বরবাদী ছিলেন কিন্তু ভগবান্‌কে কখন ডাকতেন তা আমরা জানতেও পারতাম না। মা পূজা আহ্নিক করতেন কিন্তু আমাদের অগোচরে। ঠাকুরঘর ব'লে পদার্থ টা ত বাড়ীতে ছিলই না। আমাদিকে কেউ নিত্য উপাসনা করতে উপদেশ দেন নি, বরং একথা বারবার শুনতাম যে, নিয়মিত লেখাপড়া ও শরীর চর্চ্চা করাটাই বিদ্যার্থীর যথার্থ উপাসনা। এ অবস্থায় আমাদের একের নম্বর কালপাহাড় হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা ঠিক হ'ল না। বিখ্যাত ব্রাহ্ম আচার্য্যেরা কুচবেহারে এলে বাড়ীতে উপাসনা হ'ত আর আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকার আদেশ ছিল। খুব ছেলেবেলায় দুই-একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও উপাসনা করেছিলেন। এতদিনের কথা, কিন্তু তবু তাঁর সৌম্য সুন্দর চেহারা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তন্ময় ভাব এখনও যেন চোখের সামনে রয়েছে। বড় বড় উৎসবের সময় বাবা সমাজে নিয়ে যেতেন। ভালই লাগত, যদিও কতকটা spectacular (ধুমধাম) হিসেবে। ভক্তি চর্চ্চার দিক থেকে যাত্রার ধ্রুব প্রহ্লাদ ঢের বেশী ভাল লাগত। যাত্রা যত ইচ্ছা শুনতে পেতাম, কিন্তু কীর্ত্তন শোনার বিষয়ে কোনও উৎসাহ কেউ দিতেন না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার কথা একরকম taboo (নিষিদ্ধ) ছিল। একদিনকার কথা মনে আছে, কলিকাতা থেকে এক সুগায়ক এসেছিলেন, মজলিশ ক'রে সবাই গান শুনতে বসেছিলেন, বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ তিনি গান ধরলেন, "এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজায়ে বাঁশরী"। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলাম। সংস্কার এই রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দশ বছর আগে হ'লে হয়ত সুরুচি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা ক'রে ফেলতাম, কিন্তু আমাদের মনে অত জোর আগুন

ছিল না। এ সব শিক্ষা সংস্কার সত্ত্বেও অকালে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কবলে কি ক'রে প'ড়ে গেলাম সেইটেই আশ্চর্য্য। কিন্তু আমাদের দোষ খুব বেশী ছিল তা বল্‌তে পারি না।

আগেই জানিয়েছি যে, একটা অব্যক্ত রকমের জাতীয় গৌরব শিশুকাল থেকে মনে জেগে উঠেছিল, সেটার জোর মুক্তি-পিপাসার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। সেই সামান্য অস্পষ্ট আগুনের ফিন্‌কি একদিন ভীষণ দাবানল হ'য়ে কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গলিয়ে দেশের সপ্তসিন্ধুকে বানে ভাসাবে তা তখন কে জানত? একটা বিষয়ে আমাদের মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। এই ঋষিতুল্য কেশবচন্দ্র, যিনি একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে দেন, তাঁর সমাজ-মন্দির খৃষ্টানি গির্জ্জের মত কেন গড়া হ'ল, ভেতরের পূজা-পদ্ধতিই বা মোটামুটি খৃষ্টানি চালের কেন করা হ'ল? মহর্ষির "খৃষ্ট বিভীষিকার" কথা তখন জানতাম না, কিন্তু জিনিসটা ঠিক হজম হ'ল না। কেশববাবুর Band of Hope (মদ্যপান নিবারণী সভা) নিয়ে কিছুদিন খুব খেটেছিলাম। আমাদের খাটা ত হুজুগ বিশেষ, তার কিছু মূল্য হয়ত ছিল না। তবে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমরা টাকা ও প্রতিজ্ঞাপত্রে সই জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু শেষে দেখলাম সব মিছে, সব ভুয়ো। আমাদের সভার যিনি অধ্যক্ষ, যাঁরা আমাদের সহায়, তাঁদেরই অভ্যাস দোষ সব চেয়ে বেশী। এ অবস্থায় আমাদের ছেলে-ছোক্‌রার উৎসাহই বা থাকে কি ক'রে? ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদের কেউ কেউ আমাদের বড় ভালবাসতেন। তার মধ্যে নববিধানের মহাজ্ঞানী গৌরগোবিন্দবাবু ও সাধারণ সমাজের ভক্ত নবদ্বীপ দাস মহাশয় দুজনের নাম করব। এঁদের দুজনের কাছে শিখেছিলামও অনেক। কিন্তু কই, এঁরা ত এঁদের সমাজের অনাচারী সাহেবদের কিছু বলতেন না। এই সব পাঁচ রকমে মন বড় বিগড়ে গিয়েছিল। একজন ভক্ত কর্ম্মীর কথা কিন্তু মনে আছে, যিনি তখন আমাদের মন একেবারে কিনে নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামকুমার। কুচবেহারে এসেছিলেন গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর বেশে। আসামের চা-বাগানে তখনকার দিনে কুলিদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হ'ত। পণ্ডিত মহাশয় বাগানে বাগানে ঘুরে সব খবর জেনে কুলিকাহিনী ব'লে এক গল্পের বই লিখেছিলেন। সেই বই থেকেই বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ এই অত্যাচারের কথা প্রথম সব জানতে পারলে। পূজনীয় পণ্ডিত যতদিন কুচবেহারে ছিলেন, আমরা দলবেঁধে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘুরলাম আর কত গল্পই তাঁর কাছে শুনলাম। শুনে মনে ইংরেজ জাতের উপর শ্রদ্ধা ভালবাসা বাড়ে নি সেটা নিশ্চিত।

কয়েক বছর পরে যখন বিলেত যাই তখন আমার ক্যাবিন-সঙ্গীদের মধ্যে Adam ব'লে একজন চা-বাগানের সাহেব ছিল। আমি একে নেটিব তায় বালক, এক কামরায় থাকা সত্ত্বেও সে আমার দিকে চেয়েও দেখত না। কিন্তু একদিন সে আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে এল। আমি ছিলাম নিতান্ত ভালমানুষ, খুব রাগ না হ'লে গায়ের muscle-গুলো শক্তও হ'ত না। আমাকে দড়াম ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল, "তুমি নাকি সিবিল্‌ সার্বিস্‌ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ? কি দরকার এত কষ্ট করার, তোমরা ত মাসিক দুশো টাকা হ'লেই রাজার হালে থাকতে পার।" আমি ছেলে মানুষ কি বা জবাব দেব, কিন্তু মা সরস্বতী জিবের ডগায় এসে জবাব দিলেন, "দেখি চেষ্টা ক'রে, যদি ইংরেজ একটারও এদেশে আসা বন্ধ করতে পারিত কষ্ট সার্থক হবে।" সাহেবটা একবার দুবার "ঘোঁক্" ক'রে উঠে গেল। তার পর আর সারা পথ আমায় জ্বালায় নি। কিন্তু এই ঘটনার এক মজার ফল হ'ল। আমার আর এক ক্যাবিন-সঙ্গী ছিল, তার নাম Stewart, সে সওয়ার পলটনের কাপ্তান। পয়সার অভাব, তাই স্ত্রী ছেলেকে উপর কেলাসে দিয়ে নিজে সেকেণ্ড কেলাসে যাচ্ছিল। সেও কোন দিন আমার দিকে ফিরে চায় নি, কিন্তু যখন Adam ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে গেল, তখন সে হেসে আমার কাছে এসে বসল আর "গুড্‌ মর্ণিং" ব'লে গল্প জুড়ে দিলে। শেষে বল্‌লে, "আমি তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় খুসী হয়েছি, you are a boy of the right sort (তুমি ছেলের মত ছেলে)।" আমি একটু কাঁচুমাচু হ'য়ে তাকে বল্‌লাম যে, "আমি নিরীহ ছেলে, সাত চড়ে রা বেরোয় না, কিন্তু চা-বাগানের সাহেব আমি বরদাস্ত করতে পারি না; আসামের কোলের কাছে মানুষ হয়েছি, সেখানকার জুলুম অত্যাচারের কথা কোনদিন্‌ ভুলতে পারিনি।" কুলিকাহিনীর এক-আধটা গল্পও বল্‌লাম, কিন্তু কাপ্তান বিশ্বাস্‌ করলে না, বল্‌লে, "না না, এ হতেই পারে না, তোমায় কেউ বোকা-বুঝিয়েছে।" বাকী যে কদিন জাহাজে ছিলাম, এই সাহেব আমায় অনেক যত্ন করেছিল, তার স্ত্রী বিলেতে তাঁদের বাড়ীতে যেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। আমি সে নিমন্ত্রণ নানা কারণে রক্ষা করতে পারি নি। কিন্তু এই ব্যাপারে মোটামুটি বুঝে নিলাম যে, ইংরেজ জাতের কাছে সোজা কথার খুব কদর। পরে ইংরেজের সঙ্গে অনেক কারবার করেছি কিন্তু এ বিষয়ে আমার ধারণা কায়েম আছে।

চা-বাগানের সম্বন্ধে আমায় কেউ যে বোকা বোঝায় নি সেটা পরে ভাল ক'রেই জানতে পেরেছিলাম। বিলেতে আমি অধিকাংশ সময় ঘর ভাড়া ক'রে থাকতাম। আর আমার অভ্যাসদোষে আমার ঘরে

আড্ডাও জমত খুব। এই ধরণের আড্ডাতে সচরাচর যে রকম তর্ক-বিতর্ক হ'য়ে থাকে আমার ঘরেও সেই রকম হ'ত। শুধু একটা কথা উল্লেখযোগ্য। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল সব সময়েই এক, রাষ্ট্রনীতি ও ভারতের ভবিষ্যৎ। কাজেই আমরা খুব গরম হ'য়ে উঠতাম। একদিন জোর গলায় এই গবেষণা চলছে, এমন সময় বাড়ীর ঝিটা এক চিঠি নিয়ে এল, তাতে লেখা আছে, "আমার স্ত্রীর বড় কঠিন অসুখ, মরণাপন্ন অবস্থা, আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্ত্তা চালান ত বড় উপকৃত হই।" নীচে একটা ইংরেজের সই। সই দেখে আমাদের বীর রক্ত ধমনীতে নেচে উঠল, একজন প্রস্তাব করলেন, "লিখে দে, আমাদের বয়ে গেল।" শেষ পর্য্যন্ত কতদূর বাঁদরামি ক'রে তুলতাম জানি না কিন্তু এক সাহেব সশরীরে এসে ঘরে উপস্থিত হ'ল। কথায় বোঝা গেল সেই চিঠি দিয়েছে। সে বল্‌লে, "আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমার স্ত্রীকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে। আপনাদের কথাবার্ত্তায় ব্যাঘাত করলাম, কিছু মনে করবেন না।" আমাদের রাগ প'ড়ে গেল। ভদ্রলোক ব'সে একটু গল্পস্বল্প ক'রে বেরিয়ে গেল। তার দু-চার কথাতেই মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। আমরা ভারতবাসী, একথা জেনে সে বল্‌লে, "আমিও ভারতবর্ষে পনের বছর ছিলাম। যে অত্যাচার অনাচার করেছি, আজ তার ফল পাচ্ছি। আমাদের রাজত্ব এই পাপে ধ্বংস না হ'লে হয়।" লোকটী উপর-তলার ভাড়াটে ছিল। এই আলাপের পর, তার স্ত্রী ফিরে আসা পর্য্যন্ত কদিন প্রায়ই আমার ঘরে এসে গল্প করত। একটা কথা আমায় বিঁধে বিঁধে বার বার বল্‌ত, "তোমাদের দেশের লোক সহায় না হ'লে এত পাপ চলতে পারত না।" কথাটা একশোবার ঠিক। পাপ আমাদের, ভোগ আমাদের, অন্যলোক নিমিত্ত মাত্র।

ভদ্রলোক আসামে চা-বাগানের সাহেব ছিল। পনের বছর অশেষ অনাচার ক'রে, হায়রান হ'য়ে, দেশে পালিয়ে এসে বিয়ে থা ক'রে সবে বছর খানেক বাস করেছে। সদাই তার ভয় যে, তার পূর্ব্বজীবনের সঞ্চিত ভোগ কবে তার ঘাড়ে এসে চাপে, আর তার নূতন সংসার চূরমার ক'রে দেয়। ভারতবর্ষে তার পরেপরে তিনটী স্ত্রী (?) ছিল। প্রথম দুটীকে চা-বাগানেই বিনা আয়াসে সঞ্চয় করেছিল, আর তেমনি নির্ব্বিবাদে তালাক দিয়েছিল, দু-চার মাস রেখে। শেষেরটী পাহাড়ের এক কন্‌ভেণ্ট্ ইস্কুল থেকে রপ্তানি। কিছু লেখা-পড়া আগেই জানত, সাহেব তাকে গ'ড়ে-পিটে, শিখিয়ে বুঝিয়ে সহধর্ম্মিণী না হোক্ সহকর্ম্মিণী ক'রে নিয়েছিলেন। মেয়েটী আমাদের বাঙ্গালী, পাঁচ বছর সে বাটীতে গৃহিণীপনা করেছিল। তাকে সাহেব ভাল বাসতেন ব'লে দেশে ফেরবার

সময় মাঠে ছেড়ে না দিয়ে নিজের খানসামার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষ প্রশ্নের এক রকম সমাধান ক'রে এসেছিলেন। এই মেয়েটী একবার সাহেবের প্রাণ কি ক'রে বাঁচিয়েছিল সে গল্প শুনলাম। বাগানে দুটী কুলি-মেয়ে ছিল, তারা বাঁকুড়া জেলার চাষী-কন্যা। বড়টী দিন কয়েক সাহেবের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল, কিন্তু ছোটটীকে সাহেব কোন মতেই দখল করতে পারেন নি। তার দিদি তাকে সর্ব্বদা বাঘিনীর মত আগলে থাকত। দূত দূতী কেউ তার কুঁড়ের কাছে এগোতে সাহস পেত না। সাহেব বল্‌লে যে, হয়ত এই ছোট বোন্‌টীকে বাঁচাবার জন্যই দিদি অত সহজে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। একথা যদি সত্য হয় ত, মেয়েটী শিবি দধীচির দলের লোক। পাঠক তাকে মনে ক'রে একটী অতি ছোট নমস্কারও করবেন। সাহেবের তখন জোয়ান বয়স, উদ্দাম প্রবৃত্তি, বাধা পেয়ে দুই বোনের সর্ব্বনাশ করবেন স্থির করলেন। কিন্তু জিনিসটা আপাততঃ চাপা পড়ল, কারণ অল্পদিন পরেই সাহেব দার্জ্জিলিঙ্গ বেড়াতে গিয়ে সেখানকার ইস্কুল থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষ সংসার সংগ্রহ ক'রে আনলেন। কিছুদিন পুরানো প্রেম, প্রতিহিংসা, সবই ভুলে রহিলেন নূতনের নেশায়। তারপর একদিন তাঁর বাড়ীতে এক ক্ষুদে হাকীম সাহেব এসে অতিথি হ'লেন। হাকীমরা তখনকার দিনে চা-কর সাহেবদের কুঠীতেই ডেরা নিতেন। চা বাগানে অতিথিসৎকারের একটা নিয়ম ছিল। অন্যত্র একেবারে ছিল না তাও আমি বল্‌তে প্রস্তুত নই। সেই নিয়মমত, অতিথি এলে তাঁকে সে রাত্রের জন্য একটা গান্ধর্ব্ব কি আসুর বিবাহ দিতে হ'ত। সাহেবের প্রতিহিংসার সুযোগ মিলল। বাগানের ডাক্তারবাবুকে ডেকে বল্‌লেন, "ডাক্তার, জমাদারকে নিয়ে যাও, যেমন ক'রে হোক্ আজ খানার পর সেই কুলি-মেয়েটাকে আনাই চাই।" সাহেবের হুকুম তামিল হ'ল। সকালবেলা সর্ব্বদেবময় অতিথিকে বিদায় দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বাগান তদারক করতে বের হলেন। দেখলেন যে, হাওয়ায় কেমন একটা থম্‌থমে ভাব। কুলিরা যে যার কাজ করছে কিন্তু কারও মুখে হাসিঠাট্টা কথাবার্ত্তা কিছু নেই। সেই বোন দুটী এক জায়গায় কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেরই চোখ লাল, যেন গাঁজা খেয়েছে। সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় বড়টীকে রসিকতা ক'রে বল্‌লেন, "কি রে, বোন কি বলে?" তার পা কোদালের ফালের উপরই ছিল। একটানে হাতলটা বের ক'রে নিয়ে মারলে সাহেবের রগের উপর এক ঘা। সাহেব অজ্ঞান হ'য়ে ভুঁইয়ে প'ড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলেন যে কুঠীর বারান্দায় প'ড়ে আছেন আর চারিদিকে দু-তিনশো কুলি গর্জ্জন করছে আর ইঁট ছুঁড়ছে। বাগানের জমাদার

সাহেব বারান্দার কোণে জড়সড় হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। ডাক্তারবাবু চেঁচিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছেন। আর তাঁর স্ত্রী তাঁর দেহের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তাঁকে আগলে, একটা দোনলা বন্দুক মেরে মেরে কুলিদের তফাৎ করছে। ডাক্তারবাবু জানালেন যে, এই সব বেয়াড়া হারামজাদাদের সাজা দেওয়ার জন্য তিনি পাশের বাগানের সাহেবকে খবর দিয়েছেন। বিকেল নাগাদ অন্য বাগানের সাহেবটী তার তিনশো কুলি নিয়ে এসে সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন। আমার সাহেব গল্প বল্‌তে বল্‌তে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ঘটনার moral (নীতি) কি, বুঝতে পারছ ত?" যাক্, শান্তি স্থাপন হ'ল, বড় মেয়েটীকে পুলিশ ও হাকীম মারফৎ জেলে দাখিল করা হ'ল, আর আমাদের ডাক্তারবাবু ছোট মেয়েটীকে বকশিস্ পেলেন। আর বেশী গল্প বলার দরকার বোধ হয় নেই। সেকালের চা-বাগানের অবস্থা পাঠক নিশ্চয়ই কতকটা বুঝতে পেরেছেন। আজ কি অবস্থা ঠিক জানি না। তবে কটন সাহেবের আন্তরিক চেষ্টার ফল না হ'য়ে যায়নি। পণ্ডিত রামকুমারের কথা হ'তে এত কথা এসে পড়ল। আর একটু ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল, কুচবেহারে আমাদের বাড়ীতে থাকত। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। ছেলেবেলায় সাঁওতালদের মাঝে মানুষ হয়েছিল। লাঠি খেলতে বেশ ভাল জানত, আর ধনুকে তীর দিয়ে কি বাঁটুল দিয়ে অব্যর্থ নিশানা ছিল। মহারাজের চাবুক সওয়ারদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়ে ঘোড়াশালের যত দুর্দ্দান্ত ঘোড়া চুরী ক'রে চ'ড়ে বেড়াত। আমার একটী মোটা ভুটিয়া টাট্টু ছিল, সেটা নিয়ে ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতে এল। একদিন এক খোড়ো বাড়ীতে আগুন লেগেছিল, হাতের কাছে মই না থাকায় নেবাবার কোন চেষ্টা হচ্ছিল না। অগ্নিকাণ্ড বেড়েই চলেছিল, এমন সময় আমার বন্ধুটী এসে উপস্থিত হ'ল আর চট্ ক'রে চালের উপর একটা চেরা বাঁশ ঠেকিয়ে তাই দিয়ে চ'ড়ে গিয়ে জল তুলে ঢালতে লেগে গেল। এ রকম ছেলের কি আর ভাল মানুষটীর মত প'ড়ে শুনে কেরাণীগিরি করা পোষায়? অনুকূল হাওয়ায় প'ড়লে এরা অনেকদূর গিয়ে পৌছায়। নইলে বানচাল। বন্ধুর অদৃষ্টে শেষটাই হ'ল। কিন্তু যে জন্যে এর উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে এই। চা-বাগানের কুলিদের দুর্দ্দশায় যখন আমরা হা হুতাশ করছি, এ একদিন কাউকে না ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। বাবার নামে চিঠি রেখে গেল, "অপরাধ নেবেন না, অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। লেখা-পড়া ক'রে আপনাকে খুসী করতে পারলাম না, ইত্যাদি।" আমায় কিন্তু ব'লে গিয়েছিল যে,

চা-বাগানে কুলি হ'তে যাচ্ছে, একবার সাহেবগুলোকে দেখে নেবে। পারলে না কিছু করতে, কারণ বয়স বড় কম ছিল। বছরখানেক কি বছর দুই পরে ফিরে এল, তারপর কয়েক বছর নানা জিনিস চেষ্টা ক'রে, শেষ বহুদূরে অজানার সন্ধানে চ'লে গেল। তখন আমি বিদেশে।

এর কথা বলতে বলতে আর একজনের কথা মনে হচ্ছে। একদিন আমরা তিন বন্ধু প্যারিসে বেড়াতে বেড়াতে সেন নদীর একটা পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি। পুলেতে মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য পাথরের বেঞ্চ। যেতে যেতে দেখি এক বেঞ্চে ব'সে একটী কৃষ্ণকায় যুবক আপেল খাচ্ছে। সে কোন্ দেশের লোক এই বিষয় জল্পনা করতে করতে আমরা চ'লে যাচ্ছি, এমন সময় সে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা আমায় কিছু কি বলছিলেন?" আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। তার পরণে ময়লা আধছেঁড়া লম্বা কোর্ত্তা, মাথায় খড়ের টুপী, হাতে আধ-খাওয়া আপেল। খানিকক্ষণ সকলে একসঙ্গে ব'সে গল্প হ'ল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পরিচয় তিনি দিলেন না। কেবল এইটুকু জানালেন যে, যুদ্ধ শিক্ষার জন্য এদেশে এসেছেন, কিছুতেই কোথাও আমল পাচ্ছেন না। অর্থসঙ্গতির কথা বললেন, "চ'লে যাচ্ছে"। আমি বললাম, "দাদা, চলুন একসঙ্গে কোথাও চারটী খাওয়া যাক্।" জবাব দিলেন, "সে হয় না ভাই, আমার ত নিজের কিছু সঙ্গতি নেই আর ভিক্ষাও করি না।" শেষ বললেন, "তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে, কথা কয়ে, বড় আনন্দ হ'ল। যদি কিছু ক'রে উঠতে পারি ত আবার একদিন দেখা হবে।" আর দেখা হয়নি। ব্রেজিলের সুরেশ বিশ্বাস মহাশয়ের জাতের লোক। ভারতের যদি দিন ফেরে ত এ-রকম কত দেখা যাবে।

আর ডানপিটে ছেলেদের গল্প এখন থাক। নিজের একঘেয়ে জীবনের কথাই বলি। ছেলেবেলায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম শিক্ষার প্রভাবের কথা বলেছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রভাব একরকম ছিল না বললেই হয়। বাবার সঙ্গে উৎসবাদিতে যেমন সমাজে যেতাম, মার সঙ্গে তেমনি পূজা পার্ব্বণে মন্দিরে যেতাম। মন্দির সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ ছিল না, আর মা-ও কোনদিন কোন পূজায় আমাদের বিশেষভাবে যোগ দিতে বলেন নি। আজকাল যেমন হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটা hysteria বা বায়ুর প্রকোপ হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকেছে, তখন তা ছিল না। মার সব রকমে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে একটা fuss বা হৈচৈ কখনও দেখি নি। ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে কালে ভদ্রে দেখা হ'লে শেকহ্যাণ্ডও করতেন, আবার তারা চ'লে গেলে কখন নিঃশব্দে স্নান ক'রে কাপড় ছেড়ে আসতেন কেউ জানতেও পারত না। বাবা খুব চেষ্টা করেছিলেন

যে আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন রকমের গোঁড়ামি না হয়। তাই যেমন রামায়ণ মহাভারত প'ড়তে হয়েছিল, তেমনি মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বাইবেলও খানিক খানিক প'ড়েছিলাম। মুসলমান বাল্যবন্ধুও অনেক ছিল। তাদের কাছে পয়গম্বরের জীবন, মেহদীর কথা, শয়তান ও ফেরেস্তাদের গল্প অনেক শুনে শিখেছিলাম। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ইস্কুল-জীবনের শেষের দিকে মূর্ত্তিপূজা, জাত-বিচার, টিকি, টিকটিকি, হাঁচি ইত্যাদি অনেক জিনিসে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। অন্ততঃ বিশ্বাস করি এই কথা জোরে জাহির করতে লাগলাম। কি ক'রে এ রকম হ'ল তা ভাববার বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব খুব স্পষ্ট আর প্রবল হ'য়ে এল।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক আমাদের এই সময়কার নেতা। আর বঙ্গবাসী আমাদের এই সময়ের Oracle (দৈববাণী)। এই অবস্থায় কলিকাতায় প'ড়তে গেলাম। কপাল মন্দ যে সেই বছরেই Consent Bill (যাকে তখন সম্মতি আইন বলা হ'ত) পেশ হ'ল। নব হিন্দু ভাবের সঙ্গে একে মিশল সরকার বিদ্বেষ। রাস্তায় মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘোরা অভ্যাস হ'য়ে গেল। মুখে বুলি, "ধর্ম্ম গেল", "আইন চাইনা"। যাঁরা সে আইনের পক্ষপাতী, সবাই হ'লেন আমাদের শত্রুপক্ষ। কোথায় গেল ভেসে ছেলেবেলাকার কাগজ পত্র, সঞ্জীবনী ও নব্যভারত, Liberal ও Indian Messenger, সমস্ত মনটা জুড়ে বসল বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি। যে যবনান্নে চিরকাল এত লোভ ছিল, তা দেশের কল্যাণের জন্য ছেড়ে দিতে হ'ল। এমন কি বিলেতী নুন চিনি পর্য্যন্ত গেল। ঘরে ঘরে ছেলেদের সাবান দেশলাই তৈরী হ'তে লাগল। কুচবেহারে থাকতে চুলের পাট করা আমাদের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দলভুক্ত হ'য়ে সেদিকে সময় নষ্ট করা ছেড়ে দিলাম। রুক্ষ কেশ, পরণে মোটা ধুতি চাদর, হাতে বাঁশের লাঠি, তখন লোকে দেখে কি মনে করত জানি না, এখন কিন্তু মনে প'ড়লেই হাসি পায়। টিকির বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সত্যি টিকিটা রেখে উঠতে পারিনি। ফোঁটা মাঝে মাঝে কাটতাম, কিন্তু সে অবস্থায় রাস্তায় বের হ'তে সাহস কুলোয় নি। মন্দিরে যাওয়া আসা করার খুব ইচ্ছা হ'ত কিন্তু হ'য়ে উঠত না। তাই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তারকেশ্বর কালীঘাট দর্শন হয়নি। ব্রাহ্ম আবেষ্টনে জন্ম, তাই গোঁড়ামি যখন এল খুব জোরেই এল। কথায় বলে, "হিঁদুর ছেলে যবন হ'লে, গরু খাওয়ার যম", কিন্তু পেটে সয় না যে। আমার ত আর্য্যামি করতে গিয়ে অজীর্ণ রোগ হ'য়ে প'ড়েছিল। তবে সেটা স্বীকার করতাম না,

দাপটে চালিয়ে নিতাম। সনাতন ধর্ম্মে আস্থা দুতিন বছরেই কেটে গেল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অন্য দীক্ষাটা রয়ে গেল। সনাতনী কীর্ত্তি অনেক করেছিলাম তার দুই একটা গল্প ব'লে এ পর্ব্ব শেষ করব।

যখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি তখন কলিকাতায় খুব জোরে ৺শীতলার কৃপা হয়। ছেলেবেলায় কতবারই টিকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অনুমত নয় ব'লে এবার নিলাম না। উপরন্তু, কয়েকটী প্রবাসী ছাত্রের বসন্ত হয়েছিল, আমরা তাঁদের সেবার ভার নিলাম। আমার ভার নেওয়া মানে কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের মত, কিন্তু রোগীর কাছে ব'সে থাকতাম। মা নিরুপায় হ'য়ে ৺শীতলার ফুল সঙ্গে দিতেন, সেটা কোমরে গোঁজা থাকত। এইখানে উল্লেখ করা উচিত যে, সে সময় বিপদে আপদে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর প্রধান সহায় ছিলেন নীলরতনবাবু। তাঁর ডাক্তারী ও আমার সিনিয়র-(বয়োজ্যেষ্ঠ) দের সেবায় আমাদের সব কটী রোগী বেঁচে গেল কিন্তু আমার সনাতনী চালের জন্য বাবার কাছে ভয়ানক বকুনি খেলাম, বিশেষ যখন দেখা গেল যে মাকে বসন্তের ছোঁয়াচ এনে দিয়েছি।

খাদ্যাখাদ্য বিচার হিন্দুর প্রধান কীর্ত্তি ব'লেই জানতাম। কিন্তু যত দিন পারি আমার অখাদ্যবর্জ্জন বাবার ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। শেষে ধরা প'ড়ল। গরমির ছুটীতে আমরা তিন ভাই কুচবেহার যাচ্ছিলাম। যেখানে রেল-পথের শেষ সেইখানে বাবা আমাদের নিতে এসেছিলেন। চিরপ্রথামত ডাকবাংলায় ষোড়শোপচারে ভোজন ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। সেখানকার খানসামা তের-চৌদ্দবার বিলেত ঘুরে এসেছিল, খুব লায়েক আদমী ব'লেই নিজেকে জানত, আর কাজেও সেটা দেখাতে চেষ্টা করত। আমাদের খিদের ধার বাড়াবার জন্যেই বোধ হয় বাবা menu-টা কি তাই বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় আমার ছোট্ট ভাইটী রস ভঙ্গ করলে, ব'লে উঠল, "বাবা, বড়দা ত ওসব খাবে না। সকালবেলা তিস্তায় মোছলমানে ছোঁয়া ব'লে চা টোষ্টও খায়নি।" বাবা গম্ভীরভাবে তাঁর চোপদার মিশির ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "মিশির, বড়বাবু তোমাদের কাছে খাবেন, নিয়ে যাও।" আমি এত সহজে martyr (শহীদ) হ'তে পারব আশা করিনি। মাথা উঁচু ক'রে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলাম। আশা করি খুব সঙের মত দেখায় নি। কলিকাতায় ফিরে শুনলাম যে, বাবা আমাদের অভিভাবক কাকাকে চিঠি লিখেছেন, "আমার ছেলে এত বড় গাধা হ'তে পারে ধারণা ছিল না।"

এ ত হ'ল ঘরের কথা। একবার খুব বড় আসরে হিন্দুত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় মারা গেলেন। তিনি আমাদের বড় স্নেহ করতেন। দশ দিন আমরা অশৌচ পালন

করেছিলাম, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে আমি গেলাম। যাওয়া মাত্র নারায়ণবাবু ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সেখানে আট-দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসেছিলেন। একটু কথাবার্ত্তার পর জলখাবার এল। দেখলাম যে খাবার সব এত পরিষ্কার যে, নিশ্চয় বিলেতী নুন চিনির তৈরী। আমি বিনয় ক'রে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি এ সব খাই না। পণ্ডিত মহাশয়েরা হেসে উঠলেন, বললেন যে, "এই কথা। এতে আর কি হয়েছে? ওরে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জলখাবার একখানা নিয়ে আয় ত।" অপেক্ষাকৃত মলিন জলখাবার এল। আমার বুকটা দশ হাত হ'য়ে উঠল। পণ্ডিতদের দেখালাম যে Young Bengal (নব্যবঙ্গ) সব অনাচারী নয়।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

মাঘ সংখ্যার পুরানো কথায় গোটাকয়েক মারাত্মক ছাপার ভুল রয়ে গেছে। পাঠক সেগুলো সংশোধন ক'রে নিলে আমরা অনুগৃহীত হ'ব।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১৭ পৃষ্ঠা ৩০ লাইন	বেলাটা	খেলাটা
৪১৮ পৃষ্ঠা ২১ লাইন	ভদ্র	শুভ্র
৪২০ পৃষ্ঠা ২১ লাইন	হনুমান দন্ত	হনুমান দণ্ড
৪২৬ পৃষ্ঠা ৬ লাইন ৪২৬ পৃষ্ঠা ৮ লাইন	ফলতাপুর	কমতাপুর
৪২৬ পৃষ্ঠা ৩২ লাইন	অব্রাহ্মণ্য	অব্রহ্মণ্য
৪২৭ পৃষ্ঠা ২৯ লাইন	নাম	নাচ

মনুষ্যধর্ম্ম

মানুষের চরিত্রে এমন কতকগুলো বিরোধ আছে, যার গুণে, পিশাচ-সিদ্ধের মতো, ভাবিকথকেরও একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে আষাঢ়ে গল্পের নায়ক হ'য়ে থাকা। এমনি কোনো একটা বিসম্বাদের অনুগ্রহেই যে-যুগ গালিলিওকে প্রাণান্ত প্রয়াসে পৃথিবীর সূর্য্যনির্ভরতা ঘোষণা করতে দেখেছিলো, ঠিক সেই যুগেই য়ুরোপে মনুষ্যধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুপাতে মর্ত্যলোককে অণোরণীয়ান্ জেনেও উজ্জীবিত পশ্চিম বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করলেনা, ধ্রুপদী সভ্যতার দৈবানুগত্যে ফিরে গেলোনা; মধ্যযুগের অধ্যাত্মনিষ্ঠাকে নান্যপন্থা ব'লে মানলে না; সে তার পিতাপিতামহের ভয়-ভাবনা, শিক্ষা-সংস্কার মুহূর্ত্তমধ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে, চণ্ডীদাসের অনুকরণে গান ধরলেঃ "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। এই গানে আন্তরিকতা আনতে হলে কী পরিমাণ একাগ্রতা, অভীপ্সা ও আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, তা যিনি বোঝেন, তাঁর কাছে পশ্চিমের আকস্মিক উন্নতি আর রহস্যময় বোধ হবে না। মানুষের জগতে মানুষই নিত্য, মানুষের জগতে মানুষই উপাস্য, মানুষের জগতে মানুষিক মঙ্গলই একমাত্র লক্ষ্য, এই মহাসত্যকে যে-জাতি সমগ্রভাবে তার শিল্পে সাহিত্যে, দর্শনে বিজ্ঞানে, জীবনে মরণে উপলব্ধি করেছে, তার অভ্যুত্থান অপ্রতিহত হতে বাধ্য। কোনো অনধিগম্য অমরার হতাশ আকাঙ্ক্ষা সেই আদর্শের পটভূমি হয়ে ওঠেনি, সেই জন্যেই তার আহ্বানে সারা বিশ্বে সাড়া জেগেছিলো। মানুষের মহামিলনই ছিলো সেই নিমন্ত্রণের মূলমন্ত্র, তাই সে-সমবেত আক্রমণে চিরবৈরী প্রকৃতিরও সন্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অমিশ্র সিদ্ধি অনন্ত স্বর্গের মতোই শুধু কবি-কল্পনা; জীবনে জন্ম-মৃত্যুর সীমাসন্ধি অনিশ্চিত; এবং শীতের পশ্চাতে বসন্তও যেমন আসে, বসন্তের পরে গ্রীষ্মের আগম হয়তো তারও চেয়ে ধ্রুব। সম্ভবত এই কারণেই নবজাত মনুষ্যধর্ম্ম অচিরে ব্যক্তিবাদে পরিণত হলো। বিশ্বমানব অতিবাস্তব হলেও, সে হাওয়ার মতো। তাকে বাদ দিয়ে বাঁচা শক্ত, অথচ তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ব্যক্তি স্পর্শনীয়, তার ধাক্কায় পথে চলা বিপদ, তার সংসর্গ চেষ্টা করেও এড়ানো দুষ্কর। উপরন্তু সে-কালটা ছিলো ব্যক্তির অনুকূল। শূদ্র সেদিন অন্ধকূপ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সমাজপতিদের অনুরূপ অর্থ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মতো সুযোগ সে তখনো পায়নি। তা ছাড়া বিশ্বের সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়, কাজেই সে-

হয়তো সেদিন বোঝেনি যে আলোর আশীর্ব্বাদ গিরিশৃঙ্গকে প্রথম স্পর্শ করলেও, পর্ব্বতচূড়া অনুর্ব্বরই থেকে যায়; কিন্তু সে-আলোককে চরিতার্থ করে সমভূমির সফলতা। কারণ যাই হোক্, মানুষ সেদিন তার অন্তরের বিশুদ্ধ শূন্যতায় ব্যক্তির পাদপীঠ স্থাপনে বিলম্ব করেনি। ফলে যারা অত চেষ্টায় স্থাণু পৃথিবীকে বিধাতার করায়ত্ত থেকে ছিনিয়ে, উন্মুক্ত আকাশে জঙ্গম ক'রে দিয়েছিলো, এক শ বছর বাদে তাদেরই মুখপাত্র হয়ে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্ একদিন ব'লে বসলেন—আমরা অমৃতের পুত্র, দ্বিধাবিভক্ত অনন্তকে সেতুবন্ধ ক'রে রাখে আমাদেরই জ্যোতির্ম্ময় গতি।

উপরের যুক্তি দিয়ে আমি 'ইতি গজ'-পদটাকে উহ্য রেখে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ উচ্চকণ্ঠে প্রচারের পক্ষে ওকালতি করছি, এমন ভাবলে অন্যায় হবে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, আকস্মিক মুক্তি সচরাচর ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ মাত্র, অনর্জ্জিত জ্ঞান অনেক সময়েই অবিদ্যার নামান্তর, অনভ্যস্ত আলোক সাধারণত অন্ধতাকেই প্রসব করে। কিন্তু কাল ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মতো, তার প্রভাবে প্রায় সকল আতিশয্যই নির্ব্বিষ হয়ে আসে, এবং যে-ব্যাধি সে-প্রলেপেও নিরাময় হতে চায়না, তার অবসান অমোঘ মরণে। উজ্জীবিত পশ্চিম-সম্বন্ধেও এ-সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার পোপ্‌কে উচ্ছেদ করার উৎসাহ পর্য্যবসিত হয়েছে ধর্ম্মব্যাপারে অনীহায়; তার সমাজসংস্কারের উদ্দাম প্রচেষ্টার পরিণাম অর্থশাস্ত্রের অবচ্ছিন্ন অভ্যুদয়ে; তার অদম্য কৌতূহল আজ শান্ত সংযত বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরিবর্ত্তিত। কেবল নির্ব্বিকার রয়ে গেছে তার ব্যক্তিবাদ। না, নির্ব্বিকার থাকেনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে নীট্‌শের কণ্ঠে তা প্রকাশ হয়েছে দানবিক প্রমত্ততার প্রতিমূর্ত্তিরূপে। কিন্তু ব্যক্তির দম্ভ, ব্যক্তির দাবি, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এত দিন ধ'রে সময়ের শাসনকে উপেক্ষা ক'রে এলেও, তার আয়ুও যে অপরিমেয় নয়, সে-প্রমাণ মিলেছে গত মহাযুদ্ধে। আমার বিশ্বাস ওই কুরুক্ষেত্র বিলুপ্তির অগ্রদূত। এখনো হয়তো সংস্কৃতির শেষ সুযোগ অতীত হয়নি; কিন্তু এবারে যদি ব্যক্তি ও তার সহোদর সাম্রাজ্য সমষ্টির সঙ্গে সসম্মান সন্ধিস্থাপনের অবকাশ হেলায় হারায়, তবে আগামী প্রলয়ে তাদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ।

কেউ যেন-না মনে করেন যে, এই অপ্রচলিত মতের সাহায্যে আমি মহতের মাহাত্ম্য অস্বীকার করছি। আমি জানি যে, জগতে দু-চার জন মহৎ মানুষ ছিলেন এবং আছেন ব'লেই আমার মনুষ্যত্বের গর্ব্ব একান্ত উপহাস্য নয়। আমি জানি যে, সম্মিলিত, সমবেত মানুষ বারম্বার এমন আচরণ করে এবং করেছে যে, তাদৃশ ব্যবহার বুদ্ধিবিবেচনাহীন পশুর

৮

কাছেও অপ্রত্যাশিত। আমি জানি যে, জনসাধারণের পক্ষে ভাবুকতার চেয়ে ভাবালুতাই সহজ, বিচারের চেয়ে ব্যাভিচারই স্বাভাবিক, আবেগের চেয়ে আবেশই শোভন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমার অবিদিত নেই যে, মহৎ মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়; আমার পাশে সে যতই গগনস্পর্শী হোক্, তবু তার মনুষ্যত্বেরও একটা সীমা আছে, এবং সেই সীমা আছে ব'লেই মানবসমষ্টির প্রতিযোগিতায় তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে মহামানব বিশ্বমানবের প্রতিভূ। তাকে আগ্নেয়-গিরির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাকে প্রণালী ক'রে যে-দীপ্তি, যে-তেজ, যে-দাহ উৎক্ষিপ্ত হয় সে-সমস্তই মানবীয় গৌরবের কণামাত্র। অবশ্য, এই অন্তঃশীল ঐশ্বর্য্যের বাহক হতে পারা কম গর্ব্বের কথা নয়; এর মধ্যে এমন একটা অনির্ব্বচনীয়, এমন একটা অমেয় মুক্তির প্রেরণা আছে যে, তার উন্মাদনায় আমাদের সীমাবধারণের শক্তিটা সহজেই লোপ পায়। কিন্তু তাই ব'লেই একজন মহামানব, এমন-কি জগতের মহামানব-সমবায়, বিশ্বমানবের চেয়ে গরীয়ান, এ-দর্প চূর্ণ হবেই হবে।

উপরের কথাগুলোয় যে-অর্থবিরোধের আভাস আছে, তা হয়তো একটা উপমার সাহায্যে দূর হবে। সৌরজগতে যেমন সূর্য্যের প্রধান্য অস্বীকার করতে চাওয়া পাগলামি, তেমনি মনুষ্যসমাজেও মহামানবের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সমগ্র সৌরজগতের অনুপাতে স্বতন্ত্র সূর্য্য যে-কারণে গৌণ ব'লে বিবেচিত হতে বাধ্য, ঠিক সেই কারণেই মানবগোষ্ঠীর পাশে নিঃসঙ্গ মহামানবকে উপেক্ষা করা স্বাভাবিক। সূর্য্যের তুলনায় সৌরজগৎকে বৃহৎ বলা সম্ভব, কারণ সে-জগতে সূর্য্যের স্বকীয় উৎকর্ষ তো বাদ পড়েই না, বরং আরো কতকগুলো অখ্যাত গ্রহনক্ষত্রের গুণাবলীর সমন্বয়ও তারি মধ্যে ঘটে; এবং মানবসমষ্টিও মহামানবের চেয়ে বড়, কারণ মানবসমষ্টি মহামানবের বিয়োগে গঠিত নয়, মহামানব ও ক্ষুদ্রমানবের সন্নিপাতেই সৃষ্ট। পক্ষান্তরে, সূর্য্য সৌরজগতের অধিপতি হলেও, যেমন তার উপাদানে আর নিকৃষ্টতম উল্কার উপাদানে একটা মূলগত ঐক্য আছে এবং সেই সাদৃশ্যের শাসনেই তারা উভয়ে একটা বিশেষ আয়তনে, একটা বিশেষ আচরণে, একটা বিশেষ অয়নে চিরকাল আবধ্য; তেমনি মহামানুষ ও মামুলি মানুষ, এরা দুজনেই নির্ম্মিত এক ধাতুতে, দুজনেই চালিত এক প্রবর্ত্তনায়, দুজনেরই সুরু জন্মে এবং শেষ মৃত্যুতে। অবশ্য এক আর দুই, এই সংখ্যা দুটি যেমন একটা ভগ্নাংশক্রমে সংযুক্ত, তেমনি জন্ম ও মৃত্যু, এই মর্ত্ত্যসীমার মধ্যেও তারতম্যের প্রায় ইয়ত্তা নেই, বললেই চলে। কিন্তু এই পরিধির মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা অগণ্য হলেও, অনন্ত নয়। বৃত্তবদ্ধ ব্যোমের মতো

সুপরিমিত পৃথিবীর মধ্যেও বামন ও অসুরের ভিতরকার প্রভেদ ততটা মৌলিক নয়, যতটা মৌলিক তাদের সাদৃশ্য।

আমি উপমার খাতিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-নিয়ম মানুষের সম্বন্ধে চালালুম, তা, হয়তো, এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাই ব'লে জড়-বিজ্ঞানের রীতি-নীতি প্রাণময় মানুষের পক্ষে অপ্রযোজ্য, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য বিজ্ঞানে আমার অজ্ঞানতার পরিমাপ করতে হলে, সুমেরুকেও মানদণ্ড-হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। এবং সেই জন্যেই সম্ভবত ফরাসী রাসায়নিক স্তেফান্ লত্যুক্-এর 'অস্মোসিস্'-সংক্রান্ত গবেষণার কথা শুনে, আমি এত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছি। কিন্তু বিভিন্ন দ্রাবণের সুচিন্তিত সংমিশ্রণে যদি এমন ব্যাঙের ছাতা, ঘাস, বীজ, ফুল, পাতা, পলা, কড়ি ইত্যাদি রচনা করা যায়, যাতে বিশেষজ্ঞেরও ভুল ঘটে, তবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণসঞ্চারের ব্যাপারটাকে, হয়তো, আর অগম-রহস্যের অন্তর্গত ব'লে না-ভাবলেও চলবে। এই কল্পিত প্রত্যূষের প্রায়ান্ধকারে জীবকে জড়ের প্রতিভাস ব'লে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হাস্যকর হতে পারে, তবু জীব যে জীবনের লৌহ নিগড়ে বাঁধা, জীব যে সান্ত, জীব যে ক্ষয়শীল, সে-কথার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। জীববিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান থেকে খুব বেশি রোমহর্ষক নয়; এবং জড়বিজ্ঞান যেমন প্রথমাণু থেকে নীহারিকা পর্য্যন্ত, জড়ের সমস্ত অভিব্যক্তির সম্পর্কে খাটে, তেমনি জীববিজ্ঞানের প্রসারও, এককোশী শষ্প থেকে বহুলাঙ্গ মানুষ পর্য্যন্ত, জীবনের সকল আবির্ভাবকেই আচ্ছন্ন ক'রে আছে। তবে প্রাধান্য জড়বিজ্ঞানেরই, কারণ জীবনের উপক্রমণিকা যদিই বা জড়বিজ্ঞানের নিয়ম অমান্য করে, তবুও জীবনের বৃদ্ধি এবং স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সেই নিয়মে পরিচালিত।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাণের মূলতত্ত্ব ভূতবিদ্যার বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে না। জীবনের চরম পরম ধর্ম্ম হচ্ছে অনুবর্ত্তন ও ক্রমানুসরণ, এবং জড় সান্তর ও অধোগামী। এই পার্থক্য সম্ভবত আমাদের অজ্ঞানতা-প্রসূত; হয়তো বিজ্ঞানদৃষ্টির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে, প্রভেদটা আসলে বাহ্য। কিন্তু তা যদি না-ও হয়, জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে যদি বিবাদটা আরো প্রাথমিক ব'লে ধরা পড়ে, তবু ওর পৃষ্ঠপোষণে ব্যক্তির অনন্যতন্ত্রতা, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির উৎকর্ষ কি ক'রে টিঁকতে পারে, তা আমি বুঝি না। জীববিদ্যা থেকে যদি কোনো নীতি আহরণ করা সম্ভব হয়, তবে তা হচ্ছে, ঈসপের ভাষায়, ঐক্যই শক্তির হেতু, বিচ্ছেদ অধঃপতনের মূল। প্রাণের প্রাক্তন প্রকারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, শুধু যে তাদের মিশ্র উপকরণের বৈচিত্র্য বোঝা যায়, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে

এটাও সাব্যস্ত হয় যে, প্রাণপ্রবাহের নিমিত্তও ওই সংমিশ্রণ, ওই সহযোগ। জীবলোকের সোপানমার্গে যতই উঠি, এই সংযোগ ততই প্রত্যক্ষ করি; এবং শেষকালে ভিন্নাবয়ব প্রাণীর প্রকোষ্ঠে এসে থামলে দেখি যে, তাদের প্রজনন তো দ্বিবিধ প্রাণকোশের পরিপূর্ণ সঙ্গমে ঘটেই, এমন-কি তাদের প্রত্যেকের পৃথক দেহও একটা অদ্বৈত সমষ্টির আধারমাত্র; অর্থাৎ তাদের স্বয়ম্বশ দেহের অখণ্ডায় ভেদবুদ্ধির লেশ পর্য্যন্ত নেই, তাদের সজীব অবয়বগুলির কোনো দেহাতীত অস্তিত্ব নেই, একের দুঃখ অপরের মধ্যে সংক্রামিত, একের হর্ষে অন্য সকলেই পুলকিত। আমার বিশ্বাস, এই নিগূঢ় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব'লেই, জীবজগৎ ভূতজগতের উপরে স্বাধিকার-বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। জড় সাধ্যপক্ষে তার স্বকীয়তা বাঁচিয়ে চলে। তা সত্ত্বেও সংহতি অবশ্যই ঘটে, কিন্তু সে-যোজনার প্রবর্ত্তনা আন্তরিক নয়, তার হেতু দৈবদুর্ব্বিপাক। তাই যখন আবার বাইরে থেকে বিকলনের তাগিদ আসে, তখন সে ওই আপতিক সম্বন্ধ-বন্ধন থেকে তার আত্মরত সত্তাকে নিষ্কৃতি দিতে মুহূর্ত্তেক বিলম্ব করেনা। কিন্তু প্রাণের মিলন সাধিত হয় অস্‌মোসিস্‌-জাতীয় কোনো একটা অন্তর্গূঢ় প্রেরণায়। ফলে বাহির থেকে বিয়োগের আদেশ পেলে, দুটি আশ্লিষ্ট প্রাণকোশ তাদের সৌহৃদ্যসূত্র ছিন্ন করতে পারেনা, বরণ করে সহমরণ। প্রাণের পিছনে এই নিবিড় অনুষঙ্গ রয়েছে ব'লেই, বোধ হয়, জীবনের রথ-পতাকায় প্রত্যুৎপাদন-ও পরিবর্ত্তন-রূপ গৌরব-লাঞ্ছন দুটি গত পঞ্চাশ কোটি বৎসরেও ম্লান হয়নি।

জীবজগতে প্রাণকোশের যে-স্থান, মনুষ্যলোকে ব্যক্তির অবস্থাও তদনুরূপ। তার আধিপত্যের কারণও ঐক্য, অহংসর্ব্বস্ব হলে, তার সর্ব্বনাশও অনিবার্য্য। জীবন প্ররোহী এবং পরিবর্ত্তনশীল ব'লে, কেউ যেন না-ভাবেন যে তার এই গুণ দুটি কোনো অলৌকিক প্রসাদের পরিচায়ক। তা তো নয়ই, এমন-কি ভূতজগতের মূলে ভ্রাম্যমাণ অণু-পরমাণুর আচরণেও যে-একটা তথাকথিত স্বৈরাচারের ইঙ্গিত আছে, জীবজগতে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত। পূর্ব্বে আমি জীবকে পৃথিবীর অধিশ্বর-নামে অভিহিত করেছি, কিন্তু তার কারণ আমি নিজেও জীবজাতীয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে, জীব আবহমান কাল পৃথিবীর নিতান্ত নগণ্য অধিবাসী, জীব আজন্ম শূদ্র। সে শুধু অন্য জীবের সাহচর্য্যেই অভিষ্টসিদ্ধিতে কৃতকার্য্য হয়নি, যুগযুগান্তর ধ'রে স্থবির হয়ে ব'সে থেকেছে ভূতপ্রকৃতির আনুকূল্যের প্রত্যাশায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদেরা আজকাল বলতে সুরু করেছেন যে, সৃজনের আদিতে সমস্ত আকাশ জড়ের একটা লঘু এবং নিরন্তর প্রসারে পরিপূর্ণ ছিলো; তার পরে জড়েরই স্বভাবগত ধর্ম্মে সেই অবিচ্ছিন্নতার

মধ্যে হলো পুঞ্জের প্রাদুর্ভাব। জীবনের বিকাশে এই প্রাক্তন চপলতাটুকুও অদ্যাবধি ধরা পড়েনি।

জীব নিশ্চয়ই তার সন্তানসন্ততির ভিতর দিয়ে নিজের অস্তিত্বসূত্রকে নিরবচ্ছিন্ন রাখ্‌বার চেষ্টা করে; কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির তাড়নাব্যতিরেকে তার অন্তরে কোনো অভীপ্সা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া গেছে ব'লে আমি অন্তত জানিনা। কোটি কোটি বৎসর ধ'রে অভিব্যাপ্ত সমুদ্র যতদিন নিঃস্রোত ছিলো, 'ট্রাইলোবাইট্' এবং সমগোত্রের জীবেরা ততদিন তাদের শুক্তির সৌধে স্বচ্ছন্দ নিদ্রায় বিভোর থাকতে এতটুকু আপত্তি করেনি। কিন্তু প্রকৃতি বিমুখ হলো, আস্তে আস্তে এখানে ওখানে একটা দুটো পাহাড় মাথা জাগিয়ে উঠে দাঁড়ালো, একটা দুটো নদী অচল সমুদ্রে চাঞ্চল্য এনে দিলে; এবং যুগের পর যুগ লণ্ডভণ্ড ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, কম্বুজাতি অল্পে অল্পে বুঝতে লাগলো যে, বাঁচতে হলে, তাদের এমন দেহের দরকার যা স্রোতের সঙ্ঘাতে নুয়ে যাবে অথচ ভাঙবে না। তারপর আবার কোটি কোটি বৎসরের সমবেত চেষ্টায় জীব মেরুদণ্ডের সন্ধান পেলে। এই ইতিহাসের অনুমোদনে যিনি জীবের স্বাতন্ত্র্য ও জীবনের অতিমর্ত্ত্যতা প্রমাণ কর্‌তে পারবেন, তাঁর দৃষ্টিকে দিব্য বল্‌তেই হবে।

উপরের বর্ণনায় প্রগতির পদচিহ্ন খুঁজতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ ট্রাইলোবাইট্‌দের কাহিনীতে মেরুদণ্ড আবিষ্করণটা তত দ্রষ্টব্য নয়, যত দ্রষ্টব্য ওই জাতির উচ্ছেদ-ব্যাপারটা। প্রগতির প্রসঙ্গে এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা দরকার যে, ট্রাইলোবাইট্, ডাইনোসর্, ম্যামথ্ প্রভৃতি অধুনালুপ্ত জীবেরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন যুগে উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছেছিলো; এবং বৈশেষিকতার সীমা অতিক্রম করেছিলো ব'লেই আজকে আর তাদের স্মৃতিটুকুও অবশিষ্ট নেই। জীবনেতিহাসের পাতায় পাতায় প্রকৃতি, বোধ হয়, এই তত্ত্বটিকেই বার বার রেখাঙ্কিত করেছে যে, অতিবৃদ্ধি তার অনভিপ্রেত; যে সে পছন্দ করে সেই জীবেদের, যারা সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিমানের সুমিত গণ্ডিকে লঙ্ঘন কর্‌তে অপারগ বা অনিচ্ছুক। অবর, ইতর, অবজ্ঞেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়, এরাই প্রকৃতির প্রিয়পাত্র। যে-শৈবাল, যে-শিলাবল্ক ঝড়ে ভাঙেনা, রৌদ্রে শুকায় না, জলে ধুয়ে যায়না, জীবনের আরম্ভ থেকে অদ্যাবধি তারাই আছে অবিনাশ; অথচ তাদের পরবর্ত্তী অভ্রভেদী বনস্পতিরা আজকে কয়লায় পরিণত। অজ্ঞাত অখ্যাত জীবাণুদের ইতিবৃত্তও অনুরূপ; টিরানোসরাসের জীবাবশেষে যে-রোগাবহ বীজাণুর প্রস্তরিত স্বাক্ষর দেখা যায়, আধুনিক মানুষের অস্থিতেও সে আজ মৃত্যুর অগ্রদূত-রূপে বিদ্যমান। মানুষও যেহেতু জীব, এবং তাকেও যেহেতু প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়, তাই

বৃত্তবদ্ধ প্রগতির ঘূর্ণি লেগে, পূর্ব্বগামীদের দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হওয়া তার পক্ষেও বিপজ্জনক। এবং যেটা জাতির ক্ষেত্রে অহিতকর, সেটা কখনো কোনো ব্যক্তির—তা সে যতই মহান্ হোক্—কখনো কোন ব্যক্তির পক্ষে শুভ হতে পারেনা। কারণ, আগেই বলেছি ব্যক্তির সামর্থ্য, জাতির সামর্থ্যের চেয়ে কম; ব্যক্তির প্রাণশক্তি জাতির প্রাণশক্তির তুলনায় হেয়।

বলাই বাহুল্য, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যে-বুদ্ধির, যে-নির্ব্বাচন ক্ষমতার ব্যবধানে বিভক্ত, তা প্রথম দৃষ্টিতে মৌল, দুস্তর, অভূতপূর্ব্ব ব'লে মনে হয়। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত করবার কোনোই উপায় নেই যে বুদ্ধি ও নির্ব্বাচনক্ষমতা মানুষের নিজস্ব সম্পদ। যে-দেহী সর্ব্বপ্রথম নাড়ীমণ্ডলের আবিষ্কার করে, সেই অতিপুরাতন জীবই মানুষকে বুদ্ধির উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে। এবং যে-উপায়ে আদিম পাকস্থলীবিশিষ্ট জন্তু আপনার অন্ত্রকে জীর্ণ না-ক'রে খাদ্যকে পরিপাক করতে শিখেছিলো, আমাদের জঠরাগ্নি ঠিক সেই দৃষ্টান্তই অনুকরণ করছে। নির্ব্বাচন-পদ্ধতির পুরাবৃত্ত আরো প্রাচীন। "পারামিসিয়ম্"-নামক এককোশী কীট,—যার নাড়ী-মস্তিষ্কহীন আণুবীক্ষণিক দেহের স্বল্পতা দেখে মনে হয়, সেই বুঝি সৃষ্টির প্রথম প্রাণী, তারও বিপদের থেকে পলায়নের এবং আহার্য্যের দিকে পুরশ্চরণের শক্তি আছে। অতএব যদি বলা যায় যে, আধুনিক বৈদ্য যখন রোগীর অনাবশ্যক এপেন্‌ডিক্স্ কেটে, তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচান, তখন তিনিও সেই প্রাক্তন প্রাণীর পদানুসরণ করছেন, তবে আমাদের অহমিকা অল্পবিস্তর প্রপীড়িত হয় বটে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের কোনো অমর্য্যাদা ঘটে না।

মূলত প্রাথমিক জীবের মতো, মানুষের কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাও উপজ্ঞা-ঘটিত। তবে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের বাকযন্ত্রকে ব্যাবহারিক ক'রে তুলেছি; তাই পশুর মতো আচরণের পরে আমরা তার নাম দিই দৈবানুপ্রেরণা। এবং শুধু তাতেই আমরা তুষ্ট নই; যে-লজ্জাকর প্রবৃত্তিগুলো মানুষের একান্ত আপন, পশুজগতে যার ইসারা পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন, এমন সমস্ত বিকৃতির আমরা স্খালন করি জন্তুর দোহাই দিয়ে। উদাহরণ-স্বরূপ মানুষের আষ্টপ্রহরিক কাম-বৃত্তির নাম করা যেতে পারে। মানুষের নিম্নস্তরে এমন কোনো পশু আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি, (সম্ভবত এক বানর ছাড়া) কামায়ন যার নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত, মিথুনকে যে নিষিদ্ধফলের পর্য্যায়ে ফেলে, জীবনে একটা অবাস্তব নন্দনের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। কিন্তু এমনি আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষমতা যে, মানুষের ভাষায় যৌন ব্যাভিচারের প্রচলিত বিশেষণ হচ্ছে পাশবিক।

তবে এ-কথা মানতেই হবে যে, মানুষের ভাষা হচ্ছে তার অপূর্ব্ব অবদান, এটাই তার সম্পূর্ণ আপন, এবং এরি জোরে সে আজ ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ী। মানুষের পূর্ব্বগামীরা এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয় নি, যার আশীর্ব্বাদে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ব্যতিরেকেও জীবনযাপন সম্ভব। তাই তাদের যুগ ছিলো অপচয়ে ভরা; বংশকে বংশ, পর্য্যায়কে পর্য্যায় উজাড় হয়ে গেলে, তবে জাননিক নির্ব্বাচনের দুর্গম পথ দিয়ে একগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার দায়ভাগ এসে পৌঁছতো আরেকগোষ্ঠীর আয়ত্তে। এই সর্ব্বনাশা যোগ্যতাসঞ্চয়ের মধ্যে মানুষ এলো তার ভঙ্গুরতা নিয়ে। পুরাতন প্রথায় প্রাণপাত ক'রে প্রকৃতির বরণমালা কুড়াবার সাধ যদিই বা তার থেকে থাকে, সাধ্য আদৌ ছিলোনা। কাজেই সে অল্পদিনেই বুঝলে যে, তাকে বাঁচতে হলে, এমন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, যাতে একের বিজ্ঞান বিনা-অনুশীলনেই অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। এমনি ক'রে, ভাষার জন্মও দৈবাৎ; সে-আবিষ্কারের জন্যে কোনো ঐশী শক্তির প্রতিগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। বিশ্লিষ্ট ব্যক্তির দুর্ব্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যেই তার উৎপত্তি। তার আদি লক্ষ্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনকে সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতিহত করা। এই মহাব্রতে ভাষার সার্থকতা অত্যদ্ভুত, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই ব'লে ভুললে চলবে না যে, ভাষা যদিও প্রতিবেশজয়ের পরমাস্ত্র, তবুও তা প্রতিবেশেরই আজ্ঞাবহ। যে-ভুবন আমাদের জ্ঞানের আগোচরে, যে-অবস্থা আমাদের দৃষ্টির উত্তরে, যে-সংঘটনে আমরা অনভ্যস্ত, সে-সকল ক্ষেত্রে ভাষা একেবারেই অকারী।

আমার অনুমিতির প্রমাণস্বরূপ বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র এমনি লোকোত্তর যে শত মনীষীর অক্লান্ত অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাকে এখনো কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে নি, এবং কখনো পারবে কিনা সন্দেহ। ভাষা সাংসারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যে তৈরি, সুতরাং তার সাহায্যে যখন আমরা তারকার আন্তর উত্তাপের পরিমাণ দিতে চাই, তখন সাধারণের মনে চার কোটি ডিগ্রি তাপের কোনো ফলাফলই ব্যক্ত হয় না। সুদূর তারার অন্দরের অবস্থা না-হয় বাদই দেওয়া গেলো, কিন্তু আমাদের নিজের আন্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাও খুব সহজসাধ্য নয়। আসলে যেটা আমরা কখনো দেখিনি, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কখনো সুস্পষ্ট হয়না; উপমার সাহায্যে যদি বোঝানো গেলো তো গেলো, নচেৎ জিনিসটায় আমরা ফাঁকি পড়তে বাধ্য। গণ্ডারের মতো দ্বিরায়তনিক দৃষ্টি লাভ করলে, মানুষের ভাষা ও বুদ্ধি যে কি রূপ ধরতো, তার কতকটার ইঙ্গিত পাওয়া যায় চতুর্থ আয়তন-সম্বন্ধে আমাদের কষ্টকল্পনা থেকে।

ভাষা-সম্পর্কে আমার অনুমান যদিও বা বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবু সকলে এতে সায় দেবেন না, জানি। আমার কথা আর যিনিই মেনে নিন, সভ্যতাভিমানী বিদগ্ধের দল, অন্তত, বিশ্বসাহিত্যের দিকে সজয় তর্জ্জনী নির্দ্দেশ ক'রে, জানতে চাইবেন, সেই প্রকীর্ত্তির সঙ্গে মানুষের পরবশ প্রস্তাবনার সম্বন্ধ কি ? আড্‌লার্-প্রমুখ এক সম্প্রদায়ের মনো-বিদেরা মানুষের সকল প্রচেষ্টার মূলেই "দৈন্যগ্রন্থীর" সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, মামুলি মানুষ, সে কল্পলোকবাসী, সে আদর্শমাত্র ; বাস্তব জগতে যারা জন্মায়, তাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো গুণের অনটন পড়ে। মানুষের সাধনাই হচ্ছে এই অভাব পূরণ ক'রে, আদর্শে উপনীত হওয়া। এঁদের মতে সাহিত্যসেবায় তারাই আত্মনিয়োগ করে, যাদের জন্মগত ত্রুটি কোনো ভৌতিক প্রক্রিয়ায় সারবার নয় ; তারাই কায়াকে ছেড়ে আশ্রয় করে ছায়াকে ; তাদের উপাদানে সোনা নেই, তাই তাদের কারবারে রাঙতার এত ছড়াছড়ি। এই দলের মনস্তাত্ত্বিকেরা আদর্শ মানেন ব'লে, দর্শনশাস্ত্রে যে-মত আদর্শবাদ-নামে পরিচিত, এঁরাও সেই মোহময় মন্ত্রের উপাসক, এমন বিশ্বাস, সম্ভবত, অমূলক হবে। আধুনিক মনস্তত্ত্বে আমি, অন্তত, ক্রমোন্নতিবাদের কোনো সমর্থন পাইনি। এখানে যে-আদর্শের কথা বলা হয়েছে, সে কোনো দুর্লভ তত্ত্ব নয়, সে কেবল ধ্যেয় সত্য নয়, সে-অস্থাবর আলেয়াকে অনুসরণ ক'রে, মানুষ শেষে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায় না। এই পরিপূর্ণতা ব্যষ্টির মধ্যে ধরা না-গেলেও, একটা যে-কোনো সজীব মানবসমষ্টির ভিতরে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবগোষ্ঠীকে বাঁচতে হলে, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে তার যে-সার্ব্বত্রিক সদ্ভাবের প্রয়োজন, এই পরিপূর্ণতা সেই সনাতন মিতালিরই নামান্তর। সুস্থ, সবল ব্যক্তিমাত্রের প্রচেষ্টার পরমার্থ হচ্ছে এই সমীকরণব্যাপারে আত্মোৎ-সর্গ করা। এখানে এই কথাটিই প্রণিধানযোগ্য যে, ব্যক্তি নির্দ্দোষ হলে, অর্থাৎ তার নিজের ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ সঙ্গতি সাধিত হয়ে থাকলে, তার আর কোনো কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা থাকা সম্ভব নয়। সাহিত্যও এই অসংস্থিতির ফল, এবং সেই জন্যেই সে-সাধনা সমাজের মঙ্গলবিধায়ক। একের সামঞ্জস্যপদ্ধতিকে দশের সামনে ফুটিয়ে তুলে, সাহিত্যও জৈবিক প্রতিষ্ঠার প্রকরণ-আবিষ্কারে সহায়তা করে। তা না-করলে, এই বিষয়াসক্ত সংসারে তার অন্নজলের ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই উঠে যেতো।

তবে আমরা মানতে বাধ্য যে, ভাষা, এবং পক্ষান্তরে সাহিত্য, আসলে মানুষের অন্যান্য অঙ্গবিক্ষেপের মতো একটা স্থিতিস্থাপক ভঙ্গীমাত্র হলেও, তার পরিণতি আজকে অত্যন্ত জটিল হয়ে দাড়িয়েছে। উদাহরণ, শাসন ও অভ্যাস, এই তিন দীক্ষাগুরুর ভ্রুকুটিতে নবজাত শিশুর ক্ষুধিত ক্রন্দন

যেমন অচিরে পাচককে পরিবেষণের আজ্ঞায় পর্য্যবসিত হয়, ঠিক তেমনি ক'রেই আমরা আজকে আর রিরংসার তাড়নে সঙ্গিনীসন্ধানে বাহির হই না, ঘরে ব'সে লিখি প্রেমের কবিতা। অঘটন সংঘটনই হচ্ছে সভ্যতার সার্থকতা ; আমাদের বৈদগ্ধ্য, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের পরিশীলন যতই বাড়ছে, আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলি ততই যাচ্ছে হারিয়ে; ব্যাপার এতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে যে, সম্প্রতি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর নয়, যার কার্য্যকলাপের আর নৈমিত্তিক কাটামোই নেই, আছে কেবল পুঁথিজাত প্রবৃত্তি ; যারা আর জীবনের তাগিদে বিচলিত হয় না, মেতে ওঠে কথায়। কিন্তু আধুনিক জগতে ভাষা সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে উঠেছে ব'লেই, মানুষ তার পাশব কুটুম্বদের জাতিচ্যুত করতে পারবে, এমন ধারণা নিঃসার স্বপ্নমাত্র। মদনসখার সংস্পর্শে আমাদের আদিপুরুষের দেহে যে-অবস্থান্তর ঘটতো, সেই মদস্রাবই এখনো প্রণয়-নামে অভিহিত ; তবে সে-গণ্ড-নিঃসরণের উদ্বোধন আর সময়সাপেক্ষ নয়, আজ তা ব্যক্তিগত। এখানে কারণটা বদলেছে কিন্তু ফল আছে যথাপূর্ব্ব ; অভিনেতা ও পট পরিবর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু নাটক রয়েছে নির্ব্বিকার।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভাবনা-বেদনা, আবেগ-উদ্যোগ, এ-সমস্তেরই সূত্রপাত দেহে। একথা অন্তর্দর্শী মনোবিদও অস্বীকার করেন না ; এবং স্বয়ং উইলিয়ম্ জেম্স্ই প্রথম দেখান যে, প্রাণী যখন ভয়াবেগ অনুভব করে, তখন তার শরীরের অবস্থান্তরটা গৌণ নয়, মুখ্য। অর্থাৎ আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়, নিঃশ্বাস ক্ষিপ্র হ'য়ে ওঠে, হৃদ্‌কম্প বাড়ে ব'লেই আমরা ভীত হই, ভয়ানুভূতি জাগে ব'লে ওই বিকারগুলো পরিলক্ষিত হয় না। এই মহাপ্রমাণ আবিষ্কারের পরেও কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির শরণ নেন, কারণ নরদেহের নলীহীন গণ্ডসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অদ্যাপিও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু এ-বিষয়ে, বোধহয়, আর মতদ্বৈত নেই যে, ক্ষুধার তাড়নে মানুষের গণ্ডবিশেষ যেমন লালায়িত হ'য়ে ওঠে, অন্য যে-কোনো উত্তেজনাতেই বিভিন্ন গণ্ডে ঠিক তেমনি ক'রেই রসসঞ্চার হয়। আলঙ্কারিক রস এই প্রাকৃত রসের প্রতিরূপ। এই প্রাকৃত রসে আমাদের বাতবহা নাড়ীর বিভিন্ন কেন্দ্র অভিষিক্ত না-হ'লে আমরা বীরত্ব, স্নেহ, সৌন্দর্য্য, অধ্যাত্ম্য ইত্যাদিকে উপলব্ধি করতে অপারগ। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে মানবচৈতন্যকে আর দেহাতিরিক্ত ব'লে মনে করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। চৈতন্যের সার্ব্বভৌমত্ব ও অবিনশ্বরতার ব্যাখ্যাও বোধহয় এইখানে। যে-শাশ্বত সত্য, যে-সনাতন সৌন্দর্য্য মানুষকে গত পাঁচ হাজার বছর ধ'রে প্রলুব্ধ ক'রে রেখেছে, সে আর কিছুই নয়, কেবল এমন রসস্রাব যা দেহীর পক্ষে মহত্তম মঙ্গলের কারণ। এগুলো

অবিনশ্বর, কেননা শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মানুষ তার আঙ্গিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে সংযত করতে পারলেও, পূর্ব্বোক্ত গণ্ডনিঃসরণকে অবদমন করতে অসমর্থ। সুতরাং তার চৈতন্যের ভেক বদলায় কিন্তু চৈতন্য থাকে নির্ব্বিকল্প; প্রেমাস্পদের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু প্রেমানুভূতিতে বিকার ধরা পড়ে না। উপরন্তু উক্ত রসগুলি যেহেতু রসায়নের অকাট্য নিয়মে বাঁধা, তাই তাদের ফলাফলও সকল কালে ও সকল ক্ষেত্রে সমান। মানব-চৈতন্য যদি এই ভৌতিক উপাদানে বিরচিত না-হয় তবে মানুষের মূল্যজ্ঞানের, মানুষের অর্ঘ্যপ্রমাণের কি অর্থ থাকতে পারে, তা, অন্তত, আমার কাছে অপ্রকাশ।

এই কোণ থেকে দেখ্‌লে কবিকে আর স্বর্গের চক্রান্ত ব'লে মনে হবে না; তাহলে দেখা যাবে সেও আমাদের মতো অসম্পূর্ণ মানুষ, যে প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টায় নিজের প্রণালীহীন গণ্ডগুলিকে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ক'রে তুলেছে। ফলে যতটুকু বা যে-রকমের অভ্যাঘাতে তার দেহ সরস হ'য়ে ওঠে, হয়তো তার অনেক বেশি ধাক্কা না-লাগলে আমাদের শরীরে আন্দোলন জাগে না। অতএব কবি, মহাকবি, সেই, যে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রের প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনশক্তিকে নিজের দেহের দ্বারা একান্ত আপন ক'রে নিয়ে, সে-দুর্ব্বল উত্তেজনাকে অনুকূল ঘটনাচক্রের অনুগ্রহে পাঠকের দেহে সংক্রামিত করতে পারে। এ-ক্ষেত্রে অনুকূল ঘটনাচক্র হচ্ছে ভাষা, কারণ ভাষা যে শুধু ধ্বনিরূপ উচ্চণ্ড উদ্দীপকের আধার, তা নয়, সভ্য মানুষের পক্ষে শব্দ আর বস্তু প্রায় অভেদাত্মা। কাজেই কাব্যরচনাকালে কবি কোনো অলৌকিক প্রেরণায় অমানুষ হ'য়ে ওঠে না, সে অভিধান নিয়ে এমন শব্দরূপ অন্বেষণ করে, এমন ধ্বনিতরঙ্গ খোঁজে, যা তার প্রাথমিক উদ্বোধনের যথার্থ প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এবং তার রূপায়ন তখনই সার্থক হয়, যখন অবশ্যম্ভাবী বাক্যবিন্যাসের অভ্যাঘাতে তার দেহান্তরে সেই ঈপ্সিত আবেগের পুনরভিনয় চলে। এইটাই যদি কাব্যসৃষ্টির অনন্য উপায় না-হতো, তবে মহৎ কবিতার প্রত্যেক শব্দটি, প্রত্যেক অলঙ্কারটি, সমগ্র রূপটি অত অপরিহার্য্য, অত নির্ব্যূঢ় ব'লে মনে করার কোনো কারণ থাকতো না; তাহলে কবির পক্ষে বুদ্ধি-বিচারের কোনো আবশ্যিকতা দেখা যেতোনা; তাহলে মহাকবিদের পরম প্রবচনগুলিকে প্রথমপাঠেই অতিপরিচিত ব'লে ভ্রম হতো না।

কবি জানে যে, আবেগের ঝোঁকে কথা কইতে গেলে, মানুষের বাক্‌যন্ত্রে কতকগুলো সুনির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। তাই সে যখন তার শব্দশৃঙ্খলার গুণে সেই পরিবর্ত্তনগুলোকে পাঠকের কণ্ঠে পুনরাবৃত্ত করাতে

পারে, তখনই কবির আবেগ-প্রতিমা জাগে পাঠকের মানসপটে। বাক্-যন্ত্রের এই পরিবর্ত্তনকেই হয়তো বলে "রিদ্‌ম্", বলে গতিভঙ্গী। এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলে মনুষ্যদেহের গণ্ডগুলোকে ইচ্ছামত সরস করা যায় ব'লেই, হয়তো, আধুনিক কাব্যবিবেচকেরা মনে করেন যে, কবিতায় কৃত্রিম ছন্দের ক্রটি যদিও বা মার্জ্জনীয় তবু গতিভঙ্গীর পঙ্গুতা একেবারেই অসহ্য। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে, চেঁচিয়ে পড়ায় আর মনে মনে পড়ায় খুব বেশি তফাৎ নেই। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষার সঙ্গে যিনিই পরিচিত, তিনিই জানেন যে, চিন্তাকালে আমরা শুধু মস্তিষ্ককেই কাজে লাগাই না, সারা দেহে আন্দোলন জাগিয়ে তুলি। এবং যেহেতু পূর্ব্বেই বলেছি উদ্দীপনা যেমনি হোক্, তার শারীরিক প্রতিঘাত সার্ব্বত্রিক ও সমান, তাই কবি ও পাঠকের নিমিত্ত পৃথক হ'লেও তাদের আবেগ ও অনুভূত রস প্রায় অভিন্ন। এ না-হ'লে, কাব্য কেন চিরপরিচয়ের বিস্ময় জাগায়, কাব্যপাঠে বিষাদ, পুলক, উৎসাহ ইত্যাদি কায়িক সংবেদনগুলো কেন পরিলক্ষিত হয়, কাব্যের অর্থ কেন অনির্ব্বচনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়, এ-সকল প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া শক্ত।

শুনেছি, সাধনার এমন মার্গ আছে, যাতে চললে মানুষ মর্ত্ত্যসীমা অতিক্রম ক'রে, অমৃতলোকে পৌঁছয়। এ-কথা সত্য কিনা জানবার সৌভাগ্য, সুযোগ বা সামর্থ্য কোনোদিন না-ঘটলেও, আমি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি যোগীদের এই দাবিতে আমার আস্থা যেন নিত্যকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি কিছুতে বুঝতে পারিনা, উক্ত সাধনার সঙ্গে কাব্যচর্চ্চার সম্পর্ক কোথায়? প্রচ্ছন্ন প্রেরণাকে প্রকাশ্য ব্যঞ্জনায় পরিণত করাই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কার, সাধারণ অনুভূতির সীমা মানা ছাড়া কবির গত্যন্তর দেখিনা। রাক্ষস-শব্দের দ্বারা কোনো রমণীর দেবীত্ব জ্ঞাপন করতে চাওয়া যেমন উপহাস্য, মর্ত্ত্যের ভাষায় স্বর্গের বার্ত্তা ব্যক্ত করার চেষ্টা তার চেয়ে কিছু কম ব্যর্থ নয়। আগেই বলেছি, ভাষা অতীন্দ্রিয়ের বাহন তো হতেই পারেনা, এমন-কি ইন্দ্রিয়গোচরকে প্রকাশ করাও সময়ে সময়ে তার সাধ্যের অতীত। উপরন্তু আবেগ ও বাক্‌যন্ত্রের মধ্যে যদি যথার্থই নিবিড় আত্মীয়তা থাকে, তবে এমন সিদ্ধান্ত থেকে অব্যাহতি নেই যে, মানুষের কান যে-নিয়মে একটা সুপরিমিত শব্দপর্য্যায়ের উপরে-নিচে বধির, মানুষের চক্ষু যে-নিয়মে একটা সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণস্তরের অধে-উর্দ্ধে অন্ধ, ঠিক তেমনি কোনো নিয়মেই মানুষের কণ্ঠ একটা নাতিবৃহৎ আবেগ-গণ্ডির বাইরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কাজেই কবির প্রেরণা যতই মহৎ হোক্, তার ভাষায় শুধু ততটুকুই প্রকাশ্য যতটুকুর চাপ তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সয়, অথবা যতখানির তাড়া না-খেলে

তার বাক্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক আলস্য অবিচল থাকে। হয়তো, তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যেতে পারে যে, এমন সিদ্ধপুরুষ আছেন, যাঁর দিব্যকর্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের নূপুর নিক্কণে অহর্নিশি ঝঙ্কৃত। কিন্তু তাই ব'লে এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর কবিতায় ব্যক্ত করতে পারবেন, এমন ভাবলে খুবই ভুল হবে। তাঁর কাব্য যেহেতু মানুষী ভাষায় রচিত, তাই সে-কবিতার ধ্বনিসমাবেশও গতিগণিতের ঠিক সেই বিধিবিধানকে মানবে, যার আজ্ঞায় তারার পদশব্দ মনুষ্যলোকে নিষিদ্ধ। এই রকমের নিষ্ফল প্রয়াস নিরস্ত করবার জন্যেই ক্রোচে তাঁর বিখ্যাত সূত্রটিকে প্রচার করেছিলেন যে, রূপাতীত ভাবনা ভাবনাই নয়, ভাবনার ভানমাত্র।

অবশ্য তারার নূপুরনিক্কণ-ব্যাপারটা নিতান্তই অতিকথন; কিন্তু অনুরূপ ঘটনা আধুনিক সাহিত্যে খুব বিরল নয়। আজকালকার কবি সাহিত্যের ব্যাবহারিক ধর্ম্মে আস্থা হারিয়েছেন। গত দেড়শ বছর ধ'রে আমরা সাহিত্যের সার্ব্বিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সমস্ত প্রয়াস প্রয়োগ করেছি কাব্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহক ক'রে তুলতে। ফলে কবি আজকে উৎকেন্দ্রিক, কাব্য মুমূর্ষু, সাহিত্য স্বীকারোক্তিতে পরিণত। আমরা ভুলে গেছি যে, উদ্‌ভাবনের সামর্থ্য মানুষের নেই, কবি শুধু আবিষ্কারক। আমরা ভুলে গেছি যে, অসামান্য অভিজ্ঞতা থাকলেই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়না, তার জন্যে দরকার অনুকম্পন। আমরা ভুলে গেছি যে, প্রিয়াকে পেলেই কাব্যলক্ষ্মীকে বাঁধা যায় না, সে জন্যে প্রয়োজন আমার প্রিয়ার মধ্যে চিরন্তন নারীর আবির্ভাব। এই আত্মোৎসর্গে আমরা আবার যবে সক্ষম হবো তবেই আমাদের জিহ্বাগ্রে সরস্বতী আপনার আসন পাতবেন, তবেই জগতে জন্মাবে নূতন সফোক্লিস্, অভিনব শেক্‌স্‌পীয়র্। কিন্তু এ-সত্যকে আমরা মানতে চাইনা, সেইজন্যেই বৈচিত্র্যে আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের বহু উর্দ্ধে হ'লেও, আজকে তা খেলার জিনিস, আজকে তা বিলাসিতার উপকরণ, তা আর পূর্ব্বের মতো জীবনের অবর্জ্জনীয় সম্পদ নয়। সেই জন্যেই আধুনিক সাহিত্য হেঁয়ালির পার্শ্বচর। ব্যক্তি-বাদের উগ্র সুরা আমাদের শিরা-উপশিরায় এমনি বিস্মৃতি ভ'রে রেখেছে যে, এই অধঃপতনের সংজ্ঞা সুদ্ধ আজকে বিলুপ্ত; আজকে আমরা বল্‌তে সুরু করেছি যে, সাহিত্যবোধ, সে হচ্ছে অধিকারভেদের কথা; যে সাহিত্য-রস, সে হচ্ছে অমরাবতীর উপহার; যে সাহিত্যসিদ্ধি, বিশ্বোৎপত্তির মতো, কেবল নেতি-নেতির দ্বারাই প্রকাশ্য।

অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করা বৃথা যে, সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি, তাও অন্যান্য বিদ্যার মতো, অনুশীলনের ফল, এবং অন্যান্য বিদ্যার মতো তার জন্যেও একটা সহজাত পক্ষপাত থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই পক্ষপাতকে,

এই আয়াসসিদ্ধ পরিপক্কতাকে অলোকের আশীর্ব্বাদ ব'লে জাহির করলে, পারদর্শী ফুট্‌বল্‌খেলোয়াড়কেও অধরার প্রিয়পাত্র ব'লে মানা দরকার। কবি-পাঠক-সংবাদ যদি সত্যই একটা আধিদৈবিক ব্যাপার হয়, তাহলে সাহিত্যের—অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের কোনো সার্থকতাই থাকে না, তৃতীয় নয়ন খুলে চাইলেই পাঠক বোঝে কবির হৃদয় কোন্ অনুপ্রেরণায় উদ্বেল। আসলে সাহিত্যপ্রবণতার জন্যে যেটা অপরিহার্য্য, সে হচ্ছে অনুকূল আবেষ্টন। ভিন্ন মানুষের পরিমণ্ডল ভিন্ন ব'লেই, কেউ ঝোঁকে সাহিত্যের দিকে, কেউ তন্ময় হয় গণিত-চর্চ্চায়; কারো জিহ্বা গো-নামে সরস হ'য়ে ওঠে, কেউ ভাবে গাভী ভগবতী। এবং যুগের আবেষ্টনও ব্যক্তির আবেষ্টনের মতো পরিবর্ত্তনশীল, তাই অষ্টাদশ শতকের কবিতা উনবিংশ শতাব্দীতে ছড়া হ'য়ে দাঁড়ায়; শেক্‌স্‌পীয়রের প্রহসন প'ড়ে, পরীক্ষার্থীর কান্না আসে; 'সঙ্ অফ্ সলোমন্'-এর আধ্যাত্মিকতা আধুনিক মানুষের কামোৎপাদন করে। কিন্তু মানুষের অধিকাংশ ভাবনা-বেদনা শিক্ষা ও সমাজ সংঘটিত হ'লেও, তার দেহের কতকগুলো প্রতিক্রিয়া সহজ, কতকগুলো প্রবৃত্তি স্বসমুত্থ, কতকগুলো অভিজ্ঞা মজ্জাগত। সুতরাং যে-কবি এই প্রাকৃত ধর্ম্মের শরণে কাব্য রচেন, দেশ, কাল ও পাত্রকে পেরিয়ে তাঁর কবিতাই জ্বলে ধ্রুবতারার মতো, তাঁর কবিতা আনে আপনার পূজা আপনি আহরণ ক'রে, ব্যক্তিতার অন্ধকূপ ভেঙে তিনিই ব্যক্ত হন অবিনশ্বর ব্যক্তিস্বরূপে; বিশ্বমানবের শাশ্বত প্রতীকরূপে তিনি বিরাজমান থাকেন সময়ের অনিত্য পটভূমিকায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রসঙ্গ, পদ্ধতি এবং আবেদনের সমতা ও সার্ব্বিকতার এ ছাড়া অন্য কি টীকা থাকতে পারে, তা, অন্তত, আমার জানা নেই।

কাব্য ও মহত্ত্ব বিশ্লেষণে যাঁরা স্থূলহস্তাবলেপ অপছন্দ করেন, তাঁরা বলেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র্ বা বুদ্ধ যতদিন প্রয়োগাগারে উৎপন্ন না-হচ্ছেন, ততদিন তাঁদের অসামান্য লক্ষণগুলির বিষয়ে বিজ্ঞানের জারিজুরি কেবল নিরর্থ নয়, উপহাস্যও। এই মনোভাবের অলিগলিতে প্রবেশ করার মতো পথজ্ঞান আমার নেই, তবু এমন মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভূতবিজ্ঞানের সাহায্যে হিমালয়কে গড়া যায় না ব'লেই, ওই গিরিরাজের বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মিথ্যা নয়। এটা, অবশ্যই, সত্য যে, জড়পদার্থে আমাদের যতটা অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে, পরীক্ষার অসৌকর্য্য ইত্যাদি কারণে জীবনপ্রসঙ্গে আমরা ততটা নিশ্চিত নই। কিন্তু যদি ভৌতিক প্রণালীতে জীবের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, প্রণয়াসক্তির মতো মৌলিক প্রবৃত্তিকে বিপরীত থেকে সমপদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, মনুষ্যমিশ্রিত দ্রাবণে পাতা গজিয়ে ওঠে, তবে এ-কথা

অস্বীকার করা বৃথা যে, জীববিদ্যায় আমরা সর্ব্বজ্ঞ না-হ'লেও, একেবারে অনভিজ্ঞ নই ; যে প্রাণপ্রসঙ্গে আমাদের অনুমান স্থানবিশেষে অস্পষ্ট হ'লেও, তাতে অযৌক্তিক কিছু নেই, তার নির্দ্দেশে পরিণামে সত্য গন্তব্যে উপনীত হওয়াই সম্ভব। অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান অনুমিতি জন্তুর সাহায্যেই গঠিত হয়েছে, এবং মন, মেধা ও মনীষার গুণে মানুষের মধ্যে একটা অতিজান্তব লক্ষণ বিদ্যমান। কিন্তু এ-গুণগুলির সূত্রপাত-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যা বলেছি, তার পরে এমন মন্তব্য নিশ্চয়ই সঙ্গত যে, মর্ত্ত্যমহিমা মর্ত্ত্যেরই মহিমা, স্বর্গের প্রতিচ্ছবি নয়। এই মহিমার সমস্ত অন্ধিসন্ধি এখনো আমাদের অধিকারে আসেনি, সত্য; কিন্তু সেই জন্যেই যদি ওর অতিমর্ত্ত্যতা মানতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটা বলাও প্রয়োজন যে, তীরের ঋজুগতি, তাও ঊর্দ্ধলোকের অনুগ্রহ। আসলে চক্র যেমন গড়িয়ে চলে আপনার স্বভাবগতিকে, তেমনি মানুষও আজ পশুপতি কেবল ঘটনার খেয়ালে। অবশ্য ঘটনার খেয়াল জিনিসটা বেশ একটু আবছা ধরণের হলো ; কিন্তু আমাদের জ্ঞান এখনোও অমিত হয়নি ব'লেই, ব্রহ্মবাদের মতো, একটা নঙর্থক আদর্শের আশ্রয় চাইতে হবে, এমন উপদেশও কিছু কাজের নয়। আমরা যেন কখনো না-ভুলি যে, অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান ক'রে মানুষ শ্রীমান বা শক্তিশালী হয়নি ; মানবীয় কীর্ত্তিস্তম্ভের পাদপীঠে যে-আর্য্যসত্য নিহিত আছে, তা হচ্ছে এই : যা অজ্ঞানগোচর তা অবাস্তব ; যা অব্যক্ত তা মায়া, মরীচিকা, মিথ্যা।

উপসংহারে এই কথাটার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন মনে করি যে, আমি মহাপুরুষকে খর্ব্ব করতে চাই না, সেই মহত্ত্বের প্রতিবিম্বে দাঁড়িয়ে অপার গৌরব অনুভব করি ; সাধারণের মতো, আমার মাথাও বিরাটের চরণে সর্ব্বদা ভক্তিপ্রণত। কিন্তু বিরাটকে চাইলেও আমি অসুরকে চাই না, আমার কাছে মহৎ আর অমিত সমার্থব্যঞ্জক নয়। আমি জানি, এর জন্যে আমার স্বকীয় সামান্যতাই দায়ী, আমি নিজে সীমাবদ্ধ ব'লেই আজ অসীমকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি। আমার বুদ্ধি অক্ষম, কল্পনা সঙ্কীর্ণ, সেইজন্যেই গতি-বেগের বিচার করতে হ'লে আমি বিমানপোতে উঠি না, আসন পাতি এমন যানে, মাটির টান যাকে প্রতিপদে ব্যাহত করে ; সিন্ধুর বিশালতা উপভোগ করতে হ'লে আমি নিস্তট সাগরে ঝাঁপ দিই না, দাঁড়াই গিয়ে এমন উপকূলে যেখানে পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রচেতার আক্রমণকে প্রতিক্ষণ প্রতিহত করে ; আমার সমীপদর্শী চোখে মানুষের মাহাত্ম্য তখনি পরিস্ফুট হয়, যখন বুঝি ওথেলোর কত বড় অভীপ্সা কতটুকু আঘাতে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলো। আমি নিজে অপদার্থ ও অপারগ ব'লেই ব্যক্তিবাদের ভয়াবহ সঙ্কল্প আমাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে। সম্ভবত সেই জন্যেই আমি ভবিষ্যৎকে ভবিতব্য ব'লে

ভুল করি, সেইজন্যেই আমার দৃষ্টি আগামী কালের অপূর্ব্ব আশ্বাসের দিকে না-তাকিয়ে, ছুটে চলে সেই অখ্যাত অতীতের পানে যেখানে মানুষ সমবেত চেষ্টায় আপনার অধীনতা দূর করেছিলো। কিন্তু যেহেতু আমার সমষ্টিবাদ অত্যন্ত আন্তরিক, সম্পূর্ণ অখল, তাই এই একান্ত উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও জানি যে, আমার মোক্ষের মার্গ, হয়তো অন্যের পক্ষে মুমূর্ষার নামান্তর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বিবাহ ও নীতি *

বিবাহে আর নরনারীর অন্যান্য যৌন সম্পর্কে সব চেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, বিবাহ আইনসম্মত, আর সেই জন্যে তা কড়া পাহারায় ঘেরা। গোড়ার কথা বলতে গেলে বিবাহ-ঘটিত আচার-ব্যবহার গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ তিনটে জিনিস নিয়ে। প্রথমটি মানুষের প্রবৃত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক এবং শেষেরটি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা। এদের কোনোটিকেই আলাদা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে ফেলা যায়না বটে, কিন্তু এরা যখন পরস্পরের সঙ্গে একটা দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে তখন আবার মুস্কিল বাড়ে বই কমেনা। প্রবৃত্তি আর ধর্ম্মের কথাই আগে ধরা যাক, কারণ এদের সম্বন্ধটাই আমাদের আলোচনায় বেশি ক'রে উঠবে।

ধর্ম্মের যে-সব অনুশাসন মানুষের জীবনে খুব প্রবল, সেগুলো প্রায়ই তার প্রবৃত্তিজাত। তবে পরে সেই সঙ্গে সংস্কারপ্রিয়তাও যোগ দেয়। আবার যৌনবোধ যে পূরোপূরি প্রবৃত্তিমূলক নয়, প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতাই তার চরম সাক্ষ্য। অথচ সমাজের ও ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে উল্‌টো কথাটাই সত্য ব'লে জাহির করবার মারাত্মক চেষ্টা চলছে। মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রবৃত্তির থেকে কত তফাৎ তা যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো ক'রেই বোঝা যায়।

বিবাহের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে স্থায়ী করার প্রয়াসই প্রধান। ঠিক এমনি ধরণের স্থায়িত্ব পশুজগতেও অল্পবিস্তর দেখা যায়, বিশেষ ক'রে যখন সন্তান-সন্ততি লালনপালনে পুরুষের সাহায্য ও সাহচর্য্য আবশ্যক হয়। জীবনধারণের জন্যে সন্তানের পক্ষে পিতা অদরকারী হতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে পিতার প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করাও শক্ত। পিতৃস্নেহ কতটা প্রবৃত্তিমূলক, সে-বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মোটের উপর মানুষের অন্যান্য প্রীতিবন্ধনের মতো পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সামাজিক নীতির আবেষ্টনে সহজ হয়েই গড়ে উঠেছে। পশুদের তথাকথিত বিবাহের মধ্যে একবিবাহের প্রচলন বেশ বেশি। এমন কি অনেক পণ্ডিতের মতে এই আদর্শ পশুদের পক্ষেই স্বাভাবিক, কেননা তাদের ভিতরে বিবাহের পরে পরকীয়া-প্রীতি মোটেই দেখা যায় না। কিন্তু পশুর পক্ষে এই নিয়মটা সাধারণ হলেও, মানুষের বেলায় ব্যতিক্রমটাই প্রথা; আর তাই থেকেই অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি। এ থেকে বোঝা যাবে যে, ধর্ম্ম অথবা আইনের সাহায্য না-নিয়েও, শুধু প্রবৃত্তির উপরে নির্ভর ক'রেই বিবাহের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।

* বার্ট্রেণ্ড্ রাসেলের "ম্যারেজ্ এণ্ড্ মরাল্‌স্" পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ এতই দৈহিক যে, বিচারবুদ্ধিব্যতিরেকেও তা আমাদের চোখে পড়েছিলো। কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ততটা দৈহিক নয় ব'লে সেটা আবিষ্কার করতে অনেকদিন বিলম্ব হয়েছিলো। সেই অবকাশে সমাজ, ধর্ম্ম ও আইন বিবাহ-অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেলো। ফলে বিবাহের মধ্যেই মানুষ পারিবারিক জীবনের প্রথম আস্বাদ পেলে। কিন্তু বিবাহসম্বন্ধে মানুষের আদিম মনোভাব—যেটা একবিবাহের পরিপন্থী—তার পরিবর্ত্তন অত্যন্ত ধীরে ধীরে হতে লাগলো। এই পরিবর্ত্তনের মূলে আর্থিক কারণই সব চেয়ে বেশি বর্ত্তমান। মানুষ যতদিন কৃষিজীবী ছিলো, ততদিন স্ত্রী-পুত্রের সংখ্যাধিক্যই যে তার পক্ষে লাভের, তা সহজেই অনুমেয়। এমনি ভাবে বহুবিবাহ প্রথার মধ্যে দিয়েই সবপ্রথমে নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ককে সাংসারিক অন্যান্য প্রয়োজনের তুলনায় গৌণ করা হলো। এবং সেইজন্যেই সে-যুগের আইন স্ত্রীজাতির অনুকূল হলোনা। তবে সৌভাগ্যের বিষয় পক্ষপাতের প্রতিক্রিয়া খুব শীঘ্রই সুরু হলো এবং ধর্ম্মের সাহায্য পেয়ে বিবাহপ্রথায় অসাধারণ সাফল্যও এলো অচিরে। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ সংস্কারের পর্য্যায়ে উঠে দাঁড়ালো। এবং সে-সূত্র স্বামী-স্ত্রীর জীবনে ছিন্ন হবার নয় ব'লেই মানুষের যৌন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন দরকার হয়ে পড়লো।

ধর্ম্মের অনুশাসনে নারী হয়তো পুরুষের যথেচ্ছাচার থেকে কিছু রক্ষা পেলে, কিন্তু মোটের উপর তার অবস্থার বিশেষ বদল ঘটলো না। পুরুষের সঙ্গে তার যৌনসম্পর্ক আগের মতোই ধরাধরিতে বাঁধা রইলো। স্বামী তার বিবাহিত জীবনের একমাত্র আরাধ্য অধীশ্বর; তবে আধ্যাত্মিক জীবনে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ এখন আর ততটা নিষিদ্ধ রইলো না। বিবাহিত জীবনে থেকেও সে অনায়াসে স্বামীকে ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হতে পারে। এতে নিন্দার চেয়ে গৌরবই বেশি। মানুষ যতদিন তার স্বাধিকার-সম্বন্ধে সজাগ হয় নি ততদিন বিবাহিত জীবনে স্বাধীনতার অভাব তাকে তেমন পীড়া দেয় নি। কিন্তু সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অধিকার যেই চিনতে শিখলে অমনি নূতন বাধা তাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। এই বিদ্রোহের ধাক্কা সব চেয়ে বেশি লাগলো বিবাহ অনুষ্ঠানে, কারণ একা বিবাহই নর-নারীর জীবনের অধিকাংশটা জুড়ে বসে থাকে। তা ছাড়া যৌবন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ পছন্দ করে না; গাছের অসংখ্য ডালে সদ্য ফোটা নানা রঙের ফুলের অসংযত প্রকাশ দেখে সংযম শিক্ষা করা খুব সহজ নয়।

তাই নীতিবাগীশেরা বললে, মানুষ সভ্য হলো আর বিবাহের মধ্যে এ কি দুর্নীতির ঝড় উঠলো। হয়তো এটা সত্য যে, আজ-কালকার

মানুষ আর সারা জীবন শুধু একজনকে সঙ্গী ক'রে থাকৃতে রাজি নয়। কিন্তু এটা কি দুর্নীতিপ্রসূত অসহিষ্ণুতা না জীবনে সত্যানুসন্ধানের ফল ? আজো তো দেখা যায় যে, দেশে দেশে পুরুষে পুরুষে তফাৎ করা হয় না, কেবল মেয়েদেরই এক পর্য্যায়ে ফেলে বলা হয় বিবাহ যাবজ্জীবনের বন্ধন—সুখেরই আকর। এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করেন বলেই শাস্ত্রকারেরা বিধান দেবার বেলা বিবাহকে অচ্ছেদ্য না করার কারণ খুঁজে পান নি। কিন্তু চলার পথে এ উপদেশ মানুষের কাছে সঙ্গত ঠেকে না। সে দেখে যে, শুধু চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়—সারা জীবনকে নির্জলা ও আকর্ষণশূন্য না করতে পারলে বিবাহে চলনসই সুখ, এমন কি মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য আনাও অসম্ভব। তাই যেখানে নরনারী বিবাহ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না সেখানে বিবাহ কতকটা সুখের হয়। অন্যত্র তা শুধু ভাগ্যবিড়ম্বনা। সমাজের শাসনে মানুষ যখন বিবাহের চেয়ে বড় কিছু সুখের আশা ছেড়ে দেয় তখনই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আচরণে বিরাগের কারণ দূর হয়। কিন্তু এই দুরাশা ত্যাগ করা আজকে অত্যন্ত কঠিন, সেই জন্যেই পুরানো সমাজের বিবাহ অতি আধুনিক বিবাহের চেয়ে বেশি সার্থক হ'তো।

কিন্তু আজ যদি সেই সার্থকতার দোহাই দিয়ে আমরা আর নব অভিযানে অগ্রসর না হই তবে আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন তাতে তৃপ্ত হবে না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে সভ্যতার উচ্চতর ধাপে উঠে বিবাহিত জীবনের অসামঞ্জস্যের সমাধান করা। যাকে বরণ করেছি তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার সাহস যেন আমাদের হয়।

বিবাহের নিষ্ফলতার কারণ খুঁজলে সব প্রথমেই যারা বিবাহিত জীবনের জন্যে তৈরী হচ্ছে তাদের যৌনজ্ঞানের অভাব চোখে পড়ে। যেখানে অজ্ঞতা ভয়াবহ সেখানেই তার অহৈতুকী প্রশংসা চলছে। আমরা গোড়ায়ই বলেছি যৌনবোধ তত বেশি প্রবৃত্তিমূলক নয়, তার উপরে যদি বিবাহিত জীবনে এক পক্ষ পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে অপর পক্ষের অজ্ঞতার অপব্যবহার করার চেষ্টা করে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনুরাগ-সঞ্চারের যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বরাগের আকর্ষণকে বিবাহের পরেও স্থায়ী করতে হলে আমাদের মধ্যে যৌন শিক্ষার প্রচলন দরকার।

আর এক কারণে আমাদের বিবাহ অত্যন্ত অসুখের হয়ে ওঠে। বর্ত্তমান সমাজ-শাসনে শৈথিল্য এসে পড়ায় মানুষের মন গোড়াকার সংযমকে আর বড় বলে মানতে চায় না। ফলে বহুবিবাহের প্রবৃত্তি আধুনিক সভ্য মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখা যায়। এইজন্যেই গভীর প্রণয়ের

ফলেও যে বিবাহ সম্পন্ন হয় কিছুকাল পরে তাতেও ভাঁটার স্রোত বইতে থাকে। এই হ্রাসের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যৌনসম্পর্কও বোধ হয় দায়ী। তাই নর-নারী আবার তাদের প্রথম জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রত্যাবর্ত্তন দেখ্‌তে চায়; নতুন সঙ্গীর সহায়তায়। সুনীতির অজুহাতে একে বাইরে থেকে দমন করা সম্ভব হলেও ভিতরের হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত রোধ করা যায় না। বর্ত্তমান যুগের নারী-প্রগতি ব্যাপারটিকে আরো জটিল ক'রে তুলেছে। পুরাকালে নারী পুরুষের উপযোগী হলেই মোটামুটি কাজ চ'লে যেতো কিন্তু আজ নারী তার স্বকীয় সত্তা সম্বন্ধে খুব সজাগ হয়ে উঠেছে; পুরুষের উপযোগী হবার জন্যে তার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে সে আর রাজি নয়—তাতে বিবাহ সুখকর হোক বা না হোক। কিন্তু পুরুষ অতীতের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি; তাই আজও নারীর সতীত্বের বিচার হয় সাবেক কালের সেই কঠোর নীতির মাপকাঠি দিয়ে। আমরা ভুলে যাই আগেকার সমাজে পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত খুবই কম ছিল, আর যাও বা দেখা যেতো তাও তাদের স্ত্রীদের কানে এসে পৌছাতো না। পৌছালে পুরুষ দোষ স্বীকার ক'রে অনুতপ্ত হতো। তাই সে অবস্থায় যে রীতি-নীতি বা আইনের উদ্ভব হয়েছিলো আজকে আর তার জের টানা চলে না। নারী নিষ্ঠার বিনিময়ে পুরুষের কাছে কি কিছুই চাইতে পারে না? চাইলে, পৌরুষ-অভিমানী পুরুষ এর কি প্রতিদান দেবে? পুরুষ যেমন নিজেকে নারীর উপযোগী ক'রে নিতে অস্বীকৃত হলে আপত্তি উঠে না, নারীও ঠিক তেমনি স্বাধীনতা দাবী করে। এইজন্যেই বর্ত্তমান বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যনিষ্ঠার কথাকে আর তেমন বড় ক'রে দেখা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাহে ঈর্ষাকে একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি ব'লে মেনে তাকে যথেচ্ছাচারের সুযোগ না দিয়ে তার পিছনে কোনও নৈতিক সমর্থন নেই একথা স্বীকার করলে ঈর্ষা জয় হয়তো ঢের বেশি সহজ হবে। "প্রথম দেখায়" প্রণয়ের সম্বন্ধে আমরা যতই মুখর হই না কেন কালের গুণে বহুদিনের সাহচর্য্য ক্রমে মৌরশী হয়ে আসে এবং মৌরশী হয়ে আসে ব'লে আমাদের মন শেষ পর্য্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেয়। এইজন্যেই তাকে নবীন প্রেমের কাছে পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখলে আমরা গোপনে ব্যথা পাই।

প্রণয় বা ভালবাসা বিবাহকে সুখসম্পদে ভরে দেয় বটে তবু যাঁরা প্রণয়ের পরিণতিতে বিশ্বাসী তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, কর্ত্তব্যবন্ধনের চেয়ে মুক্তির মধ্যেই প্রেম বেশি সার্থক। সাধারণতঃ বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সন্দেহের সূত্রপাত হয় ব'লে তাতে পাহারার প্রয়োজন ঘটে, ফলে প্রণয়ের সচ্ছন্দতা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফুল পড়ে থাকে, গন্ধ চ'লে যায়;

অর্থহীন বন্ধনে জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। নিবৃত্তির নিষ্ফলতা বিবাহকে পাশে পরিণত করে।

তাই আবার যদি বিবাহকে সুন্দর ও সুখকর করতে হয় তবে তার বন্ধন যেমন সহজসাধ্য হবে মোচনও ঠিক তেমনি ধরণের হওয়া চাই। মনের গরমিল যেখানে স্পষ্ট, বাইরের চটক সেখানে ফাঁকি। নারী যে বিবাহে প্রস্তুতী নয় সেখানে মনের গরমিল ঘট্‌লে বিচ্ছেদই একমাত্র কর্ত্তব্য। অপর ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির মুখ চেয়ে কেবল যৌনতৃষার তাড়নে নর-নারী বিবাহবন্ধন থেকে তত সহজে মুক্তি নিতে পারবে না। পিতামাতার মনের বিকার যেখানে সুস্পষ্ট সেখানে সন্তানের মানসিক ও শারীরিক অধোগতিও নিশ্চিত। তাই পিতামাতা যদি পরস্পরের মধ্যে আর কোন আকর্ষণই না দেখতে পায়,—এমন কি অপর কারুর প্রতিও যদি ক্ষণিকের জন্যে আসক্ত হয়ে ওঠে, তবু সন্তান-সন্ততির মঙ্গলকল্পে যতদিন প্রয়োজন ও সম্ভব বিবাহিত জীবনের কোমলতা রক্ষা করা তাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

তাই মনে হয়, প্রবৃত্তিকে নিষ্পেষণ না ক'রে তাকে সুচালিত করলে বর্ত্তমান বিবাহ সুখকর হবে। তার জন্যে প্রচলিত সুনীতি হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, বদলাতে হবে, কিন্তু তা'তে পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। বিজ্ঞান ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে এবং মানুষের নূতন-বিলাসী মন অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছে, আরো অনেক তথ্যসন্ধানে রত। এক্ষেত্রে যদি নূতন অভিজ্ঞতার ফলে বিবাহকে সামাজিক সংস্কার ব'লে না মেনে তাকে ব্যক্তিগত সমস্যার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায় তবে কিছু ভুল হবে না। এখানে সমাজের ও আইনের প্রাধান্যকে যতটা কমানো যাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ হবে ততই সরল।

এমনি উপায়েই সমাজ ও আইনের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে নর-নারী একদিন বিবাহিত জীবনের সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রী প্রচার করবে এবং তারই ফলে তাদের সখ্যও হবে নিবিড় এবং আনন্দও হবে অতুলনীয়।

শ্রীপদ্মা বসু

আধুনিক কাব্য

মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখ্‌তে অনুরোধ করা হয়েচে। কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বল্‌তে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক্‌ আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চল্‌ত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্ণ্‌স্‌ থেকে তার সুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ডস্বার্থ কোলরিজ শেলী কীট্‌স।

সমাজে সর্ব্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে—রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটা তিলক কেটে চল্‌লে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্ণ্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এলো সে যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জ্জি এসে উপস্থিত। "কুমুদ-কহ্লার সেবিত সরোবর" হচ্চে সাধু-কারখানায় তৈরী সরকারী ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে বুলি সরিয়ে পূরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হ'য়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে "ধিক্‌"।

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া সুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জ্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে তর্জ্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক্‌, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্চে ব্যক্তিগত খুসির দৌড়। ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন, সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলীর ছিল প্ল্যাটোনিক

ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্ম্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্য্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্য্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম ক'রে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপ-করণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্প-কলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েচে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্য সংসার রচনা করত তার রচনা-কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্কে জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিষ ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা, নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা, তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোলো তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখ্‌ছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা, মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলীর ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হ'য়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়, সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান, সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে

সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়, সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্চে উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইরেজি কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা।

কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েচে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার ঠোঁটে রং লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসঙ্কোচে। বল্‌তে চায় মোহ জিনিষটাতে আর কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি নক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেচে, বল্‌চে মূলে মোহ নেই, আছে কার্ব্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গীতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেচি একথা কবুল করতেই হবে। ইসারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয় সত্যের আভরণ সেটাকে ত্যাগ করতে পারিনি। তার ঈষৎ-বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙীন আলো এসেচে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেচি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে লেগেচে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সঙ্কোচ লাগে? এই সঙ্কোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই? সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে আচ্ছন্ন করে না তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্য্যকে কি নিঃস্ব হ'তে হয় না?

কিন্তু আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিষটা জীবনের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেচে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে মানুষ একদিন রয়ে বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাৎ দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারী আদর্শে কাজচালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হোলো কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা

জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সঙ্গীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ। জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয় সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হ'লে আজ কোন্ লক্ষ্য ধ'রে কোন্ রাস্তায় বেরোবে? নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা এ এখন আর চল্‌বে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয় সম্বন্ধবন্ধনে নয়। আমি কি ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিষটা স্বয়ং ঠিক মতো কি সেইটেই বিচার্য্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য-ব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চল্‌চে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখ্‌চেন—I am the greatest laugher of all—বল্‌চেন আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্য্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, এ্যাপলো দেবতার চেয়ে। Than the frog and Apollo এটা হোলো ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইচে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হোত সমুদ্র তা হ'লে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বল্‌তে পারত ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উল্টো ছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হোলো ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয় একথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ এ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাইনে। এমন কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্ হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু অতি বড়ো

বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে হাসি সূর্য্যের, যে হাসি ওক্ বনস্পতির; যে হাসি এ্যাপলোর, সে হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েচে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙীন ছিল আজ সেটা ফিকে হ'য়ে এসেচে, সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না বস্তু চাই। ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং বল্‌লে প্রায় বারো আনা বেশি বলা হয়। একটি অধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে সম্ভাষণ করেচেন সেটাকে তর্জ্জমা ক'রে দিই। তর্জ্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে—চেষ্টাও সফল হবে না।

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজচে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েচে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্ত্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্চে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো,—
তোমার ঐ মিলে-মিশে যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝকমকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেককালের যে মাধুরী, তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্দ্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয়, তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তাহলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্চে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো। ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেচেন লাল চটি জুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যা-বেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইচে, ভিতরে পালিশকরা

কাঁচের পিছনে লম্বা সার ক'রে ঝুলচে লাল চটিজুতোর মালা like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হোলো, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া, তারা জিজ্ঞাসা করবে, "মানে কি হোলো, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, না হয় হোলোই বা তার রং লাল।" উত্তরে বলতে হয়, "চেয়েই দেখ না।" "দেখে লাভ কি?" তার কোন জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে—সে থাক্‌তে পারল না, ব'লে উঠ্‌ল, "দেখ্‌ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেসচিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রে লাফালাফি করতে লাগ্‌ল। বুড়োরা ধমক্‌ দিয়ে বল্‌লে, স্থির হ'য়ে বোস্‌। তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল, "কী সুন্দর।" কবি বল্‌চেন, শুনে I was mildly abashed।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও, একই ভাষায় বল্‌তে কুণ্ঠিত হোয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা, এর পংক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপর নয়। কেননা অলঙ্কারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্চে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে

বিবিধপ্রকারে উৎপাত সুরু ক'রে দিলে। সে বল্‌লে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয় মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয় যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মান্‌লে না, মান্‌লে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বল্‌তে চায় আমি দ্রষ্টব্য। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিসির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্ম্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ সে হ'য়ে উঠেচে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনীকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারিনে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর, কেউ কাজের কেউ অকাজের, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল ক'রে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হ'য়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহী নেই, যদি না হ'য়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে শুধু থাকে ভাবলালিত্য তাহলে সেটা বর্জ্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম্ম মেনেচে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখ্‌চেন,—

> এঘরে ওঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
> তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
> এখন ছ'টা
> ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেক্‌ল।
> বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
> পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
>   আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
> ভাঙা শার্সি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
>   বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
> আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
> ভাপ উঠ্‌চে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুক্‌চে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার মদের গন্ধওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্চে :—

> বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েচ কম্বলটা,
> চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
> কখনো ঝিমচ্চ, দেখচ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্চে

হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা' দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই ঃ—

His soul stretched tight across the skies
that fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জ্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগ্‌ল।—বল্‌লেন,—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling;
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিঁকল না। এইখানে কূপমণ্ডুকের মক্‌মক্‌ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ব্বিকার নন্‌। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্চে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেচেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্চে, যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্চে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেককালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙীন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেচেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয় কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি নাও ফোটে তাহলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যটাকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে—এই বিশ্বের

সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না কিন্তু অধিকাংশ জগৎ সংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোম্যান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তারপরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হ'তে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হ'য়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে অনাবৃত আকাশে পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্ন রকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে, কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে আকৃতি, তারও অন্তরে কেউবা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে, মনে করে না গূঢ় ব'লে কিছুই নেই, মনে করে না যা প্রতীয়মান তাতেই সব কিছু নিঃশেষে ধরা পড়চে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত কিছু আদব ও আব্রু, তা সাংঘাতিক সঙ্কটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হ'য়ে গেল, দীর্ঘকাল যে সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্ত্তে দীর্ণবিদীর্ণ হ'য়ে গেল; মানুষ যে সকল শোভন রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জান্‌ত তাকে দুর্ব্বল ব'লে আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল, বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধ'রে নিয়েছে।

কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বল্‌তেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বল্‌ব না ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বল্‌ব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখ্‌বে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারি। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হোলো। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদাভাষায় তিনি লিখ্‌চেন :—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিইনে। আমার মন নিঃস্তব্ধ।
যে আর এক আকাশে আর এক পৃথিবীতে
বাস করি—
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচ গাছে ফুল ধরে
জলের স্রোত যায় বয়ে॥

আর একটা ছবি :—

নীল জল······ ······ নির্ম্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেচে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল
তারা বাড়ি ফিরচে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর একটা :—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগচে না।
টুপিটা রেখে দিয়েচি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার পরে।

একটি বধূর কথা :—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।

চাঁঙকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হোলো যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হোত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট করে,
তুমি হাজারবার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম। বুঝলুম প্রেমের আয়ু ধুলোকে ছাড়িয়ে যাব।
মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত থাকতে পারতুম আমার আসনে,
নীরব জাগরণের তোরণেও ভরসা থাকৃত মনের মধ্যে।
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল,—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হল্‌দে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্চে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙশার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তারপরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখচিনে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। ষ্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিষটা আধুনিক হোত। কেননা সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুক্‌নো চিংড়ি মাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুট্‌কি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, "এটা কী হোলো?" একেলে কবি উত্তর করত, "এমনতরো হয়েই থাকে।" "অন্যটাও তো হয়।" "হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর সৌখীন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।" সেকালে কাব্যের বাবুগিরি

ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে সেটা পচামাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখচে ও দেখাচ্চে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধূলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ব-বিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে, বলে আসল জিনিষটা এতদিনে ধরা পড়েচে। সেই ঢেলা সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়চে। বিষয়টি এই :— বুড়ি মারা গেল—সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলমিলি-গুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠ্‌বে, তাহলেই কি যথেষ্ট হোলো? এ কবিতাটা লেখবার গরজ কি নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন? একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তাহলে বলব এ খবরটা দেবার মতো বটে কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্‌ট্‌ এলো, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে, মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েচে, তাহলে বলতে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তাহলে সন্দেহ করব তারো মেজাজে পোকা পড়েচে। যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখ্‌তেন অতি আধুনিকরা বাছাই করেন না সে কথা মান্‌তে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুক্‌নো পোকায় খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাৎ এই যে, এঁরা সর্ব্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার সখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিষ খায়, দূষিত জিনিষ ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিষে তাদের পক্ষপাত, তাতে ফল হয়, অভালো জিনিষেই তাদের পক্ষপাত পাকা হ'য়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তাহলে শুচি জিনিষে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়? কোনো কোনো

গাছে ফুলে পাতায় কেবলি পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না— প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব সাধনা ব'লে বাহাদুরী করতে হবে ?

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করচেন :—

রিচার্ড কোডি যখন সহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত,
ছিপ্ ছিপে যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন, গুড্ মর্ণিং, আমাদের নাড়ি উঠত চঞ্চল হ'য়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব,
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা কিছু এঁর চোখে পড়ত, মনে হোত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এদিকে আমরা যখন মরচি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটেনা,
গাল পাড়চি মোটা রুটিকে,—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।*

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয়, তার পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেচেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেচেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্চে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংসরসরক্তের কদর্য্য সমাবেশ সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতি-শাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্য সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এই রকম

* মূল কবিতাটি হাতের কা'ছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জ্জমা করতে হোলো, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি ত বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেচে। কিন্তু এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগ্‌ল শ্মশানের হাওয়া,—এমন কথা সে খুসি হ'য়ে বল্‌তে সুরু করেচে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?

মন যাদের বুড়িয়ে গেচে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হ'য়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর কর্‌তে চায়, গাঁজিয়ে ওঠা পচা জিনিষের মতো যত কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে, লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ ক'রে তবে তার বলি-রেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এযুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক্ মন এমন বিগ্‌ড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ করো তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উল্টো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েচে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাসান

১

কাকের ডাক, মোটরের হর্ণের শব্দ, ট্রামের চাকার ঘড়ঘড়ানি, ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়, "পাথ্‌রী চূণ, পাথ্‌-থ্‌রী চূ—ণ"। ভোরের কল্‌কাতা চিড়্‌বিড়ে আলোয় তেতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কোলাহলের ভুড়ভুড়ি ভাঙ্‌তে থাকে।

সমস্ত রাত ধ'রে কে যেন দেহটাকে খাটের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, রোজ রাত্রে যেমন বাঁধে। কনুয়ে ভর দিয়ে আধখানা শরীর তোলে ত বাকী আধখানা দ্বিগুণ ভার হয়ে বিছানার সঙ্গে লেপ্‌টে থাকে, রোজ যেমন হয়। কিন্তু আজ ফিলজফির ট্যুটরিয়াল। কাল প্রায় সারাটা রাত সুইন্‌বার্ণের অ্যাটালান্টা নিয়ে কাট্‌ল, বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে এর পর দেরি কর্‌লে ট্যুটরের কাছে মুখ থাক্‌বে না।

ফিলজফির ট্যুটর। অবিনাশের মনটা ভোরের আলোরই মতন একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতার জ্যোতিঃতে ভ'রে উঠ্‌ল। ভারি চমৎকার মানুষটি! কি কারণে যে চমৎকার তা সে জানে না, কিন্তু তার ভারি ভালো লাগে। সপ্তাহে দুদিন ত মোটে এক ঘণ্টা ক'রে দেখা হয়, আজ অবধি একটা কথাও হয়নি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ক্লাসঘরের দোরগোড়ায় প্রোফেসার লাহিড়ীকে দেখ্‌লেই তা'র মনটা অকারণে খুসি হয়ে ওঠে। কেমন ছেলেমানুষের মতো কচি মুখ, হাসি-হাসি ভাব, দৃষ্টিমাত্রে তা'র নিজেরও মুখে একটি সলজ্জ হাসির ছোঁয়াচ এসে লাগে। সেই হাসিটুকু দিয়েই নীরবে নতশিরে তাঁকে সে সম্ভ্রমভরা অভিনন্দন জানায়।

ফিলজফির মতো নীরস কাঠখোট্টা একটা জিনিস, কিন্তু উনি যখন পড়ান, মনে হয় সেতার বাজ্‌ছে। তন্ময় হয়ে শুন্‌তে হয়, তাঁর দিক্‌ থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

তাঁর দিকে চেয়ে থেকে থেকে অবিনাশের মনে হয়, যেন ওঁর মনের ভিতরটা ওঁর মুখশ্রীর মতোই স্নিগ্ধোজ্জ্বল। যেন ওঁর চিন্তাগুলি চমৎকার দামী রেশমে বাঁধা, প্রত্যেকটির গায়ে সোনার জলে নাম লেখা। বাইরের আলোর তীব্রতা রঙীন কাচে ছাঁকা হ'য়ে তাঁর মনের মধ্যে স্নিগ্ধ হয়ে পড়ে। বাইরের ধূলি-মলিনতা সেখানে ঢুক্‌তে পায় না। সব-কিছু সেখানে সারাক্ষণ তক্‌তক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছে।

অবিনাশ শিয়রের কাছে কেরাসিন কাঠের টেবিলটার উপর থেকে অমৃতবাজার-পত্রিকায় মোড়া ফিলজফিটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। গভীর প্রীতির সঙ্গে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে একটা-দুটো ক'রে তার পাতা-কয়েক

ওল্টাতেই চোখে-কানে যেন নেশা লাগ্‌ল, ঘুম ছুটে গেল। মনে মনে একটি ক'রে sentence পড়ে, ট্যুটরের কণ্ঠস্বর কানে বাজ্‌তে থাকে। তার মন যেন তারপর আর নিজের কণ্ঠে কথা কয় না, ট্যুটরের কণ্ঠস্বর দিয়ে তার কণ্ঠে সুর ফোটাতে হয়।

কাল রাত্রে ময়লা পাঞ্জাবীটা সাবান-কাচা ক'রে মশারির দড়ির ওপর মেলে দিয়েছিল, বিছানা ছেড়ে উঠে মুঠোয় ক'রে অনুভব ক'রে ক'রে দেখ্‌ল সেটা ঠিক শুকিয়েছে কি-না। তারপর টেনে টেনে লাট ভেঙে সেটাকে আরো ভালো ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে, চোখেমুখে জল না দিয়েই বই নিয়ে এসে ব'সে গেল।

বিছানার শিয়রের দিক্‌টা তার চেয়ার, তৈলচিহ্নিত বালিশটাকে তখনকার মতো ঠেলা মেরে সরিয়ে রাখ্‌তে হয়। তক্তপোষের গা ঘেঁসে কেরোসিন কাঠের একটা নড়বড়ে টেবিল, বই রেখে পড়া যায় কিন্তু লিখ্‌তে গেলে হাত যত নড়ে টেবিল নড়ে তার চেয়ে বেশি। পায়ের কাছে কাঁসার গেলাসে ঢাকা একটা জলের কুঁজো, সাবধানে পা রেখে বস্‌তে হয় উল্টে দেবার ভয়ে।

কিন্তু ভয় কি ঐ একটা? অবিনাশ ত্রস্তে একবার পাশের খাটটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। গোপাল তখনো ঘুমচ্ছে। যদি অবিনাশের কপাল-জোর থাকে, আরো ঘণ্টাখানেক সে ঘুমবে। তার মধ্যে তাড়াহুড়ো ক'রে সকালের পড়া যেটুকু কর্‌বার ক'রে নিতে হবে। রাত্রের পড়ার জন্যে ভাব্‌তে হয় না বেশি, কেননা সাড়ে এগারোটার শেষ সিনেমা না দে'খে গোপাল প্রায়ই বাড়ী ফেরে না। যেদিন সিনেমায় যায় না, সেদিন রাত আরও বেশি করে। তারপর এসেই জুতো-জোড়া লাথি ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুলে, জামাকাপড় না-বদ্‌লেই বিছানায় চিৎপাত হয়ে প'ড়ে টেনে ঘুম দেয়। কিন্তু ভোরের বেলাটা সে যদি কোনওপ্রকারে একবার জাগে তবে সেদিনকার মতো সব কাজ একেবারে মাটি। ঘরের মধ্যে আকবরের নওরতন সভা ব'সে যাবে একেবারে, কার সাধ্য বইয়ের পাতায় মন রাখ্‌তে পারে। প্রোফেসার লাহিড়ীর স্বপ্নময় প্রভাবকে তার অট্টহাসির শব্দ এখনই ভোঁতা ছুরীর মতো ঘস্‌ড়ে ঘস্‌ড়ে কাট্‌তে থাক্‌বে। ভগবান্‌ করুন ও ঘুমোক আরও ঘণ্টাদুই।

অবিনাশের ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌ল, গোপালের বিছানার ওপাশের জান্‌লাটা একটু খোলে। চোখ তার ভালো নয় প্রায় কোনোকালেই, পয়সার অভাবে চশ্‌মা নেওয়া হয় না, একটু আলো কম হ'লে ভারি পড়্‌তে কষ্ট হয়, দুচোখ ভ'রে জল আসে। বন্ধ দরজা-জান্‌লায় মেসের ঘরে তত বেলাতেও প্রায় রাত্রিরই মতো অন্ধকার। কিন্তু পাছে চোখে

আলো লেগে গোপাল জেগে ওঠে, এই ভয়ে সে আর উঠ্‌ল না। না-হয় একটু কষ্টই হবে, কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। বইয়ের ওপর আরও একটু ঝুঁকে প'ড়ে পড়া কর্‌তে লাগ্‌ল। ছোট হরফের ফুটনোটগুলো আঙুল বুলিয়ে পড়্‌তে হয়, কপালের ওপর ভুরুত্নটো একসঙ্গে এসে ঠেকে, উপায় নেই।

একটা দরকারী খাতা বের কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে, টেবিলের সেদিক্‌টা একগাদা বিলিতি ছবির কাগজে একেবারে ঠাসা। গোপালের সম্পত্তি। রাত্রের ঝোঁকে আত্মপর ভেদ করেনি। Photoplay, Dance, Film Fun, London Life, Bal de Moulin Rouge-এর Souvenir আরও কত-কি। মলাটের ছবি দেখ্‌লেই আঁৎকে উঠ্‌তে হয়। অবিনাশ সেগুলির থাক্‌ না ভেঙে ওপরের দিকটা একটুখানি ফাঁক ক'রে ক'রে আল্‌গোছে কেবল নামগুলো প'ড়ে দেখ্‌লে। সম্ভবতঃ তার হাত একটু কাঁপ্‌ছিল, সব-শুদ্ধ সরিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে দুপ্‌ ক'রে শব্দ হ'ল। গোপাল ডান কাতে শুয়েছিল, বিকট মুখভঙ্গী ক'রে গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুল। অবিনাশের বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, মনে মনে পড়া কর্‌তেও এরপর তার ভয়, কি-জানি তার মনের গলার আওয়াজ শুনেই গোপাল যদি জেগে ওঠে।

ততটুকুরও দরকার হ'ল না। গোপাল জাগ্‌ল। চোখ তাকিয়েই সটান দেহটাকে স্ক্রুয়ের ধরণে একটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে তুলে উঠে বস্‌ল— একেবারে পদ্মাসনে যোগী সন্ন্যাসীর ভঙ্গীতে। বল্‌লে, "কি কপাল! এত ফিকির ক'রে সব গুছিয়ে আন্‌ছি, আর মাঝ থেকে ঘুমটাই গেল ভেঙে! স্বপ্ন আরও দেখ্‌ব, কিন্তু Merlene Dietrich-কে চুমো খাওয়া সে কি আর ইচ্ছে কর্‌লেই ঘট্‌বে?"

অবিনাশ ফিললজির পৃষ্ঠার উপর প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল।

গোপাল বল্‌লে, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌। আমার যেমন বুদ্ধি, তাই এত লোক থাক্‌তে তোমায় বল্‌ছি এসব দুঃখের কথা। তুমি পড়, পড়; কি পড়্‌ছ ওটা?" ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বল্‌তে লাগ্‌ল, "কি পোষাক পরা ছিল জানো? টাইট্‌ শাদা undies, মাথায় একটা টপ হ্যাট্‌, ব্যস্‌ আর কিচ্ছু না। ফাইন্‌ দেখাচ্ছিল, যাই বল।"

অবিনাশ ফিললজিটা সরিয়ে রেখে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের পোএটিক্যাল্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌ টেনে নিল।

গোপাল বল্‌লে, "ওরে আমার যাদু রে, একটা বাইবেল ঘরে রাখনি? একখানা শ্রীমদ্ভাগবৎ? ও কুঁজোটাতে কি রেখেছ, কালিঘাটের গঙ্গার জল? নিজের চারদিকটাতে ভালো ক'রে ছিটিয়ে নাও, আমি যাচ্ছি। ভজুকে ডেকে ব'লে দেব একটু গোবর এনে দিতে?"

অবিনাশের চোখদুটো ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু কোন্ কথার কি-রকম ক'রে জবাব দিতে হয়, কলেজে কেউ তাকে তা শেখায়নি। সে চুপ ক'রে রইল। গোপাল উঠে পড়্‌ল। গুন্‌গুন্ কর্‌তে কর্‌তে পরণের কাপড়টাকে লুঙির মতো ক'রে ঘুরিয়ে প'রে নিল। মশারির দড়ির ওপর ঝুলানো জামাটার পকেট হাত্‌ড়ে সিগারেট্-কেস্ বা'র ক'রে সিগারেট্ ধরাল, তারপর বেরিয়ে যাবার মুখে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে আবার একবার সে অবিনাশের দিকে ফিরে তাকাল। অবিনাশের বুকটা দুর্‌দুর্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

গোপাল বল্‌লে, "ভয় নেই, ভজুকে সত্যিই গোবর আন্‌তে বল্‌ব না। কি আর এমন হয়েছে, স্বপ্ন বই ত কিছু নয়? সত্যিকারের exploits যদি দুটো-একটা তোমাকে শোনাই, গোবরছড়ায় তাহলে আর কুলোবে না, এই অপবিত্র মেস্ ছেড়ে বাকী জীবন পিঁজ্‌রাপোলে গিয়ে বাস কর্‌তে হবে।"

অবিনাশের জীবনের সব-চেয়ে বড় সমস্যা গোপাল। গোপাল তার জীবনাকাশের ধূমকেতু। আর কতটুকু নিয়েই-বা তার এই আকাশ, মেসের এই অন্ধকার ঘরটার দেয়ালগুলোর মধ্যেই তার প্রায় বারো-আনার ঠাঁই হয়, বাকী চার-আনা কলেজে। গোপাল আর প্রোফেসার লাহিড়ী, এই দুটি মানুষকে নিয়ে সে ভাবে। তার বৈচিত্র্যহীন ছোট সুখদুঃখের জীবনের দুইদিকে এই দুটি মানুষের পাহারা, ভিতরটা প্রায় বই দিয়েই ঠাসা।

স্নানের ঘর থেকে গোপালের গলা শোনা গেল, "এই সুরেন্, আমি যাচ্ছি কয়েক হাত খেল্‌ব, আমাকে partner ক'রে নিও কেউ-একজন।"

অবিনাশের আশা হয়, হয়ত পাশের ঘরে ব্রিজের আড্ডা বস্‌বে, গোপালের হাত থেকে রেহাই পাবে সে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে। কিন্তু তার কপাল মন্দ, মুখ ধুতে গোপালের দেরি হয়ে গেল, সুরেনের ব্রিজের আড্ডায় তার ঠাঁই হ'ল না। সে ঘুরে ঘুরে লোক জুটাল, তারপর নরেশ, বিলাস, অমর আর সে হুড়-মুড় ক'রে অবিনাশের পড়ার জায়গায় এসে ঢুকে পড়্‌ল। অবিনাশ বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে অত্যন্ত কাতরভাবে তাদের দিকে তাকাল, কিন্তু তাদের কারও দয়া হ'ল না। নরেশ বল্‌লে, "ড্যামিট্, কাল্ সরস্বতী-পূজো, অনধ্যায়। আজকে থেকে প্র্যাক্‌টিস্ না কর্‌লে তোমার মতো বইয়ের পোকা, কাল্‌কে ঠিক ফেল্ কর্‌বে।"

অমরের দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নেই। হাতের Green Mansions খানার থেকে চোখ না তুলেই বল্‌লে, "সরস্বতী-পূজোয় অনধ্যায়, এ না হ'লে তোমাদের জাতের এ দশা হবে কেন? বিশ্বকর্ম্মা পূজোর দিনে দেশশুদ্ধ লোকের কর্ম্ম নেই। কি এর মানে বল্‌তে পার?"

তাস-জোড়াকে বার-সাতেক ভেঁজে বিলাস গোপালকে দিয়ে সেটা এবার কাটিয়ে নিচ্ছিল, বল্‌লে, "এও আর বুঝলে না? সাইমন কমিশন যখন এসেছিল, কি হয়েছিল? হরতাল হয়নি? এও আমাদের এক-রকমের হরতাল। যে-দুটি দেবতার নাম করলে, তাঁদের রাজত্বে খুব যে সুশাসনে আছি তা-ত বলা যায় না। নাও, এবার বই রাখো, তাস দিচ্ছি।"

অবিনাশ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো ব'সে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাদের খেলা দেখ্‌ল, দুএকবার উঠ্‌তে গেল, কেউ না কেউ হাত ধ'রে টেনে তাকে বসিয়ে দিল।

নরেশ বল্‌লে, তুমি আম্পায়ার। গোপাল বল্‌লে, কেউ দেখ্‌ছে না জান্‌লে খে'লে আমার সুখই হয় না। কিন্তু ক্রমে তাদের তন্ময়তা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। অবিনাশ কখন যে উঠে গোটা-দুই বই হাতে ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তখন আর তা'রা তা লক্ষ্য কর্‌লে না। অমর খেলায় কোথায় কি finesse-এর ভুল করেছে, নরেশ তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। অমরের হাত থেকে Green Mansions খানা কেড়ে নিতে গিয়েছিল, অমর বলেছে, ডামী হবার সময় ছাড়া বাকী সময়টা সে ত পড়ে না, বইটার কোনো দোষ নেই। নরেশ জবাবে বলেছে, ড্যামিট—।

তর্কের শেষ হয় না। ক্রমে যে জিনিস খেলা ব'লে সুরু হয়েছিল তা দস্তুরমতো গুরুতর ব্যাপার হয়ে ওঠে। হাতাহাতি বাধ্‌বার উপক্রম হয়, একলা বিলাস দুই হাত দিয়ে কোনোগতিকে দুজনাকে ঠে'লে থামিয়ে রাখে।

দূরে একটা পার্কের খানিকটা রৌদ্রপ্লাবিত শ্যামলতা ছাতের ওপর থেকে চোখে পড়ে, আল্‌সেয় ভর দিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে অবিনাশ দাঁড়িয়ে রইল। আজ কি যে তার হ'ল অকস্মাৎ, পড়াতে মন বস্‌বার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আর রইল না।

সুদূর শৈশবের কোন্ একটি বিস্মৃতপ্রায় আসন্ন সরস্বতী-পূজা বারম্বার তার মনের আনাচে-কানাচে উকিঝুঁকি দিতে লাগ্‌ল। ছাড়াছাড়া স্মৃতির টুক্‌রো।···সরস্বতী-প্রতিমাকে চুম্‌কির কাজ করা বেগুনী রঙের কাপড় পরানো হচ্ছে।···নিভাঁজ বিপুল একটা আঁচলে দেবী-প্রতিমা ঢাকা প'ড়ে গেল, এত যত্নে গড়া সুন্দর মূর্ত্তিটির মুখটুকু ছাড়া কিছু আর চোখে পড়ে না, পদ্মের পাপড়ির উপর পদ্মের মতো টলটলে পা-দুটিও না, এতদিন ধ'রে কারিগরের এত পরিশ্রমের কি যে অর্থ রইল কে জানে?··· পান্‌কো-বিলের ধারে নৌকোয় নৌকোয় ছেলের দল ঘুর্‌ছে লাল খাগের সন্ধানে, নলখাগ্‌ড়ার বনে ফর্‌র্‌র্ ফর্‌র্‌র্ ক'রে ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।···

কাচের দোয়াতগুলোকে ক্ষারজলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, ভোরবেলার প্রথম দোয়া দুধ তাতে ভ'রে সেই দুধে খাগের কলম ডুবিয়ে দেবীর পায়ের কাছে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।···মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, ভোর রাত্রে কুকুর এবং চৌকিদারের পাহারা এড়িয়ে চৌধুরীদের পলাশ-বন উজাড় ক'রে ফুল নিয়ে আসা হ'ত।

ছাতের একপাশে রান্নাঘর। দরজার বাইরে ব'সে ভজু একটা ভেট্‌কি মাছকে চাক চাক ক'রে কেটে ক'খানা হ'ল গুনে দেখ্‌ছিল। ভেতর থেকে ফোড়নের গন্ধ। মেথর কলতলা ঝাঁট দিচ্ছে তার শব্দ আস্‌ছে। অবিনাশ জোর ক'রে মনটাকে সেদিক্ থেকে ফিরিয়ে নিল।

সার সার গাছ। মাঝে মাঝে এক-একটাতে লঘুশ্যাম নব-পত্রোদ্গম হয়েছে। মৃদু হাওয়ায় পাতাগুলি ঝিরঝির ক'রে কাঁপ্‌ছে, আলো প'ড়ে চিক্‌চিক্ ক'রে জ্বল্‌ছে, যেন কোন্ অদৃশ্য দেবী-প্রতিমার অঙ্গে সবুজ-চুম্‌কির কাজ করা আঁচল। অবিনাশ ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, কোন্ গাছটার কি নাম। দেখ্‌লে, কোনোটাই তার চেনা নয়, কৃষ্ণচূড়া ছাড়া। ঐ সুন্দরী তন্বীর মতো দৃপ্ত গাছটির কি নাম যদি জানা থাক্‌ত। একটা ইংরেজি কবিতা মনে পড়্‌ল, ভাব্‌লে হয়ত ঐ গাছটার ইংরেজি নাম হবে 'পপ্‌লার'। ভারি সুন্দর নাম পপ্‌লার, নামের মধ্যে ওর বায়ুতাড়িত পল্লবের পতপত যেন শুন্‌তে পাওয়া যায়। মনে মনে ইংরেজি কবিতাটার কয়েকটা চরণ আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌ল।

The poplars, in long order due,
With cypress promenaded...

সবটা মনে নেই, ভারি বিরক্ত লাগ্‌তে লাগ্‌ল। যাবে একবার নীচে? দে'খে আস্‌বে শেষের লাইন-ক'টা?···পাশের বাড়ীর চিলকোঠার ওপাশ থেকে একটা পাখী ডেকে ডেকে খুন হয়ে যাচ্ছিল। অবিনাশের হঠাৎ মনে পড়্‌ল, সেটা সত্যিই কোকিল। মনে পড়্‌ল, এটা বসন্তকাল, পাখীটা স্পষ্টই কুহুকুহু ব'লে ডাক্‌ছে।

কিন্তু কোকিলকে বেশীক্ষণ মনে রইল না, কলেজের বেলা হচ্ছে। অভ্যাসক্রমে দূরে গির্জ্জার ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, আটটা বেজে সাড়ে-সাঁইত্রিশ মিনিট। ছ'বছর ধ'রে দেখ্‌ছে, আটটা বেজে সাড়ে-সাঁইত্রিশ মিনিট। কেউ কাঁটাটাকে ঘুরিয়ে ন'টা বাজিয়ে রাখে না? রোজ তাহলে বারবার ক'রে ঘর গুনে সাড়ে-সাঁইত্রিশ পড়্‌তে হয় না। চাকর-বাকরকে হুকুম কর্‌তে, ডাক্‌তে তার ভালো লাগে না, নিজেই এগিয়ে গিয়ে অতি নরম সুরে ভজুকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "ক'টা বেজেছে বল্‌তে পার ভজু?"

আঁস ওঠাতে ওঠাতে ভজু বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। আমাদেরও সব হয়ে গেল বাবু।"

রাস্তার ওপাশে বাথ্‌-টালি দিয়ে মোড়া শিবমন্দিরটার সাম্‌নে থেকে কর্‌পরেশনের গাড়ী একটা ডাষ্টবিন্‌ খালি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে ফুটপাথের ওপর ব'সে একটা লোক আদুল গায়ে চুল ছাঁটাচ্ছে। তেতে-ওঠা রোদটা একেবারে সোজা তার ছাঁটা ঘাড়টার ওপর এসে পড়েছে। সে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, ঘাড়টা সরাতে চাচ্ছে, কিন্তু তার নাপিত কিছুতেই তাকে নড়্‌তে দেবে না, দুহাত দিয়ে চেপে মাথাটাকে সোজা ক'রে রাখ্‌ছে। শিবমন্দিরটার দিকে মুখ ক'রে মুদিতনেত্রে অবিনাশ অদূরাগতা বাগ্‌দেবীকে মনে মনে প্রণাম কর্‌লে, তারপর কলেজ যাবার জোগাড় কর্‌তে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

২

কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখে, বিপর্য্যয় কাণ্ড। তক্তপোষ, টেবিল, বাক্স-তোরঙ্গ, জলের কুঁজো, বইখাতাপত্র সমস্ত সে-ঘর থেকে বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। ধূলিমলিন দারিদ্র্যচিহ্নিত ঘরটা স্নাত বৈধব্যের মতো একটি স্নিগ্ধ শোভায় ভ'রে উঠেছে। যেদিক্‌টায় তার খাট থাক্‌ত সেখানে থরে থরে পদ্মফুল সাজিয়ে দেবীর পাদপীঠ রচিত হয়েছে। আর একটি অতিকায় শ্বেত শতদল পদ্মের মাঝখানে এলায়িত দেহপল্লবের মৃদুভার রক্ষা ক'রে কুন্দধবল দেহা হাস্যস্ফুরিতাধরা দেবী বীণাপাণি সরস্বতী।

হঠাৎ অবিনাশের বুকটায় কিসের একটা দোলা লাগ্‌ল। ও মুখটিতে, ও হাসিটিতে কি আছে যার জন্যে পলকের দেখায় চোখে চির-পরিচয়ের স্বাদ এসে লাগে? মুহূর্ত্তে প্রোফেসার লাহিড়ী, গোপাল, তার কলেজ-পড়াশোনা-পরীক্ষা, তার জীবন-জোড়া যে-ব্যর্থতাকে সে নিজে জানে না, তার অবসাদ সবকিছু সেই মধুর জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রতার মধ্যে একবিন্দু অন্ধকারের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেল। সে কেবল অনুভব কর্‌লে, তার অনাদিকালের পরিচিত কোন্‌ পরমাত্মীয়ের আগমন হয়েছে, অমৃতগন্ধী বাতাসকে একটু অবহিত হ'লেই সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন অনুভব করা যায়, যে-ঘরটা সারাক্ষণ গোপালের কুৎসিত বাক্যভঙ্গী এবং নীরস হাসিতে মুখরিত হয়ে থাক্‌ত সেখানে কি এক অপরূপ সুর-অবকাশের স্তব্ধতা যেন বিরাজ কর্‌ছে।

সরস্বতীর দুপাশে সখী নেই ব'লে বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে গোপাল অত্যন্ত কঠিন সমালোচনা সুরু করেছিল। আম্‌তা আম্‌তা

ক'রে অবিনাশ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আমার বইটইগুলো কোথায় ?"

গোপাল বল্‌লে, "আছে কোথায় উপরে সিঁড়ির ঘরে বোধহয়, দেখগে।"

অবিনাশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিঁড়ি বেয়ে উপরে এল, কিন্তু বইয়ের খোঁজ আর কর্‌ল না। একটি সুঠাম সুললিত দেহভঙ্গী, চিরপরিচয়ের নিবিড় মমত্বমাখানো প্রসন্ন একখানি মুখ, কুসুম-পেলব আলোহিত দুটি-সুকুমার চরণকমল তার সমস্ত উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে জেগে রইল।

সে-রাত্রে ছাতের সিঁড়ির ঘরে তার শোবার জায়গা হ'ল। গোপালের জন্যে ভাবনা নেই, রাত্রে বাড়ী না থাক্‌লেই হ'ল। অনেক রাত-অবধি মশার কামড়ে এবং শৈশবের-স্মৃতির-ভাণ্ডার-উজাড়-করা অনভ্যস্ত নানা চিন্তায় অবিনাশের চোখে কিছুতেই যখন ঘুম এল না তখন চোরের মতো চুপি চুপি নেমে এসে নিজের ঘরের দরজাটা সন্তর্পণে ঠে'লে খুলে সে ভেতরে ঢুক্‌ল। আলো জ্বাল্‌তে ভরসা হ'ল না, চোরেরই মতো লুকিয়ে ঘরের একটা কোণে জড়সড় হয়ে সে ব'সে রইল। ক্রমে সে ঘরের মধ্যেকার অতি-নিবিড় অন্ধকার তার চোখে অভ্যস্ত হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ একসময়ে সে দেখ্‌লে, অনায়াসেই ঘরের সবকিছু সে প্রায় স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছে। কুন্দকান্তি দেবীপ্রতিমার অঙ্গ থেকে যেন একটি অস্ফুট শুভ্র আলো নির্গত হচ্ছে ; তাঁর পাদুখানির লোহিতাভা সে আলোয় আরো যেন স্নিগ্ধতর হয়ে চোখে পড়্‌ছে। তখন সেই সুপ্তিব্যাপ্ত-গভীর নির্জ্জনতায়, রুদ্ধ ঘরের সেই রহস্যময় আধ-আলো অন্ধকারে, এই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রাণ-স্বরূপিণী বাণী বাগীশ্বরী নির্ব্বাক্ স্তব্ধতায় বাহুবিস্তার ক'রে অবিনাশের সৌন্দর্য্য-তৃষিত অন্তরকে স্পর্শ কর্‌লেন।

তার কি মনে হ'ল সে জানে না, কেবল অনুভব কর্‌ল, সহসা তার সমস্ত অন্তর মধুময় হয়ে উঠ্‌ল। তার অস্তিত্ব ভ'রে, তার দেহের সমস্ত অণুপরমাণুকে স্পন্দিত ক'রে, দেবীর সহস্রতন্ত্রী বীণা স্বর্ণিম ঝঙ্কারে মুখরিত হতে লাগ্‌ল। স্নিগ্ধ পারিজাতগন্ধী বাতাস বইল, নিরানন্দ জীবনের জানা অজানা সমস্ত প্রকোষ্ঠ ভ'রে উৎসবের আলো জ্বল্‌ল, পাখী গাইল, মর্ম্মবৃন্তে সুবাস-এবং-শোভায়-সমাবৃত সহস্রদল পদ্মের বিকাশ হ'ল, এবং দেবী পরম করুণাভরে কোরকগুচ্ছের মতো সুকোমল উষারাগরঞ্জিত নিজের অতুলন দুটি চরণ সেই বিকশিত পদ্মের ওপর স্থাপন কর্‌লেন। অবিনাশের সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, আকুল ভাবাবেগে, অশ্রু-আপ্লুত নয়নে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে বারম্বার সে নিজেকে লুণ্ঠিত কর্‌তে লাগ্‌ল।

এই অবস্থায় কখন্ যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। যখন জাগ্‌ল,

তখনো রাত্রি প্রভাত হয়নি, মেসের ছেলেদের তখনো জাগ্‌তে বহু বিলম্ব আছে। আজ আর তার দেহে নাগপাশের বাঁধন জড়ানো নেই, শিরায় শিরায় রক্তগতির স্বচ্ছন্দ সঞ্চার সে যেন অনুভব করতে পারছে। লঘু দেহমন নিয়ে সে উঠে বস্‌ল। সকলের অগোচরে এমন একান্ত ক'রে একটি মধুময় রাত দয়া ক'রে চরণাশ্রয়ে কাটাতে দেবার জন্যে প্রাণভ'রে দেবীকে সে ধন্যবাদ জানালে। তারপর তাঁর সম্মুখে করজোড়ে ধ্যানাসনে নিস্পন্দ হয়ে ব'সে রইল। তার ভয় ছিল, কখন্ অন্যেরা ঘুম ভেঙে উঠে পড়্‌বে এবং তাকে সেই অবস্থায় দেখ্‌তে পেয়ে পরিহাসে জর্জ্জরিত করবে ; কিন্তু প্রাণ ধ'রে সে চ'লে যেতেও পারছিল না। দেবীর প্রসন্ন মুখের স্মিতহাস্য একেবারে তার অন্তরের অন্তরতম কোণটিকে পর্য্যন্ত কি এক পুণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল, তার দে'খে দে'খে তৃপ্তি হচ্ছিল না। সুকুমার পা-দুখানির অতি সুললিত-সংস্থান, লোহিতাভ পদতল, সুবিন্যস্ত সমুজ্জ্বল নখররাজি, সমস্তই কি এক অপরূপ যাদুমন্ত্রে তার গভীরতম অস্তিত্ব অবধি মুগ্ধতার সঞ্চার করেছিল। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে কিছুতেই তার সাধ্যে কুলচ্ছিল না।

পাশের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হতেই সে উঠে পড়্‌ল। পরিতোষ রোজ সকালে গঙ্গায় নাইতে যায়, অবিনাশকে বেরিয়ে আস্‌তে দে'খে বল্‌লে, "আজ খুব সকাল-সকাল উঠেছ দেখ্‌ছি যে। পড়াশোনা ত আজ আর নেই, যাবে একটা ডুব দিতে ?"

রাত্রির অনধিকার-চর্চ্চায় অবিনাশের নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। তাই পরিতোষের এই সাদর আহ্বানে সে একসঙ্গে আরাম অনুভব করল এবং কৃতজ্ঞ হ'ল, কিছুতেই 'না' বল্‌তে পারলে না। ধোয়া কাপড় ও গামছা খুঁজে বার ক'রে একচাপ্‌ড়া তেল মাথায় ঘস্‌তে ঘস্‌তে সে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌ল।

এর আগে কখনো আর সে গঙ্গায় নাইতে আসেনি। দেখ্‌লে, ঘাটে তত সকালেই বহু লোকের সমাগম। কুয়াসাচ্ছন্ন রহস্যময় প্রভাত, গঙ্গার প্রখর নিঃশব্দ রহস্যময় প্রবাহ, বহু স্নানার্থীর ধ্যানগভীর রহস্যময় সমাগম, এসমস্ত মিলে তার চিত্তের ওপর কি এক তপঃস্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাব বিস্তার করলে। একটি বিপুল শ্রদ্ধার ভারে তার হৃদয় বারবার নুয়ে নুয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কোন্ এক আবেগময় আরাধনার ভাষাহীন মন্ত্র তার সমস্ত চেতনা ভ'রে মন্দ্রিত হতে লাগ্‌ল।

স্নানার্থী এবং স্নানার্থিনী। কেহ বা তরুণী, এবং সুন্দরী। অবিনাশ হঠাৎ অনুভব করলে, নিজেরই অগোচরে কখন্ তার তৃষিত দৃষ্টি তাদের মধ্যে দুটি অলক্তরঞ্জিত সুকুমার চরণপল্লবের সন্ধান করছে। নিজেরই

কাছে লজ্জিত হয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ডুব দিল। আজ সমস্ত কাজেই সে একটি আশ্চর্য্য উৎসাহ বোধ করছিল। আজকের মতো তার জীবন অর্থময়, আজকের মতো একটি চূড়ান্ত সার্থকতার নীড় অদূরে তার জন্যে বাঁধা হয়ে আছে। দুর্ব্বল দেহটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে সে অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে সাঁতার কাটল। তারপর পরিতোষের ডাকাডাকিতে উঠেপ'ড়ে কাপড় ছেড়ে ট্রাম ধরতে চল্‌ল।

বাড়ী ফিরে দেখ্‌ল, তার সেই নিরানন্দ নোংরা ঘরটাকে আর চেনা যায় না। ফুলপল্লব-আলিপনা, ধূপধূম-চন্দন। বহুকণ্ঠে মধুচ্ছন্দ আরাধনার মন্ত্র গুঞ্জরিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়গুলোকে ফে'লে রেখে সেও এসে সকলের সঙ্গে নতশির হয়ে ব'সে পড়্‌ল। মন্ত্রের প্রতিটি শব্দ সাবধানে স্পষ্ট ক'রে সে উচ্চারণ কর্‌ল, কণ্ঠস্বরে আবেগ ভ'রে দিল, দুহাত ভ'রে ফুল তুলে তুলে অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রীতিতে সেগুলিকে মণ্ডিত ক'রে দেবীর পায়ে অর্ঘ্যাঞ্জলি অর্পণ কর্‌ল।

সকলে মিলে যখন হুড়োহুড়ি ক'রে উপরে খেতে গেল, সে ইচ্ছে ক'রেই তাদের সঙ্গে গেল না। আজ উৎসবের ভিড়ে তার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য কর্‌বে না।

ছাতের সিঁড়িতে শেষ পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে সে উঠে গিয়ে দরজাটাকে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে এল।—তারপর গতরাত্রির মতো ক'রে দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। তার নিরানন্দ উৎসবহীন জীবনে এই একটিমাত্র উৎসব প্রতিবৎসর আসে, যথেষ্ট উৎসাহ সহকারেই তাতে সে যোগ দেয়, আনন্দের শেষ রসবিন্দুটিকে পর্য্যন্ত তার উৎসব-রস-পিপাসু তরুণ চিত্ত সেই ক'টি মুহূর্ত্তের কাছ থেকে আদায় ক'রে নেয়। কিন্তু আজকের মতো এমন পরিপূর্ণ উৎসব আর তার জীবনে কখনো আসেনি। এ যেন তার মধ্যেকার কোন্ অপরিচিত সুপ্ত সত্তাকে গম্ভীর উদাত্ত সুরে আহ্বানে করেছে। সে আহ্বানে তার চিরকালের অসীম সম্ভাবনা দুঃসহ আনন্দ-বেদনায় আজ সাড়া দিয়েছে।

এতদিন যাঁকে প্রতি বৎসর সে পূজা করেছে, যাঁর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে, মন্ত্রে যাঁকে অভিনন্দিত করেছে, তিনি তার উৎসবেরই প্রতীক মাত্র ছিলেন, সে-উৎসব থেকে আলাদা ক'রে তাঁর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আজ এ এক বিশেষ আবির্ভাব। ইনি শুধু দেবী নন্, ইনি বিশেষ ক'রে তার দেবী। তার কোনো-একটি বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে তার জীবনপদ্মে নিজের চরণ রক্ষা করেছেন। এই বিশেষ আবির্ভাবটিকে বুঝ্‌বার, তাঁকে বিশেষভাবে অন্তরে বরণ ক'রে নেবার সামর্থ্য

এই বিপুল পৃথিবীতে আজ একমাত্র তারই আছে, আর কারও নেই। দেবীর স্মিত-প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল যেন একমাত্র তারই জন্যে বিশেষ ক'রে আজকের এই হাসি। কত-জন্মান্তর ধ'রে ঐ মুখটির ঐ হাসিটুকুর জন্যে সে যেন সাধনা করেছে, আজ বহুপুণ্যফলে সিদ্ধি তার দ্বারে সমাগত। তারই ঘরটিতে, তারই নিজের অধিকৃত স্থানটিতে দেবীর পীঠস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, যে এটাও যেন আকস্মিক ঘটনা নয়, দেবীর কোন্ স্নেহরহস্যময় মধুর ইচ্ছাকে সে যেন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখ্‌তে পেলে।

কলেজে তার স্থান সকলের শীর্ষে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আজ দর্পের সঙ্গে সে উপলব্ধি কর্‌লে, দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার অধিকার আর-সকলের চেয়ে তার কত বেশী। তার পূজাতে দেবীর তাই বিশেষ প্রসন্নতা। তার স্বভাবতঃ বিনয়ী মন আজ দেবতার কাছে আত্ম-নিবেদনের আশ্রয়ে নিজের চূড়ান্ত অহঙ্কারকে চরিতার্থ কর্‌লে। সহসা নিজেকে নিজেরই কাছে তার অতি বিস্ময়কর রকমের বড় মনে হ'ল। দেবতার কাছে একটি পরম নিবিড় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময়রূপে নিজেকে যেন সে দেখ্‌তে পেলে। তখন কোথাও লজ্জাভয়ের অন্তরাল আর রইল না, স্বাধিকারের গর্ব্বে এগিয়ে গিয়ে দেবীর মনোরম দুটি-পাদপদ্মের নীচে করতল এবং উপরে ললাট স্পর্শ ক'রে সে ব'সে রইল। সেই অতি-অন্তরঙ্গ স্পর্শে তার সমস্ত দেহে ভাবাবেগের শিহরণ বিদ্যুৎ স্রোতের মতো সঞ্চারিত হ'ল। তার মনে হতে লাগ্‌ল, তার দুর্ব্বল দেহ সেই শিহরাবেগ যেন বেশীক্ষণ বহন কর্‌তে পার্‌বে না, যেন সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌বে, কিন্তু সে মধুর মূর্চ্ছাও তার কাছে আজ পরম রমণীয় ব'লে মনে হতে লাগ্‌ল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মেসের ছেলেরা প্রায় সকলেই অন্যান্য মেসে-হষ্টেলে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে চ'লে গেল। বাইরের নিমন্ত্রিতরা যদি কেউ আসে, তাদের অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে একজন কারও বাড়ীতে থাকা দর্‌কার, এই অজুহাতে অবিনাশ থেকে গেল। যাবার জায়গা তার ছিলও না। অমর ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁসা মানুষ, একখানা ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে নিজের ঘরে দরজায় খিল দিয়ে রইল। সকালের অর্পিত-পুষ্পাঞ্জলি দুপুরের গরমে শুকিয়ে আস্‌ছিল, বারবার জলসেচন ক'রে অবিনাশ সেগুলিকে তাজা রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। ধূপের আগুনকে একমুহূর্ত্ত নিব্‌তে দিল না।

বিকেলের দিকে বাইরের লোক দুএকজন যারা এল, প্রতিমা-দর্শন ক'রেই চ'লে গেল, বাড়ীতে বিশেষ কেউ নেই দে'খে দেরী কর্‌ল না। সমস্ত সন্ধ্যা নিস্তব্ধ একান্তে তার বহু তপোলব্ধ সম্পদ্ দুটি রাতুল চরণের সান্নিধ্যে অপূর্ব্ব একটি মাধুর্য্যের আবেশ নিয়ে তার কাট্‌ল। তারপর রাত্রি।

•

•

গোপাল এসে মুরুব্বিয়ানা চালে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "এত আর কেন? এম্‌নিতেই ত আমাদের সঙ্গে মা-সরস্বতীর সৎমায়ের মতো ব্যবহার, এর ওপর তুমি যদি এ রেট্‌-এ তোয়াজ চালাও—তাহলে আমরা হতভাগারা আর ত্রিসীমানায় ঠাঁই পাব না।"

তেজেশ বল্‌লে, "যাই বল ভাই, ইডেন হষ্টেলের ঠাকুর এবার যা চমৎকার হয়েছে, এমন আর কোথাও হয়নি। একবার দেখ্‌লে আর-কোনো ঠাকুরের দিকে তাকাতে শুদ্ধু ইচ্ছে করে না।"

অবিনাশের স্বপ্নের চমক ভাঙে। মৃণ্ময়ী দেবীপ্রতিমার উপর থেকে জ্যোতিঃর প্রলেপ মুছে মুছে যায়। খড়িমাটির ওপর তেঁতুলবীচির গর্জ্জন, পায়ের তলায় কোনো-এক-জায়গায় আঠাল মাটির গায়ে তাড়াতাড়িতে অথবা অনাবশ্যকবোধে মূর্ত্তিকারের তুলির পোঁচ পৌঁছয়নি। প্রাণপণে সে তার মাধুর্য্যের ধ্যানটিকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌বার জন্যে চোখ বোজে।

গোপাল বল্‌লে, "তিন গেলাস সিদ্ধি খেয়ে মাথাটা চম্‌চম্‌ কর্‌ছে। ফ্ল্যাশ কে কে খেল্‌তে চাও-এসো, আজ হার্‌ব ঠিক করেছি।"

দলবল নিয়ে গোপাল বেরিয়ে গেল, তবু ঘরের ভিড় কম্‌ল না। শীতলাপ্রসাদ মুখভরা পানের ওপর আর-একটা খিলি জোর ক'রে চাপিয়ে উটের মতো উর্দ্ধগ্রীব হয়ে বল্‌লে, "পাদ্রী বেটারা এবার আচ্ছা জব্দ। হষ্টেলের ছাত্ররা ভোর রাত্রে উঠে একেবারে chapel-এর গায়ে ঠাকুর নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাদ্যভাণ্ড শুনে সবাই-ত একেবারে থ। ল্যাংটন-সাহেব পুলিশকে টেলিফোন করেছিল ব'লে পরশু থেকে কলেজশুদ্ধ ছেলে strike কর্‌বে ঠিক করেছে।"

সমরেশ বল্‌লে, "আমাদের কলেজটা যত অজ পাড়াগেঁয়ের আড্ডা। strike কাকে বলে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, মানে বল্‌তে পার্‌বে না। সব ম'রে আছে।—প্রাণ নেই রে ভাই, প্রাণ নেই!"

অবিনাশ চোখ বুজে ব'সেই ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কান্‌-দুটোকেও যদি কোনো উপায়ে বন্ধ করা যেত ত মন্দ হত না। যখন অসহ্য হ'ল, রান্না হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে উপরে গিয়ে দেখ্‌লে, অমরবাবু ছাড়া আর সবাই হয় বাইরে খাবে, নয় খাবে না ব'লে সে রাত্রের মতো উনুন জ্বলেনি। ভজু বল্‌লে, "অমরবাবুর লেগে চায়ের দোকান থেকে আলুর চপ আর ডবল ডিমের 'মাম্‌লেড' আস্‌ছে। আপনার আস্‌বে বাবু?"

খানিকটা কাঁচা ছানা আনিয়ে চিনি দিয়ে খেয়ে সে জল খেল। মাংস ডিম সে খায় না তা নয়, কিন্তু আজকের দিনটা কোনোদিকে কোনো অশুচিতা কর্‌তে তার ইচ্ছে কর্‌ল না।

খেতে খেতে ভজুকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "তুমি অঞ্জলি দিলে না, ভজু?"

ভজু বল্‌লে, "আজ্ঞে বাবু, আমরা কি আর সে কপাল ক'রে এসেছি যে মা-সরস্বতী ঠাক্‌রুণের পায়ে ফুল দেব? অম্‌নি দূর থেকে গড় করেছি।"

এই নিরক্ষর মাতৃকৃপা-বঞ্চিত হতভাগ্যের কল্পিত দুঃখ স্মরণ ক'রে অবিনাশের দুই চোখ সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "না, না, ফুল দেবার অধিকার থাক্‌বে না কেন? ভক্তিতে দেবতার অসম্মান হয় না। আর বিদ্যা কি কেবল বই প'ড়েই হয়? আজকের দিনে যে পড়াশোনা করা বারণ তার মানেই হচ্ছে—"

ভজু মনে মনে সেদিনকার বাজারের দস্তুরী পাওনার হিসাবটা গুছিয়ে নিতে লাগ্‌ল।

রাত্রে গতরাত্রিরই মতো ব্যবস্থা। ছাতের ঘরের ধূলিবালুভরা মেঝেতে খানিকক্ষণ মশার কামড় খেয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে অবিনাশ উঠে পড়্‌ল। তখনো মেসের ছেলেরা সকলে ঘুময়নি। পাশের ঘর থেকে নরেশের চীৎকার শোনা যাচ্ছে, "তুমি ইস্কাবন খেল্‌লে কি ব'লে, ড্যামিট? দেখ্‌ছ, পরপর ক্রমাগত ইস্কাবন আমি discard কর্‌ছি।" অমর বল্‌ছে, "আহা না হয় ভুলই খেলেছি, তাই নিয়ে এত চেঁচামেচি কর্‌ছ কেন?" "আমার খুসি আমি চেঁচাব, তোমার কি?" "না, তুমি চেঁচাতে পাবে না।" "হ্যাঁ, একশোবার চেঁচাব, তোমাকে ভয় করি নাকি, ড্যামিট।" "অভদ্র।" "রাস্কেল।"

এবারে কানে আঙুল দিতে বাধা ছিল না। অবিনাশ দুই-হাতে কান চেপে একটি অপলক ধ্যানদৃষ্টির দীপারতিকে দেবীপ্রতিমার সম্মুখে জ্বালিয়ে ধ'রে ব'সে রইল।

ঐ মুখটিকে এরই মধ্যে কত আপনার ব'লে যে তার মনে হচ্ছে! সে শৈশবে পিতৃমাতৃহারা। যদি তার মা বেঁচে থাক্‌তেন, নিশ্চয়ই তাঁকে তার এইরকম আপনার মনে হ'ত। সে ছবি আঁক্‌তে জানে না, কিন্তু তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, অনভ্যস্ত হাতে তুলি চালিয়ে সে যেন অনায়াসে ঐ অপরূপ লীলায়িত দেহভঙ্গী, পরিপাটি পা-দুটির ঐ বিশেষ ধরণের একটি সুন্দর সুললিত সমাবেশ, প্রতিটি সুকুমার পদাঙ্গুলির অতি স্নিগ্ধ করুণ লাবণ্যকে বারম্বার চিত্রপটে রূপ দিতে পারে। কিন্তু এমন ক'রে তার সমস্ত অন্তর ঐ মাধুর্য্যের অমৃতরসে ভ'রে ওঠা সত্ত্বেও কিছুতেই তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। কি হলে যে তৃপ্তি হয়, তাও সে বুঝ্‌ছিল না।

হঠাৎ আবার অতি নিবিড় ভাবাবেগের প্রেরণায় দেবীপ্রতিমার পা-দুখানিতে করস্পর্শ কর্‌তে গিয়ে মনে হলো, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার পরিচিত-অপরিচিত আর কেহ কোথাও এমন ব্যবহার কর্‌ছে, সে

ভাব্‌তে চেষ্টা করল। তার সমস্ত উন্মুখ চিত্ত সহসা নিদারুণ সঙ্কোচে-কুণ্ঠায় যেন নিজেরই মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে গুটিয়ে গেল। ক্রমে তার লজ্জা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, এতক্ষণ দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়নি, এতক্ষণ যিনি ছিলেন তার ভাবাবেগের সৃষ্টি এবারে তিনি সত্যই জীবন্ত এবং জাগ্রত। তার এই পাগ্‌লামী কেউ দেখ্‌ছে না ভেবে সে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল, সহসা সচকিত হয়ে উপলব্ধি কর্‌লে, দেবী স্বয়ং দেখ্‌ছেন! কেন যে তারপর তার ভয় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল, তা সে জানে না। তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে সে পালিয়ে এসে বাঁচল।

ছাতের ঘরটায় অন্ধকারে একলা ব'সে ব'সেও বহুক্ষণ তার ভয় গেল না। তারপর যখন ক্লান্ত দেহমনের ওপর নিদ্রার লঘু আবেশ নেমে এল; সে স্বপ্ন দেখ্‌ল, গঙ্গায় নাইতে গিয়েছে। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে সোপানাবলী অতিক্রম ক'রে যিনি উঠে যাচ্ছেন, শুভ্র তাঁর দেহের জ্যোতিঃ, সুকোমল সুন্দর দুটি পা থেকে মাধুর্য্য যেন রক্ত হয়ে ফেটে পড়্‌ছে।

৩

পরের দিন ভাসান। সেদিনও কলেজ ছুটি। শাস্ত্রমতে অনধ্যায় নয়, কিন্তু অবিনাশের পড়ার কথা মনে হ'ল না। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথমে মনে হ'ল, এ দুদিন সে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল। এতখানি মাধুর্য্য কি তুচ্ছ সূত্র ধ'রে কোথা দিয়ে তার জীবনে এসে পড়েছিল, এ যেন বাস্তব নয়, আগাগোড়াই ফাঁকি। আজকে স্বপ্নের ঘোর অনেকটাই কেটে গিয়েছে। পূজাশেষে আজ দেবীমূর্ত্তি প্রাণহীন, কোনো আরাধনা আজ আর তাঁর পাওনা নয়, আজ তাঁকে নিতান্ত সাদা চোখে নূতন ক'রে মোহমুক্ত ভাবে দেখে নেবার কৌতূহল তবু তাকে পাশের ঘরটায় টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির কর্‌ল।

প্রতিবৎসর যে-দৃষ্টি নিয়ে দেবীকে সে দেখেছে, আজও তাই দেখ্‌তে চাইল এবং কৃতকার্য্যও হ'ল। সুন্দর গড়ন, সুনিপুণ শিল্পরচনা। মনে পড়্‌ল কত অধ্যবসায়, স্বভাবজ কি আশ্চর্য্য নির্ভুল রূপদৃষ্টি দিয়ে নিরক্ষর শিল্পী একে গড়েছে। কোথাও তার নিজের নামটা এঁকে বসিয়ে দেবার কথা তার মনে হয়নি। তার এত সাধের এবং সাধনার এই রচনাকে আজ সবাই মিলে গঙ্গার অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌বে। অনন্ত-কালের পৃথিবীতে তার কোনো চিহ্ন আর থাকবে না। কোনো ম্যুজিয়মের বেদীতে তার ঠাঁই হবে না, কিম্বা কোনো শিল্প ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, পৃথিবীর কোনো কবি কোনোদিন তাকে নিয়ে কবিতা লিখ্‌বে না। তবু শিল্পী যে, তা নিয়ে সে এতটুকু ক্ষোভ কর্‌বে না, একবার সেকথা সে ভাব্‌বেও না।

এখন, এই মুহূর্ত্তটিতে সে কি কর্‌ছে কে জানে? হয়ত কাছাকাছি পূজো নেই তাই হাঁড়ি গড়্‌ছে, কিম্বা কল্‌কে। সে কাজেও হয়ত তার সমানই আগ্রহ, সমানই অধ্যবসায়।

মেসের সব ছেলেরা মিলে ভাসানের জোগাড় কর্‌ছে। হৈ হৈ হুল্লোড়। কাল এদের এত উৎসাহ ছিল কোথায়? অবিনাশ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, আচ্ছা, এরা সবাই ত বোটানী পড়ে না, কীট্‌স্‌ও ত কেউ কেউ পড়ে। একবারও কি এদের একটু কষ্ট হচ্ছে না? এমন অপূর্ব্ব সুন্দর একটা জিনিসকেও জলে ফে'লে দিয়ে আস্‌তে এত উৎসাহ? এ কি বর্ব্বরতা!

আজ যখন মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, পাগ্‌লামীর কোনও অবশেষ কোথাও কিছু আর নেই, তখন সে অনুভব কর্‌লে, এই দেবী-প্রতিমার মধ্যে সত্যকার দেবীত্ব যদি কিছু নাও থাক্‌ত, শুদ্ধমাত্র অপরূপ শিল্পসৃষ্টি হিসাবেই একে তার অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সে নিবেদন কর্‌তে পার্‌ত। ঐ দুটি পায়ে ললাটস্পর্শ করিয়ে তার নিজের তৃপ্তি হত। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠির স্পর্শেই হৃদয়ে উৎসবের জ্যোতিঃর উৎস খুলে যেত। আজ যে আসন্নবিচ্ছেদব্যথায় হৃদয় ভারাতুর, সে কেবল ইনি দেবী ব'লে নয়, ইনি বিশেষ ক'রে তারই দিকে বরাভয়-মণ্ডিত প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেছিলেন ব'লেও কেবল নয়, ইনি মনোহরণ রূপ নিয়ে তাকে দেখা দিয়েছিলেন সেই কারণটাই যেন সবচেয়ে বড়।

নরেশ আর বিলাস ভবানীপুর থেকে লরী সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে চ'লে গেল। অমর ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু সেও আজ উৎসাহ ক'রে এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বীণাপাণির বন্দনা ক'রে গান রচনা করেছে, সারা সকাল বক্স্ হার্‌মনিয়াম নিয়ে গানে সুর দিয়েছে। পাশের ঘরে কোরাসে তার রিহার্সাল চল্‌ছে। গোপালের হাতে মিছিলের আর সমস্ত আয়োজনের ভার। এক জায়গায় একটুক্‌রো লাল সালুতে তুলো বসিয়ে কলেজের নাম ও মেসের ঠিকানা লেখা হচ্ছে। বাঁশের কাঠামোর গায়ে রঙীন কাগজ, সালু আর রাংতা জড়িয়ে দেবীর চতুর্দ্দোলা তৈরি হচ্ছে। কেবলমাত্র কোরাসের কীর্ত্তনেই গোপালের মন খুসি নয়, বীণাযন্ত্র-হাতে পট্টবাসপরিহিত নির্ম্মাল্যবলয়-শোভিত কয়েকটি সুন্দর-কান্তি যুবককে সেই সঙ্গে সে একটু নাচিয়ে নিতেও চায়। তাই নিয়ে তর্ক। বল্‌লে, "থাক্‌ত সত্যিই সব ভার আমার হাতে, দেখিয়ে দিতাম প্রোসেশান কাকে বলে। তোমাদের কারু খোসামোদ কর্‌তাম, তোমরা ভেবেছ? এমন নাচের দল নামাতাম, পথে পেলা কুড়িয়ে বড়লোক হয়ে যেতে।"

অবিনাশ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, অনেক আলোর ত জোগাড় হল, কিন্তু কোন্

ক্ষ্যাপামির একটুকু ফাঁকে এই যে একটু আলো তার জীবনে দুদিনের জন্যে এসে পড়েছিল, তা এবার নিব্‌বে। মনকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ল, কি আর এমন! সম্বৎসর ঘুরে এলেই ত আবার পূজো। কিন্তু হায়রে, যে যাবে সে ত আর ফির্‌বে না! আত্মাকে অমর ব'লে মানুষ মৃত্যুর মধ্যেও ত এইরকম ক'রেই সান্ত্বনা খুঁজেছে। প্রিয়জনকে হারায়, ভাবে সে রইল, আবার দেখা হবে, কিন্তু যে-রূপের আলোয় তাকে জীবনে পেয়েছিল, যে-চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তাকে আত্মার আত্মীয় ব'লে জেনেছিল সেই রূপের আলোকে সেই দৃষ্টি দিয়ে তাকে যে আর দেখ্‌বে না, তাই জেনেই তার সেই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস বারম্বার ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। অবিনাশেরও ব্যর্থ হ'ল।

ভাব্‌লে, ওদের একবার ব'লে দেখ্‌লে হয় না? সরস্বতীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া না-দেওয়া পূজকের ইচ্ছাসাপেক্ষ; কি হয় যদি এই মূর্ত্তিটির বদলে আর-একটি সংগ্রহ ক'রে এনে তারা ডুবিয়ে দিয়ে আসে? কুমোরটুলীতে উদ্বৃত্ত প্রতিমা একটিও কি আর এখন পাওয়া যায় না? টাকাটা খুসি হয়েই তাহলে সে দেয়। কিন্তু মুখ ফুটে এমন কথা কাউকে কি বলা যায়? কি ক'রে ওদের কাছে নিজেকে সে পাগল প্রতিপন্ন কর্‌বে? এম্‌নিতেই তার লাঞ্ছনার শেষ নেই, এরপর তাহলে প্রাণধারণ করাই তার দুরূহ হয়ে উঠ্‌বে।

ভাব্‌লে, হায়রে! এ কেমন দেবতা, জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভ'রে যিনি থাক্‌বেন না। যাঁর আগমন সুদূর দেশের অতিথির মতো, ভালো ক'রে দৃষ্টি বিনিময় না হতেই যাঁকে বিদায় দেবার পালা। তারপর এক বৎসর ভুলেও যাঁর কথা আর কেউ ভাব্‌বে না। ঘটা ক'রে আলো জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে সর্ব্বশেষে জলে ডুবিয়ে সম্বৎসরের জন্যে যাঁকে পর ক'রে দিয়ে আস্‌তে হয়। মানুষের আরাধনা-বৃত্তিকে নিয়ে এ কি অমানুষের মতো নিষ্ঠুর ছেলে-খেলা?

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, এটা ভারতবর্ষ। এখানে দেব-আরাধনার ক্ষেত্রেও সংযমকে স্বীকার করা হয়েছে। অতিরিক্ত ভাবাবেগকে গৃহীর জীবনের অনেকখানি অধিকার ছেড়ে দিতে ভারতবর্ষের চিত্তশীলতা তাই লোকশিক্ষার জন্যে চিন্তাশাসনের জন্যে এই নিষ্ঠুরতার ব্যবস্থা। সে যে নারাজ, ভারতবর্ষের মানুষ এই ভেবে এরপর তার গর্ব্ব হ'ল। সেই গর্ব্বের আনন্দে আজকের চূড়ান্ত ক্ষতির বেদনাকে সে ভুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ল।

গোপাল অন্যদের সঙ্গে মিছিলের গন্তব্যপথ নিয়ে তর্ক সুরু করেছে। বৌবাজার হয়ে লালদীঘির দিক্ দিয়ে গঙ্গায় যেতে সে একেবারে নারাজ। ওদিকে কে আছে যে দেখ্‌বে? বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে বেরিয়ে চিৎপুর, তারপর

বাগবাজার, আরও ছুটো-একটা গলির সে নাম কর্‌ল, সেই ত সনাতন পন্থা। "যদি তোমাদের পছন্দ না হয়; বল, আমি তোমাদের এসব ভূতের কীর্ত্তনের মধ্যে নেই।" অনেক কথা-কাটাকাটির পর গোপালেরই জিত হ'ল। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না-হতেই সন্ধ্যা।

এসিটিলিনের আলোয় চোখে জ্বালা ধরিয়ে, একঘেয়ে কোরাসের গানে কানে তালা ধরিয়ে, নিশান উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে, রাজহংসের-সাজ-পরা মোটর-লরীর ওপর চতুর্দ্দোলায় দেবী-প্রতিমা বসিয়ে সবাই যখন চ'লে গেল, তখন অবিনাশের মনে হ'ল, যেন তার পরমাত্মীয় কারও মৃত্যু হয়েছে, সকলে আনন্দ ক'রে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। খুব বেশী সে শোক কর্‌ল না। অন্ধকার শূন্য ঘরটায় যেখানে দেবীর আসন পাতা হয়েছিল সেইখানটায় মেজের ধূলির ওপর, ছুই হাঁটু বাহুতে বেষ্টন ক'রে তার ওপর মুখ গুঁজে সে ব'সে রইল।

তারপর সমস্ত জীবন ভরা কি নিদারুণ শূন্যতা। একটি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির জন্যে মানুষের এমন হয়?

বই নিয়ে বসে, কিন্তু পড়াশোনার কোনো অর্থ থাকে না। বেশ ত ছিল আগের দিনগুলো, প্রোফেসার লাহিড়ীকে ভেবেই বইয়ের পাতায় রসের সন্ধান সে খুঁজে পেত। মাঝখানে ছুটি দিন হঠাৎ সমস্ত পড়াশোনার চূড়ান্ত অর্থটিকে স্বপ্নের মতো ক'রে পেয়ে তারপর চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলার এ কি নিদারুণ অভিশাপ তাকে লাগ্‌ল?

জীবনে আর-কোনো দেবতার সঙ্গে কোনোদিন কেউ তার পরিচয় ক'রে দেয়নি। আর-কোনো দেবতাতে তার মনও হয়ত উঠ্‌ত না। যখন তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি উন্মুখ তখন তার যথাসর্ব্বস্ব এ কোন্ দেবতার পায়ে উজাড় ক'রে সে নিঃস্ব হয়ে গেল, যাঁর এই ত্রিভুবনে কোথাও আজ আর অস্তিত্ব নেই, গঙ্গায় বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ তার কাছে চিরকালের জন্যে যাঁর অবসান হয়ে গিয়েছে।

ব'সে থেকে থেকে উন্মানা হয়ে যায়, কি যে মাথামুণ্ডু ভাবে! মনে পড়ে তার এক মামীমা ছিলেন, অনেকটা অমনি সুন্দর ছিল তাঁর পা-ছুটি। ঘোম্‌টা টেনে নতমুখে অতি ছোট ছোট ক'রে পা ফে'লে আস্তে হাঁট্‌তেন, মনে হ'ত মেঝের ধূলির স্পর্শে সে কোমলতা পীড়িত হচ্ছে। তিনি প্রথম সন্তান হতে গিয়েই মারা গেলেন। মামা এখন বিবাগী হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পৃথিবীতে বুড়ী দিদিমা ছাড়া তার আর এখন কেউ নেই, তাঁরও সঙ্গে ছুতিনচার বছরে একবার দেখা হয়।

অমর আসে, ব্রাহ্মসমাজের গল্প করে। বলে, "হিন্দু মেয়েরা তবু ত

ঘোম্‌টার ফাঁকে কৌতূহল নিয়েও একটু-আধটু তাকায়, যেমন ক'রে ভালুক-বাঁদরকে লোকে দেখে। এরা নাক উঁচিয়েই আছে রে ভাই, কারুর দিকে তাকায় না শুদ্ধু। আর পর্দ্দার কথা বল্‌ছ, চিকের আড়ালটাই না-হয় উঠে গিয়েছে, এরা মনে প্রাণে পর্দ্দানশীন। সাধ্যি কি যে কাছে ঘেঁস্‌বে ?"

গীতিছত্রের উৎসবের টিকিটের জন্যে ছেলেরা তার হাতে-পায়ে ধ'রে সাধ্য-সাধনা করে। সে বলে, "কোথায় পাব ? এদের যা আঁটা-আঁটি ! চেনা লোক না হলে টিকিট দেখালেও ঢুক্‌তে দেয় না।" তারপর এককোণে গম্ভীর হয়ে ব'সে লরেন্সের একটা কি বইয়ে মনোনিবেশ করে।

গোপাল বলে, "আরে রেখে দাও তোমার গীতিছত্র, ন্যাকা সুরে ল্যাগবেগে গান বেতালা গেয়ে দিয়ে ভারি ত একেবারে মাথা কিন্‌বে। শুন্‌তে চাও গান, এসো আমার সঙ্গে। টিকিট-ফিকিটের বালাই নেই, টাকাগুলো বাজ্‌লেই হ'ল।"

অবিনাশ কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে, যেন কলের পুতুল। সকাল বেলাটা আর ফিলজফি পড়ে না, পরিতোষের সঙ্গে গঙ্গায় ডুব দিতে যায়, ব্যাকুল চোখদুটো কোথায় কি রত্নের সন্ধান করে কে জানে ?……

একদিন কলেজে গিয়ে শুন্‌ল, প্রোফেসার লাহিড়ী সেদিনই শেষ তাদের ক্লাস পড়াবেন, পরশু তাঁর বিলেত যাবার দিন। অনেকদিন থেকেই যাওয়া ঠিক ছিল, ছেলেদের জানানো তিনি আবশ্যক মনে করেন নি। অভিমান ছাপিয়ে আসন্ন-বিচ্ছেদের বেদনাই তবু অবিনাশের বড় হয়ে উঠ্‌ল। ক্লাসে ব'সে আশা করতে লাগ্‌ল যাবার আগে সবাইকার কাছে তিনি বিদায় নিয়ে যাবেন, তখন অন্ততঃ তাঁর পায়ের ধূলো নেবার একটা উপলক্ষ্য হবে। কিন্তু সারাটা ঘণ্টা প্রোফেসার লাহিড়ী একবার ঘুণাক্ষরেও তাঁর বিলেত যাওয়ার কথার উল্লেখ করলেন না। যেমন চিরকাল করেন, প্রত্যেকটি শব্দ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে, তার বিবর্ত্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা ক'রে, কারুর মুখের দিকে না তাকিয়ে গড়গড় ক'রে তিনি পড়িয়ে গেলেন। তারপর ঘণ্টা শেষ হতেই দুম্ ক'রে বইটাকে মুড়ে "আজ এই পর্য্যন্ত" ব'লে প্রায় তিন লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। তাঁর সঙ্গেও যে এরপর পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ-জীবনে আর দেখা হবে এমন সম্ভাবনা রইল না।

এরপর যা ঘট্‌ল তা অতি অকস্মাৎ। বিগত কয়েকদিনের ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্কের যোগ কিছু আছে পাগলেও এমন কথা বল্‌বে না। কিন্তু কথাটা না বল্‌লে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

হঠাৎ একদিন রাত্রেও অবিনাশের পড়ায় মন বস্‌ল না। গোপালের সে রাত্রে বাড়ী ফির্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তার টেবিলে গাদা-করা

পুরণো ছবির কাগজ এক বোঝা নিয়ে অবিনাশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওল্টাতে লাগ্‌ল। হঠাৎ একটা বাংলা সিনেমার কাগজে পাতা-জোড়া একটি ছবি। সুন্দরী বীণাবাদিনী মূর্ত্তি। পরিপূর্ণ দেহ-সৌষ্ঠব, সুললিত উপবেশনভঙ্গী। অবিনাশের মনে হ'ল, তার অলস পা-দুটিতে পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য্য যেন মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। নীচের নামটা ইচ্ছে ক'রেই সে পড়্‌ল না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বারান্দার দিক্‌কার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।

তারপর ক'দিন সুবিধা পেলেই লুকিয়ে সেই বইটিকে সে বার করে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে ছবিটিকে অপলক দৃষ্টিতে দে'খে দে'খে তার সাধ মেটে না। যাঁকে হারিয়েছে তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন এর একটু আদল আসে, কিম্বা হয়ত আসে না, এম্‌নিতেই ছবিটি তার মনোহরণ করে।

একদিন অসতর্কে গোপাল তাকে ধ'রে ফেল্‌ল। বল্‌লে, "তাই ত বলি—" কিন্তু অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যে সে বলে সেটা আর তার বলা হয়ে উঠ্‌ল না। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "আলাপ কর্‌বে? ভারি মিশুক লোক।"

অবিনাশের কানের কাছে রক্তস্রোত দামামা পিটতে লাগ্‌ল। গলাটা কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে। বাইরে দৈন্যপীড়িত, শোভাহীন, সম্পদহীন, নীরস, নিরানন্দ পৃথিবী। তার অন্তরের সিংহাসনে অন্ধকার শূন্যতা। সম্মুখে আশাহীন, উদ্দীপনাহীন, দেবতাহীন ভবিষ্যৎ। একটা ঢোঁক গিলে কি যে সে বল্‌লে নিজেই সে তা বুঝ্‌ল না। কিন্তু গোপাল বুঝ্‌ল। অবিনাশের পকেটের ভিতরটাকে বাইরে থেকে দু-আঙুলে টিপে টিপে অনুভব ক'রে তার হাত ধ'রে আচম্‌কা একটা টান মেরে বল্‌লে, "এসো, ভেসে পড়া যাক্‌।"

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

কবিতাগুচ্ছ

শূন্য-ঘর

গোধূলি অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।
ডাকিনু, "আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো সাড়া দেহো।"
ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা॥

বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সঙ্কেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায় মালী।
সিঁড়িটা নির্ব্বিকার
বলে, "এসো আর নাই এসো যদি
সমান অর্থ তার॥"

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়
"ডুব দিয়ে দেখো সত্তা-সাগরতলায়
বুঝিতে পারিবে থাকা নাই থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া।"
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নাই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া॥

মেয়াদ যখন ফুরায় কপালে
হায়রে তখন, সেবা
কারেই বা করে কেবা॥

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।

ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
　　　　বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
　　　　চপলম্ অতিশয়
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব—আরে, অতএবখানা থাক্,
　　　　আপাতত ফেরা যাক্ ॥

ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে
　　　　ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
　　　　দূরতর হোলো মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
　　　　আকাশ-ভরানো ধূলি
　　　　　　সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
　　　　ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হোলো যত মাইক্রোব্‌দল
　　　　নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম সহজ তো নয়
　　　　ফিলজফারের বুদ্ধি,
দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।
　　　　মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হেসে উঠি হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সাম্‌নে
　　　　হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাৎ এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।
　　　　বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
　　　　ফিরিনু আপন দ্বারে ॥

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে তাই
　　　　না থাকার ফিলজাফি
　　　　মনটাকে ধরে চাপি।

থাকাটা আকস্মিক,
না থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধ্যেবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ঐ বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরাম কেদারা
পূরোপুরি নিঃশেষ।
মাস-মাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
ভুই ভুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম কার্নেশনের
কেয়ারি সমেত তা'রা
নাই-গহ্বরে হারা॥

চেয়ে দেখি দূর-পানে,—
সেই ভাবীকালে যা রয়েছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্য তাহা অতি,—
হেথায় সেথায় বুদ্বুদ-সংহতি।
যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।
অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই, নাই, হায়, নাই সে কোথাও আর॥

দূর করো ছাই, এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো,
ফিলজফারের কুয়াশা কোথা মিলালো।
স্পষ্ট বুঝিনু, যা-কিছু সমুখে আছে
চক্ষের পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেইতো অন্তহীন,
প্রতিপল, প্রতিদিন।

যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।
বাঁধিয়া রেখেছে এ মুহূর্ত্তের জাল
সমস্ত ভাবীকাল॥

অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লবো টানি
বসিব আরামে সে মুহূর্ত্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো, সন্ন্যাসী হবো না কো।
আরবার যদি ডাকো
আবার সে ঐ মাইক্রোব্-ওড়া পথে
চলিব মোটর রথে।
ঘরে যদি কেহ রয়
নাই বলে তারে ফিলজফারের
হবে না কো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে ক'বে "এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোজন-বীর

অসঙ্কোচে করিবে কষে ভোজন রস ভোগ,
সাবধানতা সেই তো মহা রোগ।
যকৃত যদি বিকৃত হয়,
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা,
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীরসর।

দেহের তামসিকতা ছি ছি মাংস হাড় পেশি
তাহারি পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা তাহারে করি ঘৃণা
মরণ-ভীরু এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে,
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক্ না ঝঙ্কৃত
পেটের নাড়ি ব্যথায় টঙ্কৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে,—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলঙ্কৃত।

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে
কবিরাজিও নারাজ হবে
তখন অবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরি পথে ঢুকে
অম্লশূল-সাধন কৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত
ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে।

খাওয়া বাঁচিয়ে বাঙালীদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এদেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক॥

লঙ্কা আনো শর্ষে আনো, শস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো,—তাহার পরে মৃত॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌড়ীরীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি
লোকে তার পরে মহা রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি'।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে
"দাতা বটে ষোলো আনা।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে
খুঁজিয়া না পাবে চাবি,
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবী।

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
দ্বারীর প্রসাদে খোলে,
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে।

সাম্‌নে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
ধন্য ধন্য গৌড় ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন-দূত

হে স্বপ্নের নীরব দেবতা !
চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন নেপথ্যের অভিনয় করো প্রযোজন।
আঁধার-রহস্য-'পরে তুমি ফেলো আলোকের শিখা,
নিরুদ্ধ বাসনা সব মায়া-স্পর্শে করো উন্মোচন ;
যখন মনের কথা বলিতে হৃদয়ে লাগে ব্যথা,
তীব্র আত্ম-নিপীড়নে যন্ত্রনায় কাটে জাগরণ—
তুমি আন মুক্তির বারতা।

আজি মোর তোমার সকাশে
একটি প্রার্থনা আছে। রজনীর অন্তিম প্রহরে,
অনেক চেষ্টায় যবে তন্দ্রায় জড়াবে আঁখি তা'র—
মোর মূর্ত্তি ধরে' তুমি যাবে তার শয়ন-শিয়রে,
দেখিবে সন্ধান করে তার অন্তরের অন্ধকার।
—রাত্রি ভোর হ'য়ে আসে ; চুলগুলি চঞ্চল বাতাসে
এলোমেলো হ'য়ে যায়, নড়ে' ওঠে ঠোটের কিনার।
তুমি গিয়ে দাঁড়াইয়ো পাশে।

যেয়ো তুমি নিঃশব্দ-সঞ্চারে—
যেয়ো তুমি অলক্ষিতে, যেন স্বপ্ন নাহি মনে হয়
তার কাছে ; বুঝিতে না পারে যেন তব ছদ্মবেশ।
সহসা আমারে দেখে তার পাশে—মধুর বিস্ময়,
নিমীলিত চক্ষু-পক্ষ্মে আনন্দের উজ্জ্বল উন্মেষ,
সূক্ষ্ম পলকের আড়ে রক্ত-আভা লজ্জার প্রচারে—
সব তুমি লক্ষ করো, ভাব-গাঢ় প্রতিটি নিমেষ ঃ
সব এসে বলিবে আমারে।

তুমি তা'কে দেখে মুগ্ধ হ'বে ঃ
—এলোমেলো কালো চুল ছড়ায়েছে সমস্ত বালিশে,
অযত্নে মুছিয়া গেছে সীমন্তের বিষণ্ণ সিন্দূর,
আরক্তিম কর-তলে কপোলের আভা গেছে মিশে' ;
সিন্ধুর তরঙ্গ-সম উচ্ছ্বসিত উচ্চ স্তনচূড় ঃ
প্রতি তপ্ত অবয়বে সৌন্দর্য্যের স্বাধীন গৌরবে
প্রাণের আনন্দ-লীন ;—যে আনন্দ প্রকৃতি-বধূর
বসন্তের নির্লজ্জ উৎসবে।

পাশে তা'র প্রশান্ত, মধুর
ঘুমন্ত শিশুর মুখে তা'রি মুখ দেখিবে আবার ;
তবু ঠিক তা'র নয়, সৃষ্টি তা'রে করেছে দু'জন।
দ্বিতীয় যে—তা'রো ছায়া স্বপ্ন-পথে এসেছে কি তা'র
শয্যা-পাশে ? কী হবে তোমার সঙ্গে তা'র সম্ভাষণ ?
পরাজিত ভয়াতুর ম্লান চক্ষে কম্পন অশ্রুর,
বাহিরের তমিস্রায় মিশে যাবে তুমি কি তখন ?
পূর্ব্বাস্বাদ লভিবে মৃত্যুর ?

হে দেবতা, বিরহী-বান্ধব !
কোনো ভয় রাখিয়ো না, বহু শিশু অপ্রেমের ফল ;
অপ্রেম-দুর্ব্বল, দীন ; কিছু তা'র নাহি অধিকার।
প্রেমের সহায়ে তব রজনীর স্বপ্নের ফসল ;
মোর প্রতিমূর্ত্তি হয়ে মোর প্রেমে ক্ষমতা তোমার ঃ
হবে নাকো পরাভব ; আছে প্রেম তোমার গৌরব।
যাও তুমি—সুপ্ত তা'র চেতনায় করো আবিষ্কার
গূঢ় গুপ্ত মনের উদ্ভব।

এই কথা বলিবে তাহাকে ঃ
'সব আশা গেছে, প্রিয়া, তবু আছে দুর্ব্বার দুরাশা ;
যা হয়েছে, হয়ে গেছে ঃ এখনো রয়েছে ভবিষ্যৎ ।
মোর সাথে চলে' এসো, একবার খেলে দেখি পাশা
বজ্র অদৃষ্টের সনে । কূটগতি পৃথিবীর পথ—
অনিশ্চিত প্রতি বাঁকে সুখ-দুঃখ-যাহা-কিছু থাকে,
সব অতিক্রমি', যাবে মোদের প্রেমের জয়-রথ
পলাতক দিগন্তের ডাকে ।

'প্রেতসম অতীতের ভার—
তা'র বিষশ্বাসে কেন, হে মধুর, তুমি হ'বে মৃত ?
ফেলে দাও, ছেড়ে দাও, চেয়ে ছাখো বিস্তীর্ণ সম্মুখে ;
জীবনের তীব্র দীপ্তি-পাতে হোক্ অতীত বিস্মৃত ।
একবার ভয়ে মোরা নিয়েছিনু মেনে যে মৃত্যুকে
ভেঙে ফেলে' তার দ্বার; হত্যা করে' হিংস্র অন্ধকার
মোরা দোঁহে মুক্ত হবো দুঃসাহসে আনন্দের বুকে ।
আমরা বাঁচিবো এইবার ।'

নিয়ে এসো তাহার উত্তর
মোর কাছে—যেখানে নিদ্রার ঘোরে আমার শরীর
পড়ে আছে মৃত-সম ; (তুমি এলে তার কাছ থেকে
মোর প্রতিমূর্ত্তি হয়ে ; মোর প্রাণ প্রণয়-অস্থির
তুমি নিয়ে গেলে ।) এখন সে ছদ্মবেশ ফেলে রেখে,
এসো অশরীরী স্বর মোর মর্ম্মে অশান্ত মর্ম্মর—
সব তুমি বলো মোরে,—যা শুনেছো, যা এসেছো দেখে,
তা'রি 'পরে জীবন নির্ভর ।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

দুটো কাজল আঁখি

তোমার দু'টো কাজল আঁখি, হাল্‌কা ঠোঁট,
মিঠে একটু পল্‌কা হাসি, একটু রোষ,
আধেক ফোটা কোরক দু'টি স্তনের চূড়,
ঠোঁটের পাশে তিলটি কালো, আমার দোষ ?
বুকের বসন একটু নড়ে, তাকাই কেন !
চোখে দুষ্টু হাসি, মুখে লালের ছোপ।
শ্রোণীর চলন নাচের ছাঁদে, মিষ্টি ভারী,
কান্না তোমার শিশিরঝরা কেয়ার ঝোপ।
পূর্ণ তুমি গহীন গাঙ, চপল নদী,
আমার আঁখি ডুবলো সেথা মরণ মাগি।
একটু ছোঁয়া, একটু হাসি, মিথ্যে কথা,
পাগল হল বনের তৃণ, নেইতো বাকি।
জঘন তোমার ছলন জানে, বিশ্বজেতা
গালের টোল, ঠোঁটের তিল, আঁখির বাণে
হাফেজ পাগল ! সারেঙ্‌ কাঁদে ! লাল পিয়ালা !
মদন কত ভস্ম হল, কেইবা জানে !
মৃণালবাহু, কোমল কটি, দেখতে যেন
চাঁদের আলোয় শীর্ণ নদী, রুপোর ফিতে
যূথীর গন্ধ, শুক্রতারা, ফুলের হাসি
সবাই তুচ্ছ তোমার কাছে ছন্দে গীতে।
পরশ বুকের, বাহুর বাঁধন, একটু ছল,
একটু মিছে, একটু হাসি, চোখের জল,
নয়তো শুধু, কাতর আঁখি ব্যাকুল তাজের
গড়ল ধূলায় অবাক-করা ঐ মহল্‌।
'মিলোর ভিনাস' নয়তো বেশি, ননীর তনু,
মোমের শিখা বড্ড ভীরু, তাহার চেয়ে,
তিলটি কালো—আমার মুখের চুমোর লালী
একটা আবার ? চোখের পাতায় ? দুষ্টু মেয়ে !

শ্রীসান্ত্বনা গুহ

সন্ধ্যা

বামদিকে গিরিশৃঙ্গ আকাশেরে করিছে আহত
শ্যামাঙ্গী দিতিরে যেন মুষ্টি তোলে ক্ষিপ্ত দৈত্যশিশু।
দুরন্ত পর্ব্বতচূড়া চোখেরে সে এড়াইতে চাহে,
মানুষের তৃণভূমি ত্যজি'—মোর হৃদয়ের মতো।

অন্যদিকে চলিয়াছে অন্তহীন ঘন অরণ্যানী,
মানুষেরও দেখি নাই অন্তহীন এত ঘন ভিড়,
মানুষের ভিড়ও কভু নয় এত অজ্ঞাত নিবিড়।
কোন্ লোকে আসিয়াছি, জানি নাকো বনানীর বাণী!

পশ্চাতে পড়িয়া আছে পাথরের একখানি হাড়
দেহে মোর রিণিঝিনি রক্তধারা স্পর্শ তার পায়।
পাথরের কী যে ভাষা! রক্ত মোর হিম হ'য়ে যায়
অজ্ঞাত ধমনী কার স্পর্শে মোরে করিছে নিঃসাড়!

রক্তের ফোয়ারা সূর্য্য অকস্মাৎ পর্ব্বতের মাঝে
ডুবে' গেল দ্রুতগতি নদীগর্ভে কুমীরের মতো।
গোধূলির ছায়া নামে আর ওঠে কারা শতশত
প্রান্তরে, বনানী আর কৃষ্ণ ক্রূর পর্ব্বতের মাঝে।

সমুৎকর্ণ অরণ্যানী, ঊর্দ্ধগ্রীব পর্ব্বতের মালা—
বিধাতার মনে আসে বাসনার বিবর্ণ আবেশ,
জলস্থলে কম্পমান সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ,
দেহ মোর হিমস্থির, চক্ষে মোর কী বিস্ময়-জ্বালা!

মনে হয় মৃত আমি, দেহ মোর মোর নহে আর।
ম্যামথেরা আসে বুঝি? প্রেম জাগে ধরিত্রীর বুকে?
একজন ছোটে আগে—মদমত্ত ম্যামথ-পুরুষ?
দেহ হিম, মন কাঁপে পরিচয়ে আদিম সন্ধ্যার!

শ্রীবিষ্ণু দে

মেঘার্ত্ত অমাবস্যা

আকাশের দুর্গ হতে পলাতকা অমাবস্যা আজ।
সমুদ্রের স্নায়ু আজ অবসন্ন—মরেছে জোয়ার
তন্দ্রাহত পরাজিত পলাতক ঢেউয়ের সোয়ার।
আজ আর প্রেম নয়। নিদ্রাহীন অন্ধকার আজ।

চিত্তের সমুদ্র আজ শান্ত স্থির বিম্ববতী দীঘি।
নক্ষত্রদেয়ালি নেই, গোধূলির দেহহীন আলো।
এ আলোতে আমি আছি, আর আছে বিশ্ব মোর পাশে,
সে বিশ্ব আমারই মূর্ত্তি—দীর্ঘছায়া সে মোর মনের।

সে ছায়ায় প্রেম নেই, সে ছায়ায় জাগে ক্লান্ত মন,
নিশাচর মন মোর জাগে আজ উগ্র অন্ধকারে।
তোমার ও চোখ আজ ভুলে' যাক্ তাদের ভাষারে।
স্পন্দিত হৃদয়ে মোর বিধাতার-গর্ভ-অন্ধকার।

শ্রীবিষ্ণু দে

ক্ষণিকা

সুধু দেখা হলো, বেশি কিছু নয়
দেখা হলো পথে যেতে,
বারেকের তরে মুখ পানে চাওয়া
নয়নে নয়ন পেতে।
ফুটিলোনা মুখ নাহি হলো কথা
শুধালোনা কেহ কুশল বারতা ;
কোথা কার ঘর দুঁহু দোঁহা পর
কেহ নাহি জানে কারে,—
চেনা-জনে যবে পায় অবহেলা
কেবা চেনে অচেনারে!

দুই জনা চলে দুই পথে হায়
যত যায় তত যায়,
খনে খনে বাড়ে দূর-ব্যবধান,
ব্যবধান পায়-পায়।
মন যেন তবু মানেনা বারণ
পিছু পানে ছোটে কেন অকারণ,
যা'রে দেখা হলো তারে যেন আরো
দেখিতে রহিলো বাকি,—
বুকের খাঁচায় পাখা সাপটায়
সে-কোন বনের পাখী!

সুধু দেখা হলো? বেশি কিছু নয়?
পথে-দেখা সে কি খালি?
দু' আঁখির ভুল বিজলি-চটুল
আলেয়ার আলো জ্বালি?
যে-কথা হলোনা মুখের ভাষায়
রঙিলোনা সে কি মহা দুরাশায়—
বেদনার রূপে অতি চুপে চুপ
পথিক সুজন সে কি
জীবনের পাতে দু'একটি কথা
সহসা গেলোনা লেখি'?

শামসুল হুদা

তিলোত্তমা

দেবতার ধ্যান-মূর্তি নিখিলের সঞ্চিত সুষমা
তুমি, তিলোত্তমা,—
অপমান-কণ্টকিত মৃণালের বুকে
ছলনার রক্তপদ্ম একদিন ফুটিলে কৌতুকে!
তোমার বিলাস-বহ্নি অসুন্দরে ভস্মশেষ করি
সুন্দরের পরাজয়-কলঙ্ক-কালিমা যত আঁখির পলকে নিল হরি!

তারপর কেন তুমি স্বপ্নময়ি, মিলালে না স্বপ্নের মাঝারে ?
কেন তুমি ডুবিলে না মিথ্যার অতল পারাবারে ?
ওগো আকস্মিকা,
কেন জ্বালি কামনার চিরন্তনী শিখা
রচিলে আপন হাতে আপনার, দেবতার চিতা ?—
স্বর্গ-স্বয়ম্বরা হ'লে, হে স্বর্গের মানসী দুহিতা !

অমর্ত্ত্যের বক্ষে যবে মণির মঞ্জীর তব বাজে,
মর্ত্ত্যের মলিন মাথা অবনত হ'য়ে যায় লাজে !

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

অনুবাদ

লহ এই ফুল রেখেছিনু যারে মর্ম্মমাঝে,
এ কুসুমটিও লহ যেটি মোর অলকে রাজে,
পরে যেয়ো চলি ; হের আজিকার স্বচ্ছরাতে
তোমার পথের চলার পুলকে তারারা মাতে।

—অজ্ঞাত ইংরেজ কবি হইতে

* * * * *

ভাল যদি বাসিতাম যবে ভালো বেসেছিলে মোরে,
পড়িতাম বাঁধা তবে তুমি আমি দোঁহে পরস্পর
সে আনন্দে, মৃত্যু যার তীব্রতার চরম শিখর।
নিঃসঙ্গ মুক্তির স্বাদ আজ মোরা জানি ভালো কোরে।
তোমারেই ভালো বেসে, আজ যবে তুমি আছ দূরে,
কী আনন্দ পাই আমি ; চিত্ত মোর উঠে ভরি' ভরি',
যেন কোন দূর তারার কিরণে ; সারা নিশি ধরি'
তুমি থাকো সংরক্ষিত অন্তরের গুপ্ত অন্তঃপুরে।

—এড্ওয়ার্ড অ্যাশক্রফ্ট হইতে

* * * * *

জানি তুমি করিবেনা শোক
আমি যবে হইব বিগত,
তোমার কবরী হ'তে খসা
অযতন কুসুমের মত।

তবু কোন ঝড়-ওঠা দিনে,
কোন এক দীপ-জ্বালা সাঁঝে,
ফুটি-ফুটি ফুলটির প্রায়
চঞ্চলিব তব মর্ম্ম মাঝে।

ম্লান হেসে মোরে মনে হবে,
হাত হতে বই যাবে প'ড়ে,
দীপ-পানে রহিবে ঝুঁকিয়া,
চেয়ে রবে কোন্ দিগন্তরে।

—সাহেদ সুরাওয়ার্দ্দি হইতে

*　　*　　*　　*　　*

তুমি ছিলে শুকতারা মরলোক মাঝে,
তার পরে নিবে গেলো জ্যোতি;
এখন মরণ-পারে সন্ধ্যাতারা সাজে
বিতরিছ নবতর দ্যুতি।

—প্লেটো হইতে

*　　*　　*　　*　　*

বলিয়ো স্পার্টায়, এই স্মৃতিফলকের পথ দিয়ে চলো যে পথিক,
মোরা প্রাণ দিছি তারি লাগি', কামনার কিছু নাই ইহার অধিক।

—সাইমনাইডিস্ হইতে

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক-পরিচয়

কবি-পরিচিতি। কান্ত পাবলিশিং হাউস, ১ডি রসা রোড, ভবানীপুর। দুই টাকা।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলাভাষায় পুস্তক অত্যন্ত কম। এই দুইটি পুস্তক এই অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিবে। দুইটি পুস্তকই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনাবলীর সংগ্রহ এবং কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত। 'কবি-পরিচিতি'র প্রবন্ধগুলি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত হইয়াছিল এবং এই পরিষদের সম্পাদনায় পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে। 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' যে সকল প্রবন্ধ ও কবিতা স্থান পাইয়াছে বঙ্গবাণীর প্রশস্ত অঙ্গনে তাহা চয়ন করা হইয়াছে। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা, কিন্তু আরব্ধ কার্য্যের ভার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তাঁহারা বিশ্বভারতীর উপর সমর্পণ করেন এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া এই অর্ঘ্য-সম্ভার কবির চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন।

'কবি-পরিচিতি'র সর্ব্বপ্রথমে রীতিমত বই আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একটি অত্যন্ত সুন্দর কবিতায় কবি তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন :—

> হে মানব, তোমার মন্দিরে
> দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
> আরতির সান্ধ্যক্ষণে,—একের চরণে রাখিলাম
> বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম॥

বই আরম্ভ হইয়াছে রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণের অনুলিপি লইয়া। তাহার পর "সাহিত্য-বিচার" শীর্ষক কবির একটি প্রবন্ধ। তিনি বলিতেছেন : "সাহিত্যের বিচার হচ্চে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হ'তে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নাই।" তাঁহার অভিভাষণে কবি বলিয়াছেন : "আমার কাব্য ঠিক কি কথাটি বলেচে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে—যাঁরা শুনতে পেয়েচেন তাঁদের কাছে।" রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার ও ব্যাখ্যাই পুস্তকটির উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পুস্তকে কবিতায় ও প্রবন্ধে কবি কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা না করিয়া শ্রোতৃবর্গ কি বলেন তাহা শোনা যাক্।

কবির যে-সকল শ্রোতার রচনা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নাম সাহিত্যিক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রবন্ধের নাম "চিত্রাঙ্গদা"। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয় "চিত্রাঙ্গদা" নয়, "চিত্রাঙ্গদা" সম্বন্ধে Thompson সাহেবের মতামত। লেখক নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। Thompson সাহেব নাকি বলিয়াছেন, "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের প্রথম অংশ অশ্লীলতার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। তিনি আরো বলিয়াছেন :—The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude।

এই attitude সম্বন্ধে Thompson-এর উক্তি যে নিতান্তই বেরসিকের উক্তি তাহা বোঝাইবার জন্য চৌধুরী মহাশয় যে আলোচনা-জাল বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে Plato, Aristotle, কালিদাস, বামনাচার্য্য, Croce, Rollo, ভারতচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বহু প্রাচীন ও আধুনিক কবি, দার্শনিক, আলঙ্কারিক ও অধ্যাপক ধরা পড়িয়াছেন এবং ইঁহাদের অনেকে আসামী Thompson-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল সাক্ষীদের জবানবন্দীর মাঝে মাঝে প্রমথবাবু নিজের মন্তব্য প্রক্ষেপ করিয়াছেন এবং ঐ সকল মন্তব্যের মশলা হিসাবে "চিত্রাঙ্গদা" হইতে বাছিয়া বাছিয়া অংশ উদ্ধার করিয়াছেন। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে Thompson তো কাবু হইয়াছেনই, উপরন্তু এমন একটি প্রবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা রসিক পাঠকমাত্রই উপভোগ করিবেন। এই রচনায় বৈদগ্ধ্যের ও পাণ্ডিত্যের যে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাংলা ভাষায় বোধ হয় এক প্রমথবাবুই করিতে পারেন। কিন্তু তবু রচনাটি পড়িয়া মন তৃপ্ত হয় না। সমগ্র প্রবন্ধটি যেন একটি বৃহৎ গৌরচন্দ্রিকা, আসল কথাটি বাদে সবই যেন তাহাতে বলা হইয়াছে। তাই মনে হয়, লেখক তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার অপব্যয় করিয়াছেন, সাহিত্য-সমালোচনার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু যে-আলোচনা করিয়াছেন তাহার উপলক্ষ্যমাত্র সাহিত্য; লক্ষ্য কি তাহা বলা কঠিন।

রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়-লিখিত "বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে উচ্চাঙ্গের গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয় অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ বা ব্যবহারিত্ববাদ, যথাভূতবাদ এবং পরিকল্পনা-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাদ্বারা প্রবন্ধটির গোড়াপত্তন করিয়াছেন। অপণ্ডিত নিরীহ পাঠকগণ পাছে এই সকল বিবিধ "বাদ"-এর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করেন সেই জন্য অধ্যাপক মহাশয় মামুলি ভাষায় তাহাদের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন—তাই বুঝিতে কষ্ট হয় না এই আলোচনার বিষয় pragmatism, realism ও idealism। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ভারতীয় বর্ষাকবিতার মধ্যে কাব্যে realism হইতে idealism-এ উঠিবার যে-ক্রমপদ্ধতি প্রকট হইয়াছে তাহাই দেখানো। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রচণ্ড গোড়াপত্তন।

তাহার পর দৃষ্টান্ত। লেখক একেবারে বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের বিরহ এবং সুগ্রীব ও সুগ্রীবাণীর মিলন বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বর্ষার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে pragmatic attitude নাকি অত্যন্ত ক্ষীণ, যদিও pragmatic atmosphere-এর অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্মীকি শুধু আদি কবি নয়, আদিম কবি; তাই বোধ হয় এই চমৎকার অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদের আব্‌হাওয়া তাঁহার কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন না।

অধ্যাপক মহাশয় তাহার পর আরো দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং তাহা আহরণের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মতে বর্ষাকাব্যে idealism-এর চরম পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতায়। "ঝমঝমে একঘেয়ে বৃষ্টির ধারা" রবীন্দ্রনাথের মনের একতারায় ঘা দেয় এবং তাহা সর্ব্বদা বাজিয়া উঠে। কেমন করিয়া বাজে? অবশ্য "পিড়িং পিড়িং করিয়া", কেননা ধ্বনি-রসিক অধ্যাপক মহাশয় onomatopoetic ভাষায় তাহাই লিখিয়াছেন।

যাহা হউক, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি কবিতা হিসাবে খুবই উপভোগ্য। সেগুলির তিনি যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা স্থানে স্থানে স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় কাব্য-রসিক তাহাতে সন্দেহ নাই—শুধু দুঃখ হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূতের বোঝা তিনি নামাইতে পারেন নাই। চৌধুরী মহাশয়ের মতো পাণ্ডিত্যের সহিত বৈদগ্ধ্যের সহজ সম্মিলন তিনি করিতে পারেন নাই, তাই প্রবন্ধটির পূর্ব্ব-অংশ সাহিত্য হিসাবে অপাঠ্য, এবং উত্তর-অংশ উপভোগ্য হইয়াছে অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তব্যের আকর্ষণে নয়—উদ্ধৃতাংশসমূহ ও তাহাদের অনুবাদের জন্য।

সাহিত্য-বিচার হিসাবে 'কবি-পরিচিতি' পুস্তকটির শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প"। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মূল বিষয়গুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা, (১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানব-মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ—এবং এই চারিটি পর্য্যায়ের প্রত্যেকটির অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জাতীয় বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সহজেই নীরস হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীকুমারবাবুর রসগ্রাহিতার ও বর্ণনাভঙ্গীর গুণে তাঁহার প্রবন্ধে তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে লেখক যে আশ্চর্য্য রসের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার আস্বাদনের আনন্দ তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন; ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীকুমারবাবুর বিশ্লেষণমূলক আলোচনার ঠিক বিপরীত রীতি দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রের "ছিন্নপত্র" প্রবন্ধে। এই পত্রগুলির মূল সুর কি তাহা সোমনাথবাবু সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "উন্মুক্ত আকাশের আলো থেকে, নদীজলকল্লোল থেকে, দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল ধরণী থেকে কবির পুলকিত চিত্ত যে অমৃত গ্রহণ করেচে, এ চিঠিতে আমরা তারই আস্বাদ পাই। সহজবোধ দিয়ে তিনি সুন্দরকে উপলব্ধি করেচেন, মনের দ্বার খুলে রেখে তিনি আলোকে গগনে তরুলতায় সেই সুন্দরের বাণী শুনেচেন, হাটের হট্টগোলে এই বোধশক্তি যখনই ক্ষীণ হয়েচে, নদীতীরে ঊষার আলোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, তারাখচিত আকাশের তলে তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেচেন।"

প্রকৃতির সহিত কবির এই নিবিড় পরিচয়ের কথাই শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিচয় কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে নীহাররঞ্জন কবির বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কবিতা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। নীহাররঞ্জন যাহা বলিতে চান তাহার মর্ম্ম এই—"বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব রহস্যময় অনুভূতিই" কবির কাব্যের ও জীবনের প্রধান প্রেরণা। এই বিশ্বজীবন ও বিশ্বদেবতা এক নহে। অনেক সময়—বিশেষত 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যের' যুগে—বিশ্বজীবনের অনুভূতি বিশ্বদেবতার অনুভূতির মধ্যে হয়তো বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু এই অনুভূতিকে ঠিক এক বলা চলে না।—এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' কি তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার আতিশয্য সত্ত্বেও তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। তবে দুটি কবিতার তিনি যে অর্থ

করিয়াছেন তাহাতে আপত্তি হইতে পারে। একটি কবিতা 'মানসী'র "ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে"; আর একটি 'পূরবী'র "বলেছিনু ভুলিবনা"। এই দুইটি কবিতার প্রেরণা কি বিশ্বজীবনের অনুভূতি? যে জীবন-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন লিখিয়াছিলেন ঃ

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাকো নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মম, পরাণ-বল্লভ!
তোমার কোমল-কান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয জীবন তরীতে
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

এই কবিতা দুইটি যে তাঁহারই উদ্দেশে রচিত তাহা ভাবিতে নিতান্তই কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয়।

এই বইতে আরো দুইটি প্রবন্ধ আছে—শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর "ঘরে-বাইরে" ও শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের "বলাকাব যুগ"। প্রথম প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বিতীয়টিতে লেখক বলিতেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ এই কালটিতে (অর্থাৎ 'বলাকা' লিখিবার সময়) এ সরল দৃষ্টিটি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর গানে সহজ সুরটি খোয়া গেছে। এই জন্যই তাঁর কাব্য রচনায় গানের চাইতে গমক বেশী, সুরের চাইতে কথা এত অধিক।" ইহার সরল অর্থ অবশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ আর তেমন ভালো কবিতা লিখিতে পারেন না। কিন্তু গিরিজাবাবু সাবধানী লোক, সরল অর্থে কথা বলেন না, তাই লিখিতেছেন ঃ—"একে শক্তির decadence বা decline বল্‌লে অন্যায় করা হবে।" তথাপি "একথা আমাদের মান্‌তেই হবে যে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক মতবাদের অনেক নীচে এখানে চাপা পড়েছেন।" এইরূপ সমগ্র প্রবন্ধটিতে লেখক এক অর্থে কথা বলিতেছেন, বলিয়াই ভাবিতেছেন, বোধ হয় কবির নিন্দা করা হইল, তৎক্ষণাৎ আর এক অর্থে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দোষক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন।

'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকটির সম্যক্ পরিচয় দেওয়া কঠিন—তাহার কারণ পুস্তকটির কোন ঐক্য নাই। অবশ্য বহু বিশিষ্ট লেখকের রচনা পুস্তকটিতে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু এই রচনাগুলি অধিকাংশস্থলেই বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। কিন্তু শুধু সাহিত্য-সমালোচনার মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার করিলে চলিবে না। যে-অনুষ্ঠানের সম্পর্কে এই পুস্তকটির সূচনা তাহা বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; এই অনুষ্ঠানের স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তকটিও বাংলাসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবার দাবি রাখে।

কিন্তু এই কথা বলিয়া 'জয়ন্তী-উৎসর্গ'কে উপেক্ষা করিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে, কেননা ইহাতে এমন কয়েকটি রচনা আছে যাহার সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই রচনাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য"। আধুনিক বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে কোন কথা বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে বাদ দেওয়া চলেনা—কেননা আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন তাঁহারা। মোহিতলাল তাই তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথমেই এই দুই মনীষীর কথা আলোচনা

করিয়া বাংলাসাহিত্যে এবং বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি তাহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোহিতলালের মতে "আর কোনো সাহিত্যে কোনো একজনের সৃষ্টি-শক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তাহাও লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার গভীরতম অনুভূতিদ্বারা যে-সত্যের স্পর্শ লাভ করা যায় কবি বহিঃ-প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় তাহারই আভাস পাইয়াছেন। তাই মোহিতলাল লিখিয়াছেনঃ "রবীন্দ্রনাথ এই অন্তর-গহনের দীপশিখাকেই বস্তু-পরিচয়ের মানস রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন।" কিন্তু লেখক দুঃখ করিতেছেন যে "আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে-পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত হই নাই।" তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের "কাব্যকলার মূল প্রেরণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কল্পনাকে স্ব-তন্ত্র মুক্তির সন্ধান দেয় নাই" এবং "রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি নাই।"

মোহিতলাল একটি কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন—তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান "ভাবের রূপ-সৃষ্টি, কোনও প্রকার mysticism নয়। তাঁহার কবিচিত্ত ভাব ও বস্তুর যখন যেটাকে আশ্রয় করিয়া যত বিচিত্র রসের সৃষ্টি করুক তাহাতে idealism থাকিলেও mysticism নাই।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই ঠিক্, কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে mysticism কি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে? এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার "চতুরঙ্গ" প্রবন্ধের গোড়াতে যাহা বলেন তাহা বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়—"তাঁহার কাব্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে যাহা মরমী কবিদের কাব্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না। মরমী কবি পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে অরূপের সন্ধান করেন, ইহার বিচিত্রতার মধ্যে এক বিরাট একক আত্মার স্পন্দন শুনিতে পান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মরমী কবিতার এই বিশেষ সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য, তাহার রূপের অফুরন্ত মাধুর্য্যও ফুটিয়াছে।······তাঁহার কাব্যে অসীম ধরা দিয়াছে সীমার মধ্যে, অনন্ত তাঁহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে খণ্ড সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে।"

মোহিতলালের আরও দুই একটি মত উদ্ধার করা যাইতে পারে যাহাদের সম্বন্ধে তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা আছে। অনেকস্থলে ভাষার জটিলতার জন্য তাঁহার কথার অর্থ ঠিকমত বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রধান বক্তব্য সুপরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তারিত ও চিন্তাশীল আলোচনা ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় কেহ করেন নাই।

মোহিতলাল ব্যতীত আর একজন লেখক 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছেন—"রবীন্দ্র-কাব্য-জিজ্ঞাসা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি সুলিখিত; লেখক রসগ্রাহী ও চিন্তাশীল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার মতামত অনেক সময়ই অপরিণত বিচারশক্তির পরিচায়ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যকে

লেখক বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপ সম্বন্ধে 'বস্তুতন্ত্র' বিশেষণটি বহুপ্রয়োগের ফলে শুধু পুরাতন নহে নিতান্তই সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাহাই হোক্, এইরূপ একটি সঙ্কীর্ণ বিশেষণদ্বারা একটি সমগ্র মহাদেশের বিচিত্র সাধনাকে কি ব্যাপকভাবে অভিহিত করা চলে? আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন: "মানুষের অন্তরের সকল বিচিত্র অনুভূতিকে এমন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে এমন সুন্দর, সরস ও সার্থক অভিব্যক্তি দিতে কালিদাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কেহ আছে বলিয়া মনে হয়না।" এই উক্তিটিও অত্যন্ত অযথাভাবে ব্যাপক। লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমান্টিক আদর্শের ও ভাবের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, "কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্যের সকল লক্ষণই ষোল কলায় বর্ত্তমান।" তিনি কি বলিতে চান Shelley, Wordsworth বা Coleridge-এর কবিতার সকল বৈশিষ্ট্য কালিদাসে পাওয়া যায়? আর একস্থলে তিনি বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদা রোমান্টিক আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই সাহিত্য-বিচার করিয়াছেন এবং "সাহিত্য-বিচারে তাঁহার এই রোমান্টিক পক্ষপাত অতিশয় সুন্দর এবং লিরিক্যাল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'জয়-পরাজয়' গল্পে।" কেননা, রাজসভায় পুণ্ডরীকের কাছে 'রোমান্টিক' কবি শেখরের পরাজয় ঘটিলেও, রবীন্দ্রনাথ "সুচতুরভাবে শেখরের জয়-ঘোষণাই করিয়াছেন।" এই জাতীয় অপরিণত মতামত সম্বন্ধে তর্ক করিতে গেলে বিস্তৃত প্রবন্ধের আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও অরুণকুমারের প্রবন্ধটি উপভোগ্য, কারণ তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী সরস।

ভাষার মাধুর্য্যে এবং সহজ রসগ্রাহিতায় এই পুস্তকটির শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ শ্রীমতী আশা দেবীর 'সৌন্দর্য্যে রবীন্দ্রনাথ'। লেখিকা জটিল তর্কের সৃষ্টি করেন নাই, গুরুভার তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই, সংক্ষিপ্ত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শুধু এই কথাই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'পুরোধা পরিচয়' :তিনি কবি—সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা। এই প্রসঙ্গে লেখিকা সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি তাহা যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে শুধু রসগ্রাহিতার নয়, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় যে তিনি কবি এই কথা শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়ও "কবি রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক কুড়িপাতা প্রবন্ধে বিস্তর বাক্যব্যয় করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া যে তিনি ঋষি নন, পাছে কেহ এরূপ ভুল ধারণা করিয়া বসে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কেন ঋষি লেখক বহু দুর্দ্ধর্ষ যুক্তির প্রয়োগে তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, "সর্ব্বোপরি, তাঁহার ঋষিত্বের সব চেয়ে বড় চাক্ষুষ অভিজ্ঞান তাঁহার সুদর্শন চেহারা।" শুধু তাহাই নয়—"শান্তিনিকেতনে, প্রত্যূষে অথবা প্রদোষে কবিগুরুকে একা মাঠের মধ্যে অথবা ছাদের উপরে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ঋষিত্ব কত বড় সত্য।" এই জাতীয় বহু অকাট্য প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন—তাই তিনি মনে করেন "রবীন্দ্রনাথ ঋষিও বটেন।" রবীন্দ্রনাথ সব, কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি কবি এই হইল নীহাররঞ্জনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সহজ কথাটি জগতে প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রভূত আয়াসে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা পূর্ব্বক এই বিপুল প্রবন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে "কবি অপেক্ষা ধ্যানবলে বলীয়ান্ কেহ নাই, কবি অপেক্ষা জ্ঞানবলে

বলীয়ান্ কেহ নাই। বিশ্বভুবন সবই তিনি জানেন। তিনি আমাদের সখা, তিনিই আমাদের পরম বন্ধু" এই শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া প্রচণ্ড নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘোষণা করিতেছেন :—

"———রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।"

'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকটির আর একটি প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের নাটক"—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমারবাবু রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন না। এই মতে অনেকেই আপত্তি করিবেন—কোন বড় শিল্পীসম্বন্ধেই সকলে একমত হইতে পারেন না। ভাবিকালের বিচারে হয়তো শ্রীকুমারবাবুর মতই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, হয়তো করিবে না। কিন্তু তাঁহার মত যাহাই হউক, শ্রীকুমারবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভালো করিয়া লিখিয়াছেন—সাহিত্য-সমালোচনা করিতে হইলে এই ভাবেই করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেকেই উচ্ছ্বাস করেন, সাহিত্যিক বা ব্যক্তিগত কারণে বা অকারণে তাঁহাকে গালি দিতেও লোকে ছাড়ে না; শ্রীকুমারবাবু যে-ভাবে প্রকৃত সমালোচকের রীতিতে তাঁহার নাটকের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'জয়ন্তী-উৎসর্গে' আরও বহু প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে—সেইগুলির আলোচনা এস্থলে করা সম্ভব নহে। তাই কয়েকটিমাত্র প্রবন্ধের পরিচয় দিয়া এই আলোচনা শেষ করা হইল। কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতাটি নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষায় এইরূপ কবিতা সচরাচর পড়িতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাটিও সুন্দর।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

আধুনিকী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত (মডার্ণ বুক এজেন্সি)

তিন কারণে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের আধুনিকী-প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রথমত তাঁর মতো অগাধ পাণ্ডিত্যে আমি বঞ্চিত; দ্বিতীয়ত এই পাণ্ডিত্য এত অস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে যে লেখকের বক্তব্য-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হ'তে পারিনি; এবং তৃতীয়ত তাঁর ও আমার দৃষ্টি এমনি বিপরীতমুখী যে, কোনো বিষয়ে আমাদের একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কাব্য ও কাব্যবিবেচনা ভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তু। কাব্যের বেসাতি আবেগকে দিয়ে; সুতরাং তার আবেদন বুদ্ধির তোয়াক্কা রাখে না, দেহের দৌত্যে একেবারে গিয়ে অন্দরে হাজির হয়। এবং বুদ্ধিতে জাতিবিচার থাকলেও, দেহ যেহেতু সাম্যবাদী, তাই পাঠক বিধর্ম্ম হ'লেও, কবির পায়ে মাথা নুয়তে সে বাধ্য। পক্ষান্তরে কাব্যবিবেচনা তর্কাধীন, কারণ তার দেনাপাওনা সত্যকে নিয়ে; এবং সত্যমাত্রেই প্রামাণ্য। অন্তত আমি এখনো কোনো ধ্রুব-সত্যের সন্ধান পাইনি। কাজেই সমধর্ম্মী-ব্যতীত সমালোচকের পসার জমে না। কথাটা প্রথমে হেঁয়ালির মতো শোনালেও, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, প্রস্তাবনাকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে না-মেনে নিলে, নৈয়ায়িকের জারিজুরি নিতান্ত নিঃসার।

কারণ যাই হোক্, নলিনীকান্ত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যে-প্রভেদ নির্দ্দেশ করেছেন, সে-ভেদজ্ঞান আমার কাছে, কেবল অসঙ্গত নয়, বিপজ্জনক ব'লেও বোধ হয়। তাঁর মতে পুরাতন সাহিত্য মানুষের দেবত্ব-ব্যঞ্জক, আর আজকালকার সাহিত্যিক মানুষের পশুত্ব-প্রচারে বদ্ধপরিকর। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তকে আমি অমূলক মনে করি, কারণ মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলোই যদি তার পশুত্বজ্ঞাপন করে, তবে এক ভিক্টোরিয়ার বকধার্ম্মিক যুগ ছাড়া, সকল কালে এবং সকল দেশে ঠিক ওই প্রবৃত্তি-গুলোর বর্ণনাকল্পেই অধিকাংশ সাহিত্যের সৃষ্টি। স্কুলপাঠ্য-হিসেবে মহাভারতের কাটতি নেই এবং শত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও বাইবেল আজো কুমারীভোগ্য হ'তে পারেনি। এরিষ্টফেনিস্ থেকে উত্থিত হ'য়ে, পেট্রোনিয়স্, রাব্‌লে, বোকাচ্চো ইত্যাদিকে নিয়ে, পাশ্চাত্য প্রহসনের যে-ধারা উনবিংশ শতকের মরুভূমিতে এসে অদৃশ্য হয়েছিলো, তার সঙ্গে অলকনন্দার উপমাও বোধ হয় অশোভন।

স্বমতের সমর্থনে নলিনীকান্ত চণ্ডীদাসের চারটি লাইনের পাশে এক নামহীন আধুনিক বাঙালী কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত আধুনিক লাইন কটি হাল-আমলের বাঙলা কবিতার প্রতিনিধি হ'তে পারে কিনা জানি না। তবে আশা করি, আজকালকার উল্লেখযোগ্য কবিরা আর 'ব্রণ'-শব্দকে 'উন্মন', 'যৌবন', 'চুম্বনের' মিল-হিসেবে ব্যবহার করেন না। কিন্তু এই ভয়াবহ মিলটিই যদি আধুনিক অধঃপতনের একমাত্র চিহ্ন না-হয়, তাহলে মানতেই হবে যে মিথুনের অলজ্জ বিবরণে প্রাচীনেরা অর্ব্বাচীনের বহু অগ্রে। সংস্কৃত কবিরা নারীকে তো শাপভ্রষ্ট দেবতা ব'লে বিবেচনা করতেন না-ই, এমন-কি তাঁদের চোখে আসল দেবীরাও ছিলেন কামাগ্নির ইন্ধনমাত্র। হোমারের মহাকাব্যে দেখি, ট্রয়বিজয়ী বীরেরা তাদের সেনাপতিকে হারিয়ে মানুষের অমর আত্মার সম্বন্ধে মুখর হ'য়ে ওঠে না, তারা নীরবে নিরত হয় খাদ্যাহার-সংগ্রহে। সফোক্লিসের অতিমানুষ অমৃতের পুত্র নয়, অন্ধ নিয়তির ক্রীড়নকমাত্র; শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে 'দ্বিপৃষ্ঠ পশু'-র উল্লেখ সুলভ; গলিষ্ণু শবের বর্ণনায় ওয়েব্‌ষ্টার বোদ্‌লেয়র্‌কেও টেক্কা দিয়েছেন। স্মলেট্, ফিল্‌ডিঙ, ষ্টর্ণ্, ক্রেবিইয়ঁ, লাঁক্লো, রেস্‌তিফ্ দ লা ব্রেতঁ, এমন কি আবে প্রেভস্‌ৎ সুদ্ধ, প্রেমে কোনো নিরিন্দ্রিয় সঙ্গমের পরিচয় পাননি ব'লেই আমার বিশ্বাস।

আসল কথা হচ্ছে, পরাবিদ্যার নিকষে সাহিত্যকে কষতে গেলে এই রকমের প্রমাদ অনিবার্য্য। সাহিত্যের ধর্ম্ম থাকতে পারে, কিন্তু সে-ধর্ম্ম পারত্রিক নয়, ঐহিক, এ-কথাও নিতান্ত নিশ্চয়। 'বলাকায়' রবীন্দ্রনাথ অরূপের অনেক খোঁজ খবর নিয়েছেন; কিন্তু তাই ব'লেই ওই কাব্য 'ক্ষণিকার' চেয়ে মহৎ, এমন অভিমত দুঃসাহসিক। বাস্তবিক পক্ষে এই দুটি পুস্তকের উৎকর্ষ ওদের প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে রূপায়ণের উপর। অর্থাৎ কবির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আবেগ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে ব'লেই পার্থক্য ধরা পড়ে; কিন্তু কবির মনোভাব যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই পাঠকের কাছে সমানভাবে ব্যক্ত, তাই কাব্যসম্পদে ও-দুটির তুল্যমূল্য। প্রকৃতপক্ষে কাব্যবিচারে এই অভিব্যক্তি-রীতিই হচ্ছে মূল কথা; বক্তব্য নেহাৎ নগণ্য। অবশ্য নিখুঁত রূপের সঙ্গে সঙ্গে যদি সুমহান তথ্যের সাক্ষাৎ পাই, তবে আপত্তির কিছু থাকে না; কিন্তু শুধু বক্তব্য বিরাট হ'লেই যদি কাব্য গরীয়ান্ হ'য়ে উঠতো, তবে লঙফেলোকে আমরা হেরিক্-এর উপরে আসন দিতে বাধ্য হতুম, তবে কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-

রচয়িতা নবীনচন্দ্রকে ফুলের ফসল-প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে বড় বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকতোনা।

সাহিত্যের প্রাণবস্তুর আলোচনা এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক; এবং নলিনীকান্ত এই ব'লে আপত্তি করতে পারেন যে, আধুনিক সাহিত্যের মূল্যনির্দ্ধারণ তাঁর অভিপ্রায় নয়, তাঁর উদ্দেশ্য কেবল বর্ত্তমানের পদানুসরণ। এ-কথার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষি যোগাড় করা হয়তো শক্ত হবে। কিন্তু যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, আধুনিক শিল্পকে "দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প" থেকে আলাদা ক'রে, তাকে "পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের, জিন-দানার শিল্প" আখ্যা দেওয়ায় কোনো মূল্যবিচারের চেষ্টা নেই, আছে কেবল পারিভাষিক শুদ্ধি, তবু এ-কথা ভুললে চলবেনা যে, সাহিত্যকে সমাজতত্ত্বের পাদপীঠ-রূপে ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়। সংস্কৃত কাব্যের দোহাই দিয়ে প্রাচীন হিন্দুর লাম্পট্য ইতিপূর্ব্বেই ঘোষিত হয়েছে। জীদ্-এর খানকতক বইকে অবলম্বন ক'রে, আধুনিক ফ্রান্সে "উৎকট কামের" অনাসৃষ্টি আবিষ্করণও ঠিক তেমনিতর ব্যর্থ। এটা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আর্ট ফটোগ্রাফ নয়, আলেখ্য। অবশ্য আলেখ্য কখনো সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেশকে জয় করতে পারেনা; কিন্তু সকল প্রকৃত আর্টিষ্টই অখণ্ডতার খাতিরে তাঁদের চিত্রে অনেক সময়ে এমন অতিরঞ্জন বা অবদমন আমদানী করেন যার জোড়া শুধু একালে নয়, কোন কালেই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

উপরন্তু জাতীয় ব্যাধির পরিমাপকার্য্যে যদি সাহিত্যই একমাত্র মানদণ্ড হয়, তবে যন্ত্রটাকে মুর্গীহাটার মনিহারী দোকান থেকে না-কিনে, তার জন্যে কোনো নামজাদা কারখানার দ্বারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এমন মনে করার কোনোই উপায় নেই যে ফরাসী সাহিত্যে নলিনীকান্তের দৌড় শুধু কামিল্ মোক্লের্ অথবা রণে মার্ঁা পর্য্যন্ত। কিন্তু যে-দৃষ্টি দিয়ে তিনি বোদ্‌লেয়র্-এর স্বর্গাভিলাষ আবিষ্কার করেছেন, সেই চোখে র‍্যাঁবো, ভের্লেন্, মালার্মে বা ভালেরির দিকে চাইলেই আধুনিক জগতের অভীপ্সা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। তবে এ-সম্বন্ধে আমার অনুমান একেবারে ভুল হ'তে পারে, কারণ যে-প্রুস্ৎ-এর "অস্পষ্টতার মধ্যে" নলিনীকান্তের শ্বাসরোধ হ'য়ে আসে, সেখানে আমি দেখি একটা অপূর্ব্ব আলোকের উদ্ভাস, যে-লাতিনদের তিনি 'অন্তর্জ্ঞান'- অথবা ইনটুইসান্-চালিত মনে করেন তাদের কলায় আমি পাই অতিমাত্রিক বিচারবুদ্ধির পরিচয়, এবং যে-কালিদাসকে তিনি সংযত রূপায়ণের পুরোধা ব'লে ভাবেন, তারি শকুন্তলার অসংহত উচ্ছৃঙ্খলতায় আমার গায়ে জ্বর আসে।

কিন্তু এ-সমস্তই তো পক্ষপাতের কথা, এবং মানুষমাত্রেই ওই দোষে দুষ্ট। কাজেই রুচিভেদের বিষয়ে আর বাক্যব্যয় না ক'রে, কোথায় তিনি আমি একমত সে-খবর দেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। নলিনীকান্ত ঠিকই বলেছেন যে, পশ্চিমের বর্ত্তমান সাহিত্য পশ্চিমের বর্ত্তমান জিজ্ঞাসার উপযুক্ত উত্তর। সুতরাং সে-উত্তর যতই অপ্রত্যাশিত হোক, তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। কিন্তু আমাদের মণ্ডূক-ভুক্তিত কূপে সেই পরদেশী কুমীরকে খাল কেটে ডেকে আনলে, সুশৃঙ্খলার চেয়ে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য বিপ্লবমাত্রেই নিন্দনীয় নয়, কিন্তু বিপ্লবকে বৈনাশিকতার কবল থেকে বাঁচাতে হ'লে, তার পিছনে একটা চেতনার তাগিদ, একটা সৃষ্টির আকূতি, একটা সামঞ্জস্যের সংস্কার থাকা অত্যাবশ্যক। নিছক নকল নরের কাজ নয়, সে শোভা পায় বানরকে। যে-কলায় অন্তরের কোনো প্রয়োজন লক্ষিত হয়না, সে-কলা কৃত্রিম,

সে-কলা অচিরে পরিণত হয় কৌশলে। ঠিক এই ভাবে না বললেও, আমার বিশ্বাস, এই মহাপ্রমাণ উপদেশের উক্তি-পুনরুক্তিতে 'আধুনিকী' মুখর।

কিন্তু কেবল এই জন্যেই নলিনীকান্ত আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন নন। পড়ার অভ্যাস এ-দেশে খুব বিরল না-হ'লেও ভাবার চেষ্টা এখানে অপ্রচল। সুতরাং নলিনীকান্তের মতো যিনি বিদ্যাকে পাণ্ডিত্যাভিমানের নিমিত্তমাত্র না-ক'রে তাকে লাগান স্বাধীন চিন্তার পদসেবায়, তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে পারি বা না-পারি, তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আমরা বাধ্য।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

India's Mission in the World—Anilbaran Roy.
Published by the Hindu Mission, Kalighat.

একখানি ক্ষুদ্রকায়া পুস্তিকা। শ্রীঅরবিন্দের নানা পুস্তকের ও নানা প্রবন্ধের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার খ্যাতনামা পুরুষ, সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি যাহা লিখিবেন, তাহা সর্ব্বদাই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এই অতিসংক্ষিপ্ত পুস্তিকা কেন লিখিয়াছেন। প্রকাশকের নাম দেখিয়া হয়ত বা কেহ সন্দেহ করিবেন যে, ইহা একটা mission বিশেষের tract (প্রচার পত্রিকা) মাত্র। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য্যের সহিত শ্রীঅরবিন্দের নাম সংশ্লিষ্ট থাকা এত অস্বাভাবিক যে এ সংশয় নিমেষমাত্রও মনে স্থান পাইতে পারে না। আমরা আজ কল্পনাচক্ষে ভাবী ভারতরাষ্ট্রের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, সে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি ত অরবিন্দই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। আমাদের হৃদয় আজ সেই সমগ্র বিরাট মূর্ত্তির দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখিবার অবকাশ আমাদের কোথায়? সুতরাং, ভারতের mission কি তাহা আমাদের স্থির করিতে হইলে, এক অখণ্ড দেশ-মাতার কথাই ভাবিতে হইবে। খণ্ড খণ্ড জাতি বা সম্প্রদায়ের বিক্ষিপ্ত কার্য্যক্রম আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায়-বিশেষের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ আমাদের নমস্য সন্দেহ নাই, কারণ mission সকলেরই আছে। যেমন মহাজাতির মহান্ mission আছে, তেমনই জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, পরিবার, এমন কি মনুষ্যমাত্রেরই নিজের নিজের mission আছে। নির্ঝরিণীর সহিত মহানদের যে সম্বন্ধ, হয়ত এই খণ্ড খণ্ড mission-এর সহিত রাষ্ট্রের mission-এরও সেই সম্বন্ধ। তথা, রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা গতির সহিত মহামানবের mission-এর সম্বন্ধ একই রূপ। ঋষিকল্প মহাপুরুষের ধ্যেয় বস্তু সমগ্র বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টির উন্নতি অধোগতি তাঁহার ধ্যান বিষয়ের বহির্ভূত। অনিলবরণবাবুর মত সাধনাশ্রমবাসীর নিকট হইতে আমরা এই প্রত্যাশা করি যে, তিনি আমাদের লৌকিক দেশসেবার সহিত আধ্যাত্মিক বিশ্বপ্রেমের সামঞ্জস্য করিয়া দিবেন। কিন্তু এ কার্য্য করিতে গিয়া যদি তিনি আমাদের নব অর্জ্জিত রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আরও খর্ব্ব করেন, যদি মুখে ভারত বলিয়া তিনি মনে হিন্দুভারতের চিন্তা করিতে শিক্ষা দেন ত তাঁহাকে শিক্ষক পদে বরণ করা কঠিন হইবে। আলোচ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথম আপত্তি। India's

mission নাম দিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতে হিন্দু ব্যতিরেকেও যে অন্য বহু সম্প্রদায় আছে তাহাদের উল্লেখ দুই-এক স্থানে ভিন্ন প্রায় নাই। (২৭ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় যৎসামান্য আছে)। গ্রন্থকার কোথাও দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই যে, ভারতীয় রাষ্ট্র-গঠনের জন্য হিন্দু আদর্শের সহিত মুসলমান বা খৃষ্টান আদর্শের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য কিরূপে করিতে হইবে। হিন্দুর বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ, গীতার অবতারবাদ জড়িত উপদেশ এ সব ভারতের অহিন্দুরা কেন গ্রহণ করিবে? মুসলমানের বা খৃষ্টানের ত নিজের সবই আছে। সে কেন Aryan Culture বা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার নামে নৃত্য করিবে? তাহা হইলে ভারতের mission কি মুসলমানদিগের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করা, ছলে বলে কৌশলে ভারতীয় অহিন্দুকে হিন্দুর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করান? এ দুরূহ বিষয় অনিলবরণবাবুর আলোচনা করা উচিত ছিল। তিনি ত এক সময় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা রূপে সকল সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া ছিলেন। ফিরিঙ্গীর আব্দার, মুসলমানের আব্দার, পঞ্চম জাতির আব্দার, এ সকলের নিন্দা ত আমরা অহরহ করিতেছি। উচ্চবর্ণের হিন্দু ভারতের ইতর সব জাতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এ দেশে রাষ্ট্রগঠন যদি কবিতে হয় ত কনিষ্ঠের আব্দার সহিতে হইবে। কিন্তু যদি দেখি জ্যেষ্ঠও আব্দার আরম্ভ করিয়াছে, ত যজ্ঞ পণ্ড হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতের কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য মহাজাতিসংঘটন। যদি আমরা জগৎকে কার্য্যতঃ কোন দিন দেখাইতে পারি যে, ভারতের হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান আপন আপন ধর্ম্মে অনুরাগী থাকিয়াও দ্বেষ মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়াছে, রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার জন্য একমন একপ্রাণ হইয়াছে, তবেই আমাদের mission সার্থক হইবে, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। তখন রাষ্ট্রের নূতন পরিপূর্ণ আদর্শ লইয়া ভারত জগৎ সমক্ষে আবার উচ্চ শির হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরেব প্রাচীন ইতিহাস আমাদিগকে এই মহাব্রতের দিকে ধীরে ধীরে লইয়া আসিয়াছে। পরন্তু দুর্দ্দিনে যে হীনতা, অক্ষমতা সঞ্চয় করিয়াছি, আজ তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। যে স্বার্থত্যাগ ও সংযম প্রয়োজন তাহা ভারতের জাতিমাত্রকেই অভ্যাস করিতে হইবে। অহিংসা অপেক্ষাও মহত্তর যে গুণ, মৈত্রী, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। এই সাধনায় অচল অটল হইয়া পথ দেখাইবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হিন্দুর নবীন উদ্যম, নবীন শক্তি, কোথা হইতে আসিবে তাহা গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এত সংক্ষেপে সারিয়াছেন যে, তাহা হইতে তাঁহার দেশবাসী কোনও উপকার পাইবে না। শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা এই পুস্তিকার স্থানে স্থানে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কিন্তু জহুরীর নিপুণতার অভাবে এ রত্নরাজিও যেন অপেক্ষাকৃত ম্লান দেখাইতেছে। কোথাও কোথাও বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য রচিত সংক্ষিপ্তসারের মত বোধ হয়, যেন কণ্ঠস্থ করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। কোথাও বা আদালতে উকীলের অভিভাষণের মত পক্ষপাতদোষদুষ্ট। বিরুদ্ধমত খণ্ডন মাত্রই দুষণীয় নহে। তবে ইংরেজীতে যাহাকে বলে tilting at a windmill, অর্থাৎ বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা, তাহা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত জওয়াহের লাল বা মহাত্মা গান্ধী, কেহই উৎকট সাহেবিয়ানা কিম্বা অন্ধ ধর্ম্মহীনতার উপাসক নহেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-প্রাণতা ইঁহাদের বা অন্য কাহারও অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। উপরন্তু গ্রন্থকার নিজেই আক্ষেপ করিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্ম-প্রাণতা আজ একটা প্রাণহীন কঙ্কাল

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাও তিনি বারবার স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবল প্রাচীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাদ্বারা ভারতের সমস্যা মিটিবে না। তবে কাহার বিরুদ্ধে এত তর্কের অবতারণা? এই রাজা মহারাজা নবাব বেগম অধিষ্ঠিত দেশে, এই পুরোহিত মোল্লা, গুরু মহান্ত অধিরূঢ় সমাজে, বল্‌শেভিক বিপ্লবের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং বল্‌শেভিকবাদ খণ্ডন করিবার উগ্র প্রয়াসও নিষ্প্রয়োজন। লেলিন বা মার্ক্সের নাম জানে এরূপ লোকই বা এদেশে কয়জন? আর এই মহাপুরুষের পন্থা অনুসরণ করিতে চাহে বা পারে যাহারা, তাহারা ত নিতান্ত মুষ্টিমেয়। তবে এই বহুজনমান্য জগদ্‌বিখ্যাত মনীষীদিগকে দানবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সার্থকতাই বা কোথায়? বৌদ্ধ ধর্ম্মের বা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত মায়াবাদের হীনতা প্রচার করিবারও প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। গণতন্ত্রে বহুমতের অত্যাচার, socialism-এ স্বতন্ত্রতার নাশ এ সবেরই গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধীজীর চরখার উপর শ্লেষ ত আছেই। এক ক্ষুদ্র পুস্তিকার ৭০ পৃষ্ঠার মধ্যে এত শত্রুর বিলোপ সাধন সম্ভব নহে। ফল হইয়াছে যে, মূল কথা, মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অনেক অবান্তর তর্ক বিতর্ক শ্লেষের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছে। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়কে সাহায্য করিবার জন্য এ পুস্তক ত লেখা হয়ই নাই, কিন্তু হিন্দু পাঠকও ইহার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন না যে, তাঁহাকে কি করিতে বলা হইয়াছে। অহঙ্কার নিন্দনীয়, তাহা পরিহার কর, স্বার্থ বলি দিয় স্বদেশের কার্য্য কর, সকল কর্ম্মের ফল ভগবৎ চরণে অর্পণ কর, এইরূপ উপদেশ অনেক আছে। কিন্তু এ উপদেশ ত হিন্দুর কি ভারতবাসীর মৌরসী সম্পত্তি নহে। ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ একথাও বোধহয় সকল যুগে সকল দেশে শোনা গিয়াছে। এই সমস্ত শাশ্বত সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া, শুধু ভারতে রাষ্ট্র কেন, ভূতলে স্বর্গের সৃষ্টি করা যায়। আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ-ভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত আধ্যাত্মিক সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, এ কথা বারম্বার বলায় লাভ কি? কথার ভেল্কী লাগাইবার লোক আজও ভারতে অনেক আছে। যে গভীর তমোরূপ পঙ্কে ভারতবাসী নিমগ্ন, তাহা হইতে উদ্ধারের পথ কেবল কর্ম্মের মধ্য দিয়া। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথা কতবার বলিয়া গিয়াছেন। দুটী বাক্য তিনি সময়ে অসময়ে তাঁর দেশবাসীকে শোনাইতেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এবং "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। এই একই উপদেশ সেকালে শ্রীঅরবিন্দের মুখেও কতবার শুনিয়াছি, "কর্ম্মযোগিন্"-এও পড়িয়াছি। আলোচ্য পুস্তকে একথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে যে অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন "নিয়ত কর্ম্ম কর অর্জ্জুন, অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ," এই উপদেশই আজ ভারত সকল সাধকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে। এই কর্ম্মই তাহার মুক্তি, এই কর্ম্মের মধ্যেই তাহার সকল জড়তা, সকল ভেদবুদ্ধির অবসান হইবে।

আর একটু বক্তব্য আছে। অনিলবরণবাবু যে alien ideals বা বিজাতীয় আদর্শের এত নিন্দা করিয়াছেন, আশা করি তাহা spiritual বা আধ্যাত্মিক আদর্শ নহে। আত্মারও জাতিভেদ আছে এ কথা বলিলে অতি বড় দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরেজীতে religion বলিতে যে ধর্ম্ম বুঝায় তাহা সনাতন সার্ব্বজনিক ও ধ্রুব। যে পরধর্ম্মকে গীতা ভয়াবহ বলিয়াছেন তাহা ব্যক্তিগত বা জাতিগত কর্ত্তব্যের সমষ্টিমাত্র। হিন্দুর নিকট একথা পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন আছে। পুস্তিকার শেষের দিকে বলা হইয়াছে যে, "ভারত যদি তাহার এই সুযোগ হেলায় হারায়, যদি ভারত পরকীয় আদর্শ

বা পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যচ্যুত হয়, তবে অন্য কোনও দেশ এই কার্য্য মাথায় তুলিয়া লইবে ও জগৎকে তাহার চরম আধ্যাত্মিক পরিণতির দিকে লইয়া যাইবে।" যদি তাহাই হয় ত জগতের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে? ভারত যাহা পারিল না, অন্য দেশ তাহা করিল ইহাতেই বা ক্ষোভের কারণ কি আছে? সমস্ত পৃথিবী যাহা পাইবে ভারতই বা তাহার ফললাভে কিরূপে বঞ্চিত হইবে? আধ্যাত্মিক জগতে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে কি?

ভারত এক হউক, মহান্ হউক, রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করুক এই তাহার mission। তাহার পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনে জাতি ও ধর্ম্মগত সকল দ্বেষ লয় প্রাপ্ত হউক, তাহার কীর্ত্তি ও সফলতা দেখিয়া সমস্ত জগৎ শিখুক যে ভেদ অনিত্য, অভেদই সত্য ও শাশ্বত।

গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অসম্মান দেখান আমার অনভিপ্রেত। আশা করি আমার সমালোচনা তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Africa View—JULIAN HUXLEY, (Chatto and Windus).

মধ্য আফ্রিকা আফ্রিকা-মহাদেশের একটি বৃহৎ অংশ; এখানে বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূচনা এখনও হয় নাই। পৃথিবীতে এই একটিমাত্র মহান ভূখণ্ড এখনও অবশিষ্ট আছে যেখানে পুরাতনের ধ্বংসব্যতিরেকেও নূতন সভ্যতার অভ্যুত্থান সম্ভব। ইহার অধিবাসীদিগকে সভ্য করিয়া তুলিতে ইংলণ্ডেরই সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, কারণ উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার আকারে ব্রিটিশেরই সমতুল্য হইলেও, তাহার অধিকাংশই সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত। এবং ভারতীয় ও আরব সভ্যতা কেবলমাত্র পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূভাগেই আবদ্ধ। তাহার প্রভাবও অত্যন্ত ক্ষীণ। তা ছাড়া সে-প্রভাব ব্রিটিশের রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতে অচিরে ক্ষীণতর হইবে, মনে হয়। কিন্তু মধ্য আফ্রিকায় সভ্যতা বিস্তার করা হয়তো ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যরবি আজ মধ্যাকাশ হইতে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে; বর্ত্তমান জগৎব্যাপী অর্থসঙ্কটের আবর্ত্তে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যলক্ষ্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী, এই অবস্থায় ইহা আশা করা যায় না যে, ইংলণ্ড উপস্থিত লাভ ত্যাগ করিয়া এরূপ কোনো মহৎ পরীক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে যাহার ফল লক্ষিত হইবে বহুযুগ পরে।

প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ জুলিয়ান্ হাক্স্লির 'এফ্রিকা ভিউ' গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি মধ্য আফ্রিকাবাসীদের জন্য এমন সভ্যতা কামনা করেন না যাহাতে তাহারা বস্তিবাসী কুলীমজুরে পরিণত হইবে। তাঁহার বিশ্বাস, এরূপ ঘটিলে তাঁহার মাতৃভূমির কলঙ্কের অন্ত থাকিবে না।

হাক্স্লি প্রারম্ভেই তাঁহার স্বদেশবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আফ্রিকান নিগ্রোসমষ্টি উপেক্ষার বা অবজ্ঞার পাত্র নহে। তাহাদের মধ্যে সকল প্রকার য়ুরোপীয় ভাবের আভাস আছে; তাহাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভ্যন্তরে

মনুষ্যজনোচিত সকল বৃত্তি লক্ষিত হয়। আফ্রিকায় পিগ্‌ম্ এবং বুস্‌ম্যান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহৎ সমাজ, প্রশংসনীয় বিধি-ব্যবস্থা, নিজস্ব আইন এবং স্বতন্ত্র বিচার-পদ্ধতি আছে। মালিকীয়ানা স্বত্ব, ব্যবস্থাসভা, নীতিশাস্ত্র, গ্রাম্য ও জাতীয় শাসন, এমন কি অল্প পরিমাণে শিক্ষার বিস্তার এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত বিশাল রাজ্যের ইতিহাস এবং রাজবৃত্তিভোগী ঐতিহাসিকের খবরও শোনা যায়।

হাক্‌স্‌লি আশা করেন যে "এফ্রিকা ভিউ"-এর পাঠকেরা নেটিভ্ সম্বন্ধে বিশদরূপে জানিলে নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি বর্জ্জন করিতে পারিবেন। কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় গোঁড়ামি ঘুচিলে অথবা কতিপয় প্রাণীবিদের বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য জাগিলেই কি ইংলণ্ডের জনমত জেনারেল স্মাট স্-এর "শ্বেত মেরুদণ্ড" প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপেক্ষা করিতে পারিবে? উক্ত শ্বেত মেরুদণ্ডের অর্থ এই—কেনিয়া হইতে তাঙ্গানিকার মধ্য দিয়া নায়াসাল্যাণ্ড্ এবং রোডেসিয়া হইয়া দক্ষিণ এফ্রিকা পর্য্যন্ত সংলগ্ন উপনিবেশের উপযুক্ত যে উচ্চ ভূমিখণ্ড আছে তাহা শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত করা। এই স্থানে নিগ্রোদের গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখাই ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসের প্রধান অভিসন্ধি।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন হাই-কমিসনর একটি সরকারী পত্রে প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সম্প্রসারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে তখন রাজনৈতিক দাবা খেলায় যত কম চালে সম্ভব সাদাকে দিয়া কালোকে মাৎ করাই গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই সময় হইতে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিয়াছে। এমন কি জমী ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা কতকগুলি বিলাতী সিণ্ডিকেট্ প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের সংখ্যা এখনও অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠে নাই তাহার কারণ শ্বেতাঙ্গদের বিশ্বাস যে, দরিদ্র স্বজাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্ত্ব ও প্রভুত্ব দেশীয় লোকের চক্ষে খর্ব্ব হইবে। অকিঞ্চন শ্বেত ও কৃষ্ণের মধ্যে আর্থিক প্রতিযোগিতাও এই প্রসারের পরিপন্থী। সমস্যা সমাধান কল্পে জেনারেল স্মাট্‌স্ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নেটিভ শ্রমজীবিদের স্ত্রীপুত্রের জন্য নিম্নভূমিতে একটী আবাসস্থল নির্দ্ধারিত থাকিবে। সেই সীমার মধ্যে প্রত্যেক নিগ্রো আবদ্ধ রহিবে। এমন কি যাহারা শ্বেতাঙ্গদের বাগানে কুলীমজুরের কার্য্য করিবে উচ্চভূমিতে তাহাদের সস্ত্রীক প্রবেশও নিষিদ্ধ হইবে। ইহাতে নেটিভ গ্রামের মধ্যে অপুত্রক নারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

হাক্‌স্‌লি বলিয়াছেন যে, আফ্রিকাবাসী য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন এই প্রস্তাবের পক্ষে। তাহারা নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও অপছন্দ করেন, কারণ তাহাতে নিগ্রোজাতির রাজনৈতিক অভীপ্সা জন্মিতে পারে। হাক্‌স্‌লি এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রতিবাদ উক্ত প্রস্তাবটী স্বার্থদুষ্ট বলিয়া নহে। তিনি মনে করেন, জেনারেল স্মাট্‌স্-এর সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইলে আফ্রিকার স্বকীয় সভ্যতা বিকসিত হইতে পারিবে না। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে আস্থাহীন যে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উক্ত উপায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া উচিত। কিন্তু হাক্‌স্‌লির অসুবিধা হইতেছে যে, তিনি নিজে শ্বেত উপনিবেশের পক্ষপাতী। তবে তিনি মনে করেন যে, এই উপনিবেশের বিস্তৃতি ধীরে ধীরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহার মতে শ্বেত-

কৃষ্ণের স্বার্থ সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী নহে। নেটিভ চীফ্ ও গ্রামবৃদ্ধের দ্বারা তাঙ্গানিকা প্রদেশে শ্বেতাঙ্গদের যে পরোক্ষ-শাসনের ব্যবস্থা আছে হাক্স্লি তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয় কবিয়া বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নেটিভগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু না লইয়াই স্বকীয় সমাজ গঠনে সক্ষম হইবে; ফলে তাহাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাসের কোন বাধা থাকিবে না।

হাক্স্লির এই বিশ্বাস কিন্তু নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে হয়। নেটিভ চীফদের মারফতে তাঙ্গানিকার সুশাসন সম্ভব হইয়াছে, কারণ সেখানকার শ্বেত অধিবাসীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের চাপ অল্প। উপরন্তু তাঙ্গানিকা একটি Mandated Territory, অর্থাৎ উহার উন্নতি-অবনতির হিসাব-নিকাস পেশ করিতে হয় লীগ্ অফ্ নেশন্স্-এর নিকটে। এক্ষেত্রে কোনো স্বার্থ-সংঘাত নাই, কাজেই যদি কোনো স্থানীয় চীফ্ জাতীয় আচার অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রজাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে চাহেন, তবে সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে যে সাহায্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ এইরূপ সাহায্য করিবার জন্যই উক্ত কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই অফিসাররাই যদি কেনিয়াতে বদলি হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাই নেটিভদিগকে শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারোপযোগী দ্বিপদ জন্তু ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করেন না।

সে যাহা হউক, শ্বেতাঙ্গদের পরোক্ষ প্রভুত্বের সমর্থন করিতে গিয়া হাক্স্লি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—নেটিভদের সভ্যতা কৃষিপ্রধান হইবে। নিগ্রো নাগরিক ও কৃষকই হইবে দেশের মেরুদণ্ড। তাহারা নিজ নিজ ভূমি কর্ষণ করিবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রামে মনোরম গৃহে বাস করিবে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতিকর সহরে সারা দেশ ছাইয়া যাইবে; চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিবে সাপ্তাহিক হাট ও ছোট ছোট পঞ্চায়েৎ। নিগ্রো পরিচালিত আদালত, হাঁসপাতাল, স্কুল, ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশময় আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিবে। ইহাতে সমগ্র জাতির একাত্মবোধ জন্মিবে, অথচ স্ব স্ব আচার-ব্যবহার, উচ্চারণরীতি, প্রাদেশিকতা, পোষাকপরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিবে—যেমন ব্রিটিশ যুক্তরাজে ওয়েল্স্, হাইল্যাণ্ড ও ডেভনবাসীদের আছে। তিনি মানস চক্ষে দেখিয়াছেন, বহু প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে মোটার ও বাস পরিপূর্ণ। সেই রাজপথগুলিই বিভিন্ন সহরকে যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। সহরে যাহারা আছে তাহারা মোটামুটি শিক্ষিত, বেতারবিলাসী, সংবাদপত্রপাঠক ইত্যাদি।

এই স্বপ্নচিত্রের সার্থকতা বোঝা শক্ত। হয়তো অন্যান্য স্থলে আফ্রিকাবাসী মিশনারী ও য়ুরোপীয়দের কুকীর্ত্তির যথার্থ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি যে ভীষণ ছবি আঁকিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই স্বপ্নচিত্র সেই কলঙ্ক কালিমার বর্ণসামঞ্জস্য করিবে ভাবিয়াই তিনি সুদূর ভবিষ্যতের শরণ লইয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, আসল ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুসভ্য কেনিয়ার পথে-ঘাটে যে-পরিমার্জ্জিত নিগ্রো কুলিমজুরদের ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় তাহারা অন্য রকমের এবং কেনিয়ার প্রত্যেক গ্রামেই প্রগতির যে সাড়া শুনা যায় তাহাতে বোধ হয় যে পশ্চিমের জ্ঞান, ধনলিপ্সা, খ্রীষ্টধর্ম্ম, পুস্তক, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র ও সস্তা সৌখিনি দ্রব্যের প্রভাবে দেশের অন্তঃস্থলে ঘুণ ধরিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, সমগ্র আফ্রিকা যদি এই নব্য জ্ঞান ও অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে তবে তাহার

পরিণাম হইবে শোচনীয়, অন্ততঃপক্ষে য়ুরোপীয় দেশগুলির তুলনায়। পশ্চিমের নূতন মনোভাবের পিছনে যে বহুশতাব্দীসঞ্চিত সংস্কার ও সবল জনমত আছে, তাহাই তাহাকে স্থিতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব যদি কোনো নূতন খেয়াল পুরাতনকে ধ্বংস করিতে চাহে, তাহাতে সমাজের ডালপালা বিনষ্ট হইলেও, মূলে আঘাত লাগে না। কিন্তু আফ্রিকা এখনো সেই জগতে বিরাজমান যেখানে প্রবৃত্তি অদৃষ্টচালিত, বিজ্ঞান জাদুবিদ্যার অন্তর্গত, সংস্কার শিশুসুলভ; আফ্রিকান নিগ্রো এখনো মাটির সঙ্গে এত ঘনিষ্ট সূত্রে বাঁধা আছে যে, কোনো দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে হয়তো তাহার বাঁচা দুষ্কর হইবে।

স্থানীয় শ্বেতাঙ্গেরা অবশ্য নিগ্রোদের সাহেবিয়ানার চেষ্টার সমর্থন করেন না। কিন্তু এই প্রয়াস মর্ম্মান্তক হইলেও, অনিবার্য্য বলিয়া হাক্‌স্‌লি তাঁহাদিগকে সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধিতে নবীন বলিয়াই নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ প্রবীণদের অনুকরণ করিতে বাধ্য। যুক্তিটার সঙ্গে আমরা ভারতে সুপরিচিত। এদেশের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ইঙ্গবঙ্গেরাও এমনি করিয়াই য়ুরোপীয়দের উপহাস্য হয়। কিন্তু ইহা ভুলিলে অন্যায় হইবে যে, পশ্চিমের আত্মশ্লাঘার পিছনে যতদিন বাহুবলের ইসারা থাকিবে, ততদিন এই অনুকরণ অবশ্যম্ভাবী। এখানকার মিশনারী বিদ্যালয়ে যেমন আর্য্যামি শিক্ষা দেওয়া হয়না, তেমনি আফ্রিকান পাঠশালাতেও কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার ও ক্রিশ্চান ধর্ম্মের প্রকীর্ত্তিই প্রচারিত হয়। অথচ সেই আদর্শকে নিগ্রোরা যখন নিজেদের জীবনে ফলিত করিতে চাহে, তখনই স্থানীয় য়ুরোপীয়দের গাত্রদাহ জাগে। হাক্‌স্‌লি অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রো ক্রিশ্চান অপেক্ষা নিগ্রো মুসলমানদেরই অধিক পছন্দ করেন। যে নিগ্রো লিখিতে পড়িতে পারে তাহার চাকরি পাওয়া সহজ নহে; এমন কি লেখা পড়া জানার অপরাধে সুযোগ্য সুদক্ষ্য নেটিভের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়াও শুনা যায়।

আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে হাক্‌স্‌লির ধারণা খুব উচ্চ নহে। ভারতীয় বাসগৃহের আশে পাশে বিছানা কাপড় শুকাইতে দেখিয়া হাক্‌স্‌লি সম্ভবতঃ স্তম্ভিত হইয়াছেন। পশ্চিমের প্রথায় অপরিচ্ছন্নতা গোপন করাই সুরুচির পরাকাষ্ঠা এবং অপরিষ্কার বস্ত্রকে ধৌত করিয়া রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অমার্জ্জনীয় নোংরামি। সেই জন্যই বোধ হয় হাক্‌স্‌লি স্থির করিয়াছেন যে তিনি যত জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভারতীয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু হাক্সলি যদি কখনও কোনো ভারতীয় গৃহস্থের গৃহে যাইতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁর এ-বিশ্বাস থাকিত না। ভারত নারীর শুচিতার সহিতও, তিনি নিশ্চয়ই পরিচিত নহেন। তিনি দেখিয়াছেন পাঞ্জাবী রেলমিস্ত্রিদের বস্তি। কিন্তু এখানকার অপরিচ্ছন্নতার জন্যও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী শ্বেতাঙ্গ স্যানিটারি অফিসার।

হাক্‌স্‌লি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবাসী পূর্ব্ব আফ্রিকায় পদার্পণ না করিলে, সে দেশের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইত না। মুখ্যতঃ তাহাদের সহায়তায়ই য়ুগাণ্ডা রেলপথ প্রতিষ্ঠা হয়। তবু তিনি ভারতবাসীদের আফ্রিকায় থাকা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, ইহারা যত শীঘ্র আফ্রিকা ত্যাগ করিবে, ততই মঙ্গল। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কোনো বিদ্বেষ নাই বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। কিন্তু তবু তিনি ভারতীয়দের আফ্রিকা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিতে চাহেন, কারণ তাঁহার মতে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের

মধ্যে ইহাদের অবস্থিতি আফ্রিকার সমস্যাকে জটিলতর করিতেছে। ইহাতে আমাদের আপত্তি করা বৃথা; যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহার স্বদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব না অর্জ্জন করিবে, ততদিন পূর্ব্ব আফ্রিকার সমস্যার মধ্যে তাহার প্রবেশচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আফ্রিকায় প্রাচ্য সভ্যতার বিস্তৃতি সম্বন্ধে কোনো মতামত শুনা যায়না। সম্প্রতি অধ্যাপক টমসন্ অবশ্য অনুমান করিয়াছেন যে, ভারতে যে পরিমাণে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে অচির ভবিষ্যতে ভারতীয়গণ পূর্ব্ব আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হইবে—এবং ক্রমশঃ সে মহাদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া যাইবে। হাক্স্লি এই অভিমত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। "আফ্রিকা ভিউ"-তে তিনি কয়েকবার স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতীয় বালক যে সকল পরীক্ষা অবলীলায় অতিক্রম করে, য়ুরোপীয় বালকেরা তাহাতে কেবলি ধাক্কা খাইতে থাকে। কিন্তু ইহার জন্য নাকি ভারতীয় বালকের বুদ্ধি প্রশংসনীয় নহে, দায়ী পরীক্ষা এবং শিক্ষাপদ্ধতি। এরূপ চলিলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত কৃষ্ণকায়দের উপরে মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কালে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া তিনি ভয় পাইয়াছেন।

এতক্ষণ হাক্স্লির সহিত মতভেদের কথাই বলিলাম, কিন্তু তাঁহার চারিশত পঞ্চাশ পাতা ব্যাপী আফ্রিকা চিত্রে শিক্ষনীয় বা উপভোগ্য বস্তুর অভাব নাই। আফ্রিকা সম্বন্ধে বহু পুস্তক আজ বাজারে মিলে, এরূপ অন্তর্দৃষ্টি অধিকাংশ গ্রন্থেই বিরল। সাধারণ পর্য্যটকের চক্ষে আফ্রিকার স্বরূপ ধরা পড়েনা। তাঁহারা দেখেন আফ্রিকার প্রকান্ড হ্রদসমূহ, শুষ্ক তৃণাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তর, অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বতশ্রেণী, মৌচাকসদৃশ অতি ক্ষুদ্র কুটীরপূর্ণ গ্রামগুলি, জিব্রা ও হরিণের পাল, বর্শাধারী দীর্ঘ কৃষ্ণ উলঙ্গ পুরুষ; চর্ম্মাবৃত, খদিরবরণী হাস্যমুখী রমণীবৃন্দ। কোথাও বা 'সি-সি' মক্ষিকা পরিবৃত বিরাট্ ভূখণ্ড অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে, কোথাও বা ছোট বড় নানাজাতীয় আগ্নেয়গিরি বহ্ন্যুৎপাত করিতেছে, কোথাও হ্রদের জল লবণাক্ত, কোনোস্থান নিরক্ষবৃত্তের সূর্য্যের প্রখর প্রতাপে দগ্ধ। দূরাগত সিংহগর্জ্জন, ঝিঁঝিঁ-পোকার অবিশ্রাম আর্ত্তনাদ, বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সারারাত্রব্যাপী অদ্ভুত নৃত্য-উৎসব, এই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য মানুষের মনে একটা অজানিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মনে হয়, সেখানে প্রকৃতি অসুস্থ, আকাশ বাতাস রোগের দীর্ঘ ছায়ায় আচ্ছন্ন। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে হাক্স্লি ব্যতীত অন্য কেহ পিশাচসিদ্ধি ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ফলিত বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও বর্ত্তমান যুগের রাজনীতি পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারে এরূপ দরদী ও সুস্থ দৃষ্টি প্রসার করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কর্কটের প্রেমনিবেদন, হায়নার কদর্য্যতা প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ বহু বিবরণও তাঁহার পুস্তকখানিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। পশু পক্ষী, লতা পাতা, ফুল ফল, তীরের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের ফিজিকাল জিওগ্রাফি ইত্যাদিও তাঁহাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার বর্ণনায় ইংরাজী সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হইবে। বইখানির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ হইতেছে স্থানীয় সকল সম্প্রদায়গুলির বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার ও রীতি নীতির বিশদ বর্ণনা। এলিমেন্টেটার নিকটে খনন করিয়া পুরাকালের যত দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ তিনি এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনায় সেই ইতিহাসহীন মহাদেশ এক অত্যাশ্চর্য্য প্রাক্-ইতিহাসে মণ্ডিত।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

রেখা-চিত্র—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। গুপ্ত ফ্রেণ্ড্স্ এণ্ড্ কোম্পানী, মূল্য দেড় টাকা।

ইতি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, মূল্য দেড় টাকা।

পুতুল ও প্রতিমা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, মূল্য দেড় টাকা।

বধূবরণ—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, মূল্য দেড় টাকা।

বুদ্ধদেব-বাবুর ভাষার সুন্দর একটি স্বচ্ছন্দতা আছে। যে-কথা তাঁহার বলিবার তাহা বেশ অনায়াসে এবং পরিপূর্ণভাবে বলা হইয়া যায়। লিখনভঙ্গীতে কোথাও আড়ষ্টতা নাই। মীড়গুলি অধিকাংশ কোমলের পর্দ্দায়, কানে বেশ গানের মতো বাজে। বহুকাল পূর্ব্বে মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে কতকটা এইরূপ ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাইতাম, কিন্তু মনে হইতেছে, বুদ্ধদেবের ভাষায় মাধুর্য্যের মসলা-সংযোগ কোথাও কোথাও কিছু বেশী হইয়াছে। "চঞ্চল বাতাসে ক্ষীণ শেফালি-শাখার মতো ঈষৎ শিহরিয়া"—সুন্দর, কিন্তু তারপরেই "তুমি বলিলে, উঃ একটু শীত করছে না ?" শুনিবার জন্য মনটা প্রস্তুত থাকে না।

ভাষা এবং সুর লইয়া সুরু করিয়াছি, তাহার কারণ লেখক ঐ-দুটি উপকরণ দিয়াই বেশীর ভাগ ছবি আঁকিয়াছেন। গল্প বলিতে সাধারণতঃ যাহা বোঝায়, এই লেখাগুলিকে ঠিক সে পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। সেদিক্ দিয়া বইটির রেখাচিত্র নামকরণ সার্থক হইয়াছে। প্লটের কাঠামো, চরিত্র-বর্ণনার বর্ণসম্পদ্, মানবজীবনের গভীরতর সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে আহরণ করা আলোছায়ার বৈচিত্র্য, ইহার সমস্ত-কিছুকেই বুদ্ধদেব এই বইখানিতে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। অত্যন্ত হাল্কা হাতে ছবি আঁকিয়াছেন, হৃদয়কে কোথাও স্পর্শ করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই।

কিন্তু যদিও রেখার সাহায্যে আঁকা ছবি, অত্যন্ত ঘন-সন্নিবেশের রেখা। যবনিকা যেখানেই উত্তোলন করিয়াছেন, তুচ্ছতম খুঁটিনাটিটিও প্রকাশের আলোয় পরিপূর্ণ করিয়া ধরা পড়িয়াছে। যেন কেবলমাত্র রেখার ঘন-বিন্যাসের দ্বারাই লেখক আলোছায়ার values গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। যেখানে আহারটা মুখ্য নহে সেখানে যেমন আনুসঙ্গিক উপকরণ অজস্র হইয়া উঠিতে কোনো বাধা থাকে না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। আসর জমিয়াছে, রস জমে নাই। কোথাও এমন রহস্যময় আব্ছায়া কিছু থাকে নাই যাহাকে আশ্রয় করিয়া মনটা বইয়ের পাতা ছাড়িয়া একমুহূর্ত্ত উদাস হইতে পারে।

এই-ধরণের রেখাচিত্র etching-জাতীয় জিনিস, কিছু মন্দ নহে; কিন্তু সর্ব্বত্র খুব সুবিচারের সঙ্গে এই রচনা-পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় নাই। যেমন "ছায়াচিত্র" গল্পে। একজন প্রেমার্ত্ত যুবক কিছুক্ষণের জন্য ট্রেনে একদল অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে, তারপর নামিয়া গেল। এইটুকু পরিসরের পটভূমিকায় বুদ্ধদেব অনেক খুঁটিনাটির সমাবেশ করিয়াছেন। খুঁটিনাটি হিসাবে সেগুলির মূল্য থাকিত যদি সেই প্রেমার্ত্ত যুবকের কোনো-একটি বিশেষ mood বা দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া সেগুলিকে আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সেই যুবক প্রণয়িণীকে ছাড়িয়া চলিয়াছে, না রেস্ জিতিয়া ফিরিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায়

নাই। পড়িতে পড়িতে সহজেই এ প্রশ্ন মনে জাগে, প্রেমে যাহার এমন তন্ময়তা যে নিজেকে গ্রহান্তরবাসী বলিয়া মনে করিতেছে, এমন কি প্রায় চলন্ত ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িয়া প্রেমাস্পদের কাছে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার পক্ষে এতক্ষণ ধরিয়া এমন অব্যাহতভাবে এত খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করা কি সম্ভব ? নিজে যে-ট্রেনে যাইতেছে সমস্ত পথ সে-ট্রেনের সব-ক'টি মানুষের প্রতিটি কথাবার্ত্তা সে ত অবহিত হইয়া শুনিলই, পাশ দিয়া যে-ট্রেনটি "চক্ষের নিমিষে দৃষ্টির বহির্ভূত" হইয়া গেল তাহারও কোন্ কক্ষে কে বিড়ি ধরাইল, কে ওষুদের-বিজ্ঞাপন পড়িতেছে, কেই বা নভেল পড়িতেছে তাহারও কিছুই তাহার চোখ এড়াইয়া গেল না। এমন কি নভেলটা যে ডিটেকৃটিভ্ নভেল তাহাও সে লক্ষ্য করিল!

পৃথিবীর যে-সুখদুঃখের সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা জন্মিলে অপরকে হাসাইবার এবং কাঁদাইবার ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জ্জন করা যায়, আলোচ্য বইখানি পড়িয়া মনে হইল না সে-সুখদুঃখ লেখককে কোথাও স্পর্শ করিয়াছে। কেবল যে হাসাইতে কাঁদাইতেই তিনি নারাজ তাহাও নহে, দুএকজায়গায় ছাড়া কোনো-একটি বিশেষ moodও তাঁহার লেখাতে কোথাও রূপ ধরিয়া ওঠে নাই। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যে আত্মহত্যার আয়োজন করিতেছে, সেও বেশ নির্ব্বিকারভাবে সব হিসাব খতাইয়া, গুছাইয়া, প্রতিটি খুঁটিনাটি চিন্তা করিয়া, তাহা করিতেছে। করিতে পারে না তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু সে করার মধ্যে কোনো রসের উপাদান নাই।

সমস্ত গল্পগুলির আলাদা করিয়া আলোচনার স্থান নাই। মোটামুটি ভাবে মনে হইল. লেখকের আসল যে দৃষ্টি তাহা সহানুভূতির দৃষ্টি নয়, সেইজন্যই তাহা পরিহাসের দৃষ্টিও নয়, তাহা শ্লেষের দৃষ্টি। অধিকাংশ চরিত্র লেখকের শ্লেষের ভাগ পাইবার প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে; কোথাও সে শ্লেষ প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকট; বাকী যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা সুন্দরী তরুণী। এইটুকু বলিলে বইটির মূলনিহিত design যাহা তাহাকে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াই উদ্ঘাটিত করা হইয়া যায়। একটি সুন্দরী তরুণী সম্বন্ধে মুগ্ধতা এবং পৃথিবীর বাকী প্রায় সমুদয় মনুষ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞা, এই টানা-পড়েনের সহায়তায় গল্পের জাল বোনা হইয়াছে।

কিন্তু গরীব গোবেচারি কেরাণীদের লইয়া শ্লেষ আর ভালো লাগে না, স্ত্রীজাতিকে লইয়া শ্লেষ ভালো লাগে না। পৃথিবীতে অপরাধের অভাব নাই, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই।

সাহিত্যে শ্লেষের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু বহুদর্শিতা না থাকিলে, জীবনের বিচিত্র বহুমুখীনতায় তাহার সমস্ত সম্পদ্ এবং নিঃস্বতার সঙ্গে মর্ম্মান্তিক পরিচয়ের যোগ স্থাপিত না হইলে শ্লেষকে রসবস্তু করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। শ্লেষের প্রয়োজনে যে শ্লেষ তাহা stale হইতে বাধ্য, যেমন বুদ্ধদেবের হইয়াছে। অবজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষায় জোর বাঁধে নাই। সহানুভূতির শ্যামলতার বুকে জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়া তাঁহার শ্লেষের হাসি কাগজের ফুলের হাসির মতো নিরর্থক হইয়াছে।

"দুঃখ" গল্পটি এই বইয়ে না ছাপিলেই ভালো হইত। এই গল্পটির treatment আলাদা, যদিও দুঃখবস্তু ইহার মধ্যে কোথাও রূপ ধরে নাই। এষ্টেটের রাণী গভীর

রাত্রিতে তৈল-সহযোগে কেশচর্য্যা করেন এবং এজন্য প্রতি রাত্রিতে একটি বালিকা দ্বাদশীর তলব হয়, কেমন গলাধঃকরণ যায় না। বুড়া দর্জি লটারীতে একশো টাকা জিতিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া কাঁদিতে চায় কাঁদুক, কিন্তু ছেঁড়া কোটের পকেট হইতে একতাড়া দশটাকার নোট বাহির করিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এটা বাড়াবাড়ি। তদুপরি গ্রন্থকারের narrator বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন, তিনি সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাধা দিতেও চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাধা দিবার সময় পাইলেন না। দশটাকার দশখানা নোট একসঙ্গে বা আলাদা করিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে একজন বুড়া দরজির কত সময় লাগিতে পারে লেখক তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। মূক-বধির কন্যার সিক্তবস্ত্রে বাড়ী ফিরিবার লজ্জায় মাথা খুঁড়িয়া কপাল রক্তাক্ত করা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক। দৈহিক লজ্জার এতখানি বোধ মূক-বধির কন্যার থাকে কি ?

"জ্বর" গল্পটিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব কিছু পরিচয় পাই, এবং ইহার শেষটুকু সুন্দর একটি মোচড় খাইয়া গল্প হইয়া উঠিয়াছে। "গৃহ" গল্পটিতে কল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, যদিও করুণ-কল্পনার পাশে পানের পিক্ খাপছাড়া লাগে। এই দুটি গল্প মোটের উপর ভালো লাগিয়াছে। "মেজাজ" নামক গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু সে-সংবাদ বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় না থাকিয়া বইয়ের ভূমিকায় কেন ? অনুবাদকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইবার অন্য অসংখ্য উপলক্ষ্য মিলিত।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কবিতে চাই। যে-সব ইংরেজী শব্দ বহুব্যবহারে রূপান্তরিত হইয়া বাংলা বনিয়া গিয়াছে, যেমন ষ্টেশন ষ্টোভ প্রভৃতি, সেগুলিকে স্‌টেশন, স্‌টোভ লিখিয়া কি লাভ হয় ? Phonetics-এর দোহাই মানিয়া স্‌টেশন না হয় বুঝিলাম, কিন্তু স্‌টেইট্‌স্‌ম্যান কেন ? রেইট্, ট্রেইন্, রেইস্, পেইজ্ যদি চলে, দক্ষিণীদের ব্‌রেট্‌চেড (wretched) চলিতেই বা দোষ কি ?

অচিন্ত্যকুমার পৃথিবীকে সুখদুঃখের রঙে রাঙাইয়া দেখিয়াছেন, এবং সেরঙ গভীরও বটে। কিন্তু বুঝিতে পারি দুঃখের কালো রঙটার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশি, এবং এজন্য যখন চতুর্দ্দিক্‌কার পরিচিত পৃথিবী হইতে মশলা আহরণ করিয়া তাঁহার কুলায় নাই, অবলীলায় তিনি নিছক কল্পনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। শ্লেষে তাঁহার রুচি নাই, কিন্তু বুদ্ধদেবের শ্লেষের মতো তাঁহারও প্রায় দুঃখের প্রয়োজনেই দুঃখ। রসসৃষ্টির খাতিরেও ইহার একটুখানি relief স্থানে স্থানে থাকা উচিত ছিল।

ইহা স্বীকার করিব, গল্প জমিয়াছে, গ্রন্থকার নিপুণহাতে কাঠামো গড়িয়াছেন। কিন্তু রঙের তুলি যখন বুলাইয়াছেন তখন অধিকাংশক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সৌকর্য্য রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে এই দোষ হইয়াছে যে, হৃদয়কে অত্যন্ত গভীর করিয়া আলোড়িত করিবাব সমস্ত আয়োজন হাতে লইয়াও লেখক হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই পীড়ার্ত্তা বিভাকে তাহার স্বামী বিমল সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতেছে দেখিয়াও মনটা কিছুমাত্র সাড়া দেয় না। ভুলিতে পারা যায় না যে, অচিন্ত্যকুমার গল্প বলিতেছেন। কেরাণীর জীবন নিছক দুঃখের নয়, একথা জোরের সঙ্গে মনে পড়িয়া যায়, যখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিস্‌গুলিকে লেখক অন্ধকূপ, অন্ধকার খুপ্‌রি ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন দেখিতে পাই।

স্ত্রীহত্যার পাতক চিন্তার ক্ষেত্রে কোনও স্বামী কখনও করে না, তাহা না হইতেও পারে। কিন্তু গ্রন্থকারের পরিচিত কাছাকাছি বাহিরের জগতে স্ত্রীহন্তা বিমল নাই ;—খুনের চিন্তা যাহারা করে তাহাদের দিয়া এত সহজে যদি খুন করানো যাইত তাহা হইলে পৃথিবীর এই নশ্বর চেহারা থাকিত না। বিমল স্ত্রীকে হত্যা করিল ইহা কেবলমাত্র যে আমাদের ধারণায় আসে না তাহা নহে, গ্রন্থকারের নিজেরও ধারণায় আসে নাই। তাই দেখিতে পাই, জল হইতে বিমল উঠিয়া আসিলে তীরবর্ত্তী সনাতন যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় ?"—বিমল হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল ইহা বলিয়াই তিনি গল্প শেষ করিয়াছেন। সত্যকারের খুনের গল্প এত সহজে শেষ হয় না। সত্যকারের সনাতনরা খুনে-বাবুকে জড়াইয়া ধরে, ডাক-হাঁক করে, জলে ঝাঁপ দেয়। যথারীতি কুরুক্ষেত্র বাধায়।

অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত, এই দুইটি জিনিসের ব্যবহার অচিন্ত্যকুমার প্রায় সর্ব্বত্রই একটু বেশি করিয়াছেন। চারিটি গল্পের দুইটিতে দুইটি ছেলে ছাত হইতে পড়িয়া মারা গেল, দেখিয়া এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় যে জীবনে tragedy-র অভিজ্ঞতার পুঁজি সত্যই অচিন্ত্যকুমারের খুব পর্য্যাপ্ত নয়। Effect সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে জোর করিয়া tragedy গড়িয়াছেন, তাহাতে তত আপত্তি নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র এই effect-এর প্রতি অনুরাগ অনেক স্থলে উগ্র আত্মপরায়ণতার রূপ লইয়াছে। ভাষায় অস্বাভাবিকতা আনিয়াছে। সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই অত্যন্ত ক্লেভার হইয়া উঠিবার চেষ্টায় অচিন্ত্যকুমারের মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইয়া কথা কহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র pun করে, সুন্দর উপমাবহুল ভাষা প্রয়োগ করে, প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের অনুপ্রাসের প্রতি অনুরক্তি।

নয়ত গল্প কাহাকে বলে লেখক তাহা বোঝেন। সে-পরিচয় তাঁহার শেষ গল্প "ইতি"-তে পাই। যদিও মফঃস্বলের উকিল বগলাবাবু বলেন, "এখানে বনের মশা আছে থাক্, বিলাসের মশাল চাইনে, অভিনয় আমরা চাই বটে কিন্তু অবিনয় নয়", তথাপি এই সমস্ত ছোটখাট মুদ্রাদোষ কাটাইয়া উঠিতে লেখকের বেশি সময় লাগে নাই। সত্যকারের সৃষ্টির তাগিদ্ বেগবান্ নদীস্রোতের মতো তাঁহাকে তাঁহার নিজের কাছ হইতে টানিয়া ছিনাইয়া চিরন্তন রসতীর্থের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অতি গভীর সহানুভূতি এবং সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি হইতে সরলা-চরিত্র আঁকা হইয়াছে, গোড়ার দিকে দু'একবার চেষ্টা করিয়াও সে অচিন্ত্যকুমারের মতো হইয়া পড়িতে পারে নাই।

ইহাছাড়া অন্যত্রও রস জমিয়াছে। যেখানেই অচিন্ত্যকুমার নিজেকে ভুলিয়াছেন, যেখানেই ভাষার রাশে একটু আল্‌গা দিয়াছেন, যেখানেই চেষ্টা করিয়া সবকিছুকে ক্লেভার করিয়া তুলিবার কথা তাঁহার মনে থাকে নাই, সেখানেই তাঁহার মধ্যেকার দরদী রূপকার ছাড়া পাইয়াছে। কোনো চরিত্রকে যখন উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই অবকাশে তখন সে পরিপূর্ণ মানুষ হইয়াছে। যেমন 'ধন্বন্তরি' গল্পের রমা, 'দিনের পর দিন' গল্পের সুধীর।

ভাষা সম্বন্ধেও ঐ কথা। সবরকম সুরে তাহা বাজে। প্রকাশভঙ্গীর একটি বিশেষ জোর মনকে সর্ব্বদা সজাগ করিয়া রাখে। কিন্তু বিধিদত্ত স্বভাবজ ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিচয় এখানেও পদে পদে। ক্লেশ হয়, ভাবি, একটা তুচ্ছ অনুপ্রাস, তাহার মূল্য এত, যাহার জন্যে উন্মুখ চিন্তাধারার ঘাড় ফিরাইয়া বারম্বার তাহাকে অপথে-বিপথে লইয়া যাইতে হইবে ?

•

•

আশা করি এই phase-টা কাটিয়া যাইবে, অচিন্ত্যকুমার একদা এই-সমস্ত তুচ্ছ প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিবেন।

জীবনের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় সহজ পরিচয়। তাঁহার দৃষ্টি কোনও একদেশদর্শিতার দ্বারা ব্যাহত নহে। জীবনকে তাহার বহুবিচিত্রতায় বিচিত্রভাবে আস্বাদ করিবার ক্ষমতা এবং সাধনা এই লেখকের আছে বলিয়া মনে হইল। বিষয়-নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্যে, পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র সমাবেশে, ইহার পরিচয় পাই। লেখকের দৃষ্টি আন্তরিকতার দৃষ্টি বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সহজেই স্বতন্ত্র সত্তা অর্জ্জন করিয়াছে।

বর্ণনায় অতিশয়তা নাই, ভাষা নিরাড়ম্বর কিন্তু নির্দ্দোষ। সেই কারণে তাঁহার লেখা সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। রসবোধকে বৃথা প্রলোভনে বিপথেও লইয়া যায় না, তার ন্যায্য পাওনা হইতে তাহাকে বঞ্চিতও করে না।

যে-রঙ দিয়া তিনি ছবি আঁকেন তাহা জীবনেরই রঙ, জীবন্ত। তাই তাঁহার গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয় সত্যই সাগরসঙ্গমে চলিয়াছি। প্রকাণ্ড জরাজীর্ণ রহস্য-সমাকুল সাতমহলা বাড়ীটাকে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। অখিলের সঙ্গে তাহার মেসের বাড়ীটাতে কবে যেন থাকিয়া আসিয়াছি, রাঁধুনী বামুনটার নামটাই কেবল মনে নাই। 'পোণাঘাট পেরিয়ে' ছোট গল্প, কিন্তু চরিত্রসংখ্যা বহু। আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে ঐটুকু পরিসরের মধ্যে সব-ক'টি চরিত্রকে তিনি সমগ্রতা দান করিয়াছেন।

জীবনকে অন্তরঙ্গতার রূপ দিতে প্রেমেন্দ্রবাবুকে সব-চেয়ে বেশী সাহায্য করে তাঁহার dialogues। যাহার মুখে যেমন কথাটি মানায় ঠিক তেমনটি আরোপ করিবার ক্ষমতায় প্রেমেন্দ্রবাবুর সমকক্ষ লেখক খুব বেশি নাই। ব্যারিষ্টার সুবিকাশ হইতে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান জীমূৎ পর্য্যন্ত সকলের বাক্যালাপ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তাহাই। একেবারে নিখুঁৎ সুন্দর।

কিন্তু এত সত্যনিষ্ঠা সত্ত্বেও লেখক অপ্রাকৃতের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্লট গড়িতে হইয়াছে, যেখানে নিজে হইতে জোড় লাগে নাই বা জোড় দিতে পারেন নাই, সেখানে প্রায় অবলীলায় অস্বাভাবিকতার শরণ লইয়াছেন। "সাগর-সঙ্গমে"র মতো এত সুন্দর গল্পের সমস্ত ভিত্তিটাই কাঁচা। দাক্ষায়ণীর মতো মানুষ, যত বড় ডাকসাইটে তেজী এবং নিষ্ঠাবতীই হউক, আটবছরের মেয়ে বাতাসীকে অজ্ঞাতকুলশীলা এবং অস্পৃশ্যা বলিয়া নদীবক্ষে তাহার শেষ আশ্রয় হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে না। গল্পটির ভবিষ্যৎ পরিণতির দিক্ দিয়া এই ধরণের অপরাধের হয়ত প্রায়োজন ছিল, কিন্তু তাহা হইলে অপরাধকারিণীকে পূর্ব্ব হইতেই অন্য ধাতুতে গড়িয়া তোলা উচিত ছিল। "হয়ত" গল্পে কল্পনা ছাড়া পাইয়াছে, প্রতিপদে ঔৎসুক্য জাগায়, বেশ একটি নূতন ধরণ, কিন্তু যে-ঘটনায় কল্পনার নিষিদ্ধ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল সেইটাই অত্যন্ত বেশি খাপছাড়া কাল্পনিক হওয়াতে contrast মারা পড়িয়াছে। লাবণ্য ঝড়ের রাত্রে নদীর উপরকার পুল হইতে পড়িয়া গিয়াও পড়িল না, প্রথমতঃ তাহার শাড়ীর প্রান্ত আট্‌কাইল একটা বল্টুতে, তারপর সে নিজে আট্‌কাইল তাহার শাড়ীতে। শাড়ীটা সে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিল পাছে কেহ তাহা মনে করে, এজন্য বলা হইয়াছে, সে নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতেছিল। অনেক চেষ্টা করিলে, অনেক যুক্তিতর্ক ব্যয় করিলে এরূপ একটা ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করা যে যায় না তাহা নহে, কিন্তু

গল্প করিতে বসিয়া তর্কের অবকাশ দিলে রসভঙ্গ হয়। "সংক্রান্তি" গল্পে মেস ভালো লাগিয়াছে, কিন্তু অখিলের কথা যতটুকু পাই তাহাতে মনে হয়, পাশের বাড়ীর একটি অপরিচিতা মেয়ের দিকে একবার মাত্র তাকানোর অপরাধ জানাজানি হওয়ার ভয়ে সে আফিং সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিল। "দিবাস্বপ্ন" গল্পে ব্যারিষ্টার সুবিকাশ বাড়ীর ঝির গাল টিপিতেছে।—কালা বাঙালীর দেশে ইহা নানাকারণে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, প্রেমেন্দ্রবাবু ব্যারিষ্টার আঁকিতে গিয়া মুহূর্ত্তের ভুলে খাসবিলাতী এরিষ্টক্র্যাট আঁকিয়া ফেলিয়াছেন, অন্ততঃ ঝিটি বিলাতের আমদানী। প্রিসিলার দোষের মধ্যে সে বলিয়াছিল, "আমাদের পৃথিবীতে সবুজের বদলে বিধাতা অন্য একটা রঙ choice কর্‌লে কি বিপদ্ হত বল ত?" ইহাকে রমেশের মনে হইল নিছক ন্যাকামী। বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী অনুপমাকে ভাঁড়ারের পাশে ডিবিয়ার আলোয় কয়লা ভাঙিতে দেখিয়া তাহার যখন মনে হইল, এইত চিরন্তনী নারী, তখন তাহা ন্যাকামী হইল না। হয়ত হয় নাই, কিন্তু তাহার এই তুলনামূলক সিদ্ধান্তটা কেমন যেন নিজের জোরে দাঁড়ায় নাই, প্রেমেন্দ্রবাবু তাহাকে কথার বুকনির ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।

কিন্তু সব জড়াইয়া বইখানি সুখপাঠ্য। সুস্থ সুন্দর রচনা।

বধূবরণ বইখানি ভালো হইয়াছে। ছোট-খাট চিন্তা, ছোট-খাট সুখদুঃখ, ছোট-খাট কথা, কিন্তু উপলব্ধির একটি অপরিমেয়ত্ব হইতে গল্পগুলির জন্ম হইয়াছে।

জীবনের সঙ্গে গ্রন্থকারের যতটুকু পরিচয় তাহা নিগূঢ় ঐকান্তিক পরিচয়, সেইসঙ্গে সত্যকারের রসবোধ এবং রূপদৃষ্টি তাঁহার স্বভাবজ। এ-সমস্তই এই বইটিতে একটি আশ্চর্য্য সংযমের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশের এই সংযম, এই সমাহিত ভঙ্গী, গভীর শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

কোথাও অবান্তর একটি কথা বলা হয় নাই, অবান্তর একটি ঘটনার বিন্যাস করা হয় নাই; সব মিলিয়া কড়া পাকের সন্দেশের মতো জমজমাট। একটি কথার ইঙ্গিত কতখানি যে বলিবার ক্ষমতা রাখে, শৈলজানন্দের লেখায় বারম্বার তাহার পরিচয় পাইতেছি। সৃষ্টির মধ্যে শৈলজানন্দের আত্মবিস্মৃতি পরিপূর্ণ; নিজের রসের ভিয়ানের গভীর তলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া থাকিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। একটু মাথা তুলিয়া কবিত্ব করিবার অবকাশও তাঁহার নাই, আসর জমাইয়া বক্তৃতা করা ত দূরের কথা।

প্রত্যেকটি চরিত্র পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তাহাদের পরস্পরের ভাষা কেবল নয়, পরস্পরের চিন্তাধারা, পরস্পরের উপলব্ধি পরস্পর হইতে আলাদা। "চক্ষুদান" গল্পে বিপিনের চরিত্র ওস্তাদ কারিগরের সৃষ্টি।

ঘটনা-বিন্যাসের কারিকুরি নাই, কিন্তু ছোট গল্পের প্রাণ স্বরূপ যে প্লট তাহাকে লেখক কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। "ভঙ্গুর" ভিন্ন বাকী গল্পগুলি নিছক গল্প হিসাবেও জমিয়াছে।

"বধূবরণ" গল্পটি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিবার মতো, আগাগোড়া entertaining। ভালোমন্দ, সাধারণ-অসাধারণ সমস্ত চরিত্রগুলি পরিচয়মাত্রে মনোহরণ করে। কিন্তু সুরুতে এবং শেষে রসের balance থাকে নাই। গোড়ার দিকে এত বেশী sex appeal-এর উপর নির্ভর করার দরুণ, শেষের দিক্‌টা ফিকা হইয়া গিয়াছে।

ননীমাধবের সুদূর কৈশোর-জীবনের পাপ অলক্ষ্যে তাহার জন্য গৌরীর স্নেহলোক হইতে নির্ব্বাসনের শাস্তি বহন করিয়া আনিল, এই theme-টি চমৎকার। কিন্তু jealousy-র যতটা কারণ ঘটিয়াছিল তাহাতে গৌরীর প্রতি তাহার শেষ নিষ্ঠুরতাটা খুব সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গোড়া হইতে তাহাকে যেভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, তারপর দীর্ঘদিনের অপরিচয়ের অবকাশে যতটা পরিবর্ত্তন-সম্ভাবনার স্থান হয় তাহাতেও এই নিষ্ঠুরতাকে মনটা গ্রহণ করে না। চলন্ত ট্রেনে চুরি করিয়া যে হাত পাকাইয়াছে, শ্বশুরালয় হইতে স্ত্রীর গহনার বাক্স লইয়া বেমালুম উবিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইত না, সুতরাং ননীমাধবকে দিয়া চুরি করানোটা গ্রন্থকারের আসল উদ্দেশ্য নয় তাহা বুঝি, যদিও চুরি না করিয়া চলিয়া গেলেও চরিত্র-চিত্রণে ভুল হইত। বারম্বার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গৌরীকে তাহার স্বদেশের কাছাকাছি কোথাও ছাড়িয়া না গিয়া, দূরদেশে প্রায় জনহীন নৈশ প্রান্তরে সে যে পরিত্যাগ করিয়া গেল, ইহাতেই কি তাহার চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে? এমন অকারণ নির্ম্মমতা যে করিতে পারে, কৃতকর্ম্মের জন্য এত শীঘ্র কি আবার তার অনুশোচনা জাগে? আমার মনে হয়, পথে-পরিত্যাগের অধ্যায়টিকে ঔৎসুক্য জাগাইয়া রাখিবার লোভে গ্রন্থকার টানিয়া বুনিয়াছেন। তাঁহার মতো শক্তিমানের পক্ষে এ লোভ অনাবশ্যক এবং অশোভন।

"অতি ঘরন্তী না পায় ঘর" গল্পটিরও মাঝের দিক্‌টা কেমন এলাইয়া গিয়াছে। পুতুল লইয়া সুষমার বাড়াবাড়িটা একটু অত্যধিক হয় নাই কি? ধরিলাম না-হয় তাহার মাথা সত্যসত্যই এতটা খারাপ হইয়াছিল যে, দিনের পর দিন পুতুলকে খোকা কল্পনা করিয়া, তাহা লইয়া অনর্গল কথা বলিয়া তাহার চলিত। কিন্তু প্রকৃতিস্থ কোনও স্বামী সে-অবস্থায় তাহার পাগ্‌লামির এতটা প্রশ্রয় দিত না। অন্ততঃ এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক হইলেও অবস্থাটাকে অত্যধিক করুণ করিবার জন্য এতখানি ফলাও করা কর্ত্তব্য হয় নাই, ইহাতে রসের দানা বাঁধিতে বাঁধিতে ছাড়িয়া গিয়াছে। শেষের দিকে সুষমা আত্ম-ঘাতিনী হইলে জানা গেল তাহার সঙ্গে আরও একটি প্রাণীর অনারব্ধ জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। এই অবধি হইয়া থামিলে কোনো গোল ছিল না, কিন্তু কি অশুভ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শৈলজানন্দ সেই হতভাগ্যের পশ্চাতে একছত্র একটা বর্ণনা জুড়িয়া দিয়াছেন। রসশাস্ত্রের বিধানে বীভৎসতাও রস, সেকথা না-হয় না-ই তুলিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমানার বাহিরে ঐটুকু পা বাড়াইবার ফল কি যে ভীষণ মারাত্মক হইয়াছে, লেখক তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। বর্ণনা হইতে মনে হয়, বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ যে কাটিয়া গিয়াছে ইহা উপলব্ধি করিবার প্রচুর অবকাশ সুষমার জুটিয়াছিল, এবং ফলে এত সুন্দর গল্পটির ভিত্তির মাটিই খসিয়া যায়, যাহা কিছু লইয়া হৃদয়ের শিরায় টান পড়িতেছিল তাহার কিছুরই আর কোনো অর্থ থাকে না।

"চক্ষুদান" গল্পে বিপিন লাথি মারিয়া প্রতিমা ভাঙিতেছে, ইহা অসম্ভব কেবল নয়, অকল্পনীয়। দেব-বিগ্রহ সম্বন্ধে হিন্দুর বহু পুরুষ-পরম্পরায় অর্জ্জিত ভয়-ভক্তির সংস্কার পা তুলিবার কথাই তাহাকে মনে পড়িতে দিত না, হাত তুলিতেও দিত কিনা সন্দেহ। এই একটুখানি দোষ বাদ দিলে গল্পটি আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য। "মৃত্যুভয়" এবং "জনি ও টনি" দুটি গল্পই নিখুঁত নিটোল রসসৃষ্টি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

Parade of the Living—J. H. BRADLEY, (Routledge).

উনিশ শ' খৃষ্টাব্দের আরম্ভে ইউরোপে যখন যন্ত্রশিল্পের রাজ্য সুরু হয় ও সেখানকার লোকেরা পৃথিবীর অন্য জাতিদের জয় করিয়া নিজেদের সাচ্ছল্য বাড়াইবার ব্যবস্থা করেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের জাতি সেদিন যেখানে পৌছিয়াছিল, পূর্ব্বে কখনও কেহ সেখানে যাইতে পারে নাই, এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের এ শ্রেষ্ঠতা অটুট থাকিবে। এ মনোভাবের ছাপ, ঐ আমলের বিজ্ঞানের কল্পনা-জল্পনাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একশত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, এবং বিজ্ঞানের পুরাতন যুগের অবসান ও নূতন ঊষার সন্ধিক্ষণে চিন্তার অবসর পাইয়া, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ও জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠতার অনিত্যতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছেন। জীবরাজ্যে নিজেদের জাতির ও সভ্যতার উচ্চ স্থানসম্বন্ধে শেষপর্য্যন্ত যে অভিমান অবশিষ্ট ছিল, বিগত মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে নিজেদের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া, পশ্চিম-ইউরোপের জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকের মনে তাহা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। ফলে তাঁহারা জীবনের নিত্য স্রোতে মানুষের স্থান ও তাহার ভবিষ্যৎ এ-সম্বন্ধে, নূতন করিয়া, বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেন। অধ্যাপক ব্রাড্‌লির লেখা বইখানি এইরূপ সঙ্কল্পের ফলেই রচিত হইয়াছে।

কোন সুদূর যুগে, বিমানবিহারিণী কাহার আকর্ষণে সূর্য্যদেব বিশাল বাহু মেলিয়া আকাশরাজ্যে সৃষ্টির অগ্নিময়ধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন;—তাহার পর খণ্ডগ্রহের সংঘাত ও মিলনে কি করিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটিল; ও ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি আমাদের জ্ঞাতরূপে ধরিত্রীবক্ষে স্ফুরিত হইল,—শাস্ত্রকার মহাশয় প্রথমে তাহারই কাহিনী দিয়াছেন; ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য কোন্ যোগসূত্রে গাঁথা, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মানুষ আহার ও জীবনধারণ করে, আশপাশের জীব ও উদ্ভিদের খরচায়; প্রাণীমাত্রেই নিজেকে রক্ষা করে, অন্যকে গ্রাস করিয়া। দীপের আলোক উজ্জ্বল হয় ও জ্বলিতে থাকে, আশপাশের হাওয়া হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া। জীব ও উদ্ভিদের অণু (cell) গুলি বড় হয়, বিশেষ বিশেষ রূপ ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া। কোনো কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, এইসকল রূপের ও ক্রিয়ার হুবহু নকল দেখা যায়। অতএব চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিককে ভাবিতেই হয়, তাহা হইলে জীব ও জড়ের পার্থক্য কোথায়? সে সীমারেখা প্রগতির পথে কোথায়ও টানা যায় কি? পৃথিবীর প্রাচীন শিলালিপি পাঠ করিবার প্রয়াসে এমনই আরও অনেক কথা মনে উঠিতে থাকে; ও কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। বহু শিল্পীর বহু যত্নফলে বহু ফলকের অনেক অংশই উদ্ধৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ফিরিয়া পাইবার নয়, তাহার পরিমাণ অনেক বেশি। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক ব্রাড্‌লি দিয়াছেন; অন্যত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

* * * * *

দুর্ব্বলচিত্ত, মেরুদণ্ডহীন-অপবাদগ্রস্ত লোকে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পায় না; কিন্তু বিশকোটী বৎসর পূর্ব্বে মেরুদণ্ডহীন ত্রিলম্বীই (trilobite) ছিল সাগরের সম্রাট

অস্থিসম্বলিত দেহসম্পন্ন জীব তখনও জন্মায় নাই ; এবং যখন জন্মাইল, তখন তাহারা সম্ভবতঃ ভয়ে ভয়ে পরাক্রান্ত অস্থিশূন্য জীবেদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া কোনোরূপে নিজেদের বংশরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এমন একদিন আসিল, যখন সে-আমলের ছোট লোকেরাই সাগর জয় করিল, ও পরিশেষে স্থলচরের সৃষ্টি সম্ভব হইল।

জলচর হইতে স্থলচর, ও জল ও স্থল উভয়চর কি করিয়া উৎপন্ন হইল ; তাহাদের কোন্ বংশ কিরূপে অতিকায় হইয়া পৃথিবীর বিভিন্নযুগে সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল ; ও পরিশেষে, নূতনের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া কালের স্রোতে লুপ্ত হইয়া গেল—এই ইতিহাস পড়িতে পড়িতে বারবারই দেখা যায় যে, আয়েস ও আরামে কেহ বড় হয় নাই। ঝঞ্ঝা ও মৃত্যুর ভিতর দিয়াই নূতনের সৃষ্টি হইয়াছে ; ও যখনই জীব সাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিত্য মনে করিয়া, তাহার সহিত নিজের দেহ ও জীবনের স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, তখনই রুদ্র প্রলয়ে সে-মিলন ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে। শুধু তাহারাই যুগে যুগে বাঁচিতে পারিয়াছে, যাহারা নিত্য দুঃখের মধ্যে থাকিয়া দুঃখকেই বরণ করিয়া লইয়াছে ; কোনও আশ্রয়বিশেষকে সর্ব্বস্ব করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করে নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া বাঁচিবার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম পরিত্যাগ করে নাই।

এমনই কোনও ধারাবাহিক বংশানুক্রমে উৎপন্ন অর্দ্ধ মানব এসিয়ার মরুরাজ্যে আসিয়া বৃক্ষগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ হইবার পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছিল। পৃথিবীর রাজত্ব ছিল তখন নখদন্তী হিংস্র জীবেদের। অস্ত্র হিসাবে, ইহাদের তুলনায় অর্দ্ধ মানবের কিছুই ছিল না ; আত্মরক্ষার উপায় ছিল, শুধু বুদ্ধিবৃত্তির আধারে। তাহারই সাহায্যে মানুষ আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। কিন্তু এ রাজ্য কতকালের জন্য, তাহা ভাবিবার বিষয়। মানব অধিকারের যে-যুগে যখনই যে-জাতি বড় হইয়াছে, তাহারা মনে করিয়াছে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বুঝি তাহারাই ; অন্য কেহ কখনও তাহাদের সমকক্ষ হয় নাই, ও হইবে না। তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষয় হইবে।

আজিকার মানুষও এই কথাই ভাবিয়া থাকে। কিন্তু সে ভুলিয়া যায় যে, তাহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের বেশীর ভাগই তাহার পূর্ব্বতন জনকদের পুরাতন সংস্কার হইতে প্রসূত। তাহার মেরুদণ্ডের, স্নায়ুগ্রন্থির ও মগজের বেশীর ভাগ অংশই, বহুকোটী বৎসর ধরিয়া প্রাচীন জীবের প্রাচীন স্নায়ুযন্ত্রে ধাপের পর ধাপ উঠিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিম যুগের আদিম ভাব তাহার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে।

তাই বলিয়া প্রকৃতই কি মানুষ ও পশুতে কোনও প্রভেদ নাই ? পশুর মত বাস্তবিক, আমরাও আহার সংগ্রহ করিবার জন্য অপরকে ও পরস্পরকে ধ্বংস করি ; দেহ পূর্ণ হইলে আমরাও যৌবনের আহ্বানে তাহাদেরই মত মিলনের সাড়া দিতে উদ্যত হই ; ভবিষ্যতে কি হইবে বিশেষ ভাবি না—। কিন্তু পার্থক্য এইখানেই ; ভবিষ্যতের কথা কিছু কিছু ভাবিতে আমরা শিখিয়াছি।

সত্য বটে, এ চিন্তা যাহারা করে ; অযথা বংশবৃদ্ধির বিপদ যাহারা নিবারণ করিতে চায় ; স্বজাতীয়ের অকালমরণ ও শক্তির অপচয় বন্ধ করিবার কথা যাহারা ভাবে, সংখ্যায় তাহারা অল্প। কিন্তু ইহারাই একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে বলিয়া আশা রাখিবার কারণ, যথেষ্ট না হইলেও, আছে। সভ্যদেশমাত্রেই মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, ও শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রচার সেই ভবিষ্যতেরই পূর্ব্বাভাস দিয়া থাকে।

কিন্তু সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের মূল প্রকৃতি কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়? অধ্যাপক মহাশয় মনে করেন যে, যতদিন মানুষের দেহে, দৈহিক মিলনের আনন্দকামনার রাজ্য অটুট রহিবে, ততদিন মানুষ তাহার জ্ঞানবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অভিসারের পথে চলিবে না। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিলে কামনার স্রোত নিতান্তই প্রাচীন পথে দেহের দ্বারে ঢালিয়া না দিয়া, অন্তরে রসসৃষ্টির পথে প্রেরণ করিতে পারে। মানুষের ভবিষ্যতের ভরসা সেইখানেই। যতদিন না সেই সুদূর ভবিষ্যৎ আসিয়া পৌঁছায়, —যখন বেশীর ভাগ মানুষ এই পথে চলিবে—ততদিন আমাদিগকে সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ সম্বল করিয়া, নিজের ও পরস্পরের হাতে ধ্বংস হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই অধ্যাপক ব্রাড্লীর শেষ কথা।

যৌনমিলনেব আনন্দই সৃষ্টির আনন্দ। নব জীব সৃজন না করিয়া আমরা আনন্দের সন্ধানে, চিরপুরাতন পথে যদি শুধু দৈহিক অপচয়ই করি; নূতনের উদ্দেশে যদি সৃষ্টিব ধারা ভিন্ন পথে প্রেরণ না করি; তাহা হইলে আমাদের শক্তি কোনও দিন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। যে জাতি বা জীবশ্রেণী এ বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিয়া পূর্ণতা অর্জ্জন করিবে, তাহারা যে আমাদিগকে প্রগতির পথে পিছনে ফেলিয়া ভবিষ্যতের রাজটীকা লাভ করিবে, একথা নিঃসন্দেহ। সে পূর্ণতা অর্জ্জন করিতে হইলে মানুষকে তাহার সৃষ্টি-শক্তির ও বুদ্ধির সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়সাধ্য কর্ম্মের সংযোগ সাধন করিতে হইবে; তবেই তাহার সমস্ত অঙ্গের প্রকৃত সমন্বয় ঘটিবে, ও নবীন সৃষ্টির পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে। তাহা হইলে অসামঞ্জস্য ও প্রাচীনতার বার্দ্ধক্যহেতু অন্য জীবের ন্যায়, মানবজাতির মৃত্যু হইবে না। এ সর্ব্বাঙ্গযোগ মানুষের শক্তির মধ্যেই; এ বিষয় লইয়া যুগে যুগে, কেহ না কেহ সাধনা করিয়াছে; ও নিজের উক্তিতে ও জীবনে ইহার সার্থকতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু অন্য জীবের ন্যায় মানুষ আয়েসপ্রিয়; বহু পরিশ্রম ও সাধনা করিয়া অন্তরে নিত্য আনন্দলাভের অপেক্ষা, জ্ঞাত, সহজপ্রাপ্য, ক্ষণিক তৃপ্তিকেই বড় করিয়া দেখে। ভুলিয়া যায়, যে সে-আনন্দের পথের সীমায় নূতনের সন্ধান পাওয়া যায় না; ও নবীনতার সৃষ্টি না হইলে, জীবনের অবসান কেহ রোধ করিতে পারে না। অতএব সুখই যদি ভবিষ্যৎ মানুষের একমাত্র কাম্য হয়; বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ও অতিকায় উৎকর্ষ শুধু সেই দিকেই ঘটে; মানুষ ও মানুষের এবং জীব ও মানুষের দ্বন্দ্ব যদি কেবল বাড়িয়াই যায়; মানুষ যদি বিশ্বসৃষ্টির যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াও, নিজেকে তাহাতে যুক্ত করিতে না চায়; শুধু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে চলিতে থাকে; তাহা হইলে মানুষের সাম্রাজ্য একদিন শেষ হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে অন্য কোনও জাতির প্রত্নতত্ত্ববিদের কৌতূহল তৃপ্ত করিবে মাত্র। এ মরণ হইতে রক্ষার পথ,—কামান, গোলা, বন্দুক, সঙ্গীন, অথবা তীব্র গতিশীল ব্যোমযান নহে; সংসারের বিপদরাশি হইতে পলায়ন করিয়া নিভৃত বিহারও নহে। পৃথিবীর অতীত যুগে বহু জাতিই এই দুই পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বিশাল কলেবর সম্রাট টিরানোসোরাস ও জাইগাণ্টোসোরাস, বর্ম্মাবৃত এঙ্কাইলো-সোরাস ও ট্রিকেরাটপ্স্, ও অনুরূপ জলচর ও খেচররাজেরা বহুকাল হইতে শুধু কঙ্কাল সাক্ষ্যই রাখিয়াছে। আমাদের ভাগেও এই পরিণাম ঘটিবে কি না, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ পথের উপরেই নির্ভর করে।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নানা চর্চ্চা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, প্রকাশক কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা, দাম দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এ বইয়ে তাঁর লিখিত চোদ্দটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। প্রবন্ধগুলির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই কতকটা পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এখন এ প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে একসঙ্গে পেয়ে এ'দের ভিতর যে যোগাযোগ আছে তা' আরও স্পষ্টভাবে ধরতে পারবেন। প্রমথবাবুর উৎসুক দৃষ্টি যে কত বিভিন্ন বিষয়ে নিবদ্ধ হয় তা'ও বুঝতে পারবেন।

এ বইয়ে এত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে তা'র একত্র সমালোচনা করা শক্ত। প্রথম দু'টী ও শেষের পাঁচটী বাদ দিলে বাকীগুলি সবই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। সেগুলি আবার কোন বিশেষ যুগের ইতিহাস নয়, তা'দের ভিতর ভারতের ইতিহাসের প্রায় সব যুগের কথাই কিছু না কিছু আছে। প্রাচীন যুগ অবলম্বনে তিনটী প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। প্রথমটী "মহাভারত ও গীতা"। এ প্রবন্ধে প্রমথবাবু গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কিনা তাই বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তা'র পূর্ব্বে তিনি আলোচনা করেছেন সম্পূর্ণ মহাভারত এক হাতের রচনা কিনা। গীতা প্রক্ষিপ্ত কিনা সে সমস্যার সমাধান এ প্রবন্ধে না করা হ'লেও মহাভারত এক হাতের রচনা কিনা সে প্রশ্নের উত্তর প্রমথবাবু দিয়েছেন। সে উত্তর বেশি সহজ ব'লে আমাদের মনঃপূত না হ'লেও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, মহাভারত গোড়ায় ছিল কাব্য, আর নীলকণ্ঠের নজীর তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, সে কাব্যের নাম ছিল জয়কাব্য। "এ কাব্যে ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা। সুতরাং যুদ্ধজয়ের পরবর্ত্তী কোন বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধপ্রধান গ্রন্থ, এবং ও কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা' শেষ হয়েছে সৌপ্তিক পর্ব্বে।" প্রমথবাবুর মতে স্ত্রীপর্ব্বকেও আদি মহাভারতের অঙ্গীভূত ব'লে স্বীকার করা যায়; কারণ "গান্ধারীর বিলাপ না থাকলে ভারতকাব্যের অঙ্গহানি হয়।" "কাব্যকে আমরা ফুল বলি, আদিপর্ব্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব্ব হচ্ছে—প্রসূন, আর শান্তিপর্ব্ব—মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয় তখন তা' কাব্যের বহির্ভূত হ'য়ে পড়ে।" এই হিসাবেই প্রমথবাবু মনে করেন যে, শান্তিপর্ব্ব থেকে সুরু ক'রে বাকী মহাভারত আদি ভারতকাব্যের বহির্ভূত, আদিপর্ব্বও তাই। কারণ এগুলি ভারতকাব্যের ক্রম পর্য্যায়ে পড়ে না। মহাভারত যে এক হাতের রচনা একথা বেশিরভাগ পণ্ডিতেরাই বলেন না, আর তাঁদের কেহ কেহ মনে করেন যে, বিভিন্ন যুগে রচিত ভারত ও মহাভারত নামক দুই কাব্যের মিশ্রণে মহাভারতের উৎপত্তি। আদি ভারতকাব্য কি ছিল তা' নির্দ্ধারণ করবার জন্য নানা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে কেহই পৌঁছুতে পারেন নি। এ অবস্থায় প্রমথবাবুও একটী নূতন মত প্রকাশ ক'রে কিছু অন্যায় করেন নি। আদি ভারত যে কাব্য ছিল সে বিষয়ে সকলেই একমত। তবে প্রমথবাবুর মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠ্‌তে পারে সেই ভারতকাব্যের রূপ নিয়ে। পাণ্ডবদের যদি সে ভারতকাব্যের প্রধান নায়ক ধ'রে নেওয়া যায় তবে সে কাব্যের পরিসমাপ্তি যুদ্ধজয়ে কেন স্বর্গারোহণেও ধরা যেতে পারে।

প্রাচীনযুগ অবলম্বন করে প্রমথবাবুর আর দু'টী প্রবন্ধ হচ্ছে "বৌদ্ধধর্ম্ম" ও

"হর্ষ চরিত"। 'বৌদ্ধধর্ম্ম' প্রবন্ধ প্রথমে ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে প্রমথবাবু সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সাম্‌নে ধ'রে দিয়েছেন ও সে ধর্ম্ম ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে কোন স্থান অধিকার করে তা' আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। "মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মের রূপান্তর বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যু হয় নি। ও-ধর্ম্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ ক'রে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছে।" প্রমথবাবুর এ কথা যে আনুবর্ণিকভাবে সত্য তা'তে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা গভীরভাবে করলেই এ সত্য উপলব্ধি করা যায়। 'হর্ষচরিত' প্রবন্ধে প্রমথবাবু বাণভট্টের গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে সরস ভাষায় আমাদের হর্ষচরিত শুনিয়েছেন, ও সেই সঙ্গে রাধাকুমুদবাবুর প্রণীত "হর্ষ" শীর্ষক গ্রন্থেরও সমালোচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধের আর দু'টি প্রবন্ধ হচ্ছে মুসলমান যুগ অবলম্বনে। একটি প্রবন্ধে প্রমথবাবু পাঠান রাজকুমার বিজুলী খাঁর ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করেছেন ও অন্যটীতে আকবরের সভাসদ বীরবল সম্বন্ধে স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের লিখিত কতকগুলি মিথ্যাবাদ খণ্ডন করেছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পাঠান রাজকুমার বিজুলী খাঁর দেখা হয়। এ কথা চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়। তিনি জাতিতে ছিলেন মুসলমান পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রমথবাবু দেখিয়েছেন যে, বিজুলী খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি,—তিনি কালীঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র। পরে কালীঞ্জর তিনি রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রী ক'রে চলে যান, খুব সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে। এ ঘটনা ঘটে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পর। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় খুব সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। 'বীরবল' প্রবন্ধে প্রমথবাবু দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, বীরবল আকবরের সভায় সুরসিক সভাসদ ছিলেন, শুধু এই পরিচয় দিলেই চলে না—তিনি একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক ও সত্যপ্রিয়। তাঁর প্রভাবেই যে আকবর এক নূতন ধর্ম্মস্থাপনে যত্নবান্ হ'ন্ এ কথা বীরবলের শত্রুপক্ষও স্বীকার ক'রে গিয়েছেন।

সমালোচনায় সব প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বইয়ের প্রথম দু'টী প্রবন্ধের কিছু পরিচয় না দিলে এ সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রমথবাবু অনু-হিন্দুস্থান বা যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপের কথা বলেছেন। রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে ঐ সব দ্বীপ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব উদ্ধার ক'রে তা'দের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের যোগাযোগ দেখিয়েছেন। বলীদ্বীপে এখনও যে হিন্দু সভ্যতা জীবন্ত রয়েছে তা'র খোঁজ আমাদের দেশের কম লোকেই রাখেন। প্রথম প্রবন্ধটী হচ্ছে "ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি" নিয়ে লেখা। এখনও বাংলা ভাষায় সত্যকার জিওগ্রাফি লিখিত হয় নাই। যে সব পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলি শিশুদের মনে কৌতূহল উদ্দীপন না ক'রে বরং মুখস্থ করতেই প্রণোদিত করে। বাংলা ভাষায় শিশুপাঠ্য জিওগ্রাফি কিভাবে লেখা উচিত প্রমথবাবু তা'র একটি সরস নমুনা দিয়েছেন।

এ সব প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কারণ প্রমথবাবুর ষ্টাইলের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই পরিচিত। বিষয় অবতারণা হিসাবে প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ; ও সেগুলিকে পুস্তকাকারে পেয়ে সকলেই যে উপকৃত হবেন তা' বলাই বাহুল্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

The Universe in the Light of Modern Physics—MAX PLANK, George Allen & Unwin Ltd.

The New Conceptions of Matter—C. G. DARWIN, G. Bell & Sons.

গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে যে-সব অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি বিজ্ঞানে যে-রকম উৎপাত সৃষ্টি করেছে সে-সমস্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা তার চেয়ে কম উপদ্রব সৃষ্টি করেন নি। এই সব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন হ'ল এই রকম একটা সংশয়ের উদয় হয়েছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিংটন্ তাঁর Nature of the Physical World-এ বলেছেন যে, বিজ্ঞান নিজেরই তৈরী একটা চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ, পরা-বিদ্যার অন্বেষণ এ চৌহদ্দীর বাইরে। সুবিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ রাসেল্ বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর ক্যাথলিক্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মত বিজ্ঞানের প্রভাব একদিন লোপ পাওয়া বিচিত্র না-ও হ'তে পারে। কেউ কেউ আরও এগিয়ে গিয়েছেন; প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রকাশিত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে "পত্রাবলী"-তে তিনি লিখেছেন যে, শ্রীদিলীপকুমার রায়ের মতে "এখন ফিজিক্সের রাজ্যে হঠাৎ revolution হওয়ায় বিজ্ঞান সে-ক্ষেত্রে একদম উলটে পড়েছে, ফলে religion-এর অতঃপর জয় হয়েছে, কারণ তার বিরুদ্ধে লড়বার আর কেউ নেই।" বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিরোধ যাই থাকুক্, বিজ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব হ'লেই ধর্ম্মরাজ্যের অভ্যুদয় সূচিত হয় না। শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয় "পত্রাবলী"-তেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজ্ঞানের সম্বন্ধে এই যে সংশয় এর কারণ দুটি। প্রথম হচ্ছে বিজ্ঞান এতদিন যে-সব সত্তাকে চরম ও যথার্থ ব'লে প্রচার করেছিল, এখন আর বিজ্ঞান সেগুলিকে যথার্থতার মার্কা দেয় না, বলে সেগুলি বৈজ্ঞানিকের মনগড়া জিনিষ,—concepts,—প্রত্যয়। যথার্থ নয় বটে কিন্তু যথার্থের কাছাকাছি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানের নূতন সূত্র ও নূতন প্রত্যয় তার পুরাতন সূত্র ও প্রত্যয়ের বিরোধী। এখানে একটা কথা আছে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান গণিতের সাঙ্কেতিকে আবৃত। যখনই এই গণিতের সাঙ্কেতিক উন্মোচন ক'রে আধুনিক বিজ্ঞানকে সাধারণ ভাষা ও উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয় তখনই ভুল-ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানের শৈশবে এতটা গোলযোগ ছিল না। নিউটনের সময় যখন জড়পিণ্ডে আকর্ষণ আরোপ করা হয়েছিল বা ম্যাক্স্‌ওয়েলের সময় যখন ঈথরে আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব ধার্য্য করা হয়েছিল তখন অপ্রত্যাশিত হ'লেও এ-সব ব্যাখ্যা কল্পনাবহির্ভূত ছিল না। কিন্তু নব্যবিজ্ঞানের কালের আপেক্ষিকতা, দেশ্-কাল সমন্বয়, বিশ্বের চারটি বা ততোধিক

প্রসার, জড় ও শক্তির অভিন্নতা, নৈমিত্তিকতার পঙ্গুতা—ইত্যাদি বিধান সাধারণ অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে পরাস্ত করে। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক অনেকেই স্থূল হস্তাবলেপন ক'রে গোলযোগ খুবই বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উপরিউক্ত যে-দুটি বই আমরা আজ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করলাম তাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, তারা বিজ্ঞানের প্রতি কোন সংশয় বাড়ায় নি। বেহিসেবী ব্যাখ্যা বা বিজ্ঞান-অনধিকৃত ক্ষেত্রে স্বাধিকার-প্রমত্ত স্বেচ্ছাভ্রমণ করে নি। আধুনিক বিজ্ঞানের মূলপরীক্ষা, সূত্র ও সমস্যাগুলির অকপট বিবরণ দিয়ে বই দুটি বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধ্য করেছে। বিশেষ ক'রে ডারউইনের বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যগুলি নব্যবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিপাটি ক'রে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সব তথ্যের তত্ত্বালোচনা অত্যন্ত সরসভাবে অথচ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা বজায় রেখে উপস্থিত করা হয়েছে। যাঁরা পরার্থবিদ্যা আলোচনা করবার আগে পদার্থবিদ্যার মূল তথ্যগুলি জেনে নেবার অবকাশ রাখেন তাঁদের জন্য ইংরাজীতে লেখা এ-রকম বইয়ের সমতুল মেলা ভার। এঁর লেখা তরঙ্গতত্ত্ব, অণুপরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠন, আলোককণার আচরণ ও সংঘর্ষ, রামণ-প্রভা ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, পরীক্ষা ও গবেষণার সরল বিবরণ পড়ে মনে হয় যে, আরব্যোপন্যাসের রহস্যময় কাহিনীও এর মত সুরম্য ও উপভোগ্য নয়। আর এও মনে হয় যে, নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা—সাধারণ পাঠক—যে-সব ভাসা ভাসা বার্তা খবরের কাগজ ও বৈজ্ঞানিক বন্ধু মারফৎ শুনতাম তা সব কতই ফাঁকা, কতই ভ্রমপ্রদ।

প্লাঙ্ক বিশেষ ক'রে মামুলীবিজ্ঞান-বনাম-নব্যবিজ্ঞান-এর সমস্যাগুলিই আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যে "মাত্রাবাদ" আসার দরুণ নব্যবিজ্ঞান সুরু হ'ল প্লাঙ্ক সেই শক্তিমাত্রা পরিকল্পনার জন্মদাতা। এখানে আমরা Quantum-কে "মাত্রা" নামে অভিহিত করলাম। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে এখানে একটা মুখবন্ধ তৈরি করতে ইচ্ছা করি। "মাত্রাবাদ"-এর প্রতিপাদ্য এই যে, বিজ্ঞান জগতের অণুপ্রমাণ ব্যাপারে শক্তির আদান-প্রদান হয় মাত্রা হিসাবে। শক্তিমাত্রা জড়পদার্থের ইলেকট্রন্ ও প্রোটনের মতই অবিভাজ্য; এর সাঙ্কেতিক "h", নাম প্লাঙ্কাঙ্ক। গত ১৯০০ অব্দে প্লাঙ্ক বিকিরণের কয়েকটি ব্যবহার পর্য্যালোচনার ফলে প্রচার করেন যে, বিকিরণে শক্তির অর্জ্জন বা বর্জ্জন হয় একটি দুটি বা ততোধিক h-এর অভগ্ন সংখ্যার অনুপাতে, কিন্তু কিছুতেই h-এর কোন ভগ্নাংশ বা মিশ্রাঙ্ক অনুপাতে নয়। তারপর বিজ্ঞানজগতের বহুতর আণবিক ব্যাপারেই শক্তির এই মাত্রিক ব্যবহার প্রমাণিত হয়েছে। কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে, শক্তি অবিরাম নয়, শক্তি একটা সমূহ। প্লাঙ্ক তাঁর বইটিতে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ক'রে মাত্রাবাদের পর্য্যালোচনা থেকে নিজের আবিষ্কারের কথা বাদ দিয়েছেন। তৎপরিবর্ত্তে এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন যে, নব্যবিজ্ঞানে তাঁর স্বজাতীয় বৈজ্ঞানিকদের দান অনেক। আমরাও বোধহয় এই বলে শ্লাঘা করতে পারি যে, মাত্রাবাদের প্রতিষ্ঠায় আমাদের একজন স্বজাতীয়ের দান বিশ্ববৈজ্ঞানিকদের কাছে পরিকীর্ত্তিত। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আইনষ্টাইনের অনুমোদনে ইনি আলোকের ক্ষেত্রেও শক্তির আদান-প্রদান "h" মাত্রা অনুসারে সম্পাদিত হয়, এর একটি বিশুদ্ধ প্রমাণ দিয়ে মাত্রাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর পদ্ধতি হ'ল

এই যে, ব্যষ্টি থেকে যেমন সমষ্টির বিবরণ গড়পরতা হিসাবে দেওয়া যেতে পারে, শক্তিমাত্রা থেকেও তেমনি শক্তিসমূহের ব্যবহার গড়পরতা নিয়ম অনুসারে নির্দ্ধারিত হ'তে পারে। এই থেকে একটা নূতন গণিত—"সমষ্টি-গণিত", তৈরী হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে, শক্তিমাত্রা এর পর আপন ব্যক্তিত্বের বা ভোটের অধিকার লাভ করল। এদিকে স্বনামধন্য ডাচ্ বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর দেখিয়েছেন যে, ইলেকট্রণও প্লাঙ্কাঙ্ক অনুসারে শক্তি জয় বা ব্যয় করে। আমেরিকার নোবেল্ লরিয়েট্ কম্পটন্ দেখিয়েছেন যে, শক্তিকণা ও ইলেকট্রণের বা বস্তুকণার মধ্যে ছুটি বিলিয়ার্ড বলের মত সংঘর্ষ হতে পারে এবং এক্ষেত্রেও উভয়ের পক্ষেই মাত্রাবাদ অনুসাবে শক্তির আদান-প্রদান হয়। এর মধ্যে বিশেষ কথা এই যে, মামুলী বিজ্ঞান অনুসারে ইলেকট্রণের পবিলক্ষিত আচরণ কিছুতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু এই মাত্রার পরিকল্পনা থেকেই তা সম্ভব হয়েছিল। এতেও কিন্তু শান্তি হ'ল না, কেননা ইলেকট্রণের আচরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অব্যাখ্যাত র'য়ে গেল। এমন সময় ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডি ব্রোগলি একটা নূতন প্রত্যয় দাঁড় করিয়ে দেখালেন যে, ইলেক্ট্রণকে বস্তু :হিসাবে কল্পনা না ক'রে বস্তু-তরঙ্গ রূপে কল্পনা করতে হবে। এই থেকে তাঁব প্রদর্শিত পথে নূতন তরঙ্গগণিতের উদ্ভব হয়েছে। এই গণিত শুধু ইলেকট্রণের ব্যবহার নয় শক্তিমাত্রার ব্যবহারও নির্দ্দেশ ক'রে মাত্রা-গণিতকেও আপন অঙ্গীভূত করেছে। অত্যন্ত বিস্ময় ও আশার কথা এই যে, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জি, পি, টমসন্ কৌশলে ইলেকট্রণ-তরঙ্গের সংঘাত বাধিয়ে তার ফটো তুলে এর চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। ডারউইন তাঁর New Conceptions of Matter-এ এই ফটোর নকল দিয়ে বইখানিকে অসামান্য আভরণে অলঙ্কৃত করেছেন। ডি ব্রোগলির ইলেকট্রণ-তরঙ্গ কিন্তু একটিমাত্র তরঙ্গ নয়, তরঙ্গ-সমবায়। কেননা তরঙ্গের ধর্ম্মই হ'ল বিশ্বময় পরিব্যাপ্তি হওয়া, সুতরাং তরঙ্গের মধ্যে ইলেকট্রণের স্থান নির্দ্দেশ কি ক'রে সম্ভব? সম্ভব তরঙ্গের সমবায় দিয়ে। সমবায়ে সংঘাত হয়, সংঘাতের ফল এই যে, একের কুব্জপৃষ্ঠের সঙ্গে যদি অপরের কুব্জপৃষ্ঠ মেলে তবে আনুকূল্যে সে স্থান স্ফীত হয় কিন্তু একের কুব্জপৃষ্ঠ যদি অপরের ন্যুব্জপৃষ্ঠের সঙ্গে এসে মেলে তবে সেখানে প্রতিকূলতায় তরঙ্গ আন্দোলন থেমে যায়। যদি সমবায় এমন হয় যে, এইরকম আনুকূল্যের ফলে তরঙ্গের একস্থানে স্ফীতি হয় ও অপর সকল স্থানে প্রতিকূলতার ফলে বিনাশ হয় তবে স্ফীত স্থান দিয়ে ইলেকট্রণের অবস্থিতি কতকটা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের প্রথম বিপত্তি এইখানে, কেননা যদি বস্তুর বস্তুস্বভাবই গেল তাহলে ভৌতিক জগতের রইল কি? দ্বিতীয় বিপত্তি এই যে, তরঙ্গগণিত অনুসারে ইলেক্ট্রণের সংস্থান সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে না। এখানে তরঙ্গগণিত প্রেফেসার বোর এর পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে বৈজ্ঞানিক মতবাদের কি সার্থকতা যার গণিত অনিশ্চয়কে মূলগত ব'লে স্বীকার করে? ব্যাপারটা কি ইচ্ছা শক্তিব খেলার মত দেখাচ্ছে না? প্লাঙ্ক এ ছুটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর আলোচনাটি তাঁর মনীষার তুল্যই জ্যোতিষ্মান হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের জগৎ কি যথার্থ—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, না, বৈজ্ঞানিক জগৎ বৈজ্ঞানিকেরই মনগড়া জিনিষ। আপন আভ্যন্তরিক সঙ্গতির উপর এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, পরীক্ষা ও

নিরীক্ষা দিয়ে এ জগৎ পরিশাসিত। এ ছাড়া আব দুটি জগৎ তিনি মেনে নিয়েছেন, সে হচ্ছে প্রত্যক্ষ জগৎ ও তার পিছনে যা' আত্মগোপন ক'রে রয়েছে সেই যথার্থতম জগৎ। ন্যায় দিয়ে যথার্থ জগৎ প্রমাণিত হয় না, কিন্তু তাঁর মতে, অপ্রমাণিতও হয় না। এখানে তিনি যুক্তির দ্বারস্থ হয়েছেন ও একটা উদাহরণ দিয়েছেন—যেমন কোন কিছুর দিকে পিছন ফিরলে তার অস্তিত্ব তর্ক দিয়ে প্রমাণিত হয় না কিন্তু যুক্তি দিয়ে হয়,—যথার্থ জগতের বেলাও তেমনি। বিজ্ঞান একদিকে এই যাথার্থ্যের সঙ্গে ও অন্যদিকে প্রত্যক্ষজগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এর লক্ষ্য একদিকে যাথার্থ্যকে যতদূর সম্ভব জানা, অপরদিকে প্রত্যক্ষ জগৎকে যতখানি সম্ভব জটিলতা বিমুক্ত করা। এ দুটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই, আছে সহযোগীতা, কেননা যাথার্থ্যকে সরাসরি যেমন সর্ব্বতোভাবে জানা অসম্ভব তেমনি এ প্রশ্নের কোন সাধু জবাব নেই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলির প্রাঞ্জলতম ব্যাখ্যা কি। যাথার্থ্যের সন্ধান ও প্রতক্ষ্যের অধিকার বাড়ান বিজ্ঞানের এই দুই প্রচেষ্টাতেই বৈজ্ঞানিকরা মনোনিবেশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের স্বকীয় যৌক্তিকতা ও শৃঙ্খলাসাধনের জন্যই তাঁরা বিশেষ ক'রে আত্মনিয়োগ করেছেন। এর ফলে বিজ্ঞান কতক পরিমাণে সূত্রসন্ধানী হয়েছে এবং স্বতঃসিদ্ধের আশ্রয় নিয়েছে। আসলে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ-মূর্ত্ত থেকে অমূর্ত্তপন্থী হওয়ার প্রচেষ্টায় অর্থাৎ abstraction-এর ফলে তৈরী হয়েছে, আর প্লাঙ্কের মতে বিজ্ঞান যে পরিমাণে অমূর্ত্তপন্থী হয়েছে সেই পরিমাণে তা' যাথার্থ্যের নিকটতর হয়েছে। এ রকম মনে করার কারণ এই যে—abstraction—অমূর্ত্তসাধনাই আবার প্রতক্ষ্য-জগতের পরিসর বিস্তৃত করেছে। এমন একটিও অমূর্ত্তসাধনা সম্পাদিত হয় নি যার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অধিকার কোন না কোন উপায়ে সমৃদ্ধ না হয়েছে। কিন্তু abstraction-এর একটা মুস্কিল এই যে, বিজ্ঞানের সূত্রের সঙ্গে উপাধি আসে ও উপাধির পিছনে থাকে প্রতিমা। পরে এই সব উপাধির অর্থ-বিস্তৃতি করতে গেলে প্রতিমা পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। বস্তুর বস্তুস্বভাব নিয়ে যে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তা' এমনি ক'রেই। প্রাচীন চৈনিক ও ভারতীয় জ্যোতিষীরা ভূয়োদর্শনের ফলে গ্রহদের গতি, অবস্থান ও গ্রহণের তারিখ সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন কিন্তু গ্যালিলিও গ্রহগতিকে সৌরকেন্দ্রীয় ব'লে সূত্রের প্রথম পত্তন করেন। তারপর কেপলার এই গতিকে বৃত্তাভাষ পথে ও শেষে নিউটন গ্রহদের ও সূর্য্যের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বা কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে সমস্ত গ্রহগতিকে একটিমাত্র সূত্রে নিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ প্রাচীনরা যাকে আলাদা স্থানে ও আলাদা কালে মূর্ত্তরূপে দেখতেন বিজ্ঞান তাকে মূর্ত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে সূত্রে প্রকাশ করল। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ একটা বল,—এই বলের পিছনে তার তারতম্য সাধনের জন্য এল mass—মান,—তার পিছনে এল মানের প্রতিভূ পদার্থ বা বস্তু। এই বস্তুর কল্পনা নিছক আমাদের চিন্তার সহায়ক, নতুবা সূত্রে বস্তুর প্রয়োজন নেই, আছে মানের। গত শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে প্রত্যেক সূত্রের পিছনে এই রকম প্রতিভূ দাঁড় করাতে গিয়ে বিজ্ঞান নিজেকে যন্ত্রচালিত প্রতিমা-সর্ব্বস্ব ক'রে ফেলেছিল। নব্য বিজ্ঞান অবান্তর প্রতিমাকে বাদ দিতে চাইছে,—মান বজায় রেখেছে, তার অবিনশ্বরতা বজায় রেখেছে কিন্তু তার বাস্তবতা অবান্তর ব'লে ত্যাগ করতে উদ্যত। নব্য বিজ্ঞান এমনি ক'রে "বল"-এর কল্পনাকে ত্যাগ করেছে, তার স্থান এখন অধিকার করেছে

"শক্তিক্ষেত্র"। এই রকম আপেক্ষিকতায় দেশ ও কালের সমন্বয় ক'রে বিজ্ঞানে ঠিক তাই সাধিত হয়েছে যা' গণিতে সঙ্কর সংখ্যা ($x+\sqrt{-1}y$) স্বীকার ক'রে করা হয়েছিল। দেশ ও কালের মধ্যে সেই সম্পর্ক যা আসল ও অলৌকিক সংখ্যা ($\sqrt{-1}y$) এর মধ্যে থাকতে পারে। প্লাঙ্ক বলেন এ সব বিজ্ঞানের বিরোধ বা পদস্খলন জ্ঞাপন করে না, কেননা, বিজ্ঞান বিবর্ত্তনের অধীন, আর শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে যে, বস্তুর বদলে বস্তুতরঙ্গের কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে বিজ্ঞান অমূর্ত্ত-সাধনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তরঙ্গগণিতের যেটা দ্বিতীয় বিপত্তি সেটার নাম uncertainty principle বা 'অনিশ্চয় বিধি'। বোর দেখিয়েছিলেন যে হাইড্রোজনের বর্ণছত্রের সম্যক ব্যাখ্যা করতে গেলে অনুমান করতে হয় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সৌরজগতের মত, তার কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও প্রোটনের চারিদিকে একটা ইলেক্‌ট্রণ পরিভ্রমণ ক'রে বেড়ায়। কিন্তু গ্রহকক্ষা থেকে ইলেক্‌ট্রণ-কক্ষার একটু পার্থক্য আছে, সে হ'ল এই যে, ইলেক্‌ট্রণের পরিভ্রমণ মাত্র কয়েকটি বিশেষ কক্ষে সম্ভব। কিন্তু গ্রহদের বেলা এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আর এক কথা যে, কক্ষায় গ্রহদের কখন কোথায় অবস্থিতি তা' দেখা বা গণনা করা যেতে পারে, ইলেক্‌ট্রণের বেলা কিন্তু কক্ষায় তার সংস্থান গণনায় বা পরীক্ষায় নিরূপণ করা অসম্ভব। দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান যাকে সত্তা দিচ্ছে তার অবস্থিতিই নির্দ্দেশ করতে পারছে না। ইলেক্‌ট্রণেব এই আচরণ তরঙ্গগণিতের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আর একটু বিশদ ক'রে বলতে গেলে ইলেক্‌ট্রণের শুধু অবস্থিতি নয় বেগভারও এই অনিশ্চিততার অধীন, এ দুটিকে সুনির্দ্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু একটা সমন্বয় করা যায়, একটিকে অপেক্ষাকৃত সুনির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাতে অপরটি হ'য়ে পড়ে তুলনায় বেশি ক'রে অনিশ্চিত। এর ব্যাখ্যাটি এইরকম—প্রথম ধরা যাক্ ইলেক্‌ট্রণ-কক্ষের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পথ। এখানে ইলেক্‌ট্রণ হ'ল তবঙ্গ, তরঙ্গের কিন্তু পদ আছে অতএব কক্ষপথে একবার পরিভ্রমণ. সম্পূর্ণ করতে হ'লে তরঙ্গের পাদপূরণ ক'রে কক্ষপথ নির্ণয় করতে হবে। যেমন কবিতার কলিতে পদ অপূর্ণ থাকতে পারে না। অর্থাৎ কক্ষপথ-সংখ্যা অগণ্য নয়, পরিমিত। তার পর ধরা যাক্ ইলেক্‌ট্রণের অবস্থিতি। তরঙ্গগণিতের মতে তরঙ্গ সমবায়ের পূর্ব্ববর্ণিত স্ফীতি ইলেক্‌ট্রণেব অবস্থান নির্দ্দেশ করে, কিন্তু বিন্দুবৎ-সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করতে পারে না। সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করতে হ'লে স্ফীতস্থান সঙ্কুচিত করতে হয়, তার উপায় হচ্ছে তরঙ্গ সমবায়ে বহুলপরিমাণে তরঙ্গ আনায়ন করা। কিন্তু তরঙ্গের সংখ্যাধিক্য হ'লে তাদের বেগভারও হবে বিচিত্রতর অর্থাৎ তার অনিশ্চিততার মাত্রা যাবে বেড়ে। ফলে, একটিকে অপেক্ষাকৃত সুনির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে, হয় অবস্থিতি নয় বেগভার। দুটিকে একসঙ্গে সুনির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে না, একটিকে নির্দ্দেশ করতে গেলেই অপরটির অনিশ্চিততা আসবে। এব মধ্যে ইচ্ছাশক্তির কোন খেলা আছে কিনা তা' এই থেকেই বোঝা যাবে যে, এ দুটি অনিশ্চিততার পরিমাণও একেবারে অনিয়ন্ত্রিত নয়, পরন্তু এ দুটি পরিমাণের গুণফল শক্তিমাত্রার সমপর্য্যায়ের। প্লাঙ্ক বলেন, এ অনিশ্চয় বিজ্ঞানের নৈমিত্তিকতার বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করছে না। কেননা কোন অবস্থা বা পরিমাণ কোন মতবাদ অনুসারে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হ'তে পারে কিনা তা' সেই মতবাদের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। প্রাচীন মত অনুসারে ঈথরের অস্তিত্ব পর্য্যবেক্ষণ করা

সম্ভব ছিল। কিন্তু আপেক্ষিকতা অনুসারে সেটা হ'ল অসম্ভব। এর প্রকৃত সমাধান পরীক্ষায়; পরীক্ষায় দেখা গেল আপেক্ষিকতারই জিত। তেমনি পরীক্ষাতেই স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ইলেকট্রণের সংস্থান ও বেগভার উভয়ে কখনই একসঙ্গে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হতে পারেনা। ব্যাপার এ নয় যে, ইলেকট্রণের অবস্থিতি নিমিত্তাতীত উপায়ে সংঘটিত হয়েছে, ব্যাপার এই যে, সে অবস্থান নির্দ্দেশ করতে যাওয়া ভুল,—ও প্রশ্নই অর্থহীন। যদি পরীক্ষা সাহায্যে বস্তু-তরঙ্গ ধরা সম্ভব হ'ত তাহলে ইলেকট্রণের প্রত্যেক তরঙ্গটি নির্ণয় ক'রে দেখান চলত, তাতে নৈমিত্তিকতারই জয়-জয়কার হ'ত,—কিন্তু তবু ইলেকট্রণের অনিশ্চিততা দূরীভূত হ'ত না। প্লাঙ্ক আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। মামুলী বিজ্ঞানে কোন বস্তুর এক সময়ের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ণয় করা দস্তুর ছিল; তরঙ্গগণিতে এই বিভিন্ন অবস্থা দুটি সম্যক জানা থাকলেও এদের আগের পরের বা মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নির্ণয় করার কোন অর্থসঙ্গতি নেই—কেননা এ সব অবস্থায় তরঙ্গগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। এর একটা চলনসই উপমা আমাদের মনে উদয় হয়েছে। একদল লোকের যদি দুই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সম্মেলন হয় তাহলে যেমন মধ্যবর্ত্তী সময়ে সেই সম্মেলনের অস্তিত্ব বরাবর বিদ্যমান থাকেনা যদিও লোকগুলি ব্যক্তিবিশেষ ভাবে বিদ্যমান থাকে—এও তেমনি। এখানে একটা কথা আছে,—নৈমিত্তিকতা বা কার্য্য-কারণের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—যা বিজ্ঞানে চিরকাল স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে, তার ভিতরকার কথাই এই যে, একটা অবস্থা হুবহু জানা থাকলে আগের বা পরের আর যে কোন অবস্থাও হুবহু বলা চলে। তবে কি নব্য বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে নৈমিত্তিকতা লুপ্ত হ'ল? প্লাঙ্ক বলেন, মামুলী বিজ্ঞানে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সংস্থানই ছিল নিশ্চিত, নব্য বিজ্ঞানে বস্তুতরঙ্গরাই নিশ্চিত, সংস্থান অর্থহীন। তা' ছাড়া মামুলী বিজ্ঞানের মূল-সূত্রগুলি—যথা mass-এর অবিনশ্বরতা, শক্তির অবিনশ্বরতা, আলোকের বেগ,—নৈমিত্তিকতার এ সকল উপাদান নব্যবিজ্ঞানেও অবিকৃত আছে। সুতরাং নৈমিত্তিকতার অবসান হয়নি। এ বিষয়ে অনেক কথা আছে, সে সবের জন্য প্লাঙ্কও ডারউইনের বই-ই পঠিতব্য। তবে একটা কথা বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। ইলেকট্রণের আচরণ যদিও তরঙ্গগণিতমতে ব্যাখ্যাত হয় তবু তার কণাস্বভাব এ মতে সুসম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। আলোকের ব্যাপারেও এই রকম একটা আচরণ লক্ষ্য হয়। প্রাচীন মতে আলোক ছিল আকাশ-তরঙ্গ, এ মতে আলোকের ব্যাপ্তি-ধর্ম্ম বর্ণছত্র উৎপাদন ইত্যাদি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হ'ত কিন্তু আলোকপাতে ধাতুগাত্র থেকে ইলেকট্রণের স্ফুরণ—আধুনিক সময়ের এই আবিষ্কার,—ব্যাখ্যাত হ'ত না। এ দিকে আলোক-মাত্রাবাদে এ-আচরণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হলো। আলোক, ইলেকট্রণ—উভয় ক্ষেত্রেই এ দ্বৈতভাব বিদ্যমান। অণু-পরমাণুতেও তাই। মনে হয় যেন এই দ্বৈতরূপই জগৎপরিচয়ের একটা প্রধান সঙ্কেত। অধুনা এই দুই মতের একটা সমন্বয় করবারও চেষ্টা হয়েছে অর্থাৎ এই রকম মনে করা হয় যে, ইলেকট্রণ আলোক ইত্যাদি তরঙ্গরূপে পরিব্যাপ্ত হয় কিন্তু শীর্ষে শীর্ষে মাত্রাকে বহন করে। শীর্ষেই মাত্রার প্রাধান্য বা বসতি, অন্যস্থানে নয়। সুতরাং এমনভাবে যদি পরীক্ষার ফাঁদ পাতা যায় যে, তাতে কণা বা মাত্রা ধরা পড়ে তাহলে ব্যাপারটাকে মনে হয় মাত্রা-রূপী; অথবা এমনভাবে যদি ফাঁদ পাতা যায় যে, তরঙ্গবৃত্তি ধরা পড়ে তাহলে ব্যাপারটাকে মনে হয় তরঙ্গরূপী। একত্র উভয়রূপে প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ প্লাঙ্ক ও ডারউইনের মতে বিজ্ঞানপরিচর্য্যার

ফলে ধরা পড়েছে যে তরঙ্গরূপে বিশ্বনিখিলে যা পরিব্যপ্ত তাই আবার মাত্রা বা বস্তুকণারূপে সংখ্যা, স্থান ও আকার-বদ্ধ। স্থূল বা বৃহদায়তনের বেলা তরঙ্গরূপ অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন, দেখা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু পরমাণু ইলেকট্রণ ও জ্যোতিঃকণার বেলা তরঙ্গরূপ আর মৃদু-মন্দ নয়, সুতরাং তখন তরঙ্গরূপ ও বস্তুরূপ দুইই ধরা পড়ে। এতে বিরোধ নেই—সবকিছুকে বস্তুময় ভাবলেই বিরোধ। এখানে অবশ্য অ-বাস্তবতা আধ্যাত্মিক অর্থে ধর্ত্তব্য নয়।

প্লাঙ্ক বলেন, আসল কথা বিজ্ঞানে দুরকম নিয়মের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে; এক হচ্ছে ব্যষ্টি-বিধ যাতে সব সময়েই নিয়ম হুবহু মেলে আর এক হচ্ছে সমষ্টি-বিধ যাতে নিয়ম গড়পড়তায় মেলে কিন্তু ব্যষ্টিহিসেবে ইতরবিশেষ হয়। হয়ত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রায় সবই সমষ্টিহিসেবে ঠিক, ব্যষ্টিহিসেবে নয়। কিন্তু,—তাঁর মতে,—ব্যষ্টি-বিধ নিয়মই আদর্শ নিয়ম যার মাপকাঠি দিয়ে সমষ্টি-বিধ নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি মাপা যায়। আর ব্যষ্টি-বিধ নিয়মের আবিষ্কারেই বিজ্ঞানের বিশেষ ক'রে ব্যাপৃত থাকা উচিত কেননা এ নিয়ম বিজ্ঞানকে গন্তব্যের দিকে যতখানি এগিয়ে দেয় সমষ্টি-বিধ নিয়ম ততখানি পারে না।

প্লাঙ্কের মতে যাথার্থ্যের সন্ধানে বিজ্ঞানকে চির-ব্যাপৃত থাকতে হবে কিন্তু কিছুতেই তার অবধি মিল্‌বে না;—এতেই মানুষের কল্যাণ। তাঁর শেষ কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল—

"Scientists have learned that the starting point of their investigations does not lie solely in the perception of the senses, and that science cannot exist without some small portion of metaphysics. Modern physics impresses us particularly with the truth of the old doctrine which teaches that there are realities existing apart from cur sense perception, and that there are problems and conflicts where these realities are of greater value for us than the richest treasures of the world of experience."

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Cosmic Problems,—An Essay in Speculative Philosophy—J. S. MACKENZIE (Macmillan & Co., Ltd.).

মেকেঞ্জি মহোদয় দার্শনিক জগতে সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিবিধ গ্রন্থনিচয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাঁহার আধুনিকতম চিন্তাধারাকে "বিশ্ব-জাগতিক সমস্যাসংগ্রহ" এই আখ্যা দিয়া তিনি উপরিলিখিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের মুখবন্ধে যথারীতি পুস্তকটীর জন্মপরিচয় ও ইতিবৃত্ত নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে স্বীয় গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"আমি এখনও নিজেকে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ চিন্তাধারার একজন অনুগত সেবক হিসাবে দেখিয়া থাকি ও তৎসম্পর্কে আমার প্রথম শিক্ষাগুরু এড ওয়ার্ড্ কেয়ার্ড্‌কেই সর্ব্বোত্তম পথনির্দ্দেশক মনে করি।"

সমালোচনার কষ্টিপাথরে এই পুস্তকখানির মূল্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে, ইহা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। তত্ত্ববিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া দেখিলে বিশ্বরহস্যের এই সব জটিল সমস্যার আলোচনা সমস্যাপূরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয় বলিয়া মনে হয় না। তবে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, দর্শনের প্রাণগতি সমস্যাপূর্ত্তিতে নয়, সমস্যাস্ফূর্ত্তিতে। সেজন্য এই গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলির ব্যাপকতার অনুমাপে ইহাদের সমাধানের গভীরতার অভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইলেও, ইহার সার্থকতা তাহার উপর নির্ভর করিবে না। অবহিতদৃষ্টিতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার যে দশটি অধ্যায়ে এই বিশ্ব-সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক অধ্যায়ই এক এক জিজ্ঞাসার চিহ্নে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের কোনও এক সুরসিক পরলোকগত বন্ধু তত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষার পূর্ব্বে কোনও এক পরীক্ষার্থীকে বলিয়াছিলেন, "ও নিয়ে অত ভাব্‌ছ কেন? সব প্রশ্নের উত্তরেই কিছুটা লিখে তার পর 'এ্যা-ও হয়' 'অ-ও হয়' এই দিয়ে শেষ করবে।" এক্ষেত্রেও যেন অনেকটা সেই সুরই ধ্বনিত হয়।

শুনিতে স্বতোবিরুদ্ধ হইলেও একদিক দিয়া দেখিলে ঠিকই মনে হয় যে, অনধ্যবসায় বা অজ্ঞেয় রহস্যবাদেই দার্শনিক দৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ পরিণতি বা চরম উৎকর্ষ। অন্ততঃপক্ষে গ্রন্থকারের দৃষ্টি তাহাই প্রতিপন্ন করে। এ বিষয়ে বোধ হয় তাঁহার সমসাময়িক ও সমরসরসিক ব্রাড্‌লি অগ্রদূত। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Appearance and Reality"-নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে এক জায়গায় বলিয়াছেন, "যখন মানুষের মন রহস্যময় মায়ালোকের সূক্ষ্মানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া আর যথেচ্ছবিহার বা অজানার উদ্দেশে তার প্রেমের নৈবেদ্য উৎসর্গ করে না, যখন সংক্ষেপতঃ, জ্ঞানের স্তিমিতালোক মানুষের মনকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না তখনই শুধু তত্ত্বজ্ঞান নিরর্থক হইয়া উঠে।" আবার উপসংহারে এই সত্যের প্রতিপাদন হিসাবে মন্তব্য করিয়াছেন—"যে সংশয়বাদ জ্ঞানানুকূল—যাহার দৃষ্টিতে সমস্ত জ্ঞানসত্তার এক রকম মদান্ধতারই নামান্তর—যাহার অনুভূতিতে মানুষের জ্ঞান এই বিশ্বজগতের সম্পদের অনুপাতে অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—আমি তাহারই সমর্থন করি। মানুষের যে সহজ বিস্ময় এই জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত জগতের বাহিরে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় এবং জানা-অজানা নানান্‌ রাজ্যের পথে ভ্রাম্যমাণ করে আমি সেই বিস্ময়ের সার্থকতা আছে মনে করি।" সমস্ত জানার মর্ম্মস্থলে যে অজানার নিভৃতলোক বর্ত্তমান তাহার সন্ধান যে তত্ত্বজ্ঞানার্থী না পায় সে যথার্থই 'প্রকৃতিকৃপণ'।

অতএব এদিক দিয়া দেখিলে গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টাকে মোটেই ব্যর্থপ্রয়াস বলা যায় না। ইহার প্রতি সুবিচার করা হইবে যদি সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টার উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, সমাধানের সাফল্যের উপর নহে। এবিষয়ে গ্রন্থখানির উপসংহারে মেকেঞ্জি মহোদয় যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহাই সমালোচকের প্রধান উপজীব্য। তিনি লিখিয়াছেন (১১৯ পৃঃ) "এই পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীবনের মূলীভূত কতকগুলি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও তৎ-সমাধানের পক্ষে যে সব অন্তরায় সুবিদিত সেগুলির অপসারণ। এটা কখনও আমার কল্পনায় উদিতও হয় নাই যে, এই সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়াছে। তবে আমার বিশ্বাস যে, আমি কিছুই গোপন করি নাই।"

•

•

গ্রন্থখানি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত :—

(1) The Present Outlook in Speculative Philosophy; (2) A General Theory of Value; (3) The Ideas of the Absolute and God; (4) The Problem of Creation; (5) The Spatio-Temporal System: (6) The Conception of Evolution; (7) The Problem of Freedom; (8) The Problem of Immortality; (9) The Conception of Deity: (10) The Present Outlook in Religion.

এই দশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি এইরূপে নির্দ্দেশ করা যায় :— এই নামরূপাত্মক জগতের মূলীভূত কারণস্বরূপ এক সর্ব্বগত স্রষ্টা পুরুষের কল্পনা অপরিহার্য্য। মানব-শিল্পীর সমস্ত সৃষ্টি যেরূপ কল্পনাপ্রসূত, সেরূপ বিশ্বসৃষ্টিও বিশ্বশিল্পীর কোন আগন্তুক সংকল্পপ্রসূত। সেই সৃষ্টিক্রিয়ার চরম লক্ষ্য মনে করা যাইতে পারে এক মানবসমাজের উদ্ভাবন যাহাতে প্রত্যেকেই পরস্পর নিরপেক্ষ, স্বাধীন, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার ব্যাপকাভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট। যেমনতর কোন নাটকে বিভিন্ন পাত্রগণ নাটকপ্রবন্ধানুসারে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া থাকে। ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের স্বপক্ষে অমরত্বের দাবী যুক্তিসম্মত (৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থকার তাঁহার নিবন্ধের প্রতিপাদনে যে বিচারনৈপুণ্য ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার্হ। তাঁহার চিন্তাধারার মূলসূত্র বিজ্ঞানপ্রসূত না হইলেও বিজ্ঞানসম্মত। নতুবা এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোনও স্বকপোলকল্পিত উদ্ভট সৃষ্টিতত্ত্ব আমল পাইত না। তাঁহার সৃষ্টিপরিকল্পনার সব উপাদানই বিজ্ঞানেব ভাণ্ডার হইতে আহৃত এবং এবিষয়ে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কিন্তু ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনসম্বন্ধে তিনি যে দু-একটি মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লেখকদিগের স্বভাবসিদ্ধ উন্নীত ভ্রূবন্ধ বা নাসিকাকুঞ্চন বা ঘৃণাব্যঞ্জক অন্য কোনও নবোদ্ভাবিত অঙ্গভঙ্গি অবশ্য নাই তথাপি তাহা আমরা মানিয়া লইতে পারিনা। কারণ, এগুলি অবজ্ঞা-প্রণোদিত না হইলেও অজ্ঞতাপ্রসূত। একথা তিনি বিনয়সহকারে স্বীকারই করিয়াছেন যে তিনি বেদান্তদর্শন-বিশেষজ্ঞ নহেন। তথাপি এমন একটা মন্তব্য কবিয়াছেন যাহা এই বিশেষজ্ঞতার দাবির মতই শোনায়। 'ব্রহ্ম-ও ঈশ্বর-তত্ত্ব' প্রসঙ্গে (৩৩ পৃঃ) তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রাড্‌লির অধ্যাত্মবাদের সহিত বেদান্তদর্শনের মূলগত ঐক্য আছে বলিয়া অনেক সময় শোনা যায় কিন্তু আমার মনে হয় যে, ব্রাড্‌লির দর্শনের প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যে সত্য ও সত্তার তারতম্যবাদ (Degrees of Truth and Reality) ব্রাড্‌লির দর্শনের মূলতত্ত্ব তাহার অস্তিত্ব বেদান্তদর্শনে না থাকাতে উভয়ই একান্ত বিভিন্ন।" কিন্তু বেদান্তদর্শনের অন্যান্য ব্যাখ্যা দূরে থাকুক শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যেই (ব্র সূ ১-১-১১) দেখিতে পাই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রহিয়াছে—"যদ্যপ্যেক আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গূঢ়ঃ তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষতারতম্যাদাত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যৈমৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ শ্রূয়তে"। এই অধিকারিভেদতত্ত্ব শাঙ্কর দর্শনের অঙ্গীভূত এবং অতি পরিস্ফুটভাবে ইহার উল্লেখ তদীয় ভাষ্যে পাই। ইহ'র প্রসিদ্ধি সম্পর্কে বিচারের অবতারণা না করিয়া শঙ্করাচার্য্য শুধু এক কথায় মানিয়া লইয়াছেন "প্রসিদ্ধশ্চার্থিত্বসামর্থ্যাদিকৃতমধিকারিতারতম্যম্ (ব্র সূ ভা ১-১-৪)। এই সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রাড্‌লির দর্শনের সহিত শাঙ্কর দর্শনের ভাবগত ঐক্য এবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়েও রহিয়াছে। ব্রাড্‌লি যেমন বলিয়াছেন

যে, "The Absolute itself has no degrees ; for there is no more or less in perfection" ঠিক্ তাহারই যেন পূর্ব্বাভাস শঙ্করের উক্তিতে পাই "অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য" (ব্র সূ ভা ১-১-৪)।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গেই মেকেঞ্জি মহোদয় বলিয়াছেন যে, "বেদান্তদর্শনে (বিশেষতঃ শঙ্করভাষ্যে) ব্রহ্মের কূটস্থনিত্যত্ব ও সংসারের অনিত্যত্ব যেরূপ একান্তবিবিক্ত তাহাতে সংসারের আপাতপ্রতীয়মানরূপও উপপন্ন হয় না। এই চিরপ্রবহমান সংসারের একমাত্র যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহা ইহাকে নিত্যকূটস্থ ব্রহ্মের লীলারূপে দেখা। কিন্তু এটাকে শুধু একটা লীলা-খেলা হিসাবে দেখা চলে না ; এর মধ্যে একটা গুরুত্ব উপলব্ধিরও প্রয়োজন আছে। আমার যতদূর মনে হয়, বেদান্তদর্শনে এই গুরুত্ব-উপলব্ধির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।" (৩৩-৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অথচ এই লীলাতত্ত্বের ভিতর দিয়া সৃষ্টিসমস্যার সমাধান বেদান্তদর্শনের এক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। এক্ষেত্রে সমগ্র তত্ত্বের অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্ভব। কেবল শঙ্করভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, একদিকে যেমন ব্রহ্মের আপ্তকামত্ব এবং প্রয়োজনপূর্ব্বিকা সৃষ্টির অসম্ভাবনা দেখান হইয়াছে, অপরদিকে যে বিশ্বসৃষ্টিতে প্রাণিকর্ম্মের অপেক্ষা রহিয়াছে তাহাও সুসমঞ্জসভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সৃষ্টিকে লৌকিক লীলার সহিত তুলনা করিয়া একদিকে যেমন "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" বলিয়া সূত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অপরদিকে কর্ম্মসাপেক্ষত্বের মধ্যে তাহার গুরুত্বের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। এই লীলাবাদের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের মধ্যে এবং আত্মপ্রকাশই আনন্দের স্বরূপ। এইজন্যই বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী-টীকায় ব্রহ্মের 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধযুক্তস্বভাব' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'বুদ্ধেত্যপরাধীনপ্রকাশমানন্দাত্মানং দর্শয়তি' এবং ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য তাঁহার অপরাধীন প্রকাশত্ব বা স্বয়ং প্রকাশত্ব স্বীকার করা ; কারণ আনন্দ ও তাহার প্রকাশ অভিন্নাত্মক ("আনন্দপ্রকাশয়োরভেদাৎ")।

শ্রীসরোজকুমার দাস

The Man Who Died—D. H. LAWRENCE (Secker).
The Waves—VIRGINIA WOOLF (Hogarth Press).

লরেন্স্-এর অকাল মৃত্যুর পরে তাঁর যে-উপাখ্যান দুখানি প্রকাশ হয়েছে, তা প'ড়ে ভাবুকমাত্রেই শোক অনুভব করবেন। লরেন্স্-এর মতো প্রতিভা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালেই দুর্ল্ভ ; উপরন্তু সংস্কারপ্রধান ইংলণ্ডে ও-রকমের অনুসন্ধিৎসা গত দু শ বছরের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। লরেন্স্-এর পিতা ছিলেন কয়লাখনির মজুর, এবং তাঁর মায়ের জন্ম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে। এমন দুটি বিসম্বাদী প্রাণীর দাম্পত্যজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব অবশ্যম্ভাবী। এই অন্তর্বিরোধের মধ্যে প্রসূত হয়ে লরেন্স্ স্বভাবতই সমাজের প্রচলিত মূল্যগুলোকে সংশয়ের চক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু আজীবন অস্বাস্থ্যের ফলে তাঁর সংস্কারকবৃত্তি কর্ম্মস্রোতে যোগ দিতে পারলে না,

সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ প্রণালীতেই আটক থাকতে বাধ্য হলো। এই কারণে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় বিলাসিতার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া শক্ত; এমন-কি আসলে হয়তো তিনি সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টাই করেন নি, আবিষ্কার করেছেন একটা নতুন তত্ত্বদর্শন, একটা অভিনব মুক্তিমার্গ। আজকের দিনে সাহিত্যিকেরা যখন সাহিত্যের স্বায়ত্তশাসন, সাহিত্যের নির্নিমিত্ত বিশুদ্ধতা প্রমাণে বদ্ধপরিকর, তখন সাহিত্যের লৌকিক আদর্শকে মনে রাখতে পারাই হয়তো যথেষ্ট কৃতিত্ব। তার উপরে যিনি কবিপ্রতিভায় ও লিপিচাতুর্য্যে লরেন্স্-এর সমকক্ষ হয়েও, আপাতখ্যাতির পথ ছেড়ে, তাঁর মতো, সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন, তিনি অবশ্যই আমাদের নমস্য।

উপরন্তু তাঁর দার্শনিক মতামত নেহাৎ নগণ্য নয়। জীবন প্রত্যূষেই লরেন্স্ আবিষ্কার করেন যে, তাঁর পিতামাতার মধ্যে কোনো দেহাতীত আকর্ষণ তো নেইই, এমন-কি প্রণয়ব্যাপারে তাঁর নিজের বিতৃষ্ণা ও বৈফল্যের ইতিহাস জেনে মনে হয়, যে-স্নেহবন্ধনে তিনি ও তাঁর মা অত নিবিড় ভাবে বিজড়িত ছিলেন, আধুনিক মনস্তত্ত্বে তারই নাম জননীগ্রন্থী। অতএব নিজের জীবনের শোকাবহ দুর্গতি থেকে লরেন্স এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে মানবীয় সম্বন্ধের মূলসূত্র হচ্ছে দেহ; এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহকে অস্বীকার ক'রে মানুষ জগৎকে দুঃস্থ দুর্নিতিময় ক'রে তুলেছে। এ-বিশ্বাসে উপনীত হবার পরে ক্রিশ্চানিটির মতো আত্মাপ্রবণ ধর্ম্মকে ও ক্রাইষ্টের মতো অতনু দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিলো না। এবং পাশ্চাত্য সমাজ প্রকাশত বিষয়াসক্ত হলেও, তার অন্তরাত্মা যেহেতু এই বৈদেহী ভাবে আবিষ্ট, তাই কালে-লরেন্স্-এর বৈনাশিক দিকটাই স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরাই লরেন্স্-এর সমর্থন করবেন। কিন্তু ওয়াট্‌সন্, পাভ্‌লোভ্ ইত্যাদিকে উদ্‌ভ্রান্ত ব'লে ভাবলেও লরেন্স্ আমাদের প্রণম্য। সংসার দেহপ্রধানই হোক্ আর আত্মাপ্রধানই হোক্, দুই নৌকোয় পা দিয়ে জীবননদী পেরুনো, সকলের মতেই অসম্ভব। এ-সত্যকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্যত একাগ্র নিষ্ঠা আজ আমাদের হাস্য উদ্রেক করে; শতমুখী, সহস্রাক্ষ হয়ে ওঠাই বর্ত্তমানের আদর্শ। এই নৈরাজ্যের যুগে, এই বিক্ষোভের মধ্যে অখণ্ডতা-ও অবৈকল্য-সম্বন্ধে সচেতন হতে পারাই এত বড় কথা যে, লরেন্স-এর দেহবাদকে উপেক্ষা করলেও তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে মুগ্ধ হতে হয়। তবে অবৈকল্যের আদর্শ শুধু জীবনে প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয়, সাহিত্যও সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তব্য ও উক্তির মধ্যে দ্বৈধ থেকে গেলে, সাহিত্যসৃষ্টি তো অসম্পূর্ণ বটেই, এমন-কি তাতে বক্তৃতাও ব্যর্থ হ তে বাধ্য

যুদ্ধের পরে লরেন্স্ যে-বইগুলি বার করেন, তার অধিকাংশ প'ড়েই মনে হয়, তিনি সাহিত্যের প্রাক্তন সংস্কারটিকে ভুলে গেছেন। তাঁর ইদানিকার পুস্তকে আবেগের অভাব নেই, ভাবুকতার প্রমাণও তাতে প্রচুর; কিন্তু উক্ত বইগুলির রূপ-পরিকল্পনার কোনো সার্থকতা পাঠকের কাছে ধরা দেয় না ব'লেই আমার বিশ্বাস। কাজেই যিনি নিছক আখ্যানবস্তুর লোভে লরেন্স্-এর বই পড়তে গেছেন, তর্কের বাহুল্যে তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে; এবং পবিত্র হিতৈষণার প্রত্যাশায় যিনি লরেন্স্-এর শরণ নিয়েছেন, গল্পের অলিগলিতে ঘুরে, তাঁর শিক্ষানুরাগ অচিরেই তর্কের সূত্রটিকে হারিয়ে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও যে লরেন্স্ অপাঠ্য হয়ে

ওঠেন নি, সেজন্যে তাঁর অত্যদ্ভুত লিপিদক্ষতা ও সহজ কবিপ্রতিভাই দায়ী। তাঁর উপন্যাস, এমন-কি কবিতা নামধেয় উচ্চণ্ড ভর্ৎসনার মাঝে মাঝে এই অনিকাম কাব্যানুপ্রেরণাগুলি গোবি-সাহারার বক্ষে স্বসমুখ মরুস্থানের মতো; একবার সেখানে গিয়ে পৌছালে, পথকষ্ট তো বিস্মৃত হতেই হয়, উপরন্তু এগুলো আবার তেমন ভূস্বর্গের সাক্ষাৎ মিলতে পারে, এই মরীচিকার মোহে সেইখানে যাত্রাশেষ করাও দুঃসাধ্য।

কিন্তু তাহলেও সম্প্রতি লরেন্স্-সম্বন্ধে আমার মনে একটা ক্লান্তি জেগেছিলো। তাঁর লেখা থেকে আমার রূপপিপাসা মেটাবার আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলুম, এমন সময় হঠাৎ "দি ভর্জিন্ এণ্ড্ দি জিপ্সী"-র আবির্ভাব হলো; এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম যে, লরেন্স্-এর আর যাই অধঃপতন ঘটে থাকুক, রসসৃষ্টির শক্তিতে ভাঁটা লাগেনি। সে তো দূরের কথা, বরং মৃত্যুকে সন্নিকট জেনে তাঁর প্রাথমিক প্রতিভা এই ছোট বইখানির পাতায় পাতায় স্বীয় অমরত্ব দ্বিগুণ বিদ্রোহে ঘোষণা ক'রে গেছে। "দি ম্যান্ হু ডাইড্" আরো পরের বই; কিন্তু এতেও পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার অণুমাত্র হ্রাস লক্ষিত হয় না। ফলে লরেন্স্-সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আবার অসীমের কাছাকাছি পৌছেছে।

লরেন্স্ এই বই দুখানিকে কোনো কষ্টে শেষ করেছিলেন মাত্র, ও-দুটিকে ঘষে মেজে প্রকাশোপযোগী করার অবসর পান নি। তাই থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে স্বভাবত তিনি মহাকবি ছিলেন; কিন্তু মানবের মঙ্গল তাঁর কাছে এত মূল্যবান মনে হতো যে জনহিতার্থে তিনি সেই প্রাকৃত উৎকর্ষকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। আমি মনে করি যে স্বাভাবিক পথে চললে লরেন্স্ ইংরেজি কাব্যের নবগ্রহের অন্যতম হতে পারতেন। তা না-হ'য়ে তিনি যে কেবল উদ্দীপ্ত উল্কা হয়ে থেকে গেছেন, তার কারণ তিনি মৌল প্রেরণাকে অবদমন ক'রে আপনাকে সামাজিক কল্যাণের যূপে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আশা ছিলো সেই আত্মবলিদানের ফলে সংসার আবার সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। এই আশা দুরাশা কিনা বিচার করার সময় এখনো আসে নি; কিন্তু এত বড় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখে মিড্লটন্ মারি যদি তাঁকে ক্রাইষ্টের সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকেন, তবে সে-তুলনা নিশ্চয়ই সার্থক, তাতে অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নেই।

লরেন্স্-এর শেষ বই-দুখানিকে রূপসৃষ্টি-হিসেবে আমি তাঁর অন্যান্য বইয়ের উপরে স্থান দিচ্ছি ব'লে, এ-দুটি কেবল গল্প, এমন বিশ্বাস অমূলক হবে। গল্প বাস্তবপন্থী হওয়া দরকার কিনা, সে-প্রসঙ্গ এখনো তর্কাধীন; কিন্তু রূপসৃষ্টি আর রূপকথা যে এক নয়, তাও বোধ হয় নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো বিশুদ্ধ চৈতন্যের মতোই দুর্লভ; অন্ততপক্ষে প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিষ্টই চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টিতে একটা শিল্পোত্তর অর্থ, একটা রূপাতীত সঙ্গতি, একটা অনির্ব্বচনীয় সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কেবল মোনালিজার মুখভঙ্গীই রহস্যময় নয়, অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর হাসিও সমস্যামূলক। "দি ভর্জিন্ এণ্ড্ দি জিপ্সী" ও "দি ম্যান্ হু ডাইড্" বই দুখানিতেও কথকতাই লরেন্সের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হলেও, তাঁর আসল অভিপ্রায় হচ্ছে সমস্যার সমাধান। এ-মত যে আমার কপোলকল্পিত নয়, তার প্রমাণ কাহিনী-দুটিকে বিশ্লেষণ করলেই মিলবে।

বই দুখানির আখ্যান বস্তু অত্যন্ত নির্ভার, এত বাহুল্যবর্জ্জিত, এত স্বচ্ছ যে

তাকে সংক্ষেপ করা অসাধ্য। প্রথমটি এক পরিমার্জ্জিত কুমারীর ইতিহাস। সভ্যতা-শিষ্টতার চাপে তার উদ্ভিন্ন জীবন যখন শুকিয়ে ঝ'রে যাবার দাখিল হয়েছে। এমন সময় এক অনাহূত জিপ্‌সীর আরণ্যিক আকর্ষণ তাকে মুক্তির খবর এনে দিলে। কিন্তু এমনি সঙ্কীর্ণ আমাদের সমাজ, এত বদ্ধমূল আমাদের কুসংস্কার যে, মোক্ষের পথ উদ্‌ঘাট দেখেও আমরা উধাও হতে পারি না। সে-মেয়েটিও, আমাদের সকলের মতো, তার মনের সঙ্কোচকে মূর্ত্ত ক'রে, নিজের গারদে নিজেই রক্ষী হয়ে বসলো। তবে তার অদৃষ্ট ছিলো ভালো, তাই আমাদের কপালে যা ঘটে না, তার কপালে তাই সম্ভব হলো। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী একদিন সংহারমূর্ত্তি ধ'রে, তার পন্থা অবার ক'রে দিলেন। শীতের বরফ গ'লে, তাদের গ্রামের গোষ্পদ নদীতে একদিন প্রলয়বন্যা ডাক্‌লো। ভেসে গেলো তার পৈতৃক ভিটা, ডুবে ম'লো তার কাকভুষণ্ডি পিতামহী, তলিয়ে গেলো তার বাপের ফাঁকা হিতোপদেশ; সেই উদ্দাম বসন্তবন্যার মুক্তিস্নানে সনাতন মানবধর্ম্মে তার দীক্ষা শেষ হলো। চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হলো; কেবল জেগে রইলো তাব শয়নকক্ষ; সেখানে আয়োজনহীন বাসরে জিপ্‌সীর তারক আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ ক'রে, সে তার দেহকে চরম পরম ব'লে চিনলে।

"দি ম্যান্ হু ডাইড্"-বইখানির প্রতিপাদ্যও সমান; তবে এবারে জোর দেওয়া হয়েছে পুরুষের দিক্‌টায়। লরেন্স্-এর শেষ বইখানিব নায়ক স্বয়ং ক্রাইষ্ট যিনি দেহকে সহজে গ্রহণ করলে সত্যসত্যই স্বর্গের সিঁড়ি র'চে যেতেন, কিন্তু দেহকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, আমাদের নরকের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন। এই আখ্যায়িকায় ক্রাইষ্ট কেবল উজ্জীবিত হয়ে জগতে ফিরলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের ভ্রান্তি-সম্বন্ধে পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে এলেন। কিন্তু তখন পৃথিবী-পরিত্রাণের অমৃতযোগ অতীত হয়ে গেছে, তখন তিনি তাঁর ধনপিপাসু আশ্রয়দাতার গলগ্রহ, মেরি মড্‌লিন-এর সন্দেহভাজন, শিষ্যদের কাছে অনর্থের উপসর্গ মাত্র; তখন তাঁর সামনে আশা নেই, এবং পশ্চাতে কেবল সুমেরুপ্রমাণ ভুল। ক্রাইষ্ট বুঝলেন যে স্বদেশে তাঁর স্থান হবেনা, তাই তিনি মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন, যেখানে মানুষ তার দেহকে অসম্মান করেনি, যেখানে মানুষ প্রাক্‌পৌরাণিক প্রকৃতিকে ভক্তির রহস্যে মহিয়ান ক'রে রেখেছে। যাবার সময় মেরি-মড্‌লিন্-দত্ত স্বর্ণমুদ্রার বাকি কটার বিনিময়ে তাঁর আশ্রয়দাতার কাছ থেকে শৃঙ্খলিত মোরগাটির মুক্তি ক্রয় করে তিনি অজ্ঞাত-বাসী হলেন। তাঁর যাত্রা ব্যর্থ হলোনা; মিসরের এক অখ্যাত জনপদে আইসিস্-এর কুমারী হোত্রী বিতাড়িত নরনারায়ণকে স্বাধিকার ফিরিয়ে দিলে; এবং যিনি সারা পশ্চিমে মরুর উর্বরতা বিস্তার করেছিলেন, সেই কুমারীর দৈহিক সঙ্গমে তিনি হয়ে উঠলেন উর্ব্বরতার দেবতা, কৃষিব অধিষ্ঠাতা, আইসিস্-এর স্বামী ওসাইরিস্।

সমগ্রতা থেকে ছিন্ন ক'রে দেখলে, গল্প-দুটিকে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলক রূপক ব'লে মনে হবে। এখানেও লরেন্স্-এর প্রতিপাদ্য নীতি হচ্ছে সেই পুরাতন অভিমত যে, দেহকে অঙ্গীকার না-করলে জীবন নিরর্থ বিড়ম্বনা। কিন্তু সম্পূর্ণ বই-দুখানির শিল্পকৌশল এমনি চতুর, আখ্যানভাগ এমনি মর্ম্মস্পর্শী। চরিত্রচিত্রণ এত সজীব, এত অসন্দিগ্ধ, আবেগ এমন গভীর, এমন অথল, যে প্রচারপ্রবৃত্তি অনায়াসেই কাব্যে পর্য্যবসিত হয়েছে। কথকতার স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা তর্কের আলোড়নে কোথাও আবিল হয়ে ওঠেনি, লেখাব মধ্যে পাঠককে ধর্ম্মান্তরিত করবার কোনো চেষ্টাই নেই; সেইজন্যেই

বোধহয় বই-দুখানি বন্ধ করার অনেক আগেই অনুভব করি লেখক আমাদের কায়মনবাক্য জুড়ে বসেছেন। একটি লাইনেও গুরুগিরির চোখরাঙানি ধরা পড়েনা, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ সমধর্ম্মীর, সমব্যথার আবেদনে মুখব, তাই আমাদেব বুদ্ধি লরেন্স্-এর সমর্থন করুক বা না-করুক, আমাদের নিষ্ঠা নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। এমনি ক'রে অনুমোদনের অপেক্ষা না-রেখে অন্তরের তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে পারে এক কাব্য, এবং এই মন্ত্রসিদ্ধির পরিচয় লরেন্স্-এর রচনাব বারবার পাই। আজকের দিনে উক্ত প্রতিভা অত্যন্ত দুর্লভ। গদ্য তো দূরের কথা, এমন-কি কবিতাও আজ বিচারপন্থী হয়ে উঠছে। অতএব ঠিক এই দুর্দ্দিনে লরেন্স্‌কে হারানো শুধু ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য নয়, তাতে সারা জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত।

* * * * * *

আমি শ্রীমতী ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর একজন ভক্ত। কিন্তু যে-কারণে লরেন্স্-এর অধিকাংশ উপাখ্যানকে আমি উপন্যাস-হিসেবে বর্দ্দাস্ত করতে পারিনা, ঠিক সেই করণেই শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর শেষ পুস্তক "দি ওয়েভ্‌স্" আমার শ্রদ্ধা-উদ্রেকে অক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ এখানিব রূপায়ণের সার্থকতা আমার বুদ্ধির অতীত। প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির এমনতর পার্থক্য শ্রীমতী উল্‌ফ-এর লেখায় আর কখনো দেখা যায়নি।

অবশ্য সুরু থেকেই শ্রীমতী উল্‌ফ্ উপন্যাস-রচনায় বিধর্ম্মী; কিন্তু তাই ব'লেই তিনি "রূপকাবী বিবেকে" বঞ্চিত নন। কথকতার ধ্রুপদী প্রণালী ছিলো একটা সুনির্দ্দিষ্ট একটা পূর্ব্বকল্পিত চবিত্রকে বিভিন্ন ঘটনা-সমাবেশের সাহায্যে স্ফুটতর ক'বে তোলা। উদাহরণ-হিসেবে "ভ্যানিটি ফেয়ার্"-এব নায়িকাকে ধরা যেতে পারে। বেকি শার্প্-এর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব নেই; কিন্তু উক্ত ঘটনাগুলি ঘটবার বহু আগেই পাঠক নিঃসন্দেহে বল্‌তে পাবে বেকির উপরে ওগুলির প্রতিক্রিয়া কি বকম হবে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত হয়তো অন্যায় নয় যে দৃশ্যগুলি পাঠকের সঙ্গে নায়িকার পরিচয় নিবিড় করার জন্যে অঙ্কিত হয়নি, পরিকল্পিত হয়েছে বেকির নিকষে অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের কষে দেখবার উদ্দেশ্যে। আমাদের দিক্ থেকে, বেকি স্কুল ছাড়ার পবে তার সম্বন্ধে আব কোনো সংশয়ই থাকে না। পটভূমির সাহায্য না-নিয়ে এমনি একটা সুনিশ্চিত ছবি ফুটিয়ে তোলা অতিবড় শিল্পের পবিচায়ক। কিন্তু তাহলেও শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর চিত্রপদ্ধতিতে নেহাৎ কম প্রতিভা নেই। তাঁর শিল্প পোঁয়াতিলিস্‌ৎদের ছবির মতো। তার মধ্যে রেখার নিশ্চয়তা নেই, আংশিকভাবে দেখ্‌লে মনে হয়, তাতে বর্ণের অপচয়ও অমার্জ্জনীয়; কিন্তু শেষ বিন্দুটি যেই পটে স্বস্থান দখল ক'রে, অমনি একটা নবতর, একটা পরিপূর্ণতর সঙ্গতিতে দর্শক অবাক হয়ে যায়।

এর ফলে শ্রীমতী উল্‌ফ্ হয়তো ঔপন্যাসিক আকাদেমিতে আসন পাবেন না। কিন্তু তাহলেও বেপরোয়া তরুণদের মজলিসে মর্য্যাদায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসে শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর অপ্রতিহত প্রভাবকে তরুণিমার আতিশয্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু এটা ভুললে অন্যায় হবে যে নিছক ফাঁকির উপবে সার্ব্বভৌম গুরুগিরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানুষ সাধারণত পরিবর্ত্তনশীল; ঘটনাকে আয়ত্তে আনা তার সাধ্যে তো কুলায় নাই, এমন-কি সমপর্য্যায়ের দুটো ঘটনার প্রতিঘাতও তার অন্তরে সমান নয়। অতএব নভেলকে যদি এই বিস্ময়ময় মনোজগতেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তবে পাত্রপাত্রীর সংকল্পনা অনমনীয় ও নির্ব্বিকল্প না-হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে তাদের

সায়ত্তশাসনে সম্মতি দেওয়াই সঙ্গত। এই মহামূল্য আবিষ্কারের জন্যে শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং এই জন্যই আজকে তাঁর শিষ্যের এত প্রাদুর্ভাব।

বলাই বাহুল্য, অন্যান্য পন্থার মতো, এ-পন্থার পথিকরাও কিছু সকলে গন্তব্যে পৌঁছায় না। অনেকেই মাঝরাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, কেউ কেউ, ঘন বনে পথ হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, অপরে হয়তো স্বর্গের এলেকায় এসেও পেটুকতার অপরাধে প্রাণে মরে; কিন্তু নরক ঘুরেই হোক, আর যেমন করেই হোক, যে শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে এসে থামে, তাকে অনুসরণ করায় শুধু পুণ্য নয়, প্রসাদও মিলে প্রচুর। "মিসেস্‌ ডালোয়ে" প'ড়ে একটা এমনি পরিতৃপ্তি পেয়েছিলুম। নায়িকা সমাপ্তির সীমায় এসে না-দাঁড়ানো পর্য্যন্ত তাকে ধরতে ছুঁতে পারিনি বটে, কিন্তু বই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আমাতে যে-নিবিড় সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়েছিলো, তা কেবল তাদের মধ্যেই সম্ভব যারা জন্মাবধি পাশাপাশি মানুষ হয়ে, শেষকালে একদিন একসঙ্গে বর্দ্ধক্যের আরাম-কেদারায় গা ছড়িয়ে বসতে পায়। তখন সুরু হয় বিশ্রম্ভালাপের পালা, জীবনের যে ঘটনা এক সময়ে দুরূহ লেগে ছিলো, যে-আচরণ এক সময়ে ব্যথা দিয়েছিলো, তখন সে-সব সরল, সহজ, কৌতুকপ্রদ হয়ে আসে। শুধু তাই নয়, এই যে-পরিসমাপ্তি, এটাও সার্থক হয়ে ওঠে। তখন বুঝিএই যে-আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসা, তা ক্লান্তিজনিত নয়; দিনের অবসানই এই বিরামের কারণ, আর যাওয়ার পথ নেই ব'লেই থামা, আর বৃদ্ধির অবকাশ নেই ব'লেই ক্ষান্তি।

কিন্তু এই পদ্ধতির একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ হচ্ছে এর সঙ্কীর্ণতা। চৈতন্যধারাকে আতলস্বচ্ছ রাখতে হলে, তাতে খাল কেটে বাইরের জল আনা চলেনা। উদ্বেল প্লাবন তার ঊষর উপকূলকে শুধুই কর্দ্দমাক্ত ক'রে যায়, দু পাশে উর্ব্বরতা ছড়াতে পারে না। এই প্রণালীর সাহায্যে যদি লেখককে পাঠকের সমুদ্র-সঙ্গমে ছুটতে হয়, তবে অবৈকল্য ও একনিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এ-ধরণের উপন্যাসে চারিত্র্যের বাহুল্যও যেমন ভয়াবহ, দৃশ্যের অপর্য্যাপ্তিও তদ্রূপ। কথাটাকে জয়েস্‌ হৃদয়াঙ্গম করেন নি ব'লেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান "য়ুলিসিস্‌" সিদ্ধির সীমায় পৌঁছেও, কেবল ঔৎসুক্যময় পরীক্ষাতেই আবদ্ধ থেকে গেছে; এবং এই ধ্রুবতারাকে প্রণাম ক'রে প্রুস্‌ৎ নিরুদ্দেশযাত্রায় বেরিয়েছিলেন ব'লেই পাতাল স্পর্শ ক'রেও, তিনি অবশেষে অমরাবতীতে উপনীত হয়েছেন।

"মিসেস্‌ ডালোয়ে" পড়ার পরে আমার বিশ্বাস জন্মেছিলো যে শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ একাগ্রতার ও আবশ্যিকতা-সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু "দি ওয়েভ্‌স্‌" শেষ ক'রে, বুঝেছি সে-ধারণা ভ্রান্ত। শ্রীমতী উল্‌ফ্‌-এর সকল বইয়ের মতো এখানিকেও ভাষান্তরে বর্ণনা করা অসাধ্য। তবে "দি ওয়েভ্‌স্‌"-এর প্রসঙ্গ মোটের উপরে হচ্ছে তিন জোড়া স্ত্রী-পুরুষের ইতিহাস। তারা বেড়ে উঠেছিলো এক-সঙ্গে, ভালোবেসে ছিলো একলোককে, এবং জীবনের মর্জ্জিতে তাদের একযাত্রার ফল সম্পূর্ণ পৃথক হলেও, তারা তাদের স্ব স্ব মণ্ডলাকার অয়নে আমরণ আটকে ছিলো কেবল পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণে। কিন্তু এই পর্য্যন্তই; এই সওয়া-তিন-শ পাতার বইখানি থেকে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো খবর সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অথচ আত্মপ্রকাশই তাদের কাজ, কারণ এই বিরাট বইখানির আগাগোড়ায় কোনো ঘটনা নেই, কোনো পরিবর্ত্তন নেই, ছয়টি বাধাবিহীন স্বগতোক্তির ধারা সমান বেগে পাশাপাশি ছুটে চলেছে। এই অনিবার, অবিকার, অনন্ত বাক্যস্রোতের মধ্যে বৈচিত্র্যের একমাত্র আভাস পাওয়া যায় পাত্রপাত্রীদের পটভূমি থেকে। এই পটভূমি হচ্ছে উন্মুক্ত

সমুদ্র এবং উষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনের হ্রাসবৃদ্ধিশীল আলোক। মানবচৈতন্যের ও মানবজীবনের প্রতীক-হিসেবে পটভূমি খুবই সার্থক। কিন্তু এই অবিরাম শব্দতরঙ্গের ফলে পাঠকের মানসকর্ণে যে-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে, সেটা প্রথমত সমুদ্রগর্জ্জনের মতোই শ্রবণসুভগ হলেও, অল্প পরেই নিরর্থ অনুলাপে পরিণত হয়। বইখানিতে সুরবৈচিত্র্যের এতই অভাব যে বক্তৃতাগুলির শিরোনামায় বক্তার উপাধি লেখা না-থাকলে, তাঁদের আলাদা ব'লে চেনার কোনোই উপায় থাকে না, মনে হয় সমুদ্রই তাদের যথার্থ উপমান; জলের মতো, এই চৈতন্যসিন্ধুতেও একবিন্দুর সঙ্গে আরেকবিন্দুর কোনো প্রভেদ নেই।

সমালোচনার বহর দেখে বোঝা যাবে যে পুস্তকটিকে অসুন্দর বা অপাঠ্য বলা আমার অভিপ্রেত নয়। বইখানির স্থানে-স্থানে এমন বাক্যবিন্যাস, এমন বর্ণনাচাতুর্য্য, এমন অন্তর্দৃষ্টির ইসারা আছে, যা শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর শ্রেষ্ঠ রচনায় তো অনায়াসে স্থান পেতে পারেই; উপরন্তু যার সংস্পর্শে অতিবড় কবিও গৌরব বোধ করবেন। কিন্তু বইটির প্রেরণা এপিক্ নয়, লিরিক্, অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কবিতা লেখা যেতো, কিন্তু কোনো উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচা যায় না। বিশেষ ক'রে এমন উপন্যাস যার উদ্দেশ্য মানবীয় সম্বন্ধে-বন্ধনকে বিশ্লেষণ করা। এই ধরণের উপন্যাসে বিষয়ীর চেয়ে বিষয়েরই প্রাধান্য বেশি, কর্ত্তার চেয়ে কর্ম্মই বড়, অব্যয় ছেড়ে, অন্বয়কে নির্ভুল করাই প্রথম প্রয়োজন। কারণ প্রবর্ত্তনার বিচার যদিই বা কোনো লোকোত্তর জগতে সম্ভব হয়, তবু সংসারে মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে আচরণ, কর্ম্ম। বিড়ালতপস্বী কেবল সাহিত্যে নয়, ভূভারতেও নিন্দনীয়; এবং যিনি মনে মনে চুরি করার পক্ষপাতী হয়েও, কার্য্যত পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ বিবেচনা করেন, সমাজে চিরদিন তিনি সাধু ব'লেই খ্যাত থাকবেন। সুতরাং যখন একজনকে দশের পরিবেষ্টনে দেখার দরকার হয়, তখন চুলচেরা মনোবিকলন নিতান্ত বৃথা, তখন দ্রষ্টব্য হচ্ছে তার ব্যবহার। ব্যবহারকে বাদ দিয়ে কেবল মুখের কথায় একটা মানবসমষ্টির আভ্যন্তরিক সহযোগ ব্যক্ত করা কখনো সম্ভব নয়। অবশ্য আচরণ-বর্ণনা সাবেকি পন্থা; কিন্তু গন্তব্যই যদি একমাত্র কাম্য হয়, তবে পথের প্রাচীনতায় আপত্তি করলে চলবে না; এক্ষেত্রে বরং পুরাতনেরই আদর বেশি, কেননা সেটাতেই আমরা অভ্যস্ত, দিশারীর দেখাও সেটাতেই মিলে। একথা মনে করলে খুবই অন্যায় হবে যে, পৃথিবীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিকেরা উদ্ভাবনাশক্তির অভাবেই বাঁধা পথে চলেছিলেন। নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করা টলষ্টয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন হতোনা। তবুও যে তিনি সনাতন পথে চলতে দ্বিধা করেননি, তার কারণ এই যে, আর গত্যন্তর ছিলোনা, সেই পথই ছিলো অনন্যপথ।

অবশ্য "এ রুম্ অফ্ ওয়ান্‌স্ ওন্" যিনি লিখেছেন তাঁকে এ-উপদেশ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। হয়তো ছয়টি প্রাণীর সম্বন্ধসূত্রকে আবিষ্কার করা "দি ওয়েভ্‌স্"-এর লক্ষ্যই নয়, তার লক্ষ্য ছয়টি বিভিন্ন চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় ঐক্য নির্দ্দেশ করা। কিন্তু তাও যদি হয়, তবু বইখানিকে অবশ্যম্ভাবী মনে করা শক্ত। যিনি নিছক পরস্মৈপদের সাহায্যে "দি ওয়েভ্‌স্"-এর একমাত্র জীবন্ত চরিত্র, পর্সিভ্যালকে, অমর সত্তা দিতে সমর্থ, চৈতন্যরূপ সূক্ষ্ম ব্যাপারে তাঁর এই-রকম স্থূল বক্তৃতার দরকার হয়েছিলো, এমন বিশ্বাস নিশ্চয়ই অনুচিত। শ্রীমতী ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্ এত বড় আর্টিষ্ট যে তাঁর কাছ থেকে কেবল সৌখিনি শিল্প নিতে আমরা সব সময়েই নারাজ।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়

সঞ্চয়িতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

রবীন্দ্রকাব্যের পরিসর এতই বিস্তৃত যে, তাহাকে সমগ্রভাবে জানিবার মত উৎসাহী পাঠক চিরদিনই বিরল থাকিবে। তাই কাব্যামোদীগণের জন্য পরিচায়ক চয়ন-গ্রন্থের প্রয়োজন বহু পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছে। নির্ব্বাচকের রুচি ও মতানুযায়ী বিভিন্ন ধরণের চয়নিকাও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া রবীন্দ্রকাব্য প্রচারে সহায়তা করিয়াছে। 'সঞ্চয়িতা'র বিশেষত্ব এই যে, এ-ক্ষেত্রে সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন স্বয়ং কবি। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "এই সঙ্কলন উপলক্ষ্যে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা ক'রে একাজে হাত দিয়েচি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেকদিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করিচি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চল্‌তে আরম্ভ করেচে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌছায় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অত্যাচার।...সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।" তাই সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলিতেছে, একে তিনি বলেন কালাতিক্রমণ দোষ। "ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তাছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেচে।"

"যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমায় দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না।" এই "স্বীকৃত" কবিতাগুলি একত্রে সংগ্রথনের উদ্দেশ্যেই কবি সঞ্চয়িতা প্রণয়নে হাত দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যের প্রভাব প্রথমাবস্থায় এমনই প্রবল ছিল যে, মানসীর "ভালোবাসা ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি যে সুখেই থাক", এই সুন্দর কবিতাটিকে নির্ম্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু মনে হয়, পরে কবি সঞ্চয়ন অপেক্ষা সঙ্কলনের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন—বাদ দেবার চেয়ে জড়ো করার দিকেই তাঁহার আগ্রহ বেশী। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এই সকল রচনা তাঁহার আদর্শ অনুসারে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; আর তাহাদের মধ্যে ভালো কবিতারও সংখ্যার ইয়ত্তা করা সহজ নহে। এ অবস্থায় সর্ব্বজন-সমাদৃত নির্ব্বাচনে অনেক বিপদ। কবি নিজেই স্বীকার করিতেছেন—"এরকম সঙ্কলন কখনই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হয়ে যায় না।" তাছাড়া "এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছে করেচি তার অনেকগুলিই দেওয়া হোলো না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হ'তে হ'তে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীত মনে আত্মসংবরণ করেচি।"

এই প্রসঙ্গে আমরা কবির নিকট—বঙ্গভাষার পাঠকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে—দুটি নিবেদন জানাইতেছি। এক: তাঁহার অনুমোদিত সমস্ত সুনিশ্চিত কবিতার সুলভ সংস্করণ প্রকাশ। কারণ, কোনো চয়নিকাতেই তাঁহার বিশাল কবিপ্রতিভার সম্যক পরিচয় সম্ভব নহে। দুই: আর একখানি চয়ন-গ্রন্থের প্রণয়ন, যাহাতে থাকিবে শুদ্ধ সেই কবিতাগুলি যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়। আমরা অপত্য-

স্নেহের অপক্ষপাতিত্বে এমনই বিশ্বাসবান নহি যে মনে করিতে পারি যে কবির নিকট তাঁহার সমস্ত কবিতারই সমান দর বা সমান আদর। এইরূপ একশত কি দেড়শত কবিতার সঙ্কলন বাঙ্গালী পাঠক সমাজে মহাসমাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে কবির মনের একটি দিকের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন সঞ্চয়িতার বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের এতগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার একত্র সমাবেশ আর কোনো সঙ্কলনে হয় নাই। কবিতাগুলি সময়ক্রমে সজ্জিত হওয়ায় কবির সৃজনী-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি মাত্র ত্রুটি, মুদ্রাঙ্কন প্রমাদ। বোধ হয় জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশের তাড়া তাহার জন্য দায়ী। আশা করা যাক, দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা বিদূরিত হইবে। আর মূল্য? সাহিত্যিক মূল্যের কথা বাদ দিয়াও সুধু গ্রন্থের আয়তন ও শোভন সংগঠনের কথা মনে রাখিলে মূল্য সম্বন্ধে কোনো নালিশের কারণ থাকে না।

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ রায়

বাস্তবিকা—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা

বিদেশের সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে realism-এর আবহাওয়া আনতে গিয়ে তরুণ সাহিত্যিকেরা কি রকম আবর্জ্জনার সৃষ্টি করেছেন, সেই দেখিয়ে দেওয়াই এই ব্যঙ্গ-রচনার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য; একবার বসে কিন্তু বইখানি আদ্যন্ত পড়া যায় না, একঘেঁয়ে রসিকতায় মন পীড়িত হয় আর মনে হয় অপরাধের তুলনায় শাস্তি কিছু গুরুতর হ'য়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় ব্যক্তিগত কটাক্ষের আভাস পেয়ে ক্ষুণ্ণ হতে হয়। আইন বাঁচিয়ে "জবাবদিহি" দিয়েছেন বটে কিন্তু সেটাও যেন বিগ্রহগৃহের কদলীভক্ষকের সাফাই।

বইখানির ভাষার সুখ্যাতি করতেই হবে। ছাপা বাঁধাইও ভাল।

মানস সরোবর ও কৈলাস—শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও বসুমতী সাহিত্যমন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে লেখা একখানি ভ্রমণ-কাহিনী। ঐ দুর্গম তীর্থের যাত্রীদের খুবই দরকারে আসতে পারে। "রাবণ হ্রদের" বর্ণনা মনোরম কিন্তু ঐ জায়গাটুকু ছাড়া বইখানির মধ্যে আর কোথাও লেখকের সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

চৈতালী ঘূর্ণি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখে কষ্টে, জমীদারের অত্যাচারে নাস্তানবুদ হ'য়ে, স্ত্রীর হাত ধরে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠ শেষে এক কারখানায় কুলির কাজ নিলে। সেখানকার নিদারুণ অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে "বাবুদের" কথা শুনে কতকগুলি কুলির সঙ্গে সে ধর্ম্মঘট করলে। শেষ পর্য্যন্ত পেটের দায়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে হাতুড়ীর ঘায়ে গোষ্ঠ প্রাণ হারালে। "বাবুদের" দ্বারা Self-consciousness জাগাবার চেষ্টা, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি করা আপাততঃ "চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণীর মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী" হ'লেও লেখকের বিশ্বাস "চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণী, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।"

বইখানি দরদ দিয়ে লেখা। কুলি-বস্তির ছবি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

পাঠকগোষ্ঠী

["পরিচয়ে" প্রকাশিত প্রবন্ধাদি-সম্বন্ধে পাঠকগোষ্ঠীর মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই এই পরিচ্ছেদের সূচনা। সমালোচনা পত্রাকারে ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।]

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু—

"পরিচয়ে"র "পাঠকগোষ্ঠী"তে "পরিচয়" সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া দুই একটা কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

বাঙ্গলা উচ্চশ্রেণীর সাময়িক মাত্রেরই প্রত্নতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রবন্ধে অনেকগুলি পাতা ভরান বহুদিন হইতেই আভিজাত্যের একটী লক্ষণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার সবগুলিতেই পদার্থ থাকে কিনা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে তাহার বেশীর ভাগই যে অপাঠ্য আর সেগুলিতে ঠেকিলে তাঁহারা পাতা উল্টাইয়াই যান, একথা জোর করিয়াই বলা যায়। মাননীয় যোগেশচন্দ্র রায়ের "বাড়বাগ্নি" বা গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "সত্য, রজঃ, তমঃ" জাতীয় প্রবন্ধ কদাচিৎই মিলে। সেগুলি অপাঠ্যও হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ এ কোঠায় পড়ে কি? যাহা হউক, আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরের কথা যখন অনধিকারচর্চ্চা তখন তাঁহারা না হয় মাথায়ই থাকুন। কিন্তু অন্য পাতাগুলিতে, অন্ততঃ বোধ হয় নূতন কাগজের কাছে, বাঙ্গালী পাঠক আরও কিছু দাবী করিতে পারে। উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গলা কাগজ খাঁটি সাহিত্যে আপনার বৈশিষ্ট্য রাখিবার উচ্চাশা লইয়াই শুধু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু "সাধনা" বা "সবুজপত্রে"র মত জোর কপাল নহিলে তাহা [illegible] পূর্ণ হইবার নয়। কারণ এক একটী রবীন্দ্রনাথ কোন সাময়িকপত্রের ফরমাস বা তাগাদামত জন্মান নি। কাজেই ঐ সব উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাগজকেও অবিলম্বেই সাধারণের কোঠাতেই নামিয়া আসিতে দেখা যায়। আর সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ই বাঙ্গালী পাঠকের অদৃষ্টে জুটিতে থাকে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কাগজ যদি কেবল খাঁটি সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকারের দুরাশা ছাড়িয়া আরও নানা বিষয়ে দৃষ্টি দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও মিটিতে পারে, পাঠকেরাও উপকৃত হয়। যেমন "পরিচয়" বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় দিবার ভার লইয়া খুবই আবশ্যকীয় কাজে হাত দিয়াছেন এবং একটী অভাব মিটাইতেছেন। এই পাঠকগোষ্ঠীও বাঙ্গলা কাগজে অনেকটা নূতন জিনিষ। তেমনি যে সব ঘটনা, সমস্যা, চিন্তা জগতের এবং আমাদেরও মনের দুয়ারে আসিয়া পড়ে, সে সকল বিষয়ের সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ উচ্চশ্রেণীর কাগজেরই কাজ। যেমন এখন টাকার বাজার, বর্ত্তমানে পৃথিবীর আর্থিক ব্যবস্থা, আমাদের দেশই বা সেজন্য কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এ সম্বন্ধে উত্তম পরিকল্পনাই বা কি ইত্যাদি, অর্থনীতি সম্বন্ধে দক্ষ, জ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ অথচ সাধারণের বোধগম্য সুলিখিত প্রবন্ধ ইহাতে থাকা উচিত। তেমনি মাঞ্চুরিয়া লইয়া জাপানে কেনই বা টানাছেঁড়া চলিতেছে, সেখানকার আভ্যন্তরীন অবস্থাদি এই [illegible]য় জানাইতে হয়। সামাজিক, নৈতিক, যৌন ও মঙ্গলকর্ম্মাদি বিষয়ক এত যে [illegible] চিন্তাদর্শ এখন আসিতেছে বাঙ্গলা উচ্চশ্রেণীর কাগজ ত প্রায় তাহা অস্পৃশ্য

করিয়াই রাখিয়াছেন। সাপ্তাহিক এবং নিচুদরের মাসিকেই মাত্র এ সব বিষয়ের আলোচনা অতি খেলোভাবে হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর মাসিকে ঘটনার ফিরিস্তিই মাত্র দেখা যায়। ইহারও আবশ্যকতা আছে; কিন্তু কেবল সংবাদ ও সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া এক একটী বিষয়ের বিশদ তথ্যও সাধারণকে জানান ও সে সম্বন্ধে শিক্ষাদান দরকার। ইহাতে কাগজের বৈচিত্র্য, চিত্তাকর্ষকত্বও অনেক বাড়িতে পারে। এবং নির্জ্জলা সাহিত্যিকতার মোহে যে সকল রদ্দি-মাল দিয়া তাঁহাদের কাগজ ভরাইতে হয় তাহার আবশ্যকতাও অন্ততঃ কমে। বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর লেখা প্রচলিত না হওয়ায় ইহার লেখকও তেমন নাই বলিয়া বোধ হয়। কয়েকটী বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পরই বাঙ্গলা লেখকের সাধারণ স্তর অনেক নিচে পড়িয়া যায়। রূপসাহিত্যের প্রেরণা বা সেদিকে আপনাদের প্রেরণা আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই প্রধানতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। তা' ছাড়া অন্য চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকে এখনও ইহাতে তেমন হাত দেন নাই। নূতন ভাল কাগজগুলি যদি ইহাদের লেখায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে চিন্তাজগতের নানা বিভাগেই বাঙ্গলা সাহিত্যও পুষ্টিলাভ করিতে পায়। পাশ্চাত্য বিশিষ্ট পত্রগুলির এবিষয়ে যথেষ্টই মনোযোগ দেখা যায়। কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কোন কাজ ও চিন্তায় নিযুক্ত অনেকের মত সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রকাশ করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে বাদানুবাদ, আলোচনার বন্দোবস্তও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। অবশ্য অন্য শিক্ষাসাধ্য বিষয়ে পণ্ডিতলোকেরা যেমন বলিতে পারেন, সামাজিক নৈতিকাদি বিষয় যাহা মেয়েদের স্পর্শ করে, তাহাতে তাঁহাদের মতামত সুবিধার না হওয়াই সম্ভব। তবু এসব সম্বন্ধে খেলো আলোচনা ত চলিতেছেই, উহাদের সকলের মতামত প্রকাশ পাইলে যাঁহাদের সে বিষয়ে আগ্রহ আছে, তাঁহারা তাহার উত্তর দিতেও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

* * * * * *

পরিচয় সম্পাদকেষু—

গত সংখ্যার পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" প্রবন্ধে রূপসাগরে গানটির যে মাত্রা বিভাগ (scansion) করেছেন তা এই :—

২	১		১	১	১		২	১		১	১	১		ইত্যাদি।*
রূ	পসা		গ	রে	-		ডু	বি		য়ে	ছি	-		(৩৮৮ পৃষ্ঠা

লিখেছেন :—"এম্‌নি ক'রে আগা গোড়া তিনমাত্রা জমে উঠল।" (৩৮৯ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে এ গানটির ছন্দ কাওয়ালির ছন্দ নয়—একতালারই ছন্দ তাঁর এ মাত্রাবিভাগটি আমি ঠিক্ বুঝতে পারি নি ব'লেই এ-প্রশ্ন করছি আপনা পত্র-মারফৎ মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কালি রায়কে। ওটি কি এই ছন্দেই পড়েন তাঁরা? না প্রকৃত চতুর্মাত্রিক্ ছন্দে (প্র বাবুর ভাষায় স্বরবৃত্ত ছন্দে)? আমার সংশয়ের কারণ সংক্ষেপে এই :—

রূপসাগরেরর ছন্দ প্রাকৃত (স্বরবৃত্ত) বাংলায় এত বেশি প্রচলিত যে প গেলেই চতুর্মাত্রিক ঝোঁক মাথার মধ্যে গুণ্‌ গুণিয়ে ওঠে। অন্ততঃ আমার তো